আমার একান্নটি গল্প

ভগীরথ মিশ্র

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৫

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

বহির্বঙ্গোর পক্ককেশ তরুণ
শ্রী চক্রবর্তী অরুণ,
আমার ভালোবাসার দান গ্রহণ করুন।

এক লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস ❖ তস্কর ❑ আড়কাঠি ❑ চারণভূমি ❑ জানগুরু ❑ মৃগয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ ❑ শিকড়ের ঘ্রাণ ❑ আরশিচরিত ❑ ফাঁসবদল। **গল্প-সংকলন** ❖ জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প ❑ লেবারণ বাদ্যিগর ❑ কাকচরিত্র ❑ নির্বাচিত গল্প ❑ চিকনবাবু ❑ মিডফিল্ডার ❑ ভগীরথ মিশ্রর ছোটগল্প ❑ ভগীরথ মিশ্রের গল্প ❑ অ্যাকুয়ারিয়াম ❑ সরস গল্প ❑ শ্রেষ্ঠ গল্প ❑ আমার একান্নটি গল্প। **কিশোর উপন্যাস-গল্প** ❖ দুখু মাঝি ❑ বাতাসীর মন ❑ ছড়ারু গোয়েন্দা ❑ মধুবনের বন্ধুরা ❑ সামনেই সুড়ঙ্গটা শেষ ❑ পুরন্দর ও ধুরন্ধর। **ভ্রমণ-সাহিত্য** ❖ হিমালয়কে ছুঁয়ে বেড়াই ❑ মালয়ের ডায়েরি। **অন্যান্য** ❖ বনসাই চর্চা।

সূচিপত্র

শিকার ও শিকারি

১.

লোকটাকে অনেকক্ষণ ধরে পাঁচিলের ধারে ঘোরাঘুবি করতে দেখে প্রথম থেকেই সন্দেহ জেগেছিল অমলেশের মনে।

এলাকাটা এখনো অবধি বেশ ফাঁকাফাঁকা। নতুন গজিয়ে ওঠা বাড়িঘরগুলোর ফাঁকেফাঁকে দু'চারটে প্লট খালি জমি, এখনো। মানুষজন কিনে রেখে গেছে, পিলার পুঁতে চৌহদ্দি পাকা করেছে, কেউ বা গেঁথেছে হাতখানেক উঁচু পাঁচিল। ন'মাসে ছ'মাসে রিক্সোয় চড়ে আসে, স্বচক্ষে দেখে যায়, নিজেদের সাধের জমিটুকু বেদখল হয়ে গেল কিনা ? কেউ কেউ অমলেশের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে আলাপ পাতিয়ে আশ্বাস দিয়ে যায়, বর্ষার পরপরই শুরু করবে বাড়ির কাজ। তবে সে-কথা শুনে বড় একটা উৎসাহ বোধ করেন না অমলেশ। বাড়িঘর গজিয়ে উঠলেই তো এই ফাঁকাফাঁকা ভাবটা চলে যাবে। গাছগাছালের জঙ্গালের বদলে আবার সেই এক কংক্রীটের জঙ্গাল। তাহলে আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িটা কী দোষ করলো ! দিব্যি থাকতে পারতেন ওখানে। কী দরকার ছিল কোলকাতা মহানগরীর এতএত সুযোগসুবিধে ফেলে এতটা দূরে এসে বাড়ি করবার ! একটুখানি ফাঁকাফাঁকা ... গাছগাছাল ... পাখিপাখাল ..., মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ ..., এ সব তো ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে মহানগরীর মানুষ। কাজেই, থাক্, যতদিন ফাঁকা থাকে ততদিনই ভালো। মাঝেমাঝে রিক্সোয় চড়ে আসুক জমির মালিকেরা, রিক্সোয় চড়েই ফিরে যাক্।

ফাঁকাফাঁকা জমিগুলোতে রাজ্যের ঝোপঝাড়, ... আগাছা জন্মেছে অনাদরে। বর্ষায় তা আরও বেড়েছে। নিচু জমিগুলোতে জল জমে কচুরিপানা, ... শালুক-সাপলা ..., এখনো অবধি নিশুত রাতে, এমন কি সন্ধে প্রহরেও শেয়াল ডাকে একেবারে অমলেশের বাড়ির পাঁচিলের গা ঘেঁসে। অমলেশের বাড়ির পেছন দিকটাতে এখনো অবধি কোনও বাড়িঘর নেই। খানিকটা ফাঁকা নিচু জমি, তারপর নয়ানজুলি, তার ওপারে পীচরাস্তা। জমিটাতে প্রায় বারোমাস অল্পস্বল্প জল জমে থাকে। বনকলমি আর ভাটপিটুলির ঝোপঝাড় দিনদিন কলেবরে বাড়ছে। পাখি-পাখাল, শেয়াল-বেজির দল নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেতেছে। হরেক জাতের পাখিপাখাল দিনভর চরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়, মাঝেমাঝে অমলেশের পাঁচিলের ধারেধারে হেঁটে বেড়ায়। মৃদু গলায় খুব ভয়মেশানো আওয়াজ তুলে ডাকে। তাদের অবিরাম কুঁ..চ..কুঁ..চ আওয়াজ আবহসংগীতের

মতো বাজতে থাকে অমলেশের কানে। মাঝেমাঝে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা ফোটায় ওরা। বাচ্ছাগুলো কিছুদিন মায়েদের সঙ্গে উড়েউড়ে বেড়ায়। একদিন ওরাও বড় হয়ে যায়, কোথায় উড়ে পালায়, অমলেশ তার হদিশ পান না। তবে এতএত পাখিপাখালের মধ্যে ডাহুক কখনো নজরে পড়ে নি অমলেশের। এইসব ঝোপেঝাড়ে যে ডাহুক থাকে, এমনটা কখনোই মনে হয় নি তাঁর। ছেলেবেলায় গ্রামের বাড়িতে, পুকুরপাড়ে, ঝোপেজঙ্গলে অজস্র ডাহুক থাকতো। মাঝেমাঝে একপাল বাচ্চা নিয়ে ওরা খুব ভারিক্কি চালে ঘুরে বেড়াতো। ওদের চোখের মণিজোড়ায় এক আশ্চর্য মমতা লেগে থাকতো সারাক্ষণ। কতদিন, খুব ভোরবেলায়, বিছানায় শুয়েশুয়ে অমলেশ শুনতে পেয়েছেন জানালার বাইরে থেকে ভেসে আসা বাচ্চা ডাহুকের কুঁচ... ...কুঁচ ডাক। শহুরে ফ্ল্যাটে থাকতে থাকতে কতদিন যে ডাহুকের ডাক শোনা হয়ে ওঠে নি তাঁর! ডাহুকেরা যে এই দুনিয়ায় বেঁচে রয়েছে, সেটাই তো একটু একটু করে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। এই আধা-গ্রাম পরিবেশে বাড়ি বানানোর পর বহুদিন বাদে আবার ডাহুকের মতো দুর্লভ পাখিদের ডাক শুনতে পাচ্ছেন তিনি। ডাহুকের ডাক আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কৈশোরের সেই গাঁয়ে। ডাহুকেরা এখনো বেঁচে রয়েছে তাহলে! খুব সন্তর্পনে, ধূর্ত মানুষের চোখ এড়িয়ে এখনো অবধি টিকে রয়েছে ওরা! ভাবতে ভাবতে অমলেশ চমৎকৃত বোধ করেন। পেছনের জমিটার মালিক দু'তিন মাস অন্তর আসেন। জমিটাকে অপরিসীম মমতা নিয়ে দেখেন। অমলেশের সঙ্গে আলাপটাও ঝালিয়ে নেন প্রতিবারেই। বলেন, সামনের হপ্তায় লেবার পাঠিয়ে দেব। ঝোপঝাড়গুলো সাফ করে দিয়ে যাবে। অমলেশ হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, কী দরকার? থাক্ না। বেশ তো সবুজ রয়েছে পেছনটা। পাখিপাখাল, বেজি, শেয়াল, দিব্যি আস্তানা পেতেছে। বেশ অভয়ারণ্য গোছের লাগে। ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেখতে থাকেন অমলেশকে। সাফ করবার খরচাটা বেঁচে গেল বলে সামান্য খুশিও হন বুঝি।

লোকটা ঘুরঘুর করছিল ঐ ঝোপঝাড়ের মধ্যেই। মাঝেমাঝে উচুঁ ঢিবিমতো জায়গাটায় বসে থাকছিল চুপটি করে। আরও কী-কী যেন করছিল, পাঁচিলের এদিক থেকে ঠিকঠিক দেখতে পাচ্ছিলেন না অমলেশ। কিন্তু মনের মধ্যে থিকথিক করছিল সন্দেহ। লোকটার উপস্থিতি যেন কাঁটার মতো বিঁধে ছিল মনে।

এই এলাকায় মাঝেমাঝেই উটকো লোকজন ঘোরাঘুরি করে। কাগজ-কুড়ুনিগুলো রোজ দুপুরের দিকে নিয়ম করে আসে। কাদের যেন গরুটরু চরতে নামে মাঝেমাঝে। কাদের গরু, কোত্থেকে আসে, অতশত খোঁজখবর রাখেন না অমলেশ। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে কাঁচা গোবর কুড়িয়ে বেড়ায় একটা খনখনে বুড়ি। ঐ দিয়ে সে নাকি ঘুঁটে দেয়। ঐ ঘুঁটে বেচে নাকি সংসার চালায়। এই লোকটা ওদের কারোর মতোই নয়। একেবারে অন্যরকম। কুচকুচে কালোটি, রোগা, সিড়িঙ্গে, ... পাতলা লালচে চুল লতিয়ে নেমেছে ঘাড় অবধি। লোকটার সঙ্গে ইতিমধ্যেই পাঁচিলের এধার থেকে চোখাচোখি হয়েছে, আর তাতেই অমলেশ বুঝেছেন, লোকটা ট্যারা। আর, ওপরের মাড়ির খানতিনেক দাঁত ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে। লোকটার হাঁটন-চলন, ট্যারা চোখে ইতিউতি চাউনি, ... দেখতে দেখতে অমলেশের এও মনে হয়েছে, লোকটা কাগজ কিংবা গোবর-কুড়িয়ে

নয়। এলাকাটা নির্জন হওয়ার সুবাদে এই নতুন গড়ে উঠা ছড়ানোছেটানো পাড়াটাতে নানান জাতের উটকো লোকজন ঘোরাঘুরি করে দিনভর। কুয়ো-কাটিয়ে, বাসনওয়ালা, কুলপিওয়ালা, আচারওয়ালা, ভুজিওয়ালার আনাগোনা খুবই। দিনের মধ্যে দশবার 'খবরের কাগজ—লোহা ভাঙা—শিশিবোতল—বেচবেন—' কিংবা 'পুরাতন কাপড়চোপড়ের বদলে পিলাস্টিকের বালতি, মগ, বদনা, গামলা নিন — 'হেঁকে যায় ফেরিওয়ালার দল। এরা সাধারণত আসে ভরদুপুরে, যখন বাড়ির পুরুষেরা সবাই কাজকর্মে বেরিয়ে যায়, উঠতি ছেলেমেয়ের দল স্কুলে, ঘরে থাকে কেবল মেয়েরা আর বাচ্চারা। তাছাড়া, অকারণে সাইকেলে টুং-টাং ঘন্টা বাজিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে যায় কিছু ভিনপাড়ার ছোকরা। তারা এ-পাড়ার কোনও বাড়িতেই আসে না, এ-পাড়ার রাস্তা ধরে অন্য পাড়াতেও যায় না, তারা এই পাড়াতেই ঢোকে, কিছুক্ষণ এ-গলি ও-গলি চক্কর মেরে ফিরে যায়। এ লোকটি ওদের কারোর মতোই নয।

আজও সেই সকাল থেকে লোকটা অমলেশের বাড়ির পেছনের দিকের পাঁচিলের গা ঘেঁসে ঘুরঘুর করছিল। অমলেশ কখনো তার শরীরের উর্ধ্বভাগ দেখতে পাচ্ছিলেন, কখনো বা শুধুই ওর পায়ের খসখস, ছপছপ আওয়াজ ভেসে আসছিল কানে। ছুটির দিনে নিজস্ব কাজকর্মের মধ্যেও অমলেশ লোকটিকে মনোযোগের বাইরে রাখতে পারছিলেন না কিছুতেই। একজন কুৎসিৎ-দর্শন মানুষ তাঁর পাঁচিলের গা ঘেঁসে সমানে ঘুরঘুর করছে, মাঝে মাঝেই ইতিউতি তাকাচ্ছে, সে ঠিক কী করছে বোঝা যাচ্ছে না ... ব্যাপারটা অমলেশের কাছে আগাগোড়া খুবই অস্বস্তিকর। কাজেই অমলেশ ছুটির দিনের কাজকর্ম ফেলে রেখে পায়েপায়ে পাঁচিলের গা ঘেঁসে দাঁড়ান। তেরচা চোখে লক্ষ করতে থাকেন, লোকটা ঠিক কী করছে ওখানে! ততক্ষণে লোকটি চুপচাপ বসে পড়েছে একটা ঝোপের আড়ালে। ওর দৃষ্টি বিঁধে রয়েছে সামনের কোনকিছুর ওপর। একসময় অমলেশ খুকখুক করে কাশেন। কাশির শব্দে ঘাড় ঘোরায লোকটি। অমলেশকে দেখতে পায়। যদিও বা যৎসামান্য অস্বস্তি জমে লোকটার মুখে, অল্পক্ষণই থিতু হয় তা। পরক্ষণেই নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অমলেশের দিকে। তাই দেখে খুব রাগ হযে যায় অমলেশের। চড়া গলায় শুধোন, কী করছো হে এখানে? অমলেশের প্রশ্নটাকে বড় একটা আমল দেয় না লোকটা। ঝোপের আড়ালে বসেই থাকে। তবে সেই টানটান মনঃসংযোগে কিঞ্চিৎ চিড় ধরে বুঝি। মনের মধ্যে সন্দেহটা গাঢ় হয় অমলেশের। বেশ বুঝতে পারেন, ওঁর দাঁড়িয়ে থাকাতে লোকটির কোনও কারণে অসুবিধে হচ্ছে। মূলত সেই কারণেই অমলেশ ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে থাকেন। লোকটির ঠিক কী ধরনের অসুবিধে হচ্ছে, বোঝা দরকার।

লোকটা বসেই থাকে, মাঝেমাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে খুব অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে থাকে অমলেশকে। সময় নিঃশব্দে বয়ে যেতে থাকে।

একসময় ঝটিতি উঠে দাঁড়ায় লোকটা। সামনের ঝোপটার দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়। এবং অমলেশ দেখতে পান, বাঁশের তৈরি ফাঁদের মধ্যে একটা ডাহুক। এতক্ষণে সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় অমলেশের কাছে। লোকটা ফাঁদ পেতে ডাহুক ধরছে!

ডাহুকশুদ্ধু ফাঁদটা ডানহাতে দোলাতে দোলাতে ঢিবির কাছে ফিরে আসে লোকটা।

এতক্ষণে অমলেশ দেখতে পান, সামনের ঢিবিমতো জায়গাটায় একখানা বাঁশের খাঁচা রয়েছে। লোকটা ডাহুকটাকে ফাঁদ থেকে বের করে খাঁচার মধ্যে ভরে দেয়। পাখিটা কেমন হতচকিত। বোকাবোকা চোখে কুঁকড়ে বসে থাকে খাঁচার মধ্যে। বুকটা অজান্তে টনটনিয়ে ওঠে অমলেশের। এই সুন্দর সকালে একটা সুন্দর অবোধ পাখি মানুষের হাতে বন্দী হয়ে গেল! মৃত্যুর আগে অবধি এই বন্দীত্ব আর ঘুচবে না ওর। পাখিটাকে দেখতে দেখতে লোকটার প্রতি ভয়ানক রাগ হয় অমলেশের। লোকটার দিকে খুব খরখরে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, পাখিটাকে ধরে ফেললে? অমলেশের প্রশ্নটাকে প্রশংসাসূচক ভেবে নিয়ে কান অবধি গদগদ হাসে লোকটা। বলে, আজ খুব জলদি একটা ধরা পড়লো বাবু, নইলে, বড্ড চালাক, ধরা দিতেই চায় না সহজে। ফাঁদ দেখলেই অন্য পথে পালায়।

— এখানে ডাহুক থাকে নাকি? কই, নজরে তো পড়ে নি কখনোই।

— নেই। এই একটাই বোধ করি ছ্যালো। শেয়ালেই খেয়ি নেয় সব।

খাঁচার ভেতরে দৃষ্টি বিঁধিয়ে দিয়ে পাখিটাকে দেখতে থাকেন অমলেশ। একসময় দৃষ্টি ফেলেন লোকটার মুখের ওপর।

— কী করবে এটাকে নিয়ে?

— কী আবার করবো? বেচি দেব। ঐ করেই তো সংসার চলে।

খুব সাবলীল ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতে থাকে লোকটা। খুব আটপৌরে গলায়। শুনে পিত্তি জ্বলে যায় অমলেশের। বলেন, কিন্তু এইভাবে পশুপাখিগুলোকে মেরে ফেললে ওরা যে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শুনে লোকটা কেমন ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকায় অমলেশের দিকে। তারপর, কী মনে হয়, জবাব দেয়, তা বটে।

— তা বটে তো ধর কেন? খেঁকিয়ে ওঠেন অমলেশ।

লোকটা বুঝি অমলেশের বুকের ভেতরের রাগটার হদিশ পেয়ে যায়। বলে, ঐ করেই তো পেট চালাই।

—ঐ করে পেট চালাও? বনের পশুপাখিগুলোকে সাবাড় করে? লজ্জা করে না? অন্য কাজকর্ম করতে পার না?

— দ্যান না একটা কাজ। লোকটা, সম্ভবত নগদপ্রাপ্তির প্রত্যাশায়, ডান হাতের তালু চিৎ করে মেলে ধরে অমলেশের সামনে। অমলেশের জ্বলন্ত দৃষ্টিকে তিলমাত্র পাত্তা দেয় না। বরং ওঁর মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কালো কুচ্ছিৎ দাঁতগুলো বের করে হাসে। তাই দেখে মাথায় রক্ত চড়ে যায় অমলেশের। বলেন, এসব বেআইনি তা জান? বনের পশুপাখি ধরা সরকারি আইনে নিষেধ। ধরা পড়লে জেল হয়ে যেতে পারে।

সে-কথায় লোকটা ভারী অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। বলে, কত বেআইনি কাজকর্মই তো চারপাশ চলতেছে বাবু, এ'তো সামান্য এক পাখি!

আরে! লোকটা তো ভারী পাটাবুকো! দেশের আইনকেও সামান্যতম রেয়াৎ করে না! আবার দাঁত বের করে হাসে! তবুও অমলেশ মনে মনে স্বীকার করেন, লোকটা মিথ্যে বলে নি। দেশজুড়ে বেআইনি কাজকর্মের যেন হিড়িক লেগেছে। কিছু মানুষ বুক

ফুলিয়ে করছে সে সব। ধরবার লোক নেই। বরং যাদের ধরবার কথা, তারাই ওদের সাহায্য করছে। শয়ে শয়ে একর জলাভূমি বেআইনিভাবে বুজিয়ে সেখানে বহুতল বাড়ি বানাচ্ছে। জঙ্গলগুলো সব রাতারাতি লোপাট হয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চোরাই ব্যবসা চলছে। এবং এই ধরনের প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গে দেশের কর্তাব্যক্তিরা জড়িত। এমন পরিস্থিতিতে এই লোকটাকে একটা ডাহুক ধরা নিয়ে আইনের ভয় দেখানোটা হাস্যকর ঠেকে অমলেশের কাছে।

গলাটাকে সামান্য খাদে নামান অমলেশ। নরম সুরে শুধোন, তোমার নাম কি ?

— নিতাই।

— নিতাই, শোন ...। ভয় দেখানোর পথ ছেড়ে অমলেশ এবার বোঝানোর পথ ধরেন,—এই ছোট্ট পাখিটার শরীরে কতটুকুই বা মাংস রয়েছে! একজনারও কুলোবে না। খামোখা এমন সুন্দর পাখিটা মারা পড়বে। কি, ঠিক বলিনি ?

— এক্কেবারে ঠিক। খাঁটি কথা। কিন্তু বাবুরা এই ছোট্ট পাখিটাকেই হুমড়ি খেয়ে কিনবেন।

নিতাইয়ের কথাটা যেন অমলেশের গায়েই বিঁধে যায়। নিতাই-বর্ণিত 'বাবু'দের মধ্যে তিনিও তো পড়েন। মনে মনে সামান্য অস্বস্তি বোধ করেন অমলেশ। বলেন, ক'টাকায় বিকোবে পাখিটা ?

— তা — ভালো খদ্দের পেলে দশটাকাও পেয়ি যেতি পারি।

—দ—শ টাকা! অমলেশ সার্চ-লাইটের মতো দৃষ্টি ফেলেন নিতাইয়ের মুখের ওপর। পর মুহূর্তে তাকান খাঁচাটার দিকে, খাঁচার মধ্যেকার পাখিটার দিকে। পাখিটা সেই তখন থেকে একেবারেই কুঁকড়ে রয়েছে। অমলেশ দেখতে পান, ওর দু'চোখের মণিতে বাসা বেঁধেছে সীমাহীন আকুতি। অমলেশ স্পষ্ট পড়তে পারেন ওর চোখের ভাষা। পাখিটা যেন বলতে চাইছে, তোমার মতো পড়শি থাকতে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে এই উটকো লোকটা ? তুমি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তা ? তোমার কিছুই করনীয় নেই ?

সামান্যক্ষণ কী যেন ভাবেন অমলেশ। তারপর নিতাইয়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, একটুখানি দাঁড়াও। আসছি। চলে যেও না।

ঘরে ঢুকে একখানা দশটাকার নোট নিয়ে পুনরায় পাঁচিলের কাছে ফিরে আসেন অমলেশ। বলেন, এই নাও, দশটাকা। পাখিটাকে আমিই কিনে নিলুম। বলতে বলতে দশটাকাশুদ্ধু ডানহাতটা পাঁচিলের ওপারে বাড়িয়ে দেন অমলেশ।

নিতাই একটুক্ষণ ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে অমলেশের দিকে। ধীরে ধীরে তার ঠোঁটের কোণে হাসি জমে। সারা মুখে আবিষ্কারের আনন্দ। অমলেশের চোখে চোখ রেখে বিড়বিড় করে বলে,ও ... তাই বলুন ...। বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নেয় নিতাই। উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে। আর তখনই অমলেশ দেখতে পান, ওর সারা মুখে বিস্ময়, অবিশ্বাস, এবং চাপা উল্লাস। অমলেশের মনে হয়, পাখিটার দাম সম্ভবত অত নয়। নিতাই নির্ঘাৎ বাড়িয়েই বলেছিল দাম। ওর চোখেমুখে উপচে পড়া উল্লাস দেখে এ ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত হন অমলেশ।

— ভালোই হলো। নোটটা ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে বলে নিতাই, —আমাকে আর

সেই বাজার অবধি যেতি হলো না। বলতে বলতে পায়েপায়ে ঢিবির দিকে চলে যায় নিতাই। পাখিশুদ্ধু খাঁচাটাকে দোলাতে দোলাতে ফিরে আসে। খাঁচাটাকে পাঁচিলের ওপর রাখে। তারপর ডানহাত দিয়ে পাখিটাকে বের করে এনে এগিয়ে দেয় অমলেশের দিকে। বলে, সাবধানে ধরুন বাবু। একটুখান ঢিলে পেলিই ফুরুৎ।

নিতাইয়ের মুঠোর শক্ত টিপুনির মধ্যে হাঁসফাস করছিল পাখিটা। দেখতে দেখতে অমলেশ বলেন, পাখিটাকে নামিয়ে দাও মাটিতে।

অমলেশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নিতাই। দু'চোখের মণিতে পাগল দেখবার বিস্ময়। ওর শক্ত মুঠোর মধ্যে বুঝি দম আটকে আসছিল পাখিটার। তাও অল্প ডানা নাড়াবার চেষ্টা করছিল। মাঝে মাঝে করুণ চোখে তাকাচ্ছিল অমলেশের মুখের দিকে। তাই দেখে অমলেশ খুব বিরক্তি মাখানো গলায় বলে ওঠেন, আহ্, ছাড়ো না ওকে। দাম তো পেয়ে গিয়েছ।

কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে নিতাই। ডাহুকটাকে মাটিতে নামাতে নামাতে সে আবারো ঘাড় ঘুরিয়ে সম্মতি চায় অমলেশের। বলে, ছেড়ি দেবো?

— বললুম তো। রাগে গরগর করতে থাকেন অমলেশ।

— ছেড়ি দিলেই পাইলে যাবে কিন্তু। নিতাই চেতাবনি দেয় অমলেশকে।

— আহ্, কী বলছি, শুনতে পাও না তুমি? কালা নাকি?

নিতাই হাতের মুঠো একটু একটু করে ঢিলে করতে থাকে। শেষবারের মতো বলে, ছেড়ি দিচ্ছি কিন্তু।

অমলেশ কটমট চোখে তাকিয়ে থাকেন নিতাইয়ের দিকে। দু'চোখ দিয়ে নিঃশব্দে আগুন ঝরাতে থাকেন।

একসময় মুঠোটাকে পুরোপুরি আলগা করে দেয় নিতাই। ছাড়া পাওয়া মাত্রই দৌড়াতে শুরু করে পাখিটা। মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

নিতাইয়ের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়। ঠিক উন্মাদের দিকে যেমন করে তাকায় মানুষ, ঠিক তেমন করেই দেখতে থাকে অমলেশকে। ভেতরে ভেতরে কেমন জানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে লোকটা।

অমলেশ চোখ পাকিয়ে বলেন, এবার বাড়ি যাও। আর কক্ষনো এই মহল্লায় পাখি ধরতে এসো না। এসব আমরা পছন্দ করি নে।

ট্যাঁকে বামহাতটা বোলাতে বোলাতে বারবার দশটাকার নোটটার ছোঁয়া নেয় নিতাই। তারপর খালি খাঁচাটা দোলাতে দোলাতে নয়ানজুলি পেরিয়ে বড়রাস্তায় গিয়ে ওঠে।

নিতাই পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেলে পর অমলেশ ঝোপঝাড়গুলোর দিকে তাকান পাখিটাকে আর একবার দেখবার আশায়। বিশেষ করে ওর চোখদুটো। চোখের মণিজোড়ায় কতখানি স্বস্তি, কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলো, দেখতে ভারী ইচ্ছে করছিল তাঁর।

২.

পরদিন সকালে পাঁচিলের ওপারে নিতাইকে দেখে খুবই বিস্মিত হন অমলেশ। ঝোপঝাড়ের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছিল। এবং অমলেশ দেখতে পান, ঢিবিমতো উঁচু জায়গাটাতে আগের দিনের মতো খাঁচাটি বসানো রয়েছে।

গতকাল শেষ-বিকেলে পাঁচিলের কাছটাতে গিয়েছিলেন অমলেশ। ডাহুকটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছিল। এক সময় অমলেশের সঙ্গে ক্ষণিকের চোখাচোখিও হয়েছিল ওর। এবং অমলেশের মনে হয়েছিল, পাখিটার দু'চোখ দিয়ে কৃতজ্ঞতা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। অমলেশের দিকে তাকিয়ে ও যেন বলছে, বড্ড বাঁচিয়ে দিয়েছ আজ! নইলে এতক্ষণে কেউ না কেউ ঝোল বানিয়ে খেয়ে ফেলতো আমাকে। গেল সন্ধেয় অনেক চোখ চারিযেও আর দ্বিতীয় ডাহুক দেখতে পান নি অমলেশ। আজ নিতাইকে দেখা মাত্র সেই কারণেই ধন্দ জমে অমলেশের মনে। একটাই তো পাখি রয়েছে পুরো ঝোপজঙ্গলে ঢাকা জমিটাতে, অমলেশের কেনা পাখি সেটা, লোকটা তবে কীসের আশায় আবার এসেছে আজ!

অমলেশের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র হাসে নিতাই। দেখে পিত্তি জ্বলে যায় অমলেশের। বলেন, আবার এসেছ যে বড়?

— আজ্ঞে ... উই পেটের জ্বালায়। নিতাই খুব অপ্রস্তুতের হাসি হাসে।

অমলেশের দু'চোখ কপালে উঠে যায়। বলেন, তুমি কি আজ আবার ডাহুক ধরতে এসেছ নাকি?

— ডাহুক ছাড়া এখানে আর কীই বা আছে বাবু? খুব নির্দোষ হাসি হাসে নিতাই। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়। ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে অমলেশকে চুপ করতে বলে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সামনের ঝোপটার দিকে। অমলেশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিতাইয়ের দিকে। অফিস বেরোবেন, চানের বেলা বয়ে যায়, কিন্তু ব্যাপারটা শেষ অবধি না দেখে যেতেও পারছেন না।

একটু বাদে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে নিতাই। এবং অমলেশ দেখতে পান, ওর দু'হাতের চেটোর মধ্যে ছটফট করছে একটি ডাহুক। নিতাইয়ের সারা মুখ সাফল্যের হাসিতে উজ্জ্বল।

দেখতে দেখতে ভীষণ রকমের রাগ চড়ে যায় অমলেশের মাথায়। চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, আবার তুমি ডাহুক ধরেছ আজ? কাল যে অত করে বললুম তোমায়? করকরে দশটা টাকাও যে দিলুম?

—কালকের টাকাটা বড্ড কাজে নেগেছে বাবু। বিনয়ে গদগদ হয় নিতাই, —কালকে ঐ টাকাটা না পেলে হাঁড়ি চড়তো নি বাড়িতে। বালবাচ্চা নিয়ে উপোস দিতি হতো।

—কিন্তু কাল যে টাকাটা দিয়ে অত করে বললুম তোমায়, আর এদিকে এসো না—।

— বা-রে কাল একটা ডাহুক ধরিছি বলে আজ আর ধরতি পারবো নি? নিতাইয়ের দু'চোখ দিয়ে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ে বুঝি, — আজ আমি তবে খাবো কি? আপনি তো কোথাও চাকরি করেন নিশ্চয়। মাস-মাইনে একবার মাত্তর পেলে আপনার সারাজীবন চলি যায়?

বটে! আচ্ছা ধড়িবাজ লোক তো! কথার কী প্যাঁচ! তাও ভেতরের উথলে ওঠা রাগটাকে কোনগতিকে গিলে ফেলেন অমলেশ। বলেন, কিন্তু গতকাল যে ডাহুকটা

আমি কিনে নিয়েছি তোমার থেকে, সেটা তো এখন আইনত আমার ডাহুক। ওটা তুমি দ্বিতীয় বার ধরতে পার না।

এমন কথায় সামান্য ক্ষণের জন্য বুঝি হকচকিয়ে যায় নিতাই। পরক্ষণে দু'চোখে মজা মাখিয়ে তাকায় অমলেশের দিকে। হলদেপানা দাঁতে হাসে। বলে, এটা সে ডাহুক নয় গো বাবু। এটা অন্য ডাহুক।

লোকটা বলে কি! অমলেশ কটমটে চোখে তাকিয়ে বলেন, তাহলে আমারটা কোথায় গেল?

— সে নির্ঘাৎ অন্যত্র চলি গিয়েছে।

— বাজে বকো না। অমলেশ ধমকে ওঠেন, —এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা ডাহুকই তো ছিল। তুমিও তো কাল বললে, একটার বেশি নেই।

—কী যে বলেন বাবু, ডাহুক কখনো একটা মাত্তর থাকে? ওরা দল বেঁধি থাকে। পশু-পেরানীদের মধ্যে কেবল একটা জানোয়ারই একলা একলা থাকতি ভালোবাসে।

— কী সে জানোয়ার, শুনি?

—আজ্ঞে, বড় মিঞ্যা। বুঝলেন তো? বাঘ। বাঘ কখনো দলে দলে থাকে না। জঙ্গালে একটা এলাকা জুড়ে একটা মাত্তর বাঘ থাকে। অন্য বাঘকে নিজের এলাকায় ঢুকতি দেয় না। ডাহুক তো আর বাঘ নয় যে, একটা এলাকায় একটা মাত্তর থাকবে।

অমলেশ বোঝেন, লোকটাব সঙ্গো কথায পেরে ওঠা মুশকিল। একটুক্ষণ পাথরেব মতো দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। নিতাইয়ের হাতে ধরে থাকা ডাহুকটাকে দেখতে দেখতে তাঁর মনে হয়, এটা কালকের ঐ ডাহুকটা না হয়ে যায় না । ওর চোখের চাউনিটাই বলে দেয় তা। একসময় নিতাইয়ের দিকে খরদৃষ্টি হেনে বলেন, একটুখানি দাঁড়াও।

নিতাই সবগুলো হলদে দাঁত বের করে হাসে। বুঝিয়ে দেয়, দাঁড়াতে বিলক্ষণ রাজি সে। কেন কি, বাবু একটা সিন্ধান্ত নিতে চলেছেন, তাঁকে একটুখানি সময় দিতে হবে বৈকি।

একটু বাদে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন অমলেশ। অত্যন্ত বিতৃষ্মা সহকারে একখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দেন নিতাইয়ের দিক। বাঁ-হাত দিয়ে ডাহুকটাকে বগলের সঙ্গো শক্ত করে চেপে ধরে ডানহাতটা অমলেশের দিকে এগিয়ে দেয় নিতাই। নির্বিকার মুখে নোটখানা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। তারপর সামান্য ইতস্তত করে তাকায় অমলেশের দিকে। বলে, ছেড়ি দেব, নাকি রাখবেন? অমলেশ ইঙ্গিতে ছেড়ে দিতে বলা মাত্তর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ডাহুকটাকে ছেড়ে দেয় জমিতে। তারপর খালি খাঁচাটাকে দোলাতে দোলাতে নয়ানজুলি পেরিয়ে চলে যায় রাস্তার ওপারে। ততক্ষণে ডাহুকটা গেল-দিনের মতোই হারিয়ে গিয়েছে ঝোপেঝাড়ের মধ্যে।

৩.

পরের দিন নিতাইকে নগদ দশটাকা দিয়ে বিদেয় করেই অমলেশ সোজা থানায় গিয়ে হাজির হন। প্রায় হেদিয়ে পড়ে সবকিছু খুলে বলেন বড়বাবুকে। শুনতে শুনতে বড়বাবু খুব অবাক চোখে দেখছিলেন অমলেশকে। পলক পড়ছিল না তাঁর চোখে। একসময় বলেন, আপনার কি কোনও কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা, সমস্যাদি নেই?

— মানে? বড়বাবুর দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকেন অমলেশ।

— মানে, সংসার-টংসার করেছেন, নাকি নিজেও পাখির মতো উড়ে বেড়ান?

— কেন? এমন প্রশ্ন উঠছে কেন?

— না, বলছিলুম কি — সংসার-টংসার না করলেই তো ঝাড়া-হাত পা হয়ে যায় মানুষ, কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না, ঝুটঝামেলা থাকে না, তখন সে এই ধরনের সিলী ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে টাইম কিল করতে পারে। হাতে কোনও কাজকর্ম না থাকলে মানুষ এমনতরো অ্যাকুাট রোমান্টিসিজমে ভোগে বলে শুনেছি।

— এ কী বলছেন আপনি? এতে রোমান্টিসিজমের কী আছে? পরিবেশ রক্ষার কথাটা ভাববেন তো। পাখি-পাখালের প্রজাতিগুলো দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে । এমন হতে থাকলে ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স বলে কিছু থাকবে? সারা পৃথিবী জুড়ে এসব ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের সরকারও একটা আলাদা দপ্তর খুলেছে। পরিবেশ দপ্তর।

— ওটা মশাই দু'একজন মন্ত্রীকে অ্যাকোমোডেট করবার জন্য। নইলে, অ্যাইসান চেল্লাবে, ভেতরে-বাইরে এমন সাবোতাজ করতে থাকবে—, আসলে, ম্যান-ম্যানেজমেন্ট যে আজকের দিনে কী প্রোব্লেম! সবাই খালি মন্ত্রী হতে চায়।

— তাহলে, আপনি বলতে চান, পরিবেশ গোল্লায় যাক, জীবজন্তু, পাখিপাখাল সব নিকেশ হতে থাক, আপনাদের কারোরই কোনও দায়দায়িত্ব নেই? আচ্ছা একটা কথা ভেবে দেখুন তো—।

— দুর মশাই, কী শুরু করেছেন তখন থেকে? লোক্যাল এম-এল-এ'র শালার বউয়ের বলে হার ছিনতাই হয়েছে, আমাকে বলে এক্ষুনি বেরোতে হবে, ... কোথাকার কে ডাহুক ধরেছে ... যত্তোসব!

বড়বাবু জীপে উঠে বসা মাত্তর জীপটা হুশ করে বেরিয়ে যায়।

৪.

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমলেশ বোঝেন, ন'টা বেজে গিয়েছে। তার মানে নিতাইয়ের আসার সময় হলো।

অমলেশ থানায় গিয়েছিলেন পরশু। কাজের কাজ কিছুই হয় নি। বেশ খানিকটা জ্ঞান দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন বড়বাবু। গতকালও নিতাইকে পাখির দাম বাবদ নগদ দশটাকা গুনে দিতে হয়েছে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছে। খুব ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব করে অমলেশের কথাগুলো শুনেছিলেন তিনি। অবশেষে বলেছিলেন, একটা দরখাস্ত রেখে যান, আমরা পরিবেশ দপ্তরে পাঠিয়ে দোবো। সব মিলিয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন অমলেশ। এই ক'দিনে তিনি বুঝে গিয়েছেন, মানুষের শ্যেনদৃষ্টির থেকে এই অসহায় পাখি-পাখালগুলোকে বাঁচাবার কোনও ব্যবস্থাই নেই এদেশে।

এখন সাড়ে ন'টা বাজে। নিতাই হয়তো বা এতক্ষণে পাঁচিলের ওপারে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু আজ অমলেশ সকাল থেকেই স্থির করে ফেলেছেন, আজ আর পাঁচিলের ঐদিকটাতে যাবেনই না। যাওয়া মানেই তো অসহায় পাখিটার সঙ্গে

চোখাচোখি হওয়া। মনটা দুর্বল হয়ে যাবেই। তার মানে, পাখিটাকে ঐ জল্লাদ লোকটার হাত থেকে ছাড়াতে অমলেশকে গাঁটগচ্চা দিতে হবে করকরে দশটা টাকা। কিন্তু সেটা তো আর রোজরোজ সম্ভব নয়। অমলেশ এমন কিছু কোটিপতি নন যে রোজরোজ একটা ডাহুককে মুক্ত করতে গিয়ে দশটা করে টাকা খরচ করে যাবেন দিনের পর দিন। তার চেয়ে এই ভালো। গেলেনই না ওদিকটায়। গেলেই তো দেখতে হবে খাঁচাবন্দী পাখিটার করুণ একজোড়া চোখ, মায়া জাগবে মনে, আর তাহলেই তো টাকা দিয়ে পাখিটাকে ছাড়াতে ইচ্ছে করবে। তার চেয়ে বরং পাঁচিলের ওপারে কে কী করছে, নজরে না পড়লেই হলো।

ঘরের মধ্যে অন্যমনস্ক বসে ছিলেন অমলেশ, একসময় পাঁচিলের ওপার থেকে নিতাইয়ের গলা খাঁকারির আওয়াজ শুনতে পান। ঝোপঝাড় ভেঙে হেঁটে বেড়াবার আওয়াজও ভেসে আসে। অমলেশ শুনেও শোনেন না। অন্যমনস্ক থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। পেছনের পাঁচিল বরাবর জানালাটা আলগোছে বন্ধ করে দেন। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না তিনি, কানদুটো বেজায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। অমলেশ শুনতে পান, পাঁচিলের ওপারে কার সঙ্গে যেন জোর গলায় কথা জুড়েছে নিতাই। মনেমনে খুব কৌতূহল জাগলেও বহু কষ্টে তা সংবরণ করেন অমলেশ। পণ করেছেন, আজ আর কিছুতেই নিতাইয়ের খপ্পরে পড়বেন না।

একটু বাদে পাঁচিলের ওপার থেকে ভেসে আসে নিতাইয়ের গলা, বাবু—, ও বাবু—।

প্রথমটা সাড়াই দেন না অমলেশ। কিন্তু নিতাইটা যেন নাছোড়বান্দা আজ, বারবার ডাক পাড়তে থাকে সে।

একসময় সারা মুখে বিরক্তি জমিয়ে বাইরে আসেন অমলেশ। দেখেন, পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে নিতাই। আজ আর ডাহুকটাকে খাঁচায় ভরে নি। তার বদলে প্রাণীটার দু'ঠ্যাং ওর বাঁ-হাতের মুঠোয়, মুন্ডুটা মাটির দিকে, ঐ অবস্থায় পাখিটা শূন্যে ঝুলছে।

পাখিটার শরীর থেকে নজর সরিয়ে নেন অমলেশ। খাপ্পা হয়ে শুধোন, কী হলো কী? ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?

নিতাই রাগে না। তিলমাত্র বিকার ঘটে না তার। ঠোঁটের ডগায় হাসিটা ঝুলিয়ে রেখে বলে, আজ অপিস যাবেন না? ছুটি নাকি?

অমলেশ চোখ চারিয়ে দেখেন, ধারেপাশে কেউ নেই। বলেন, কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

— এই পাখিটার সঙ্গো। নির্বিকার মুখে জবাব দেয় নিতাই, —ওকে বলতেছিলাম, চল্ তবে, ঘরে ফিরি। লতুনপাড়ার বাবুটি তোকে না পেলি আজ অশান্তি বাধাবেন। বহুৎদিন বাদে তোর রোস খেয়ে অরুচি কাটাবেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাখিটার সঙ্গো চোখাচোখি হয় অমলেশের। অমলেশ দেখতে পান, ঝুলন্ত অবস্থায় পাখিটা করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওঁর দিকে। অতি দ্রুত চোখ সরিয়ে নেন অমলেশ। নিতাইয়ের শেষ কথাগুলো, ইতিমধ্যেই তো ঢুকে পড়েছে কানে,

মগজ অবধি যাতে পৌঁছতে না পারে, তার জন্য হরেক কিসিমের মানসিক কসরৎ শুরু করেন তিনি। নিতাইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধোন, ডাক পাড়ছিলে কেন?

— এই, এমনি। টেইম কত হলো, জানতে চাচ্ছিলাম। দশটা বেজি গিয়েছে?

পাখিটা নিতাইয়ের বাঁ-হাতে ঝুলছিল। নিতাই কব্জির আলতো মোচড়ে অল্পঅল্প দোলাচ্ছিল ওকে। অমলেশ দেখতে পান, ক্রমাগত ঝুলে থাকতে থাকতে, দুলুনি খেতে খেতে, চোখের মণিদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে বেচারির।

একসময় নিতাই খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠে, ইস্, দেরি হয়ে গেল খুব। চলি বাবু। বলতে বলতে পিছু ফিরে হাঁটতে শুরু করে সে। বাঁ-হাতের দুলুনিটা বাড়িয়ে দেয় দ্বিগুণ। অমলেশের চোখের সামনে পাখিটা ঠিক দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে অবিরাম।

সবে আট-দশ পা মতো গিয়েছে নিতাই, পেছন থেকে ডাক পাড়েন অমলেশ, —এই, শোন—।

নিতাই বুঝি তৈরী ছিল, সঙ্গোসঙ্গো থমকে দাঁড়ায়, —কিছু বলতিছ্যান, বাবু?

রাগে সর্বশরীর জ্বলছিল অমলেশের। ঐ অবস্থায় দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, একটুখানি দাঁড়াও। বলেই পা বাড়ান বাড়ির ভেতরে।

— আজ আর টাকা আনতি গিয়ে লাভ নাই বাবু। প্রায় সঙ্গোসঙ্গো পেছন থেকে বলে ওঠে নিতাই।

থমকে থেমে যান অমলেশ। কুতকুতে চোখে দেখতে থাকেন নিতাইকে, — কেন?

নিতাই কান এঁঠো করে হাসে, — আসলে হয়েছে কি —, যেসব বাবুরা আমার থেকে রোজরোজ পাখি কিনতেন, তেনাদের খুব গোঁসা হয়েছে। দিনকতক তো পাখি দিতে পারতিছি না। তাই । তো কাল একজনা বলেছেন, পাখি তাঁর চাইই চাই। ডাক-পাখির রোস না খেতে পেরে তিনি নাকি হেদিয়ে পড়িছেন। বলেছেন, পাখিপিছু পনেরো ট্যাকা দেবেন।

— মানে? রাগে-বিস্ময়ে প্রায় হতভম্ব হয়ে যান অমলেশ, — এই কদিনের মধ্যেই দাম বাড়িয়ে দিলে?

— আমি বাড়াবো কেন? দাঁত দিয়ে জিভ কাটে নিতাই, — বাবুরা বেশি দাম দিতে চাইলে আমি কী করবো?

স্থির দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন অমলেশ। নিষ্ফল আক্রোশে সারা শরীর জ্বলছিল। একসময় বলেন, তাবলে আমার থেকেও কি পনেরো টাকা চাইছো নাকি তুমি?

নিতাই এক প্রস্থ নিটোল হাসি উপহার দেয় অমলেশকে। বলে, আপনার থেকে বা তেনার থেকে বলে নয়, আমি যার কাছে বেশি দাম পাবো তাকেই বেচবো। গরিব মানুষ আমি, বোঝেনই তো।

— আরে, কী আশ্চর্য! অমলেশ বুঝি বোমার মতো ফেটে পড়তে চান, — আমি তোমার তেমন খদ্দের নাকি? আমি কি সত্যিসত্যি কিনি নাকি পাখিটাকে? আমি ওকে ঝোল রেঁধে খাবো নাকি?

— দেখুন বাবু—। নিতাই একেবারে বিবেচক বিচারকের আসনে বসিয়ে ফেলে নিজেকে, — কোন্ খইদ্দার কী কারণে কিনতিছে, সেটা ভেবে তো দোকানদার জিনিস ব্যাচে নাকো। কে ঝোল রেঁধি খাবে, কে ছেড়ি দিয়ে পুন্যি করবে, দোকানদার আদার বেপারি, তার অত জাহাজের খোঁজে দরকার কি? বলতে বলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আচমকা ভিরমি খায় নিতাই, ইস্, বেলা বাড়ি যেতিছে! আমি চলি বাবু।

নিতাইকে পিছু ফিরে চলতে দেখে ভেতরে ভেতরে খুব অসহায় বোধ করতে থাকেন অমলেশ। খুব জোরে পা চালানোর দরুন পাখিটা ঝুলন্ত অবস্থায় জোরে জোরে দুলছে। দুলুনির চোটে মাঝেমাঝে ওর মুন্ডুটা ধাক্কা খাচ্ছে নিতাইয়ের হাঁটুর সঙ্গে।

বেশ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে নিতাই। তাও অমলেশের মনে হয়, ঝুলন্ত অবস্থায় পাখিটা সারাক্ষণ দৃষ্টি বিঁধিয়ে রেখেছে অমলেশেরই ওপর। সেই দৃষ্টিতে, অমলেশ স্পষ্ট দেখতে পান, এক ধরনের প্রগাঢ় আস্থা, নির্ভরতা, অমলেশের প্রতি, এক ধরনের গভীর বিশ্বাস, কিনা, অমলেশের মতো মানুষ ওকে কিছুতেই রোস্ট বানাবার জন্য জ্বলন্ত চুল্লি অবধি পৌঁছতে দেবেন না।

সহসা পেছন থেকে ডাক পাড়েন অমলেশ, নিতাই, শোন—।

নিতাইয়ের রোগা রোগা পা'দুটো যন্ত্রের মতো থেমে যায়। বলতে হয় না, সে নিজেই পায়েপায়ে এগিয়ে আসতে থাকে পাঁচিলের দিকে। ক্রমাগত বিড়বিড় করে বলতে থাকে , যাহ্, আজকের মতো বেঁচি গেলি তুই। কী কপাল রে তোর!

অমলেশের মনে হলো, নিতাইয়ের গলার স্বরেও পাখিটার বেঁচে যাওয়াতে এক ধরনের স্বস্তি।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি দশটাকার এবং একটি পাঁচ টাকার নোট নিয়ে যখন পাঁচিলের কাছে ফিরে আসেন অমলেশ, নিতাই তখন পা নাচাতে নাচাতে এক মনে আকাশ দেখায় মশগুল। টাকাগুলো হাতে ধরিয়ে দিতেই একগাল হাসে সে। ডাহুকটাকে জমিতে নামিয়ে দিয়ে বলে, চলি বাবু, একটু দেরি হয়ে গেল আজ।

টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে আর মনের খুশিতে শিস্ দিতে দিতে বাড়ির পথ ধরে নিতাই।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তে অমলেশের মনে হয়, পাখিটা নয়, তিনি নিজেই নিতাইয়ের রোজদিনের শিকার। তিনিই রোজদিন ফাঁদে পড়ছেন, আর রীতিমতো অর্থদন্ড দিয়ে নিজেকে মুক্ত করছেন নিতাইয়ের পাতা ফাঁদ থেকে। পাখিটা নেহাত্ই উপলক্ষ্য। এমন কি, ওটা নিতাইয়ের পোষা পাখিও হতে পারে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র

১.

— স্যানালদা ঘুমোচ্ছেন নাকি?

— আমি তো রোজ রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি ঘুমোই ব্রাদার।

— না, চোখ বন্ধ করে ছিলেন কিনা, তাই।

— ভাবছিলুম, ব্রাদার।

— চোখ বন্ধ করে ভাববেন না, সান্যালদা। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়বেন।

সুপ্রভ সান্যাল ভ্রূ কুঁচকে তাকান। কথাটার মধ্যে কোনও খোঁচা আছে কিনা পরখ করেন। অনির্বাণ হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে অন্য দিকে চলে যায়। এবার ও ভবতোষবাবুকে ধরবে। এবং সেই প্রশ্ন তাঁকেও, ঘুমোচ্ছেন নাকি?

অনির্বানের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সুপ্রভ সান্যাল ফের চোখ মুদলেন।

২.

ইউনিয়ন অফিসের সামনে ভিড়টা জমাট বাঁধছিল। তিন পাশের জানালা দিয়ে উপচে পড়ছিল মুখ। চাপা উত্তেজনাটা ক্রমশ খোলস ভাঙছিল। সুপ্রভ সান্যাল, ভবতোষ ধর, ঘনশ্যাম পাল, শশিভূষণ সরখেল, আরও দু-চার জন, যাদের বলা যায় এই কেসের সাফারার কিংবা অ্যাগ্রিভড্, অর্থাৎ কিনা বাদীপক্ষ, — দু-এক মিনিটের ব্যবধানে একে একে অফিস-ঘরে এসে ঢুকেছেন। নেতারা তো প্রথম থেকেই হাজির। তাঁদের সুমুখে রয়েছে বাদীপক্ষের মাস-পিটিশন। আর, আসামী অনির্বাণ বসু, সেও ঢুকেছে প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেল।

ভেতরের নাটকটা ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। বাইরে থেকেই তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। ঘনশ্যাম, ভবতোষদের গলা ক্রমশ চড়ছে। নেতাদের কেউ কেউ গরগর করে উঠছেন মাঝেমাঝে। নিম্নবিত্ত বাড়ির ছেলে হয়ে তুমি মালিকপক্ষের দালালি করছো! আর, সবাইয়ের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে অনির্বান বসু নামের বছর পঁচিশের ছোকরাটি ভেজা বেড়ালের মতো তিরতিরিয়ে কাঁপছে, আর ঠোঁটের ফাঁকে কেবলই বিড়বিড় করছে, — বিশ্বাস করুন, আপনারা বিশ্বাস করুন ...। শুনে চিড়বিড় করে ওঠে জমায়েত। কুনো হালায় বিশ্বাস করি না। কেউ বলে, আরে তোর বিশ্বাসে ইয়ে করি। কেউ বলে, একটিবার বের করে দ্যান না, বিশ্বাসের পোলারে বাপ চেনাই। ... ক্রমশ হিংস্র হয়ে

ওঠে জমায়েত। হিংস্রতা, ... ভীরুতার গর্ভে তার জন্ম। আজকেও জমায়েতের এই হিংস্রতা সৃষ্টি হয়েছে এক সীমাহীন ভয় ও অনিশ্চয়তা থেকে। রুটিরুজি হারানোর ভয়। অফিসের প্রতিটি কর্মচারী যেন এক প্রবল ঘূর্ণিতে পড়েছে। সর্বদাই আতঙ্ক, এই বুঝি আমার পালা এলো। আমারই ঘাড়ে কোপটা পড়লো বুঝি। এমনি এক সীমাহীন আতঙ্কের মুহূর্তে অনির্বান নামের যুবকটিকে ওরা সহসা পেয়ে গেছে সেই ঘূর্ণির উৎসমূলে। ওদের তাবৎ নিরুপায় রোষ আজ লক্ষবস্তুর সন্ধান পেয়ে গেছে।

৩.

এমনিতে ভালো ছেলে বলেই তো মনে হয় অনির্বানকে। বেশ স্মার্ট, বুদ্ধিমান, দক্ষ, হাসিখুশি, পরোপকারীও বটে। অফিসে, ক্যান্টিনে খুব হৈ-হৈ করে মাতিয়ে রাখে। কেবল একটাই দোষ, মুদ্রাদোষও বলা যায়, যখন-তখন যাকে-তাকে শুধিয়ে বসে, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? অফিসে কাজ করতে এসে সবাই সর্বদা কিছু ঘুমিয়ে পড়ে না, তবে সকাল আটটা-নটায় ভরপেট ভাত খেয়ে, ট্রেনে-বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে পৌঁছেছে, অফিসে পাখার তলায় বসে কারো কারো একটু-আধটু ঝিমুনি এসে যেতেই পারে। কিংবা ভরদুপুরে, একটা-দেড়টার পর, যখন অফিসের গমগমে ভাবটা ক্রমশ নিথর হয়ে আসে, বড় সাহেব চলে যান লাঞ্চে, মেজো সাহেব কারখানায়, ছোট সাহব তাঁর প্রেমিকার সঙ্গো টেলিফোনে গসিপ করতে থাকেন, তখন ভিজিটারদের সংখ্যা একেবারেই কমে যায়, ইউনিয়নের লিডাররা চলে যায় হরেক কিসিমের কাজে, অফিসের বাইরে বিশাল বাগানের মধ্যিখানে বুড়ো নিমগাছের চুড়োয় এক নিঃসঙ্গা ঘুঘু কোনও কোনও দিন ডেকে ওঠে, তখন শরীর জুড়ে কারো-কারো, বিশেষত যারা মেদবহুল এবং পঞ্চাশ উত্তীর্ণ, তাদের সামান্য আলস্য আসতেই পারে। চোখের পাতা সামান্য ছোট হয়ে, মগজের মধ্যে ভোঁতা ভোঁতা ভাব। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই অনির্বানের গলা বেজে উঠবে, বড় সাহেবের কলিং-বেলের মতো, মোলায়েম, সুরেলা, ভীতিপ্রদ এবং অনিশ্চয়তায় ভরপুর, কী দাদা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? যারা সত্যিসত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল, চমকে জেগে ওঠে। বিব্রত, সন্ত্রস্ত, ভীত। বলে, কই, না-তো। ঘুমোলুম কখন?

— হুঁ—হুঁ...। অনির্বান আরো সুরেলা হয়ে বাজে, আমি ঠিকই লক্ষ করেছি, ঘুমোচ্ছিলেন। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

যারা সত্যিসত্যি ঘুমোচ্ছিল, একেবারে সিঁটিয়ে যায়। যারা বাস্তবিক ঘুমোচ্ছিল না, তারাও চমকে তাকায়, বিরক্ত হয়। ক্ষেপে ওঠে। আড়ালে বলে, আচ্ছা পোঁদপাকা ছেলে তো। কেউ বলে, কেমন বোকাবোকা প্রশ্ন করে! ভোঁদাই। কেউ বলে, ভোঁদাই নয়, সেয়ানা। আসলে ছোকরা নির্ঘাৎ ম্যানেজমেন্টের দালাল। কে ঘুমোয়, কে কাজ করে, কে দেরিতে আসে, ছুটির আগে কাটে, এসব খবর গোপনে পাচার করে ছোট সাহেবের কাছে। ছোট সাহেব থেকে মেজো, বড় হয়ে সে খবর চলে যায় খোদ মালিকের কাছে। ব্যাটা আস্ত ঘুঘু। শেষের কথাগুলো সবাইয়ের মনে ধরে খুব। বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তার সঙ্গাত কারণও রয়েছে।

ভবতোষবাবু অম্বলের রোগী। খিঁটখিটে মেজাজ। আচমকা কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দেওয়ায় ক্ষেপে উঠে বললেন, নিজে চরকায় তেল দাও হে।

— আজ্ঞে, নিজের চরকাতেই তো তেল দিচ্ছি।

— নিজের চরকায় তেল দিচ্ছ? পাকামো হচ্ছে? আমি ঘুমোচ্ছি কিনা দেখবার জন্য ম্যানেজমেন্ট রেখেছে তোমায়?

— ম্যানেজমেন্ট রাখবে কেন, আমি নিজের থেকেই করছি।

— কেন। টেল মি, হোযাই? চিৎকার করে ওঠেন ভবতোষবাবু, তোমার নিজের কাজকর্ম নেই? অন্যের ওপর খবরদারি করার জন্য তোমাকে মাইনে দেয় কোম্পানি?

— এটাকে খবরদারি ভাবছেন কেন, ভবতোষদা? আমি নিজের মানুষ ভেবেই করছি এটা।

— নিজের মানুষ? চ্যাংড়ামো করবার আর জায়গা পাও না? ক্ষেপে ফায়ার হয়ে উঠে দাঁড়ান ভবতোষবাবু, নিজের মানুষের ঘুম ভাঙাবার যদি এতোই সখ, রাতের বেলায় নিজের বউয়ের ঘুম ভাঙিয়ে ঐ সখ মেটাও গে।

— আপনি খামোখা রেগে যাচ্ছেন ভবতোষদা।

— খামোখা? তোমার চেয়ে না হলেও বিশ বছরের বড় আমি। রোজরোজ এমন পাতলা ইয়ার্কি করতে লজ্জা করে না?

— আপনি বিশ্বাস করুন, ইয়ার্কি করে এসব বলি নে আমি। আসলে —।

লোক জমে যায় ভবতোষবাবুর চারপাশে। কেউ মজা দেখছে, কেউ বিরক্ত। শশিভূষণবাবু ভবতোষের পক্ষ নেন। বলেন, সেদিন মিছিলের লাইনে ছোকরা আমাকে বলছে কি জানো? বলছে, কি শশিদা, এমন এলোমেলো পা ফেলছেন কেন? ঘুমিযে পড়লেন নাকি? বোঝো।

— আপনি এলোমেলো পা ফেলছিলেন দাদা। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় অনির্বাণ।

— অ্যাই, একদম বাজে বকবে না। এইসব ডেঁপোমি বন্ধ না করলে আমি ইউনিয়নকে জানাবো।

এই নিয়ে কিছুদিন যাবৎ সারা অফিস উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। অনির্বানের ওপর অনেকেই ভেতরে ভেতরে চটে রযেছে। সময় নেই, অসময় নেই, স্থান-কাল-পাত্র নেই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি, এ কী কাঁচা রসিকতা!

আসলে, সবাই ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়েছে খুব অনির্বানকে। সেই কারণেই চটে যাচ্ছে বেশি বেশি।

৪.

ঘনশ্যামবাবু গম্ভীর ধাতের মানুষ। বড় একটা বাক্যালাপ করেন না কারোর সঙ্গে। তাঁর মুখখানি এমন এক জমাট কাঠিন্য দিয়ে মোড়া, কেউই কাছেপিঠে বড় একটা ভিড়তে সাহস পায় না। কিন্তু অনির্বান পায়েপায়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এমনিতে অফিসে কারো মনে সুখ নেই ইদানীং। কানাঘুসোয় খবর, র্যান্ডম ছাঁটাই হবে। লিস্ট নাকি তৈরি হচ্ছে গোপনে। আরো খবর, ইউনিযনকে নাকি হাত করে ফেলেছে ম্যানেজমেন্ট। ইউনিয়ন নাকি লিস্ট বেরোবার পর তড়পাবে দু-এক দিন,

গেট-মিটিং, মিছিল-টিছিল করবে, তারপর ফণা নামিয়ে পেড়িতে ঢুকে যাবে। উইথ প্রোটেস্ট মেনে নেবে ব্যাপারটা। ভয়ে, আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে সকলেই। লিস্টে কার কার নাম রয়েছে, সেই ভাবনায় আকুল। সকলেরই আশঙ্কা, আজই অফিসে না তার শেষ দিন হয়ে যায়! আবার কায়দা করে নাম রাখা হয়েছে 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক'! ভয়-ভাবনা, ম্যানেজমেন্টকে গালাগাল, যা কিছু সবই মনেমনে। ভুলক্রমেও মুখ খুলছে না কেউই। কে কোথায় শুনে ফেলবে, কোন দ্যাবতার থানে গিয়ে সাতকাহন করে লাগাবে! আজকের দিনে নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস নেই।

ঘনশ্যামবাবুর ক-দিন থেকেই বাঁ চোখটা নাচছিল। কেন জানি বারেই বারেই মনে হচ্ছিল, লিস্টে তাঁর নামটা রয়েছে। এবং প্রথম দিকেই। ফলে, মনের মধ্যে সারাক্ষণ একটা অস্থির অস্থির ভাব। সারাক্ষণ আমাশার ।চড়। কাউকে খুলে বলাও যায় না, আবার চেপে রাখাও দায়। একবার ইউনিয়ন অফিসে গেলে হয। কিন্তু বিগত একত্রিশ বছরের চাকরিতে ওপথে তো হাঁটেন নি ঘনশ্যামবাবু। চাঁদা দেননি একটি পয়সা, মিছিলে হাঁটেন নি একদিনও। সহসা অ্যাদ্দিন বাদে, একটা গুজবের ওপর নির্ভর করে কোন মুখে হাজির হন ইউনিয়ন অফিসে! এইসব ভাবতে ভাবতে ঘনশ্যামবাবু এক-পা এগোচ্ছেন তো তিন-পা পেছোচ্ছেন। তেমনি এক গভীর ভাবনার মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালো অনির্বান। আর, যে কিনা এযাবৎকাল ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে কথা বলবারই সাহস পেত না, আচমকা শুধিয়ে বসে, ঘনশ্যামদা ঘুমিযে পড়লেন নাকি?

ঘনশ্যামবাবুর চিন্তার জালটা পটাপট ছিঁড়ে গেল। মুখ তুলে তাকালেন। ভুরুজোড়া অজান্তেই কোঁচকালো, কিছু বলছো।

— বলছিলুম, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

সে কথায় সহসা ভয়ানক কঠিন হয়ে ওঠে ঘনশ্যামবাবুর মুখ। শান দেওয়া হাঁসুয়ার মতো ধারালো চোখে তাকান অনির্বানের দিকে। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান। গটমটিয়ে চলে যান টয়লেটের দিকে।

এইসব ডেঁপোমির জন্য অনির্বানের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও ইদানীং মনে মনে বেজায় বিরক্ত। ওরা ধমক দেয় অনির্বানকে। বলে, সীমা ছাড়াচ্ছ অনির্বান। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে, দ্যাখো, একদিন লঙ্কাকান্ড হযে যাবে।

অচিন্ত্য বিশ্বাস, অনির্বানের কলেজের সহপাঠী। একই হোস্টেলে থাকতো। বলে, অনির্বানের এটা একটা বহু পুরোনো ব্যাধি। সেই ছেলেবেলার। হোস্টেলে কম জ্বালিয়েছে আমাদের! দিনে-রাতে, যখন-তখন, এর-ওর দরজায় ঘা মারতো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি! হোস্টেলের রাত-জাগুয়া ছাত্ররা দিনে ঘুমোতো, দিনে-পড়ুয়ারা রাতের বেলায় নিশ্ছিদ্র ঘুম চাইতো। কিন্তু অনির্বানের জ্বালায় কি ঘুমোবার জো থাকতো? যখন-তখন শুরু হতো ওর দরজা ধাক্কানোর হিড়িক। এই সনৎ, নিবারণ, প্রভাত, অচিন্ত্য, কী হে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি। ওই নিয়ে কতবার হুজ্জুতি হয়েছে হোস্টেলে। চড়চাপড়ও খেয়েছে অনির্বান। একবার তো ব্যাপারটা এতদূর অবধি গড়িয়েছিল যে ওর হোস্টেল-ছাড়া হওয়ার জোগাড়। আমরা জনাকয় হাতেপায়ে ধরে কোনও মতে ঠেকাই। কিন্তু তাতে কি, স্বভাব কি যায়? অনির্বানের এই রোগটা গেল না কিছুতেই।

৫.

অবশেষে সেদিন পুরো ব্যাপারটা সকলের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

নিশিকান্ত দাস ইউনিয়নের সেক্রেটারি। এই কিছুদিন আগে অবধি বেশ রোগাপ্যাটকা গোছের ছিলেন। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছিল। চোখের গর্ত ছিল বেশ গভীর। ইদানীং বেশ মুটোতে লেগেছেন। সারা মুখে, চোখের কোলে, যেন বন্যার পলি পড়েছে। চোয়াল, গাল একাকার। ফলে, আগে হাঁটতেন ঝড়ের বেগে, এখন হাঁটেন দুলকি চালে। হাঁটছিলেন তেমনি করে করিডোরে। যাকে বলে, গজেন্দ্রগমন। পেছন পেছন ক্যান্টিনের দিকে হাঁটছিল অনির্বান। আচমকা পেছন থেকে ডাক দিল নিশিকান্তকে। —নিশিকান্ত-দা—।

নিশিকান্তর কান আগে ছিল খুবই প্রখর। ফিসফিস করে কথা বললেও শুনতে পেতেন অবলীলায়। ইদানীং কানেও বুঝি পলি পড়েছে। কেউ ডাকলে-টাকলে একডাকে ফিরে তাকান না। অনেক কথার জবাবই দেন না। ভাবখানা, যেন শুনতেই পাননি।

— সম্ভবত তাই। কেউকেউ মন্তব্য করে, —নিশিকান্তদার শ্রবণশক্তি খুবই কমজোরি হয়ে গেছে।

— শ্রবণশক্তি কমেনি। আর এক পক্ষের ধারণা, —আসলে ওর ঘ্যাম বেড়েছে। বেশ ওজনদার গলা ছাড়া শুনতেই পায় না। সারা অফিস জুড়ে যে নরমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি নীরবে চলছে, সেসব যেন তার নজরেই নেই। ওই নিয়ে কেউ কিছু বললে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বোবার মতো। অবশেষে এমন ভাব করে, যেন জবাব দেবার উপযুক্ত প্রশ্নই নয় ওটা। অনির্বাণ শুনে একান্তে বলে, ওসব কিছু নয়। আসলে, নিশিকান্তদা ইদানীং ঘনঘন ঘুমিয়ে পড়েন। নজর করলেই বোঝা যায়। সারাদিন জুড়ে ওঁর কেবলই ঘুম। আসলে, শরীরে মেদের আধিক্য হলে ঘুম পাবেই।

অনির্বাণ পেছন থেকে ডাক দিল, নিশিকান্তদা—।

ভ্রুক্ষেপ নেই নিশিকান্ত দাসের। তিনি হেঁটেই চলেছেন নিজের খেয়ালে। অনির্বান সহসা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। নিশিকান্ত দাসের গায়ে গা মিশিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুনরায় ডাক দিল, নিশিকান্তদা—।

নিশিকান্ত দাস ভ্রু কুঁচকে তাকালেন, কিছু বলছিলে।

— ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

নিমেষের মধ্যে থমকে দাঁড়ান নিশিকান্ত দাস। কপালের তাবৎ বলিরেখা ভেঙেচুরে তছনছ হয়। বলেন, মানে?

— মানে, আমার মনে হলো, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

নিশিকান্তর চোখদুটি এবার সরাসরি বিঁধে যায় অনির্বাণের মুখের ওপর। অনির্বাণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন তিনি। বলেন, হাঁটতে হাঁটতে ঘুমোয় নাকি?

— আমার মনে হলো, আপনি হাঁটতে হাঁটতে ঘুমোচ্ছেন। বলতে বলতে অনির্বাণের সারা মুখে নিষ্পাপ হাসি, —কিংবা ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটছেন।

৬

দুপুর থেকেই কথাটা অফিসময় রটে গেল খুব। অফিসেরই এক ছোকরা, অনির্বাণ

না কী যেন নাম, গোপনে গোপনে মালিকের দালালি করছে। অফিসে কে ঘুমোয়, কে দেরি করে আসে, আগেভাগে চলে যায়, ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে কে কী মন্তব্য করে, সবকিছু পাচার করে। আর, তারই ভিত্তিতে গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেকের লিস্ট তৈরি হচ্ছে গোপনে। ছোকরার এমনই দুঃসাহস, ইউনিয়নের সেক্রেটারি নিশিকান্তদার ওপরেও নজরদারি শুরু করেছে!

এমনিভাবেই সবকিছু রটে বোধ করি। কচি চারা নিমেষে ডালপালা গজিয়ে মহীরুহ হয়। ভয় মানুষকে এমনিতেই হিংস্র করে তোলে। আর, এ হলো রুটি-রুজি হারানোর ভয়। ফলে, শোনামাত্তর, সবাই একবাক্যে রায় দেয়, এমন মিরজাফরকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

অফিস-ঘরে বসে রয়েছেন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বদ্রীপ্রসাদ এবং অন্য নেতারা। থমথম করছিল বদ্রীপ্রসাদের মুখ। বারবার তিনি আড়চোখে দেখছিলেন অনির্বাণকে। আর অনির্বাণ কেবলই আউড়ে যাচ্ছিল একটাই কথা, বিশ্বাস করুন, বদ্রীদা, বিশ্বাস করুন—।

— কেমন করে বিশ্বাস করি বল? আজ নিশিকান্তকে তুমি যেভাবে শুধিয়ে বসলে—। কেউ তোমাকে আড়াল থেকে ইনস্টিগেট না করলে—। খুব ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বললেন বদ্রীপ্রসাদ, তাছাড়া, বাইরের এই এতবড় জমায়েত, এদের সকলেরই ধারণা, কোনও দুরভিসন্ধি নিয়েই—।

— কোনও দুরভিসন্ধি নেই। বিশ্বাস করুন। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে অনির্বাণ।

— তাহলে তো বলতে হয়, তোমার মাথায় গুরুতর গোলমাল রয়েছে। নইলে, অফিসে কে কে ঘুমিয়ে পড়ছে, খামোখা কেউ ঐ নিয়ে জরীপ করে বেড়ায়? বল, জবাব দাও। চুপ করে থাকলে আমরা শুনছি নে।

সন্ধে ঘনিয়ে আসছে দিগন্তের রেখায় রেখায়। জমায়েতের মানুষগুলোর সন্দেহকুটিল চোখগুলো সেই আঁধার গিলছে গোগ্রাসে।

বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে অনির্বাণ। নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকায় সকলের দিকে। তারপর খুব আত্মস্থ গলায় বলে, আসলে, আমি না, নিজেই খুব ঘুমিয়ে পড়ি। যখন-তখন, যেখানে-সেখানে, আচমকা ঘুম পেয়ে যায় আমার। কিছুতেই খুলে রাখতে পারিনে চোখ। বাড়ি বসতে বসতে ঘুমিয়ে পড়লুম, খেতে খেতে, হাঁটতে হাঁটতে, এমন কি খেলার মাঠে দৌড়তে দৌড়তেও ...। আর, সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, আমি যে ঘুমিয়ে পড়ছি, সেটাই আগাম বুঝতে পারিনে।

মন দিয়ে শুনছিলেন নিশিকান্ত, বদ্রীপ্রসাদেরা। অনির্বাণের কথা শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন। নিজেদের মধ্যে চোখেচোখে কথা বলে নেন। একসময় বদ্রীপ্রসাদ বলেন, বল কী। এ-তো এক ধরনের রোগ।

— রোগ হয়েছে তো চিকিৎসা করাও। পাশ থেকে বলে ওঠেন নিশিকান্ত, অন্যদের রোগী বানাচ্ছ কেন।

— চিকিৎসাই তো করাচ্ছি নিশিকান্তদা। সেই কারণেই তো...।

— অন্যদের জ্বালাতন করাটা চিকিৎসা হলো তোমার কাছে? প্রায় খেঁকিয়ে ওঠেন নিশিকান্ত দাস।

ভারী অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে অনির্বাণ। কেমন করে যে ব্যাপারটা বোঝাবে, ভেবে পায় না বুঝি।

বিড়বিড়িয়ে বলে, অন্যকে যখন ধাক্কা মেরে জাগাই, তখন সমান ধাক্কা তো আমিও খাই। অন্যকে যখন বলি, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি, তখন তো কথাগুলো আমার ভেতরেও ঢোকে। বুকের মধ্যে চারিয়ে গিয়ে তোলপাড় তোলে। বিশ্বাস করুন বদ্রীদা, কোনও দুরভিসন্ধি নয়, ষড়যন্ত্রও নয়, অন্যকে জাগাবার ছলে আমি অহরহ সুকৌশলে নিজেকেই জাগিয়ে রাখি। যখন নিশিকান্তদাকে চেঁচিয়ে বলি, নিশিকান্তদা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? তখন, আসলে, মনেমনে নিজেকেই বলি, অনির্বাণ, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি। বিশ্বাস করুন, বদ্রীদা, বিশ্বাস করুন...।

কুঁজোপানা মানুষ

আমি তাকে দেখতেই পাইনি, অথচ যখন দেখতে পেলুম, সে দাবি করল, সে নাকি অনেকক্ষণ ধরে আমার পিছু পিছু হাঁটছে। আসলে, মেলার মধ্যে আমি হাঁটছিলুম অন্যদের সঙ্গে, তারা আমার ছেলেবেলার বন্ধু, বহুদিন বাদে দেখা, আমি একেবারে ডুবেছিলুম ওদের মধ্যে। ডুব-সাঁতারে মজেছিলুম। মেলাটা হয়ে উঠেছিল উপলক্ষ্য, আবহ মাত্র।

এ বছর মেলাটা জমেও উঠেছে খুবই। পাঁপর-ভাজা, ফুলুরি-বেগুনি, ঘুগনি, খাজা-গজা, বোঁদে-জিলিপি,—গন্ধে ম-ম করছে বাতাস। এই গন্ধটাও ভারি মনমাতানো আবহ, আমার কতকালের চেনা। পুরো ছেলেবেলাটা যেন মিশে থাকে ওই হাওয়ায়। মনে পড়ে, পুরো কৈশোর জুড়ে মেলাটা আমাদের স্বপ্নের মধ্যে থাকত। ভীম-একাদশীর মেলা। আমাদের গাঁয়ের একেবারে সাবেক মেলা। ওই সময়েই দিদিরা আসত শ্বশুরবাড়ি থেকে, গাঁয়ের প্রতিটি বাড়ি কুটুম-বাটুমে ভরে যেত, হাজার সমস্যায় জর্জরিত আমাদের গ্রামটা, ওই কটা দিন আচমকা খিলখিলিয়ে হেসে উঠত। নতুন নতুন রান্না হত দু'বেলা, পড়াশোনা মাথায় উঠত আমাদের, দিনভর মেলায় ঘোরা, রাতে যাত্রার পালাগান শুনে শেষরাতে ঢুলতে ঢুলতে বাড়ি ফেরা, ক'টা দিন স্বপ্নের মত কেটে যেত। বয়স আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছুই, আমাদের স্বপ্নের মেলাটাকেও। চাকুরিসূত্রে গ্রামছাড়া বহুদিন, হাজার কাজের চাপে মেলার সময়টাতে গাঁয়ে আর আসা হয়ে ওঠে না। গাঁয়ের স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে মনে। ছেলেবেলার বন্ধুরা, ওদের সঙ্গে দিনরাত হাজারো দুষ্টুমি,— সেসব যেন কতকালের স্মৃতি বলে মনে হয়! বন্ধুরাও সংসারী হয়েছে, হাজার কাজের শেকলে বেঁধে ফেলেছে নিজেদের, কেউ কেউ আমার মতই গাঁ'ছাড়া, চাকরি-বাকরি করে দূরে দূরে, কালেভদ্রে দেখা হয়। আর, যারা গাঁয়ে রয়েছে এখনও, তাদের মধ্যেও অনেকেই সফল মানুষ। শ্যামল হাইস্কুলের মাস্টার, পঞ্চায়েতের মেম্বারও, অতীন নিজের গাঁয়েরই পোষ্টমাষ্টার। নিরাপদ ব্লক অফিসে চাকরি পেয়েছে, বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে রোজ। ক্বচিৎ গাঁয়ে গেলে সববারেই যে ওদের সঙ্গো দেখা হয় তা নয়, তবে যোগাযোগটা পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। আর, আমি খুব উঁচুদরের একটা চাকরি করি বলে ওরা আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করে, আমি জানি।

চারজনাতে হাঁটুছিলুম, গল্প করছিলুম, কতকালের গল্প সে-সব, শ্যাওলা জমেছে গায়ে, একেবারে মজেছিলুম আমরা। খেয়ালই করিনি, সে কতক্ষণ ধরে হেঁটে চলেছে

আমাদের পিছু পিছু। বলল, খেয়াল করবে কী করিয়া? তুমি তো পিছু ফিরিয়া তাকাওনি একবারের তরেও। তা অবশ্য তাকাইনি, তবে তাকালেও খুব কিছু হত না, কারণ, দেখামাত্তর ওকে চিনে ফেলা তো আর সম্ভব ছিল না। আমি নয়, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করল ও-ই। বলল, তুমি এখন কত বড় মানুষ, আমার মত নগন্য লোককে চিনা তুমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তখন মনে মনে ভাবছিলুম একটাই কথা। আমি একবারের তরেও পিছু ফিরে তাকাইনি, ওর এমন মন্তব্যটা কি অতটাই সোজা-সরল, যা ওর মত মানুষের মুখে মানিয়ে যায়? আমার সফল জীবনের প্রতি, গ্রাম ছেড়ে পরবাসী হওয়ার প্রতি, গ্রামের দিকে ফিরে না তাকানোর প্রতি, মনে মনে কোনও অভিমান জড়িয়ে নেই তো ওই রহস্যময় মন্তব্যে? আর, তখনই মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায়, প্রাইমারি স্কুলে পড়াকালীন, রহস্যময় কথা বলায় ওর জুড়ি ছিল না। কথায় কথায় ধাঁধাঁ আর প্রবাদ বলতে পারত মুড়ি-মুড়কির মত। অভ্যাস কি মানুষকে পুরোপুরি রেহাই দেয়? আমি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি ওর মুখ, চোখ ... কপালের বলিরেখাগুলি ..., ধীরে ধীরে আমার চোখদুটো ক্রেনের মত নেমে আসে ওর শরীর বেয়ে। এবং আমি দেখতে থাকি ওর পুরো অবয়ব। রোগাসোগা চামচিকেপানা গড়ন, হাঁটু অবধি আধ-ময়লা ধুতি, নীল রঙের হাফশার্ট, পায়ে শস্তা চপ্পল, সারা শরীর জুড়ে অপুষ্টির ছাপ ...।

আমাকে নাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে, সে সামান্য অস্বস্তি বোধ করে বুঝি, আমার মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরাতে চায়, বলে, জয়া বৌদি কেমন আছে? আনোনি সাথে? অন্তত ছেলেটাকে তো আনবে। ভারি মিষ্টি নাম তোমার ছেলের, কিং। আমার ছেলেটা শুনিয়া অবধি বায়না ধচ্ছিল, ওই নামটা তার চাই। বলি, চাইলেই কি সব পাওয়া যায় রে এই দুনিয়ায়? সে হইল রাজার ছেলে, তাকে উ-নাম মানায়। তুই হইলি খেত মজুরের ব্যাটা, কিং তোকে মানাবেও নি, সইবেও নি। কিং মানে তো রাজা।

জবাব দেব কি, আমি মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছিলুম ওর গুছিয়ে কথা বলবার ধরন। ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি হচ্ছিল এটাই ভেবে যে, ও আমার বউ-ছেলের নাম অবধি জানে, অথচ আমি ওর নামটাই মনে করতে পারছি নে।

— আমার নামটা তুমার মনে থাইকবার কথা নয়। সে বলল, — কিন্তু ওই ছড়াটা তো মনে থাকা উচিত, ওই যে, 'পাখির ছ্যানা, নকুলদানা', মনে নাই?

আর, সঙ্গে সঙ্গে তার নামটা স্মৃতির দরজায় ঘা মারতে থাকে অবিরাম। ওর নাম, নকুল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আরও কত কথাই। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় কত সরল ছিল নকুল। কত বন্ধুবৎসল। আমাদের অনুরোধে কত কঠিন কঠিন কাজ করে ফেলত হাসিমুখে। তরতরিয়ে গাছে উঠে কাঁচা আম পেড়ে আনত, পুকুরে নেমে পদ্মচাকি তুলে আনত। আর, যতক্ষণ সঙ্গে থাকত, সবাইকে খালি হাসাত। বলি, তো, পিছু পিছু হাঁটছিলি কেন তখন থেকে? ডাকিসনি কেন?

নকুল খুব করুণ হাসে, তুমরা সব গল্পে মশগুল ছিলে ...।

বলি, তাতে কি? তোরও তো বন্ধু ওরা। আমরা তো সবাই একসঙ্গে কাটিয়েছি ছেলেবেলা।

তা অবশ্যি ঠিক। বিড়বিড় করে বলে ও।

কিন্তু ওর চোখের ভাষা পড়ে ফেলতে পারি নিমেষে। আমার আবেগপূর্ণ কথাগুলো ওর বুক অবধি পৌঁছতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে কোথাও। বুকের মধ্যে থেকে সায় পাচ্ছে না পুরোপুরি। খুব করুণ হেসে বলে, তেবে তুমরা এখন কত বড়, কত উঁচুতে! এখন তুমি মথুরাপতি কৃষ্ণ।

ওর কথা শুনে মজা পাই। বলি, আর তুই?

—যদি স্বীকার কর তো, সুদামা। খুব অভিমান জড়ানো গলায় কথাগুলো বলে নকুল।

হয়ত বা ওর এই অভিমান স্বাভাবিক, কারণ, ছেলেবেলার বন্ধুদের কাছ থেকে সম্ভবত ভাল ব্যবহার ইদানীং পায় না ও। আনন্দ, নিরাপদ, শ্যামল, অতীন, যখনই গাঁয়ে আসি এদের সঙ্গে দেখা তো হয়, পুরনো বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেসা কবলে ওদের সারা মুখ তেতো হয়ে যায়। বলে, ভাল মন্দ মিশিয়েই আছে সব, যারা আয়-উপায় করছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, তাদের সঙ্গে দেখা হলে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা হয়, কিন্তু যারা অভাবে অনটনে রয়েছে, মুটে-মজুরি করে, কালেভদ্রে দেখা হয়ে গেলে খালি ছেলেবেলার সম্পর্কের কথা তুলে সাহায্য চায়। ওদের সঙ্গে মেশামেশি সেই কারণেই ইদানীং আর নেই বললেই চলে।

নকুলের পিঠে মোলায়েম হাত রাখি আমি, চাকরির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কী-রে? চল্ কোথাও গিয়ে বসি।

মেলার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে একচিলতে ফাঁকা জায়গা দেখে বসি দুজনে। বলি, কেমন আছিস?

আকাশের দিকে চোখ বিঁধিয়ে বসে থাকে নকুল। একসময় বলে, অন্য কেউ জিগালে এমন কথার জবাবে, 'ভাল' বলিয়া দিই। কেন জান? দুট্টা কারণে। পর্‌থম্ কথা হল, এটা আদপে কুনো পশ্ন‌ই নয়। লিহাতই কথার কথা। পশ্ন করে বটে, তবে এ প্রশ্নের জবাব কেউ আশা করে না। তবে পশ্ন যখন কল্ল, জবাব একটা দিতেই হয়, ভদ্দতার পশ্ন, কাজেই বলিয়া দিই 'ভালো'। কেন কি, 'খারাপ' বললে তো ফের অন্য হ্যাপা। আমি ভাল আছি শুনলে সবাই খুশি, চলিয়া যায় যে-যার কাজে, কিন্তু ভালো নেই বললেই তুমার আর রিহাই নাই, তখন তুমাকে বিতাং করিয়া বলতে হবে, তুমার খারাপ থাকার গল্প। কী খারাপ, কবে থেকে খারাপ, কেন খারাপ ... ...। তুমার বলা শেষ হইলে পর সে কিন্তু আর এক মুহূর্তও দাঁড়াবে নি। কুনো একটা জরুরি কাজের অছিলায় কাটিয়া পড়বে। যদি বল, শুনবে নি তো জিগায় ক্যানে, তো বলি, জিগায় ভদ্দতা বশে, সেটাই দস্তুর, এবং এও জানে, এমন পশ্নের জবাবে সক্কলে 'ভাল আছি'ই কইবে। কয়ও পনের আনা মানুষ। কিন্তু ওই বাকি এক আনা মানুষ যখন কয়, 'ভাল নাই', তখনই হয় মুশকিল। তখন, যে কথাটা জিগাল, সে মনে মনে হাত কামড়ায়, কিনা, ইস, এখন জোয়ারের সময়, কত কাজ, লোকটা যে কতক্ষণ ভ্যাজরভ্যাজর করবে! এই সব কারণে আজকাল কেউ 'কেমন আছ' জিগালে বলিয়া দেই, ভাল আছি। কিন্তু তুমার ক্ষেত্রে তো আর সেটা চলবে নি। তুমি আমার ছা-বেলার বন্ধু, তুমার সাথ

তো আমার ভদ্দতার সম্পক্ক নয়, কাজেই তুমার পাশ সত্যি কথাটাই কইতে হবে। ভাল নাই। এক্কেবারেই ভাল নাই।

বাহ্! আমাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়, গুছিয়ে কথা বলাটা দারুণ রপ্ত করেছে নকুল। ছেলেবেলা থেকেই ওর মধ্যে ব্যাপারটা ছিল, কালে কালে আরও পোক্ত হয়েছে। আর, সেই কারণেই, নকুলের কথাগুলো শুনতে শুনতে এক ধরনের আশঙ্কা কাজ করে চলেছিল মনের মধ্যে। বারবার মনে হচ্ছিল, এ কেবল অকারণে কথার জাল বোনা নয়, একটা গূঢ় উদ্দেশ্য কাজ করছে অন্তরালে। আমার এমনতরো ধারনার খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে। একটা ভাল চাকরি করবার সুবাদে আমার যে বেশ সচ্ছল অবস্থা, এটা গ্রামের প্রায় সব মানুষই জানে। কাজেই, কালেভদ্রে গ্রামে গেলে, গরিব-গুরবোর দল, যারা এককালে কোনও না কোনওভাবে আমাদের সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, কোনও একটা বায়নাক্কা নিয়ে আসবেই। এটা দাও, ওটা দাও, বড় ছেলের চাকরি, ছোট ছেলের পড়ার খরচ, ... যে ক'দিন থাকব, একেবারে জ্বালিয়ে খাবে। আমি সন্তর্পণে চোখ রাখি নকুলের মুখের ওপর। খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, তেমন কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য লেপ্টে রয়েছে কিনা ওর আপাত কথাশিল্পের মধ্যে। বুঝতে পারিনে, ফলে মনের মধ্যে চাপা অস্বস্তি চরে বেড়ায়। ভদ্রতাবশত শুধোই, ভাল নেই কেন?

নকুল ম্রিয়মান হাসে, তার কি একটা কারণ? গরিবের জীবনে ভাল না থাকার হাজারটা কারণ থাকে। সেগুলা অন্যকে বলাও যা, না-বলাও তা। তবে যেটা আমাকে পলে পলে দগ্ধিয়া মারছে, তা হইল, ছেলেটাকে পড়াতে পারলাম নি। ক্লাস ফাইভের পর থামিয়া দিতে হইল।

মন বলছিল, বেশ আটঘাট বেঁধে এগোতে চাইছে নকুল। একেবারে, চাল দাও, টাকা দাও, কাপড় দাও গোছের ভিক্ষাবৃত্তি নয়, আরও শক্ত, পাকাপোক্ত ঘাটে বাঁধতে চাইছে নৌকোটি। সম্ভবত ছেলেবেলার সম্পন্ন বন্ধুর থেকে নিজের ছেলের লেখাপড়ার খরচটা বাগিয়ে নেবার মতলব। তাও স্রেফ ভদ্রতাবশতই শুধোতে হয়, ছেলের লেখাপড়াটা বন্ধ করে দিতে হল কেন? বইপত্তরের অভাবে? এখন তো স্কুলে মাইনেপাতি লাগে না।

নকুল একটুক্ষণ কী যেন ভাবে। বলে, বইপত্তর, মাইনার বেপারও আছে, তার চাইতে বড় কথা, সংসার চলবে কী করিয়া? ভত্তি করিয়া দিছি সাউদের বাখুলে, গরুবাছুর চরায়, খায় দায়, ষাট টাকা মাইনা পায়। অভাবের সংসারে সেটাই কত!

মুখের কথা থেকে কোনও আন্দাজ পাচ্ছিলুম না নকুলের মনোগত ইচ্ছার। ঠিক কী চাইছে ও? বইপত্র চায় না, বুঝলুম, তবে কি ও মনে মনে চাইছে আমি ওর সংসারটা চালাবার সুরাহা করে দিই? ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনে বটে, তবে মনে মনে প্রস্তুত থাকি। আমি জানি, তেমনভাবে চেপে ধরলে, একেবারে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। একে তো ছেলেবেলার বন্ধু, সহপাঠী, তার ওপর, আমাকে সত্যিই খুব ভালবাসত ছেলেবেলায়। সত্যি কথা বলতে কি, ওকে কিছু দিতে ইচ্ছেও করছিল আমার, ওর দুরবস্থা দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। ছেলেবেলায় কতই না ফ্যাক খেটেছে আমাদের জন্য। সম্পন্ন বাড়ির ছেলে ছিলুম, শরীরিক ক্লেশ হয় এমন কোনও কাজই করতে চাইতুম না

আমরা, অর্থাৎ আমি, আনন্দ, নিরাপদ। নকুলই হাসিমুখে করত সেই কাজ, হ্যাঁ, হাসিমুখেই করত, আমাদের থেকে কেড়ে নিয়ে করত। বলত, তুদের মাছ-মাংস-দুধ-ঘি খাওয়া শরীর, অত কষ্টের কাজ সইবে নি। এখন মনে হয়, ওই ছেলেবেলায়ও, আমাদের ভেতরে একটা সুবিধাবাদী মানুষ বেঁচে ছিল, নকুলের মত খেত-মজুরের ছেলেকে যে নিজেদের দলভুক্ত করেছিলুম, আমাদের সঙ্গো ঘোরাঘুরির অধিকার দিয়েছিলুম, তার মধ্যে যত না ছিল বন্ধুত্বের টান, তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল প্রচ্ছন্ন স্বার্থ, কিনা, নকুল সঙ্গো থাকলে আর চিন্তা নেই, আমাদের জন্য সে অবলীলায় গাছে উঠবে, পুকুরে ঝাঁপাবে, গেরস্থের বেড়া ভেঙে ফল-পাকুড় চুরি করবে, কোথাও ফিস্টি খেতে গেলে, স্বেচ্ছায় সানন্দে আমাদের পাতটাও তুলে ফেলে দিয়ে আসবে নিজেরটির সঙ্গো। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ওইসব দিনে নকুলের ঘাড়ে চড়ে সবক্ষেত্রে বৈতরনী পার হওয়াটাকে মনে মনে বেশ রেলিস করতুম আমরা। অ্যাদ্দিন বাদে তার জন্য অবশ্যই মনে মনে লজ্জা বোধ করি, আর সেই কারণেই যে-কোনও অজুহাতে নকুলকে কিছু অর্থ সাহায্য হিসেবে দিতে ভালই লাগবে আমার। তার চেয়েও বড় কথা, বড় চাকুরে হিসেবে সারা গ্রামে এমনই একটা নামডাক হয়েছে, অথচ ছেলেবেলার গরিব বন্ধু কত আশা করে হাত পাতল, কিন্তু আমার হাত দিয়ে জল গলল না, এটা আমার আত্মমর্যাদার হানি তো ঘটাবেই, যে শুনবে, একেবারে ছি-ছি করবে। হাজার হোক, সমাজে বাস করতে হলে লোকনিন্দা-লোকলজ্জার ব্যাপারটা ভাবতে হয় বৈকি। কাজেই আমি মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকি, চাইলে পরে টাকার পরিমাণ নিয়ে মনের মধ্যে চলতে থাকে টানাপোড়েন।

— হ্যাঁ, ভাল কথা — আমি খুব ভাবনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিলুম বুঝি, একেবারে ডুবন্ত মানুষকে তুলে আনবার ভঙ্গিতে হ্যাঁচকা টান মারে নকুল, — তুমার সেই কাঠ-মল্লিকার চারা জোগাড় করিয়া দিবার তরে কতদিন ধরিয়া বলতে আমাকে, মনে নাই ? সেই যে আমরা, কিলাস-থ্রি-তে বোধ করি পড়ি তখন, একদিন দল বাঁধিয়া ওলদা-চন্ডীর জঙ্গালে গেলাম সক্কলে, আমি, তুমি, শ্যামল, অতীন, জঙ্গালের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা মউল গাছের তলায় গিয়া বসলাম, চারপাশটা ভুরভুর কচ্ছিল কাঠ-মল্লিকার ফুলের গন্ধে, গন্ধটা লিতে লিতেই তুমি বায়না ধল্লে, এই গাছের চারা একটা তুমার চাই, আর, ওই বইসে তুমাদের কুনো একটা জিনিস চাই মানে কী ? কার উপর সে জিনিসটা আনিয়া দিবার ভার পড়ত ?

এটা ঠিক। ওই বয়েসে যা কিছু দুর্লভ সামগ্রীর জন্য নকুলই ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা। এবং ঝাপসাভাবে যেন মনে পড়ল, জঙ্গালে তো প্রায়ই যেতাম, একবার যেন ওই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম আমি, তবে কাঠমল্লিকার জন্য কিনা তা আর এতদিন বাদে মনে নেই।

—ওই তো, সেবার বাসস্ট্যান্ডে দেখা হইল, তুমি বাড়ি থিকে কোলকাতা ফিচ্ছিলে, তখনও তো বললে ওই গাছটার কথা।

আমি মনে মনে হাসি, সামান্য কিছু অর্থ কিংবা আনুকূল্যের প্রত্যাশায় কতখানি গ্রাউন্ড-ওয়ার্ক করে চলেছে তখন থেকে! মুখে বলি, বলেছিলুম বুঝি ? কতদিন আগে বল তো ?

নকুল একটু ভেবে বলে, তা বছর আট-দশ তো হবেই।

আমি যারপরনাই বিস্মিত, বলিস কি! সে কথা তোর মনে আছে এখনও! আমি তো নিজেই ভুলে গিয়েছি। বলতে বলতে এতক্ষণে আমি সত্যি সত্যি লজ্জা পাই। সত্যি! সেই সোনার দিনগুলোকে যে কেমন করে ভুলে গেলুম আমি!

শুনে নকুলের গলায় চাপা অনুযোগ, তুমি ভুলতে পার, কিন্তু আমি ভুলিনি। গলায় খুব প্রত্যয় ফুটিয়ে বলে সে, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দ্যাখ। নকুল পরীক্ষার্থীর মত প্রস্তুত হয়। আমিও কেমন করে যেন ওর কথার ফাঁদে আটকে গিয়ে পরীক্ষকের পদে অবতীর্ণ হই, এবং একটু বাদেই সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় নকুল, ছেলেবেলার সব ঘটনা অনুপুঙ্খসহ ষোলআনা মনে আছে ওর। অবাক হয়ে বলি, তোর দেখছি সবকিছুই মনে আছে? ততক্ষণে খুব মন খারাপ শুরু হয়েছে আমার মধ্যে। বলি, ইস্ আমার তো অধিকাংশ কথাই মনে নেই রে।

রোগীর রোগটা সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পেরে সুচিকিৎসকের সারা মুখে যেমন করে ফুটে ওঠে আত্মপ্রসাদের চাপা অহঙ্কার, এবং সেই সুবাদে মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ততক্ষণে নকুলের সারামুখে ফুটে উঠেছে সেই জাতের হাসি ও উজ্জ্বলতা। বলে , তুমার মনে থাকবে কী করিয়া? তুমার তো সারা জীবনটাই পুঁজি, আমার যে ওই ছেলেবেলাটুকু ছাড়া আর পুঁজি বলতে কিছুই নাই।

বাপরে! কথার কী বাঁধুনি নকুলের! মনে মনে চমৎকৃত হই আমি। আহা রে, খুবই বোধ করি অনটনের মধ্যে রয়েছে বেচারা, নইলে, সারা কৈশোর জুড়ে অত অত কাজ করে দেওয়ার পরও যে কিনা একটি দিনের জন্যও হাত পাতেনি আমাদের কাছে, সেই সে আজ বড়লোক বন্ধুর থেকে সামান্য সাহায্যের আশায় কতই না মনোহর ফাঁদ পাততে চাইছে। একবার মনে হয়, দুম করে কিছু টাকা এগিয়ে দিয়ে ওর নিরুপায় খেলাটা ভেঙে দিই, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয়, হঠাৎ টাকা দিতে গেলে যদি আরও অপ্রস্তুত বোধ করে বেচারা। এই এতদিনে কতখানি বদলেছে ও তা তো আমি জানি নে, যদি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, এ কী, টাকা দিচ্ছ কেন? সাতপাঁচ ভেবে ওপথ আর মাড়াইনে আমি। থাক, যখন চাইবে, তখনই না হয় দেওয়া যাবে। বলি, নিতে তো ইচ্ছে করে, কিন্তু বুনো গাছের চারা, শহুরে বাগানে কি বাঁচবে? এখন তো সব হাইব্রিডের গাছ।

আমার কথায় কেমন জানি ম্রিয়মাণ দেখায় নকুলকে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চল, হাঁটি। বসিয়া থাকিয়া কী লাভ? হাঁটতে হাঁটতে মেলার মধ্যে ঢুকে পড়ি আমরা।

একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ায় নকুল। বলে, আইস, টুকচার বসি ইখেনে।

দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে বসি দুজনে। জিলিপি ভাজা চলছে। হলুদ রঙের জিলিপি ডাঁই হয়ে রয়েছে পেতলের বারকোশে। নকুল খুব ফুরফুরে গলায় হাঁক পাড়ে, একশো গেরাম করিয়া জিলাবি দাও তো হে দু'জায়গায়। আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করছিল লোকজন। তাদের মধ্যে পরিচিত কাউকে দেখলেই মিটিমিটি হাসছিল নকুল, আর, কে যেন ওকে কৈফিয়ত তলব করেছে, এমন ভাব করে আগ বাড়িয়ে বলছিল, ছেলিয়াবেলাকার বন্ধু, কতদিন বাদে দেখা ... সেই তরেই ...।

জিলিপি খেতে খেতে নকুল শুধোয়, ক'দিন আছ?

বলি, পরশুই চলে যাব।

— সে কি! মেলা শেষ হওয়ার আগেই?

— উপায় নেই। আমি ম্রিয়মাণ হাসি,— অনেক কাজ পড়ে রয়েছে অফিসে।

— কাজ রইলে তো—। নকুল বুঝি মেনে নেয় আমার যুক্তিটা। বলে, গাছটা তবে আমি পরশুই দিয়া আইসবো।

বলি, এবারে থাক না। আমি ইতস্তত করি। আসলে, বাগানের নেশাটা কাটেনি এখনও অবধি। শহরতলিতে বাড়ি করবার পর অনেক ফুলের গাছ পুঁতেছি সামনের একচিলতে বাগানে। তবে দু-আড়াই কাঠা জমির ওপর বাড়ি, তার থেকেই একটুকরো বাগানের জন্য রাখা, এখন গিজগিজ করছে গাছে। গৃহিনীর কড়া নির্দেশ, গাছ আর বাড়ানো চলবে না কিছুতেই। বাগানটাকে জঙ্গল বানাতে চাও নাকি? নকুলের দিকে তাকিয়ে বলি, এবারে কি নিয়ে যেতে পারব? এবারে লটবহর ঢের। পরের বারে না হয়—।

—পরের বারে—? নকুল যেন ভাবনায় ডুবে যেতে থাকে।

জিলিপি খাওয়া শেষ। নকুল উঠে দাঁড়িয়ে হাফশার্টের পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দেয় দোকানদারের দিকে।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠি, কী করছিস? আমি দেব।

নকুল ঠান্ডা চোখে তাকায় আমার দিকে। বলে, তুমি কেন দিবে? আমিই তো ডাকিয়া আনিয়া খাবালাম তুমাকে। প্রায় জবরদস্তি দাম মেটায় নকুল। আমি আর বাধা দিইনি ওকে, কিন্তু পার্স খুলে একটা একশো টাকার নোট বের করে বুক পকেটে রাখি, যাতে নকুলের দিক থেকে প্রস্তাবটা এলেই টাকাটা বের করে তুলে দিতে পারি ওর হাতে। আমার মন বলছে,আমার কাছে কিছু সাহায্যের প্রস্তাব রাখবার জন্য হাঁকুপাকু করছে ও, কিন্তু নিতান্তই সঙ্কোচবশত কথাটা উত্থাপন করতে পারছে না। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি, অন্য বন্ধুদের মত এড়িয়ে যাব না ওর প্রস্তাব। কারণ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, এতদিন বাদে দেখা হলেও সেই ছেলেবেলার নকুলটাকে মনে মনে আমি ভালইবাসি।

মিঠাইয়ের দোকান থেকে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করি। মনে মনে বাড়ি ফিরতে চাইছিলুম আমি। অনেকক্ষণ কাটালুম মেলায়। ভিড় আর ধুলোয় এতক্ষণে একটু একটু মাথা ধরতে শুরু করেছে। বলি, তুই এখন কোথায় যাবি?

আমার প্রশ্নটা বুঝি ধরতে পারেনি নকুল, বলে, কেন? অন্য কুনো দিকে যাইতে চাচ্ছো তুমি? চল, আমার কুনো আপত্তি নাই। মেলা ভাঙা অবধি আমি মেলাতেই থাকি রোজ।

বলি, না, মানে, আমি এবার বাড়ি ফিরতে চাইছিলুম।

নকুল অবাক হয়, এক্ষুনি? এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে করবে কি? অতদিন বাদে দেখা, একটু গল্পগুজব করি?

সরাসরি না বলতে পারিনে। পুরনো জায়গাটাতেই গিয়ে বসি। কেমন জানি উসখুস

করছিল নকুল। চকিতের তরে মনে হল যেন ওর চোখের তারায় চাপা লোভ দেখতে পেলুম। আমার মন বলছিল, কিছু একটা বলতে চাইছে নকুল, প্রস্তুত হচ্ছে মনে মনে, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, কথাটা পাড়তে পারছে না। তবে আমার এও মনে হল, খুব শিগগির কথাটা পাড়বে নকুল। খাওয়া-দাওয়ার পরও আবার টেনে এনে বসিয়ে যেভাবে ভাঙা খেলাটা আবার খেলতে শুরু করল, তাতে করেই আমার মনে হল তেমনটা। নকুলের এই খেলাটাকে মনে মনে প্রশ্রয় দিলুম আমি, কথাবার্তার ফাঁকে ফের মানিব্যাগ খুলে আরও একখানা একশো টাকার নোট বের করে বুক পকেটে রাখলুম। তবে আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল, মাত্র দুশো টাকায় খুশি হবে না নকুল, সে মনে মনে আরও বড় দাঁও মারতে চাইছে। বিশেষ করে সে যখন ইতিমধ্যেই লোকমুখে খবরটা জেনেই গেছে যে, আমি মানুষটা পুরোপুরি অন্য বন্ধুদের মত নই, এখনও অবধি আত্মীয়স্বজন কিংবা ছেলেবেলার বন্ধুরা গিয়ে হামলে পড়লে কিছু দিই-টিই, একেবারে খালি হাতে ফিরিয়ে দিই না। এটা অবশ্য পুরোপুরি মিথ্যে নয়, তেমন কেউ সামনে এসে হামলে পড়লে ফিরিযে দিতে কেমন বাধে, কেবলই মনে হয়, তাতে করে নিদারুণ নিন্দে হবে আমার। তাছাড়া, আরও একটা কথা আছে। অনটনগ্রস্ত আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্য করতে গিয়ে যে মনে মনে এক ধরনের আত্মশ্লাঘা বোধকরি এটা তো একেবারে মিথ্যা নয়। ওদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করবার বেলায় প্রতিক্ষেত্রেই আমি ওদের চেয়ে অনেকখানি উচ্চাসনে স্থাপন করি নিজেকে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ওই উচ্চাসনে বসবার সুখই আলাদা।

টেনে এনে বসাল বটে, কিন্তু কিছুই বলছে না নকুল, অন্ধকার আকাশের গায়ে চোখ বিঁধিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে, নিঃশব্দে বিড়বিড় করছে ঠোঁটদুটি, দেখে মনে হয় বুঝি আকাশের তারা গুনছে নকুল। একসময় বলি, কতক্ষণ বসবি? বাড়ি যাবিনে?

নকুল আমার দিকে মুখ ফেরায়। বলে হুঁ, যাব। আসলে, ছেইলাটার আইস্‌বার কথা মেলাতে। যে বাড়িতে গরু চরায়, এমনই চামার, মেলার দিনগুলাতেও একটু জলদি জলদি ছুটি দেয় না। ছুটি পাইয়া যদি আসে মেলাতে, আমাকে দেখতে না পাইলে মন খেরাব হবে। তা বাদে, মেলায় আইলে আমার থিকে দু-চার পয়সা পায় তো। নকুল ম্লান হাসে। ততক্ষণে আমি পুরোপুরি বুঝে গিয়েছি, কেন আমাকে আটকে রেখেছে নকুল। ছেলেটা এলে পরে, তাকে স্বচক্ষে দেখলে পরে, খুব মায়া জমবে আমার বুকে, আর তখনি সে এমন কিছু চেয়ে বসবে, ছেলেটার জন্যই, যা আমি হয়ত বা ফেলতে পারব না।

একটু বাদে নকুলের ছেলে এল। চামচিকের কত শীর্ণকায় চেহারা, মাথায় খোঁচাখোঁচা চুল, পিটপিট করে দেখছিল আমাকে। নকুল বলে, দেখু কি, তোর এক জেঠা, গড় কর্। যদ্দুর জানি, নকুল আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। এমনিতেই তো গরিব-গুরবোদের ছেলেরা একটু বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়, ও তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়ত। ক্লাস ফোরে এসে ধরে ফেলি ওকে, সেই হিসেবে ওর বয়েস তিন বছরের বেশিও হতে পারে আমার চেয়ে। ফলে সম্পর্ক বানাতে গেলে আমি বড়জোর নকুলের ছেলের কাকা হতে পারি, জ্যাঠা কিছুতেই নয়। কিন্তু বিষয়টা আমাকে তিলমাত্র বিস্মিত

করল না। কারণ আমি সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, এই ব্যাপারটা গ্রামাঞ্চলে বয়সে ছোট-বড়র ওপর নির্ভর করে না, করে আর্থিক এবং সামাজিক কৌলিন্যের ওপর। বয়েসে বড় গরিব মানুষটি যেমন অবলীলায় সাত-ছোটকে দাদা বলে ডাকে এবং অপরপক্ষ সাড়াও দেয়, তেমনই সাত-ছোট সচ্ছল পরিবারের ছোকরাটি গরিব অথচ বয়স্ক মানুষটিকে সচ্ছন্দে নাম ধরে ডাকে। কাজেই আমি প্রতিবাদ না করে অবলীলাক্রমে নকুলের ছেলের জ্যাঠা বনে গেলুম।

মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল নকুলের ছেলে।

আমি ওকে হাত ধরে টেনে তুলি। বলি, কী নাম?

—সুবল। খুব নম্র গলায় জবাব দেয় ও।

অনেকক্ষণ থেকে জামার পকেটে দু-খানা একশো টাকার নোট খসখস আওয়াজ তুলে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল। এবার আমি আলটপকা একটা সুযোগ গ্রহণ করি। পকেট থেকে নোট দুটোকে বের করে মেলে ধরি সুবলের সুমুখে। বলি, নাও, ধর। মিষ্টি খেও।

নেবে কি নেবে না, দোনামোনা করছিল সুবল, সরু হাতখানি প্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল টাকাগুলোর দিকে, আচমকা হাঁ-হাঁ করে ওঠে নকুল, কচ্ছো কি? বাচ্চা ছেলিয়ার হাতে অত টাকা দেয় কেউ? চটজলদি হাফশার্টের পকেট থেকে একটা এক টাকার কয়েন বের করে এগিয়ে দেয় সুবলের দিকে। বলে, যা, জলদি জলদি যা খাওয়ার খায়্যা লে। রাত হয়্যালো। কাল তোর গরু চরানো নাই?

সুবল দৌড়ে চলে যায় মিঠাইয়ের দোকানগুলোর দিকে। নকুল এবার আমার দিকে তাকায়। বলে, রাত হয়্যালো, বাড়ি যাবেনি?

আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম নকুলের দিকে। ছেলেকে আড়ালে পাঠিয়ে দিল, এবার নির্ঘাত কিছু একটা বলবে, এমনটা ভেবে নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে থাকি। তখনও অবধি আমার হাতে ধরা রয়েছে করকরে একশো টাকার দু-দুটি নোট।

টাকাগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল নকুল। আমি ছল করে বলি, হ্যাঁ, এবার বাড়ি যাব। বলতে বলতে টাকাগুলোকে পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে আমি পিছু ফিরি, চলি, অ্যাঁ? আমি হাঁটতে শুরু করি।

দশ পা'ও বোধ করি হাঁটিনি, পেছন থেকে ডাক দেয় নকুল, অমিত, শুন।

আমি পিছু ফিরে তাকাই ওর দিকে। দেখি, আমার দিকে খুব দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে ও। নিজের অজান্তে আমার হাত চলে যায় পকেটের দিকে। ভাঁজ করা নোটগুলোকে আলতো করে ছুঁই আমি।

পাশটিতে এসে নকুল বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। বলি, কিছু বলবি? বল্ না। বন্ধুর কাছে এত সঙ্কোচ কীসের? আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকি।

এক সময় নকুল খুব ভেজা ভেজা গলায় বলে, আবার কবে দেখা হবে?

বাস্তবিক, এমন প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না আমি। বোকার মত হাসতে থাকি। বলি, খুব শিগগির তো আর আসছি নে, আবার হয়ত বা আসছে বছর মেলার সময় ...।

চোখদুটো চিকচিক করছিল নকুলের। আমি খুব আকুল গলায় বলি, কিছু বলবি? বল্ না।

— না, কী আর বলব? খুব ম্রিয়মাণ মুখে বলে নকুল, ভাল থেকো। আবার আইলে যেন দেখা হয়। কখন যে আসো, চলিয়া যাও, খাটাবাটায় ব্যস্ত থাকি, জানতেও পারি না। খুব ধীরলয়ে কথাগুলো বলতে বলতে নকুল, সম্ভবত ছেলের সন্ধানে, মিষ্টির দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করে। আমি পেছন থেকে দেখতে থাকি ওকে। কুঁজোপানা শরীরটাকে প্রাণপণে সোজা রাখবার চেষ্টা চালাতে চালাতে এক সময় মানুষজনের ভিড়ে হারিয়ে যায় সে।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বুক পকেটে রাখা টাকাগুলোকে বাঁ-হাত দিয়ে স্পর্শ করি। কানের লতি অজান্তে জ্বলছিল। নকুলের প্রতি যারপরনাই ক্ষোভ জন্মাচ্ছিল আমার মনে। আমি তার ছেলেবেলার বন্ধু, আমাকে অতখানি অপমান ও না করলেই পারত।

সন্তান-সন্ততি

এতক্ষণে সবাইয়ের মুখে হাসি ফুটলো।

মেঘে ঢাকা আকাশের আড়ালে নরম আলোর ছটা, এতক্ষণে।

অথবা কাঁসইয়ের ওপারে মেঘের ছায়া-পড়া গোমড়ামুখো ডুংরিগুলো অকস্মাৎ রোদ্দুর পেয়ে হেসে উঠলো একসাথে।

বাঁশরী একটা আলতো আলমোড়া ভেঙে শরীরে বার-দুই লীলায়িত ঝাঁকুনি তুললো। ছন্দা সবার অলক্ষ্যে ওর গোলাপি জামদানি শাড়ির কুঁচি গুছিয়ে নিল, দু'হাতের নিপুণ কৌশলে। সত্য একখানা লম্বা সিগারেট ধরালো। মণিময় আর ধ্রুব সামনের টবে থরেথরে সাজানো ক্যাকটাসগুলোকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো।

ধ্রুবর দু'চোখের কোণায় টলটলে অহংকার। ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর হাসি। একটা ভয়ানক অনিশ্চয়তার হাত থেকে সবাইকে মুক্তি দেবার বারোআনা কৃতিত্ব বুঝি ওরই। একে নিশ্চয়ই কোনও অর্থে জয় বলা যায়।

খুব ছেলেবেলা থেকে সত্য একটা তত্ত্ব পুষে রেখেছে বুকে। ওর এক মডেল-মাস্টারমশাই বলেছিলেন কথাটা। "হোপ ফর দ্য বেস্ট, বাট বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য ওয়ার্স্ট"। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মনটাকে ঐ খাতে বইয়ে দিতে পারলে নাকি সুখ আসে একেবারে গাণিতিক নিয়মে।

বেরোবার আগে কথাটা সবার মধ্যে সংক্রামিত করবার চেষ্টা করেছে ও। সবাই একমত হয়েছে। অত গুছিয়ে গাছিয়ে কোথাও বেরোনো উচিৎ নয়। সংসারটাকে খানিক হারাবার জন্যই তো বেরোনো। সেখানে অনির্দিষ্টই আনন্দ। লক্ষ্যহীনতাই লক্ষ্য। সংসার থেকে আচমকাই পালাতে হয়।

— ঠিক হরিপদ ময়রার মতো। মণিময় সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ জোগায়, — ভাত দিয়ে বউ গেল ডাল আনতে, প্রাণপাখি সেই ফাঁকে শিকলি কেটে হাওয়া।

মুকুটমণিপুরে ইরিগেশনের একটা ছিমছাম বাংলো আছে। ডুংরীর চুড়োয়। একটা ইয়োথ-হোস্টেলও রয়েছে। ডর্মেটরি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও নাকি একটা লজ বানিয়েছে। ইচ্ছে করলে এগুলোর যে-কোনও একটা আগাম বুক করা যেত। যাওয়াটা হয়তো পিছিয়ে যেত দু'দিন, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরাপদ বাসস্থান। ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ম আরাম। খাবার-দাবারও অনেক বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। আপেল, চেরি, কলা, বিস্কুট...। কফির কৌটো, গুঁড়ো দুধ...। রান্নার জন্য উপকরণ। অবশ্য ও এলাকায়

মুরগি সস্তা। মহুয়া কি আগের মতোই সহজলভ্য? নাকি রায়ের শপ থেকে দু'চারটে সোনালি-ঈগল, বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী...? কিন্তু ঐ যে, অত মাপজোক, হিসেব-নিকেশ করে গুছিয়ে গাছিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এক সংসার থেকে পালিয়ে দ্বিতীয় সংসার রচনার স্পৃহা নেই কারো। তাই ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে গেল প্রস্তাবটা। একেবারে শূন্য হয়েই যাবো। ওখানে যা মিলবে, খাবো। যেখানে পাবো, থাকবো। যা খুশি করবো। কিছুই ঠিক থাকবে না আগে থেকে।

— আমি শুধু দিনভর নুড়ি কুড়োবো। রঙিন নুড়ি। বাঁশরী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। — ঐ টানেই যাওয়া।

— বাচ্চারা যাবে তো সঙ্গে? ছন্দা শুধোয়।

— নো, নো, নেভার। সত্য প্রবলভাবে দু'হাত নাড়ে, —এমন ট্রিপে সঙ্গে বাচ্চা নিলেই হয়েছে। সর্বদাই ঘ্যানর-ঘ্যানর করবে। সারাক্ষণ ওদের সহস্র আবদার মেটাতে ট্রিপের আনন্দটাই মাটি।

— আপনার পক্ষে বলা সহজ মশাই। বাঁশরী ভুরুতে কপট রোষ ফুটিয়ে বলে, —ব্যাচেলররা অমন বড়বড় কথা বলতেই পারে।

— রাইট ম্যাডাম। ধ্রুব তা দেয় বন্ধু-পত্নীর কথায়, — আমরা হলুম গিয়ে সংসারী মানুষ।

শেষ অবধি সাতপাঁচ ভেবে তিন্নিকে দিদার কাছে রেখে এসেছে ছন্দা। মুন্নাকেও বাঁশরী ওর বাবার কাছে রেখে এসেছে। সত্যি, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এসব প্লেজার-ট্রিপ ঠিক জমে না। ওদের দিকেই নজরটা পড়ে থাকে।

বাসস্ট্যান্ডে এসে চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও অবিশ্বাস যায় না সত্যর।

— বাচ্চাগুলোকে রিয়েলী রেখে এসেছেন? সত্যি?

— দেখছেন তো নিজের চোখে। ছন্দা চোখ মটকে জবাব দেয়।

চারপাশটা আবার আতিপাঁতি দেখে সত্য। ঝুঁকে পড়ে ছন্দার দিকে। ঘন হয়ে বলে, এই যে, ম্যাডাম, খোকা বুকের মধ্যে লেপটে নেই তো?

সত্য এমন একটা ভঙ্গি করে ছন্দার বুকের দিকে তাকায়, ছন্দা ও বাঁশরীর মুখ সহসা লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়।

— এই জন্যেই বাচ্চাদের মানা করা, তাই না? বাঁশরী দুচোখের কাজলের রেখা ভাঙচুর করে বলে, ওদের সামনে এসব বাঁদরামোগুলো তো চলে না।

সত্য আলতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে অল্প দূরে সরে যায়। বলে, না থাকলেই ভালো, তবে আমার মনে হয়, এর মধ্যে কোনও চাতুরি আছে। বাচ্চা ফেলে মেয়েরা কখনো বেরোয়? অল-রাইট, যথাসময়ে দেখতে পাবো নিশ্চয়ই।

ধলডাঙার মোড়ে ওরা চা-বিস্কুট খেয়েছে। সামনে দ্বারকেশ্বর বুক চিতিয়ে শুয়েছিল। ধু-ধু বালির জাজিমে শালিখদের জমায়েত।

এক্তেশ্বরে যাওয়ার লাল রাস্তার ধারে বুড়ো বটের অসংখ্য ঝুরিতে দোল খাচ্ছিল বাচ্চারা। একটা ঝরঝরে বাস বিষম আওয়াজ তুলে আসছিল। চা-ওয়ালা বললো, ইট্যাও গোরাবাড়ি যাবেক। তবে উয়ার পিছু পিছু একখানা ভাল গাড়ি রঁয়েছে। নৈতন গাড়ি। এসপেস্।

কিন্তু ঐ যে, ওরা পণ করে বেরিয়েছে, কোনও বাছবিচার থাকবে না, ভাল-মন্দর ফারাকটাও লোপ পেয়ে যাবে। কাজেই, ঐ ঝরঝরে বাসেই আরোহন।

সর্বাঙ্গে ঝনাঝন আওয়াজ তুলে খানাখন্দের ওপর নাচতে নাচতে এগোচ্ছিল বাস। দু'ধারে ডাঙা-ডহর-ডিহি হারিয়ে যাচ্ছিল শ্লথগতিতে। বাঁপাশে লাল টকটকে টাঁড় জমিন। ঢেউ খেলানো, রুক্ষ। তার মধ্যে গোটা দশ-বারো শীর্ণকায় তালগাছের বিক্ষিপ্ত মিছিল। ডাইনে ঢালু জমির ওপর আঁকাবাঁকা নালা। তার দু'পাড়ে অসংখ্য এবড়োখেবড়ো খাঁজ। তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল।

রাস্তার দু'ধারে ছড়ানো-ছেটানো পলাশ আর আঁকোড়ের ঝোপ। অজস্র পিংদো গাছের গুল্ম, সবুজে হলুদে মাখামাখি। রুখা জমির ওপর লিউলির লতা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে এন্তার। লতার মাঝেমাঝে বেগুনি ফুলের সমারোহ। মাথার ওপর নীল আকাশ, তার কোলে কালচে জঙ্গাল, গেরুয়া ডাঙা, ধোঁয়াটে গাঁ...।

— আমরা বাসে বসে খাবো না কিছু? মণিময় লোভী লোভী চোখে শুধোয়।

ছন্দা চোখের তারায় কৌতুক জড়ো করে বলে, এই তো খেলেন।

— কখ-ন! সেই তো কোন্ আদিম যুগে ধলডাঙার মোড়ে —! মণিময় উদাস চোখে তাকায়।

বাঁশরীর টকটকে ফরসা মুখ। চোখে বাঁকানো কাজলপাতি ঢংয়ের চশমা। সোনালি ফ্রেমে চিকন কাজ। স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে ওর চোখদুটোকে ভারী রহস্যময় লাগে। স্বামীর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে খুব মায়াবি গলায় বাঁশরী বলে, সব সময় খালি খাই-খাই!

— রাইট। ধ্রুব চোখ দিয়ে ধমক দেয় মণিময়কে, —খিদেটা বাড়িতে রেখে আসতে পারিস নি?

দু'চোখে চিকন নিমফুলি হাসি ছড়িয়ে বাঁশরী বলে, ঐ চারপাশে যা-সব দেখছো, এগুলোই এখন আমাদের খাদ্য, বুঝলে মশাই?

—এ'তো স্রেফ উদরপূর্তির জন্য 'খাই-খাই' বলে খোঁটা দেওয়া নয়, ম্যাডাম। সত্য চোখ মটকায়, — কী রে মণিময়, ম্যাডাম কী কয়? কোন্ কোন্ ব্যাপারে তোর সবসময় খাই-খাই ভাব?

—ধ্যাৎ! চোখ পাকায় বাঁশরী।

মণিময় অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে বউয়ে দিকে।

ধ্রুব ব্যাপারটা ভারী উপভোগ করছিল। বলে, সেই একটা গল্প রয়েছে না, ফ্রান্সের এক ভদ্রলোক...।

—স্টপ —স্টপ। ওপাশ থেকে মিহি সুরেলা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ছন্দা।

হকচকিয়ে থেমে যায় ধ্রুব।

ছন্দা কোমল তর্জনী তুলে তাক করে স্বামীর দিকে। সতর্ক করে দেবার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, চলতি জীবনের সব নিরস গল্পগাথা পেছনে ফেলে এসেছি না আমরা? ওসব বস্তাপচা মাল আবার ফিরে গিয়ে বাড়ির ড্রইং-রুমে হবে।

—রাইট। সত্য সারা কপালে একটা অনির্বচনীয় ভঙ্গি করে। বলে, আপাতত ঐ দ্যাখ; খালের ঝিরঝিরে জলে কেমন গা ডুবিয়ে শুয়ে রয়েছে মোষের পাল।

সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল।

খালের বুকে অল্পই জল, দু'পাশে বালির চর। সামনেই একটা চটুল বাঁক। বাঁকের মুখে হাঁটুটাক জলে আধখানা শরীর ডুবিয়ে শুয়ে রয়েছে একপাল কালো মোষ।

— ইস, যেন কালো পাথরের চাঙড় এক-একটি! বাঁশরীর দু'চোখ স্বচ্ছ কাচের আড়ালে অপরূপ হয়ে ওঠে।

— পাথরই তো। সত্য নির্বিকার গলায় বলে, সত্যি সত্যি মোষ ভেবেছেন নাকি?

সবাই চমকে তাকায় আবার। স্ট্রেঞ্জ! পাথরই তো!

সত্যিসত্যি কালো পাথরের চাঙড় এগুলো, বর্ষায় ডুবে যায়, শীতে ঝিরঝিরে জলে পিঠ জাগিয়ে রোদ পোহায়। সারা গায়ে শ্যাওলা জমে মসৃণ, পিচ্ছিল।

— ঐ দ্যাখো, আবার বক বসেছে পিঠে। ছন্দা কলকল করে ওঠে।

সত্য মিটিমিটি হাসছিল। বলে, ঐ চোখদুটোকে মোটেই বিশ্বাস করবেন না, ম্যাডাম। ও ব্যাটারা যে কখন কী দ্যাখে!

— ওগুলো কি তবে বকও নয়? বাঁশরী অনিশ্চিত চোখে তাকিয়ে থাকে সত্যর দিকে।

সত্য হো-হো করে হেসে ওঠে।

শুলুকপাহাড়ীর হাট জমে উঠেছে এখনই। বেলা এখন আন্দাজ ন'টা। বিশাল ডাঙায় শতখানেক ঝাঁকড়া মহুল গাছ। তার তলায় জমজমাট হাট। পশুহাট। গরু-মোষ, ছাগল, হাঁস-মুরগি, শুয়োর...। হাটের বাইরে এক বিধ্বস্ত টিক্‌রার ওপর চুল ছাঁটবার সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে নাপিত। এক দেহাতি ছোকরা খালিগায়ে চুল কাটাতে বসেছে। দিনের শুরুতে ষোলআনা উদ্যম নিয়ে কাঁচি চালাচ্ছে নাপিত ভায়া। দেখতে দেখতে উদাস হয়ে আসে মণিময়ের চোখ। বলে, হাটে এসেছে, চুল কাটাচ্ছে, এরপর গায়ে জবজবে করে সরষের তেল মেখে ঝাঁপিয়ে পড়বে পেছনের দিঘির জলে...।

— ভিজে কাপড়ে উঠে এসে একধামা মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে ঠুসেঠুসে খাবে। ধ্রুব পাদপূরণ করে, —তারপর উদাস নয়নে ঘুরে বেড়াবে যতক্ষণ না পশ্চিম আকাশে সূর্যের লাল চাকি দেখা যায়।

— তোমাকে বলেছে? যা খুশি ভাবলেই হলো? বাঁশরী ক্ষেপে গিয়ে শুধোয়।

— ভাবলে ক্ষতি কি? ছন্দা ঠোঁট উলটে বলে, — এমন আনন্দের দিনে ছকবাঁধা ভাবনা ভাববার দরকার কী? আজ আমরা সবাইকে নিয়ে যেমন খুশি, যা খুশি ভাববো।

ধুতমো ডাঙার ওপর ইন্‌দ্‌পুর ব্লক অফিস। সামনে বিশাল এলাকা জুড়ে অজস্র এবড়োখেবড়ো পাথর বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো। মাঝে মাঝে দু-একটি মহুলের গাছ, পলাশের ঝোড়।

— এই, জানিস তো, এখানে নীলাঞ্জন বি-ডি-ও।

— কোন নীলাঞ্জন? সত্য আড়চোখে অর্ধেক দৃষ্টি ফেলে ধ্রুবর ওপর।

— ঐ যে, সিঁথিতে থাকতো।

— কোন্ সিঁথি? কার মাথার সিঁথি?

ধ্রুব বোঝে, মস্করা করছে সত্য। বলে, ওকে নিয়ে নিলে ভালো হতো মাইরি। দারুণ জমাটি ছেলে।

ধ্রুবর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সত্য। বলে, বলেছি না, সংসার থেকে কিছুই সঙ্গে নেব না আমরা। চিরুনিও না, নীলাঞ্জনও না।

বয়রামুড়ি পেরোতেই পেছনে একটা বাস দেখা গেল। বেশ চকচকে, নতুন। অহঙ্কারী আওয়াজ তুলে ছুটে আসছে।

— ইস্! ছন্দা কেমন মিইয়ে গেল হঠাৎই, — ঐ বাসটাতে গেলে আগে পৌঁছনো যেত। সত্যদা, নেমে পড়বেন?

সত্য আড়চোখে তাকায় ছন্দার কব্জির দিকে। বলে, ঘড়িগুলো সঙ্গে এনে ব্লান্ডার হলো দেখছি।

লজ্জা পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেয় ছন্দা। মিষ্টি হেসে বলে, স-রি।

পেছনের বাসটা ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে বাসের মধ্যে কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, আরে, চালাও হে ড্রাইভার। জোরসে চালাও।

এ এক অদ্ভুত মানসিকতার শিকার আমরা সবাই। এমনিতে রাফ ড্রাইভিংয়ের নিন্দে সারাক্ষণই করি, কিন্তু বাসে উঠলেই অন্যরকম। তখন, যে বাসে উঠি, সেই বাসেরই সাপোর্টার। তখন আমরা কিছুতেই চাইনে, অন্য বাসটা আমাদের চেয়ে আগে যাক।

বাসটা কাছাকাছি আসতেই হৈ-হৈ করে ওঠে মণিময়, একদম রাস্তার মাঝ বরাবর চালাও ভাই। ও যেন সাইড না পায় কোনমতেই। মণিময়ের প্রস্তাবে হৈ-হৈ করে সায় দেয় অনেকেই।

ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে পেছনের বাসটা। মণিময় সোজা হয়ে বসে। ওর কপালের তাবৎ রেখায় চাপা উত্তেজনা। বলে, ডাইনে চেপে ভাই। একটু সাইড পেলেই বেরিয়ে যাবে ও।

সেইভাবেই চলতে থাকে বাসদুটো। একটু ফাঁক পেলেই পেছনের বাসটা বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে, হৈ-হৈ করে ওঠে এ বাসের যাত্রীরা। গেল, গেল! নিমেষে সজাগ হয় ড্রাইভার। স্টিয়ারিংয়ের ওপর কব্জির আলতো চাপে খেয়ে ফেলে ডানদিকের জায়গাটুকু। পেছনের বাসটা ঘনঘন অস্থির হর্ন বাজিয়ে উষ্মা ছড়িয়ে দেয় ঝলকে ঝলকে।

মণিময় একটা সিগারেট বের করেছিল, সেটা হাতেই ধরা রয়েছে। উত্তেজনায় জ্বালাবার ফুরসৎ হয় নি।

— কী হচ্ছে? বাঁশরী ভ্রূকুটি করে শাসন করতে চায় মণিময়কে, — এই করেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়।

পেছনের বাসের যাত্রীরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল বারবার। মণিময় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে ওঠে, অত তাড়া কীসের দাদা? আসনু না পেছন পেছন দুলকি চালে। বেশি স্পীড কি ভালো?

সত্য একদৃষ্টিতে মণিময়কে দেখছিল। উত্তেজনায় একেবারে পাগলের মতো করছে ও। এক সময় সত্য বলে, মণি, তুই না হয় নেমে যা।

— কেন? অবাক হয়ে তাকায় মণিময়।

—তুই বরং ফিরতি বাসে বাড়ি ফিরে যা। একটু বাদে তোর অফিস শুরু হয়ে যাবে যে।

মণিময় তাকিয়ে থাকে সত্যর দিকে। ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না।

দুচোখে দুর্বোধ্য দৃষ্টি ফুটিয়ে সত্য বলে, বলা যায় না, তোর একদিনের অ্যাবসেন্সে তরুণ বোস যদি বড়সাহেবকে পটিয়ে দু'কদম এগিয়ে যায়!

বড়সাহেবের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে তরুণ বোসের সঙ্গে মণিময়ের চিরকালের লড়াই। অফিসের সবাই তা জানে। মণিময় অপ্রস্তুত বোধ করে সত্যর কথায়। বলে, বাসে উঠলে একটা কমপিটিটিভ মাইন্ড প্লে করে মাইরি।

— সেটাই তো বলছি। ওটা বাসের সঙ্গে না করে তরুণ বোসের সঙ্গে করাই ভালো। খুব শীতল গলায় বলে সত্য।

মণিময় লজ্জা পেয়ে গুটিয়ে নেয় নিজেকে।

মুকুটমণিপুরের স্টপেজে ওদের নাবিয়ে দিয়ে বাসটা গোরাবাড়ির দিকে চলে গেল।

দু'ধারে খাড়াই সারবন্দী ডুংরী। সামনে আঁকাবাঁকা প্রশস্ত ড্যাম। ড্যামের ওধারে কাঁসাইয়ের নীল জল। মাথার ওপর ঝকঝকে আকাশ। অ্যাতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও একঝাঁক প্রশ্ন চারপাশ থেকে পাঁচটি প্রাণীকে ঘিরে ধরলো নিমেষে।

— আমরা থাকবো কোথায়?

— কেন? এইখানে, এই উদার আকাশের তলায়, ঐ ডুংরীর কোলে, সবুজ জাজিমের ওপর।

— থামুন দিকি। চোখ পাকায় ছন্দা, — সব সময় ইয়ার্কি। ইস্, মা-গো, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি নে।

বাঁশরী অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। ও সবসময় খুব ঝকঝকে থাকতে ভালোবাসে। এতক্ষণের বাস-জার্নিতে ওর মুখে অল্প ঘাম-ময়লা জমেছে। শাড়ির কুঁচি ঈষৎ লাট খেয়েছে। সৌখিন গোলাপী রুমাল কোমর থেকে টেনে নিয়ে ও নাকের ডগায় বুলোতে লাগলো পরিপাটি করে।

ছন্দার কাছে বকুনি খেয়ে সত্য তাকায় বাঁশরীর দিকে। বলে, কী ম্যাডাম, সত্যিই কি এখানেও একটা চার-দেওয়ালের বন্দীত্ব কামনা করছেন আপনিও?

— করছি বৈকি কি সত্যদা। বাঁশরী চোখের কোলে হাসে, —কেবল আপনারা ছেলেরা হলে তাও কথা ছিল, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের একটা চার-দেয়ালের আস্তানা চাই বৈকি।

— এই পরবাসে, এমন নগ্ন প্রকৃতির কোলে মেয়ে-পুরুষের ভেদাভেদটা না-হয় নাই রইল —।

— অতটা সন্নিসী হই নি এখনো। বাঁশরী চোখ টিপে হাসে।

ইয়োথ-হোস্টেলে সীট পাওয়া গেল। কিন্তু ওটা ডরমিটরি গোছের। সারবন্দী চৌকি পাতা। দেখেই ছন্দাদের চক্ষু চড়ক গাছ।

এক দঙ্গল ছোকরা হলঘরের অন্য চৌকিগুলো জুড়ে হৈ-হুল্লোড় করছে। ওদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পেটানো শরীর, পাকানো গোঁফ, চোখেমুখে একরোখা অশালীন ভাব। ওদের দেখতে দেখতে ছন্দার সঙ্গে বাঁশরীর চোখাচোখি হয়, যার অর্থ হলো, ঐখানে এক দঙ্গল ছোকরার সঙ্গে থাকা ওদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

ধ্রুব পরিস্থিতিটা এক নজর দেখে নিয়ে বলে, তোমরা একটুখানি থাকো এখানে, দেখি, অন্য কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ধ্রুব যে কতটা করিতকর্মা তার প্রমাণ পাওয়া গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ইরিগেশন-বাংলোর দুটো ঘর বুক করে ফিরে এলো খানিকক্ষণের মধ্যে। এক কথায় অসম্ভবকে সম্ভব করলো ও।

এতক্ষণে সবার মুখে হাসি ফুটলো।

এক নম্বরে ঢুকলো মণিময় আর বাঁশরী, দু'নম্বরে ছন্দা আর ধ্রুব। সত্য বললো, আমার জন্য ভেবো না। আমি রাতের বেলায় ড্রইং রুমের সোফাতেই বডি ফেলে শোবো।

হলঘরে এসে বসলো সবাই। কফি আর ওমলেট এলো। ওমলেটে কামড় দিতে দিতে পুরো জমায়েতটা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সত্য সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ধ্রুবর চোখেমুখে বাংলো-বিজয়ের অহংকারটা লেগে রয়েছে তখনো। ছন্দাও স্বামী-গরবে গরবিনী হয়ে দেমাকি মুখ করে কফির কাপে চুমুক মারছে। বাঁশরীর মুখ ঈষৎ থমথমে। বোধ করি সেই কারণেই মণিময়ের চোখেমুখে এক ধরনের অপ্রস্তুত ভাব।

দেখেশুনে হালকা ফোড়ন কাটে সত্য, মনে হচ্ছে আমরা কোনও গুরুতর সমস্যায় পড়েছি?

— কেন? চমকে তাকায় মণিময়, —কিসের সমস্যা?

— সেটাই তো জানতে চাইছি। অকস্মাৎ সবাই কেন একসঙ্গে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললাম? সত্য সবার মুখের ওপর একপ্রস্থ দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, —এই মুহূর্তে কী ভাবছি আমরা?

অল্প আড়মোড়া ভেঙে ছন্দা বলে, বাংলোটা না পেলে কী কষ্টটাই না হতো! ও অবশ্যি চিরকালই এমন রিসোর্সফুল। সেবার গোয়াতে—।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় বাঁশরী।

— কোথায় চললেন?

— যাই। বাঁশরী একচিলতে ভ্রূরো হাসি হাসে, —মুখেচোখে জল দিই গে।

খানিকবাদে বোঝা গেল, তড়িঘড়ি বেরোতে গিয়ে প্রত্যেকেই কতকিছু ফেলে এসেছে বাড়িতে। মণিময় পায়জামার সঙ্গে বাড়তি পাঞ্জাবি আনে নি। অথচ পায়জামার সঙ্গে সার্ট পরাটা বাঁশরীর ভীষণ অপছন্দ। ধ্রুব দাড়ি কামাবার সেটটাই ভুলে এসেছে। অথচ একদিন দাড়ি শেভ না করলে ওর জ্বরজ্বর লাগে। ছন্দা তো পুরো মেক-আপ বক্সটাই ফেলে এসেছে। পেঁচার মতো মুখ করে বসে রয়েছে সে। কাঁদোকাঁদো গলায়

বললো, বিকেলে আমি কিছুতেই বেড়াতে বেরোতে পারবো না। বাঁশরীর মনেও সুখ নেই একতিল। কিছু ব্যক্তিগত প্রিয় বস্তু সেও নির্ঘাৎ ছেড়ে এসেছে।

সময়ের সাথে সাথে ফেলে আসা সামগ্রীর তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। মণিময়ের স্পেশাল ব্রাণ্ডের সিগারেট, ধ্রুবর পাঞ্জাবির বোতাম, বাঁশরীর খাওয়ার আগের টনিক, ছন্দার মাথা-ধরার বড়ি, তেল, সাবান, বোরোলীন, চটি, চিরুনি, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা টিপ...। কতকিছুই যে ভুল হয়ে গিয়েছে!

ছন্দা ডুকুরে উঠলো সবার সুমুখে, কত সখ করে নতুন ডিজাইনের বাউটি-জোড়া গড়ালাম, বেরোবার সময় এমনই তাড়া লাগালো, পরে আসতেই ভুলে গেলাম। ধুশ, জার্নিটাই মাটি।

— তোমার একনম্বরেই ঢোকা উচিত ছিল। বেড়াতে বেরিয়ে ধ্রুবকে একফাঁকে খুব খাটো গলায় বলে ছন্দা।

— কেন?

— কেন কি, ওটা ভি-আই-পি রুম, অনেক বেশি কমফর্টেবেল।

ধ্রুব কোনও জবাব দেয় না।

— তোমার জন্যই তো বাংলোটা পাওয়া গেল। ছন্দা যেন একটা যুক্তি খুঁজে পায়, —ওদেরও উচিত ছিল এক নম্বর রুমটা তোমাকে অফার করা।

ধ্রুবর মগজে তখন অন্য চিন্তা ঘুরছে। ছন্দার কথাগুলো ওকে তেমন করে ছুঁলো না। সেটা আন্দাজ করে মনেমনে আহত হয় ছন্দা। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, খামোখা বিল সেঁচে বেড়ানোটা তো তোমার চিরকালের অভ্যেস। কই খায় অন্যেরা।

ধ্রুব কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাশ দিয়ে একটা দেহাতি লোককে চলে যেতে দেখে ওকে হাত তুলে থামায়। ছন্দা বুঝতে পারে, দেশি মদের সন্ধানে মানুষটা অস্থির হয়ে উঠেছে।

— আজকের দিনে ওটা না হলে চলতো না? মৃদু গলায় ছন্দা বলে।

— তার মানে? ধ্রুব অবাক চোখে তাকায় ছন্দার দিকে, —আজকের দিনেই তো বেশি করে চাই। নইলে অদ্দুর আসা কেন?

ছন্দা মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে।

পেছনে হাঁটতে থাকা ওদের পুরো দলটি এসে পড়ে ততক্ষণে।

বাঁশরী আদুরে গলায় বলে, ও সত্যদা, কোথায় তোমার নুড়ি?

সত্য চারপাশের পাহাড়-ডুংরীগুলোর দিকে হাতটা ঘুরিয়ে এনে বলে, কেন, এই তো চারপাশে রাশিরাশি নুড়ি! ছোট-বড়, সাদা-কালো...।

— ওসব শুনছি নে। বাঁশরী জেদী গলায় বলে ওঠে, তুমি কিন্তু আমাকে নুড়ির লোভ দেখিয়ে এনেছ। রঙ-বেরঙেব নুড়ি কুড়োবার লোভেই কিন্তু আমি এসেছি এখানে। মনে থাকে যেন সেটা।

দু'ধারে অসংখ্য নুড়ি, পাথর, ...হরেক রঙের..., সত্য তার থেকে দু'চারটে বেছে এনে ধরে দেয় বাঁশরীর সামনে।

— ধেৎ! বাঁশরী ঠোঁট ওলটায়, —এগুলো চাইনে। আরও সুন্দর রঙিন নুড়ি চাই আমার।

ছন্দা অনেকক্ষণ গম্ভীর মুখে হাঁটছিল। একসময় মণিময় ঘন হয়ে আসে ওর দিকে। শুধোয়, কী হলো ম্যাডাম, অমন চুপচাপ?

— কিছু না। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় ছন্দা, —মাথাটা ধরেছে।

ছন্দার মাঝে মাঝে কোন্ এক রহস্যময় কারণে মাথা ধরে। ধ্রুব সেটা জানে। এমন কি, বিয়ের অ্যাদ্দিন বাদে কারণটাও অল্পস্বল্প বুঝতে পারে।

সত্য হালকা চালে বলে, ওটাকে অদ্দুর বয়ে এনেছেন ম্যাডাম?

— আহা, উনি কেন বয়ে আনবেন? মণিময় পালটা যুক্তি দেখায়, —ও হ্যাংলার মতো পিছুপিছু এসেছে। ধ্রুব ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, ট্যাবলেটগুলো আনো নি?

ছন্দা জবাব দেয় না।

দানুয়া ডুংরীর একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে বসেছে ওরা। ওরা মানে সত্য আর বাঁশরী। ধ্রুব আর মণিময় গিয়েছে মহুয়ার সন্ধানে। ছন্দা অল্প তফাতে কুসুম গাছের তলায় বসে পড়ন্তি বিকেলের শোভা দেখছে অপলক। বিকেলের ম্লান আলো ওদের গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। পায়ের তলায় কংসাবতীর প্রাচীন খাত। এখন একটা মজে যাওয়া দহের মতো লাগে। তার মধ্যে সবুজ ঝোপঝাড়, কাঁটাবাঁশের জঙ্গল, ছোট ছোট ঝুপড়ি। ততক্ষণে ওপারের সারবন্দী ডুংরীগুলো দিনান্তের অন্ধকার গায়ে মাখতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে শিহরিত হয় বাঁশরী। কী অপরূপ সব ডুংরী, কুনকি হাতির মতো গায়েগায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

— দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী রঙ বদলায় ওরা। সত্য খুব উদাস গলায় বলে, ওরা বহুরূপী।

— ওগুলো সত্যিসত্যি ডুংরী তো, সত্যদা? নাকি আবার, —ঐ নদীর মধ্যেকার মোষ-পাথরের মতো—।

— আরেব্বাস! তুমি দেখি পাথরগুলোর নামকরণও করে ফেলেছো! মোষপাথর! এগুলোকে কী মনে হচ্ছে তোমার? একপাল বুনো হাতি?

জবাবে বাঁশরীর দু'ঠোঁটে ফেনিয়ে ওঠে গূঢ় হাসি।

সত্য বলে, এগুলোর কী নাম দিলে? হাতি-পাহাড়?

— তেমন নাম দিলেই বা ক্ষতি কি?

বাঁশরী অবাক নয়নে ডিহির দিকে তাকায়। কাঁসাইয়ের ওপারে প্রশস্ত ডিহির ওপর একপাল ময়লা হলুদ রঙের ভেড়া।

— ফ্যাট্। পরমুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কপট রোষে ফুঁসে ওঠে বাঁশরী, —আবার বোকা বানানো! ওগুলো তো পাথরের চাঁই।

— পাথরের চাঁইই বটে। সত্য রহস্যময় চোখে তাকায়, —তাবলে আমার আগের কথাগুলোও মিথ্যে নয়।

— কোন্ কথাগুলো মিথ্যে নয়? বাঁশরী ভ্রূ কুঁচকে শুধোয়।

সত্য একটা লম্বা সিগারেট মুখে পুরে জবাব দেবার দায় সারে।

সন্ধের মুখে আকন্ঠ চড়িয়ে ফিরলো ধ্রুব আর মণিময়।

সত্যরা ততক্ষণে বাংলোয় ফিরে এসেছে।

ধ্রুব ঘোষণা করলো, একটা বড়সড় মুরগি পাওয়া গেছে। মণিময় আরও গোপন খবর দিল। খাতরায় লোক পাঠানো হয়েছে এক বোতল ওল্ড-মঙ্ক নিয়ে আসার জন্য। সাড়ে-সাতটার বাসে আসছে সেটা।

বাঁশরী ভাবলেশহীন চোখে দেখছিল ওদের উচ্ছ্বাস। ছন্দা পুতুলের মতো বসে ছিল সোফায়। মনিণময় আর ধ্রুব পোশাক বদলাতে চলে গেল যে-যার ঘরে।

চৌকিদার লন্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল। লন্ঠনের মৃদু আলোয় তিনটে ছায়া নৃত্য জুড়ে দিল নীরবে। নাচতে নাচতে লুটোপুটি খেতে লাগলো এ-ওর গায়ে।

— ইস্, কী বিচ্ছিরি যে লাগছে! বাঁশরী চোখের তারায় নিদারুণ ক্লান্তি ফুটিয়ে বলে।

— সত্যি, এখানেও লোড-শেডিং। ছন্দার গলায় জমাট বিরক্তি।

মণিময় ধ্রুব পোশাক বদলে ফিরে এলো।

চৌকিদার চা দিয়ে গেল। চুপচাস বসে চা খেতে লাগলো সবাই। ধীরে ধীরে বাংলোটা একটা হানাবাড়ির রূপ নিল।

খানিকবাদে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সত্য। বললো, চল, বাগানে যাই। খোলা আকাশের তলায় বসে চুটিয়ে গল্প করি।

ছন্দা এবং বাঁশরী একসঙ্গে শিউরে উঠলো। বলে, বাপ রে, জমে যাবো ঠাণ্ডায়।

— কাল তাহলে নির্ঘাৎ নিওমোনিয়া। মণিময় জড়ানো গলায় বলে ওঠে।

— তাহলে এস, এখানেই সবাই মিলে নাচি।

— ফ্যাট। বাজে বকবেন না তো।

-- তাহলে একসাথে গান ধরি এস।

— কী গান ?

— যে-কোনও গান। সত্য কাঁধ ঝাঁকায়, — রবীন্দ্র, নজরুল, শ্যামাসঙ্গীত, খেয়াল, ঠুংরী... যা খুশি।

মণিময় আর ধ্রুব পুতুলের মতো হাসে।

আচমকা গান ধরলো সত্য। একটা চেনা নজরুল। মিহি সুরে গলা মেলালো ছন্দা। দেখাদেখি বাঁশরীও। মণিময় আর ধ্রুব নাকিসুরে গলা ভাঁজতে লাগলো সবাইয়ের সঙ্গে। পাঁচমেশালি বেসুরো গলার আওয়াজে ভরে গেল হলঘর।

একটু বাদে সোফার গায়ে এলিয়ে পড়লো ছন্দা। ধুশ, গান না ছাই হচ্ছে। তাই শুনে অন্যরাও একে একে থেমে গেল। একসময় হলঘরটা আবার নিথর হয়ে গেল। থমথম করতে লাগলো শীতের রাত। কাঁসাই নদীর কনকনে হাওয়া কাচের দরজায় ঘা মেরে মেরে অস্থির হয়ে উঠলো।

রাতটা গাঢ় হচ্ছিল।

মণিময় আর ধ্রুব ওল্ড-মঙ্ক নিয়ে বসেছে ডাইনিং-টেবিলে। ছন্দা শুয়ে পড়েছে নিজের বিছানায়। তার মাথার যন্ত্রণাটা নাকি বেড়েছে।

একসময় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় বাঁশরী। পায়ে পায়ে চলে আসে বাংলোর বাইরে। কাঁচের পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক ঠাণ্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে হলঘরের মধ্যে।

বারান্দায় নিকষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল বাঁশরী। সত্য পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় ওর পাশটিতে।

সামনে একচিলতে বাগান। বাগানের ওপ্রান্তে আচমকা কালো খাদ। কাঁসাইয়ের খোলামেলা বুক। ওপারে কালো কুচকুচে ডুংরীগুলোর আড়ালে নিঝুম আদিবাসী গাঁ।

অস্পষ্ট মাদল বাজছে কোথাও। কারা যেন উচ্ছল হয়ে গান ধরেছে। আদিম প্রকৃতির বুক জুড়ে একটা একঘেঁয়ে করুণ সুর গুমরে গুমরে উঠছে আঁধারে।

একসময় অন্ধকারকে ভাঙে বাঁশরী। ভেজা গলায় বলে, দিনটা যেন কী করে খরচ হয়ে গেল। অথচ কত্তো আশা নিয়ে বেরিয়েছিলুম সকালে।

সত্য সহসা জবাব খুঁজে পায় না। অন্ধকারে খুঁজতে থাকে সে। হাতড়াতে থাকে।

— সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে...। বাঁশরী আবার গুমরে ওঠে, —একখানা নুড়িও কুড়োতে পারলুম না সারাদিনে। একখানাও না।

অন্ধকারের বুকে ম্লান হাসি ছড়িয়ে দেয় সত্য। বলে, সকালেই তো বলেছিলাম, অতঅত কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এমন জায়গায় আসতে নেই।

— কাচ্চাবাচ্চা আবার কোথায় দেখলেন? বাঁশরীর গলায় রিনরিন বেজে ওঠে বিস্ময়, —কী যে রহস্য করে কথা বলেন আপনি!

সত্য আকাশের দিকে নিষ্পলক তাকায়। মৃদু গলায় বলে, কেবল একটা ইন্দ্রিয় দিয়েই তো সন্তান উৎপাদন করি নে আমরা। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রজনন ক্ষমতা সমান। তাদের অসংখ্য সন্তান-সন্ততি অহরহ লেপটে রয়েছে আমাদের কোলে, কাঁখে, মগজে, ...সর্বাঙ্গে। বুকের মধ্যে অসংখ্য খোপে বাস করছে তারা আজীবন। ... বুক জুড়ে আমাদের অমন ভরভরাট সংসার, নুড়ি কুড়িয়ে রাখবার মতো বাড়তি জায়গা আমরা পাবো কোথায়, বলো?

বাঁধানো দাঁত

তিনি সুন্দরের কথা বলেছেন আজীবনকাল, তাঁর যাবতীয় কবিতায়, সঙ্গাতির কথা বলেছেন, সুবিচারের কথা। এই পৃথিবীকে শোষণহীন, অনাচারমুক্ত করতে তিনি কল্কি-অবতার হয়ে জন্ম নিতে চেয়েছেন, জীবানুহীন করতে দ্বাদশ সূর্য হয়ে জ্বলতে চেয়েছেন মধ্যাহ্ন গগনে, তাঁর কবিতায়। ব্রহ্মাণ্ড নামক এই কীটদষ্ট আপেলটির বুকে আনতে চেয়েছেন টিউলিপ ও কুরচি ফুলের সাম্য ...।

এই পর্যন্ত বলে যুবকটি সামান্যক্ষণ থামে। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে উপস্থিত সবাইয়ের মনে হয়, সে এই বিষয়ে আরো অনেকক্ষণ ধরে বলতে পারলে খুশি হয়।

জীবিতেশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন যুবকটির মুখের দিকে, শ্রবণেন্দ্রিয়কে জাগ্রত রেখেছিলেন সারাক্ষণ, কুচকাওয়াজের সময় সৈনিকদের 'সাওধান' মুদ্রার মতো একশো ভাগ একাগ্র রেখেছিলেন মস্তিষ্ককে। তার মধ্যেও আড়চোখে এক ঝলক দেখে নিতে পারলেন টেবিলের ওপর এলিয়ে শুয়ে থাকা ফুলস্কেপ কাগজের বুকে সাতচল্লিশ নম্বর ক্যান্ডিডেটের নামটিকে। সুদেবসুন্দর দাস। এবং সামনে চোখ মেলতেই দেখতে পেলেন, তেকোনা ধারালো মুখখানি জুড়ে আরতির প্রদীপ জ্বলছে। ঐ প্রদীপ থেকে নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। সুদেবসুন্দর নামের যুবকটির মুখমণ্ডলের কোষে কোষে জীবিতেশ-বন্দনা চলছে তখন। জীবিতেশ দ্বিতীয় ঝলকে দেখে নেন সুদেবসুন্দরের ঠিকানা। পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা গ্রামে বাড়ি। এমন প্রত্যন্ত গ্রামের এই ছেলেটি ভেতরে ভেতরে কতখানি ধুরন্ধর, চতুর, সেটাই পরিমাপ করবার চেষ্টা চালান অজান্তে। বোর্ডের অন্য সদস্যরা মজা পেয়েছেন খুবই। নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কথা কইছেন। দু-একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো জীবিতেশের সঙ্গেও। কবি হিসেবে জীবিতেশ যে খ্যাতিমান, সেটা তাঁরা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই খ্যাতির বৃত্তটি যে কত বিস্তৃত, কতখানি গভীর, তারই একটা আন্দাজ নিচ্ছিলেন ওঁরা মনেমনে। জীবিতেশ ততক্ষণে মগ্নডুব মেরেছেন সুদেবসুন্দর নামক তাঁর এক আপাত ভক্তকে পরিমাপ করবার কাজে। ঝকঝকে মুখখানিতে গ্রামীণ সরলতা, বাহ্যত কোনও মালিন্য নেই। উচ্চারণেও নেই কোনও অপরাধবোধজনিত জড়তা, অস্পষ্টতা, তবুও জীবিতেশের বারবার মনে হয়, এ এক অতি সুপরিকল্পিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বন্দনা, যার জন্য যুবকটি বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়ে এসেছে আগেভাগে। কোনও সূত্র থেকে যুবকটি হয়ত-বা জেনেছে বোর্ড সদস্যদের নাম-ধাম, এবং আনুষঙ্গিক পরিচয়াদি। জীবিতেশই যে আজকের বোর্ডের

চেয়ারম্যান সেটাও হয়তো-বা অজানা নেই সুদেবসুন্দর নামের আপাত নিষ্কলুষ যুবকটির কাছে। সন্দেহে কুটিল হয়ে আসে মন। জীবিতেশ দু'চোখের মণি ঘসে ঘসে বারবার পরখ করতে থাকেন সুদেবসুন্দরের মুখমণ্ডলের গভীরে প্রোথিত অন্য একজন মানুষকে, যে কিনা, হয়তো-বা অতি মাত্রায় চতুর, প্রতারক, এবং সুযোগসন্ধানী। আজকাল গ্রামও তো এসব ব্যাপারে একদম পিছিয়ে নেই। গ্রামের নতুন প্রজন্মটি অতিমাত্রায় সেয়ানা। সেটা জীবিতেশ মাঝেমাঝে টের পান হাড়েহাড়ে। অজ গাঁয়ের ছেলে, চাকরি নিয়ে শহরে এলো, আলাভোলা ভাব, গ্রামের দিঘির মতো অতল চোখ, সে চোখে শশকের দৃষ্টি ..., কিন্তু ধীরে ধীরে আবিষ্কার করা গেল, আপাত ভোলেভালে যুবকটি অনেক শহুরে মানুষের চেয়ে ঢের বেশি সেয়ানা। তার গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। আর, তার যাবতীয় চাতুর্যের প্রধান মূলধন হলো, ঐ ভোলেভালে মুখখানি।

নিয়নের ত্রিসীমানা ছাড়ালেই বাঁশবন, পচাডোবা,
টিমটিম কেরোসিন আলো,
অনন্ত ডুবো মাঠে উপুড় আকাশ—
ঝিঁ ঝিঁ রাতভর ..., শেয়ালের প্রহর ঘোষণা ...,
উলুঝুলু কবি, তুমি ভুলেও কখনো যেন কোলকাতা ছেড়ো না।
ইদানিং মফঃস্বলও যথেষ্ট লায়েক হয়েছে,
ইতি বললেই বেমালুম বুঝে ফেলে গজ। ...

নিজের কবিতারই গুটিকয় পংক্তি মনে মনে আওড়াতে থাকেন জীবিতেশ।

সিলেকশন-বোর্ডের অপরাপর সদস্যরা জীবিতেশের তুলনায় তরুণ, একই মতবাদের মানুষ এবং জীবিতেশের ভক্ত। তাদের মধ্যে দু-একজন সত্যিসত্যি কবিতা-টবিতা পড়ে থাকেন। বাকিরা ঠেলায় পড়ে পাঠক। কেন কি, খোদ চেয়ারম্যান যদি এমন মাপের একজন কবি হন, তবে সেই বোর্ডের মেম্বার হয়ে একেবারে রসকষহীন হয়ে থাকা ...। জীবিতেশের মতো কাব্যরসের জীবন্ত খনিটির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যদি সদাসর্বদা, একখানি 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' গোছের ভাব করে ঘুরে বেড়ায় একজন সহকর্মী, কেমন দেখায় তেমনটা! তাছাড়া, খোদ চেয়ারম্যান বলে কথা, ঐ উপায়ে একটু-আধটু তুষ্ট রাখবার ব্যাপারটাকেও তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য ইদানিং যখন কথা প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার কথা ওঠে, যখন চারপাশের কেউ কেউ সত্যিসত্যি, কেউ কেউ স্রেফ তুষ্ট করতে তাঁর কবিতার প্রশস্তি করে বসেন, জীবিতেশ হয়তো বা যারপরনাই বিব্রত বোধ করেন। ওদের থামিয়ে দিয়ে বলেন, ধুশ্, ছাড়ো তো, কবিতা লিখে কী হবে? কবিতায় কী হয়? গাড়ি হয় না, বাড়ি হয় না, চাকরি মেলে না ...। এমন কথার কীই বা জবাব দেবেন সহকর্মীরা, তাঁরা বুঝে যান, সাফল্যের তুঙ্গে উঠে গেলে মানুষ নিজস্ব চর্চার বিষয়টিকে নিয়ে এমনই হালকা চালে কথা বলেই থাকেন। নিজের সাফল্যকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার এও এক তরিকা। তবে জীবিতেশ অবশ্য পরমুহূর্তে বলেন, শুধু কবিতার কথাই তোল কেন? কবিতা কে না লেখে? কিন্তু কবিতার জন্য এতোখানি দুঃখভোগ, সদাসর্বদা রাষ্ট্রের রোষদৃষ্টির থেকে পালিয়ে বেড়ানো, জেল খাটা, চাকরি হারানো ..., ক'জন করেছে এ যাবৎ? তখন বাস্তবিক

সহকর্মীদের মনে হয়, অতীতের জীবিতেশ কবিতাকে উপলক্ষ্য করে, কবিতার ওপর ভর করে, এমন একটা কিছু প্রলয়ঙ্কর কান্ড ঘটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, যার জন্যই আজীবনকাল তাঁকে অতখানি নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করতে হলো। জীবিতেশ যখন বলেন, কবিতা লিখে কারো কারো বাড়ি হলো, গাড়ি হলো, বিদেশ বেড়িয়ে এলো কত উলুঝুলু কবি, কেবল আমারই কপালে হাত-কড়া জুটলো কেন, জেল খাটলাম কেন, পুলিশের বুট আমার ডান হাতের আঙুলগুলোকে থেঁতলে দিল কেন, আমার চাকরিটাই বা চলে গেল কেন, তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনে হয়, এ কোনও বিলাপ তো নয়ই বরং এক বিরল জাতের সন্তোষ। যখন তিনি বলেন, বুঝলে হে, আজ যারা হেসে হেসে কথা কয়, প্রকারান্তরে তোয়াজ করে, সভাসমিতিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে মালা-টালা পরায়, হরেক প্রকারে সারাক্ষণ প্রশস্তি গায়, সেই সমবয়স্ক কবি-লেখকেরা তো সেই দিনগুলিতে প্রকাশ্যে বলে বেড়িয়েছে, জীবিতেশ সিংহ কবিতার মোড়কে পলিটিক্স ব্যাচে। আজও আমি ধরে ধরে বলে দিতে পারি তাদের নাম। শুনতে শুনতে উপস্থিত কারোরই মনে হয় না যে ঐ লোকগুলোর প্রতি জীবিতেশের মনে তিলমাত্র অসূয়া রয়েছে।

পুলিশ জরুরি অবস্থার সময়ে সত্যিসত্যি মিশায় ধরেছিল জীবিতেশকে। সত্যিসত্যি তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো থেঁতলে দিয়েছিল। কেন কি, তিনি ঐ আঙুলগুলি দিয়ে কলম বাগিয়ে ধরে কবিতা লিখতেন, যা কিনা ওদের চোখে কবিতার মোড়কে বিপজ্জনক পলিটিক্স। লালবাজারের সেন্ট্রাল লক-আপে যখন জীবিতেশের আঙুলের ডগা ফেটে রক্ত ঝরছে, চারপাশে এমনই জনরব, বিপ্লবী বামপন্থীদের ত্রাস রুনু গুহনিয়োগীর সঙ্গে নাকি জীবিতেশের কথোপকথন হয়েছিল এই ধরনের।

— এবার? কেমন করে কবিতা লিখে লিখে লোক খ্যাপাবি? অ্যাঁ?

— কেন, বাম হাত দিয়ে লিখবো।

তৎক্ষণাৎ বুট দিয়ে জীবিতেশের বাম হাতের আঙুলগুলোকে থেঁতলাতে থাকে রুনু।

— এবার? দুটো হাতই তো গেল তোর।

— ডান পা দিয়ে লিখবো।

— বেরোবার আগে ওটাও অকেজো করে দেব তোর।

— তখন বাঁ পা দিয়ে লিখবো।

— বাঁ পাও অক্ষত থাকবে না।

— তখন মুখ দিয়ে কলম বাগিয়ে ধরবো দু-ঠোঁটের ফাঁকে।

— পারবি নে। রুনু নাকি বাঁকা চোখে হেসেছিল,—তখন তোর ঠোঁটজোড়া সারাক্ষণ শিথিল হয়ে থাকবে। তিরতির করে কাঁপবে।

শোনা যায়, তেমনই জনরব, জীবিতেশ নাকি কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, তখন দু-পাটি দাঁত দিয়ে কলম বাগিয়ে ধরবো।

শুনে রুনু নাকি এমনই ক্ষেপে গিয়েছিল যে, জীবিতেশের মুখে অবিরাম ঘুসি মারতে মারতে দু'পাটির প্রায় তিন-চারটে দাঁত ফেলে দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। ভাঙা দাঁতগুলো পরবর্তীকালে বাঁধিয়ে নিয়েছেন জীবিতেশ। বেশ মিলে গিয়েছে অন্যগুলোর

সঙ্গে। বোঝাই যায় না। এখন, রুনুর সঙ্গে সেদিনের ঐ কথোপকথন সম্পর্কে কেউ কোনও প্রশ্ন করলে নির্বিকার নিরুত্তর থাকেন জীবিতেশ। বড় জোর বলেন, বাদ দাও দেখি। সেসব দিনের কথা শুনে কী করবে তোমরা? বর্তমানকে নিয়ে ভাব।

অতীত, সে তো ঐতিহাসিকদের গবেষণার জন্য,
ভবিষ্যত, সে তো গনৎকারদের নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য,
বর্তমান, ওটাই শুধু তোমার জন্য, হে কালজয়ী মানব-সন্তান। ...

রাজ্যে বাম সরকার থিতু হলে পর, জীবিতেশ যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন, যখন তিনি নতুন সরকারের একজন সাংস্কৃতিক স্তম্ভবিশেষ, সভাসমিতিতে ঘনঘন প্রধান অতিথি হয়ে যাচ্ছেন-টাচ্ছেন, তেমনই এক সভায় পাশাপাশি আসনে বসেছিলেন উনি এবং রুনু। রুনুই নাকি আগ বাড়িয়ে কথা বলেছিল, কেমন আছেন, জীবিতেশবাবু? জীবিতেশ জবাব দেন নি। রুনু বলেছিল, খুবই চটে আছেন তো আমার ওপর? জীবিতেশ জবাব দেন নি। রুনু বলেছিল, চটবেন না। তখন আপনি আপনার ডিউটি করেছেন, আমিও আমার ডিউটি করেছি।

এইভাবে, 'ডিউটি' শব্দটাকে সর্বস্বান্ত ভিখিরি বানিযে রুনু এক ধরনের সমঝোতা করতে চেয়েছিল জীবিতেশের সঙ্গে। কারণ, জীবিতেশ তখন সমাজ ও রাজনীতিতে যারপরনাই প্রতিষ্ঠিত। সরকার-পরিচালিত একটি সংস্থার পরিচালক তিনি, যদিও সে প্রসঙ্গ উঠলে বারবার বলেন, আমি তো এই কন্টকাসন চাই নে, সবাই মিলে জোরজবরদস্তি করে ...। বলেন, এ আমার কাজ নয়। আমার কাজ অন্য। লক্ষ্যে পৌঁছতে এখনো ঢের বাকি। বিশ্বাস কর, এখনো আমার অনেক অনেক কবিতা লেখা দরকার। এমন সব কবিতা, যা পড়ে পরস্বাপহারী মানুষের মন শুদ্ধ হবে, দুর্বল, শোষিত মানুষ মনে বল পাবে, দুনিয়ার প্রতিটি মার খাওয়া মানুষের বুকে আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে তবেই আমার কলম বিশ্রাম নেবে। তার আগে বিশ্রাম নিতে চাই নে আমি।

সুপারভাইজারের চাকরি। একটা মাত্র পদ। প্রার্থীর সংখ্যা দুই শতাধিক। দু'শো আড়াই-শোর থেকে একজন মাত্র বেছে নেওয়া, সে যেন খড়ের গাদা থেকে সূঁচ খুঁজে নেবার শামিল। কি আর করা যাবে! একজনের বেশি নেওয়া যাচ্ছে না। ভ্যাকেন্সি নেই। আগের জমানায় যারা ছিল, কোনরূপ রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে, একেবারে ঠেসেঠেসে নিজেদের লোকজনকে ঢুকিয়েছে। ছেলে-মেয়ে ভাগনে-ভাগনি, শালা-শালি ...। আসলে, স্বজনপোষণ, এটা একটা জাতীয় রোগ এদেশে। এ দেশের মানুষ, সামান্য একটুখানি সুযোগ পেলেই নিজের দিকে ঝোল টেনে নেবেই। ভাবতে ভাবতে মগজের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে কোনকালে নিজেরই লেখা কবিতার গুটিকয় পংক্তি, ...

... তুমি তো আর সেই রূপকথার শেয়াল নও যে
কলসিতে করে ঝোল দিলে তুমি খেতেই পারবে না।
বাস্তবিক, যে কোনও পাত্রে ঝোল দিলেও
চেটেপুটে খেয়ে নাও, সে ক্ষমতা আয়ত্তে তোমার ...।

রিটিন-টেস্টে বাদ দেওয়া গেল দেড়শোর বেশি। পঞ্চাশ জনকে ডাকা হয়েছে

ইনটারভিউতে। সুদেবসুন্দর সাতচল্লিশ নম্বর। কিন্তু এ ব্যাপারে বোর্ডের কোনও সদস্যের মনে তিলমাত্র সংশয় নেই যে, সুদেবসুন্দরই সবচেয়ে ভালো ইনটারভিউ দিয়েছে আজ। প্রায় সব প্রশ্নেরই সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিয়েছে। কথোপকথনের মাধ্যমে এটাও নিশ্চিতভাবে বোঝা গিয়েছে যে প্রগতিশীল দুনিয়ার প্রতি পরিপূর্ণ মমত্ববোধ রয়েছে যুবকটির মনে, পুঁজিবাদের প্রতি আক্রোশ। এমনিতে ইনটারভিউ নেবার কালে ওর সঙ্গে কথা বলতে ভারী ভালো লাগছিল প্রতিটি সদস্যের। তার ওপর, বোর্ডের চেয়ারম্যান যেহেতু একজন প্রতিষ্ঠিত কবি, বাংলা কাব্য-জগতের এক স্বতন্ত্র দিগন্তবিশেষ, কমলেন্দু সেনমশাই আচমকা, সামান্য রগড় করবার লোভ সামলাতে না পেরে, শুধিয়ে বসেছিলেন, কবিতা-টবিতা পড়েন? আপনার প্রিয় কবি কে? আর তারই জবাবে সুদেবসুন্দর নামের আপাতসরল ভোলেভালে প্রার্থীটি দুম করে বলে বসলো প্রিয় কবি হিসেবে জীবিতেশ সিংহের নাম। শুধু জীবিতেশই নয়, অন্য সদস্যদেরও মনে হয়েছিল, প্রিয় কবিকে বন্দনা করবার ছলে সুদেবসুন্দর নামের প্রার্থীটি কৌশলে চেয়ারম্যান-বন্দনায় রত। বাস্তবিক তাঁদের মনে হয়েছিল, প্রিয় কবি হিসেবে খোদ ইনটারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানের নাম উচ্চারণ করে নম্বর কিছুটা বাড়িয়ে নিতে চাইছে ছেলেটি। আর তখনই পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা যুবকটির অন্তর্গত ধূর্ত মানুষটিকে আবিষ্কার করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন বোর্ডের সব সদস্যই। কিন্তু তাকে যখন জীবিতেশ সিংহর কবিতার দু-একটি পংক্তি বলতে বলা হলো, জীবিতেশ তথা বোর্ডের অন্য সদস্যদের চমকিত করে, সুদেবসুন্দর ওঁর হাফ-ডজন কবিতা গড়গড়িয়ে বলে দিল। প্রশ্নোত্তরে এও জানা গেল, সুদেবসুন্দর জীবিতেশের সমস্ত কবিতার বই নিজ সংগ্রহে রেখেছে, এমন কি সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'শিশুদের বাসযোগ্য ভূমি'টিও। এমন একখানা বই যে বেরিয়েছে, সেটাই সব সদস্যের জানা ছিল না। কমলেন্দু সেন রগড়টাকে আরও একটুখানি উসকে দেবার জন্যই শুধিয়েছিলেন, আপনি কবিকে চেনেন? স্বচক্ষে দেখেছেন কখনো?

খুব লম্বা করে মাথা নেড়ে তেমন সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছিল সুদেবসুন্দর। এবং তৎসহ দিঘির মতো এমন স্বচ্ছ চোখে তাকিয়েছিল কমলেন্দু সেনের দিকে, যেন তাকে একজন কল্পলোকের বাসিন্দার সঙ্গে করমর্দন করবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সারা মুখে বিষাদ জমিয়ে সুদেবসুন্দর মৃদু গলায় বলেছিল, আমি তাঁকে দেখবো কেমন করে? তিনি তো ... তিনি তো ...। বলতে বলতে তার মুখমণ্ডলের রেখায় রেখায় যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল, তাতে করেই কবির সঙ্গে যুবকটির অনতিক্রম্য দূরত্বের পরিমাণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুদেবসুন্দর বিদায় নেবার পর একটুক্ষণ সবাই নির্বাক বসে রইলেন। কেবল জীবিতেশই খুব স্বগতোক্তির ঢংয়ে উচ্চারণ করলেন, আশ্চর্য!

সামান্য আলোচনার পর অবশেষে সবাই একমত হলেন যে, উপস্থিত পঞ্চাশ জন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে সুদেবসুন্দরই সেরা।

জীবিতেশ বুঝি এমন সিদ্ধান্তে সামান্য অস্বস্তি বোধ করেন, আমাকে নিয়ে অ্যাতো কথা বললো বলেই কি তোমরা সিলেক্ট করলে ছেলেটাকে?

— ছিঃ ছিঃ, সে কি কথা! হাঁ-হাঁ করে ওঠেন সবাই। —ঐ প্রসঙ্গটা ভুলে গিয়ে আপনি নিজেই বিচার করুন না, ওর থেকে ভালো ক্যান্ডিডেট আর একজনও কি ছিল আজ?

— বরং ...। কমলেন্দু সেন যোগ করেন, যোগ্যতার নিরীখে অন্যরা ওর থেকে অনেক পেছনে। আমার মতে ওকেই সিলেক্ট করতে আমাদের কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

'সেটা অবশ্য ঠিক ...। তবে—।' জীবিতেশ গলায় খুকখুক আওয়াজ তোলেন, ধবধবে রুমাল দিয়ে নাকের ডগাটা আলতো মুছে নেন, —বাই-দ্য-বাই, তোমাদের বলা হয় নি, আলোকদা ফোন করেছিল আজ সকালে।

'আলোকদা ... মানে,—আলোক সান্যাল?' বলতে বলতেই প্রশ্নকর্তার দু'চোখ ছাপিয়ে সম্ভ্রম, — কেমন আছেন তিনি? বিদেশ থেকে ফিরলেন কবে?

'ফিরেছে মাসটাক আগে। আজকেই সকালে ফোন করেছিল।' জীবিতেশ আলতো হাসেন, —'ও একটা ছেলের কথা বলেছে।' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করেন জীবিতেশ, ভারী চশমার ফাঁক দিয়ে পড়েন,—ছেলেটার নাম, পতিতপাবন দে। রোল নম্বর থার্টিসেভেন।

প্রায় তৎক্ষণাৎ স্মৃতিতে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। পতিতপাবন নামের ছেলেটির মুখ-চোখ, অবয়ব, কথাবার্তা, মনে করবার চেষ্টা করেন সবাই। পুরোপুরি মনে পড়ে না। স্মৃতির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। প্রত্যেকের স্মৃতিতে ছেলেটি বদলে বদলে যেতে থাকে। ছেলেটির সম্পর্কে পুরোপুরি একমত হতে পারেন না কেউই। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত হন যে, আলোকদার অনুরোধ অমান্য করা মুশকিল। ফলে, ধ্বনিভোটে, পতিতপাবনই সাব্যস্ত হয়ে যায়।

নির্বাচন শেষে আলোক সান্যালকে একটা ফোন করলেন জীবিতেশ। সুখবরটা দিলেন। কী যেন ব্যাপারে একটা তদবির করেছিলেন বুঝি দিন-কতক আগে, একটিবার মনে করিয়ে দিলেন। তারপর টয়লেটে গেলেন হাত-মুখ ধুতে।

টয়লেটে বেসিনের আয়নায় বাঁধানো দাঁতগুলোকে দেখতে গিয়ে প্রতিবারের মতো মগজে ভিড় করে এলো পুরোনো দিনের স্মৃতি। সময় তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। অনেক পুরনো স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে ...। একটুখানি হাসলে জীবিতেশের প্রায় অর্ধেকের বেশি দাঁত প্রকাশ পায়।

আয়নার দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ বুঝি অন্যমনস্ক ছিলেন জীবিতেশ। হুঁশ ফিরলে পর নিজের হাসিটাকে দেখতে দেখতে তিনি অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন, ঝকঝকে, মসৃণ তিন-চারটি বাঁধানো দাঁতের উপস্থিতিতে আগের চেয়ে তাঁর হাসিটা অনেক সুন্দর হয়েছে। অনেক মিষ্টি, শোভন, মোলায়েম।

চোর

১.

বীথিন ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। স্পষ্টতই কাঁপছিলেন। নিলয়রা চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছিল সেই কাঁপুনি।

ঘড়িতে আটটা পনেরো। 'নবারুণ' নাট্যসংস্থার প্রতিটি সভ্য সংস্থার রিহার্সেল-রুমে হাজির। সাড়ে আটটা থেকে রিহার্সেল শুরু হবে। আজ রোববার উদ্বোধনী-শো। এবারে একেবারে টাটকা নতুন নাটক। বীথিন ও অনিন্দ্যর দৃঢ় বিশ্বাস, নাটকটা জমে যাবে। আসছে মাসে সারা বাংলা একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় নাটকটা ফেলতে চায় বীথিনরা।

'নবারুণ' নাট্যসংস্থার নিজস্ব ঘর হয়েছে বছর দুয়েক। গেল ইলেকশনে রুলিং পার্টির হয়ে অনেকগুলো পথ-নাটিকা করেছিল ওরা। রুলিং পার্টির এম-এল-এ'ই জিতেছিল। পুরস্কার স্বরূপ 'নবারুণ' নাট্যসংস্থা পেয়েছে গলির মোড়ে পৌরসভার কাঠাখানেক ছুট জমি। লিজ হিসেবেই পেয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট-প্ল্যান-ফান্ড থেকে পেয়েছিল নাট্যসংস্থার নিজস্ব গৃহনির্মান খাতে হাজার পঞ্চাশ টাকা। ঐদিয়ে শুরু করেছিল ঘরের কাজ। তারপর গেল দু'বছরে কল-শো করে যা পেয়েছে সব ঢেলেছে ঐ ঘরের পেছনে। একখানা রিহার্সেল রুম, পাশে একখানা ছোট্ট স্টোর রুম। পেছনে এক ফালি ইউরিন্যাল। এখনো শেষ হয়নি ঘরের কাজ। তবে কাজ চালানোর মতো হয়েছে। রিহার্সেল রুমের মেঝে বরাবর ঢালাও শতরঞ্চি পাতা। প্লাইবোর্ডের ওপর আঁকা দৃশ্যপটগুলি দেয়ালের সঙ্গে ঠেসিয়ে রাখা। একপাশে কাঠের কাঠগোড়া। ব্যাকসিনগুলো আর ফ্ল্যাটগুলো, একেবারে নতুন করে আঁকা সব, ভাঁজ করে রাখা রয়েছে ঘরের এক কোণে।

বীথিন এমনই করেন। এটাই তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। উল্লাসে হেসে ওঠেন যখন, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ অংশগ্রহণ করে সেই হাস্যরোলে। যখন কাঁদেন, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি রোমকূপ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। যখন রাগে কাঁপতে থাকেন সারা শরীর থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে যায় উষ্মা। যখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, বিরক্ত হন, ভয় পান, দুঃখ—পা থেকে মাথা অবধি নির্বিশেষে চারিয়ে যায় সেই অনুভূতি। এবং প্রতিটি প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরতে থাকে অভিব্যক্তি।

বীথিন নিজেই এর ব্যাখ্যা দেন। বলেন, অভিনয়-শিল্পে প্রাথমিক পাঠ হল এটাই।

সারা শরীরকে ব্যবহার করতে হবে। কেবল মুখ নয়, সারা শরীরকে দিয়ে কথা বলাতে হবে। বলেন, জাত-অভিনেতা আর ঘষেমেজে অভিনেতার মধ্যে ফারাকটা এইখানেই তৈরি হয়ে যায়। ঘষে-মেজেরা মুখখানাকে খেলাতেই হিমসিম খেয়ে যায়। পদচারণটা যদিও রপ্ত করে কোনো গতিকে, হাতদুটোকে নিয়ে ভারি সমস্যা। না পারে গিলতে, না পারে ওগরাতে। না পারে ব্যবহার করতে, না পারে ছেঁটে ফেলতে। নবীশরা তো প্রথম প্রথম হাত দুটোকে নিয়েই পড়ে যায় মহা সমস্যায়। আস্তে আস্তে হয়ত বা কাটিয়ে ওঠে প্রায় সকলেই, কিন্তু হাতের ষোলআনা ব্যবহার, খুব কম অভিনেতাই রপ্ত করতে পারে তা। অথচ শুধু হাত-পা তো নয়, এদের বাইরে থেকে গেল আরও কত কত প্রত্যঙ্গ, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি, অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে কেউই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু অধিকাংশ অভিনেতা ওগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না বলেই উপেক্ষা করে দায় এড়ায়। কিন্তু বীথিন পারেন। তাঁর শরীর নামক অভিনয়ের কারখানাটিতে প্রত্যক প্রত্যঙ্গই যেন মাসমাইনের শ্রমিক। কারুর তিলমাত্র ফাঁকি দেবার জো নেই।

এই যেমন এই মুহূর্তে বীথিন কাঁপছেন ঠকঠক করে। এক প্রবল উত্তেজনায়। সে উত্তেজনা আনন্দজনিত হতে পারে, ক্রোধ, দুঃখ, ভয়জনিত হওয়াও সম্ভব। এটাই বীথিনের আশৈশব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মনের কোনো অনুভূতিকেই তিনি চেপে রাখতে পারেন না। সেটা অবশ্য উচিতও নয়। কিন্তু অনুভূতির প্রকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে নূন্যতম সংয়মও যে পালন করা কর্তব্য, বীথিন সেটাই পারেন না।

মাস চারেক আগে এমনি এক রোববারের সকালে বীথিন এমনিতরো কাঁপতে কাঁপতে ঢুকেছিলেন 'নবারুণ' এর রিহার্সেল রুমে। ঘরের মধ্যে ছিলেন অনিন্দ্য। 'নবারুণ' এর ডিরেক্টর। ছিল নিলয়, ত্রিদিব, খোকা, অমল, মৃণাল প্রমুখ কুশীলবের দল। সামনের হপ্তায় একটা কল-শো ছিল। পুরনো নাটকটা অল্পস্বল্প ঝালিয়ে নিচ্ছিল ওরা। ঠিক তেমনি সময়ে বীথিন রিহার্সেল-রুমের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুহাত আকাশের দিকে তুলে, শরীরের যাবতীয় আবেগ নিঙড়ে মুখমন্ডলে জড়ো করে উচ্চারণ করেছিলেন, আমি আজ সম্রাট।

বীথিনের ঐ অভিব্যক্তির সঙ্গো 'নবারুণ' এর তাবৎ কুশীলবই পরিচিত। কোনো কারণে খুশির বান ডেকেছে বীথিনের বুকে। কোনো একটা দারুণ সুখবর বয়ে এনেছেন তিনি।

অনিন্দ্য মিটিমিটি হাসছিলেন। নিলয়-ত্রিদিবরা নির্বাক বসে ছিল। কেউ কোনো কথা বলছিল না, প্রশ্ন করছিল না, সেটাই দস্তুর বীথিনের বেলায়। ওই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। প্রশ্নের জবাব তো দেবেনই না বীথিন, বরং তাঁর বক্তৃতা বেড়ে যাবে। ... আজ যদি কেউ আমায় তামাম হিন্দুস্থানের মালিকানা দিতে চায়, যদি কোহিনুর মণিটিকে এনে রেখে দেয় আমার পদপ্রান্তে,—বলব, চাইনে এমন তুচ্ছ মসনদ, চাইনে কোহিনুর ...। না, বীথিনকে ওই মুহূর্তে প্ররোচিত করা চলবে না। তাঁকে 'সম'-এ ফেরার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

চা এনেছিল রঘু। প্রথম ভাঁড়টি ধরিয়ে দিয়েছিল বীথিনের হাতে। ভাঁড়ভর্তি গরম চা নিয়ে বেশি অসংযমী হওয়া চলে না। বীথিনকে কাজেই স্থিত হতে হয়। পরপর তিন-চুমুক মেরে তিনি ধপ করে বসে পড়েছিলেন অনিন্দ্যর পাশটিতে। অনিন্দ্য আড়চোখে তাকান। বলেন, নে, চা-টা শেষ করে রোলটা ধর। সামনের হপ্তায় শো।

কিন্তু চা শেষ করে রিহার্সেল করতে ওঠেন না বীথিন। তার বদলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে আনেন একটা ম্যাগাজিন।

— এটা কী? খুব নিরাসক্ত গলায় তাকান অনিন্দ্য। ভ্রূ-সঙ্গমে সামান্য বিরক্তি। উষ্মা। বেলা যে বয়ে যায়!

— এটা? এটা একটা ম্যাগাজিন। লিটলম্যাগ। বীথিন মুখের সবগুলি রেখায় খুশি জড়ো করেন। —পানকৌড়ি। সহসা শিস দিয়ে ওঠেন, পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় এসে না ...।

অনিন্দ্য খানিকটা আন্দাজ করেন। বলেন, তামাম হিন্দুস্থান এবং কোহিনূরের চেয়েও দামি বস্তুটি কি এর মধ্যেই রয়েছে?

বীথিন অনির্বচনীয় হাসেন। একমনে পাতা ওলটাতে থাকেন পত্রিকার। একষট্টি পাতায় এসে থেমে যান আচমকা । প্রলুব্ধ করবার ভঙ্গিতে তাকান। অনিন্দ্যর দিকে পত্রিকাটি মেলে ধরেন। এবং অনিন্দ্য সামান্য ঘাড় ঝুঁকিয়ে পড়ে ফেলেন আটষট্টি পৃষ্ঠার কপালে চোদ্দ পয়েন্ট বোল্ড হরফে লেখা গল্পটির নাম, এবং উনসত্তর পৃষ্ঠার ওপরের ডানদিকে দশ পয়েন্টে পত্রিকাটির।

— পানকৌড়ি! লিটল ম্যাগের নাম পানকৌড়ি হয় নাকি? এ পত্রিকার নামও তো শুনিনি।

— হতে পারে। নিলয়, কুশীলবদের একজন, রিহার্সেল থেকে মন তুলে নিয়ে এখন দলের হীরো এবং ডিরেক্টরের উতোরচাপান শুনছে, মঞ্চে সর্বদাই সিরিয়াস রোল করে, মঞ্চের বাইরে চব্বিশ ঘন্টা রামফিচেল। বলে ওঠে, নিয়মিত বেরয় না, মাঝে মাঝে ডুব মারে হয়ত, পানকৌড়িদের মতো। তাই।

— ওই সেন্সে নাইনটি পারসেন্ট লিটলম্যাগই পানকৌড়ি। ত্রিদিবের পাদপূরণ।

ততক্ষণে বীথিনের হাত থেকে পত্রিকাটি তুলে নিয়েছেন অনিন্দ্য। গল্পটার শিরোনামের ওপর আটকে গেছে চোখ। 'ছোট চোর, বড় চোর'। স্বরাজ মুন্সীর লেখা।

অনিন্দ্য শুধোন, পড়েছিস?

— তিনবার।

— কেমন?

— থিমটা দারুণ! শুনবি?

— থিম আর কী শুনব? অনিন্দ্য শীতল হাই তোলে, আজকের দিনে যাকে নিয়েই গল্প লেখা হোক, কোনো না কোনো দিক থেকে সে একটি চোর। সেদিক থেকে, আজকের দিনের প্রতিটি গল্পই চোরের গল্প।

— দর্শন পরে কপচাবি, আগে থিমটা শোন। বীথিন এবার উতলা, —এটা অন্যরকম।

এক কোর্টে বিচার চলছে দুজন চোরের। একটি সিঁদেল চোর, অন্যজন রাজনৈতিক নেতা। সিঁদেল চোরটি ছিল প্রথম জীবনে চাষী। অন্যের জমি বর্গায় চাষ করত। জরুরি অবস্থায় জোতদার উচ্ছেদ করে দিল বর্গা জমি থেকে। চাষীটি ক্ষেতমজুর হয়ে গেল। বামফ্রন্টের আমলে কিছুটা খাস জমির পাট্টা পেল। কিন্তু বীজ-সার-হাল-বলদের অভাবে ভালোভাবে চাষ করতে পারল না। অভাবের তাড়নায় বন্ধক রাখল জমি। আর ছাড়াতে পারল না। আবার হয়ে গেল ক্ষেতমজুর। এক বছর খরা হল দেশে, ক্ষেতমজুরটি কাজ পেল না। বউ-বাচ্চা নিয়ে উপোসে দিন কাটতে লাগল। অবশেষে চুরি করল সে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক নেতাটি, স্বাধীনতার আগে ছিল পুলিশের মুখবীর। স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সার্টিফিকেট দেবার দায়িত্ব পেল সে। ভুল লোকদের সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে সে প্রচুর টাকা কামালো। বারংবার সুবিধে মতো দল বদলালো। মৌচাকের কাছাকাছি রইল সারাটা সময়। এখনো সে রুলিং-পার্টিতেই রয়েছে। ধাপে ধাপে অনেক উঁচুতে উঠেছে। মস্তান-মাফিয়া, প্রমোটার, বেওসায়ী, সবার থেকে বখরা নিতে নিতে সে কোটিপতি হয়েছে। খুন করিয়েছে বেশ কিছু সৎ প্রতিবাদী মানুষকে।

গল্পটি শুরু হচ্ছে এইভাবে। সিঁদেল চোরটি গেরস্থের বারো কেজি চাল চুরি করে ধরা পড়েছে। অন্যদিকে, শহরের সবচেয়ে বড় মাফিয়াটি কী কারণে যেন পুলিশের রুদ্র রোষে পড়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। তার থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে একটি ডায়েরি। ঐ ডায়েরিতেই লেখা রয়েছে নেতাটির বহু কুকীর্তির কথা। পুলিশ নেতাটিকে গ্রেপ্তার করবার আগেই তিনি শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে আগাম জামিন নিয়ে ফেলেছেন। ভর্তি রয়েছেন শহরের সবচেয়ে দামি নার্সিং হোমে তাঁরই এক স্নেহধন্য ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে। আর সিঁদেল চোরটি ভর্তি রয়েছে শহরের একটি নোংরা হাসপাতালে। লক-আপে পুলিশ তাকে এইসান মেরেছে যে বেচারার পাঁজরের তিনখানা হাড় ভেঙে গিয়েছে। হাসপাতালে চোরটির জন্য কোনো বেড মেলেনি। সে মেঝের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে থাকে। তার একটি পায়ে শেকল পরিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে জানালার গরাদের সঙ্গে। সে পুলিশ পাহারায় পায়খানা-পেচ্ছাব করতে যায়। রাতের বেলায় মশার কামড়ে অস্থির হয়ে যখন ঘনঘন পা নাচায়, নৈশ হাওয়ায় হাসপাতালের হলঘরময় ছড়িয়ে পড়ে শেকলের বিরামহীন ঝনঝন আওয়াজ। বাইরে পাহারাদার পুলিশের তন্দ্রা ছুটে যায়। ওরা ছুটে আসে। ধমকায়। বলে, শেকল কেটে ভেগে যাবার মতলবে আছিস নাকি রে? নেতাটি দুধ সাদা কনটেসা চড়ে কোর্টে আসেন, আগে-পিছে তাঁর মস্তানবাহিনী। পুলিশ তাঁর সঙ্গে সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করে। তাঁর জন্য নিযুক্ত রয়েছে শহরের সেরা পাঁচজন উকিল। সিঁদেল চোরটি সরকারের লিগ্যাল-এইড দপ্তরে একজন নিখরচার উকিল চেয়ে আর্জি পাঠিয়েছে। সিঁদেল চোরটি পুলিশের প্যাঁদানি খেতে খেতে আদালতে হাজিরা দিতে আসে, প্যাঁদানি খেতে খেতে ফিরে যায়। নেতাটি আসা-যাওয়ার সময় গুন্ডা-মস্তানবাহিনীর (যারা তাঁর ভাষায়, দলীয় সমর্থক) উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন আদালত-চত্বরে, ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাবার শপথ নেন, বেষ্টিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে। বাণী বিতরণ করেন এবং ডান

হাতের তর্জনী ও মধ্যমা ফাঁক করে আকাশের দিকে তুলে ধরে 'ভি' দেখান —জনগণের উদ্দেশে।

দেখতে দেখতে সিঁদেল চোর একদিন আক্ষেপ করে বলে উঠল, হায়, হায়, হারুদা আমারে পঞ্চাতের মেম্বর হয়ে ভোটে দাঁড়াতে বলল এত করে, আমি ক্যানে দাঁড়ালাম নি! হায়রে, আমি ক্যানে দাঁড়ালাম নি?

বলতে বলতে হো-হো করে হেসে ওঠেন বীথিন। বলেন, আরো এমন সব মজা রয়েছে গল্পটাতে, দারুণ জমে যাবে।

—তুই এটাকে নিয়ে নাটক করবি নাকি?

—তবে? এমনি এমনি পকেটে বইছি?

—সেই কারণেই বুঝি এমন খুশির বান ডেকেছে! অনিন্দ্যর মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। -নাট্যরূপ দেবে কে?

—কে দেয়?

তা সত্যি। বীথিনই দেন। নাটকের যা আকাল পড়েছে, প্রতিটি নাটকের দলকেই কোনো না কোনো গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে নামাতে হচ্ছে নাটক। বাংলাদেশে নাটকের আকাল অনেকদিনই। সেই তুলনায় যাত্রার পালাগান লেখা হচ্ছে খুব। কিন্তু মৌলিক নাটকের সংখ্যা নিতান্তই কম। যাও বা লেখা হচ্ছে, জমছে না তেমন। বিদেশী নাটকের অনুবাদ করে আর চলে না। ইতিমধ্যে দু-তিনটে গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন বীথিন। কিন্তু মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ভালো জমেনি। সেটা বীথিনের দোষ নয়। মূল কাহিনীর মধ্যে মাল কিছু ছিল না। বড়ই মনোকষ্টে কাটাচ্ছিল সবাই। ভালো নাটক না পেলে ওরা কেরামতি দেখাবে কোথায়? জুতসই অস্ত্রটি না পেলে সৈনিকটা যুদ্ধ করে কী দিয়ে?

অনিন্দ্য শুধোন, কী নাম বললি লেখকের?

—স্বরাজ মুন্সী।

—নামটি যেন চেনা লাগছে। তবে গল্প বড় একটা পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।

—আমিও পড়িনি। মাসতুতো ভাই মৃগাঙ্ক বলল, গল্পটা পড়ে দেখিস, মাল আছে। পড়ে দেখলাম, আছে। বেশ জমজমাট কাহিনী। তার চেয়েও বড় কথা, একটা সোশ্যাল কমিটমেন্ট রয়েছে গল্পটায়। ভদ্রবেশী চোরগুলোর মুখোস খুলে দেওয়া যাবে।

সেই এক রোববারের সকালে বীথিন বুকভর্তি টাটকা বাতাস নিতে নিতে উচ্ছ্বাসে, উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপছিলেন। 'নবারুণ'-এর প্রতিটি সদস্য স্বীকার করেছিল, বীথিনের উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল সেদিন। আজও ঠিক তেমনি ভাবে, তেমনি এক রোববারের সকালে, বীথিন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হাজির হয়েছেন 'নবারুণ' এর রিহার্সেল-রুমে। কাজেই, সবাই মনে মনে প্রস্তুত করতে থাকে নিজেকে।

বীথিন রিহার্সেল রুমের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দু,হাত আকাশের দিকে একই ভঙ্গিমায় তুলে ধরেন। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গলায় উচ্চারণ করেন, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। তখনো স্পষ্টতই তিনি কাঁপছিলেন।

কিন্তু আজ আর বীথিন তাঁর সর্বাঙ্গলালিত উত্তেজনাকে বেশি ফেনিয়ে তুললেন না। সহসা গলাটা অনেক খাদে নামিয়ে বললেন, থানার বড়বাবু এইমাত্র ফোন করেছিল আমায়।

২.

জনায় জনায়, হাত ঘুরে ঘুরে গল্পটা পড়ল সবাই।

আগাগোড়া স্যাটায়ার, তার মধ্য দিয়ে একটা সিরিয়াস মেসেজও রয়েছে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, গল্পটাতে স্টেজ-পসিবিলিটি খু-ব। 'চোলি'র ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা দর্শককূল খুব ভাব-গম্ভীর নাটক বড় একটা দেখতে চায় না আজকাল। যত খুশি তেতো পিল গেলাও, মগর প্যার সে। যত খুশি মেসেজ দাও, কিন্তু বাইরের কোটিংটা হবে লাল-নীল, চকচকে, মজাদার। গম্ভীর গম্ভীর মুখ করে ভারি ভারি কথা বেশিক্ষণ বললে দর্শকরা ইদানিং হাই তোলে। বলে, হুতোম প্যাঁচাদের নাটক। স্যাটায়ার আর হিউমারের ঝাল-চাটনি দিয়ে খাইয়ে দাও, অনেক ভারি ভারি কথাও গপগপিয়ে খাবে, যেমন করে সস দিয়ে লম্বা-লম্বা, কেঁচো-কেঁচো, আনম্যানেজেবল নুডল, চাওমিন খেয়ে নেয় রেস্তোঁরাতে এসে। গল্পটাতে ওগুলোই রয়েছে খুব। আগাগোড়া নাটকীয়, মজাদার সব সিচুয়েশন, অথচ থিমটা মোটেই হালকা নয়। সমাজের গভীর পচনের গল্প।

বীথিন বলেন, লিখি একবার, দেখিস তখন, মজাদার জায়গাগুলো আরও কমপ্যাক্ট, পিন-পয়েন্টেড করে নোব। বাকিটা—, বীথিন অপাঙ্গে তাকান অনিন্দ্যর দিকে, — তোমার হাতযশ গুরু।

নাটকটা লেখা শেষ হতেই একদিন সবাই মিলে পুরোটা পড়া হল।

মানতেই হবে বীথিন তাঁর কথা রেখেছেন। নাটকটা সত্যি-সত্যিই বেশ জমিয়ে দিয়েছেন।

বীথিন অনিন্দ্যর দিকে তাকান। বলেন, এবার লেগে পড়। অনেকদিন একটা ভালো নাটক দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগাতে পারিনি রে। সে আক্ষেপটা এবার ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা পুষিয়ে নিতে চাই। যত জলদি সম্ভব কাস্টিংটা সেরে ফেল। রিহার্সেলটা শুরু হয়ে যাক। পাশাপাশি চলতে থাকুক স্টেজ-প্ল্যানিং, লাইট প্ল্যানিং, কস্ট্যুম ডিজাইন, মিউজিক ইত্যাদি কাজগুলো। স্টেজে কেবল ডায়লগ মারলেই তো নাটক হল না। নাটক হল এই সবকিছুর একটা কনসার্টেড ভেনচার।

অনিন্দ্য শুনছিলেন। শুনতে শুনতে একটু একটু করে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন। সবাই বুঝতে পারে, ডিমে তা দেবার স্টেজে দ্রুত চলে যাচ্ছেন অনিন্দ্য। মগজের মধ্যে নাটকটা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার যতই দিন যাবে, ততই গুম মেরে যাবেন উনি। খাবেন না, শোবেন না, কারোর সঙ্গে ভালো করে কথা বলবেন না, এমনকি বৌয়ের সঙ্গেও না। আচমকা নিজেকে ভারি নিঃসঙ্গ করে ফেলবেন মানুষটা। একটা কাহিনীর তসর-গুটির মধ্যে ঢুকে পড়বেন তিনি, নিজেকে ওর মধ্যে বন্দী করে ফেলবেন একটু একটু করে। গুটিপোকার মতো নিঃশব্দে ঝরাতে থাকবেন মস্তিষ্কজ লালা, তিলতিল বয়ন করতে থাকবেন স্বর্ণালি তন্তু। কিংবা, বলা যায়, কিছুদিনের জন্য তিনি হয়ে যাবেন ডিমে তা দিতে থাকা মা-পাখি। পেটের তলায় গুটিকয় ডিম নিয়ে যেমন

নিস্পন্দ বসে থাকে মা-পাখি, সময় বয়ে যায় নিঃশব্দে, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, চোখের সামনে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অর্থহীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনই অবস্থা হবে অনিন্দ্যর। তিনি সামনে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকবেন, কিন্তু দেখবেন না কিছুই। বধির নন, কিন্তু চারপাশের কোলাহলের একরত্তিও ঢুকবে না তাঁর কর্ণকুহরে। কী এক ঘোরের মধ্যে কেটে যাবে তাঁর দিন ..., রাত ..., খণ্ড খণ্ড সময়ের সমষ্টি কী এক নিবিড় নিবিষ্টতায় জমাট বেঁধে অখণ্ড হয়ে যাবে। রত্নাকরের মতো তিনিও দুনিয়া থেকে নিঃশেষে তুলে নেবেন তাঁর যাবতীয় বোধ-বোধি এবং অনুভব। তাঁর শরীর জুড়ে উইঢিবি জমবে একটু একটু করে।

তারপর, একসময় একটু একটু করে সাড় ফিরবে শরীরে, চোখ ফিরে পাবে তার ভাষা, কান তার শ্রবণশক্তি, মস্তিষ্ক তার বোধ। অনিন্দ্যকে তখন সামান্য অস্থির দেখাবে, কিঞ্চিৎ ভারসাম্যহীন। তিনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবেন। ছেলেমানুষের মতো আচরণ করবেন কখনো কখনো। তারপর, এক সন্ধ্যায়, তিনি তাঁর মোটা খাতাটি নিয়ে হাজির হবেন রিহার্সেল-রুমে। খাতা জুড়ে অসংখ্য স্কেচ। প্রতি দৃশ্যের আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো ছবি। স্টেজের সামগ্রিক ডিজাইন। কস্ট্যুম ডিজাইন। আলোর অবস্থান। খাতা খুলে একটা একটা করে সবগুলো স্কেচ দেখাবেন কুশীলবদের। বোঝাবেন। সবাইকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনটির জন্য। তাড়া দেওয়া চলবে না। খোঁজ-খবর, পুছতাছ কিছুই নয়।

অনিন্দ্য একেবারে ডুবে যাওয়ার আগে শুধিয়েছিলেন, আচ্ছা নাটকটা করতে গিয়ে কোনো আইনগত ঝামেলায় পড়তে হবে না তো?

—কেন, আইনগত ঝামেলা কীসের?

—বিচার-টিচার নিয়ে নাটক তো, আদালত- অবমাননার দায়ে-টায়ে পড়ে যাব না তো?

—সে পথ আমি মেরে দিয়েছি গুরু। বীথিন খুব দরাজ হেসে বলেন, পুরো নাটকে আদালত থাকবে স্থির, প্যাসিভ। আদালতের কোনো সীন থাকছে না। স্টেজের একপ্রান্তে এজলাস ও কাঠগড়ার একটা সাজেশান থাকবে। নাটকটা যা হবে, সব আদালতের বাইরে।

এতক্ষণে কেউ কেউ মৃণালের দিকে তাকায়। মুখ টিপে হাসে। ব্যাপারটা অনিন্দ্য আর বীথিনের চোখ এড়ায় না। ওঁরাও মৃণালের দিকে তাকিয়ে হাসেন।

অনিন্দ্য বলেন, এ ব্যাপারে 'নবারুণ' এর লিগ্যাল সেল-এর চেয়ারম্যান কী বলেন? কোনো আইনগত ঝামেলা হবে না তো?

মৃণাল কস্মিনকালেও আইন-টাইন পড়েনি। কিন্তু ও হল 'নবারুণ'-এর ওয়ানম্যান-লিগ্যাল সেল-এর চেয়ারম্যান। সংস্থার যে কোনো ব্যাপারে কিছু আইনগত প্রশ্ন ও তুলবেই। এই নিয়ে সংস্থার সদস্যদের মধ্যে আড়ালে এক ধরনের হাসাহাসির ব্যাপার রয়েছে।

অনিন্দ্যর কথায় মৃণাল সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, হাসি নয়, তোমরা দেশের জুডিসিয়ারি নিয়ে নাটক করছ, কী থেকে কী হয়ে যায়, কে বলতে পারে? রিস্ক একটা থেকে যাচ্ছেই।

— কোথায় রিস্ক সেটা বলবি তো।

— সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। রিহার্সেলটা পুরোপুরি দেখলে তখন বলা যাবে।

— তাহলে নেমে পাড়ি? অনিন্দ্য চোখ মটকে হাসেন।

— হুঁ। মৃণাল গাম্ভীর্যের আড়াল থেকে বেরয় না। — বসে যাও ডিমে তা দিতে। মাসখানেকের জন্য একেবারে ভোঁ হয়ে যাও। উই ঢিবি জমিয়ে ফেল শরীরের চারপাশে। আমি ততদিনে পুরো বিষয়ের আইনগত দিকগুলো খতিয়ে দেখে নি।

সবাই বহুকষ্টে হাসি সামলায়।

৩.

রিহার্সেল তখন চলছে পুরোদমে, একদিনে মৃণাল আচমকা তুলেছিল প্রশ্নটা। —আমার মনে হয় একটা লিগ্যাল ল্যাপস্ থেকে যাচ্ছে। গল্পকারের কাছ থেকে একখানা লিখিত পারমিশন নিতে হত।

—পারমিশন? কীসের পারমিশন?

—ওর গল্প নিয়ে নাটক করছ, একটা পারমিশন নেবে না?

দোটানায় পড়ে যায় সবাই? গল্পকারের পারমিশান? হ্যাঁ, নেয় বটে। কিন্তু তাকে এখন পাওয়া যাবে কোথায়? সামনের অল্ বেঙ্গাল ড্রামা কমপিটিশনে নাটকটা নামাতে হলে আর তো সময় নেই।

— তবু, পারমিশন একটা না নিয়ে কাজে নামা উচিত হবে না। ঝানু আইনজীবীর মতো জেদী ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে মৃণালের মুখমণ্ডলে।

বীথিন আর অনিন্দ্য অগ্রাহ্য করবার ভান করলেও পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারেন না মৃণালের কথাগুলো। এক ধরনের বিপন্নতা ফুটে ওঠে তাঁদের চোখে-মুখে। এ তো ভারি বিপদে পড়া গেল! পত্রিকার নাম 'পানকৌড়ি'। ঠিকানা যা দেখা যাচ্ছে, বেরয় উলুবেড়ে থেকে। সুভাষনগর কলোনির মোড়।

—উলুবেড়ে গেছিস কেউ?

— আমি একবার গেছলাম। নিলয় বলে, — সুভাষ কলোনির মোড় কোথায় জানি নে।

—পত্রিকাটাও খুব চেনা নয়। নিয়মিত বেরয় বলে মনে হয় না।

—সে তো নাম দেখেই মালুম। পানকৌড়ি। অর্থাৎ কিনা মাঝেমধ্যেই ডুব মারে।

—সম্পাদক অচিন্ত্য বিশ্বাস।

মৃণাল বলে, সম্পাদককে চিঠি লিখে গল্পকারের ঠিকানা চাওয়া হোক। ঠিকানা পেলে গল্পকারকে অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখা হোক।

মৃণালের দিকে খুবই অপ্রসন্ন চোখে তাকান অনিন্দ্য। বলেন, সময় কতখানি লাগবে আন্দাজ আছে? ডাক বিভাগের যা ছিরি! সম্পাদকের কাছে চিঠি যেতে দু-হপ্তা। জবাব পেতে দু-হপ্তা। গল্পকারকে চিঠি লিখে জবাব পেতে ঐ একই সময়। সাকুল্যে দু'মাস লেগে যাবে।

—তাও যদি সম্পাদক এবং গল্পকার তেমন সুজন হন যে চিঠি পাওয়া মাত্র জবাব দিলেন। নইলে—।

—গল্পকার নাট্যরূপখানা পড়ে দেখতে চাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে নাটক পাঠানো বাবদ আরও দু-হপ্তা।

—তারপর, নাটকের পুরোটা পছন্দ হল না তাঁর। কিছু অদলবদল সাজেস্ট করলেন।

—কিংবা ধর, একদিন নাটকটা নিয়ে বসতে চাইলেন।

এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে বসে সকলের চাপান-উতোর শুনছিলেন বীথিন। সহসা প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, তোরা থামবি?

কলরবটা মুহূর্তে থেমে যায়।

খুব দৃঢ় গলায় বীথিন বলেন, কিচ্ছু করবার দরকার নেই। এখন নাটকটা যত জলদি তৈরি করে ফেলা যায়, ততই ভালো। অল-বেঙ্গাল এসে গেল। আর একমাসও নেই। গলাটা ভীষণ খাদে নামিয়ে এনে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে ওঠেন বীথিন, 'উই কান্ট ওয়েট এনি মোর। উই কান্ট। একটুখানি সময় নেন বীথিন। সকলের দিকে একপ্রস্থ তাকান। তারপর প্রায় বিচারকের রায়দানের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন, বহুদিন বাদে একটা ভালো নাটক পাওয়া গেছে। গোটা ইউনিট উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। অল বেঙ্গালেরও আর দেরি নেই মোটেই। এই মুহূর্তে অনুমতি নেওয়ার গাড্ডায় কিছুতেই পড়তে চাই নে আমরা। বলতে বলতেই চারপাশের কুশীলবদের চোখে-চোখ রেখে তাদের নীরব সমর্থন পেয়ে যান বীথিন।

কিন্তু মৃণাল আজ একটু বেশি মাত্রায় অনমনীয়। বীথিনের এমন চাঁচাছোলা সিদ্ধান্তের পর সাধারণত সবাই সিদ্ধান্তটা মেনে নেয়। মৃণালও। কিন্তু আজ তাকে আইন গ্রাস করেছে ষোল আনা।

একটু দুর্বিনীত ভঙ্গিতে মৃণাল বলে, এটাকে গাড্ডা বলছ?

—হ্যাঁ। বলছি। গাড্ডাই ওটা। চিঠি যাবে, ঠিকানা আসবে, অনুরোধ যাবে, সম্মতি আসবে। নাট্যরূপ চেয়ে বসতে পারে, আলোচনায় বসতে চাইতে পারে—।

—আরও আছে। আমরা আর্থিক দিকটা কেন ভাবছি নে? গল্পটার জন্য ও টাকাও চাইতে পারে।

—লিখিত চুক্তিও চাইতে পারে।

—টাকার পরিমাণ এতখানি হতে পারে যা আমাদের সাধ্যের অতীত।

—কম চাইলেই বা দেব কোত্থেকে? বলে প্রোডাকসন কস্টই তুলতে পারি নে।

—সেটা আমাদের ভাবনা। ওর নয়। মৃণাল বলে।

—কে না কে এক স্বরাজ মুন্সী, জন্মে নামও শুনিনি, সে কিনা একটা গল্পের জন্য টাকা চাইবে?

—কেন চাইবে না? তোমারা যে নাম শোননি, সেটা কী ওর দোষ, নাকি তোমাদের অজ্ঞতা? তোমরা তার নাম না শুনেও গল্পটা নিতে পারলে, আর টাকা দেবার বেলায়—। ও যদি মামলা করে, গাড্ডায় পড়ে যাবে কিন্তু।

—তাহলে টাকা কোত্থেকে দেওয়া হবে সেইটাই ঠিক হোক আগে। রিহার্সেল বন্ধ থাক। ক্ষোভ মেশানো গলায় বলে ওঠে অনেকেই।

চাপান-উতোর ক্রমশই উত্তেজনার রূপ নিচ্ছিল। অনুমতি নেবার বিষয়টা তুলে মৃণাল যেন এদের প্রত্যেকেরই গলায় একটি করে কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছে। কাঁটাটা বিঁধে রয়েছে। খচখচ করছে। ওদের মধ্যে অসহিষ্ণুতাও তাই বাড়ছে। সবাই খুব রুষ্ট চোখে তাকায় মৃণালের দিকে।

বীথিন তাকান মৃণালের দিকে। অর্থপূর্ণ সে চাহনি। বলেন, কী বুঝছিস?

—সবই বুঝছি। মৃণালও আজ কেন জানি বেজায় গোঁয়ার, সবাই রঙ মাখবার জন্য পাগল। অল বেঙ্গলে প্রাইজ জেতবার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু সত্যি করে বল দেখি, তোমার বাড়ি বানাবার সখ হয়েছে, একটা জমিও পছন্দ হয়েছে। জমির মালিককে ধরতে পারছ না, তুমি জমিটা না কিনেই বাড়ি বানাতে শুরু করে দেবে? দোকানে গিয়ে কোনো জিনিস পছন্দ হল, দোকানদার সেই মুহূর্তে দোকানে নেই , তোমারও হাতে সময় নেই, তুমি জিনিসটা তুলে নিয়ে চলে আসবে?

—চটিস নে। বীথিন খুব নরম গলায় বলেন, তুই অকারণে খুব ইমোশান্যাল হয়ে পড়িস। বললুম তো, অনুমতি আমরা অবশ্যই নিতুম, কিন্তু গল্পকারকে না পেলে কী করি বল্?

—অপেক্ষা করবে। যদ্দিন না পাও। মৃণাল খুবই আহত গলায় বলে, ঐ তো বললাম, তোমাকে না পেয়ে তোমার সিউড়ির খালি জমিতে যদি কেউ বাড়ি বানিয়ে ফেলে? মলয় বাথরুমে গেছে, ওকে না পেয়ে ওর দোকান থেকে একখানা টিভি কিংবা টেপ-রেকর্ডার যদি তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যায় কেউ? আরে গল্পটা যে সে তোমাদের নাটক করতে দেবে তার কী মানে আছে? গল্পটা যে সে ইতিমধ্যে অন্য সংস্থাকে দিয়ে দেয়নি তারই কী মানে আছে? আমি ইমোশন্যাল? একটা বড়সড় গাড্ডায় না পড়া অবধি তোমাদের শিক্ষা হবে না।

অনিন্দ্য অনেকক্ষণ ধরে শুনছিলেন ওদের চাপান-উতোর। এক সময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তাঁর। খুব চড়া গলায় বলে উঠেন, গুলি মার দেখি। আমরা ব্যাপারটাকে নিয়ে অনেকদূর ভেবে ফেলেছি। কিস্যু হবে না। কোথাকার কে স্বরাজ মুন্সী, লিটল ম্যাগ-এ একখানা গল্প বেরিয়েছে, ওতেই হয়ত বর্তে গেছে লোকটা। তার ওপর ওর গল্প নিয়ে নাটক হচ্ছে শুনলে আনন্দেই হয়ত আকাশে লাফ দেবে।

—ঠিক। অনিন্দ্যর মুখের কথা লুফে নেয় বীথিন, —প্রতিটি পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে যখন দেখবে নিজের নাম, প্রতিটি শোয়ের আগে অনিন্দ্যর ভরাট গলায় প্রাককথন; 'নবারুণ' নাট্যচক্রের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা, — 'ছোট চোর বড় চোর' —কাহিনী-স্বরাজ মুন্সী, নাট্যরূপ ... ওর অবস্থাখানা ভেবে দ্যাখ একবার।

ততক্ষণে মাখনের মতো নরম হয়ে এসেছে অনিন্দ্যর মুখ। খুব ঘনিষ্ঠ গলায় বলেন, লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেলে তার জন্য মামলা করে কেউ?

৪.

সাত সকালে থানার বড়বাবু আগ বাড়িয়ে টেলিফোন করেছিলেন,—এই কথাটাই

তো যে কোনো ভদ্রলোককে কাঁপিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর বীথিন যেভাবে উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। তবে এখনকার বড়বাবু নাকি এককালে নাটক-টাটক করতেন, 'নবারুণ'-এর শো-টো হলে দেখতে আসেন, বেশ পছন্দ করেন বীথিনদের, এটাই যা ভরসা।

সবাই ঘিরে দাঁড়ায় বীথিনকে।

বীথিন সকলের মুখের ওপর একপ্রস্থ দৃষ্টি বুলোন। বলেন, নাটক করা মাথায় উঠল।

—কেন ?

নষ্ট করবার মতো সময় এক্কেবারেই নেই। কাজেই, ঘড়ির ডায়েলে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে বীথিন সংক্ষেপে বললেন ব্যাপারটা।

তখন সবেমাত্র মুখহাত ধুয়ে চায়েব কাপটি ঠোঁটে ছুঁইয়েছেন বীথিন, ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোন ?

—বীথিনবাবু কেমন আছেন ?

এই বড়বাবুটি বেশ টাফ হলেও মিশুকে। আচার-আচরণে এক ধরনের কালচার্যাল ফ্রেভার ছড়াবার চেষ্টা করেন। থানার কালীপুজোয় এ্যাদ্দিন বাজি-পটকা আর মদের তুফান বইত। এই বড়বাবু এর সঙ্গো একটা 'সংস্কৃতিক সন্ধ্যা' যোগ করেছেন। রাতভর সে 'সন্ধ্যা' চলতে থাকে। প্রথম দিকে এক-আধটা রবীন্দ্র-নজরুল, আবৃত্তি-টাবৃত্তির পর নাচাগানা শুরু হয়। নামমাত্র পারিশ্রমিকে নামি-দামি পপ-ডিসকো গাইয়েরা আসে। আসে রগরগে ডান্সার। 'সন্ধ্যা' যত বাড়তে থাকে ততই উম্মত্ত হয়ে ওঠে শিল্পী ও দর্শক, দুপক্ষই। এক্কেবারে ভোর নাগাদ 'সন্ধ্যা'টি উতরোয়। বড়বাবু ঐ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কিম্বা অচিন্ত্যকুমারের 'ছন্নছাড়া' আবৃত্তি করেন। বীথিনকে ফোন করে খবরটা দেন, সবাইকে নিয়ে আসবেন মশাই। আমি রেসিটেশন করছি।

বড়বাবু বললেন, নতুন নাটক নামাচ্ছেন নাকি ?

টেলিফোনের এপ্রান্তে বীথিন হাসেন, পোস্টার দেখেছেন ?

— পোষ্টার তো দেখেছি। থীমটা কী ? বীথিন আবার হাসেন, আপনারাও রয়েছেন। ছোট চোর আর বড় চোরের গল্প। বীথিন থীমটা শোনান। — কেমন জমবে ?

—জমছে আর কোথায় ? বড়বাবু ওপ্রান্ত থেকে লম্বা হাই তোলেন, নাটকটা তো নামাতেই পারছেন না আপনারা।

—কেন ? এতক্ষণে বীথিন কেঁপে ওঠেন নিঃশব্দে।

—বলতে খারাপ লাগছে, কার নাকি গল্প নিয়ে নাটকটা বানিয়েছেন ?

—হ্যাঁ। স্বরাজ মুন্সী।

—রাইট। পারমিশন-টারমিশন নেননি বোধ হয়।

—না, মানে পারমিশনটা ঠিক— ।

—এ্যাই দেখুন। ডিকসনারিতেই ছাপার ভুল !

—মানে ?

—মানে, সর্ষের মধ্যেই ভূত। আরে মশাই, চোরদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে গিয়ে নিজেরাই চুরি করে বসেছেন !

—দেখুন আমরা হলুম গে, গ্রুপ থিয়েটার, নন-কমার্সিয়াল ইউনিট, নাটকের মাধ্যমে একটা সুস্থ চেতনার—।

—একেবারে ঠিক। কিন্তু নোংরা বালতিতে বিশুদ্ধ জল তুললে জলটা কি আর বিশুদ্ধ থাকে? যাগগে, শুনুন, ঐ স্বরাজ মুন্সী, কোর্টে মামলা করেছে।

স্বরাজ মুন্সী মামলা করেছে! বীথিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান। এটা ঠিক যে মাসখানেক আগে স্বরাজ মুন্সীর থেকে একখানা চিঠি পান বীথিনরা। খুব বিনীত ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল লোকটা, অনুমতি না নিয়ে গল্পটা ব্যবহার করবার জন্য। তখন আর বীথিনদের ফেরার উপায় ছিল না। রিহার্সেল তখন শেষের মাথায়। আলো, ব্যাকসিন, এজলাস, কাঠগোড়া, কস্ট্যুম এবং অন্যান্য টুকিটাকি তৈরি হয়ে গিয়েছে। পোষ্টার ছাপানো হয়ে গিয়েছে পাঁচশো। স্থানীয় বিনোদবহারী মঞ্চটিও বুক করা হয়ে গিয়েছে।

খুব বিনীত ভঙ্গি ছিল স্বরাজ মুন্সীর চিঠিখানায়। ত্রিদিব বলেছিল, মনে হচ্ছে গল্পটাকে নাটক করায় আপত্তি নেই একতিল, কেবল একটু পাত্তা পেতে চাইছে। দেখছ না, বারবার ঐ কথা লিখেছে, 'একটু চাইলেই তো দিয়ে দিতাম'।

নিলয় বলে, আমরাও একখানা চিঠি লিখে 'আচ্ছা যখন এত করে অনুমতি দিতে চাইছেন তো দিন না হয়' গোছের একখানা চিঠি ছেড়ে দিই না কেন? অনুমতি না নেওয়ার দোষ কেটে যায় তাহলে। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে নিলয়।

ঠিকও হয়েছিল, তেমন একখানা চিঠি দেওয়া হবে স্বরাজ মুন্সীকে। কিন্তু তখন তো পুরো গ্রুপের নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে। একদিকে রিহার্সেল, অন্যদিকে হল বুকিং, কার্ড ছাপানো, পোস্টার সাঁটানো, সবকিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করা। আজ দেব, কাল দেব বলে চিঠিটা শেষ অবধি লেখাই হল না। চিঠির ভাষা পড়ে মনে হয়েছিল লোকটা খুব নরম জাতের। চিঠিপত্র না দিলেও তেমন কিছু করে বসবে মনে হয়নি বীথিনদের।

বড়বাবু বললেন, শুধু মামলাই নয়, ইনজাংশনও পেয়ে গেছে। টিল ডিসপোজ্যাল অব দ্য কেস, নাটকটা মঞ্চস্থ করতে পারবেন না।

—কী বলছেন আপনি? বীথিন খুব অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠেন, হল বুক করা হয়ে গেছে। ইনভিটেশন কার্ড রেডি, পোস্টার পড়ে গেছে সর্বত্র ...।

—কোর্ট আরও একটা অর্ডার দিয়েছে। এই নাটকটা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র, মাল-মেটেরিয়াল অবিলম্বে সীজ করতে হবে। সিজার-লিস্ট পরের ডেট-এ পেশ করতে হবে কোর্টে। আপনাদের নামেও সমন জারি হয়েছে। পেয়ে যাবেন দু-একদিনের মধ্যেই।

বীথিন গলগলিয়ে ঘামছিলেন। বড়বাবুর কথার জবাবে কিছু বলবার ক্ষমতাও বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন।

—খুব খারাপ লাগছে, বুইলেন। বড়বাবুর গলায় আন্তরিক আক্ষেপ। — চোরদের বিরুদ্ধে নাটক করতে গিয়ে একেবারে চুরির দায়ে পড়লেন মশাই।

—চুরি কোথায়? একটা গল্পকে নিয়ে নাটক করলে—।

—চুরি করা হয়। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে তাহা চুরিই। পারমিশনটা নিয়ে নিলেন না কেন মশাই? এখন উটকো ঝামেলা।

—আসলে, গল্পকারের ঠিকানাটাও ছিল না আমাদের কাছে। খুঁজে পেতে পারমিশন নেবার সময়ও ছিল না। সামনে অল বেঙ্গল ওয়ান এ্যাক্ট কমপিটিশন। সব মিলিয়ে—। তাছাড়া পারমিশন চাওয়ার অন্য অসুবিধেও ছিল।

—কী?

—ওরা টাকা পয়সা চায় তো। আমরা গ্রুপ থিয়েটার এমনিতেই ধুঁকছি। —

—তা বটে। তবে হলের জন্য তো টাকা দেন?

—তা দিই।

—মঞ্চসজ্জায় তো টাকা খরচ করেন।

—তা করি।

—বিজ্ঞাপন, পোস্টার ... সব কিছুতেই তো। সাউণ্ড সিস্টেমও তো ভাড়া করেন। পেন্টারও তো পয়সা নেয়। কস্ট্যুমও তো পয়সা দিয়েই কেনেন। কেবল লেখকের জিনিসটা পয়সা না দিয়ে ব্যবহার করতে চান কেন? লেখকের জিনিসটা মাগনায় পাওয়া যাবে ভাবেন কেন?

টেলিফোনের এপ্রান্তে বীথিন নির্বাক হয়ে যান

— যাগগে আমি আদার ব্যাপারী, যা বলছিলুম, অন্য কেউ হলে আচমকা 'রেইড' করে সীজ করে নিতুম সবকিছু। কিন্তু আপনারা বন্ধু লোক। এলাকার কালচার্যাল ফিগার। সেই কারণেই ফোনটা করছি। এখন ক-টা বাজে?

—আটটা দশ।

—দশ নয়, বারো। ঠিক আধ ঘন্টা বাদে পৌঁছুব। আটটা বিয়াল্লিশে। তার মধ্যে ঐ নাটকের যা কিছু প্রমাণ-সাবুদ লোপাট করে ফেলবেন।

—সবকিছু মানে?

—মানে, ঐ ভদ্রলোকের গল্প নিয়ে আপনারা নাটক করতে চলেছেন, এমন কোনো প্রমাণই যেন আমার হাতে না আসে। ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, আমি যদি ঐ নাটক সংক্রান্ত একটুকরো কাগজও সীজ করি তো সেটাই আদালতে আপনাদের এগেইন্স্টে চলে যাবে। বিপদে পড়ে যাবেন মশাই।

বীথিন বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে রিসিভার কানে ঠেকিয়ে।

—আচ্ছ, রাখছি। আটটা বিয়াল্লিশ। রাইট? থ্যাং-ক্যু।

পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করবার পর বীথিন দেখলেন, সারা রিহার্সেল-রুম জুড়ে শ্মশানের স্তব্ধতা। কে যেন এক পোচ করে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকের মুখে।

সহসা হাত ঘড়ির ডায়েলে চোখ রাখেন অনিন্দ্য। আচমকা চিৎকার করে ওঠেন তিনি, নাটকের পান্ডুলিপি যার-যার কাছে আছে, জমা দাও শিগ্গির।

পান্ডুলিপিগুলো দলা পাকিয়ে পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে বীথিন ওটা ধরিয়ে দিলেন ভোলার হাতে। যা, রবীনকাকুর বাড়িতে রেখে আয়। কাকীমাকে বলবি, যেন লুকিয়ে রাখে। আমি গিয়ে সব খুলে বলব।

ততক্ষণে অনিন্দ্যর নির্দেশে ব্যাক-সিন, ফ্ল্যাটগুলো গুছিয়ে ডাঁই করে ফেলেছে ছেলেরা। আদালতের লাল কাপড়, এজলাস, কাঠগোড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি একত্র করে

ফেলেছে। কস্ট্যুমের ট্রাঙ্কখানাও বের করে এনেছে। কোথায় রাখা যায় এগুলো? অনেক টাকার মাল, নষ্ট তো করে ফেলা যাবে না। নকুল দিল লাখ টাকার খবর। বাপীদের তিনতলার চিলেকোঠায় একখানা কুঠরি রয়েছে। এক্কেবারে ফাঁকা। বাপীকে বললে কিছুদিনের মতো রাখতে পারে জিনিসগুলো। ওর সঙ্গে নাটকের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে বাপী অনিন্দ্যদের ছেলেবেলার বন্ধু। না করতে পারবে না।

অনিন্দ্য উঠে দাড়ান। বীথিনের দিকে তাকান। বলেন, আমি বাপীর সঙ্গে কথা বলতে চললুম। এর মধ্যে তুই একখানা কাজ সেরে ফেল্। সারা এলাকার পোষ্টার গুলো ছিড়েঁ ফেলা দরকার।

—ঠিক। পোস্টারগুলো এক একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ।

—এক কাজ কর। পুরো টিমকে দুভাগে ভাগ করে ফেল। একভাগ এই মালগুলোকে বয়ে নিয়ে যাক বাপীদের বাড়িতে। অন্যদলের এক-একজনকে ছুটিয়ে দে এক-এক এলাকায়। যত জলদি সম্ভব, পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলুক। আমি জগন্নাথদার প্রেসেও যাব। ইনভিটেশন কার্ডগুলো নিয়ে নেব। প্রুফ কপিগুলোকে নষ্ট করে ফেলব। কুইক। আর মাত্র আঠারো মিনিট সময়। একেবারে ওয়ার-ফুটিং-এ কাজ করতে হবে সবাইকে।

বড়বাবু এলেন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে। আটটা বিয়াল্লিশে তাঁর জিপখানা থামল 'নবারুণ' এর দোরগোড়ায়। লাফ দিয়ে জীপ থেকে নামলেন তিনি।

বললেন, রাস্তার দুধারের পোষ্টারগুলো তো, দেখলাম, নেই। ছিঁড়ে ফেলেছেন এরই মধ্যে?

বীথিন হাসেন। বড় ম্লান বিষন্ন সে হাসি।

—স্ট্রেন্জ! বলতে বলতে সংস্থার অফিস রুমে ঢুকলেন বড়বাবু। তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু না, হরেক কিসিমের সামগ্রীতে বোঝাই থাকলেও 'ছোট চোর বড় চোর' সম্পর্কিত এক টুকরো জিনিস কিংবা এক চিলতে কাগজ কোথাও পেলেন না।

দু-চোখ কপালে তুলে বীথিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন বড়বাবু। সপ্রশংস দৃষ্টি। বলেন, এর মধ্যেই সব কিছু নীটলি সাফ করে ফেলেছেন! আপনাদের টিম ওয়ার্ক তো দারুণ! একখানা সিগারেট ঠোটে গুঁজে নেন বড়বাবু, গ্রুপ-থিয়েটরের বিউটি এটাই। টিম-ওয়ার্কটা দারুণ।

(কেবল অসৎ ও নীতিহীন নাটকের দলগুলির প্রতি উৎসর্গীকৃত)

স্বজনের জন্য

... মাইন্‌সের স্বজন চলে যায় হে ...।

কথাটা বলেছিল ফুলঘরার সনাতন মল্লিক। বিকেলের অস্তমিত সূর্যের ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে বলেছিল।

—একটা দিন শেষ হলো মানে, একদিনের তরে চলে গেল মাইন্‌সের সবচেয়ে আপনজনটি।

ফুলঘরার বকুলতলায় রোজ বিকেল হলেই জমে ওঠে আড্ডা। পাঁচমেশালি ছেলেছোকরা, বুড়োহাবড়ার জমায়েত। জুড়ে দেয় গুলতানির আসর। শ্রীকান্তের চায়ের দোকানে চা খায় কেউ কেউ। সঙ্গে ফুলুরি-বেগুনি। গুড়াকু-তামাক দিয়ে দাঁত মাজে বয়স্করা। চিরিক-চিরিক থুতু ফেলে মাটিতে।

বকুলতলায় আমি যাই। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে চাকরি করতে এসে সময় কাটে না। মানুষের সঙ্গকামনায় যাই রোজ। ওদের সঙ্গে দু'দণ্ড কাটিয়ে এলে একাকীত্বটা খানিক ঘোচে। ওরাও আমাকে আত্মীয়জ্ঞানে টেনে নিয়েছে কাছে।

সনাতন মল্লিকের উম্বর ঢের। চোখে কম দ্যাখে, কানে কম শোনে। সারা কপাল জুড়ে জটিল আঁকিবুকি। নাতির হাত ধরে রোজ আসে বকুলতলায়। মুখের মধ্যে ভর্তি দোক্তাপান চেপে রেখে ডাং-জাল বুনতে থাকে জাল বুনবার ছড়িটিকে নাইয়ের ওপর ঠেকনা দিয়ে। সারামুখ থমথম করতে থাকে। ঘনঘন পশ্চিম গগনে তাকায়। ডুবতি সূর্যের লাল রঙের চাকিটার পানে চেয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। বিড়বিড়িয়ে বলে, সুয্যি ডুবতিছে হে ...। একটা দিন ফুরালো। মানে, ভেবে লাও চলে গেল মাইন্‌সের একটি স্বজন।

—গুজরাটে তো জোর দাঙ্গা লেগ্যেছে হে। রতন পাল পৌঁছেই খবরটা চাউর করে বকুলতলায়, —শয়ে শয়ে মুসলমানকে পুঁড়াই মারছে রোজ। ঘরকে-ঘর, বস্তিকে-বস্তি চারপাশ থিকে ঘিরে লিচ্ছে। টিন-টিন পেট্রোল ছিটাচ্ছে ঘরবাড়িতে. লাগাই দিচ্ছে আগুন। বাইরে দাঁড়াই পাহারা দিচ্ছে যাতে করে কেউ নিভাতে লারে সেই আগুন।

—হ্যাঁ, তাদের মুখ্যমন্ত্রী তো সাফ বইলে দিছে, একটা মুসলমানকেও বাঁচাই রাখবেক নাই গুজরাটে।

—গর্ভবতী মেয়ার পেট চিরে বের কইরে আনছে বাচ্চা। শাবল ডগায় ফুঁড়ে লিয়ে বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনে।

—আরব-দেশগুলান নাকি হুমকি দিয়েছে, গুজরাটে অবিলম্বে মুসলমান নিধন বন্ধ না করলে, গোটা ইন্ডিয়াকে নাকি বোম মেরে উড়াই দিবেক?

—ছাড় দেখি। অদ্দুর থেকে অমন হুমকি দেওয়া সোজা। বলতে বলতে গজেন নায়ক দু'দিকে দু'বার চোখের মণি ঘুরিয়ে নেয়, ... দাঙ্গাটা যেখানে হচ্ছে, সিখেনে গেলে বুঝতে পারতিস, কত ধানে কত চাল। সিখেনে বলে মানুষের মুন্ডু এই আছে তো এই নাই। সিখানে রোজ সইন্ধাটি নামলে ...।

শুনতে শুনতে সনাতন মল্লিকের বুকের মধ্যে গুরগুর আওয়াজ ওঠে। একটা চেনা সাপ সরসর করে হেঁটে যায় বুক থেকে নাভিকুণ্ডের দিকে। কত শত মাইল দূরে কোন্ মুলুকে বেঘোরে প্রাণ দিল কিছু অসহায় মানুষ, যারা বেঁচে রয়েছে, তাদেরও ঠিক কতখানি বিপদ, ঠিক ঠিক কী ঘটছে সেখানে, কিছুই পুরোপুরি জানে না সে। এইসব ছেলেছোকরাদের বক্তব্যও পুরোপুরি মগজে ঢোকে না তার। কেবল বুকের মধ্যে শুকনো বাঁশপাতার মতো তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকে একটা অতি পুরোনো ছবি ..., কোথায় কোন অঝোড় গাঁয়ে দিনের শেষে তেলাকুচা ফলের মতো টকটকে সুয্যিটি ডুবতিছে। সারা গাঁয়ের হাজার মানুষ, মেয়া-মদ্দ, বাচ্চা-বুড়ো, প্রাণপণে টেনে রাখতে চায় তার লাল কাপড়ের খুঁট। ব্যাকুল গলায় মিনতি জানায়, 'আর কিছুক্ষণ থেকে যাও, হে সখা, হে স্বজন!' কোথায়, কোন্ মুলুকে সন্ধ্যাটি হওয়ামাত্তর ঝুপঝুপ বাতি নিভিয়ে ঘুরঘুট্টি আঁধারের মধ্যে নাক অবধি ডুবিয়ে বসে রয়েছে পুরো গ্রাম। নিশ্ছিদ্র আঁধারে শুধু মিটমিটিয়ে জেগে থাকে হাজারে হাজারে চোখ। ঐ চোখদুটি যতক্ষণ মিটিমিটি জ্বলে, ততক্ষণই আশা, ভরসা, ততক্ষণই জীবন। নিশুত রাতে গলায় তিলমাত্র আওয়াজ না তুলে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে মানুষ। কাঁদতে থাকা কোলের বাচ্চা একটু একটু করে কাঠ হয়ে যায় কোলে, মুখের থেকে চাপা দেওয়া হাত সরে না তবু।

মানুষের ভয়ে কাঁদছে মানুষ, ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। সনাতন মল্লিক চোখ মুদলেই স্পষ্ট দেখতে পায় সেই ছবি। ছবিটা বাড়তে বাড়তে যোজনপ্রমাণ হয়। এক ছবি থেকে লক্ষ ছবি।

রতন পাল নাতির বয়েসি। ইল্‌চি করে বলে, ও সনা দাদু, তুমাকেই গুজরাটে পাঠাই দুবো আমরা।

—ঠিক। গজেন পাল পাশ থেকে ফুট কাটে, ... আমাদের হয়ে তুমিই দেখে আসো, ব্যাপারটা কী ঘটতিছে সিখেনে।

মুখ তোলে না সনাতন মল্লিক। একমনে জাল বুনতে থাকে। থমথম করতে থাকে সারা মুখ। মুখের মধ্যে অলবলে জিভ নড়েচড়ে বেড়ায় অকারণে। খানিকবাদে মুখ তোলে সনাতন। ফোকলা দাঁতের মাড়িতে জিভ ঘসে বারকয়েক। এক ধরনের বিজাতীয় আওয়াজ তোলে গলায়। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, ছগ্‌রা বয়েস তো, একলম্ফে তালগাছটা ডিঙাতে চায়। ভাবছে, কতই না মজা চলছে সিখেনে! জন্মের পর থিকে পিঠে একখানা ঘা-ও তো পড়ে নাই এযাবৎ। জীবনে একবার দাঙ্গার মুখে পড়তো কি, তাইলে বুঝতো, কত ধানে কত চাল!

শুনে হৈ-হৈ করে ওঠে ছোকরার দল। বলে, ও দাদু, তুমার তো বয়েস ঢের, কত

দাঙ্গা দেখেছ জীবনে, বল না, শুনি। বলি, এঁদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন না ভাই। এঁরা এক-একটি বটবৃক্ষ, বহুৎ কিছু দেখছেন জীবনে।

—তা দেখেছে, তবে দাঙ্গা দেখবেক ক্যামন করে?

—দাঙ্গা তো কুনোকালেও হয় নাই এ তল্লাটে।

—দাঙ্গা ইদিগ হয় না।

ছোকরাগুলোর দিকে স্থির-নয়নে তাকিয়ে থাকে সনাতন মল্লিক। উত্তেজনায় নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে। সারা মুখমণ্ডলে ঘনাতে থাকে শ্রাবনের ঘনঘটা।

রতন পাল আমায় আলতো ঠেলা মারে। চোখ টিপে বলে, বেজায় রেগে গেছে বুড়া।

বারকতক দ্রুতলয়ে জালের ফাঁসে ফাতি চালিয়ে ফের মুখ তোলে সনাতন মল্লিক। ঘোলাটে চোখে আকাশের দিকে তাকায়। বলে, বাবুমশয়, এই বালখিল্যদের কথা কানে লিবেন নাই। ইয়ারা আইজ্ঞা হেসেখেলেই কাটাই দিল্যাক জীবনটা। দুনিয়ার লোকের মাথার চুল অবধি ডুবে যায়, ইয়াদ্যার আইজ্ঞা পায়ের কড়ে-আঙুলটি অবধি ডুবে না।

সে-কথায় ছোকরার দল খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

সনাতন মল্লিক ওদের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। সহসা ডান হাতের তর্জনী রতনের দিকেই তাক করে।

—এই ছোঁড়া সেদিন জনম লিবেক। কুন্দটা পসববেদনায় ছটকাতে লেগেছে সেই সকাল থিকে। তখন তো আইজ্ঞা আজকের দিনের মতন দু'পা অন্তর ডাক্তর-কোবরাজ ছিল নাই, পিচ-রাস্তাও নাই ছিল এখনকার মতন। তখন ডাক্তার বলতে মুকুন্দ কুচলান। ডাক্তার বলুন, সাজ্জন বলুন, উই একটাই। তো, আইজ্ঞা, সেটা বোধ করি দুর্ভিক্ষের দু'তিন বচ্ছর বাদের কথা। কোলক্যাতায় দাঙ্গা বেধেছে দম্মে। তখন তো রেডিওপাতি ছিল নাই এগাঁয়ে। এখন দিনকাল বদলেছে, কত মিসিনপাতি বেইরেছে, শতযোজন দূরের খবর, ছবি, খবর-কাগজে ছাপা হইঁয়ে চক্ষের পলকে পৌঁছে যায় পাকশালে। তখন সেসব কিছোই ছিল নাই আইজ্ঞা। তখন, খবর যা, সব মুখেমুখে। রোজরোজ কত কথা ফুলে ফেঁপে গাঁয়ে ঢোকে। কত মারামারি খুনজখমের বৃত্তান্ত। শুনতে শুনতে ভয়-তরাসে মরি। ভগবানকে ডাকি। মাইন্‌সের বিপদে আইজ্ঞা ভগবানই ভরসা।

তো, যেদিনের কথা বলতিছি, উই দিন সাঁঝের বেলায় মুকুন্দ ডাক্তারের দোকানে গিয়ে দেখি, সব থমথম ... থমথম করতিছে। মুকুন্দ ডাক্তার মুখটি কালো করে বসে রয়েছে সবার মধ্যমণিটি হয়ে।

খবর এসেছে ওর কাছে, ভারী বিষম খবর। সারা গাঁয়ের পক্ষে ভারী দুঃসংবাদ।

হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়ে তার সুমুখে ঝুঁকে পড়েছে দশ-বিশটা মুণ্ড। চিন্তায় ডুবে যাওয়া মুখগুলি।

একটু বাদেই জানা গেল ব্যাপারটা। আলোচালের ডাঙায় পাঁচ-শো মিঞ্যা লেবেছে। প্রত্যেকের হাতে কেঁচা-বল্লম, আর পাকা তেল মাখানো লাঠি। লাঠি দিয়ে ফইর্‌কাল খেলছে উয়ারা। মশাল ডাঁই করেছে অগাধ। সাতভায়া তারা মাথার উপর উঠলে, উয়ারা রওনা দিবেক ফুলঘরার দিকে। বিকেল নাগাদ সোনামুখীর হাট থেকে বাড়ি ফিরবার পথে মুকুন্দ ডাক্তারের ওষুধ-দোকানে পাক্কা খবরটা দিয়ে গিয়েছে গোবিন্দ নামহাতা।

শুনে থম মেরে গেছে সবাই। একঘর মানুষ, সব ভয়ে-তরাসে বাক্যিহারা।

ওদের কথাবার্তার থেকে আরও জানতে পারলাম যে,নামোপাড়ার রহিম শেখই ঘরশত্রু বিভীষণ হয়ে পথ দেখিয়ে লিয়ে আসছে মিঞ্যাদের।

—রহিম শেখ? মুরুব্বিদের থেকে একজন বলে ওঠেন, —তাকে তো ইদানিং দেখি না। কোথা থাকে সে?

কেউ জানে না সে খবর। তাও একজন মন্তব্য করে, —বজ্জাত লোক, তার কি থাকবার কোনও ঠিকঠিকানা আছে? কোন্ মুলুকে কোন্ ধান্ধায় থাকে সে, কে তার খোঁজ রাখে!

পাকামাথাগুলো দুলছিল হ্যারিকেনের আলোয়। তাদের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো উল্টিপালটি খাচ্ছিল এর-ওর গায়ে।

গোপী বায়েন হা-হুতাশ করে উঠলো, ইস্, কালই মোর রাধিটা আইছে গো ...। সাথে কচি ছা। বংশে বাতি দিবার উই একফোঁটা হে ...। গোপী বায়েন হাহাকার করে ওঠে। শ্বশুরের অমতে লিয়ে আইছি উয়াকে। ভালোমন্দ কিছু একটা হইয়েঁ গেলে সারাটা জীবন বিঁধবেক মোকে।

—আমার ঘরের বুড়িটার কথা একটিবার ভাবো তুমরা। যতি গোঁসাই অসহায় চোখে তাকায়, রাতের বেলায় চোখে দেখে না। বুঝবার শুনবার আগেই লিকাশ হইয়েঁ যাবেক।

আক্ষেপ আর হা-হুতাশের বন্যা বয়ে গেল আসরময়। সবাই কোনও না কোনওভাবে অসহায়, অন্যের চেয়ে। প্রত্যেকের বিপদ অন্যদের চেয়ে বেশি।

তো, আমি বলতে চাচ্ছিলাম এক অন্য বিপদের কথা। তার আগেই কঁকিয়ে উঠলো রিদয় পছালি, আমার ঘরটাই তো পয়লা লম্বরে পড়বেক গো। সবার আগে মরণটি আইজ্ঞা আমার।

মুকুন্দ ডাক্তারের চোখমুখ চিন্তায় আচ্ছন্ন। ঘোর মাখানো চোখে তাকাচ্ছিলেন এর ওর-দিকে। থমথমে গলায় শুধোলেন, কোন্ দিক থেকে সেঁধাবেক যেন উয়ারা?

সকলে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। সে-কথাটা তো জানে না কেউ। সে-কথাটা তো গোবিন্দ নামহাতাকে শুধোবার বুদ্ধি হয় নাই কারো। কে আর শুধাবে! কার মাথার ঠিক ছিল তখন! পাঁচশো মিঞ্যা হাতে লাঠি-বল্লম বাগিয়ে মশাল চাগিয়ে ছুটে আসছে, এই খবরেই তো সবাই অজ্ঞান। মাথা খাটাবার মাথাটাই তো অসাড়। তাবাদে, গোবিন্দ নামহাতা তো কথাটি কয়েই ছুট মেরেছে তার নিজের গাঁয়ের দিকে। কথাটা শুধোবার ফুরসৎ পাওয়া গেল কোথায়?

গাঁয়ের সীমানা ঘেঁসে যাদের বাড়ি, তাদের সব্বাইয়ের মুখ কালো হয়ে গেল ভয়ে। যদি আমার ঘরের পাশ দিয়ে সেঁধায়! একটা অজানা ভয় জন্তুর মতো ঘাপটি মেরে বসে থাকে বুকের খোঁদলে। রাতটাকে ভয়াল মনে হয়।

কথায় কথায় রহিম শেখের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে। সবাই বলাবলি করে ওকে নিয়েই। ওই নাকি পালের গোদা? ওই নাকি পথ দেখিয়ে আনতিছে মিঞ্যাদের?

শুনে বুকভরা বিদ্বেষের পাশাপাশি বিস্ময়ও জাগে অনেকের মনে, কিনা, রহিমটা তো এরকম পাজি ছিল নাই! আমাদের থেকে কত উপকার পেয়েছে উ।

—আরে ছাড়ান দাও হে উপকারের কথা। চোরা কভু নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী। সেবার যখন আগুন লেগে ...।

মুকুন্দ ডাক্তার হাত নেড়ে থামান সবাইকে। এখন পুরোনো কথা নিয়ে গবেষণার সময় লয়। এ হলো সঙ্কটকাল। আগে একটা উপায় নিরূপন কর। গবেষণার সময় পরেও পাওয়া যাবেক।

জমায়েত দম আটকে বসে থাকে।

মুকুন্দ ডাক্তার ঠাণ্ডা ধাতের মানুষ। ভেবেচিন্তে রায় দিল।

—লরিয়া ডোমকে দিয়ে ঢোলসহরৎ করা লাগবেক সারা গাঁয়ে। মেয়াছেয়া, বুড়াথুড়া, ছা-ছাওয়ালদের তুলে দিতে হবেক মা-সিংহবাহিনীর মন্দিরের দোতলায়। মদ্দদের তিয়ার হতে হবে।

লরিয়া ডোম কাঁধে ঢোল নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালো জমায়েতের সুমুখে। পাখি পড়ানো হলো তাকে। সব শুনলো। বুঝলো। কিন্তু নড়ে না এক-পা। শেষমেষ ভ্যাঁ ... করে কেঁদে ফেললো সে। বলে, শিযরে শমন, একলাটি আঁধার রেতে কেমন করে ঘুরবো আইজ্ঞা? মিঞ্যারা যদি পশ্চাৎ থিকে ...।

লরিয়া ডোমের সঙ্গে গেল কার্তিক, ভুবন, খাঁদা, আরও বাছাবাছা ছোকরা জনাকয়। লাঠিয়ালবেষ্টিত হয়ে সে কাঁপা কাঁপা গলায় চাউর করলো কথাগুলো, সারা গাঁয়ে, ...আলোচালের ডাঙা ...য় পাঁচশো ...মিঞা লেবেছে ..., আজ রেইতেই ... আইবেক উয়ারা ...। ডিম্ ... ডিম্, ডিডিম-ডিডিম ...। মেয়াছেয়া, বুড়াদের সিংহবাহিনীর মন্দিরে রেখে ... সবাই যাও ... মুকুন্দ ডাক্তারের বাখুলে ...। ডিম্-ডিম্ ডিডিম-ডিডিম্।

এদিকে মুকুন্দ ডাক্তারের দুয়োরে লিস্টি করা চলছে জোয়ান লোকের। পিলান কষা চলছে নানান কাজের। মেয়াছেয়া, বুড়া-বাচ্চারা থাকবে সিংহবাহিনীর মন্দিরের দোতলায়। সিঁড়ির মুখ আগলাবেক জনা-দশবারো জোয়ান। উঠতে গেলেই বল্লমের ঘা মারবে। তাবাদে, চুড় করে রাখা হোক পাথর-রড়া আর বালি। দূর থেকে পাথর-রড়া, কাছে এলেই চোখ নিশানা করে বালি।

পহরটাক যখন রাত, তখন মুকুন্দ ডাক্তারের উঠোনে একশো জোয়ানের সমাবেশ। সবার হাতে লাঠি-সড়কি-কেঁচা-বল্লম। পাথর-রড়া আর বালি জড়ো হয়েছে স্তূপাকারে। আগাম-দলটি বেরিয়ে গেছে গাঁয়ের বাইরে। তামাজোড়ের চাকোলতা গাছে উঠে বসেছে লোক। হালহদিশ লক্ষ রাখছে।

—ওরে, তুয়ারা কি আহাম্মকি ধরলি রে! কঁকিয়ে ওঠে মুকুন্দ ডাক্তারের বাপ অধর কুচলান, —মারামারিতে পারবি কেন উযাদের সাথে? সব ক'টা কচুকাটা হবি। তার চেয়ে ভক্তিভরে মা-সিংহবাহিনীকে ডাক্। গ্রাম-কমিটির থিকে মায়ের থানে মানত কর। মা ... মাগো ... এই বিপদ থিকে উদ্ধার করে দিলে ...।

—থামো তো বাবা। ধমকে ওঠেন মুকুন্দ ডাক্তার, ...মনসা পূজা করলে সাপ মরে?

—হুহ্। অন্তিমকালে পাখনা গজিয়েছে তুয়াদের! অধর কুচলান রেগে ওঠে, ... দেব-অসুরের লড়াইতে দ্যাবতারা জিতেছে কুনোদিন? হেরে ভূতটি হয়ে সব ছুটেছে নারায়ণের পাশ। প্রভু, বাঁচাও। মনে নাই?

—একটা বন্দুক থাকলে ভালো হতো। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বললো কথাটা।

এখন যেমন চারদিকে বন্দুক-পিস্তল-পাইপগানের ছড়াছড়ি, সেযুগে তেমনটা নাই ছিল আইজ্ঞা। তখন পাঁচ গাঁয়ের মধ্যে বন্দুক ছিল কেবল নাচনহাটির বোসেদের। কথাটা মুকুন্দ ডাক্তারের মনে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ছোকরা আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। বোসদের বড়কর্তার অবশ্যি বাতের ধাত। পূর্ণিমা অমাবস্যায় চাগিয়ে ওঠে। তাঁকে আশা করা বৃথা। তবুও যদি নিজের বাড়ির দোতলার খোলা বারান্দা থেকে দু'চারটা ফাঁকা আওয়াজ করেন তো তাতেও খানিক ভয় পাবে শয়তানরা। তাবাদে, খবরটা পেলে সাবধান হয়ে যাবে লাচনহাটির মানুষও। তারা তো কিছু জানেই না। আর শয়তানরা যে ফুলঘরার পাশাপাশি লাচনহাটিতেও চড়াও হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি!

—আমি আইজ্ঞা তখন থিকে কথাটা বলবার লেগে তাল-ফাঁক খুঁজছিলাম ...।

আমার দিকে তাকিয়ে সনাতন মল্লিক বলে, ... একটু ফাঁক পেতেই বলে উঠলাম, উদ্দিগ্ যে অন্য বিপদ।

—ফের কী হলো? মুকুন্দ ডাক্তার মুখ তুলে তাকায়।

বলি, কুন্দটার যে বেথা উঠেছে।

কথাটা শোনামাত্তর মুকুন্দ ডাক্তারের চোখমুখ ভারী হয় এল। পোয়াতি মানুষকে তো দেবস্থানের দোতলায় তোলা যায় না। ভাবতে বসলো পঞ্চজনা। পঞ্চু ধল্ল তখন তাগড়া জোয়ান। তার সাথে উঠে দাঁড়ায় আরও জনা পাঁচ-ছয়। বলে, দোলা বেঁধে মামীকে লিয়ে এইবেলা রওনা দিচ্ছি খালপাড়ের দিকে। বিন্দু পিসিও চলুক আমাদের সাথ। অতদূর মিঞ্যারা যাবেক নাই।

—ছিঃ ছিঃ, তাও কি হয়? কারা যেন আপত্তি তোলে ভিড়ের মধ্যে, ... ঘোর অমাবশ্যার রাতে পুয়াতি-মানুষকে ঐ শ্মশান-এলাকায় ...।

—আরে, থামো হে। সঙ্কটে লিয়ম লাস্তি। বলতে বলতে পঞ্চুর দল অন্ধকারে হারিয়ে গেল কেউ বাধা দেবার আগেই।

কলাগাছের খোল কাটা হয়েছে রাশিরাশি। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে এসেছে বালিশ। সিংহবাহিনীর মন্দিরের দোতলায় বসে ঐ বালিশের তুলো দিয়ে বানানো চলছে রাশিরাশি সলতে। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে সরষের তেল এসেছে। যার যেটুকু ছিল। এক সের থেকে এক পলা অবধি। সিংহবাহিনীর মন্দিরের দোতলায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই। কলকলিয়ে কেঁদে চলেছে বাচ্চাগুলো। চক্কোত্তিদের মেজো-মা কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন দুখু বাউরির বাচ্চাটাকে। মুকুন্দ ডাক্তারের স্ত্রী সামলাচ্ছেন গোপী গায়েনের শাশুড়িকে। বুড়ির কান্না আর থামছিল না কিছুতেই।

ছেলেছোকরার দল লেগে পড়েছে কাজে। সিঁড়ির মুখে জড়ো করেছে কাঁড়িকাঁড়ি

নুড়িপাথরের টুকরো। ডাঁই করেছে বালি। অভয় তুঙ্ মুরুব্বি মানুষ। পাকা মাথা। ঘড়ঘড়ে গলায় যুক্তি দেয়, গরম জলের বেবস্থা কর্ তুয়ারা। শয়তানরা এলে মন্দিরের দোতলা থিকে ওদের গায়ে ছুঁড়তে পারবি গরমজল। কথাটা জমায়েতের মনে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় মারে ছোকরার দল। রাশি রাশি কাঠ এনে জড়ো করে দোতলার ছাদে। নিমেষের মধ্যে বানিয়ে ফেলে পাথরের উনুন। জোগাড় করে আনে বিশাল বিশাল ধান সেদ্ধ করবার কড়াই, বালতি, লোহার হাতা। কাউকে তখন কাজের কথা বলতে হচ্ছে নাই আইজ্ঞা। এমনিতে পূজাপার্বনে একটা কাজ করতে বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু এ হলো সঙ্কটকাল।

দাউদাউ করে জ্বলছে তিন-তিনটে উনুন। বিশাল কড়াইগুলো তার ওপর চাপানো। পাশের পুকুর থেকে জল বইতে লেগে গিয়েছে বহু জন। এমন কি মুকুন্দ ডাক্তার নিজেও। বালতি বালতি জল এনে কড়াইগুলোতে ঢালছে সবাই। দাউদাউ আগুনে সে জল ফুটছে। দু'ধামা কাচের শিশি-বোতল এনে নামিয়ে দিল জনা দু'তিন ছোকরা। বড় ঘরের বউ-ঝিরা সার বেঁধে বসে গেল। মসলা বাটার ভঙ্গিতে শিশি-বোতল ভেঙে টুকরো করতে লাগলো ওরা।

—কী বলবো বাবুমশয় ... ! সনাতন মল্লিক দু'চোখ কপালে তুলে বলে, সে রাতে সিংহবাহিনীর মন্দিরটা যেন একটা কারখেনা !

কদমা ডাকুয়া এমনিতে লতপতে তালপাতার সেপাইটি। গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে অষ্টপ্রহর। নিজের সমান লম্বা একখানা লাঠি বাগিয়ে ধরে সে হুংকার ছাড়লো— দেশের মান, দশের মান, সারা গাঁ'র মেয়াছেইলাদের মান, মা-সিংহবাহিনীর মান, ... তিয়ার হয়ে যাও ভাইসব ..., একজনাও বেঁচে থাকতে শয়তানদের এগাঁয়ে ঢুকতে দিবো নাই ...। জয়, মা-সিংহবাহিনীর জয়।

—জয়, মা সিংহবাহিনীর জয় ...।

হাতে হাতে ফল পেয়ে কদমা ডাকুয়ার উৎসাহ বুঝি বেড়ে যায়। লাল চোখদুটি বড় বড় করে মাথার চুলের বাবরিতে ঝাঁকুনি তুলে সে বোল দিতে থাকে একের পর এক ... জয়, মা-সিংহবাহিনীর জয়। জয় বাবা দুধেশ্বরের জয়। জয় ফুলঘরার জয়। মুকুন্দ ডাক্তারের জয় ...।

শতকন্ঠ গর্জে ওঠে, জয় মুকুন্দ ডাক্তারের জয়।

মুকুন্দ ডাক্তার দু'হাত তুলে থামান ওদের। থাম্ রে তুয়ারা। চিল্লাস না। ভাববার দে।

ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে বসে পড়ে কদমা ডাকুয়া।

ওদিকে মন্দিরের খোলা ছাদে দাউদাউ করে জ্বলছে বিশাল বিশাল উনুন। জলভর্তি কড়াই চড়েছে উনুনে। মেয়েরা কষে জ্বাল দিচ্ছে উনুনের পেটে। মুকুন্দ ডাক্তারের স্ত্রী কোমরে কাপড় জড়িয়ে বালতি বালতি জল ঢালছেন কড়াইতে। গরিব-বড়লোক, উচ্চ-নিচ, ঐ রাতে সব একাকার। মন্দিরের বাইরের চত্বরে বালতি-বালতি জল ঢালছিল কিছু জায়ান ছোকরা। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ নেমে এল নিচে। পুরুষদের সঙ্গে হাতাহাতি করে বইতে লাগলো জল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা চত্বর জলে থৈথৈ।

প্যাচাপ্যাচে কাদা। ঐ কাদায় ছড়িয়ে দেওয়া হলো বোতল-ভাঙা কাচের টুকরো, কিনা, ছুটে এলেই হড়কে পড়বেক শয়তানের দল। হাত-পা কেটে রক্তারক্তি হবেক। জখম যত না, আতঙ্কটা বেড়ে যাবে অদের মধ্যে।

—সে রাতের ঘটনা আপনাকে কী আর বলবো বাবুমশয়, শ্যাম মিত্তিরের পিসি, এমনিতেই তার পেসারের ধাত, চব্বিশ ঘন্টা হাওয়া করতে লাগে, উই কিনা বয়ে দিলেক একলা তিরিশ বালতি জল!

ঠিক সময়ে মুকুন্দ ডাক্তারের হুকুমে আঁধার কেটে বেরিয়ে গেল একশো জোয়ান। তিন-চারটে দলে ভাগ হয়ে ওরা বসে থাকবে গাঁয়ের চারপাশে। গাছে গাছে উঠে বসে থাকবে আরও কিছু জোয়ান। লক্ষ্যনজর রাখবে। ওদের পিছুপিছু কমজোরি কিছু মানুষ চললো নুড়িপাথর আর বালির বস্তা ঘাড়ে চাপিয়ে।

খানিক বাদে আরও চারটি দল চারদিকে চলে গেল। সঙ্গে নিল কলাগাছের খোল আর নারকোল-কাঠিতে জড়ানো তুলোর সলতে-বাতি। দলপিছু পাঁচশো করে। বোতল-ভর্তি সরষের তেলও নিল।

সাতভায়া তাবা তখন ঠিক মাথার উপরে ... খোলা মাঠের মধ্যে জ্বলে উঠলেক শয়ে শয়ে আলো! গাঁয়ের চারপাশের মাঠ আলোয় আলোময় ...! দূর থেকে মনে হয় বুঝি মশাল হাতে শয়ে শয়ে মানুষ! ব্যাপারটা বুঝলেন তো বাবুমশয়? মাঠময় শয়েশয়ে তুলোর বাতি জ্বলছে। শয়তানরা দূর থিকে ভাববেক, ফুলঘরা গাঁয়ের শয়ে শয়ে মানুষ বুঝি মশাল হাতে জড়ো হযেছে গাঁয়ের চারপাশে।

সে সব আলোও বুঝি একসময় নিভতে লাগলো একটি-দুটি করে। একসময় সব বাতিই নিভে গেল। বিশাল ফুলঘরা গাঁ, তার চারপাশের মাঠঘাট আবার ডুবে গেল অমাবস্যার ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে।

গভীর রাতে ... গাঁয়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দিচ্ছে সবাই। আমরা ছিলাম শিবের-বাঁধের পশ্চিম পাড়ে, মউল গাছটার তলায়। আমরা ছিলাম 'আগুয়া পার্টি'। আমাদের পিছে আছে গোপী বায়েনের দল। উয়ারা আছে কিষ্টকলি-দিঘির পাড়ে। তাদের পিছে রয়েছে আশু সর্দারের দল। মুকুন্দ ডাক্তার উয়ার দল লিয়ে রয়েছে মন্দিরের পাশটিতে। সব দলের সঙ্গে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমানে লাঠিসোটা, কোঁচা-বল্লম, আর বস্তাভর্তি পাথরের ঢেলা।

শিবের-বাঁধের পশ্চিমপাড়ে চুপটি মেরে বসে রয়েছি পুরো দলটা। দৃষ্টি বিঁধে রয়েছে দূরের আলোচালের ডাঙার দিকে। কারোর মুখে কথাটি নাই। চোখে পলক পড়ে না। রাতটা ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসে ...। ঘুটঘুটে আঁধার শকুনের মতো ডানা বিস্তার করে ধেয়ে আসে ...। বুকের মধ্যে কাড়া-নাকাড়ার বাদ্যি বাজতে থাকে, ডিম-ডিম ... ডিডিম-ডিম ...।

রাত তখন অনেক। সাতভায়া তারা মাথার উপর থেকে হেলে পড়েছে। আঁধারে ডানার ঝাপট মেরে উড়ে যায় বাদুড়ের ঝাঁক। মাথার উপর তাদের পাখনার সাঁইসাঁই আওয়াজ একেবারে বুকের মধ্যে গিয়ে বাজে।

হেনকালে ...।

হেনকালে, ঝাঁ-ঝাঁ করে ডেকে উঠলো বালিগুমা গাঁয়ের কুকুরগুলো। নিকষ অন্ধকারে একেবারে বাঘের ঝাপট নিতে লাগলো ওরা। আলোচালের ডাঙার এপ্রান্তেই গ্রামটা। তবে কি আলোচালের ডাঙা পেরিয়ে শয়তানরা চলে এসেছে বালিগুমা গাঁ অবধি! হায় ভগবান! ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ... বালিগুমা ইস্কুলের সামনের মাঠটাতে মিটমিটাচ্ছে আলো! অনেক আলো! শয়েশয়ে ...।

দেখতে দেখতে পনেরো-বিশটা জোয়ান নিঃশব্দে ঘামতে লাগলাম ঐ শীতের রাতে। চোখের পাতনি ফেলতেও ভুলে গেলাম সবাই। জগাকে ছুটিয়ে দেওয়া হলো পেছনের দলকে খবর দেবার জন্যে, কিনা শয়তানরা আসছে ... তিযার হইয়েঁ যাও সব ...।

হেনকালে আমাদের ডানদিক থেকে ভেসে এল ধাপুড-ধুপুড় আওয়াজ। কারা যেন আমাদের দিকেই ছুটে আসছে বিজলির পারা। মুহূর্তে খাড়া হয়ে দাঁড়ালাম পনেরো-বিশটা জোয়ান। তখনই বুঝলাম, ল্যাঠিসহ হাতগুলো থিরথিরিয়ে কাঁপছে।

একটুবাদেই পাশটিতে এসে দাঁড়লো পঞ্চু ধল্লরা ক'জনা। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, মামী পেসব করেছেন কিছো আগে। ব্যাটা হয়েছে। বলতে বলতে সনাতন মল্লিক কটমটে চোখে তাকায় রতন পালের দিকে।

নিজের জন্মের গল্প শুনতে শুনতে মিটিমিটি হাসছিল রতন। দেখেই সনাতন মল্লিকের রাগটা বুঝি চতুর্গুণ উথলে ওঠে। বলে, অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করেন বাবুমশয়। একদিকে খালপাড়ে এই রতনা-শালা জনম লিযেই ছটর-পটর জুড়েছে, উদিকে বালিগুমা ইস্কুলের মাঠে মিটমিট করে জ্বলছে শয়েশয়ে আলো। পঞ্চুদের থামিয়ে দিয়ে বলি, থাম্ রে তুয়ারা। শিয়রে শমন দেখতে লারিস? হু ...ই দ্যাখ, আলো ...!

পঞ্চু ধল্লরা যে-যার মতো চোখের ওপর হাত রেখে নিরীখ করলো খানিক। তারপর বললো, ইগুলান বোধ করি জোনাকির আলো গো দাদা । বালিগুমা ইস্কুলের মাঠে বটগাছটার ডালেডালে জ্বলতিছে বোধ হয়।

—লয় রে ...। দোটানার মধ্যে পড়ে যায় সবাই। একবার মনে হয়, জোনাকিই বটে। পর মুহূর্তে মনে হয়, যেন টিমটিম করে নড়ছে-চড়ছে আলোগুলো ...। ধু-ধু মাঠের মধ্যে সে এক হাড়কাঁপানো দৃশ্য!

অকস্মাৎ লাচনহাটির দিক থেকে ভেসে এল বন্দুকের আওয়াজ। শুনে ফের অন্য চিন্তা সেঁধালো মনে। রহিম শেখের বুদ্ধি তো, দুদিকে থেকে চড়াও হবার চায়। কী করি এখন, কুন দিক সামলাই ...! মনে মনে ডাকতে লাগলাম চারপাশের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে। বাঁচাও ঠাকুর ... এ বিপদে তুমরাই ভরসা ...।

এইভাবে, ... রাতভর ... সারা গাঁয়ের মানুষ, গাছেপালায়, ঝোপেঝাড়ে বসে বসে ক্ষণ গুনতে লাগলো। এক মিনিট যেন এ .... ক যুগ!

বসতে ... বসতে... বসতে ... একসময় পুব আকাশ ফরসা হলো। পয়লা কুঁকড়াটি ডাক পাড়লো। পাখিপাখাল জাগলো। খানিকবাদে, বালিগুমার ইস্কুলের মাঠ, আলোচালের ডাঙা, সবকিছু দৃশ্যমান হলো একসময়। এবং দেখলাম ...।

দেখলাম, চারপাশে যদ্দুর চোখ যায়, বেবাক ফাঁকা ...,শুনশান ...। জনপ্রাণী তো দূরের কথা, একটা পাখিপাখালও অবধি নাই আলোচালের ডাঙার দিকটাতে।

সবগুলি দল একেএকে ফিরে এলো মন্দিরের পাশে।

একটু বাদে নগেন তুঙই দিল খবরটা। সে ভারী আজব খবর।

বললো, ফিরবার পথে রহিম শেখের পাড়ার পাশ দিয়ে আসছিলাম আমরা। মড়াকান্না ভেসে আসছিল বাড়ির থিকে। সবাই পস্ট শুনেছি।

—তারপর ?

—শুনে পায়েপায়ে ঢুকলাম ওর উঠোনে।

—কী ? কি দেখলি ? শালা বাড়ি ফিরেছে ?

—দেখলাম, রহিম শেখ বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। ছাতিটা ফুলে চাল-কুমড়ার আকার হয়েছে। শ্বাস লিতে গিযে জান বেরিযে আসার জোগাড়। আমাদের দেখে শ্বাস টেনে টেনে বললো, এখনো মরি নাই আইজ্ঞা। তবে বেশি দেরি নাই বোধ হয়। আজ একমাস বাহ্যি-পিসাব বিছানায়। আর সহ্য হচ্ছে নাই। এবার খোদা টেনে নিলেই হয়।

নগেনের কথা শুনতে শুনতে সারা গাঁযের মানুষ স্তব্ধ হযে যায়।

নগেন তুঙ বলে, দোলা বানাতে বলে আঁইছি। পুকুরটায় ডুব দিয়ে দু'দানা মুখে দিয়ে দোলায় চড়িয়ে রহিম শেখকে হাসপাতালে লিয়ে যেতে হবেক।

বলতে বলতে বাড়ির দিকে পা বাড়ায নগেন।

সনাতন মল্লিক একটুক্ষণ থামে। তাব সারা মুখে তখন ফুটে উঠেছে রাত্রি উজাগরের ক্লান্তির পাশাপাশি রাতভর উৎকন্ঠাব অবসানের তৃপ্তি।

সনাতনের কথা শেষ হলে পরে শুধোই, এরপর আপনারা কী করলেন ?

কিন্তু সনাতন নয, আমার প্রশ্নের জবাব ভেসে আসে রতন পালের দিক থেকে। রতন মুচকি হেসে বলে, কী আবার করবে ? গোবিন্দ নামহাতাকে ধরে এনে গাঁ'র মানুষ দশ হাজার টাকা জরিমানা করলেক। আব, পরের তিন মাস ধরে সারা গাঁয়ের মানুষ কব্জি ডুবিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ খাইল্যাক।

—ঠাকুরের প্রসাদ ? তিনমাস ধরে ? আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি রতন পালের দিকে।

—বুঝলেন নাই কথাটা ? রতন পালের দু'চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। বলে, সে রাতে তো গাঁয়ের সব মেয়া এলাকার সব ঠাকুরের থানে মানসিক করে ফেলেছে, কিনা, বিপদ কেটে গেলে পূজা দিবেক। সেইসব মানসিক শোধ চলবেক অন্তত তিন মাস।

—থামবি তুয়ারা ? নাতিতুল্য ছোকরাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায় সনাতন মল্লিক। পরমুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, নগেনরা চলে যাবার পর আমরা কী করলাম জানেন ? আচ্ছা করে লিজেদের নাক মললাম, কান মললাম ..., মুকুন্দ ডাক্তার অবধি সক্কলের তখন নাকে খত দিবার জোগাড়।

—নাকে খত দিলেন ? আমি তো শুনে হতচকিত। বলি, কেন ?

সনাতন মল্লিক বলে, এটা আর বুঝলেন নাই আইজ্ঞা ? একটিবার ভাবেন দেখি, গোবিন্দ নামহাতা যে পাক্কা গুলিখোর, এটা ফুলঘরা গাঁয়ের কে না জানে ! সে ব্যাটা

গুলির ঘোরে কী না কী বলে গেল, তার কথাটা বিশ্বাস করে সারা গাঁ'র মানুষ ... সারা রাত ধরে ... ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। শালার কথাটা তলিয়ে দেখাটা নিতান্তই উচিৎ ছিল আমাদের।

বলতে বলতে লজ্জায় বুঝি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় সনাতন মল্লিক।

বলি, ঠিকই বলেছেন। এক গাঁ মানুষ ... কারোরই বারেকেই তরে মনে হলো না ...।

—তারপর শুনুন না আইজ্ঞা। সনাতন মল্লিকের গলায় অস্থিরতাজনিত বিরক্তি ফুটে ওঠে। বলে, নিজেদের মুর্খামির জন্য নিজেদের গালে চড় খেয়ে চলেছি সমানে, ... হেনকালে ঘটলেক এক জব্বর কাণ্ড ...।

বলতে বলতে কোঁচকানো চামড়ার আড়াল থেকে বুঝি ঠিকরে বেরোতে চায় সনাতন মল্লিকের চোখদুটো। বলে, জগন্নাথ শিকারির ভিটার পুবদিকের পুরোটা ছিল বাঁশঝাড়ে ভর্তি। ঐ বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে সহসা মুখ দেখালেন তিনি।

—কে ? কে ? ও দাদু, কে মুখ দেখালেক ?

—উহ্, পাগল কইরে মারলেক। অরে সবুর ধর, বলছি। তো বাবুমশয়, হেনকালে তিনি বাঁশঝাড়ের আড়াল যেই না মুখ দেখালেন, সারা গাঁয়ের মানুষের বুখা-শুখা মুখ চক্ষের পলকে ঘুরে গেল উঁয়ার দিকে। উহ্, কী উঁয়ার রূপ ! কী উঁয়ার দেহ জুড়ে কাঁচা সোনার বর্ণ ! নিমেষের মধ্যে পুব আকাশটা যেন আলোয় আলোময় হইয়েঁ গেল !

বলতে বলতে আবেশে ভারী হয়ে আসে সনাতন মল্লিকের চোখ দুটি। ভরাট গলায় বলে, জীবনে সুয্যি উঠা তো কম দেখি নি আইজ্ঞা, তবে ঐরাতের ভোরে যে সুয্যিটা দেখেছিলাম জগন্নাথ শিকারির ভিটার পুবদিকে, বাঁশঝাড়টার আড়ালে, অমন রূপমান সুয্যি বাপের জন্মে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি আমরা, ফুলঘরার মানুষেরা।

আলো

গলির মুখে অনিমেষের মনটা আজও বিষিয়ে উঠলো।

সারা পাড়া অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। পাশ দিয়ে ভূতের মতো যাতায়াত করছে লোকজন। অশরীরী ছায়ার দল হাঁটছে যেন। দুধারের ঘরগুলোর থেকে লন্ঠনের আলোর দু-এক চিলতে ছিটকে এসে পড়েছে রাস্তায়। কোথাও রাস্তার ওপর গরাদশুদ্ধু জানালার ছায়া। রাস্তাময় শুয়েশুয়ে কাঁপছে সারবন্দী গরাদ। গরাদের ছায়াগুলোর পাশ কাটিয়ে অনিমেষ এক সময় ঘরের দরজায় পৌঁছলো। সদর দরজা সর্বদাই বন্ধ থাকে। সুতপার ভীষণ ভয়ডরের বাতিক। অনিমেষ অফিসে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার খিল তুলে দেয়। সারাদিন আর খোলে না। অফিস ফেরতা অনিমেষকে তাই প্রায়দিনই হাঁকডাক করে পাড়া জাগিয়ে দরজা খোলাতে হয়। ঐ সময়টা ভারী বিরক্তিকর।

সদর দরজায় ঝনঝনিয়ে কড়া নাড়লো অনিমেষ। এ-ঠ্যাং ও-ঠ্যাং বদলাবদলি করলো খানিক! মিনিট পাঁচেক বাদে টর্চের আলোটালো ফেলে অবশেষে দরজা খুললো সুতপা। অনিমেষকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ এলো তার। সুতপাকে পেছনে ফেলে অনিমেষ এগিয়ে গেলো শোবার ঘরে সটান। পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে সুতপা বললো, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

অনিমেষ গা করলো না। সারা শরীর ঘামে চপচপ করছে ওর। চটচটে লাগছে মুখখানা। গেঞ্জিটা পিঠের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। পায়ের তলা জ্বলছে। চোখেমুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে অনিমেষ শোবার ঘুরে ঢুকলো।

শোবার ঘরে গাঢ় অন্ধকার। কোথায় যে কী রয়েছে বোঝার উপায় নেই। বিরক্ত অনিমেষ বললো, আলোটালো জ্বালোনি কেন?

—জ্বালতে যাচ্ছিলুম, তুমি এলে।

টর্চ জ্বালিয়ে দেশলাইটা খুঁজতে লাগলো সুতপা। পেল না।

—তোমার পকেটে দেশলাই আছে?

এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ালো অনিমেষ। দেশলাইটা পকেটে নেই।

—রোজরোজ রান্নাঘরের দেশলাইগুলো কোথায় যায়? আমার পকেটের দেশলাইয়ের জন্য উঁচিয়ে থাক!

সুতপা কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে। তারপর ধীরপায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। অনিমেষ বিছানার ওপর বসে থাকে ভূতের মতো।

টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে টুলের ওপর বসিয়ে দেয় সুতপা। ম্লান আলো কাঁপতে থাকে দেওয়ালে। অনিমেষের ছায়াটা লম্বা হয়ে দেওয়াল বেয়ে সিলিং অবধি পৌঁছে যায়। সুতপা তোয়ালে এগিয়ে দেয় অনিমেষের দিকে।

জামাটা গা' থেকে খুলে অনিমেষ ছুঁড়ে দেয় আলনার দিকে। পাখির মতো উড়ে গিয়ে আলনায় বসে ওটা।

সুতপা বলে, আজ দুপুরে এক কাণ্ড হয়েছে, জান।

জুতোর ফিতে খুলছিল অনিমেষ। জ্বালা-ধরানো গলায় বলে ওঠে, এই দেশটা দিনদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সামান্য একটু আলো, তাও জ্বালাতে পারে না এরা!

—দিনের বেলায় তাও খানিক ছিল। সুতপা বলে, সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিভে গ্যাছে সব আলো।

গাড়োলগুলো বুঝি ভাবে, মানুষ বাদুড়ের জাত, অন্ধকারে চলাফেরা করতে পারে সচ্ছন্দে, ওদের যত অসুবিধে হয় দিনের বেলায়। সেই কারণেই বুঝি দিনে আলো দেয়, রাতে আঁধার করে রাখে। এত দুঃখের মধ্যেও ঐ ছড়ার পংক্তিগুলো এলোমেলো মনে পড়ে অনিমেষের। 'এক যে ছিল মজার দেশ, সব রকমের ভালো। রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে চাঁদের আলো ...।

মোজা-জুতো, ঘেমো গেঞ্জি দুহাতে বাগিয়ে সিঁড়িতলার দিকে এগোয় অনিমেষ। অন্ধকারের মধ্যে তার গলা থেকে ঝরে পড়ে ঝলকে ঝলকে ক্ষোভ আর বিদ্রূপ, শালা, এ দেশটাকে এক মজার দেশ বানিয়ে ছাড়লো এরা!

সিঁড়ির তলায় জুতো-মোজা রেখে, গেঞ্জিখানা নিয়ে কলতলায় চলে যায় অনিমেষ। সুতপা ততক্ষণে একটা 'ডিম লন্ঠন' ঝুলিয়ে দিয়ে গ্যাছে কলতলার দেয়ালে।

চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসাটা অনিমেষের অনেকদিনের অভ্যেস। ইদানিং তাও হওয়ার জো নেই। সুতপাকে নিয়ে রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আসা যেত, কিন্তু এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে কোথায় বেরোবে! সারাক্ষণ হাতড়ে হাতড়ে পথ হাঁটা, সে এক যন্ত্রণা। তার ওপর সুতপার ঐ ভয়ের বাতিকটা। অন্ধকারে ওটা বেড়ে যায়। কাজেই সারাক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে থাকবে সুতপা। অনিমেষকেও ভয় পাওয়াতে চাইবে। অনিমেষ ভয় না পেলে ক্ষেপে যাবে। ঐ তোমাদের দোষ, কিছুই গায়ে মাখতে চাও না। কতকিছু না ঘটছে আখছার! সবতাতেই গোঁয়ার্তুমি!

সাকুল্যে দেড়খানা ঘর নিয়ে অনিমেষদের বসবাস। সামনে একচিলতে রক। ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই। রকে গিয়ে বসা যেত হয়তো, কিন্তু রকে বসতে অনিমেষের একদম ভালো লাগে না। সামনের রাস্তা দিয়ে ছায়াছায়া লোকগুলো অবিরাম হাঁটাচলা করবে, দেখতে দেখতে গা সিরসির করে। তার ওপর মাতালের টলোমলো হেঁটে যাওয়া তো রয়েছেই। রয়েছে খেঁকি কুকুরের দৌরাত্ম্য। নিজেদের মধ্যে লাগাতার কামড়াকামড়ি। অন্ধকারের মধ্যে সেটা আরও বেড়ে যায়।

সুতপা রান্নাঘরে চলে গিয়েছে। ওখানে দম আটকানো গরমের মধ্যে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ তুলে কিছু রাঁধছে সে।

টেবিল-ল্যাম্পের ম্লান আলোয় অনিমেষ শুয়ে রইলো বিছানায়। তালপাতার পাখাটা খুব বিষম তালে দোলাতে লাগলো। বাঁ-হাত দিয়ে ঢেকে রাখলো দু-চোখ। রোজ রোজ এই সন্ধেটুকুর জন্য অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে অনিমেষ। সকালটা তো পড়ি-কি-মরি করে কাটে। ন-টার মধ্যেই রোজ বেরিয়ে পড়তে হয়। তারপর ছুটে-দৌড়ে, ট্রেন ধরে, বাসে ঝুলে, অফিসে পৌঁছয় আধমরা হয়ে। অফিসে হাজার-এক ঝামেলা। লাখো ঝক্কি। দিনভর একটা ঝড় বয়ে যায়। অফিস ছুটির পর আর এক প্রস্থ লড়াই। ঘরে ফেরার লড়াই। ক্রোধে, ক্লান্তিতে, বিরক্তি-বিবমিষায়, ঘামের দুর্গন্ধে, স্বার্থপরতায়, সে লড়াইযেব ময়দানটিও জমে ওঠে রোজ। সেখানেও অনিমেষের খোয়া যায় অনেকখানি দম। সন্ধেবেলায় একেবারে বেদম হয়ে ঘরে ফেরে সে।

সুতপাও ওই সন্ধেটুকুর জন্য দিনভর হাপিত্যেশ করে বসে থাকে। সারাটা দিন তারও একলাটি সময় কাটতে চায় না। শুযে-বসে, বইযের পাতা উলটিয়ে, সেলাই ফুঁড়ে, হাই তুলে কোনও গতিকে চারটে পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলেই, ব্যস। মনটা ফের খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ অনিমেষের ফেরার সময় হলো। নিঃসঙ্গতার ভূতটা পালাবে এবার। অনিমেষও জানে সেটা। কিন্তু রোজরোজ গলির মুখে এলেই মনটা সহসা তেতো হয়ে যায় তার। পুরো গলিটা যেন অন্ধকারে শুয়ে রয়েছে মরা সাপের মতো। আর ছায়া-ছায়া মানুষগুলো যেন পিঁপড়ের মতো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে মরা সাপের গায়ের ওপর। সন্ধের আঁধারে অনিমেষও মরা সাপের গা মাড়িয়ে ঘরে ফেরে রোজ। সারা শরীর জুড়ে গা গুলানি। সুতপা উচ্ছাসে ছলকে উঠতে গিয়েই ধাক্কা খায় দোরগোড়ায়। মানুষটার চোখ সাপের মতো ঠাণ্ডা! সে কী করেই বা জানবে মরা সাপের ছোঁয়া লেগেছে অনিমেষের গায়ে। সে ভাবে অন্য কথা। অন্যতর কথা সব।

ইদানিং গলির মুখটাতে ঢুকলেই মনটা বেমালুম পালটে যায়। কেমন ভয়-ভয় অস্বস্তি জেগে ওঠে মনে। ঘুটঘুটে অন্ধকার নামক জীবটা ছাড়া আরও কিছু যেন ভর করে রাস্তাটার ওপর। দুধারের বাড়ি থেকে জানালার গরাদ টপকানো ম্লান আলো রাস্তার গায়ে পড়ে।

চিকচিকিয়ে ওঠে সাপের গা। মরা সাপের ভাবনাটা মগজের মধ্যে ঠাঁই নেয়। বাসা বাঁধে।

লন্ঠনের মিটমিটে আলোর সামনে বসেছিল অনিমেষ। চোখ মুদে যান্ত্রিকভাবে হাওয়া খাচ্ছিল হাতপাখায়। হাতপাখার ছায়াটা দেয়ালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাতায়াত করছিল। অনিমেষের মনে পড়লো, সেই ছোট্ট বেলাকার এক ঘটনা। ওদের গাঁয়ের লাগোযা ছিল একটা ধু-ধু কাঁকুরে মাঠ। মাঝ বরাবর একটা বিশালাকৃতি মান্ধাতার আমলের বট গাছ। সেই বটগাছের বিশাল কোটরের মধ্যে থেকে একটা সাপকে বের করে আনবার চেষ্টা চলছিল। জীবন্ত অথবা মৃত। অনিমেষ অন্যদের সাথে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল দৃশ্যটা, উদোম গায়ে। অনিমেষের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল জয়া। বলেছিল, ও অনিমেষদা, ভয় করে।

দাউলি-বাঁশের ডগায় কেরোসিন ভেজানো ন্যাকড়া বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে বড়রা চেপে ধরছিল ঐ কোটরের মুখে। সাপটা তার লকলকে জিভসহ মুখখানা বের করছিল মাঝেমাঝে। পর মুহূর্তেই ঢুকিয়ে নিচ্ছিল কোটরের মধ্যে।

দাউদাউ জ্বলছিল আগুন। কিন্তু সাপটা বেরোচ্ছিল না মোটেই। অবশেষে বাধ্য হয়ে কোটরের মধ্যে পিচকিরি চালিয়ে কেরোসিন ছেটানো হলো। দাউলি-বাঁশের মশালটা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কোটরের মধ্যে। দাউদাউ জ্বলে উঠলো কোটরের আগুন। এবং খানিকবাদে কালোপানা বিশাল সাপটা ছিলাটানা তীরের মতো ছিটকে পড়েছিল প্রায় বিশ হাত দূরে। সারা শরীর ঝলসে গিয়েছিল। ড্রাগনের মুখের মতো জ্বলছিল কোটরটা। তিন দিন তিন রাত। গাঁয়ের লোকেরা অনেক কষ্টে নিভিয়েছিল। বাঁচিয়েছিল বিপন্ন বৃক্ষকে। অনিমেষ সেই ছেলেবেলায় গিলেছিল দৃশ্যটা। ঢেঁকুর উঠলে এখনো গা গুলিয়ে ওঠে তার।

ইদানিং গলির মুখটাতে এলেই একটা ঠাণ্ডামতোন কিছু বুক ঠেলে ওপরে উঠতে থাকে। সাপের শরীরের মতো ঠাণ্ডা সেই অনুভূতিটা গলার কাছাকাছি এসে মিলিয়ে যায়। জয়ার কথা মনে পড়ে সহসা। নরম তুলতুলে মেয়ে জয়া।

বিছানাটা ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ তোয়ালে দিয়ে গলা, ঘাড়, বুক, পিঠ ঘসতে লাগলো। মাঝখানে সুতপা কী কারণে যেন ঢুকেছিল ঘরে। শব্দ শুনেও তাকায় নি অনিমেষ। সারা মন জুড়ে একটা খিঁচিয়ে ওটা বিরক্তি। সারা ঘর যেন একটা তাতা কড়াই। ভাঁপিয়ে দিচ্ছে গা। মাথার চুলের গোড়ায় ঘাম আর ময়লা জমে থিকথিক করছে। অনিমেষ যেন আধমরা কোনও জন্তুর মতো ধুঁকছে।

রান্নাবান্না শেষ করে ঘরে এলো সুতপা। সারা শরীর ভিজে গ্যাছে ঘামে। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে শুধোলো, খেতে দেব তোমায়?

অনিমেষ কোনও জবাবই দিল না। সুতপা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘরের সামনে পিঁড়ি পেতে আসন করলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে রাস্তাটাকে দেখছিল অনিমেষ। সুতপা জলের গ্লাস এগিয়ে দিল। অন্যমনস্ক অনিমেষ জলটুকু খেয়ে ফেলল।

খালি গ্লাসটা হাতে নিয়ে সুতপা দাঁড়িয়ে রইলো অনিমেষের পাশটিতে।

অন্ধকারে চোখ বিঁধিয়ে বিড়বিড় করছিল অনিমেষ, এরা সব শুরু করেছে কী ... ?

এইভাবে ... দিনের পর দিন ... !

রাস্তার ওপারের বাড়ি থেকে গম্ভীর গলায় খবর পড়া চলছিল রেডিওয় ঃ প্রধান মন্ত্রী বলেছেন, সরকারি কর্মচারীদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ...।

রাবিশ! মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য করলো অনিমেষ ..., সারাদিন অফিসে সেদ্ধ ..., বাড়ি ফিরে সারা রাত সেদ্ধ। পরের দিন যে অফিসটাতে যেতে পারি, এই তোদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। আরও কাজ চাই!

বলতে বলতে সুতপার দিকে তাকালো অনিমেষ। অন্ধকারে তার প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই।

অনিমেষ যান্ত্রিক গলায় বললো, খেলে?

—এই খাবো। সুতপা অন্ধকারে স্বামীর দিকে দুচোখ মেলে ধরে, আজ দুপুরে কী হয়েছে জান ...।

অনিমেষের বুক জুড়ে তখনো পাক দিচ্ছিল ঐ ঠাণ্ডা অনুভূতিটা। বিরক্তি মাখানো

গলায় বললো, কত ঘটনাই তো ঘটছে রোজ, কত শুনবো? খেয়ে নাও, রাত হয়েছে। বলেই হাঁটা দিল শোবার ঘরে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনিমেষ এপাশ ওপাশ করছিল। মশারির মধ্যে যেন সেদ্ধ হচ্ছে গা। বুকের মধ্যে এক ধরনের আইঢাই করছে। পাশটিতে শুয়ে রয়েছে সুতপা। অন্ধকারের মধ্যে সুতপার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সুতপা। কেবল অনিমেষের চোখেই ঘুম আসছে না কিছুতেই।

অনেক রাতে, আচমকা ঘরের আলোটা জ্বলে উঠলো। ঝলমলিয়ে উঠলো সমস্ত ভুবন। মাথার ওপর বনবনিয়ে ঘুরতে লাগলো পাখা। গরম গুমোট বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে জানালা দিয়ে। অনিমেষের ঘামে ভেজা গা জুড়িয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

অনেকক্ষণ ধরে পাখার হাওয়ার আমেজটুকু সর্বাঙ্গে নিল অনিমেষ। মশারির টংয়ের দুলুনিটা নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ করতে লাগলো খানিকক্ষণ। ঘরের আসবাবগুলোকে দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অন্ধকার গলিটার আলোকিত রূপ নিয়ে অনেকক্ষণ কল্পনা করলো অনেক কিছু। এবং ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো তার বুকে, গলায়, পাক দিয়ে থাকা সাপটা কখন জানি পালিয়েছে।

পাশ ফিরে সুতপাকে দেখলো অনিমেষ। হাঁটুদুটো ভাঁজ করে অল্প কুঁজো হয়ে ঘুমোচ্ছে সুতপা। মাথার দু-একটা চুলের গুছি উড়ছে। কপালের ওপর জমে থাকা কয়েক বিন্দু ঘাম দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে পাখার হাওয়ায়। মুখখানা কেমন দুঃখী দুঃখী। ঘুমন্ত মানুষের মুখে বুঝি তার মনের ছাপ পড়ে। সুতপা এখন ঘুমিয়ে কাদা।

কিন্তু সেটাও ভুল। সুতপার গায়ে আলতো হাত ছোঁয়াতেই সেটা বুঝলো অনিমেষ। সুতপা চোখ মেলে তাকালো। অনিমেষের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো সে।

ঠোঁটের ডগায় একচিলতে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলো অনিমেষ।

সুতপা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। বাথরুমে ঢুকে মুখে, চোখে, ঘাড়ে গলায় জল ছেটালো। ঢকঢকিয়ে জল খেলো। অনিমেষকেও দিল। তারপর শুয়ে পড়লো বিছানায় এসে। অনিমেষ বোঝে, সারা সন্ধের হিমায়িত অভিমান, ক্ষোভ, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াতে চাইছে। অনিমেষ সুতপার পিঠে আলতো হাত রাখলো। আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগলো সুতপার চুলের মধ্যে। সুতপা নিরবে আদরটুকু খেলো।

—জানো ...। অনিমেষ বললো, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। ছাদে ওঠার জন্য একটা কাঠের সিঁড়ি বানিয়ে নোব। দিব্যি সন্ধেটা বসাটসা যাবে।

সুতপা নিঃশব্দে শুনছিল। বোবা পুতুল যেন।

অনিমেষ বলতে থাকে, দু-চারটে ফুলের গাছও করা যায় টবে। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া ...।

— একটা বেল ফুলের গাছ থাকবে না? সুতপার ঠোঁটদুটো অজান্তে নড়ে ওঠে।

— অবশ্যই থাকবে। অনিমেষ পাশ ফিরলো, কী যেন হয়েছিল দুপুর বেলায়?

— ও কিছু নয়।

— আহা, বলই না, শুনি।

— সামান্য ব্যাপাব। ওদেব বাডিব কাবলি বেডালটা ।

— কাবলি বেডাল। অনিমেষেব দু-চোখ বড হযে ওঠে, কী কবেছে ওটা?

— চলে এসেছিল আমাদেব বাডিতে।

— এ্যাঁ। বল কী? অনিমেষেব দুচোখ কপালে উঠে যায, আমাদেব বাডিতে? কাবলি বেডাল? কী আশ্চর্য। তাবপব কী হলো? বল, বল।

সুতপা পবিপূর্ণ চোখে তাকালো। খুঁটিযে লক্ষ কবতে লাগালো অনিমেষকে। সুতপাকে খুশি কববাব জন্যই এমন বাডতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না তো লোকটা? কিন্তু না। সত্যিই ওব চোখেমুখে এখন অপাব বিস্ময।

মধ্যবাতে এক ঝলক আলো এসে ওব চোখদুটোকে আমূল বদলে দিযেছে। ওব চোখেব আলোয এখন দুনিযাব অকিঞ্চিৎকব বস্তুটিও অসামান্য। মহার্ঘ।

অদিনের সিন্দুক

রাতের খাবারে পায়েস দেখে প্রিযব্রতর ঠোঁটখানা অলক্ষ্যে ভেঙে গেল। ভুরু সংগমের মাটি এবড়ো-খেবড়ো। শান্তার চোখ এড়াল না সেটা। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীর পাযে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

শান্তা জানে, প্রিয়ব্রত আজ পায়েস ছোঁবে না। কিন্তু কারণটা শান্তার জানা নেই। এই বারো বছরেও জানা গেল না। শান্তা যখন বিয়ের কনে'টি তখনই প্রিযব্রতর মা চিবুক ছুঁয়ে বলেছিলেন, 'শিবের মতন বর পেয়েছ মা। ওকে নিযে তোমার কোনও ঝক্কিই পোহাতে হবে না। মাঝে মাঝে দুধ-নারকেল দিয়ে পাযেস বানিয়ে দিও। শিব তোমার ওতেই বারোআনা বশ। পায়েসকে মায়ের অধিক ভালবাসে।

প্রিয়ব্রতও পরে বলেছিল কথাটা। পায়েস আমার কাছে এক অর্থে দর্শন। তাই, যখন মন ভীষণ ভাল থাকে, তখন পাযেস খেতে ইচ্ছে করে। আবার যখন তীব্র বিষাদে থাকি, তখনও পায়েস চায় মন।

কিন্তু আশ্চর্য! ঐ পায়েস খাওয়াতে গিয়েই বহুবার প্রিযব্রতর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে শান্তার। অনেক সাধ করে, সারা দুপুর না ঘুমিয়ে, হযত পাযেস রাধল শান্তা পরিপাটি করে। দুধ-নারকেল-চিনি-কিশমিশ-ছোট এলাচ ও কর্পূর দিযে। এবং তার সাথে, প্রিয়ব্রত বলে, দুনিয়ার তাবৎ অসাধারণ শিল্পসৃষ্টির পেছনে ব্যাকরণ বাদেও থাকে স্রষ্টার বুকের ভেতরের খানিকটা নরম মৃত্তিকা। প্রিযব্রত অফিস থেকে ফিরে এলে, শান্তা তার দিকে পায়েসের বাটি এগিয়ে দিল প্রগাঢ় মমতায়। কিন্তু পায়েস দেখামাত্রই ঠোঁট বেঁকে গেল প্রিয়ব্রতর। নাক ভুরু কুঁচকে উঠল। যেন তার সর্বাঙ্গ জুড়ে এক তীব্র বিবমিষা। অথচ প্রিয় বস্তু পেলে অমন সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করাব সঠিক কারণ আজ অবধি শান্তার বুদ্ধির অগম্য। অনেকবার অনেকভাবে প্রিয়ব্রতব অমন ভাবান্তরের কারণ বোঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে শান্তা। প্রিয়ব্রত কিছু কিছু কারণও দেখিয়েছে। কিন্তু ওর যুক্তিগুলো শান্তার মগজে ঠিক মতো ঢোকেনি। ইদানিং শান্তার বিশ্বাস হয়েছে, প্রিয়ব্রতর বুকের ভেতর একটা অচিন রাজ্য রয়েছে যা ওব একান্ত নিজস্ব। এবং এ যাবৎকাল শান্তার অনাবিষ্কৃত। অনাবিষ্কারের একটি অন্তর্দাহী যন্ত্রণা রয়েছে। আছে দুর্বোধ্যতাজনিত ভয়। সেই যন্ত্রণায ইদানীং পুড়তে থাকে শান্তা। সিঁটিয়ে থাকে ভয়ে। তার মধ্যে তিল-তিল করে জন্ম নিচ্ছে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা ও জেদ।

শান্তা ভ্রূকুটি করে তাকাল প্রিয়ব্রতর দিকে। আড়াল থেকে লক্ষ কবতে লাগল, প্রিয়ব্রত পাযেস ছোঁয় কিনা। একটা অসংগঠিত যুদ্ধ বহুকাল নিঃশব্দে চলেছে তার

বুকে। তাকে আজ সংগঠিত করতে চাইছে শান্তা। কেন জানি, অনেকদিন ধবে শান্তার মনে হচ্ছিল, যে কোনও কাবণেই হোক প্রিয়ব্রতর এক ধরনের বিতৃষ্ণা রয়েছে শান্তাকে নিয়ে। এক ধরনের অরুচি। মাঝেমাঝেই কাজেকর্মে সেটা প্রকট হয়ে পড়ে। শান্তার প্রতি মাঝে মাঝেই বড় বিবূপ আর নির্দয় হয়ে ওঠে প্রিয়ব্রত।

এই তো সেদিন। প্রিয়ব্রত নিজেই পছন্দ করে একখানা শাড়ি কিনে দিল শান্তার জন্মদিনে। শাড়িখানা পরতেই প্রিযব্রত একেবারে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু পরের রবিবার সিনেমা যাবার সময় যখন ঐ শাড়িখানা ফের পরল শান্তা, তখন প্রিয়ব্রত অন্য মানুষ। চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, 'রোজ রোজ এক শাড়ি পর কেন ? তোমার আর শাড়ি নেই ?

আহত শান্তা জবাব দিল 'এ-তো তোমারই দেওয়া সেই জন্মদিনের শাড়িটা।'

'রোজ রোজ তোমার জন্মদিন নয়।' প্রিয়ব্রতর গলার স্বর সম্পূর্ণ অচেনা লাগে শান্তার কানে। ঐ মুহূর্তে প্রিয়ব্রত যেন রক্তমাংসের নয়, খটখটে কাঠের মানুষ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সুন্দর গায় শান্তা। প্রিয়ব্রতও রবীন্দ্রসঙ্গীত ভীষণ ভালবাসে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথেব কযেকটি গান যেন তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মিশে গেছে। শান্তাকে দেখতে গিযে শুধু একটা কথাই শুধিয়েছিল প্রিয়ব্রত, 'গানটা গাইতে পারেন ?

শান্তা সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়েছিল গানটা। শুনতে শুনতে প্রিয়ব্রতর সারা মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি। সঙ্গে সঙ্গে বিযেতে মত দিয়েছিল সে। অথচ মাসখানেক আগে, যখন গানটা গুনগুনিয়ে গাইছিল শান্তা, আচমকা ভীষণ ক্ষেপে গেল প্রিযব্রত।

বলল, 'সারাক্ষণ ফাটা রেকর্ডের মত একই গান গাও কেন ? অন্য গান জান না ? মেয়েরা অ্যাতো স্টিরিও-টাইপ !'

প্রথম প্রথম ব্যাপারগুলোকে খামখেয়ালীপনা আর ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দিত শান্তা। কিন্তু মানুষের সহ্যেরও সীমা আছে। তার ওপর শান্তারও দিনকয়েক মনটা খুব খারাপ। তার কারণও প্রিয়ব্রত। সমুদ্র প্রিয়ব্রতর স্বপ্নের বস্তু। শান্তারও। সমুদ্রের তীরে যাবার কথায় দুজনেরই প্রাণ নেচে ওঠে তাই। সমুদ্রের কাছে পৌঁছলে মনের তাবৎ বিষাদ যেন ঝড়ো হাওয়ার মত উড়িয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্র মানুষকে অ্যাতো ভুলিযে দেবার মন্ত্র জানে ! অ্যাতো দুলিয়ে দিতে জানে। একটা বিষয়ে তাই প্রিয়ব্রত আর শান্তা স্থায়ীভাবে একমত। এই পৃথিবীতে কেবল সমুদ্রের কাছেই নতজানু হওয়া চলে। সুযোগ পেলেই তাই সমুদ্রের কাছে যাওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করে দুজনেই।

প্রিয়ব্রতর, সঠিক অর্থে, কোনও গৃহ নেই। ওপার বাংলা থেকে জনস্রোতের সাথে মিশে এককালে এদেশে এসেছিল বাবা মায়ের হাত ধরে। তারপর ভাড়া বাড়িতে তিল তিল এত দিন। বাবা মা গত হয়েছেন পরপর। এখনও প্রিয়ব্রত ভাড়া বাড়িরই বাসিন্দা। একখানা বাড়ি করা প্রয়োজন। কোথাও একটুখানি থিতু হওয়া। একটা স্থায়ী ঠিকানা চাই মানুষের। প্রিয়ব্রতর বুকের ভিতরের আর্তিটা শান্তার অজানা নেই। সেই নিয়ে তার খুশিরও শেষ নেই। নিজস্ব একখানা ছিমছাম বাড়ি, মেযেদেব স্বপ্নের ভেতরে, রক্তের মধ্যে থাকে। সেটা যদি পুরুষের স্বপ্নেও চারিয়ে যায়, তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছুই নেই। ইদানীং মাঝে মাঝেই বাড়ি বানানোর ব্যাপারটা

প্রিয়ব্রত ও শান্তার একটি অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ। শান্তা বলে, 'আমাদের যখন বিশেষ কোথাও শেকড় নেই, আমরা তবে আমাদের এক্কেবারে মনের মত জায়গায় বাড়ি বানাতে পারি'।

প্রিয়ব্রতরও দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই মনের মত জায়গাটি তো নির্বাচন করতে হবে। এই মুহূর্তে বাড়ি বানানো না গেলেও, একপ্লট জমি অন্তত কিনে ফেলতে হবে এক্ষুণি। মফস্বল শহরেও হু-হু করে দাম বাড়ছে জমির।

শান্তা বলে, 'এস, আমরা সমুদ্রের তীরে বাড়ি বানাই।

কথাটা প্রিয়ব্রতকে অল্প কাঁপিয়ে দেয়। সমুদ্রের তীরে বাড়ি! তার মানে, আজীবন, দিনরাত দন্ডেদন্ডে পলেপলে সমুদ্রের সাথে নিরঙ্কুশ বসবাস, সহবাস! নীরবতাটা ভাঙতে চায় না প্রিয়ব্রত। শান্তার কথার জবাবটা দেওয়া হয়ে ওঠে না সেই কারণেই।

. ইদানীং শান্তার ভাবনায় সিঁদেল চোরের মত নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে একটি বাড়ি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মুখোমুখি নিজের বাড়ি। শান্তা যাকে পায় তাকেই বলে, 'দিন না ভাই, সমুদ্রের ধারে এক চিলতে জমি যোগাড় করে। ছোট্ট একটুকরো জমি। দু-তিন কাঠা।

দিন তিনচার আগে, প্রিয়ব্রত অফিস থেকে ফিরতেই একেবারে গেটের কাছে ছুটে গেল শান্তা। উচ্ছ্বাসিত গলায় বলল, 'দারুণ খবর।'

'কি' ?

'মিল গয়া'।

প্রিয়ব্রত হকচকিয়ে যায়। শান্তা ধানবাদের মেয়ে। বেজায় খুশি হলে হিন্দি আওড়ায়।

'কি, হল কি? লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেলে নাকি?'

'তার চেয়েও বেশি।' শান্তা রঙের টেক্কা দিয়ে তুরুপ করার ভঙ্গিতে একখানা চিঠি সপাটে আছড়ে মারল প্রিয়ব্রতর হাতে। চিঠিখানা খুলে পড়ল প্রিয়ব্রত। শান্তার মামাতো দাদা বিকাশ লিখেছে। ওর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কিছু জমি বিক্রি আছে দীঘাতে। সমুদ্রের এক্কেবারে কাছে। বিকাশদা চারকাঠা জমি আগলে রেখেছে শান্তাদের জন্য। খুব তাড়াতাড়ি কলকাতা গিয়ে বায়না দিয়ে আসতে হবে। শান্তার চোখে মুখে অধৈর্য। বলল, 'চল, আজ রাতের ট্রেনেই চলে যাই।'

'ধুশ।' এক ফুৎকারে শান্তার প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল প্রিয়ব্রত, 'আজ রাতে কি করে যাব?'

'তবে কাল সকালের ট্রেনেই চল।'

'আর অফিস' ?

'কাল দিনটা ছুটি নাও।'

'তা হয় না। কাল কতকগুলো জরুরী কাজ আছে।'

শান্তা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে 'এর চেয়েও জরুরী কাজ আর কিছু হতে পারে?'

প্রিয়ব্রত জবাব দেয় না। নিঃশব্দে জুতোর ফিতে খুলতে থাকে।

সারা সন্ধে প্রিয়ব্রতকে একতিল রেহাই দেয় নি শান্তা। উঠতে বসতে অবিশ্রাম জেরা। অনুযোগ। উপযোগ । অবশেষে নির্বাক যুদ্ধ ঘোষণা।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে আধো অন্ধকারে মনের কথা খুলে বলল প্রিয়ব্রত, 'দীঘায় বাড়ি বানানোর আদৌ ইচ্ছে নেই আমার।'

সে কি! নিজের কানকেও বিশ্বাস হয় না বুঝি শান্তার, 'কোথায় তবে বাড়ি বানাতে চাও তুমি?'

'অন্য কোথাও। সমুদ্রের ধারে ছাড়া অন্য যে কোনও জায়গায়।'

বিভ্রান্ত শান্তা একসময় ক্ষোভে ফেটে পড়ে, 'যা খুশি কর তুমি। তোমার মতিগতি কিছুই বুঝিনে। তুমি যে কী চাও কী বোঝ—। আমার আর একদম ভাল লাগছে না।'

একসময় নিজের সিদ্ধান্তের গায়ে এক পলেস্তারা জেদ চাপিয়ে শান্তা বলে, 'শোন আমি তোমায় সাফ বলে দিচ্ছি। হয় দীঘায়, নয় কোথাও নয়।'

শান্তার ভেতরের আগুনটার আঁচ প্রিয়ব্রতর কাছে পৌঁছে যায়। তার দুচোখে নেমে আসে সীমাহীন বিষাদ। শুধু অসহায় চোখে শান্তার দিকে চেয়ে থাকে সে। কথা বলে না।

সেই থেকে এক ঠাণ্ডা লড়াই এ কদিন চলছিল।

ধীরে ধীরে অবশ্য রাগটা পাতলা হয়ে এসেছে শান্তার মনে। অভিমানের ফিনফিনে নরম উড়োনিটাও উড়ে গেছে। আহা, মানুষটা তো ভাল। শান্তাকে ভালবাসেও পাগলের মত। শুধু ঐ মাঝে মাঝে কি এক রহস্যময় কারণে, কিছু কিছু বিপরীত আচরণ করে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেয়।

হঠাৎ আজ ইচ্ছে হল শান্তার, পায়েস খাওয়াবে প্রিয়ব্রতকে। আসলে উত্তপ্ত আকাশে মেঘ জমতেই ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে মনে। শান্তা এখন মনে মনে সন্ধি চায়। শ্বেত পতাকার বদলে একবাটি দুধের পায়েস। প্রিয়ব্রতর কাছে যা কিনা মায়ের মতন। সারা দুপুর বহু মেহনত করে তাই পায়েস বানিয়েছে শান্তা। কিন্তু পায়েস দেখামাত্রই প্রিয়ব্রতর যে এমন প্রতিক্রিয়া হবে সেটা কল্পনায়ও আসেনি শান্তার।

রান্নাঘরের দরজায় গা' এলিয়ে তীক্ষ্ম চোখে প্রিয়ব্রতর খাওয়া দেখছিল শান্তা।

প্রিয়ব্রত পায়েসের দিকে তাকাচ্ছেই না। দেখতে দেখতে একতাল কান্না মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল শান্তার বুক ঠেলে।

ঢকঢক করে গ্লাসের জলটুকু শেষ করল প্রিয়ব্রত। শান্তা যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল।

বলল, 'পায়েসটা খেলে না যে?

'খেতে ইচ্ছে করছে না'। খুবই ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল প্রিয়ব্রত।

'পায়েস খেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?' শান্তার দুচোখ জ্বলে উঠল।

প্রিয়ব্রত যেন এতক্ষণ আপ্রাণ প্রয়াসে শান্ত রেখেছিল নিজেকে। অকস্মাৎ নিজের ওপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল সে।

'না, করছে না।' বলেই আচমকা পায়েসের বাটিটাকে এক ঝটকায় ফেলে দিল। মেঝের ওপর ঝনঝন আওয়াজ তুলে থেমে গেল বাটিটা। পায়েসগুলো সাদা জুঁইফুলের মত ছড়িয়ে পড়ল মেঝেময়। শান্তা সে দৃশ্য দেখতে পারল না। দু-হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়ে গেল প্রিয়ব্রতর সামনে থেকে।

ছড়ানো জুঁইগুলোর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল প্রিয়ব্রত। পাথর হয়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে প্রিয়ব্রতর শরীরে মৃদু কম্পন উঠল। তার বিষাদের আকাশে মেঘ জমল। ভেজা হাওয়া বইল। দু-চোখ টলোমলো জলে ভরে গেল। সাদা জুঁইয়ের মতো পায়েসগুলো ছড়িয়ে রয়েছে মেঝের ওপর। প্রিয়ব্রত তাদের সুমুখে নতজানু হয়ে বসল। হাত দিয়ে পরম মমতায় কুড়োতে লাগল ফুল।

পায়েস ভরা বাটিখানা খাওয়ার টেবিলে রেখে ঠাণ্ডা জলে হাত ধুলো প্রিয়ব্রত। তারপর পায়ে পায়ে এল শোবার ঘরে। কাঠকাঠ উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল শান্তা। ঘরের বাতি জ্বলছিল না। বাইরের থেকে একচিলতে আলো এসে পড়েছিল ওর উন্মুক্ত পিঠের ওপর। পাশটিতে দাঁড়িয়ে শান্তাকে অনেকক্ষণ দেখল প্রিয়ব্রত। একসময় আলতো হাতে ছুঁলো তার পিঠ। মৃদু কম্পন উঠল শান্তার সারা শরীরে। শান্তার পাশটিতে বসল প্রিয়ব্রত। পরম স্নেহে ওর পিঠে হাত বুলোতে লাগল নীরবে।

আত্মস্থ গলায় বলল, 'রোজ রোজ আমায় পায়েস খাইও না শান্তা। জন্মদিনের শাড়িও রোজ রোজ পরো না। সমুদ্রের ধারে চিরকালের ঘর বানানোর স্বপ্নও দেখো না।'

একটুক্ষণের জন্য থামল প্রিয়ব্রত। তারপর গলাখানিকে খুব খাদে নামিয়ে বলল, 'জীবন থেকে প্রিয়তম বস্তুগুলি হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। দু-একটা প্রিয়তম খাদ্য, পরিচ্ছদ, গান এবং জায়গা থাক না স্বপ্নের মধ্যে। ওগুলোর জন্য কিছু অতৃপ্তি বয়ে বেড়াই না হয়। সব কিছু মুঠোর মধ্যে এনে আটপৌরে করে দিলে, আমরা আর কিসের টানে বেঁচে থাকব বল?

নীলার অসুখ

১.

ভাঁজ করা রুমালটা অনিন্দ্যর হাতে গুঁজে দিতে দিতে নীলা বললো, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি ফেরো।' 'একটু বাজারে যাবো ভাবছি।'

অনিন্দ্যর দু'ভুরুর মাঝখানের ভূমি উঁচু-নিচু হলো।

গন্ধ মাখানো রুমালখানা একবার নাকে ঠেকিয়ে অনিন্দ্য বললো, 'দেখি'।

'দেখি কি? নীলা অধৈর্য হয়, 'বাজার সাতটার সময় বন্ধ হয়ে যায়।'

'অফিসে কতকগুলো জরুরি কাজ রয়েছে আজ।' অনিন্দ্য বিড়বিড়িয়ে বলে, 'বড় সাহেব কাল দিল্লি যাবেন। তার ফাইল-টাইল তৈরি ... ...।'

'কি যে খালি কাজ-কাজ করো রোজ!' মাঝপথে অনিন্দ্যকে থামিয়ে দিল নীলা, 'সবাই তো চাকরি করছে। দেখছি তো। চাকরি করছে, বাজারে যাচ্ছে, প্রমোশনও পাচ্ছে। তোমার মতো গাধার খাটনি খাটে না কেউ।'

বেরোবার মুখে কুটকচাল ভালো লাগে না অনিন্দ্যর। মনটা তেতো হয়ে যায় তাতে। সারাদিন সেই তেতো ভাবটা যায় না। অফিসে এর-ওর ওপর সেটা প্রকাশ পায়। কারণে অকারণে। অনিন্দ্যর ভারি ক্ষতি হয় তাতে। নীলাকে এসব বোঝানো যায় না। কথায় কথা বাড়ে। গোমড়া মুখে নীলা বলতে পারে, আমার সঙ্গে কথা বলতেই তো তেতো লাগছে তোমার!

নীলার কথার জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এলো অনিন্দ্য। পথে নাবলো। ওদের গলিটা খানিকটা সোজা গিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে একটা কর্পোরেশন কল সর্বদাই জল উগরে চলেছে। আমানির মতো ঘোলা জল। তার পাশেই একটা কালো কুচকুচে বিশাল ষাঁড় শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণ কী চিবিয়ে যায়। ষাঁড়টার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আজও সেই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করলো অনিন্দ্য। ষাঁড়ের জাবরকাটা ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। তার মনস্তত্ত্বও বেশ জটিল। পেটের খাবার তুলে এনে মুখের বাইরে ফেললে, তাতে পা ছোঁওয়াতেও ঘেন্না। কিন্তু মুখের মধ্যে থাকাকালীন তাবই কত স্বাদ! চিবিয়ে যেন আশ মেটে না। নিজেব অর্ধ-জীর্ণ খাবারের প্রতি এতো লোভ আর মমতা জড়ো হয় কী করে?

ডাইনের বাঁকটা ঘুরতেই সাগরের কাঁসা-পেতলের দোকান। ঝকঝকে বাসনপত্তর থরে থরে সাজানো। বহুদূর থেকে নজরে আসে। দোকানটার দিকে না তাকিয়েও অনিন্দ্য বুঝতে পারে, সাগর এখন সোনাব চেন গলায় ঝুলিয়ে খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত।

নীলাকে নিয়ে একদিন সাগরের দোকানে উঠেছিল অনিন্দ্য। বন্ধুর বউয়ের দিকে তাকিয়ে তার সাধ-আহ্লাদের বাখান শুনেছিল সাগর, অন্য খদ্দের ফেলে। মনের মতো একটা ডেকচি মোটামুটি কম দামে দিয়েছিল নীলাকে।

ফেরবার পথে কেমন গম্ভীর লাগছিল নীলাকে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় শুধিয়েছিল, 'ও তোমার কেমন বন্ধু?'

'এক সাথে পড়তাম স্কুলে।' অনিন্দ্য হাতের সিগারেটটা ক্যারামের ঘুঁটি মারার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিয়েছিল নর্দমার দিকে। 'রোজ ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকতো বেঞ্চের ওপর।'

'গলার চেনটা কি সোনার?'

'সোনার তো বটেই।' বলেই অনিন্দ্য চমকে উঠলো নিজের মনে। নীলার চোখে লোভ যেন জ্বলছে! মেয়েদের লোভ দেখলেই নেভানোর চেষ্টা করা উচিত। অনিন্দ্য আলগা গলায় বললো, 'ঐ টাকাই করেছে। লাইফ নেই।'

নীলা অন্যমনস্ক ছিল। মৃদু গলায় বললো, 'অত টাকা থাকলে আর লাইফের দরকার হয় না! দেদার আয় করছে। দু'হাতে ওড়াচ্ছে। ঐ তো লাইফ।'

অনিন্দ্য উত্তর দেয় না। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। নিজেকে তিরস্কার করে হাজারবার। অ্যাতো দোকান থাকতে সাগরের দোকানে কেন যে উঠলো সে!

পরিবেশটা থমথমে হয়ে উঠেছিল। কুয়াশা ঢাকা সকালের মতো ভারি ভারি। একটু হালকা রসিকতা করে কুয়াশাটুকু সরিয়ে দিতে চাইলো অনিন্দ্য। বললো, বলো না, চাকরি ছেড়ে একটা ব্যবসা-ফ্যাবসায় নেবে পড়ি।'

নীলা স্থির চোখে চাইলো অনিন্দ্যর দিকে। তারপর অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

'কী ভাবছো? পারবো না?' অনিন্দ্য কাঁধ ঝাঁকালো।

'পারবে না কেন?' একঝলক বিদ্রূপ ঠান্ডা গলায় উগরে দিল নীলা, 'তুমি আর কবে কোন্‌টা না পারো?'

অনিন্দ্য চুপসে গেল ভিজে খইয়ের মতো। পরমুহূর্তে একটা অন্ধ রাগ, নিষ্ফল অভিমান তাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরলো দম আটকানো ধোঁওয়ার মতো।

নীলা বুঝি এখন একা হলেই টাকার স্বপ্ন দেখে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার স্বপ্ন।

অফিস থেকে ফিরে অনিন্দ্য এখনো মাঝে মাঝে বই নিয়ে বসে। ওর প্রিয় কবি জীবনানন্দের মুখোমুখি হয়। প্রাকযৌবনের কিছু কাঁচা লেখা নিয়ে ছেলেমানুষী নাড়াচাড়া করে একা একা। কখনো বসে 'বলাকা' নিয়ে পড়তে পড়তে বুঁদ হয়ে যায়। শব্দগুলো হাজার হাজার বজ্রকীট হয়ে মগজের মধ্যে অবিরাম কাটতে থাকে শালগ্রাম শিলা। অস্থির চেতনার মধ্যে অবিরাম ঘোড়ার খুরের শব্দগুলো ক্রমশ ঘুমিয়ে পড়তে থাকে। ঠিক তখনি নীলা এসে উসখুস করতে থাকে ধারে কাছে। এটা নাড়ে' ওটা সরায়। শাড়ির খসখস আওয়াজ তুলে হেঁটে বেড়ায়। তাতেও অনিন্দ্যের ধ্যান না ভাঙলে, পাশটিতে এসে দাঁড়ায়। ঘন হয়।

বলে, 'হ্যাঁ গো, রতনদাদের রঙিন টিভি-টা কী সুন্দর! আবার রিমোট কন্ট্রোল। বাঁশি-বউদি বিছানায় বসে বসে টিভি খোলে বন্ধ করে, চ্যানেল পালটায়।'

অনিন্দ্য মুখ তুলে তাকায়। বহু কষ্টে গিলে ফেলে উথলানো দুধের মতো রাগটা। বলে, 'কে বললো?'

'আমি দেখে এলাম পরশুদিন। নিজের চোখে।' পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পালটালো নীলা, 'বাঁশি-বৌদির দাদা তো আমেরিকা চললো। বউকেও নিয়ে যাচ্ছে।'

অনিন্দ্য যেন কিসের আভাস পাচ্ছে। একটা অস্পষ্ট ভয় যেন গুড়গুড়িয়ে উঠছে মনের মধ্যে।

আলতো হাই তুললো নীলা। ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানটার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'ওসব ওদেরই সাজে। এ আর আমাদের কম্মো নয়।'

এইসব মুহূর্তে অনিন্দ্যর নিজেকে কেমন অসহায় লাগে। নীলাকে প্রতিপক্ষ মনে হয়। নীলার সঙ্গে একটা উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন। অনিন্দ্যর তিতিবিরক্ত মনটা চেঁচিয়ে ফাটিয়ে একশা করতে চায়। বই পড়া মাথায় ওঠে। অনিন্দ্য মাথার জ্বলুনি থামিয়ে নীলাকে বোঝাতে চায়, বাঁশিরা কি করে টাকা রোজগার করে, জানো?

'ওকথা সবাই বলে।' নীলা ঠোঁট ওলটায়, 'কেউ টাকা করলে পাড়াপড়শীর অমন চোখ টাটায়।'

অনিন্দ্য কাতর চোখে তাকায়। একটা অসহায় অনুভূতি ঘুসঘুসে জ্বরেব মতো ছেয়ে ফেলে ওর সারা শরীর। আসলে, নীলার মনখানা ভারি হালকা। অল্প হাওযায় ভারি দোলে। কিংবা পুকুরের জলের মতো। আকাশের রঙের সঙ্গে ঘন ঘন রঙ বদলায়।

অধিকাংশ মেয়েই বুঝি এমনিতরো। সুখ চাইতে গিয়ে নিজের অজান্তে অসুখ বাধিয়ে বসে।

২.

অফিসের প্রশান্তকে কোনদিন দেখতে পারে না নীলা। প্রশান্ত কিন্তু ওটাকে পাওাই দেয় না। অনিন্দ্যর ড্রইং রুমের বেতের সোফায় পা তুলে বসে সে একটানা বকে যায়। বড় সাহেবের নেক নজরে রয়েছে প্রশান্ত। সেই সুবাদে হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ায় অফিসের কাজে। ফিরে এসে নীলার ড্রইং রুমে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সেই গল্প ফেনাতে থাকে জুৎ করে। অনিন্দ্য সেসব কথায় উচ্চবাচ্য করে না। বড় অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সে। নীলার মুখের দিকে তাকাতে সাহস হয় না। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে প্রশান্তর কথাবার্তা শুনতে থাকে নীলা। শুনতে শুনতে ওর হাসি মুখ ধীরে ধীরে হিংস্র হতে থাকে। তখন কত ভাবেই যে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে অনিন্দ্য। কিন্তু প্রশান্ত শুনলে তো!

ও চলে যাবার সাথে সাথেই একেবারে জ্বলে ওঠে নীলা, 'এই মাকাল-ফলটিকে অতো পাত্তা দেবার কি আছে, বুঝিনে। অফিসে আর লোক নেই? তোমাদের বড়সাহেব লোক বেছেছেন ভালো।'

অনিন্দ্য সেকথার জবাব দেয় না।

ফস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে একসময় রান্নাঘরে চলে যায় নীলা।

ইদানিং মাঝে মাঝেই এমন ফস ক্য়র নিঃশ্বাস ফেলে নীলা। অনিন্দ্য ব্যাপারটা

খেয়াল করে মাস খানেক আগে। এসপ্ল্যানেডের কাছাকাছি হাঁটছিল দুজনে। হঠাৎ নীলা ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'দ্যাখো, দ্যাখো। তোমাদের প্রশান্ত।'

বড়সাহেবের নীল গাড়িটাতে বসেছিল প্রশান্ত। গাড়িতে আর কেউ ছিল না। অনিন্দ্য ব্যাপারটাকে আমল দিতে চাইলো না। আজকের বিকেলটা বেশ ফুরফুরে। হাওয়া, মন, নীলা, সবাই বেশ হালকা।

'ছুটির দিনে কোথায় চলেছে কে জানে!' নীল গাড়িটার দিকে তাকিয়ে যেন দুয়ো দিলো অনিন্দ্য, 'শালার লাইফ বলে কিছুই নেই।'

নীলা সহসা জবাব দিল না। মুখখানা ধীরে ধীরে থমথমে ভারি হয়ে এলো ওর। কয়েক পা এগিয়ে ঠান্ডা গলায় বললো, 'চাকরি করা একটা আর্ট, বুঝলে। সবাই পারে না।'

অনিন্দ্য মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো। নীলাব সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়ে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলো উল্টেদিকে। আকাশের অনেক উঁচুতে, একটা ঢাউস রকেট -বেলুনের দিকে।

সেবার বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় গিয়ে একখানা পাথরের পেঁচা কিনলো নীলা! যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। আনতে গিয়ে রাস্তায় একটা ডানা ভেঙে দু'টুকরো। কি মন খারাপ নীলার। অনিন্দ্য যত বলে, 'ফেভিকল' দিয়ে সুন্দর জুড়ে দেওয়া যাবে ওকে, নীলা তত অবুঝ হয়। অনিন্দ্য রসিকতা করে বলে, 'তুমি বুঝছো না নীলু, এ'তো ভালোই হলো। লক্ষ্মীর ঝাঁপির পাশে রেখে দাও, ঐ ডানা-ভাঙা বাহনকে। ডানা ভাঙা নিয়ে উড়েতেই পারবে না প্যাঁচা বাবাজি। মা-লক্ষ্মী তোমার ঘরে বইলেন অচঞ্চলা। বেটির আর নড়বার জো রইলো না।'

অনিন্দ্য যত হাসে নীলা তত রেগে যায়। শেষে ঐ ডানাটা বন্ধুকে দিয়ে বদলে এনেছে শুশুনিয়া থেকে। নীলার শান্তি হয়েছে মনে।

৩.

হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালো অনিন্দ্য। অফিস টাইমের বাস। গোগ্রাসে মানুষ গিলতে গিলতে একেবারে গলা অবধি হয়ে এসে দাঁড়ায়। অনেকদূর থেকে চুম্বকের মতো মানুষকে টানে। ওঠানামার ভিড়ে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। অনিন্দ্য দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। একের পর এক বাস অনিন্দ্যকে টা-টা করে চলে যায়।

এইভাবে, বাসস্টান্ড ফাঁকা হলো। আবার ভরে গেল। বার কয়েক। অস্বস্তিতে ভরে আসছিল অনিন্দ্যর বুক। বেলা যে বেড়ে যায়! সবাই যে ওর আগে আগে চলে যায় গন্তব্যস্থলে।

নীলা বলে, 'তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। সব্বাই তোমায় ওভারটেক করে বেরিয়ে যাবে!'

নীলার কথাগুলো বহুদিন ধরে সংক্রামিত হয়েছে অনিন্দ্যর বুকে। সেও যেন বিশ্বাস করছে ধীরে ধীরে। সবার সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে সে পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশ। আজকাল যেন মনে হয় সবাই ওর থেকে হিসেবি, করিতকর্মা। সবাই ওকে পেছনে

ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। জয় করে নিচ্ছে অর্থ-বৈভব-সুখ' আরাম এবং রমণীর উষ্ণ প্রেম। নীলার সামনে সাবলীল হতে দ্বিধা হয়। হেসে উঠতে সংকোচ জাগে। ওর সামনে কারুর প্রশংসা করতে ভয় হয়। যদি নীলার দু'চোখে জমাট বেঁধে ওঠে বিদ্রুপ আর হতাশা! যদি আলতো হাই তুলে নীলা বলে ওঠে, 'ওদের কথা শুনে কী লাভ? ওরা সব কপাল করে এসেছে।'

শুভ খবরটা নিয়ে দিন কয়েক আগে বাড়ি ফিরেছিল অনিন্দ্য। নীলার সামনে এমন উজ্জ্বল মুখ নিয়ে বহুদিন আসেনি সে।

'সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিও।' অনিন্দ্য অকারণে ভারিক্কি হবার চেষ্টা করে, 'দিল্লি যেতে হচ্ছে পরশু।'

নীলা তেরচা চোখে তাকায়, 'হঠাৎ?'

'জরুরি কাজ পড়েছে একটা।' অনিন্দ্য ভারিক্কি ভাবটি বজায় রাখে, 'বড়সাহেব বললেন, 'অনিন্দ্য, তোমাকে ছাড়া এ কাজ হবে না।'

নীলা এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অনিন্দ্যর দিকে। চোখের মধ্যে ভাসছিল কত কিছুর ছায়া।

মাথার চুলগুলো অকারণে নাড়াচাড়া করতে করতে অনিন্দ্য খানিকটা প্রগল্‌ভ হলো, 'প্রশান্তর ভারি ইচ্ছে ছিল, ট্রিপটা মারবার।' অনিন্দ্যর দু'চোখে উথলে পড়ে চালাক চালাক হাসি।

'একাই যাচ্ছো?' ঠান্ডা গলায় নীলা শুধোলো।

"একা-একা মানে — বড়সাহেবের ছেলেটাও সঙ্গে যাবে। বড়সাহেবের শালী থাকে তো দিল্লিতে।'

'তাই বলো।' নীলা নিরাসক্ত গলায় বললো, 'বড়সাহেবর ছেলেকে মাসির বাড়ি পৌঁছতে যাচ্ছ।'

অনিন্দ্যর পিঠে যেন সপাং করে আছড়ে পড়লো নীলার কথাগুলো। সহসা নিজেকে বধ্যভূমির পশুর মতো অসহায় লাগলো তার।

অবশেষে একটা বাসে *ঠেলেঠুলে* উঠে পড়লো অনিন্দ্য। এইভাবে *ঠেলেঠুলে* ওঠার চেষ্টা করলে, অনেক আগের বাসেই যেতে পারতো সে। আসলে, নীলা বোধ করি ঠিকই বলে। এক চিলতে সাহস। *ঠেলেঠুলে* এগিয়ে যাবার। বুকের মধ্যেই থাকে। পুকুরের তলায় যেমন মাছ থাকে। টোপ গেঁথে, বঁড়শি ফেলে, তুলতে হয়, জলের তলার অদৃশ্যচারীকে।

সেদিন সার্কাস দেখে ফেরার পথে মৃদু ধমক দিল নীলা। 'বড়সাহেবের বাচ্চাটাকে অমন কোলের দিকে টানছিলে কেন? কি ভাবছিল বলতো চারপাশের লোকজন?'

'বাচ্চা তো।' অনিন্দ্যর দু'চোখে স্নেহ উথলে ওঠে, 'বড্ড ভালোবাসে আমায়। ভীষণ লাইক করে।'

নীলার দু'চোখে আগুন ঠিকরে পড়ে, 'আদিখ্যেতা!'

অনিন্দ্য বিচলিত বোধ করে। নীলার সঙ্গে চোখাচোখি করতে ভয় হয়। নীলার অদ্ভুত চাউনিটা হজম করতে সময় লাগে।

'আজও তুমি অফিস ফেরতা বড়সাহেবের বাড়ি যাবে নাকি?' নীলা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে শুধিয়েছিল গতকাল।

অনিন্দ্য মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল।

শুনে, নীলার চোখদুটো যেন ক্লান্তির ভারে নুয়ে এসেছিল। কথা বলেনি সে। আজ নীলা বাজারে যেতে চায়। অনিন্দ্য জানে, ওটা ওর একটা অজুহাত মাত্র। অনিন্দ্য কাজে জড়িয়ে পড়েছে জেনে ওকে খানিকটা বিব্রত করা। নীলার এ এক আনন্দ। অনিন্দ্য বলতে পারতো, তাড়াতাড়িই ফিরবো। আজ কাজকর্ম নেই কিছু। নীলা কি তাতে খুশি হতো? মনে হয় না। হয়তো বলতো, থাক। আমার জন্য তোমার কাজ কামাই করার দরকার নেই। আসলে, নীলা অসুস্থ। তার ভীষণ অসুখ। সে দুনিয়ার দুটো মেরুকে একই বিন্দুতে দেখতে চায়। অনিন্দ্য সাগর হোক, সৈকত হোক, হিল্লি যাক, দিল্লি যাক, তরতরিযে উঠে যাক মগডালে। দেরিতে অফিস যাক, তাড়াতাড়ি ফিরুক। কম কাজ করুক, বেশি গুরুত্ব পাক। সৎ হোক, টাকাও আনুক। অনিন্দ্য কম ছুটুক, কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে যাক।

নীলার সত্যি সত্যিই ভারি অসুখ।

শোবার ঘরে পরিপাটি করে লক্ষ্মীর ঝাঁপি পেতেছে নীলা। চকচকে রুপোর টাকায় সিঁদুর লেপে, রেখে দিযেছে ফুলের পাপড়ির মধ্যে। রোজ ফুল-জল দিয়ে পুজো করে লক্ষ্মীর। ধূপ জ্বালিয়ে গুঁজে দেয় প্রসাদী কলার ওপর। রোজ চান সেরে গলায কাপড় জড়িয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে মা-লক্ষ্মীর সুমুখে।

লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল অনিন্দ্য। পেছনে বসে সাদা পেঁচাটা ডগোমগো চোখে তাকিয়েছিল অনিন্দ্যর দিকে। পলকহীন সে চোখ। নিরুত্তাপ। নিশ্চিন্ত। অনিন্দ্য বুঝতে পারে, রাতের বেলায ঘুমের ঘোরে নীলা যখন বিড়বিড় করে, তখন ওর বুকের মধ্যে ঐ লক্ষ্মীপেঁচাটা ঢুকে যায় অজান্তে। তার সাথেই কথা কয় নীলা। সারা রাত। নীলা উচ্চাশার এক মগডালে বাসা বাধে তখন। পেঁচাটা বসে থাকে আরো উঁচুতে। নীলা ওকে ধরবার জন্য অনেক কসরৎ করে। পারে না। অনিন্দ্যকে দু'হাত দিয়ে ঠেলতে থাকে, 'যাও না গো। ধরো না ওটাকে।' নীলা তো বোঝে না অনিন্দ্যর পক্ষে অতো উঁচুতে ওঠার ক্ষমতা নেই এক জীবনে।

ভাবতে ভাবতে আজকাল অনিন্দ্যর মনেব বর্ণটা জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়। পাত্র অনুযায়ী রঙ বদলায় তার। পেঁচার কাছে এলে নিজেকে পেঁচা বলে মনে হয়। ষাঁড়ের পাশে দাঁড়ালে ষাঁড়। এই যেমন, এখন এই বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, অনিন্দ্যও যেন বাসেরই একটা অংশবিশেষ। সেও যেন ড্রাইভারের কবজির প্রবল টানে, বাসের সাথেই নড়ছে, দুলছে, ছুটছে। আচমকা একটা পাপবোধ ছেয়ে ফেলে তার সারা আকাশ। বর্ণহীন হবার পাপ। এক ধরনের হীনমন্যতা তাকে তিলতিল গ্রাস করে। থার্মোমিটারের রেখাগুলো ছাপিয়ে, ঝকঝকে পারদের কাঁটা সোজা আকাশের দিকে উঠে

যায়। সরু পেনসিল-টর্চের আলোর মতো সূঁচোলো হয়ে সে কাঁটা ছুঁয়ে ফেলে, বিঁধে ফেলে অসীম আকাশের শরীর। অনিন্দ্যর কানের ডগা নিঃশব্দে পুড়তে থাকে নিঃশেষে। অপমানে, লজ্জায়। ঠিক সেই সময়েই পেঁচাটা ফের নড়ে ওঠে। নীলার লক্ষ্মী-ঝাঁপি থেকে ডানা মেলে উড়ে যায় গাছের মগডালে। অনিন্দ্য প্রস্তুত হয় মনে মনে। সে জানে, এক্ষুণি নীলা ওকে ঠেলা মারতে থাকবে দু'হাত দিয়ে, 'যাও না গো। ধরো না ওটাকে।'

গুহা

হাঁটতে হাঁটতে আবার পেছন ফিরলো গোঁসাই। লোকটা পেছন পেছন আসছে তখনও। ঠিক পেছন পেছন নয়, আন্দাজ হাত ত্রিশেক তফাতে। সপ্তমীর আধখাওয়া চাঁদের ঝাপসা আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। গোঁসাইয়ের সারা গায়ে এক ধরনের মৃদু শিহরণ খেলে গেল ...।

দুধারে ধানক্ষেত ফুঁড়ে টেস্ট-রিলিফের রাস্তা। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, কৃষ্ণচূড়ারা ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিকন ডালগুলো দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। ছায়াগুলো রাস্তার ওপর শুয়ে শুয়ে কালো ছাগলছানার মতো কাঁপছে।

এরকম রাস্তায় একটু রাত হলেই পথ চলতে গা ছমছম করে। দু'পাশের গাছগাছালির ঝাপসা আঁধারে অনেক মূর্তি কল্পনায় আসে। তার ওপর কেউ যদি ঘন্টাটাক ধরে সমানে পিছু নেয় ... তবে তো ...।

গোঁসাই ভেতরে ভেতরে ঘামছিলো। মনের মধ্যে একরাশ ধাঁধাঁ। কে পিছু নিতে পারে তার? গরীব বোষ্টম সে। কেত্তনে খোল-টোল বাজায়। নাম-টাম গায়। ঝুলি জপ করে অষ্টপ্রহর। সংসারের অর্থ-সম্পদ দু'পায়ে ঠেলে, ঠাকুরের শ্রীচরণে মন-প্রাণ সঁপে বসে রয়েছে। এসব কথা এ তল্লাটে কে না জানে? এমন মানুষের পিছু নিয়ে কার কি ফয়দা হবে গোঁসাই বুঝে উঠতে পারে না।

লোকটা যেন মেপে মেপে হাঁটছে। গোঁসাইয়ের হাঁটা অনুযায়ী বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে নিজের হাঁটাটা। চাঁদের আবছা আলোয় ছায়ামূর্তিটা যেন ভেসে ভেসে আসছে। এমন অবস্থায় মন নানান ইশারা করে। নানান ভয় দেখায়। বাঁ হাতটা আপসে উঠে আসে গলার কাছটায়। তুলসী কাঠের মালা রয়েছে সেখানে। কোন সুমুন্দির পো ছোঁয় গোঁসাইকে। মনের সঙ্গো শলা-পরামর্শ করে রামনামটাও গুনগুনিয়ে ওঠে ঠোঁটের ফাঁকে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্য ভাবনা মাথায় চাপলো গোঁসাইয়ের। মানুষজন হলে কোনও কুবুদ্ধি নিয়ে পিছু নিয়েছে নির্ঘাত। সংসারে বেঁচেবর্তে থাকতে হলে কত লোকের পাকা ধানে মই দিতে হয়। জ্ঞানে-অজ্ঞানে। ঠাকুরই করান সব। গোঁসাইয়ের আর দোষ কি? তাদের মধ্যে কেউ যদি কাঁই হয়ে থাকে গোঁসাইয়ের ওপর, বদলাটা নিতে চায় বাগে পেয়ে, তাহলে গোঁসাই নাচার। তা সে যেই আসুক, ঘায়েল করার ইচ্ছে থাকলে পিছু পিছু হাঁটবে কেন খামোকা? রাত-বিরেতে এই নিঃসাড় থানে .... এই তো সুযোগ। ভাবতে গিয়ে অন্য পথ ধরলো মন। নিছক সাধারণ কোন পথ চলতি লোকই

হয়তো। সাঁঝের বেলায় ঘরে ফিরছে নিজের খেয়ালে। গোঁসাই কেবল ভাবনার ডালপালা ফাঁদছে মনের মধ্যে। রজ্জুকে সাপ ভেবে বিভ্রম। ভয়ের তানে মনের মধ্যে সাত-সতের উবুর-ডুবুর খেলা।

মনের মধ্যে সাহসটা ফিরে আসতেই চলতি পথের ধারে একটা পাকুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লো গোঁসাই। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে ...।

দু'এক পা এগিয়েই লোকটা দাঁড়িয়ে পড়লো। আধ-খাওয়া চাঁদের ফিকে আলোয় তার আবছা শরীরটা থেমে রইলো ঠায়। গোঁসাইয়ের সারা দেহে শিরশিরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। শরীরটা উত্তেজনা ও ভয়ে বারকয়েক ঝাঁকি খেল। গলা জমে পাথর। গোঁসাই বারবার ধিক্কার দিতে লাগলো নিজেকে। এমন ভর সাঁঝের বেলায় কেন যে সে রওনা হলো ঠাকুরচকের হাট থেকে! বিশেষ করে তার সঙ্গে যখন রয়েছে এমন এক মোক্ষম গেরো।

গেরো বলে গেরো। সাক্ষাৎ অনর্থ একটি বাসা বেঁধেছে আজ গোঁসাইয়ের ট্যাঁকে। সখ করে গোখরো সাপকে গলায় জড়িয়েছে সে।

আবছা অন্ধকারে সাবধানে ট্যাঁকের কাছটায় হাত রাখলো গোঁসাই। ঠিকঠাক রয়েছে শক্তপানা বস্তুটি। ওটাই বোধহয় কাল হলো! ঐ বস্তুটির লোভেই বোধ করি পিছু নিয়েছে লোকটা। জুতসই জায়গা একটি দেখলেই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বার তালে রয়েছে। জান বাঁচানো দায় হবে তাহলে। গোঁসাই প্রমাদ গুনলো।

টিপটিপে বুক নিয়ে গোঁসাই বেরিয়ে এলো গাছের তলা থেকে। জোর কদমে হাঁটতে লাগলো জানের মায়া ছেড়ে। এবং ... খানিক বাদে সে পিছু ফিরে দেখলো, পেছনের লোকটা আবার হাঁটা শুরু করেছে। গোঁসাইয়ের বুক চিরে কান্না বেরিয়ে আসার জোগাড়। বৈরিগি জেবনে একি শুকনো বেপদ জুটালে ঠাকুর? গোঁসাই চোখ পিট্‌পিট্‌ করে তাকালো আকাশের তারাগুলোর দিকে।

আসলে হয়েছে কি, আজ ঠাকুরচকের হাটে ঘুরতে ঘুরতে গোঁসাই হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছে একটা চকচকে সোনার দুল। বেশ ভারি-সারি। কুড়োবে কি কুড়োবে না, এই টানাপোড়েন চললো খানিক। কুমনে সুমনে লড়াই বাঁধলো শতজনের সুমুখে। শেষমেষ সবার চোখ এড়িয়ে আলতো হাতে বস্তুটিকে তুলেই ট্যাঁকে গুঁজেছে গোঁসাই। সেই থেকে ট্যাঁকে-ট্যাঁকেই ঘুরছে ওটা। মনটা সেই কারণেই চঞ্চল। সারা বিকেল একটা উড়ুক্কু পাখির মতো মনটা বয়ে নিয়ে, সারা হাট ঘুরে বেড়িয়েছে গোঁসাই। অকারণে, এলোমেলোভাবে। একবার মনে হয়েছিল বাসে চেপে খাকুড়দার বাজারে চলে যায়। স্যাঁকরার দোকানে বেচে দেয় ওটা। সাত-পাঁচ ভেবে সামাল দিয়েছে মনকে। খেতে হয় চেখে চেখে, পা' ফেলবে দেখে দেখে। মরুব্বিদের বচন। দুমদাড়াক্কা কিছু করতে নেই। কার দুল, কি বিত্তান্ত, তুমি কোথায় পেলে, —এসব প্রশ্ন হলে, তখন ঝামেলা। তখন জবাবটি চাই মুখের মতোন। কি করতে কি হয়, বলা তো যায় না কিছু। কাজেই সন্ধের মুখে ঘরের পানে পা।

শ্যাষতক ঘরের রাস্তাই য্যাখন ধরবি, ত্যাখন আগেভাগেই বারালি না ক্যানে রে গুঁসাই? এখুন দ্যাখ দিকি, তোর শিয়রে শমন। এখুন জানটি নিয়ে ঘরে ফিরতে পাইর্‌লে তোর পিত্তিপুরুষকে বাহবা দিস দু'কুড়ি বার। কপতুর পাখিটির মতো কাঁপতে

কাঁপতে গোঁসাই নিজেকে ধিক্কার জানাতে থাকে বার বার। রাতটা বাড়ছে ক্রমশ। চাঁদটা সরে সরে যাচ্ছে আকাশের কোণ ঘেঁসে। আদাড়ে বাদাড়ে ডেকে উঠছে শেয়ালের পাল। দূরে কালো কালো গাঁ'গুলোতে টিমটিমে বাতি জ্বলছে।

সামনে রাস্তার ধারেই একটা মজা দীঘি। ঝোপেঝাড়ে প্রায় আঁধার হয়ে থাকে দিনের বেলাতেই। রাস্তাটা ঐ দীঘির তিন পাড় ঘেঁসে বেঁকে গিয়েছে আধ-গোলাকার হয়ে। রাতের আঁধারে যেন পিশাচপুরী বলে মনে হচ্ছিল দূর থেকে। গোঁসাই যতই এগোচ্ছিল, ততই তার পা' দুটো অবশ হয়ে আসছিল। সারা গা ভিজে যাচ্ছিল ঘামে। তালু জিভ শুকিয়ে আসছিলো ভয়তরাসে।

নিজেকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করতে লাগলো গোঁসাই। বোষ্টুম মান্ষি তুই, তিন কুলে কেউ লাইকো গুয়ালে ধুয়া দিবার লেগে, তিনকাল গে এককালে ঠেকিছিস লিজে, মনের মাঝে লোভখান দ্যাখো না! য্যান্ দেড় হাত জিভ বার করে গিলতে চাতিছে বেশ্বভবন! সারা জেবন হরিনাম কইর্লি, দীক্ষে লিলি ঘটা করে, অথচ কি না কি এক চিলতে কানের দুল, তাই না দেখে হামলে পইড়্লি উটা লেবার লেগে? নিজেকে সমানে ধমকাতে লাগলো গোঁসাই। এ্যাতো লোভটা তোর কিসের লেগে? এ্যাক পোয়া চাল ফুটালে খাবার লোক থাকে না ত'র ঘরে, সোনাদানা, ট্যাকাপইসা, হাতের ময়লা, লরকের বিষ্টা, তুই দু'হাত দে ঘাঁটতে চাস ক্যানে রে? ত'র মাথায় লাঠির ঘা'টা পইড়্বে নি তো কার মাথায় পইড়বে? নিজের গায়ে হাজার বার থুৎকার দিচ্ছিলো গোঁসাই। ছুটছিলোও সমানে।

ছুটতে ছুটতে নিজেকে খানিক জ্ঞানবর্ষণ করলো গোঁসাই। এসব হলো গে তাঁর পরীক্ষে। এইটুকু বুঝতে পারলি নি? তা নালে হাটের মধ্যিখানে শতচক্ষুর সুমুখে এ্যামন একখান চিজ্, পড়ে রইলো, জগতের লোক পারায়ে গেল, ক্যাবল তোরই পাপচোখে পইড়লো তা? ইখন এ্যামন ব্যাঘোরে পড়িছিস যে পেরানখান বাঁচান্ দায় ত'র।

সামনে কালোপানা দীঘিটার দিকে তাকিয়ে প্রাণটা হাহাকার করে উঠলো গোঁসাইয়ের। পেছন ফিরে দেখলো, লোকটা প্রায় ঝাপ্টে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

দীঘিটার পাড় ঘেসে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখেই এক বিশাল প্রাচীন বট। কালো ঘুরঘুট্টি আঁধার জমে রয়েছে ওর তলায়। এগোতে গিয়েই পা'দুটো থেমে গেল। একটা ভয় আর আশঙ্কা শত ডানা বিস্তার করেছে মনের মধ্যে। কিছু যেন রয়েছে গাছের তলায়। গোঁসাইয়ের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও ষড়যন্ত্র যেন চলছে-সেখানে।

পিছু ফিরে তাকালো গোসাই। ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা। আধো-আঁধারের মধ্যেও গোঁসাইয়ের মনে হ'ল লোকটা যেন ওর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে। একি পরীক্ষেয় ফেললে গুরু? এ বেপদে তুমিই ভস্সা গো। গোঁসাইয়ের প্রাণটা কেঁদে উঠলো হুহু করে। ইচ্ছে হোল, ট্যাক থেকে ফেলে দেয় ওটা, যেদিকে খুশি। এ আপদ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ গোঁসাইয়ের নরকযন্ত্রণা চলতে থাকবে সমানে। কিন্তু এখন আর ছুঁড়ে দিয়ে লাভ কি? যে আসছে, সে তো মাথায় বসাবেই লাঠির ঘা। গোঁসাইয়ের সে এক সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা। না পারে গিলতে, না পারে ওগ্রাতে। এদিকে পেছনে পেছনে ধেয়ে আসছে সাক্ষাৎ শমন। ওদিকে ট্যাকের মধ্যে জ্যান্ত কাল-সাপটি বাসা বেঁধে মাঝেমধ্যেই ছোবল মারছে। গোঁসাই এখন কি করে?

বটগাছের তলায় জমাট আঁধারের মধ্যে আলোর দপ্‌দপানি। জোনাকির মতো ছোট্ট দু'তিনটে আলোর ফুটকি। বিড়ি টানছে কারা ... ? গোঁসাইয়ের সারা শরীর হিম হয়ে এলো। গলা থেকে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরুলো কেবল। আর তখনই ... গাছের তলা থেকে জোরালো টর্চের আলো পড়লো মুখে। গোঁসাইয়ের গলা থেকে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়েই থেমে গেল। পা-দুটো ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লাগলো বলির পাঁঠার মতো। ঝপ্ করে চোখদুটো বুঁজে ফেললো সে। টর্চের আলো এগিয়ে এসে থেমে গেল সামনে।

'কে গ' ? গুঁসাই লাকি ? ম'রা ভাবি বুঝি রাণার পো।'

বুঁজে থাকা চোখদুটো এবার খুললো গোঁসাই। বিড়বিড় করে শুধালো, কুন রাণা ?

—রিদয় রাণা গ'। উত্তর দিল টর্চ হাতে লোকটি, সদরে গিছেন তো। রাত হবে ফিরতে। ম'রা তাই তার খোঁজে বারিয়েছি।

—মুই যাতিছি রে। টচ্‌টা মার ইদিক পানে। পেছনে থেকে ভেসে এল রিদয় রাণার গলাব স্বর।

রিদয় রাণার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হতভম্বেব মতো দাঁড়িয়ে রইলো গোঁসাই অনেকক্ষণ ...।

প্রাণটা ধীরে ধীরে ফিরে আসছিলো ধড়ে। রিদয় রাণা কাছে আসতেই গোঁসাই বললো, তুমি আসতিছ্যালে গো রাণার পো' ? মুই ভাবি কে না কে! বুকটা ত্যাখন থিকে ধপড়-ধপড় করতিছ্যালো ডরের তানে।

হাঁফাতে হাঁফাতে রিদয় রাণা বললো, তুমার বুকটায় ক্যাবল ধপড়-ধপড় করতিছ্যালো। ম'ব ভিতরটায় যে কি হতিছ্যালো তা একমাত্তর উপরঅলা, যিনি দিনকে রাত করেন, তিনিই জানেন।

বুকের কাছটায় আলতো হাত বোলাতে লাগলো রিদয় রাণা। কাপড়ের খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো বারবার।

— দাঁড়ায়ে যাতেছিলে ক্যানে য্যাখন ত্যাখন ? গোঁসাই অবাক হয়ে শুধালো।

— বা-রে ? তুমি ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়িয়ে যাতিছ, গাছের তলায়। কুন সাহসে মুই পা' বাড়াই সুমুখে ? কি কুবুদ্ধি রইছে তুমার মনে, কে জানে তা ? ফিসফিসিয়ে রিদয় রাণা বললো, পাকিটটা যে এক্কেরে খালি লয়গো। ডরটাতো সেই জন্যি। এ পথটাও ভালো লযকো এক্কেরে।

কথাটা স্বীকার করতেই হয় গোঁসাইকে। রিদয় বাণার যা চালু ব্যবসা, হাজার-দু'হাজার নির্ঘাত রয়েছে সঙ্গে। মাল বানানো, বন্দকী, সব মিলে কম সোনা লেনদেন তো করে না ফি-হপ্তায়।

মুনিশ্‌রা হাঁটছিলো সামনে সামনে। হাতে টর্চটা বাগিয়ে রিদয় চলছিলো গোঁসাইযের পাশাপাশি। কথা বলছিলো না কেউই।

বিপদের মেঘটা কেটে যাবার পর গোঁসাইয়ের মনটা সহসা খুশী খুশী, ঝরঝরে হযে উঠলো। বাঁ হাতটা সবার অলক্ষ্যে ট্যাকের কাছটাতে উঠে এলো। ঠিকই আছে চিজটা।

সোনাও পালাম, স্যাঁকরাও পালাম। পথের মাঝেই। কপাল! ট্যাঁকের কাছটায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবলো গোঁসাই। মনের মধ্যে অনেক চিন্তা ভীড় করলো আবার।

কুড়িয়ে পাওয়া দুলটাকে নিয়ে কী করা যায়? কত ওজন হতে পারে ওটার? আন্দাজ কত টাকা পাওয়া যেতে পাবে বেচলে?

কোনও আন্দাজই পাচ্ছিলো না গোঁসাই। আনা দুযেক হবে নিশ্চয়ই। তা, হবে। গোঁসায়ের মন সায় দিল। মনে মনে দামটা হিসেব করতে লাগলো সে।

সোনার দাম তো এখন আকাশছোঁওয়া। হাজার তিনেক টাকার ওপর ভরি। তাহলে দু'আনার দাম পড়ে পৌনে চাবশো টাকার মতো।

মনের মধ্যে খুশীটা উথলে উঠতে গিয়ে মিলিয়ে গেল। শুধু সোনা তো নেই। খাদও রয়েছে। সে বাবদ বাদ যাবে কিছু। তাও মেরে কেটে শ'তিনেক টাকা তো হবেই। তাই বা কম কিসে?

গোঁসাইয়ের মতো মানুষেব পক্ষে এক মওকায় তিনশো টাকা পাওয়া তো আকাশের চাঁদ পাওয়ার শামিল।

এ দুনিয়ায সবই তাঁরই দান রে ভাই। সে দান ফিরায়ে দেওয়াও মহাপাপ। গোঁসাই মনে মনে আওড়ালো।

. এই যে হাটের মধ্যে হাজার চোখের সামনে পড়ে রইলো জ্বলজ্বলে চিজটা, কারো চোখে পড়লো না কেন? কেন গোঁসাই-ই দেখল কেবল? এ'তো ঠাকুরের দয়া বৈ নয়। তিনিই তো গোঁসাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। গোঁসাইয়ের সারা জীবনের সৎকর্মের পুরস্কার এটা। সেই যে শাস্ত্রে বয়েছে না, স্ত্রী পুত্রদের মুখে অন্ন জোটাতে না পেরে ভক্ত পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর দয়াপরবশ হয়ে মোহরের থলিটা ফেলে রাখলেন পথের ওপর। পথের কাঙাল ভক্ত এক রাতেই লাখপতি। গোঁসাইয়ের মনটা ক্রমশ আত্মপ্রসাদে ভরে যাচ্ছিল। ঠাকুরের দয়া নেমেছে তার ওপর। মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি। গোঁসাইকে আর ঠেকায কে? ভক্তিভরে ট্যাঁকের কাছটায় আলতো মোলায়েম হাত বোলাতে লাগলো গোঁসাই।

শ'তিনেক টাকা দিয়ে কি করা যায় আজকাল? গোঁসাই একমনে ভাবতে লাগলো! সোনা তো দিলে গ' ঠাকুর, ইবার বুদ্ধি জুগাও গুঁসাইরে।

মন দুয়েক ধান কিনে রাখা যায়, অন্‌দিনের তরে। দু'দিন পরে ধানের দাম তো আকাশ ছোঁবে। ধান কিনেও সোয়া-শো মতো বাঁচবে হয়তো। একজোড়া গামছা আর একখান ধুতি কিনে নেওয়া যাবে। না, পেটে পুরে দিলে তো ফুরিয়ে গেল সব। ঠাকুরের দান পেয়েছে এতদিন পরে। ভেবেচিন্তে খরচ করতে হবে বৈ কি!

গোটা কয়েক ছাগলের বাচ্ছা কিনে ফেললে মন্দ হয় না। একটা বছর খাইয়ে দাইয়ে পুষতে পারলে তিনগুণ হয়ে ফিরে আসবে। অবিশ্যি কিলাবের বাবুদের চোখ যদি না টাটায়। কিলাবের ছোকরাদের কথা ভেবে মনটা তেতো হয়ে এলো গোঁসাইয়ের। কাজ নেই কম্মো নেই দিনভর শুধু ফিস্টির তত্ত্বতালাস! সেও কি ট্যাঁকের পয়সা খসিয়ে? এর বাড়ীর হাঁসমুরগী, ওর বাড়ির আলু, পেঁজ, তার বাড়ীর কাঁটাখোঁচা, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা। রাতের আঁধারে ঘুরতে থাকে। এক একটি মহাদেবের চেলা

যেন। ঠাকুর দেবতার নাম শুনলে পাতলা হাসিতে ঠোঁট ভরে যায় বাবুদের। উনাদের দৃষ্টি পড়লে ঐ টুঁন ছাগশিশু আর কতক্ষণ?

পানের ব্যবসা করলে মন্দ হয় না। খাকুড়দার হাট থেকে কিনে এনে গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরি করে বেড়ানো। ডবল দাম। ডবল দাম, না কচুটি। ধারে দিতে দিতে লাভের গুড় পিপঁড়ার প্যাটে।

আসলে টাকার পরিমাণটাই বড় কম। ঐ টাকায় এ যুগে তেমন কিছু করা যায় না। তপ্ত মাটিতে এক ফোঁটা জলের মতোন। চোঁ.... করে শুষে নেয় নিমেষে।

বড় আক্ষেপ হচ্ছিল গোঁসাইয়ের। পড়বি তো পড় খসে পড়লো কিনা পুঁচকে পানা একটা দুল। কি হবে মাইন্ষের ঐটুন এক দুলে? ঠাকুরের ওপর অভিমানটা গাঢ় হতে থাকে। বিচার লাই গ' তুমার? এ্যদ্দিন বাদে টুকচান দয়া য্যাখন কইর্লেই একটুন বড়োসড়ো, ভারিসারি কিছু দিতে পাইর্লে নি পেরানে ধরে? কলিযুগে কি ঠাগরের মইমেও গ্যালো কম্যে?

মনের মধ্যে ভাপ জমছিলো গোঁসাইয়ের। কলিযুগে সব পাপে আচ্ছন্ন মতি। ঠাগ্রের দান করবার মনটাও গ্যাছে কম্যে?' ভাবতে ভাবতে অভিমানটা চাগিয়ে উঠলো মনে। তারা ছড়ানো জ্বলজ্বলে আকাশের দিকে চোখ তুলে গুমরে উঠলো গোঁসাই নিজের মনে, "কি পেরজন ছেলো অমন দু আংলে ভিখ দিবার? কে চেয়েছিল এমন অযত্নের চিজ? ইস—" মুখ ভ্যাঙ্গালো গোঁসাই ওপরের দিকে! "খোব দয়া একখান দেখালে যা হোক। শুনে ধন্যি ধন্যি কইরবে বিশ্বভবন।" দুঃখে আর অভিমানের ঝাপটায় চোখের কোণে প্রায় জল এসে গেল গোঁসাইয়ের।

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর মুখ খুললো রিদয় রাণা, চুপচাপ ক্যানে হে' গুঁসাই? কথাবার্তা কিছু কও-টও শুনি।

— মনটা বড় খ্যারাব হে। একটা কাজে গিছ্লাম, হলো লাই।

— কি কাজ গ'? গিছলে কুথা?

গোঁসাই সরে এলো রিদয় রাণার কানের পাশটিতে। প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো, তুমার খুড়ীর কানপাশা জোড়ার একখানা পড়ে ছেলো বাক্সে। সেইটো আজ লিয়ে গেছ্লাম খাকুড়দার বাজারে। বেচবার লেগে।

কান খাড়া করে শুনছিলো রিদয় রাণা। সোনাদানার কথায় কানটা তেজী হয়ে ওঠে ওর। সেটা লক্ষ করে গোঁসাই বললে, ওজন-টোজন করে শালা দাম বাতালো চারশো ট্যাকা মাত্তর। ভাবলাম কাজ লাইকো ইখ্নে ব্যাচে। পাশের গায় মুদের রাণার পো' রয়েছে। লিজ্জেদ্যার লোক। কাজ কি আঘাটায় বেঘাটায় ব্যাচে?

সোনার বাজার বড় মন্দা যাতিছে হে। কখন কি হয় বলা যায় লাকো। ঠসরা গলায় বললো রিদয় রাণা।

হাই বাপ! রাণার পো যে পয়লা পহরেই কু গায়! শেষমেষ পৌনে চারশো ট্যাকা মিলবে তো? গোঁসাই প্রমাদ গুনলো মনে মনে।

বাড়ি পৌছে দুয়োরে খিল দিয়ে নিন্তি নিয়ে তৈরী হোল রিদয় রাণা। চোখে চড়ালো সুতো বাঁধা গোল চাকতির চশমা।

ট্যাঁক থেকে অতি সাবধানে চিজটা বের করলো গোঁসাই। সন্তর্পনে এগিয়ে দিল রিদয় রাণার দিকে।

দুলটার দিকে ঝুঁকে পরখ করছিল রিদয় রাণা। গম্ভীর মুখখানা থমথম করছিল। মনে মনে গাল পাড়লো গোঁসাই, ব্যাটা বুয়াল মাছ একটা। মুখের পানে তাকালেই এক চোল রক্ত শুকায়ে যায় য্যান। এই ভড়ংটুকুই তো এদের সার। এ'রকম ভঙ্গি করেই তো আধখানা শুকিয়ে দেবে মক্কেলকে। তারপর ফস্ করে একটা নিঃশ্বাস। ঘোলাটে চোখের এক চিলতে চাউনি। মক্কেল তো তাতেই বারো আনা খতম। তখন শুধু মুখটি খোলার অপেক্ষা। কিনা, বড় খাদ আছে হে চিজটায়। বেচলে দাম পাবে লাকো খোব একটা। মক্কেল তখন চিৎপাত।

— এ দুল খুড়ীকে কবে কিনে দিছিলে হে' গুঁসাই? মুখ না তুলে প্রশ্নটা আচম্‌কা ছুঁড়ে মারলো রিদয় রাণা।

চমকে উঠলো গোঁসাই। ঘামতে লাগলো ভেতরে ভেতরে। রিদয়ের মনের অন্ধিসন্ধিটা আঁচ করার চেষ্টা করলো। চোরাই মাল ভাবছে নাকি রাণার' পো? হতে পারে। এ তল্লাটের সব চিজই তো ওরই হাতের কাজ। এ দুলও কবে কার জন্য বানিয়েছিল, মনে পড়েছে হয়তো।

মনের মধ্যে সাহস জুগিয়ে জবাব দিল গোঁসাই। কপালের ঘামটুকু চটপট মুছে ফেলে বললো, সি কি আর আজকার কতা হে। বহুৎ দিনের কতা। জোড়ার মধ্যে একটা বেচেছি পাঁচ সন আগে। ইটা কুনো রকমে আঁকড়ায়ে রাখেছিলাম। আর রাখা গেল লাকো! গোঁসাই কথার জাল বুনতে লাগলো সমানে, এর আগেরটার দাম পেইছিলাম চোদ্দ কুড়ি টাকা। সেই পাঁচ সন আগে। আর, খাকুন্দার বুড়া স্যাঁকরা বলে কিনা চারশো টাকার বেশি দিবার লারবে। আক্ষেপে যেন ফেটে পড়তে চাইলো গোঁসাই, কলিকাল আর কাকে বলে গ' রাণার পো। সবাই তালটি বুঝে ঠকায়ে লিতে চায় মাইন্‌ষিকে।

— যেমন তুমি। নির্বিকার উত্তর দিল রিদয় রাণা। মুখখান্ তুললো এতক্ষণে। ভুরু জোড়া কুঁচকে বললো, খুড়ী মরে সগ্যে গিছে, দেখতে পালো লাকো তুমার কীত্তিটা। বাঁচে থাইক্‌লে মুই লিজে গে দিয়ে আইস্‌তাম খপরটা।

ধীরেসুস্থে কানের সুতোর প্যাঁচ খুললো রিদয় রাণা। গোঁসাই ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়েছিলে ওর দিকে। চশমাটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে রিদয় রাণা বললো, লিজের পরিবারকেও ঠকায়েছ তুমি? দুলটা গোঁসাইয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, রোলগোলের চিজ কিনে, সোনা বলে পরায়ে দিছ ঘরের নক্ষ্মীর কানে? তুমি মানুষ না'কী হে?

গ'টা কেমন শিরশির করছিলো গোঁসাইয়ের। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল যেন। ভুলভুল করে এক পলক তাকিয়ে মিনতি মাখানো গলায় বললো, নিশুত রাতে কি যে তুমি মস্করা কর রাণার পো! কত দিতে চাও সাফ্ সাফ বলো না শুনি।

ঠাণ্ডা চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো রিদয় রাণা। তারপর দুলটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ব্রাশ দিয়ে বার দুই ঘসে ফেরত দিল গোঁসাইয়ের হাতে। অবাক বিস্ময়ে

জুলজুল চোখে গোঁসাই দেখলো, দুলের ওপরের চকচকে সোনালী রংটা বেমালুম উধাও।

আঁধার রাতে একাকী পথ ভাঙতে ভাঙতে গোঁসাইয়ের বুকখান্ কে যেন করাত দিয়ে ফালাফালা করছিল। তারার খই ছড়ানো ভরভরন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে মনটাকে হাজার রকমে প্রবোধ দিচ্ছিল সে। দুর দুর, তিন কাল গে এককালে ঠেকেছে সে, কি হবে তার অর্থ সম্পদ? কে আছে তার ভোগ করার? পরক্ষণেই ওপরের দিকে তাকিয়ে সে উগরে দিল তার শেষ ক্ষোভ, সব ছাড়ে-ছুড়ে নামের ঝুলিটি হাতে তুলিছি মুই। মোরে পরীক্ষে করে কুন্ সখটা তুমার মিটলো হে? এ রকম মস্করাটা মোর সাথে করে কুন লাভটা হোল তুমার? বলতে পার মোরে? বলতে পার?

অন্ধকারের মধ্যে একরাশ তেতো গেলার মতো মুখে করে গোঁসাই কথাগুলো নিঃশেষে ছুঁড়ে মারতে লাগলো আকাশের দিকে।

কাচঘরের বাসিন্দা

১.

গত পয়লা ফেব্রুয়ারী বিকেলে যখন আচমকা আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি নামল, আমি নতুন করে টের পেলাম, হুঁশিয়ার মানুষের সংখ্যা কত বেড়ে গেছে দুনিয়ায়।

সেই ছেলেবেলা থেকেই হরেক কিসিমের হুঁশিয়ার মানুষ দেখে আসছি। সিকি কিংবা আধুলি পেলে বাঁ হাতের তালুতে ঘষে ঘষে পরখ করত নিশাকর দাদু। আসল না নকল। হাটে গিয়ে বেছে বেছে পোকা বেগুন কিনত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। না, কিপ্‌টেমি নয়, এক ধরনের সতর্কতা। আনাজ-সবজিতে ইদানিং মারাত্মক কীট-নাশকের ব্যাপক প্রয়োগ চলছে! তাতে শাক-সবজি থাকে অক্ষত, পাতা নিশ্ছিদ্র, শরীরখানি তেল-চকচকে, কিন্তু ঐ সবজি খেলে নাকি কীট-নাশকের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী তিন পুরুষ ধরে চলবে মানুষের শরীরে। পোকা বেগুন, ফুটো শাক-পাতা মানে, আর যাই হোক, কীট-নাশকের মরণ-ফাঁদ থেকে রেহাই। সন্ধের পর থেকে বার বার খাট-পালঙ্কের তলা, আলমারির পেছন দিক, ভাল করে দেখে নিয়ে তবে খাটে উঠতেন কৃপাসিন্ধু মামা। জীবনে একটা 'দিনের তরেও এর অন্যথা হয়নি। এই সব দেখে শুনে আমার মনে হোত, দুনিয়ায় হুঁশিয়ার মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু সেদিন, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর পয়লা তারিখে আমি টের পেলাম, হুঁশিয়ার মানুষেরা অনেক, অনেক বেড়ে গেছে এই দুনিয়ায়।

বিকেল অবধি আকাশ ছিল খটখটে শুকনো। ঝল্‌মল্ করছিল শীতের রোদ্দুর। হাওয়া বইছিল, শুকনো হাওয়া। তখনই ঠিক করলাম বইমেলায় যাব আজ। পরিমলদা ক'দিন ধরে রোজই বলছিল—কি রে, বইমেলায় গেলি নে একটি বারের তরে?

—তুমি গিয়েছিলে?

—আমি তো রোজই যাই, অফিসের পর। আটটা অবধি টো-টো ঘুরি।

—কিনলে কিছু, বই-টাই?

—কিনেছি দু চারটে। কিনি বা না কিনি, বইমেলায় শুধু ঘুরতেই ভাল লাগে রে।

আমি আর পরিমলদা কুঁদঘাটের ওপারে পুঁটিয়ারী এলাকায় থাকি। পরিমলদা আগে গিয়ে ডেরা পেতেছিল। ওরই উদ্যোগে আমিও এক টুকরো জমি কিনি একই পাড়ায়। তিলতিল করে এই কিছুদিন হল বাড়িটা মোটামুটি শেষ করেছি।

পবিমলদাকে দেখে আমার চিরকালই হিংসা হয়। ছোট অবয়বের মধ্যে একটি

আদিগন্ত মানুষ। সৃষ্টিশীল, গতিশীল—এমন সবকিছুতেই আছে। শুধু আছে নয়, ওর নিজের কথায়, কব্জি ডুবিয়ে আছে। আমার চেয়ে ওর বয়স অন্তত পনের বছর বেশি, অথচ আমার চেয়ে অনেক তরতাজা। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি, মরে যাচ্ছি? ফুরিয়ে যাচ্ছি নাকি তিলতিল নিজের অগোচরে? বললাম, আজ তোমার সঙ্গে বইমেলায় যাব পরিমলদা। ডেকো।

আজ শনিবার, আমাদের হাফ। মাসের পয়লা, পকেটে মাইনের টাকা কর্ কর্ করছে। তিনটে নাগাদ পরিমলদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। চারপাশে তখন কাঁচা সোনার মতো রোদ্দুর।

খোশ মেজাজে হাঁটছি আমরা কার্জন পার্কের কাছাকাছি, আচমকা কালো মেঘে ভরে গেল আকাশ। এবং রেড রোড ছুঁতে না ছুঁতেই ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। শীতকালের বৃষ্টি মানেই কষ্টের। সেই বৃষ্টি যদি আচমকা আসে, ভোগান্তির একশেষ। শীতকালে আর ছাতা নিয়ে কে বেরোয়! ফলে আমি আর পরিমলদা ভিজে গেলাম একেবারে। হাতের ফোলিও ব্যাগটি দিয়ে মাথাটি কোনো গতিকে ঢাকবার চেষ্টা চালাই। আর অসহায় চোখ চারাই চারপাশে, কোথায় গিয়ে মাথা বাঁচানো যায়। তারই মধ্যে সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, চারপাশের অন্তত শ'খানেক মানুষ তাদের হাত-ব্যাগ থেকে বের করে ফেলেছে ফোল্ডিং ছাতা। আমার চারপাশে শুধুই বিচিত্র রঙের ছাতার মেলা।

আশ্চর্য! কত হুঁশিয়ার হয়েছে মানুষ! কত মানুষ!

একটা গাছের তলায় জবুথবু দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। বইমেলায় যখন পৌঁছলাম, তখনো টিপ্‌টিপিয়ে পড়ছে। সারা মাঠে জল জমে, কাদা হয়ে, একাকার। পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে চারদিক। তার ওপর কয়েক হাজার মানুষ হাঁটছে। মাঝে মাঝে খানা-খন্দ, জল জমেছে তাতে। এঁটেল মাটি, হাজার মানুষের পায়ের চাপে থল্‌থলে মণ্ড। ঐ মণ্ড ঠেলে ঠেলে হাঁটছে মানুষ। গাছের তলায় দাঁড়িয়েও এক্কেবারে ভিজে গেছি আমরা। শীতে কাঁপছি। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

মেলায় ঢুকে প্রথম চায়ের দোকানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম দু'জনে। ভিড় জমেছে চায়ের স্টলে। পেতে দেরি হবে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি চলমান জনস্রোত।

অনেকক্ষণ বাদে চা পাওয়া গেল। কাগজের কাপে চুমুক মারতেই সারা শরীর চন্‌মনিয়ে উঠল। শীতের বৃষ্টি-ভেজা শরীর, সামান্য উষ্ণতা পেয়ে যেন ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতে চায়। সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে শয়ে শয়ে মানুষ। সব বয়সের মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা। রং-বেরঙের পোশাকে মোড়া কিশোরী-যুবতী। আলাভোলা যুবকের দল, সদ্য সদ্য দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে ওদের। স্টলের মধ্যে যত না মানুষ, মাঠে হাঁটছে তার দশ গুণ। লক্ষ্যহীন, শুধুই হাঁটছে। পিচ্ছিল জমিতে, খানা-খন্দ এড়িয়ে, পা টিপে টিপে এগোচ্ছে সবাই। আমি চা খেতে খেতে দেখতে থাকি। ভাবি, কত হাজার মানুষ হাঁটছে এই পিচ্ছিল জমিতে, একজনও তো আছাড় খাচ্ছে না! অথচ সারা মাঠের যা হাল, পা ফেললেই আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা। তার মানে, আমার সহসা মনে হয়, কত সতর্ক হয়েছে মানুষ! সার্কাসের দড়ির ওপর কসরৎ করে যেমন হেঁটে যায় নিপুণ খেলোয়াড়, ঠিক একই কৌশলে, পিচ্ছিল কাদার মধ্যে পা টিপে টিপে শরীরের নিপুণ

ভারসাম্যে এরা কেমন এগিয়ে চলেছে পতনহীন সতর্কতায। ডাইনে নয়, বাঁয়ে নয়, এমন কি সামনেও দৃষ্টি নেই এদের, কেবল নিজের পায়ের তলার এক চিলতে পিচ্ছিল জমির ওপর সর্ব ইন্দ্রিয়ের তাবৎ একাগ্রতা জড়ো করে ... এভাবে হেঁটে কী লাভ? মেলার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দেবারও কী উপায় আছে এদের! এইভাবে নিজের পায়ের সামনের এক চিলতে জমি চিনতে চিনতেই তো একসময়ে বিদায়ের ঘন্টা বেজে যাবে। তখন, মন চল নিজ নিকেতনে ...।

সেদিন সারা সন্ধে আমি ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠছিলাম, মানুষ এতখানি হুঁশিয়ার হয়েছে! এতখানি!

২.

একখানা লম্বা রড দু'হাতে চেপে ধরে ক্ষণ গুনছি আমরা বিশ-তিরিশ জন। ঘামে ভিজে যাচ্ছে পুরো শরীর। আমাদের সামনে গাদাগাদি বসে কিছু মানুষ ঢুলছে। চৈত্রের গরম। বাইরের তপ্ত হাওয়া আর ভেতরের অসহ্য গুমোটে সেদ্ধ হচ্ছি তিলতিল। বাসটা রাসবিহারী স্টপ ছেড়ে গেল। সামনের সীটের একজন উঠবে উঠবে করছে অনেকক্ষণ। পোজ দিচ্ছে কিনা, কে জানে! লোকটা উঠলে সীটখানা কি পাব? লোকটা কি সত্যিই উঠবে? ওর চোখের তারায় দৃষ্টি নিবন্ধ করি। পড়তে চাই চোখের ভাষা। আপাত অচঞ্চল চোখের মণিতে মাঝে মাঝে যেন কিসের ছায়া। আলতো চকিত চাউনি বাইরের জানলা টপকে যাচ্ছে বার বার। এটাচির হাতলে সবগুলো আঙুলের চাপ। আমায় দু'পাশে সবগুলি ঝুলন্ত মানুষ চোখ বুজে ঢুলছে। আমি কিন্তু তিলমাত্র অন্যমনস্ক হই নে। পাছে সামান্য অসতর্কতায় সীটটা হাতছাড়া হয়ে যায়।

হাজরার মোড়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটি। এবং আমি পজিশন নেবার আগেই ছোঁ মেরে সীটটার দখল নিল আমার ডানদিকে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ ঢুলতে থাকা লোকটি। আমি অপার বিস্ময়ে দেখতে থাকি ওকে। বসতে না পাওয়ার দুঃখও ভুলে যাই বেমালুম।

বাসটা আটকে গেছে জ্যামে। আমি হাত বদলাই। সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে একটি নাতিদীর্ঘ মিছিল। হাতে ধর্মীয় ফেস্টুন। কোন এক অবতারের নামে স্লোগান দিচ্ছে গলা ফাটিয়ে। স্লোগানের মাঝে মাঝে প্রভুর নাম-গান, দু'পায়ে ভক্তি-গদগদ নিশ্চিন্ত শম্বুক গতি। পেছনে সারবন্দী দাঁড়িয়ে গেছে বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি। যানবাহনের লাইন দীর্ঘ হচ্ছে। দ্রুত ভাঙাচুর হয়ে যাচ্ছে ট্রাফিক শৃঙ্খলা। দিনকতক আগে মহরমের দিনেও রাস্তার মধ্যে গাড়িঘোড়া আটকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাঠি-ছুরি নিয়ে কসরৎ দেখাল আর একদল মানুষ। বাড়ি ফিরতে এগারটা বেজে গেল। ছোট মেয়েটাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, হল না। আজও বোধ হয় একই ব্যাপার ঘটবে। বাসটা বেশ খানিকক্ষণ বিকট গর্জন তুলে থেমে গেছে। খুব শীগগির রাস্তা সাফ হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। অসহ্য গরমে গলগলিয়ে ঘামছে সবাই। তবুও কী নির্বিকার মুখ! মানুষের সহ্যশক্তি কী অপরিসীম! কোনো বিষয়েই মুখ খোলে না কেউ। এসব ধর্মের ব্যাপারে তো নয়ই। সবাই আশ্চর্য রকম মৌন। এসব নাকি 'টাচি' ব্যাপার! ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশে এসব নাকি বলতে নেই। আসলে কেবল ধর্মের ব্যাপারেই নয়, কোনো

বিষয়েই মুখ খুলছে না মানুষ। প্রকাশ্য রেলস্টেশনে কিংবা বাসস্ট্যাণ্ডে দিনদুপুরে কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেললে, কিংবা কোনো মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলেও শয়ে শয়ে মানুষ না দেখার ভান করে দাঁড়িয়ে থাকবে। অগাধ জনসমুদ্রেও মানুষ মানুষের ভরসাস্থল হয় না, দিতে পারে না সামান্যতম নিরাপত্তা।

ঘন ঘন পা বদলাচ্ছে যাত্রীরা। মটমটিয়ে হাঁটু ভাঙাচ্ছে। এসব অধৈর্যের লক্ষণ। অনেকের মুখের ভাষা পড়তে পারছি। ফেটে পড়তে চাইছে উত্তেজিত আলোচনায়। কথা বললে বুকের পাষাণভার হালকা হয়। দু'দশ বছর আগে হলে এই বাসখানা হয়ে উঠত একটি মিনি-পার্লামেন্ট। কিন্তু না, যতই দিন যাচ্ছে, যেন মুখে কুলুপ আঁটছে মানুষ। শুধু একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক, রডের গায়ে ক্রুশবিদ্ধ, বললেন, 'আশ্চর্য! কেবল আমাদের দেশেই বুঝি ধর্মের ফোড়ন দিয়ে ছত্রিশ পদ রাঁধা যায়।'

'চুপ করুন মশাই।' সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে খিঁচিয়ে ওঠেন আরেক জন, 'এসব টাচি ব্যাপাব নিয়ে একটি কথাও বলবেন না।'

'ঠিক বলেছেন। কে কোত্থেকে শুনবে, কী অর্থ করবে, হামলা করবে বাসের ওপর।'

'হয়তো জ্বালিয়ে দেবে বাসখানাই।'

'আপনিও ডুববেন, আমাদেরও ডোবাবেন।'

এতগুলি সতর্কবাণী এক নিঃশ্বাসে ঝরে পড়ায় চুপ করে গেলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মন্ত্রের মতো কাজ করল কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুবোধ বালক। যারা কিছু বলবে ভেবেছিল, ওগরানো বাক্যবন্ধ এক ঢোঁকে গিলে ফেলল তৎক্ষণাৎ। সারা বাস নিমেষে বোবা। যে ব্যক্তিটি প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল, আমি তাকালাম তার মুখের দিকে। একটু আগেই আমার সামনের সীটটা অবিশ্বাস্য তৎপরতায় দখল করে নিয়েছে। বাজপাখি-চোখদুটি এখনো মিটিমিটি জ্বলছে।

এখন, সারা বাসটা যেন শ্মশান। গা ছমছম্ নিস্তব্ধতা। মানুষগুলোর মুখে কোনো অভিব্যক্তিই নেই। দু'চোখ মরা মাছের মতো ঘোলাটে। অথচ একদিন ছিল, যখন সামান্য ঘটনায় ছলকে উঠত সারা শহর। সোরগোল উঠত জেলায় জেলায়। মাঝদীঘিতে একটিমাত্র ছোট্ট নুড়ি পড়লেও তুমুল আলোড়ন উঠত। তার বৃত্তাকার রেশ ছড়িয়ে পড়ত দীঘিময়। ইদানিং যেন কেমন হয়ে উঠেছে মানুষ, সর্বদাই শশকের মতো ভীত, সন্ত্রস্ত। চারপাশ থেকে দ্রুত সরিয়ে নিচ্ছে দৃষ্টি। পুরে ফেলছে যে'যার অক্ষি কোটরে। চোখদুটি বন্ধ করে, অন্ধ সেজে কাটিয়ে দিচ্ছে দিন, এক চিলতে নিরাপত্তার বিনিময়ে।

এই তো, গেল পরশু বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল। গলির মুখে উত্তেজিত জটলা। ভিড়ের মধ্যে পরিমলদাও ছিলেন। ওদের মুখে সব শুনতে শুনতে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। আমাদের বাড়ি থেকে তিন-চারখানা বাড়ির পরে অপরেশবাবুরা থাকেন। সাধনপল্লীর মস্তানরা এসে, এই কিছুক্ষণ আগে, বাড়ি নছনছ করে দিয়ে গেছে। অপরেশবাবুকে বেধড়ক পিটিয়েছে। তাঁর স্ত্রীর আঁচল ধরেও টানাটানি করেছে। কারণ অতি সামান্য। সারারাত্রিব্যাপী জলসা হবে সাধনপল্লীতে, তারই টিকিট বেচতে এসেছিল ওরা। তিনখানা পঁচিশ টাকার টিকিট দিতে চেয়েছিল অপরেশবাবুকে। অপরেশবাবু

টিকিট নিতে চান নি, এই নিয়ে দু'চারটে কথা কাটাকাটি ...। অপরেশবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে পল্টু, হাবুরা। তারা এখনো ফেরে নি।

পরিমলদার চারপাশে জনা পাঁচ-সাত মানুষ। হেমাঙ্গবাবু, প্রমথবাবু, নিত্যগোপাল ...। সবায়ের মুখে চাপা ভয়। এসব কী হচ্ছে বলুন তো? একটু শান্তিতে থাকা যাবে না নাকি'? এরপর পাড়া ছেড়ে জলে-জঙ্গালে গিয়ে বাস করতে হবে।

পরিমলদা সবাইকে বোঝান। ঐক্যবন্ধ হওয়ার কথা বলেন বারবার। বলেন, কাল রবিবার। সকালেই আমরা বসবো লাইব্রেরী ঘরে। সবাই আসুন, ওখানেই বসে সিন্ধান্ত নেব, কী করে ঠেকানো যাবে এসব।

গতকাল সকালে বৈঠক বসেছিল। পাড়ায় মোট সত্তর-পঁচাওরটি পরিবার, মিটিংয়ে এসেছিল দশ-বারো জন। তাও হেলতে, দুলতে, দেরিতে।

৩.

অফিসে ঢুকেই মৃদু উত্তেজনা টের পেলাম। পরিবেশটা সামান্য এলোমেলো। সওদাগরী অফিস আমাদের, এক বিখ্যাত শিল্পপতি তার মালিক। কড়াকড়ি সর্বত্র। পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই এখানে। অন্যদিন হলে নিস্তব্ধ হলঘরগুলোতে শুধু টাইপ রাইটারের দীর্ঘ ছন্দোবন্ধ আওয়াজ। মাঝে মাঝে কলিং বেলের কর্কশ স্বর। আজ হলঘর জুড়ে কাজকর্ম থমকে গেছে কোনো অদৃশ্য মন্ত্রবলে। তার বদলে বক্তৃতা করছেন পরিমলদা। অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

চেয়ারে বসতে বসতে শুনলাম। ছত্তিশগড়ের শ্রমিকনেতা শংকর গুহ নিয়োগীকে এই কিছুদিন আগে গুলি করে মেরেছে শিল্পপতিদের ভাড়াটে গুণ্ডারা। অনেকেই এই বর্বরোচিত কাজের প্রতিবাদ করেছে। আমাদেরও কিছু করা দরকার। তাই আজ টিফিন-পিরিয়ডে ক্যান্টিনে জমায়েত।

পরিমলদা চলে যাওয়ার পরও তার রেশ রইল খানিকক্ষণ। টান টান করে বাঁধা তারখানি যেন সামান্য ঢিলে হয়ে গেছে আজ। হত্যাকাণ্ড নিয়ে কিছুই বলছে না কেউ। মুখরোচক নানান জ্ঞান বিতরণ করছে এক বিশেষজ্ঞ। মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে অমিতাভ বচ্চনের জবরদস্ত লড়াই বিষয়ক কোনো ছবি নিয়ে মেতে উঠেছে কেউ কেউ। 'শোলে'র সংলাপ বলছে সদ্য সদ্য জয়েন করা এক বিশ্বপাকা ছোকরা। তেরা বহুৎ নুন খায়া, সর্দার। আব্ গোলি খা ...। সবাই কথা বলছে গা বাঁচিয়ে। নিছক ঠাট্টা-মস্করার উর্ধ্বে উঠতে চাইছে না কেউই। আসলে, আমাদের অফিসটি প্রতিক্রিয়াশীলদের এক জমজমাট আড্ডা। অবাঙ্গালী বেওসায়ীর প্রাইভেট কোম্পানী তো—চাটুকারি, চুকলিবাজি, এসবই চলছে সর্বক্ষণ। মালিককে ঘাঁটাবার মতো বুকের পাটা অল্প লোকেরই রয়েছে। এখানে সর্বদাই চলেছে আমাদের হাতে-পায়ে, মুখে শেকল পরানোর এক গভীর ষড়যন্ত্র। বিচিত্র তার কৌশল, অভিনব সব পন্ধতি। ওসবের কাছে নিরন্তর হার মানছে মানুষ। দাসত্বের মসৃণ পথটি বেছে নিয়েছে অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারী। তার মধ্যেও জেগে রয়েছে মুষ্টিমেয় কেউ কেউ। বেঁচে রয়েছে সুদূর আকাশের মিটিমিটি নক্ষত্রের

মতো। তারা প্রতিবাদ করছে, প্রতিরোধ ...। পরিমলদার মতো মুষ্টিমেয় তারাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

টিফিন আওয়ারে ক্যান্টিনে পরিমলদা দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুধ্যে ধিক্কার জানালেন বারবার।—হলভর্তি মানুষ। কেউ-শুনছে, কেউ শুনছে না। এমন জনসভায় উপস্থিত থাকবার ঝুঁকি কম। টিফিন আওয়ারে কর্মচারীরা ক্যান্টিনে আসবেই। তার মধ্যে কে খেতে এসেছে, কে এসেছে বক্তৃতা শুনতে সেটা নির্ণয় করা মুশকিল হবে মালিকপক্ষের। সেই কারণেই বুঝি এত মানুষের জমায়েত ঘটেছে। অফিসের সামনে এই মিটিং হলে, এক চতুর্থাংশ মানুষ আসত কিনা সন্দেহ।

সামনের রাজপথ দিয়ে একটা মিছিল চলেছে শহীদ মিনারের দিকে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখি ওদের। দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে কয়েক শ' মানুষ। আকাশ ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। পাশের ব্যস্ত-সমস্ত মানুষজন দু'দণ্ড ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। পর মুহূর্তে হন্‌হনিয়ে হাঁটা দেয় কিংবা ঝুলে পড়ে বাসের দরজায়। দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে ওথলানো দুধের মতো আবেগ। সংঘবদ্ধ মানুষ হাঁটছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে, প্রতিরোধ করছে। মানুষ, তার মানে, বেঁচে আছে। দৃপ্ত মিছিলটা এগিয়ে গেছে অনেকখানি। আমি সারসের মতো ঘাড়খানি লম্বা করে জানলা দিয়ে দেখতে থাকি মিছিলটা।

সন্ধেবেলায় ঘরে ফিরে দেখি, পাড়ার অবস্থা ভয়াবহ। গতকাল অপরেশবাবুকে দিয়ে থানায় ডয়েরী করিয়েছিলেন পরিমলদা। থানা খুব একটা গা করে নি। বরং অপরেশবাবুর এ হেন বেয়াদপীর সাজা হিসেবে সাধনপল্লীর গুণ্ডারা আর একদফা ভাঙ্গচুর করে গেছে অপরেশবাবুর বাড়িতে। ওঁর একমাত্র মেয়ে বন্দনাকে রাস্তায়-ঘাটে তুলে নেবে বলে শাসিযে গেছে। শুনে আমি থ'হয়ে যাই। রোষে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। মুখে-চোখে সামান্য জল-টল দিয়ে সটান চলে যাই পরিমলদার বাড়িতে।

গম্ভীর মুখে বসেছিল পরিমলদা। সারা মুখের রেখাগুলি পাথরের মতো শক্ত। সেও ফিরেছে একটুক্ষণ আগে।

বলল, 'সবাইকে লাইব্রেরী ঘরে জড়ো হতে বলেছি। চল, যাই।'

'এর কি কোনো প্রতিকার নেই পরিমলদা? এভাবেই চলবে?'

একটুক্ষণ চুপ থাকে পরিমলদা। বলে, 'প্রতিকার তো এক-দুজনে করা যায় না। একযোগে রুখে দাঁড়াতে হয়। সেটারই যে ভয়ানক অভাব।'

'সেটা অবশ্যি ঠিক।' আমাকে স্বীকার কবতেই হয়।

লাইব্রেরী হলে আজ অনেক মানুষের জমায়েত। পাঁচশ-তিরিশ জন তো হবেই। লোড শেডিং-এর পর আরো পাঁচ-সাত জন এল। পরিমলদা বক্তব্য রাখলো এবং আগামী দিনে পরিস্থিতির কতখানি অবনতি হতে পারে, তার সুস্পষ্ট আভাসও দিল। সবাই বোবার মতো বসে থাকে। রা-কাড়ে না মুখে। কিছু বলবার দায় অন্যের ওপর সঁপে দেয়। এর মধ্যেও 'জরুরী কাজ আছে' কিংবা 'একটু আসছি' বলে কেটে পড়ে কেউ কেউ। পল্টু, হাবুদের মতো জনাকয়েক যুবক আর হেমাঙ্গবাবু, প্রমথবাবুদের মতো কিছু প্রৌঢ় অবশ্য মুখ খোলেন। বলেন, 'এর একটা বিহিত কবতেই হবে পরিমল। সীমা ছাড়িয়েছে এরা।'

অনেক আলাপ-আলোচনার পর সিন্ধান্ত হয়, একটা মাস-পিটিশন করে থানায় দেওয়া হবে। তার কপি দেওয়া হবে এস-ডি-পি-ও-র কাছে। ঐ পিটিশন নিয়ে ধর্ণা দিতে হবে থানায়। পাড়ার সবাইকে একসঙ্গো যেতে হবে। তাতেও কাজ না হলে, আমরা সামনের রাস্তা অবরোধ করব। সমস্ত খবরের কাগজে চিঠি লিখব। পাড়ার মোড়ে অনশন করব।

আমি মন দিয়ে শুনছিলাম পরিমলদার কথাগুলো। লক্ষ করছিলাম, প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া। জনা দশেক ছাড়া, আর সবাই কেমন মিইয়ে রয়েছে। 'হু—হ্যাঁ করছে বটে, তবে পুরো কর্মপন্থা নিয়ে তাদের মনে যে গুরুতর সংশয় রয়েছে, সেটা তাদের মুখ-চোখের ধরন দেখেই বোঝা যায়। বলি, 'যা করবে, আটঘাট বেঁধে, পরিমলদা। বেশ ভেবে-চিন্তে করবে। আমার মনে হয়, এসব মাস-পিটিশনের কম্মো নয়। অন্য কিছু ভাবতে হবে।'

সকাল থেকে হাবু-পল্টুরা মাস-পিটিশনখানা নিয়ে দুয়োরে দুয়োরে ঘুরছে। দেখলাম, এখন অবধি জনা সাত-আট সই করেছে। দরখাস্তখানা উল্টে-পাল্টে দেখলাম আমি। বললাম, 'আমি এক্ষুনি সই করছি নে। পরিমলদার সঙ্গো অফিসে কথা বলব। বিকেলে এস।'

টিফিন পিরিয়ডে দেখা হল পরিমলদার সঙ্গো। বলল, 'সই করিস নি কেন?' আমি সামান্য ইতস্তত করি।

অবশেষে বলি, 'তুমি তো আমাকে দীর্ঘ দিন দেখছ, পরিমলদা। তোমার সব মুভমেন্টেই তো আমি চিরকাল সঙ্গো থেকেছি। আসলে, ব্যাপারটা কী জান, খুব সম্প্রতি বাড়িটা শেষ করলাম তো। সমস্ত জানলায় ফ্যান্সি কাচ লাগিয়েছি। তাই ভাবছি—।'

পরিমলদা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। একটা মানুষকে লজ্জা পাইয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

'আসলে, হয়েছে কি জান—' আমি ওকে সমস্যাটা বোঝাবার চেষ্টা করি, 'আন্দোলনের স্বার্থে আমি প্রাণ দিতেও রাজি। কিন্তু সম্প্রতি পাড়ার মোড়ে একটা 'গ্লাস সেন্টার' খুলেছে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা এক ছোকরা। ও যে ঐ জলসা-পার্টির এক মাতব্বর, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কাচের দোকানটাও তেমন চলছে না ওর। সেই কারণে আশঙ্কা ... আসলে বাড়ির প্রত্যেকটি জানলার নতুন ফ্যান্সি কাচ কিনা। তা না হলে—তুমি তো জানই আমাকে—।'

বলতে বলতে পরিমলদার দু'হাত চেপে ধরি, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝলে না তো পরিমলদা? আমাকে অন্য কিছু ভাবলে না তো? অন্য কিছু নয়, শুধু জানলার ফ্যান্সি কাচগুলোর জন্যই—।'

আমি কল্পি ও ট্যাড়শ

১.

"একটা গুড নিউজ আছে।"

আমার কথায় সুব্রত মুখ তুলে তাকাল। চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কারো শুভ খবরে ওর চোখদুটো চিরকালই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বললুম, "কব্জির ব্যথাটা একদম সেরে গ্যাছে"।

সুব্রতর মুখে অকৃত্রিম আনন্দ। সাফল্যের হাসি।

"পুরো কোর্সটা খেয়েছিলি?"

এবার আমার হাসবার পালা। অপ্রস্তুত চোরের হাসি। কিংবা চালাকের।

"ওষুধটা খাবার সময় আর পেলুম কই? মানে, কেনবার সময়টাই তো পেলুম না।"

বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল সুব্রত। চোখেমুখে কপট রোষ। উষ্মা। ঠোঁটে নাজেহাল হাসি।

"শালা, সময় পাও নি? প্রেসক্রিপশনগুলোতে পয়সা লাগে না, তাই অমন হেলাফেলা? ভিজিট গুনতে হত বিশ টাকা, তাহলে ঠিক—।"

"চট্‌ছিস কেন? আমি ওকে আরও তাতাই, "তোর তো খুশি হবারই কথা। প্রেসক্রিপশন্‌টা পকেটে হপ্তাটাক্ রাখতেই ব্যথা সেরে গেল। কেমন হাত তোর, ভেবে দ্যাখ্।"

সুব্রত তখন পারলে গিলে খায় আমায়।

"আর জীবনে যদি তোর জন্য এককলম লিখি।"

আমি মুচকি হাসি। সুব্রতকে রাগানোটা আজকের নয়। এর আগেও শরীরের কোনও ঠেকায় বেঠেকায় সুব্রতর দ্বারস্থ হয়েছি। বেশ যত্ন করে দেখে টেখে ভেবেচিন্তে ওষুধ দিয়েছে সে। আমি প্রেসক্রিপশন্ পকেটে পুরে সোজা চলে এসেছি বাড়িতে।

দিন দুয়েক বাদে সুব্রত বাড়ি বয়ে এসেছে। খোঁজ নিয়েছে। আমার তখন কী অপ্রস্তুত অবস্থা। প্রেসক্রিপশন্ তো সেই পকেটেই রয়েছে। সাত তাড়াতাড়ি বলেছি "ভালো আছি! প্রায় সেরে উঠেছি।" আমার কথায় ওর সন্দেহ হয়েছে। এবং একসময় আমি ধরা পড়ে গেছি।

এরকম একবার নয়, বারবার ঘটেছে আমার জীবনে।

সুব্রত যে খারাপ ডাক্তার তা নয়। বরং অনেকের চেয়ে ওর জ্ঞান বুদ্ধি ভালোই।

আসলে এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস। যত হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটি, তত সিরিয়াস্‌লি চিকিৎসা করাই না। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ খাই-ই না। খেলেও শেষ অবধি চালিয়ে যেতে পারিনি কোনো দিন।

সেই কারণে সেই ছেলেবেলা থেকে যত রোগ আমার শরীরে ঢুকেছে, তারা কেউই বাসা পালটায় নি আর। শুধু সুব্রতই নয়, এই নিয়ে জীবনে কম ডাক্তারকে বিরক্ত করিনি আমি।

হোমিওপ্যাথিও ট্রাই করেছি। সেখানে বিড়ম্বনা আরও বেশি। একবার গেলে দ্বিতীয়বার যেতে গা ছমছম্ করে। অ্যালোপ্যাথিতে কেবল ডাক্তারের সামনে একটিবার হাজির হলেই হল। বাকিটা ডাক্তারের ভাবনা। ভালো ডাক্তারেরা রোগীকে বেশি বলতে দেন না। বলতে গেলেই বাধা দেন। তাদের ধারণা, রোগী তার নিজের কষ্টগুলো ঠিক ঠিক বলতে পারে না। যা বলে সবই তার মানসিক বিভ্রম। মিস্‌রিপ্রেজেন্টেশন্ অব্ দ্য ফ্যাক্ট। ভালো ডাক্তাররা তাই রোগীকে বোবা বানিয়ে, নিজেরাই টিপে-টুপে, ঠুকে-টুকে যা বোঝার বুঝে নেন। এ ব্যাপারে রোগীর কোনও ঝামেলা থাকে না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে ঠিক তার উলটো। রোগীর বংশ ইতিহাস, তার চোদ্দ পুরুষের ধাত, মুদ্রা, বদভ্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর চাই সেখানে। তারপর রোগীকে চলে নিরবচ্ছিন্ন জেরা। ঐ জেরার কাছে হাইকোর্টের ঝানু ব্যারিস্টারও লজ্জা পাবে।

শুলে ভালো লাগে, না বসলে? ব্যথা না যন্ত্রণা? ঝিন্‌ঝিন্ না চিন্‌চিন্? শুলে .বাড়ে, না বসলে বাড়ে? কী ধরণের স্বপ্ন দেখেন? স্বপ্ন দেখলে ঘাম দেয় কি না? সে ঘামের গন্ধ কেমন? স্বপ্ন দেখলে সকালে মনে থাকে কি না? মাথার ওপর মাছি ওড়ে কি না?”

“দূর মশাই, কী সব বাজে বকছেন তখন থেকে?”

“থাক্ থাক্ পাইয়া গেছি।”

“কি?”

“সিম্‌টম্”

“কী করে পেলেন?”

“ঐ যে খেঁকাইয়া উঠলেন। ঐটাই সিম্‌টম্।”

অফিসের এক সহকর্মী বন্ধু হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস্ করে। কর্মী মহলে খুব নামডাক তার। শুনি লুকিয়ে চুরিয়ে ফি-ও নেয় নাকি। একদিন টিফিন আওয়ারে অনেক জ্ঞান দিচ্ছিল সে। হোমিওপ্যাথির অব্যর্থ ফলাফল নিয়ে অনেক অকাট্য প্রমাণ ও উদাহরণ দাখিল করছিল। বন্ধুরা সব গোগ্রাসে গিলছিল ওর কথা। আমি এতক্ষণ চায়ের কাপ থেকে চোখ সরাইনি। সেটা লক্ষ করে ও বলল, মুকুল যে বড় চুপচাপ? এ বিষয়ে তোমার মত কী?

আমি জানি বিভিন্ন কারণে আমার মতামতের প্রতি আমার বন্ধুদের একটা প্রচ্ছন্ন টান আছে।

বলি, সে তো বটেই। হোমিওপ্যাথিতে তো সব রোগই সারে। বন্ধুটির চোখমুখ নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমি কথাটা শেষ করি, "তবে তার আগে নাকি একরাউণ্ড এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে নিতে হয় ?"

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই।

বন্ধুটি লজ্জা আর অপমানে লাল হয়ে বলে, "আসলে এ হল বিশ্বাসের ব্যাপার—।"

"সে তো ঠিকই।" আমি নিরীহ মুখে জবাব দিই। "হ্যানিম্যানের পুরো নামটাই তো হ্যানিম্যান বিশ্বাস।"

আবার হাসির রোল।

এইভাবে দুনিয়ার তাবৎ চিকিৎসককে আমি চটিয়ে বসে আছি। এদিকে দেহের মধ্যে পোষা অসুখগুলো লাই পেয়ে মাথায় চড়ছে ক্রমশ। দিন দিন ওরা চন্দ্রকলার মতো বাড়ছে।

২.

খুব সকালে আমি সত্যকিঙ্করের বাসায় গেলাম।

সত্যকিঙ্কর আইন পাশ করে নতুন ওকালতি জুড়েছে। আইনের নিবিড় প্যাঁচ কষতে কষতে তার কপালে এখনই সারবন্দী বলিরেখা উঁকি মেরেছে। আমরা বলতাম, "বাবা সত্যকিঙ্কর! ওকালতি মানেই তো মিথ্যের বেসাতি। তুমি শেষ অবধি মিথ্যাকিঙ্কর হতে চাও ?"

সত্যকিঙ্কর বেশ বনেদি বংশের ছেলে। কুঁদঘাটের দিকে ওদের সাবেক আমলের বাড়ি ছিল। বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ। এখন সেই বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা। চুণ-সুরকি খসে খসে পড়ছে। দেওয়ালে ফাট ধরেছে। চারিদিকে আগাছার জঞ্জাল। সত্যকিঙ্কররা বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি বানিয়ে উঠে এসেছে। পুরোনো বাড়িখানা এখন ভূত-বাদুড় আর চামচিকের বাসা।

আমার আসল গরজটা ঐখানেই।

সত্যকিঙ্কর আমার দিকে ব্যস্ত চোখে তাকাল। বলল, "কী ব্যাপার ? সাত সকালে যে ? বোস্"

বসলাম। সত্যকিঙ্করের মক্কেলরা দু'চারজন বাইরের বেঞ্চে বসে উসখুস্ করছে। সত্যকিঙ্করও চাইছে, আমি তাড়াতাড়ি যা বলার বলে কেটে পড়ি।

কিন্তু গিয়েই অমনি কাজের কথাটা পাড়া যায় না; হাজার হোক, ছেলেবেলার বন্ধু। একটু কুশল প্রশ্ন করতেই হয়। একটু আধটু স্মৃতি রোমন্থনও।

"তোরা তো এখানে উঠে এসেছিস্। পুরোনো বাড়িটা কে দেখছে টেখছে ?"

"কেউ না। আনকেয়ার্ড ফর।"

(সে তো আমি জানি। সেইজন্যেই তো আসা।)

সত্যকিঙ্কার চঞ্চল হয়ে উঠে।

"তুই কি বাড়িটার ব্যাপারেই এসেছিস্ ? তাহলে হপ্তাটাক বাদে খোঁজ নিস্। বাড়িটা ভাঙা শুরু হতে দেরি আছে।"

বলতে বাধা নেই, আমার ঐ কারণেই আসা। শুনেছি সত্যকিঙ্করেরা ঐ বাড়িটা ভাঙবে। ওর পুরোনো দরজা, জানালা, লোহার বীম সব বেচে দেবে। ওর থেকে খানিকটা নামমাত্র দামে বাগানোর ধান্দা আমার।

কিন্তু সত্যকিঙ্কর নিজের থেকেই সেটা আগেভাগে বলে ফেলায় ভারি অপ্রস্তুত বোধ করলাম আমি।

আসলে, কিছু চাইবার সময় সরাসরি এ্যাপ্রোচটা আমার ধাতে নেই কোনোকালেই। গেলাম, চাইলাম, পেলাম কিংবা পেলাম না—বড় ক্রুড্ প্রসেস। কোনও তৃপ্তি নেই ওরকম পেয়ে। অন্যের কাছ থেকে কিছু বাগানোটা ঠিক ছিপ ফেলে মাছ ধরার মতো। পাক্কা ছিপওয়ালারা ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারবেন আমার কথাগুলো। ছিপ ফেললাম, মাছ টোপ খেল, খিঁচ মারলাম, থলিতে ভরলাম—এমন শিকারে সুখ নেই একতিল। খেলিয়ে খেলিয়ে তুলতেই শিকারীর আনন্দ।

সেই কারণেই কাউকে টুপি পরানোর আগে আমি কখনই টুপি বের করিনে পয়লা চটকায়। গল্প শুরু করি মোজা দিয়ে। এইভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে যখন অপর পক্ষ ভোঁ হয়ে এসেছে, তখনই একসময় টুপ করে টুপিখানা পরিয়ে দিই মাথায়। ওর অজান্তে।

কিন্তু কেউ কেউ আগেভাগে বুঝে ফেলে। মুখ খুললেই, বলে দেয়, এটা চাইছিস তো? ওটা বলছিস তো? ধবধবে পাঞ্জাবির আড়ালে নোংরা গেঞ্জির অস্তিত্ব ধরা পড়ে গেলে যেমন লজ্জায় কুঁকড়ে যান ফুলবাবুটি, আমারও তখন সেই অবস্থা। ধরাপড়ে যাওয়ার প্রগাঢ় লজ্জা। গ্লানি! অপের পক্ষের ওপর রাগে রি-রি করে ওঠে সর্বাঙ্গ। বড্ড চালাক তো! খুব বুঝ্‌দার! হাঁ করলেই পেটে চোখ চারায়। আচ্ছা!

আসলে, আমি নিজের চারপাশে চালাক মানুষ একদম সইতে পারিনে। চালাক মানুষ আমার দু'চক্ষের বিষ। আমার অফিসে আমার চারপাশের টেবিলে আমার চেয়ে চালাক একজন ছাড়া আর কেউ নেই। অন্যেরা সব বেশ ভাল। অরুণ তো মাটির মানুষ। আর দিবাকর তো দেবতুল্য লোক (অর্থাৎ কিনা এদের আমি হরবখত টুপি পরাতে পারি অক্লেশে)। এদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও তাই গভীর। কেবল ঐ একজনই যা একটু বেয়াড়া গোছের। ঐ সাধন বোস। শালা নাক উঁচুওয়ালা লোকগুলো ভালো হয় না মোটেই। সাধন বোস যে আমার কোনও পাকা ধানে মই দিয়েছে, তা নয়। বরং দু'একটা খুচরো উপকার করে টরে। এমনিতে খুব ফিট্‌ফাট্ লোক। কারুর সাতেপাঁচে বড় একটা থাকে না। আমার সঙ্গে ওর কোনও স্বার্থের সংঘাত নেই। কোনো দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও মামুলি গোছের কথা কাটাকাটিও হয়নি ওর সঙ্গে। তবুও লোকটাকে আমার অসহ্য লাগে। অনেক ভেবে দেখেছি তার একটিই কারণ। ব্যাটা ভারি চালাক। আগেভাগেই আমার সব খেলা বুঝে ফেলে। ওটাই ভারি অসহ্য আমার। হয়তো মাসের শেষ নাগাদ গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সামনে। এমন কায়দায় চোখ তুলে তাকাবে, যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় "কী বাপধন, কোন ধান্দায় আগমন? বলে ফেল চটপট!" তবুও খুব মোলায়েম গলায় বললাম, "এই বোস, গোটা পঞ্চাশ টাকা হবে?" (মেয়েটার জ্বরটাতো কিছুতেই ছাড়ছে না। ডাক্তার না পাল্টালেই নয়। এদিকে বুঝতেই তো পারছ, মাসের শেষ।) কিন্তু ব্রাকেটের মধ্যের কথাগুলো বলার

আগেই সাধন বোস দুটো কাণ্ড করলো। এক, চোখ নাচিয়ে মৃদু গলায় বলল, "গ্রোব? মাই ফেয়ার লেডি? মিস্ সেনিয়েলের থেকে কনফারমেশন্ পেয়েছ?" দুই, কথাগুলো বলতে বলতে পার্স খুলে ফস্ করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিল। টাকাটা নিলাম। একটু হাসলামও। কিন্তু একটু তফাতে গিয়েই ঘাড় গলা মুছলাম ভালো করে। টয়লেটে গিয়ে জল ছিটালাম মুখে! আচ্ছা, টাকা দিলি বেশ করলি, কী দরকার ছিল তোর অমন নাটুকে হাসিখানা দেওয়ার? আমি সুতপার সঙ্গে গ্লোবে "মাই ফেরার লেডি" দেখতে যাচ্ছি এটা বুঝে ফেলার কী দরকার ছিল? পঞ্চাশ টাকা (ধার বইতো নয়) দিয়ে কেউ অমন মিষ্টি করে কান মলে দেয় মানুষের?

এই সবসময় মনের ভাব নির্ভুলভাবে বুঝে ফেলাটা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। দুনিয়ায় বেঁচেবর্তে থাকতে হলে দিনরাত হাজার খেলা খেলতে হয়। এ সংসার তো এক ক্রীড়াভূমি রে ভাই! তাবলে সব খেলার কৌশলগুলো তুমি যদি আগে থেকে বুঝেই ফেল্লে, তবে আমার যে জানপ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই মুস্কিল। এই ধরো মার্কসের ছেলেবেলার একটা রাতের ঘটনা জমজমাট করে বলছি সাঙ্গাপাঙ্গাদের। (মার্কসের জীবনী কে কতো পড়েছে, সে তো জানিই। মনীষীদের জীবন নিয়ে তাই বানিয়ে বানিয়ে যা খুশি বলে যাও, কেউ প্রোটেস্ট করবেই না।) সবাই গোগ্রাসে গিলছে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখি, কাগজপত্রে সই করতে করতে মূর্তিমান ঠোঁট বেঁকিয়ে অতি কষ্টে হাসি চাপছেন। ছোঁড়া তুমি পড়াশুনা করো জানি। তাই বলে তুমি দুনিয়ার সব কিছুই পড়ে ফেলেছ? মার্কসের জীবনে এমন একটা ঘটনা থাকতে নেই? পোঁদপাকামি আর কাকে বলে! এই সব অতি চালাকদের জন্যই দুনিয়াটা রসাতলে গেল।

শুধু সাধন বোসই নয়। কিরীটীটাও ফাজিল হয়ে গেছে ইদানিং। মাঝে মাঝে ফুট কাটে। দাদা আমাদের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। শুধু এদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কী? সত্যকিঙ্করকেই বা খামোকা গালাই কেন? পাড়াতে গনেশ সোম, প্রসাদ হালদার এরাও কি কম মাল এক-একটি? মাথায় সব জিলিপির প্যাঁচ। মোট কথা দিন-কে-দিন আমার চারপাশে চালাক মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তারা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমি অন্য পাড়ায় চলে যাবার কথা ভাবছি। অন্য অফিসে।

৩.

ইদানিং মুখে রোচে না কিছুই। জিভ, গলা খরখরে হয়ে থাকে। কড়কড়ে ভাত গলা দিয়ে নাবতে চায় না। শরীরে, মনে কিংবা মুখে সেই পিচ্ছিল ভাবখানা একেবারেই নেই।

বাজারে আগুন লেগেছে। মাছ-মাংসের বাজারে কদাচিৎ ঢুকি। ঢুকলেও একটা চরম আক্রোশ নিয়ে বেরোই। একটা চার-পাঁচ সেরি রুই দেখে বহুদিন বাদে টাক্‌রায় জল এল। গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পাশটিতে। দাম কতো? বাপরে। আঠাশ টাকা! কোনও বিয়ের লগ্ন তো নেই এ হপ্তায়। একটু কমসম করো বাপু। পঁচিশ? কাটিবে তো? দাও আড়াইশোটাক। আচমকা পেছনে বাজখাঁই গলা শুনতে পাই। —ঐ বড়ো রুইটা তোল তো হে পাল্লায়। এই রইলো থলি। ভরে রাখো। আসছি। শালা, চিলেরাও অত আচমকা অমন নিপুণভাবে

ছোঁ মারতে পারে না। লোকটাকে কষে একখানা থাপ্পড় মারতে পারলে শান্তি পেতাম, তার বদলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি চোরের মতো।

গৃহিনী? তিনি তো এই দুনিয়ার মানুষ নন। তিনি সত্যযুগ থেকে স্বর্গলোকে ছিলেন। স্বর্গলোক থেকে সরাসরি আমার কুটিরে। তিনি এ দুনিয়ার হালচাল কিছুই বোঝেন না। বোঝার চেষ্টাই করেন না। কী করে যে দিন হয়, দিন যায়, রাত আসে, ভোর হয়, সবকিছুই তাঁর অজানা। বাজারে তো সব জিনিসই আসে। আসে যখন বিক্রিও হয় নিশ্চয়ই। তাহলে কেনেও নির্ঘাৎ। শুধু আমি কেন সর্বক্ষণ হামলে বেড়াই সেটা তাঁর কাছে এক বিষম বিস্ময়।

আজকাল কিছুই করতে ইচ্ছে হয় না। বাড়ি থেকে অফিস যেতে ইচ্ছে করে না। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেও না। দুনিয়ার তাবৎ অমসৃণ রাস্তা দিয়ে হাজারো ঠোক্কর খেতে খেতে এগোয় আমার রোজদিনের গাড়ি।

আজকাল, তাই বেশি পরিমাণে ঢ্যাঁড়শ কিনি। ঢ্যাঁড়শ সেদ্ধ, ঢ্যাঁড়শ ভাজা, চচ্চড়ি, ঝাল, ঝোল, অম্বল। ভাতের সঙ্গে বেশি করে ঢ্যাঁড়শ্ চট্‌কে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলি। কড়কড়ে ভাত বেশ অনায়সেই চলে যায় পেটে। রোজ রোজ অন্ননালীকে এইভাবে পিচ্ছিল করে তুলি আমি।

কখনও কখনও একান্তে সুতপার ডান হাতখানা নাড়াচাড়া করতে করতে মনটা অজান্তে নরম হয়ে আসে। ভাবনাগুলো পিচ্ছিল হয়ে যায়। তখন ঢ্যাঁড়সের প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতায় দ্রব হয়ে ওঠে মস্তিষ্ক। সুতপার তুলতুলে আঙ্গুলগুলো আলতো টিপতে টিপতে বিড়বিড়িয়ে উচ্চারণ করি, লেডিজ ফিংগার!

৪.

এ সময়টা হাজরায় উঠে বাসের পেট অবধি পৌঁছানো যায় না। কিন্তু কী ভাগ্যি, আজ গেল। একদম পেছনের চাকার পাশাপাশি দাঁড়ালাম রড্ জাপ্‌টে। আর, একবার সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলে মনটা ঐ পুরোনো খেলায় মেতে ওঠে। এ সময়টা কাটে এক দারুন মানসিক ব্যায়ামে। সামনের সিটে বসে থাকা মানুষগুলোর চোখের উপর চোখ রাখি।

পড়তে চেষ্টা করি ওদের মনের ভাষা। দূর পাল্লার যাত্রিদের কোনও তাড়া নেই। চোখেমুখে একটা নিশ্চিন্ত আয়েসি ভাব। কিন্তু কাছেপিঠে যে নাব্‌বে, তার সদাচঞ্চল মুখ। ইতিউতি চাউনি। মুহুর্মুহু চমকে ওঠে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। ঠাহর করে, কোথায় এলাম? শহরের নতুন বাসিন্দা হলে ওদের উসখুস্ ভাবটা ধরা পড়ে সাদা চোখে। ওদের আমি পছন্দ করি না একতিল। সারা বাসের লোককে তুমি যদি বুঝিয়ে দিলে যে তুমি নাব্‌বে, তাহলে আমার ফয়দাটা কী হল? চারপাশের ডজন খানেক লোক উঁচিয়ে থাকবে তোমার সিটখানা দখল করার জন্য। সেখানে জোর যার, মুলুক তার। শরীরের জোর খাটানোটা আমি পছন্দ করিনে তেমন। পারিও না সে লড়াই জিততে। আমার হলো মগজের খেলা। তুমি যতই নিশ্চিন্ত ভাব করে বসে থাকো, আমি ঠিক বুঝতে পারবো তুমি কদ্দূর গিয়ে নাব্‌বে। আমি পজিশন নিয়ে থাকবো নিঃশব্দে। এবং যেই না তুমি আচমকা উঠে দাঁড়ালে, অমনি আমি বসে পড়লাম টুপ

করে। তোমার একদম সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা বোকার মতো দেখল আমার বসাটা। এই খেলাটা জমে ভালো, যদি তুমি এই শহরের পোকাটি হও। তাহলে তুমি তোমার নিজের স্টপ অবধি ঢুলতে থাকবে নিশ্চিন্তে। কেউ তোমার গন্তব্যস্থান বুঝতেই পারবে না আগেভাগে। এবং সব ক্ষেত্রে আমিই বসে পড়ব টুপ্ করে।

এই যেমন এখন। আমার সামনের সিটে যে লোকটি বসে রয়েছে, তার চোখ মুখ যতই নির্লিপ্ত হোক না কেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি ওর গন্তব্যস্থান বেশি দূরে নয়। হাজরার মোড় ঘুরতেই ওর চোখের সূক্ষ্ম তরঙ্গ আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তার মানে আর দু'একটা স্টপ। আদি গঙ্গার ব্রিজের ওপর বাসটা ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ তুলল। লোকটা বার দুই কাশলো অকারণে। আমি বুঝি, এটা মোটেই কাশি নয়। এ হল, উঠে দাঁড়াবার প্রস্তুতি। আমি পজিশান নিলাম নিঃশব্দে। সত্যিই গোপালনগর স্টপে উঠে দাঁড়াল লোকটা। *ঠেলেঠুলে* এগিয়ে গেল দরজার দিকে। এবং আমি বসে পড়বার পূর্ব মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে গেল। পাশের বসে থাকা লোকটি সরে এসে শূন্য স্থানটি পূরণ করে ফেলল চকিতে এবং পাশের খালি হওয়া সিটখানাতে মুহূর্তের মধ্যে বসে পড়ল আমারাই পাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ঢুলতে থাকা লোকটি। ঝলসে যাওয়া ছাই রঙের অতি জীর্ণ ঢোলা প্যান্ট এবং কোট ওর পরনে। হাড্ডিসার মুখ। রক্তাভ চোখ। মলিন টাক। কিন্তু সারাক্ষণ তো ঘুমোচ্ছিল লোকটা। কখন সামনের সিটধারীর সঙ্গে লাইন করল? চোখ বন্ধ অবস্থায় খালি সীটে অমন অবলীলায় বসে পড়লই বা কেমন করে?

বসে পড়েই আবার চোখ মুদেছে লোকটা। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। নেই কোন বিকার।

কত ধুরন্ধর লোকই না হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে আমার চারপাশে! প্রকাশ না হলে বোঝা যায় না। এরাই আমার সাথে টেক্কা মেরে আমার বাসের সিট, বাজারের মাছ, পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিচ্ছে অদ্ভুত তৎপরতায়। হায়, এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কত অযোগ্য আমি!

৫.

আজ কল্পির ফোন এসেছিল দুপুরে। এই নিয়ে পরপর তিনদিন ফোন। ওদের বাড়ি যাওয়ার বায়না। কল্পি আমার মায়ের বান্ধবীর মেয়ে। সেই সুবাদে আমার মাসতুতো বোন। একসময় ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল। বেশ কিছুদিন চালু ছিল কথাবার্তা। সেই সময়টুকু বাদে কল্পি চিরকালই আমার মাসতুতো বোন।

কল্পির বিয়ে হয়েছে আজ বছর আটেক। স্বামীর কাছে মাইশোরে থাকে ও। দিন সাতেক এসেছে কলকাতায়। একবার দেখা করার জন্য ফোনে পীড়াপীড়ি করছে আজ তিনদিন। আজ অফিস-ফেরতা যাব, কথা দিয়েছি ওকে।

পটুয়াটোলা লেনে থাকে ওরা। মেডিক্যাল কলেজ স্টপে নেমে দু'তিন মিনিটের হাঁটা।

অফিসের টয়লেটে ভালো করে সাফসুতরো হয়ে বেরিয়েছি। কী ভাগ্যি বাসে সিটও পেয়ে গেলাম হাজরার কাছাকাছি। জুত করে বসলাম। এমন সৌভাগ্য বহুদিন হয়নি। তখন থেকে মনে উলটো ভাবনা খেলছিল। আজ কি কল্পির কাছে যাব?

একে তো বহুদিন বাদে অফিস ফেরতা লম্বা রুটের বাসে সিট পেয়ে গেছি। শ্যামবাজার অবধি তোফা যাওয়া যাবে। এতটা লম্বা পথ বসে বসে বাড়ি ফেরা। এ একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আজকাল। আচমকা মাঝপথে নেমে পড়ে এমন দুর্লভ সুখটাকে হাতছাড়া করি কেন? তাছাড়া আজ আবার আমার সিটের সুমুখে শুরু হয়েছে দুই প্রৌঢ়ের স্নায়ুর লড়াই। আমার ভেতরের বহু দিনের হেরে যাওয়া মানুষটা ফুঁসে ওঠে। এমন খেলা ছেড়ে কেউ মাঝপথে নামে রে হতভাগা? কল্লির কাছে কাল গেলে চলে না? শোধ নিতে ইচ্ছে করে না?

জুড়ে দিলাম খেলাটা।

সামনে দণ্ডায়মান, দোদুল্যমান, ঠাসবুনোট ঘর্মাক্ত মানুষ। পিটপিট করে তাকায়, কোন্ সীটটা খালি হচ্ছে। মাঝে মাঝেই উস্‌খুস্ করে উঠি। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফেলি। সাথে সাথে ডজনখানেক লোক চঞ্চল হয় ওঠে। একটা নীরব প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। একটা সাড়া পড়ে যায়। ব্যাপারটা খানিকক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার পর আমি আবার সীটের গায়ে এলিয়ে পড়ি। মানুষগুলো হতাশ হয়ে পড়ে। খটাখট আওয়াজ তুলে পা বদলায়। আমি মনে মনে বেজায় হাসি।

সামনের লোকদুটোর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। একজন ঢ্যাঙা, রোগা হাড্ডিসার শরীর। হত্তুকির মতো ছোট্ট লম্বাটে কেঠো মুখ। অন্যজন বেশ মোটসোটা, নাদুসনুদুস। ফোলা ফোলা গাল। মোটা ভুরুর তলায় রাগী গোলাকার মুখ। কানের ডগায় সাদা চুলের গোছা। গেরুয়া পাঞ্জাবির ওপর কালচে জ্যাকেট। ভাবছিলাম, কে জিতবে আজকের খেলায়? উঠে দাঁড়ালে কে বসতে পারবে সিটে? কে বেশি সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে? মোটা লোকটা ঠেলেঠুলে সোজা চলতে আসতে পারবে অবলীলায়। রোগা লোকটির ক্ষমতা নেই ওকে কনুই গুঁতোয় হারায়। আবার রোগা লোকটির এ্যাডভানটেজ হল, ও পাঁকাল মাছের মতো পিছলে চলে আসতে পারে সিটের কাছাকাছি। কিন্তু আমি খামোখাই ভেবে মরছি। আমি তো শ্যামবাজারের আগে নামছিই না। ঠেলেঠুলে অথবা পিছলে চলে আসার প্রশ্নই ওঠে না।

ইতিমধ্যে আমি বার চারেক ওদের সঙ্গে খেলাটা চালিয়েছি। আরও বার চারেক খেলব। সামনে কলেজ স্ট্রিটের মোড়। অনেক ওঠানামা হয় ওখানে। একটু আগে থেকেই শুরু করব খেলাটা। হেদোর কাছে আর একবার। হাতীবাগানে তৃতীয়বার।

ওয়েলিংটন পেরোতেই নড়েচড়ে বসলাম। কোলের ফোলিও ব্যাগটা হাতে নিলাম। আড়চোখে লক্ষ করলাম ওদের। ভেতর থেকে কুলকুল করে বেরোতে চাইছিল হাসিটা।

এমনি সময় রোগাপানা লোকটি বলে উঠল "আপনি তো শ্যামবাজার যাবেন, তাই না?"

টান্ টান্ করে বাঁধা সুতোখানা যেন পটাং করে ছিঁড়ে গেল নিমেষে। এমন জমে ওঠা খেলাটা ভেস্তে যায় দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলাম মনে মনে।

বললাম, "কী করে বুঝলেন? আপনি আমায় চেনেন?"

"চিনি না। তবে মাঝে মাঝেই তো আপনাকে ওখানকার সবজি বাজারে দেখি।" নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল লোকাটি, "এই তো পরশু, বোধ করি কেজিটাক ট্যাঁড়শ কিন্‌লেন, দেখলাম।"

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি মানুষ মুখে সূক্ষ্ম হাসির তরঙ্গ তুলে একসঙ্গে তাকাল আমার দিকে। কথাটা যেন নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাসে এবং আমার সারা মগজে।

"এত ট্যাড়শ কিনেছে লোকটা? একদিনে?"

মেডিক্যাল কলেজ স্টপ আসার খানিক আগে উঠে দাঁড়ালাম তড়িঘড়ি। ঠেলেঠুলে এগুতে লাগলাম দরজার দিকে। যতই হোক কল্পি কতদিন বাদে এসেছে। পবপব তিনদিন ফোনে ডেকেছে। আজ না গেলে ভারি বিচ্ছিরি হবে ব্যাপারটা।

বাস থেকে নাববার সময় কব্জির ঐ পুরোনো ব্যথাটা চাগাড় দিয়ে উঠল আবার। অথচ কোনও ডাক্তারের কাছে যাবার উপায় নেই। দুনিয়ার সব ডাক্তারকেই আমি চটিযে বসে আছি।

বাস থেকে কোনও গতিকে নেমেই আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো। এখন কল্পিই আমার একমাত্র ভরসা।

পেছনে বাসখানা একটা নীল মাছির মতো ভন্‌ভন্‌ করে নোংরা গিলতে লাগল সমানে।

যুদ্ধের ছবি

১.

সদাব্রত সান্যাল একটুক্ষণ ভাবলেন।

এতগুলি শুভানুধ্যায়ীর সমবেত প্রশ্ন, বাড়ি বয়ে খোঁজ নিতে এসেছে সবাই, জবাবটা ভেবে-চিন্তে দিতে হবে বৈকি। কাজেই, সদাব্রত সান্যাল দেওয়ালেব ছবিগুলোকে দেখলেন। সিলিং এবং সিলিংফ্যান। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী। ভুরু কুঁচকে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করলেন। এমন নীরোগ শরীরের অধিকারী তিনি, এককালে নিয়মিত ব্যায়াম করেছেন, এক নাগাড়ে তিনশো ডন-বৈঠক দিতেন, আচমকা তিন দিন শয্যাশায়ী, সহকর্মীদের ভাবনা তো হবেই।

আসলে, অফিস থেকে গেল-পরশু যখন বেরোলাম, ভালই ছিলাম। কেবল ঘাড়ে এক ধরনের যন্ত্রণা। প্রেসার বাড়লে হয়। ভাবলাম, আমার কি প্রেসার বাড়ল! তোমাদের বউদি বলে, শোবার দোষে। এই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি। অনেক সূক্ষ্ম কারণে তোমার বউদির সঙ্গো আমার নিরন্তর মতান্তর। হাঁটুতে ব্যথা হলে রেস্ট নেব, নাকি বেশি করে হাঁটব, এ্যাসিড কমাতে অবিরাম হজমুলা নাকি নিত্য সকালে লেবুর জল, ইন্ডিয়ার ফিল্ডিংটা বাজে বলেই বোলিং ফেল করছে, নাকি ছন্নছাড়া বোলিং বলেই ফিল্ডাররা ল্যাজে-গোবরে হচ্ছে,—এইসব নিয়ে দু'জনের দু'তত্ত্ব। যা হোক, অফিস থেকে তো বেরোলাম, এখন শেয়ালদা আসি কেমন করে? ঐ সময়টাতে ট্রাম-বাসগুলোর যা অবস্থা, যেন বিয়েবাড়ির ভোজ খেয়ে ফিরছে। পরের পেয়ে গান্ডে-পিন্ডে গিলে-টিলে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে জগদীশচন্দ্র বসু রোড ধরে, সন্ধেবেলায় যাকে ডেকোরেটরনির্মিত সঙ্কীর্ণ আলোকিত প্যাসেজ বলা যায়। তাও প্রতি পাতে (অর্থাৎ স্টপেজে) পড়ে রইল ভুক্তাবশিষ্ট প্রচুর। এইজন্যই বুঝি আজকাল নেমন্তন্নবাড়িতে ক্যাটারিং দিয়ে কাজ করালেও গৃহকর্তা সায়াহ্নেই জানিয়ে দেন, সব কিছুই রাঁধুনি দিয়ে বাড়িতে বানিয়েছি দাদা, এরা এসেছে স্রেফ পরিবেশন করতে। গৃহস্বামীর ক্ষতির কথা ভেবে যদি একটু মায়াদয়া করে নষ্ট না করে। বড় মেয়ে রুবির বিয়েতে ক্যাটারিং ফলাতে গিয়ে চোট খেয়েছিলুম। মেজ মেয়ে চুমকির বিয়েতে ভুলটা শুধরে নিয়ে বেঁচেছি। সব কিছুই বাড়িতে বানানো দাদা!

যাকগে, বাসে ওঠার আশা ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এলুম শিয়ালদা অবধি। স্টেশনে পৌঁছে দেখি গিজগিজ করছে মানুষ। ইলেকট্রনিক টাইমটেবিলে রক্তের অক্ষরে যে

ইস্তাহার জ্বলছে, তাতে ঘন্টা দুয়েক আগের খান তিনেক ট্রেনের নাম। অর্থাৎ সেগুলোই তখন অবধি ছাড়েনি। আমার গলা শুকিয়ে আসছিল তেষ্টায়। এক থেকে চার অবধি সমস্ত প্লাটফর্ম তখন প্লাবিত। বাড়তি জনস্রোত উপচে এসেছে স্টেশনের বাইরে অবধি। এ সময়ে যদি সহসা মনীশের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত! কারণ, অনেকক্ষণ ধরে আমার মগজের মধ্যে একটা আশঙ্কা ঘুরঘুর করছিল, ঘাড়ের যন্ত্রণা আর স্টেশনের ভীড় যে হারে বাড়ছে, শেষ অবধি বাড়ি পৌঁছুতে পারব তো? এমন সঙ্কটকালে মনীশ নামক যুবকটি এক জীবন্ত বিশল্যকরণী। মনীশকে চেন তো? আমরা দু'জনেই বারাকপুরের বাসিন্দা। আমি থাকি রবীন্দ্রপল্লীতে, ও মোহনপুরে। বড় আজব ছেলে মনীশ। মাধ্যমিকে চার-চারটে লেটার। একটা লেটারে লিখেছে, মনীশ, তুমি কি ভাল ছেলে! আর একটিতে, মনীশ, তুমি ছাত্রকুলের গৌরব। তৃতীয়টিতে, তুমি জাতির সম্পদ। চার নম্বর লেটারে লিখেছে, তাই বলে আবার চাকরি-টাকরি চেয়ে বসো না যেন। চাকরির বাজার বড়ই খারাপ। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পড়ছিল মণীশ। থার্ড-ইয়ারে উঠে আচমকা একটা চাকরি পেয়ে পড়াশুনো ছেড়ে দিল। ডালহাউসি পাড়ার কোথায় যেন চাকরি। সকালে বেরোতো, রাতে ফিরতো। আমাকে বলেছিল একদিন, কি করবো সান্যালদা, বিধবা মা আর পিঠেপিঠি তিন-তিনটে বোন, জাতির সম্পদ হয়ে ওঠা আর হল না। বছর চার-পাঁচ মোহনপুরে 'সবুজ সংঘ' নামে একটা ক্লাব গড়েছিল। সে ক্লাব পূজো-আচ্চা করত না, মাইক বাজিয়ে পাড়া কাঁপাতো না, ট্রাক আটকে চাঁদা তুলতো না, ফুটবল-ক্রিকেট, তাস-ক্যারামের টুর্নামেন্ট চালাতো না, কনট্র্যাক্ট বেসিস-এ ভোটে খাটত না। কেবল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোই ওদের কাজ ছিল। শবদাহ, দুর্নীতি-দমন, দাতব্য-চিকিৎসা, দাতব্য-শিক্ষা ...।

ঝামেলাতেও পড়ে যেত মাঝে মাঝে। এনক্রোচ করে বসত পুলিশ, অফিসার, নেতাদের মৌরসী-পাট্টাভুক্ত এলাকাগুলোতে। হৈ-চৈ পড়ে যেত সর্বত্র। এইসব কারণেই, যদিও মুখে সবাই 'এমন সমাজসেবী যুবক বিরল' বলে প্রকাশ্যে পিঠ চাপড়াত, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ভেতরে ভেতরে ওরা টাইট দেবার চেষ্টা করত মণীশকে।

স্টেশনে মানুষের সংখ্যা যতই বাড়ছিল, ঘাড়ের যন্ত্রণাটা বেড়ে যাচ্ছিল ততই। ভীড় দেখলেই আজকাল ভয় করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু আওয়াজ ওঠে। ভীড় বড় ভয়ংকর বস্তু। কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে কিংবা নিছক অকারণে যদি সহসা ফুঁসে উত্তাল হয়ে ওঠে এই জনসমুদ্রটি, বাঁচা দায় হবে, বিশেষ করে আমার মত মানুষের পক্ষে, যার বাহান্ন বছুরে শরীরে দিনভর পরিশ্রমের ক্লান্তি আর ঘাড়ে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা টনটনানি যন্ত্রণা। একবার মনে হল, বেরিয়ে পড়ি এই জনসমুদ্র থেকে। বাইরে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করি, খোলা হাওয়ায় দম নিই। যদি সবকিছু স্বাভাবিক হয় তো ভালই, নচেৎ চলে যাব বাসে চড়ে। কিন্তু তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। জ্যামের মধ্যে ফেঁসে গেছে গাড়ি। ব্যাক করবার কোন উপায় নেই। আমার পেছনে, সেও এক জনসমুদ্র, একেবারে বাইরে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড অবধি বিস্তৃত, থইথই, উত্তাল ...।

গেল হপ্তায়ও ঠিক এমনি হয়েছিল, কিন্তু সেদিন মনীশ ছিল আমার সঙ্গে। এক

সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিলাম দু'জনে। সেদিনও জনসমুদ্র এমনি থইথই উত্তাল ছিল। মনীশকে বলি, 'মনীশ, কেমন বুঝছো?' মনীশ বড় কষ্টে হেসেছিল।

বলি, এমনি সময়ে যদি কোনও কারণে প্যানিকি হয়ে ওঠে এই জনসমুদ্রের একটা ক্ষুদ্রতম অংশও, যদি হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে! ধর, এমন ভিড়ে পকেটমাররা তো অধিক মাত্রায় সক্রিয়, কেউ একজন ন্যালাক্ষ্যাপা পাবলিকও যদি 'পকেটমার', 'পকেটমার' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, যদি কাউকে ধরে আলটপ্‌কা পেটাতে শুরু করে, তাই দেখে যদি আরও মানুষ ধেয়ে আসতে চায় পকেটমারের দিকে, কিছু মানুষ যদি ভয় পেয়ে দৌড়োদৌড়ি জুড়ে দেয়, ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে আন্দাজ করতে পার? শুধু পায়ের চাপেই মরে যাবে বহু লোক। বলা যায় না, হযত আমিই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব, আর উঠতে পারব না। আমার বয়েস হয়েছে, শরীর ক্লান্ত, ঘাড়ে স্থায়ী যন্ত্রণা ..., বলতে বলতে তেষ্টাটা বেড়ে গেল সহসা। মণীশ আবারও কষ্ট করে হাসে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে একজোড়া পাইনেপ্‌ল্‌ লজেন্স। একটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, খান, চুষতে থাকুন, তেষ্টা কমবে। এক সময় মনীশ বলে, চলুন বেরোবার চেষ্টা করি। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

—কি করে বেরোবে তুমি? দেখছ না—?

—এর মধ্যেই ঠেলেঠুলে বেরোনো যাক। বাইরে গেলে খোলা হাওয়ায় অনেক বুদ্ধি বেরোবে। আমি পথ করে করে এগোচ্ছি, আপনি আমার পিছু ছাড়বেন না।

তারপর, দীর্ঘ আধ ঘন্টার কৌশল মেশানো পরিশ্রমে, মূলত পুরো কৃতিত্বটাই মনীশের, আমরা স্টেশনের বাইরে এলাম। খোলা হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। মিষ্টির দোকানে ঢুকে জল খেলাম। তারপর এস-১১ বাসে চড়ে আমরা ঘরে ফিরেছিলাম, কিন্তু রাত এগারোটা বেজে গিয়েছিল। বাড়ির প্রায় সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। সাদা খইয়ের মতো ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল তাদের চোখ।

গত পরশু মনীশকে না পেয়ে আমাকে ভীড়ের মধ্যেই আটকে থাকতে হল। ট্রেন চলাচল শুরু হল রাত সাড়ে-দশটার পর। ব্যারাকপুর স্টেশনে পৌছে নীলগঞ্জ ডিপোগামী শেষ বাসটা যদিও বা পেলুম, সেও মসজিদ মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল এক শবযাত্রী দলের মুখোমুখি। বাড়িতে পা দিলুম মধ্যরাতে।

বসবার ঘরে ঢুকেই আমার চোখ আটকে গেল ছবিখানার ওপর। ঐ ওপরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানা, তোমরা তো দেখেছ আগে। ভেরিশ্চাগিনের আঁকা, ১৮৭২ সালের যুদ্ধের ছবি। আদিগন্ত বিস্তীর্ণ এক বৃক্ষশূন্য প্রান্তর জুড়ে এক বিশাল খুলির পাহাড়, মানুষের খুলি। চুড়োয় বসে রয়েছে একটা নিঃসঙ্গ কাক, মনে হয় ওই যেন পাহাড়টার মালিক। সারা প্রান্তর একেবারে খাঁ খাঁ। কাকটার দু'চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। ছবিখানার নামকরণও মনে কর, 'যুদ্ধের মহিমান্বয়ণ'। তলার ক্যাপসনটাও দারুণ, 'অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মহাযুদ্ধ-বিজয়ীদের প্রতি উৎসর্গিত'। ছবিটা বহুদিন ধরে ঝুলছে আমাদের বসবার ঘরের দেওয়ালে। ইচ্ছে করেই রেখেছি ঐ বিবর্ণ ছবিখানা, ঐখানে। প্রতি মুহূর্তে আমি, আমরা সবাই, যাতে করে দেখতে পাই যুদ্ধের বীভৎসতম পরিণতির জ্বলন্ত চিত্রখানি। যেন ভুলে না যাই, ভুলে যেতে না পারি, এক

মুহূর্তের জন্য। কারণ, মানুষ তো বড় ভুলে যায়। আজকের দুঃখ কাল মনে থাকে না, তীব্র কশাঘাতের ক্ষতও দু'দিনেই মিলিয়ে যায় তার শরীর থেকে, মানুষ এমনই স্মৃতিহীন। ছবিখানা আমি সময় পেলেই দেখি, বাড়ির সবাই দেখে। আমরা মাঝে মাঝে ছবিটাকে নতুন নতুন চোখে বিশ্লেষণ করি। ছবিটাকে নিয়ে কোন কোনও সন্ধ্যায় ওয়ার্কশপ বসিয়ে দিই আমাদের বসবার ঘরে। সেই ওয়ার্কশপে পরিবারের সবাই থাকি, বহিরাগত দু' একজনও থাকে যারা যুদ্ধকে ভয় পায়। গভীর রাতে খুলিগুলোর ভেতর দিয়ে হু-হু হাওয়া বয়ে যায়, আশ্চর্য রিঁ-রিঁ আওয়াজ ওঠে, যেন করুণ বেহালার সুর। আমি স্পষ্ট শুনতে পাই, আত্মজদের ডেকে ডেকে শোনাই। তো, ঘরে ঢুকেই দেখলাম, ছবিটা একটুখানি বেঁকে গেছে ডাইনে। কি করে বাঁকলো? কেউ ছবিটা ধরে ঠেলে দিয়েছে নাকি! কিন্তু ওটা তো অনেক ওপরে, সাধারণের নাগালের বাইরে। তবে কি কেউ দেওয়াল সাফ করতে গিয়ে অমন বিচ্ছিরিভাবে হেলিয়ে দিয়েছে ছবিখানাকে, ডানদিকে? সবাই ঘাড় নাড়ে, সবাই খুব অবাক হয়ে যায়। আর একটাই সম্ভাবনা রইল, টিকটিকি। ছবিখানার পেছনে বাসা বেঁধেছে ওরা বেশ ক'টিতে, মাঝে মাঝে ওদের ঘরকন্নার আভাষ পাই। পোকার টানে হঠাৎ হঠাৎ কেউ কেউ তীরবেগে বেরিয়ে আসে ছবির পেছনের অন্ধকার থেকে। কিংবা ওখানেই, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যেই ছুটোপুটি জুড়ে দেয়। সব ক'টিতে মিলে দক্ষযজ্ঞ বাধায়। পারিবারিক অশান্তি, নাকি কোনও সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ওদের, ঠাহর পাইনে। হতে পারে, আজ দুপুর থেকে যে কোনও একটা সময়ে ওরা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে ছবিটাকে হেলিয়ে দিয়েছে, পরিবারের অন্যরা ছবিখানাকে দেখে নিজেদের মধ্যে যৎসামান্য জল্পনা কল্পনা চালাতে চালাতে চলে গেল যে-যার কাজে। আমার কিন্তু ঘাড়ের ঐ টনটনে যন্ত্রণাটা আবার শুরু হল, এবং ক্রমশ তা বাড়তে লাগল তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে। কোনও গতিকে চোখে-মুখে জল দিয়েই আমি শুয়ে পড়লুম বিছানায়। রাতে আমার কম্প দিয়ে জ্বর এল। সারারাত বেঁহুশ রইলুম, ভুল বকলুম, উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখলুম, সেসব আর মনে নেই। সকালে হুঁশ ফিরতেই অনুভব করলুম, আমার কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ অসাড়।

২.

অফিসেই শরীরটা কেমন খারাপ লাগছিল। কেমন আইঢাই করছিল। সারা শরীর গুলোচ্ছিল, অথচ বমি হচ্ছিল না।

—তার ওপর আপনার ঘাড়ের ঐ ব্যথাটা—।

—ব্যথা? ঘাড়ে? সে তো আমাদের আজীবনকালের সঙ্গী। ঘাড়ব্যাপী অর্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে থাকা ব্যথা। এয়োতির সিঁদুরের মতো আমরা তাকে ধারণ করি, বহন করি আজীবনকাল। যাকগে, সকাল থেকে কি কি খেয়েছি, যাতে বদহজম হয়ে অ্যাসিড হতে পারে? হলেও গা গুলোয়, বমি পায়। আজ সকালে পায়খানা পরিষ্কার হয়নি আমার। কনস্টিপেশন আর গ্যাস, আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল রে ভাই। একেবারে ফিনিশ হয়ে গেলাম। সামান্য ঠান্ডা জল খেয়ে লাইব্রেরি-রুমের লম্বা টেবিলে চড়ে শুয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, যদি একটুখানি ঘুম আসে। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল,

একটুখানি ঘুমোতে পারলেই ঝরঝরে হয়ে উঠবে শরীর। কিন্তু অনেকক্ষণ চোখের পাতা বুজে শুয়ে রইলাম, ঘুম এলো না কিছুতেই, ঘুম আমার আসে না।

একটু আগেভাগে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে দেখি, সেখানে ভয়াবহ অবস্থা। বহুক্ষণ ট্রেন বন্ধ, প্লাটফর্ম জুড়ে গিজগিজ করছে মানুষ। খানিক আগে স্টেশন জুড়ে দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে। একটা পকেটমারকে বেধড়ক পিটিয়েছে পাবলিক। খানিক বাদে পুলিশ, স্মাগলার আর পকেটমারের সম্মিলিত বাহিনী পাবলিকের ওপর চড়াও হয়ে তার শোধ নিয়েছে। সেই রোষে পাবলিক আবার কিছু কামরা ভাঙচুর করেছে।

সারা প্লাটফর্ম জুড়ে গিজগিজ করছে মানুষ। ট্রেন কখন চালু হবে ঠিক নেই। আমি জনতার মাঝে মনীশকে খুঁজতে লাগলাম আঁতিপাতি। কিন্তু এই জনারণ্যে যত দূর দৃষ্টি চলে মনীশ নেই। মনীশকে না দেখতে পেয়ে আমার আশঙ্কা আরও গাঢ় হল। ঘাড়ের যন্ত্রণা তীব্র হল ক্রমশ। আমি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘন্টা খানেক পরে ট্রেন ছাড়ল, এবং ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে আমি যখন বাড়ি পৌঁছলাম রাত তখন এগারোটা প্রায়। মসজিদ-মোড় এলাকাটা অন্ধকার, লোড শেডিং চলছে। এমার্জেন্সি আলো জ্বলছে কিছু ঘরে। রেলিং টপকে সেই আলোর ছিটেফোঁটা গরাদের ছায়াসহ রাস্তায় পড়েছে। আমি অন্ধকারে খানা-খন্দ সামলে হাঁটতে লাগলাম। খাটিয়ায় চড়ে একটা মড়া গেল পাশ দিয়ে। রজনীগন্ধা, ধূপ, নতুন কাপড়, অগুরুর পাঁচমেশালি গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে। কে মরল এই গভীর রাতে? আমাদের পাড়ার কেউ, নাকি অন্য পাড়ার? এত মানুষজন কেন পেছনে? কোনও ভি-আই-পি ব্যক্তি নাকি! আজকাল তো পকেটমার মরলেও লাশ নিয়ে মিছিল হয়, পথসভা হয়, যে-দলের পকেটমার, সেই দলই আয়োজন করে। বাড়ি-ফেরামাত্তর স্ত্রী বললেন, মণীশ হাসপাতালে। কোথায় নাকি ওকে খুব পিটিয়েছে। বাঁচে কি না বাঁচে। শুনে আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম। এমন প্রাণবন্ত পরোপকারী ছেলেটিকে কে পেটাল! ওর ওপর অনেকের খার আছে জানি। ওদের মধ্যেই কোন গ্রুপ—? বসবার ঘরে ঢুকে দেখি যুদ্ধের ছবিখানা ওল্টানো। পাহাড়ের চূড়োটা মেঝের দিকে। বউ-ছেলেকে বলায় ওরা যেন কাঁচা ঘুম থেকে জাগল, জানি নে তো, দেখিনি তো। আশ্চর্য, একটা জলজ্যান্ত ছবি পুরোপুরি উল্টে গেল, কেউ জানে না, দেখে নি! সারারাত তেমন ঘুম এলো না আমার।

—চূড়োয় বসে থাকা কাকটা, তার মানে, ঝুলছে।

—কাক? আরে না, না, কাক কোত্থেকে আসবে? কাক তো ছিলই না। যে দাঁড়িয়েছিল ঐ খুলি-পাহাড়ের চূড়ায়, তাকে এক ঝলক দেখা মাত্তরই আমার নিম্নাঙ্গ জুড়ে তীব্র ঝাঁকুনি। আর সেই ঝাঁকুনিতেই ... পুরোটা খুলেই বলি।

রাতভর ছটফট করতে করতে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখনই দেখলাম এক হাড় হিম করা স্বপ্ন। ঐ খুলির পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। নামবার পথ পাচ্ছিনে কোনও দিকেই। এমন নিটোল করে খুলিগুলো সাজানো, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, একটু এলোমেলো হাঁটলেই খুলিগুলো হুড়মুড়িয়ে ধ্বসে পড়বে এবং আমি নির্ঘাত

চাপা পড়ে যাব ঐ খুলির স্তূপের মধ্যে। দু'পায়ে ব্যালান্স করতে করতে অতি সাবধানে আমি অবতরণের প্রয়াস চালাই। ঘেমে-নেয়ে উঠি। এই ভাবে অনেকক্ষণের, অনেক অনুসময়ের প্রচেষ্টায় আমি যখন ঐ পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছি, তখনই সামান্য টাল খেলাম ডাইনে। তাতেই পাহাড় শুদ্ধু পুরো প্রান্তর, এমন কি দিগন্তরেখা অবধি হেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলাম, সকাল হয়েছে। গেল রাতের স্বপ্নটা খচখচ করছে মনের মধ্যে। কেবল, কেমন করে কি কৌশলে উঠেছিলাম ঐ পাহাড়ের চূড়োয়, সেটাই মনে করতে পারছি নে কিছুতেই। জানলা দিয়ে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। শুয়ে শুয়ে গাছ-গাছাল, দূরের খেলার মাঠ, পার্ক, সব কিছু দেখছিলাম। আমার বাম গালে রোদ্দুর পড়েছে। আমার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। ঘাড়ের যন্ত্রণাটা কিন্তু প্রবল হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি বিছানা ছাড়তে গেলাম, আর তখনই আবিষ্কার করলাম, আমার নিম্নাঙ্গে কোনও সাড় নেই। আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। ওগো, আমার নিম্নাঙ্গ অসাড়। ডঃ সেন, আমার সুদূর প্রতিবেশী, প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে এলেন, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। বললেন, আকস্মিক কোনও শক, নার্ভের ওপর, তাতেই—। তারপর, একে একে এলেন ডাঃ রুদ্র, ডাঃ মল্লিক, আমার ন্যাওটা ভাগনে শিবতোষ, এম-ডি হয়েছে, এল, পরীক্ষা করল ওষুধ দিল ...। অবশেষে তোমরা এলে, আজ।

৩.

সকাল থেকে মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। পায়ের পাতায় চিনচিনে অনুভূতি। লো-প্রেসার হল নাকি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে হয়। হজমের গোলমালেও হয়। মনে দুর্ভাবনা থাকলে রাত্তিরে ঘুম হবে না, খাবার হজম হবে না, লো-প্রেসার অবশ্যম্ভাবী। অফিসে গিয়ে কাজে মন বসছিল না। খিটখিটে মেজাজ। কিচ্ছু ভাল লাগছিল না। খালি ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল। আমি চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে সিগারেট ধরালাম।

—গা গুলোচ্ছিল কি? বমি-টমি?

—ওটা আমার নতুন নয়? আজীবনকালের পোষা। সর্বদাই বমি বমি পায়। ক্রনিক আমাশা।

—হজমের গোলমাল আছে নাকি আপনার? বাউল্স্ ক্লিয়ার হয়?

—হজমের ভাই কস্মিনকালেও কোনও গোলমাল নেই। যা খাই হজম হয়। কালিয়া, পোলাও, বিরিয়ানি, পুঁইশাক, ফুচকা, রাবড়ি ভেলপুরী, হুইস্কি, কাবাব, কোপ্তা, কোঁৎকা, চড়-চাপড়, লাথি-ঘুষি, সব, সব। খাই, হজম করি, বের করে দিই। কিচ্ছু রাখি না পেটে, মনে। কাজেই বাউল্স্ আমার একদম ক্লিয়ার, কনসেইন্সও, সেই কারণেই।

শেয়ালদা স্টেশনে ঢুকেই শুনতে পাই সোরগোল। তিন নম্বর প্লাটফর্মে জমাট ভিড়।

—কি হয়েছে দাদা?

—পেটাচ্ছে।

—কাকে?

—একজনকে।

—কেন?

—অত প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না মশাই? পাবলে তো একটা চাকরি-বাকবি জুটে যেত এ্যাদ্দিনে। যত কড়া ইন্টারভিউই হোক বেরিয়ে যেতাম, মামা-কাকা ছাড়াই।

—পকেটমার? হাতে-নাতে ধরেছে?

—না, না ছাত্র। ইংলিশে অনার্স পড়ে প্রেসিডেন্সীতে। ছাত্র-ইউনিয়ন নিয়ে ঝগড়া। আজ ভোট ছিল তো কলেজে।

—আরে না, না। ছেলেটা নকশাল।

আমি তিন-নম্বর থেকে দু'নম্বরে চলে আসি। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে মারামারিটা ছড়িয়ে পড়ে সারা স্টেশন চত্বরে। পুলিশ আসে, লাঠি-চার্জ হয়, ট্রেন-চলাচল বন্ধ থাকে অনেকক্ষণ, সেই ক্ষোভে পাবলিক কিছু ভাঙচুর করে, ট্রেন চলাচল শুরু হয় রাত নটার পর। আমার বাড়ি ফিরতে এগারোটা।

মসজিদ-মোড়ে পান কিনছি, পাশ দিয়ে মড়া চলে গেল। সামনে-পেছনে অনেক ছোকরা। বল হরি, হরি বোল—

আমি তাকাতে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে নিলুম। শবদেহ দেখতে আমার ভাল লাগে না। যদি এমন কোনও মানুষের লাশ হয়, যাকে আমি আজ সকাল বেলাতেই দেখেছি, সুখ-দুঃখের কথা বলেছি, সইতে পারব না। আসলে, মৃতদেহ আমি সহ্য করতে পারি নে। বিশেষ করে, মৃতদেহের শরীর থেকে নতুন কাপড়, ফুল, ধূপ-ধুনো, অগুরুর যে পাঁচমিশেলী গন্ধ বেরোয়, তা আমার নিতান্তই অসহ্য ঠেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে নিঃশ্বাস চেপে আমি কোনও গতিকে পেরিয়ে এলুম জমায়েতটা।

ঘরে ঢুকতেই স্ত্রী বললেন, জান, মনীশ আজ হাসপাতালে মারা গেল। একটু আগে লাশ গেল, দেখলে না?

—ওটা মনীশের লাশ নাকি? কি আশ্চর্য! মনীশেরই!

স্ত্রী বললেন, আজ সন্ধ্যে নাগাদ শেয়ালদা স্টেশনে স্মাগলার, পকেটমার আর পুলিশ মিলে পকেটমার সাজিয়ে ওকে পিটিয়ে মেরেছে। হাসপাতালে যখন নিয়ে যায়, তার আগেই শেষ।

শুনতে শুনতে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। শেয়ালদা স্টেশনে যাকে পেটাচ্ছিল, সে মনীশ ছিল নাকি? ওরই ওপর তবে বারবার উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছিল লোকগুলো! হায় ভগবান! সহসা সারা শরীর জুড়ে বমি এল।

৪.

পরশু যখন অফিসে বেরোই, তখন কিচ্ছু হয়নি আমার। পুরোপুরি ফিট। অফিসে গেলাম, কাজ করলাম চুটিয়ে। অফিস ছুটি হতে হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদা এলাম। স্টেশনে ঢুকেই দেখি, এইমাত্র একটা কল্যানী লোক্যাল ছেড়ে গেল। এক থেকে চার অবধি কোনও প্লাটফর্মেই ট্রেন নেই। খুব একটা ভিড়ও নেই। চারটে প্লাটফর্ম জুড়ে বড় জোর শ'চারেক মানুষ। এই সময়ে একটা ট্রেন এসে পড়লে বাঁচি। বসবার জন্যে এক চিলতে জায়গা তাহলে পেলেও পেতে পারি। এরপর যত সময় যাবে, ভিড় বাড়বে,

ঠেলাঠেলি, ধ্বস্তাধ্বস্তি ...। এই সব সাত-সতের যখন ভাবছি, ঠিক সেই সময়ে আমার থেকে হাত দশেক তফাতে সহসা হল্লা বাধাল এক ছোকরা 'পকেটমার 'পকেটমার', ধর শালাকে। নিমেষের মধ্যে নড়ে চড়ে উঠল চারপাশের জটলাগুলো। মার্ মার ...। ততক্ষণে জনা পাঁচ-সাত ছোকরা পেটাতে শুরু করেছে ছেলেটাকে। ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছেলেটা। ওদের ঠেলে ঠুলে হাত পাঁচেক এলোও। আর সেই সুযোগে আমি দেখলাম ওর মুখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার গা গুলোতে লাগল। মনীশ—! অস্ফুট স্বরে নামখানা উচ্চারণ করবার আগেই ও ঢাকা পড়ে গেল চারপাশ থেকে ছুটে আসা মানু্ষের বেষ্টনীতে! শুধু উন্মত্ত মানুষগুলোর মারণ-মুদ্রা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম আমি। দু'একবার যেন শুনতেও পেলাম মনীশের অন্তিম আর্তনাদ। আমার শরীরটা কেমন দুর্বল লাগছিল। পা দুটোয় যেন শক্তি নেই। যেন মাস দুয়েক টাইফয়েডে ভুগে সবে উঠেছি আমি। আচ্ছা, মনীশ কি আমায় দেখতে পেয়েছিল? কেন জানি আমার সন্দেহ হচ্ছে, এক পলক, স্রেফ এক ঝলকের জন্য মনীশের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল আমার। পর মুহূর্তে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল জনতার ব্যূহের মধ্যে। আমি বুঝতে পারছিলাম, কারা ওকে মারছে, কেন মারছে, কাদের ভালোর জন্য ও মরছে। কাদের ভালো করতে গিয়ে। অথচ গণ-পিটুনির শরিক যেসব সাধারণ মানুষ, তারা জানলই না, কাকে মারছে, কেন মারছে, নিজেকেই মারছে ওরা, বুঝল না। আমার ভয় হল, যদি কেউ আমার চোখে-মুখে উদ্বেগ আর বিষাদ দেখে মনীশের সাগরেদ গোছের ভেবে নেয়! যদি ওদের কেউ আচমকা চিনে ফেলে আমাকে! এই স্টেশনে কিংবা অন্যত্র একসঙ্গে অনেকদিনই তো ঘোরাঘুরি করেছি দু'জনে। যদি মনীশই কোনও গতিকে ব্যূহমুক্ত হয়ে ছুটে আসে আমার দিকে! সান্যালদা, আপনি এদের বলুন, আমি পকেটমার নই, বলুন সান্যালদা। আমি একটু একটু করে পিছু হটতে থাকি। এরপর হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটবে পুরো স্টেশন চত্বর জুড়ে। মনীশের বন্ধুরা, ক্লাবের ছেলেরা খবর পেলে আসবেই। তারা মৃতদেহের দখল নেবে, ঘিরে দাঁড়াবে। তাদের হটিয়ে মৃতদেহ ছিনিয়ে নিতে, আসবে পুলিশ। শুরু হবে আর একপ্রস্থ দক্ষযজ্ঞ। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। আর আউটলেট বন্ধ হয়ে গেলে ড্রেনের যা অবস্থা হয়, সারা প্লাটফর্ম, স্টেশন চত্বর, মায় ট্যাক্সিস্ট্যান্ড অবধি উপচে পড়বে মানুষ, থইথই করবে মধ্যরাত অবধি। চাই কি উত্তেজিত জনতা স্টেশন ভাঙচুর করতে পারে। সেই সুবাদে আর একপ্রস্থ লাঠিচার্জ হতে পারে, গুলিও চলতে পারে, কে বলতে পারে! আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি। আর দেরি করলে আমি সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে আটকা পড়ে যাব মানুষের ব্যূহের মধ্যে। অভিমন্যুর মত আমিও ব্যূহ থেকে বেরোবার কৌশল জানি নে। সে জানত মনীশ। আগের দিন মনীশ ছিল, থইথই মানুষের সমুদ্র থেকে টেনে টেনে ডাঙায় তুলেছিল আমায়। আজ মনীশ নেই। কে বাঁচাবে আমাকে! ভাবতে ভাবতে আমার মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হল। ঠেলেঠুলে কোন গতিকে স্টেশনের বাইরে চলে এলাম আমি। মহাত্মা গান্ধী ধরে হাঁটতে হাঁটতে চিত্তরঞ্জনের মোড় অবধি এসে এস-১১ পাকড়ালাম। মসজিদ মোড়ে যখন পৌঁছুলাম, মধ্যরাত। বারাকপুর পরিক্রমা সেরে খাটিয়ায় চড়ে মনীশের লাশ চলেছে

গঙ্গার দিকে। আমার সঙ্গো ওর দেখা হল মসজিদ মোড়ের কাছাকাছি। ওকে যারা বইছে, তাদের চোখে চিকচিক করছে জল, জলের মধ্যে ঝিকমিক করছে আগুন, আগুনের ফুলকি। বাসটা তখনও বাজার-স্টপেজে আসে নি, আমার মনে হচ্ছিল, বাসের মধ্যেই না বমি করে ফেলি।

৫.

আসলে স্রেফ একটা কৌতূহল।

দেওয়ালের ছবিখানা দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয অন্য সকলের, সেটাই দেখতে চেয়েছিলাম। সেই কৌতূহলের বশেই বসবার ঘরের ঐ ছবিটাকে গেল-পরশুর আগের দিন মধ্যরাতে খুলে আবার উল্টো করে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম নিঃশব্দে। পরশু তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরলাম ঐ কারণে। দেখলাম, সবাই নির্বিকার, খাচ্ছে-দাচ্ছে, পেপার পড়ছে, ক্যারাম খেলছে, আড্ডা মারছে ...। ছবিখানাও দেওয়ালে নির্বিকার ওলটানো। সারা সন্ধ্যে সবাইকে নিয়ে আড্ডা মারলাম বসবার ঘরেই। যুদ্ধ নিয়ে কত কথা হল। চেঙ্গিস খান, তৈমুর, নেপোলিয়ন, হিটলার, ইরাক, ইরান, বুশ .... কিছুই বাদ গেল না, কেউই না। ছবি রইল ছবির মতোই, ওলটানো। কাকটা পাহাড়ের চূড়ো থেকে ঝুলছে, নিরালম্ব শূন্যে, পাক্কা একদিন, কেউ খেয়ালই করল না।

সে রাতে বলতে গেলে ঘুমই এল না আমার।

শেষরাতে ঐ স্বপ্নটা দেখলাম। তোমাদের সেটা আগেও বলেছি জনে জনে। পাহাড়ের চূড়োয় উঠে দাঁড়িয়েছি, কি করে উঠলাম জানি নে, এমনি সময়ে পেছনের অন্ধকার থেকে টিকটিকিগুলো প্রাণপণে ঘোরাতে লাগল ছবিখানা। চূড়োটা নেমে গেল মেঝের দিকে, আর আমি ঐ চূড়ো থেকে নিরালম্ব ঝুলছি। আমার পায়ের তলায় মহাশূন্য, ছায়াপথ, গ্রহ-নক্ষত্র, সৌরমন্ডল, নীহারিকা, ... স্থির নিস্তব্ধতা, কনকনে শীতলতা, ঘোর নির্জনতা, ... বায়ুহীনতা, আমি গলগলিয়ে ঘামছি, আমার ঘাড় টনটন করছে, আমার গা গুলোচ্ছে, বমি পাচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম, পায়ের পাতা চিনচিন করছে, আমার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। সারা গায়ে দেড়শোটা লাথি খাওয়ার ব্যথা। আমি চিৎকারও করতে পারছি নে। সারা শরীর জুড়ে আতঙ্ক, শুধুই আতঙ্ক। ঝুলন্ত আতঙ্ক হয়ে আমি দেখলাম, চারপাশ দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ ...। একে অন্যের সঙ্গো প্রবল ধাক্কা খেয়ে ভেঙে ধুলো ধুলো হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ আলোককণা, ছড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যে, হাউই পুড়লে যেমন ঝরে ঝরে পড়ে আলো। আমার সারা শরীর ঘেমে নেয়ে একসা, পায়ের পাতাও ভিজে গেছে। পাহাড়ের চূড়োর থেকে ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে পায়ের পাতা। আমি কি পড়ে যাব তবে! আমি কি অনন্ত মহাশূন্যে হারিয়ে তলিয়ে যাব! ভাবতে ভাবতে আচমকা পাহাড়ের চূড়ো থেকে খুলে গেল পায়ের পাতা। আমি পড়ে যাব, মহাশূণ্যে, পড়ে যাচ্ছি,—আমি—আহ্— !

আমার প্রবল চিৎকারে বাড়ির সবাই ছুটে এল। আমার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার গলাটা বুক অবধি শুকিয়ে কাঠ। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়েই টের পেলাম, আমর শরীরেব নীচের দিকটা অচল।

—আর ছবিটার কি হল ?

—ছবিটা ? ওল্টানো রয়েছে এখনও। আজ তিনদিন—। তি-ন দি-ন। কেউ খেয়ালই করে নি। কারো নজরেই পড়ে নি। ভাবতে পার ! অথচ ঐ ছবিখানা সম্পর্কে আমরা কতই না সচেতন। ওটাই না আমাদের স্মৃতিকে পুষ্টি জুগিয়েছে এতকাল।

—ঠিকই তো। আসলে, আমাদের দৃষ্টিতে আর কোন ছবিই ধরা পড়ে না। সোজা-উল্টো দুইই সমান মনে হয় তাই।

—শুধু ছবি কেন ? কিছুই ধরা পড়ে না। আজ তবে উঠি সান্যালদা। ভাল হয়ে উঠুন জলদি। আপনি না ভাল হয়ে উঠলে আমাদের সবারই মুস্কিল।

সান্যালাদার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি আমরা। বসবার ঘরে ঢুকে দেখি, ছবিখানা ঠিকঠিকই টাঙান রয়েছে। উল্টে যাওয়া তো দূবের কথা, ডাইনে-বাঁয়ে সামান্যতম-ও হেলে নি।

বাড়িউলি

১.

ছ-ফুট-বাই-চার ফুট ব্যালকনির সামনেটা ঐ রাতে যেন দীঘার সমুদ্রের বেলাভূমি।

তখন অনেক রাত, হু-হু করে হাওয়া খুব, কাছেপিঠে কোনও আলো ছিল না, খুব দূরে একটা ল্যাম্পপোস্টে টিমটিমিয়ে বাতি জ্বলছিল, তার আলো খুব সামান্যই পৌঁছেছিল ব্যালকনিতে। সারা শরীরে চোদ্দআনা আঁধার আর দু-আনা আলো মেখে ব্যালকনির সামনের পিচ রাস্তাটা এবং রাস্তার ওপারের ঝোপঝাড়-আগাছায় ভর্তি বুনো মাঠটা যেন সীতেশ আর করবীর চোখে রাতের সমুদ্র। সীতেশ আর করবী ব্যালকনিতে বসে বসে সমুদ্রটাকে দেখছিল। হু-হু হাওয়ার তোড়ে, ঝোপঝাড়ের চুড়োগুলো দোল খাচ্ছিল, করবীর মনে হচ্ছিল, সমুদ্রের সারবন্দী ঢেউ ওগুলো। আর, ঐ আলো-আঁধারি সমুদ্রের পাড়ে বসে ঐ রাতে করবী যেন ঠিক আট-ন বছরের বালিকা। ব্যালকনিতে বসে বসে ঐ রাতে পায়ের ওপর বালি চেপে চেপে ঘর বানালো করবী, ঘর-দোর, পাঁচিল-ঘেরা উঠোন ...। সীতেশ যদিও বসেছিল পাশটিতে, করবী দেখতেই পায় নি ওকে। কী করেই বা পাবে? সে তো ঐ সন্ধ্যায় আট-ন বছরের বালিকা মাত্র। আর ঐ বয়েসে তো করবীর জীবনে সীতেশ নেই। কাজেই, সীতেশের সঙ্গে তো তার দেখাই হয় নি তখনো অবধি। চেনেই না তাকে।

পুরো এলাকাটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ছিল তখন। যদিও প্লটে প্লটে বিক্রি হয়ে গিয়েছে চারপাশের তাবৎ জমি, ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে মাত্র গুটিকয় প্লটে। চারপাশে চোখ চারালে সাকুল্যে গোটা দশেক বাড়ি। বাকি জমি সব ফাঁকা, খাঁ-খাঁ ঝোপ-আগাছায় ভর্তি। কেউ বা ভিত গড়ে, কিংবা বড় জোর প্লিন্থ অবধি তুলে ডুব মেরেছে, কেউ বা চারপাশে পাঁচিল তুলে দম নিচ্ছে ...। এমন খাঁ-খাঁ মাঠে, বাড়িটা তৈরী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, আসতে চায় নি সীতেশ। বলেছিল, আরও কিছুদিন যাক, আরও বাড়িঘর উঠুক, এমন ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় ... সারাদিন তুমি একা একা ...। করবী *ঠোঁট উলটিয়ে নাকচ করে দিয়েছিল প্রস্তাবটা। বলেছিল, ফাঁকা জায়গা কী বলছো, খাঁ-খাঁ শ্মশানে বাড়ি বানিয়ে দিলেও চলে যাব। আর পারছি নে।*

গৃহপ্রবেশের ঐ সন্ধ্যায় অভ্যাগতরা চলে গিয়েছিল ন-টার মধ্যেই। ক্লান্ত সীতেশ আর করবী ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল ব্যালকনিতে। সারা দিনের কাজের ধকলে শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছিল, কিন্তু মনটা কানায় কানায় ভরে যাচ্ছিল এক

অনির্বচনীয় পুলকে। যেমন করে খেজুর গাছের শরীর থেকে রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভরে যায় ভাঁড়খানি, একটু একটু করে। সে রাতে ঘুম আসছিল না কারোর চোখেই। তারপর, একটু একটু করে রাত গাঢ় হল, চারপাশের বাড়িঘরগুলোর সব আলো একে একে নিভে গেল, কেবল করবীদের সারা বাড়ি ঝলমল করছিল আলোয়। এই অঞ্চলে তখনো অবধি স্ট্রীট-লাইটের ব্যবস্থা হয় নি। ফলে, সারা পাড়া জুড়ে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, আর, ঐ রাতে করবীদের আলো-ঝলমলে বাড়িখানা যেন রাতের সমুদ্রের বুকে একখানা বাতিঘর। একসময় ব্যালকনির আলোটাও নিভিয়ে দিয়েছিল করবী। একে তো হু-হু করে হাওয়া বইছে সমানে, এমনিতেই ঘুম এসে যায় চোখে, তার ওপর তখন চারপাশের সমস্ত বাড়ির মানুষজন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আর ঘুমন্ত মানুষ তো এমনিতেই খুব ছোঁয়াচে, দেখাদেখি করবীদেরও ঘুম এসে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঐ রাতে ঘুম ছিল না করবীদের চোখে। বিশেষ করে করবী, সারাদিনের হাজার ধকলেও সে এমনই তরতাজা চনমনে ছিল, দেখতে দেখতে সীতেশও অবাক। দেখেছিল, ওর সারা মুখের রেখায় ফেনা-ফেনা আবেগ। অতখানি আবেগপ্রবণ ওকে কখনোই দেখেনি সীতেশ। সোফার ওপর খুব আয়েসি ভঙ্গিতে বসেছিল করবী, আর সীতেশের মনের মধ্যে সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো সারবন্দী ছবি ...। কেমন করে জমিটা কিনলো, প্ল্যান বানিয়ে পাশ করালো, লোনের দরখাস্ত মঞ্জুর করালো, তারপর কেমন করে একটু একটু করে গাঁথা হল বাড়িখানা, দরজা-জানলা, গ্রীল ইত্যাদি বসল, মেঝেতে মোজাইকের বুকে কুঁড়ি ধরলো, ফুল ফুটলো, কেমন করে রঙেচঙে ভরে গেল দেওয়াল, এবং সীতেশ একদিন তার বাড়িউলিকে জানিয়ে দিল, সামনের মাসেই বাড়িখানা ছেড়ে দিতে চলেছে ওরা ...। তারপর, হপ্তাকালব্যাপী সে এক যুদ্ধ ...। একটা পুরো সংসারকে উপড়ে এনে নতুন মাটিতে বসানো, সার-জল দেওয়া ..., এবং সবশেষে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান ...।

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে এসে সীতেশের বন্ধুরা শতমুখে প্রশস্তি গাইল সীতেশের, নাহ্, এলেম আছে বটে সীতেশের। বলল, যাক, এ্যাদ্দিনে করবী বৌদির স্বপ্নটা তবে সফল হল।

সত্যি, বাড়ি-বাড়ি করে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল করবী। সীতেশ কখনো মুগ্ধ, কখনো বিরক্ত। বলেছিল, তোমার কি আর কোনই ভাবনা আসে না মনে? সারাদিন ঐ এক নিজের বাড়ির প্রসঙ্গ! রাতেও ঘুমের ঘোরে বাড়ির স্বপ্ন দ্যাখ বুঝি?

অনুযোগটা খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছিল করবী। বলেছিল, মেয়েরা ছেলেবেলা থেকে কী স্বপ্ন দ্যাখে, জান মশাই? ভালো ঘর, ভালো বর।

—ঘরটা আগে? বর পরে?

—তাই। একটা ঘরের স্বপ্ন মেয়েদের জন্মমুহূর্তেই তৈরি হয়ে যায়। খাদ্য মেটায় পেটের জ্বালা, আশ্রয় আনে নিরাপত্তা। আর এদেশের মেয়েরা তো আজীবনকাল নিরাপত্তার অভাবে ভোগে। তাই তারা আগে ঘর চায়, পরে বর।

করবী যখন মাঝেমাঝেই বলতো, স্বামীর ঘর মেয়েদের কাছে স্বর্গ, সেই স্বর্গের স্বপ্ন দেখে চলে সব মেয়েই, আশ্চর্য, করবীকে তখন ঠিক মা-ঠাকুমাদের মতো লাগতো

সীতেশের। অথচ সব ব্যাপারে ও কী দারুণভাবে আধুনিকা! তবে, পোশাকে-আশাকে, আচার-আচরণে ওর ঐ আধুনিকা হওয়াটাই কাল হয়েছিল, যখন ওরা ভাড়া ছিল ঘনশ্যাম মাইতির একতলায়। ওর বউ আকছার বলতো, ভাড়াটের অত ডাঁট কিসের? নিজের বাড়িতে গিযে ডাঁট দেখাক। না, সামানা-সামনি বলেনি, অন্যকে বলেছে, সে বলেছে করবীকে। করবী তো ক্ষেপে ফায়ার! সীতেশ বহু কষ্টে সামলেছে।

স্বামীর ঘরের প্রশ্নে সীতেশ করবীকে বলেছে, স্বামীর ঘরে তো তুমি কবেই এসেছ। আজ সাত বছর হলো। আন্দুলে তো আমাদের নিজেদের বাড়ি রয়েছেই। কোলকাতায় বদলি হয়ে আসার আগে অবধি তুমি তো ঐ বাড়িতেই থাকতে।

করবী ঠোঁট উল্টে বলেছে, ওটা স্বামীর ঘর নয়।

—স্বামীর ঘর তবে কোনটা?

—তুমি বানালে সেটা হবে। কবরীর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

—আন্দুলেরটা তবে কী?

—ওটা শ্বশুর-বাড়ি। করবীর ঠোঁটের কোণায় ততোধিক রহস্য।

আসলে, মেয়েরা মনে মনে চিরকালই একটা নিজস্ব সংসারের স্বপ্ন দ্যাখে। একান্ত নিজস্ব একটা সংসার। মেয়েরাই আগে দ্যাখে স্বপ্নটা, একটু একটু চারিযে দেয় ছেলেদের মনে। বাস্তবিক, করবী সারাক্ষণ এমন খোঁচা না লাগালে সীতেশের বাড়িটা অত তাড়াতাড়ি হতই না। সীতেশ ছুটেছে, কিন্তু করবী ছুটিয়েছে। সীতেশ যদি ঘোড়া হয় তো করবী সওয়ার। অবশ্য আরও অনেকেরই ভূমিকা ছিল ঐ বাড়িটার পেছনে।

সবার আগে নাম করতে হয় ঘনশ্যাম মাইতির বউয়ের আর বাবুলের মায়ের। সীতেশদের দুই বাড়িউলি।

করবী সীতেশের এমন কথার মর্ম বুঝতে পারে না। বলে, কেন? ওরা আবার কী উপকার করলো আমাদের! শুধুই তো জ্বালিয়েছে, যে কদিন ছিলাম!

সীতেশ বলে, সেটাই তো বলছি, ওরাই তো তোমার বাড়ির ক্ষিদেটা তিলতিল বাড়ালো। মানুষ তো ক্ষিদের জ্বালাতেই ছোটাছুটি জুড়ে দেয়। নিজে ছোটে, অন্যকে ছোটায়। ওদের জন্যই তো তুমি ছুটলে, আমাকেও ছোটালে।

করবী মৃদু হাসে, তা অবশ্যি ঠিক। ওদের একদিন আলাদা করে নেমন্তন্ন কর। দেখে যাক, ওদের চেয়ে ঢের ভালো বাড়ি হয়েছে আমাদের।

সীতেশ বলে, দাঁড়াও, আগে বাড়িখানা ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিই, মেঝেতে ম্যাট-ফ্যাট পাতি। কিন্তু ঐ মুহূর্তে, ঐ গৃহ-প্রবেশের রাতে, ব্যালকনিতে বসে, ঘনশ্যামের বউ আর বাবুলের মাযের সম্বর্ধনা-সভার একটা খসড়া আগাম বানিয়ে ফেলতে দোষ কি? কেমনভাবে ওদের অভ্যর্থনা জানানো হবে, কোথায় বসানো হবে, কী কী খাওয়ানো হবে, অনেকক্ষণ ধরে তারই একটা ছক বানাতে থাকে দুজনে মিলে। একটা মক-রিহার্সেলও দিয়ে নেয় বক্তৃতার। ...আজ আমাদের ভারী আনন্দের দিন...আমাদের বহুদিনের লালিত স্বপ্নটি আজ সফল হয়েছে। ...আমাদের নতুন বাড়ি হয়েছে। ...আর, সেজন্য আমরা বসু-দম্পতি, আমাদের শেষ দুই বাড়িউলি, শ্রীমতী কাদম্বরী মাইতি এবং শ্রীমত্যা ভানুমতী দেব্যার কাছে আজীবনকাল কৃতজ্ঞ থাকব। ...কারণ, ঐ দুই মহিলা

বিশেষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিলে আমাদের এই স্বপ্ন সফল হতে হয়ত বা আরও অনেক বছর লেগে যেত। ...আমাদের মধ্যে বাড়ি তৈরির ক্ষিদেটা বাড়িয়ে দেবার জন্য কী করেন নি এঁরা! যখন-তখন জল বন্ধ করে দিয়েছেন, একতলায় আমাদের গ্রীলঘেরা বারান্দায় রাখা ফুলের টবের মাটিতে অজান্তে নুন মিশিয়ে দিয়েছেন, দেয়ালে একটি মাত্র পেরেক ঠোকার অপরাধে যৎপরোনাস্তি গালমন্দ করেছেন, যখন-তখন নিজেদের আত্মীয়দের কাছে আমাদের ভাড়াটে, ভাড়াটের বউ ইত্যাদি বলে উপহাস করেছেন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটু জোর গলায় গল্প করলে দোতলা থেকে শতগুণ বাজখাঁই গলায় 'মেছোহাট অবিলম্বে বন্ধ করবার' নির্দেশ দিয়েছেন, মাসে একবার দোতলায় উঠে ভাড়া দিতে গেলে সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে জুতো খুলে যেতে বাধ্য করেছেন, এমন কি, মাঝরাতে বাড়ি থেকে বের করে দেবার হুমকিও দিয়েছেন...। এইভাবে, এঁরাই দিনের পর দিন তিলতিল করে আমাদের মনে চটজলদি বাড়ি বানাবার ইচ্ছেটাকে চাগিয়ে দিয়েছেন। তাই, আজকের এই শুভদিনে এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য কোনও ভাষাই বুঝি যথেষ্ট নয়। আশা করি, আগামী দিনেও, আরও অনেক ভাড়াটের মনে বাড়ি তৈরির ইচ্ছে বাড়িয়ে তুলে এঁরা মানুষের তথা সমাজের গৃহসমস্যার সমাধানে আরও উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করবেন। ...এঁদের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে আরও বহু মানুষ বাড়ি তৈরির কাজে প্ররোচিত হবেন। দিকে দিকে গজিয়ে উঠবে নতুন নতুন বাড়ি। ...সীতেশের ভাষণ শুনতে শুনতে ওদের মুখের অবস্থা কেমন হবে তা ভাবতে ভাবতে আর হাসতে হাসতে দুজনে লুটিয়ে পড়ছিল সোফাব গায়ে।

অথচ সেই ব্যালকনিতে, মাত্র মাস-ছয়েক বাদে, আজ, সেই গৃহপ্রবেশের দিনের মতো নিবিড় রাতে, সোফার দুপ্রান্তে দুজন মানুষ গুম মেরে বসে রয়েছে। দুজনের সব কথা বুঝি হারিয়ে গিয়েছে নিঃশেষে।

২.

প্রায় প্রত্যেক বাড়িওয়ালা নিজের বউয়ের সামনে কেন যে মেনিমুখো হয়ে থাকে, সীতেশের কাছে এ এক রহস্য। বিশেষ করে ভাড়াটের সামনে সেই মেনিমুখো ভাবটা কেন বেড়ে যায়, সীতেশ আজও বুঝতে পারে না। ঘনশ্যাম মাইতির মুখটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। চোরের মতো বাস করতো নিজের ঘরে। সীতেশরা ভাড়া এলে পর সে যেন একটা দম ফেলার জায়গা পেল। সীতেশের যাওয়ার তৃতীয় দিনে পা টিপে টিপে ঢুকলো। এদিক ওদিক তাকালো। সন্তর্পণে বসলো সোফায়। সামান্য হাসল।

—কেমন লাগছে? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

করবী চা চড়িয়েছিল, আর এক কাপ জল দিল কেটলিতে।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে 'আহ্' গোছের আওয়াজ তুলল ঘনশ্যাম। তারপর এদিক-ওদিক চোরা চাউনি হেনে বলল, একটু সাবধানে থাকবেন, মশাই।

সীতেশ বলে, কেন?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় ঘনশ্যাম বলে, ঐ যে, আমার বৌটি, ডেঞ্জারাস মহিলা, মশাই। তিরিশ বছর ঘর করছি তো, হাড়ে-মাসে এক হয়ে গেলাম।

বুঝবেন সব ধীরে ধীরে। আমি যে এখানে এসেছি, ঘুণাক্ষরেও বলবেন না যেন। শুনলে লঙ্কাকাণ্ড করবে।

সীতেশ অবাক হয়ে যায়, সে কি! কেন?

—দুটো কারণে। ঘনশ্যাম চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক মারে, —প্রথমত, ভাড়াটের সঙ্গে মেশামেশিটা ও একেবারেই পছন্দ করে না। ওতে নাকি বাড়িওয়ালার স্টেটাস নষ্ট হয়। দ্বিতীয় কারণ, ওর ধারণা, আমি ভাড়াটের ঘরে এসে ওর পিণ্ডি চটকাই।

নৈহাটির একটা চটকলে কাজ করে ঘনশ্যাম। সুপারভাইজার। নাইট-ডিউটিই বেশি পড়ে তার। ঘনশ্যাম চোখ নাচিয়ে বলে, পড়ে নয়, আমিই তদবির করে জোগাড় করি। নাইট-ডিউটিতে আলাদা অ্যালাউন্স পাওয়া যায়। তাছাড়া রাতে ঘরে থেকে কী লাভ বলুন তো? বউয়ের তো এই বাহার! সারাক্ষণ মুখ খ্যাঁচানি।

পরবর্তীকালে অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর 'প্রেমালাপ' থেকে সীতেশরা জেনেছিল, ঘনশ্যামের নাকি নৈহাটির দিকে একখানা রসের ঠেক রয়েছে। নাইট-ডিউটির বাহানায় ঐ ঠেকেই নাকি রাত কাটায়।

তো, বউয়ের প্রতি অসূয়ার কারণেই হোক, অথবা সীতেশদের প্রতি সমবেদনার কারণেই হোক, অথবা এই দুই কারণের পারম্যুটেশন-কম্বিনেশনেই হোক, প্রথম দিন থেকেই ঘনশ্যাম সীতেশদের শিবিরে যোগ দিয়েছিল। সময়-সুযোগ বুঝে পা টিপে টিপে ঢুকতো। বসতো। গল্প করতো। পনেরো আনা গল্পই নিজের বউকে নিয়ে। বউয়ের গুণপনার বাখান দিতে দিতে চমকে চমকে উঠতো। বলতো, কিছুদিন থাকুন, হাড়ে হাড়ে বুঝবেন। করবী ততক্ষণে ওর হাতে তুলে দিয়েছে গরম চায়ের পেয়ালা।

এক সময় করবীর মনে হল, এসব ব্যাপার মেয়েদের চোখেই বেশি ধরা পড়ে, লোকটার দুবেলা আসার মধ্যে একটা রিদ্‌ম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক চা চড়াবার আগের মুহূর্তেই হাজির হয় ঘনশ্যাম। রোজই তেমনটা ঘটে। আচ্ছা, লোকটা কৌশলে চা খেতেই আসে না তো? দু-কাপ চা, আজকের বাজারে কম করেও দু-টাকা, অর্থাৎ মাসে ভাড়াটের ষাট টাকা খসানো। বর্বরস্য ধনক্ষয়ং। কথাটা ঘনশ্যাম অন্য প্রসঙ্গে বলে মাঝে মাঝে। ওর খুব প্রিয় প্রবচন ওটা। বেশ মনের মতো স্লোগান। অত্যন্ত কৃপণ বন্ধু আচমকা প্যাঁচে পড়ে খাওয়াতে বাধ্য হলো, ক্ষিদে ছিল না, তবুও ঘনশ্যাম নাকি খেয়েছে স্রেফ 'বর্বরস্য ধনক্ষয়ং' প্রবচনকে মান্য করতে গিয়ে। এ ক্ষেত্রেও লোকটা ঐ স্লোগানটাকে মান্য করতেই রোজ দুবেলা আসে না তো? প্রতি মাসে ভাড়াটের ষাট টাকা ধ্বসিয়ে দেওয়া। বর্বরস্য ধনক্ষয়ং। বাড়িওয়ালাদের চোখে ভাড়াটেরা তো বর্বরই। তাদের জন্মের ঠিক নেই, চালচুলো নেই, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, টেস্ট-কালচার, কিছুই নাকি নেই। ঘনশ্যামের বউ তো প্রায়ই শোনাতো, 'কে জানে বাবা, কেন যে মানুষের মিনিমাম টেস্ট থাকে না।' করবীকে উদ্দেশ্য করেই শোনাতো।

করুণাময় হালদার, আজীবনকাল ভাড়াবাড়িতেই কাটিয়ে দিল সে, সীতেশের অফিসের বন্ধু, ভালোই বলে। ভাড়াটেরা নিতান্তই বর্বর। নিজের বাড়িতে বাস করেন যিনি, তিনি ভদ্রলোক। আর, বাড়িওয়ালারা হলেন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

রোজ চা খেতে খেতে হরেক কথা শুনিয়ে চলতো ঘনশ্যাম। তার গিন্নি কতখানি

চৌকস, তার শেয়ালের মতো বুদ্ধি, কুকুরের মতো সজাগ নাক-কান, তার মাথার চতুর্দিকে অজস্র চোখ...। সে অকুস্থলে না থেকেও অনেক কিছু শুনতে পায়, দেখতে পায়। বলতো, এই আপনারা, এই ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে যদি কোনও আকাম করেন, ও ঠিক বুঝে ফেলবে। এমনই ঐশ্বরিক ক্ষমতা ওর। আমার কোন কোন চাতুরি ধরে ফেলেছিল শুনুন। ঘনশ্যাম রয়ে-সয়ে পেশ করে তার দীর্ঘ তালিকা। এরপর আসে গিন্নির সাহসের খতিয়ান। কতখানি বেপরোয়া সে, ভয়ডরহীন, একাধিক উদাহরণসহ তা প্রমাণ করে তবে থামে। একবার নাকি এক ভাড়াটে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে লাইন করে ফেলেছিল। ওকে তাড়াবার যখন সময় এলো, পাড়ার ছেলেরা এলো ভাড়াটেকে প্রোটেকশন দিতে। দেখে তো আমি হেসে বাঁচি না। মনে মনে বলি, কোথায় খাপ খুলতে এসেছ শিবাজী, এ হলো পলাশীর প্রান্তর। যেই না উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে ছোকরার দল, অমনি আমার বউ দোতলা থেকে এমন দাবড়ানি দিল, ষণ্ডা-ষণ্ডা মস্তান ছোকরা সব পালিয়ে পথ পায় না। বেগতিক দেখে ভাড়াটে বললো, ঠিক আছে, আমাকে মাসটাক সময় দিন, চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার বউটি আবার ভারী একবগ্গা। যদি বলে, এটা করবো, তো করবেই। দুনিয়ায় হেন ব্যক্তি নেই, ওকে টলায়। ভাড়াটে বেচারি কতই না কান্নাকাটি করলো। কিন্তু নিজের বউ, কী আর বলবো, দয়ামায়া বলে কিছু ওপরওয়ালা দেন নি ওকে, ফলে সেই দিনই ভাড়াটেকে বিদেয় হতে হলো। আমার মা-টা কী করে মরলো? ঘরের কথা আর কাকে বলবো! রোজ অন্তত একবার ওকে গুমসানো চাই। একবার তো চ্যালাকাঠ দিয়ে বুড়ির হাতটাই দিল ভেঙে। দু-মাস হাসপাতালে রেখে তবে আমি সারাই বেচারাকে। শীতকালে শাশুড়িকে সাজা দেবার একটা অভিনব উপায় ছিল তার। গায়ে কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিত। আর, বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে কানে দু-চার দানা সরষে ফেলে দিতো। এমনটা শুনেছেন কখনো? এতখানি জল্লাদ মানুষ হয়?

একদিনেই নয়, ঘনশ্যাম এক-একদিন বউয়ের এক-একটি গুণপনা ব্যাখ্যা করতো। চা-টি শেষ হলেই অকস্মাৎ তার যেন খেয়াল হতো, বউ জেনে ফেলতে পারে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতো। চলি, জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। দেখতে দেখতে সীতেশেরও কেমন জানি মনে হতো, কেবল চা ধ্বংস করবার জন্যই নয়, লোকটা সম্ভবত কথার ছলে সীতেশেদের ভয় দেখাতে আসে। কেমন যেন মনে হতো, বউয়ের পক্ষে, বউয়ের সমর্থন নিয়েই লোকটা স্রেফ ভাড়াটের মনে বাড়িউলি সম্পর্কে ভীতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই আসে। এমন ধারণা কতখানি সঠিক, শেষ দিন অবধি সে ধন্দ ঘোচে নি সীতেশের।

ঘনশ্যাম মাইতির খপ্পর থেকে বছর খানেকের মাথায় সীতেশেরা গিয়ে পড়েছিল বাবুলের মায়ের খপ্পরে। তার নাম ভানুমতী। নামেও ভানুমতী, কাজেও। কাদম্বরীর খপ্পর থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য সীতেশরা যখন পাগলের মতো বাড়ি খুঁজছে, ভানুমতীর বাড়িখানার সন্ধান পেলো। দোতলা বাড়ির একতলার দু-খানা অন্ধকার ছোট ছোট ঘর, ভাড়া ন-শো। তার সঙ্গে দুখানা শর্ত। এক, গ্যাসে রান্না করা যাবে না স্রেফ নিরাপত্তাজনিত কারণে। গ্যাস 'বার্স্ট' করলে, তখন? একেবারে লঙ্কাকাণ্ড ব্যাপার

হবে। নইলে স্বয়ং ভানুমতীই কি আর সামান্য ক-টা পয়সা দিয়ে গ্যাস কিনতে পারতো না? সীতেশরা তাতেই রাজি। কয়লার উনুনেই রান্না হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো। বাড়িতে ভাড়াটেরা ছাড়া অন্য কেউ এসে থাকতে পারবে না। যদিও ট্যাপের জল ভাড়াটেরা পাবে না, তাদের জন্য উঠোনের টিউবয়েল, কিন্তু টিউবওয়েলেরও তো একটা লনজিবিটির ব্যাপার আছে, দুজনের জন্য যতটা জল লাগবে, বাড়তি লোক আসা মানে, বাড়তি জল। টিউবওয়েলের ওপর বাড়তি চাপ। মাটির তলায় জলের লেয়ার কমে যাবে...ইত্যাদি ইত্যাদি...। ভাড়াটের বাড়িতে বাড়তি লোক এলে আরও বহুবিধ লোকসান। হৈ-হুল্লোড় বাড়বে, সে একটা কথা, তাবাদে ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেপটিক-ট্যাঙ্ক জলদি ভরে যাবে। ভানুমতীর তৃতীয় শর্ত ছিল, কোনও দিন যদি লোডশেডিংজনিত কারণে ট্যাপের জল না আসে, তবে বাড়িওয়ালা টিউবওয়েল ব্যবহার করতে পারবে, এবং তার জন্য সীতেশদের বারান্দা দিয়ে টিউবওয়েলে যাবার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তার জন্য সীতেশদের 'এন্টাস' সর্বদাই খুলে রাখতে হবে। সীতেশদের তখন কোনও গত্যন্তর ছিল না। সব শর্তেই রাজি হতে হয়েছিল তাকে। তারপর শুরু হল ভানুমতীর খেল। সীতেশদের কয়লা রোজ-রোজ অস্বাভাবিক হারে কমে আসতে লাগলো। আর, তাতে করেই গ্যাসে রান্নার ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণ খানিকটা আন্দাজ করতে পারে সীতেশ।

সীতেশরা ঢোকার কিছুদিন বাদে একটা কুকুরের বাচ্চা আনলো বাবুল। সিঁড়িঘরের লাগোয়া যে জানলাটা সীতেশদের ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার একমাত্র উৎস, কুকুরটা ঐ জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচাতে থাকে। জানলা বন্ধ করে দিলে শোবার ঘর অন্ধকার, খুলে রাখলে কুকুরের অবিশ্রাম চিৎকার। সীতেশরা প্রমাদ গোনে। ভানুমতী দোতলা থেকে বাবুলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, কুকুর যাকে-তাকে দেখে ডাকে না কিন্তু। ওরা উল্টোপাল্টা লোকের গন্ধ পায় সঙ্গো সঙ্গো। পরে একদিন করবী বললো, জানো, কুকুরটা এমনি এমনি ডাকে না, ওকে আড়াল থেকে উসকে দেওয়া হয়। লেলিয়ে দেওয়া হয়। সীতেশ বিশ্বাস করেনি। পরে দেখলো, সত্যিই তাই। কুকুরটা সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ওকে উসকে দিল ভানুমতী। অমনি কুকুরটা জানলার পাশে এসে তারস্বরে ডাকতে লাগলো। সেদিনই সন্ধেবেলায় বাবুলকে ব্যাপারটা অতিশয় ভদ্রভাবে জানালো সীতেশ। বাবুল বলে, দেখছি। পরের দিন রাস্তায় দেখা হতেই বাবুল বলে, ও কিছু নয়। ও নিয়ে আপনারা ভাববেন না। কুকুরটাকে চেইজ করবার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। নইলে বড় হলে চোর-ফোর দেখলে ডাকবে না। এখন থেকে ট্রেনিং দিতে পারলে, পরে বদখত লোক দেখলেই ডাকবে। নইলে সারাক্ষণ ম্যাদা মেরে পড়ে থাকবে। চোর-চামার ঘরে ঢুকলেও রা কাড়বে না।

৩.

সুখের দিনগুলো বড় তাড়াতাড়ি কেটে যায়। মাস ছয়েক কেমন স্বপ্নের মতো কেটে গেল। নিজের বাড়ি, এটা বিশ্বাস করতেই কেটে গেল মাস তিনেক। বাড়িটার *প্রতিটি ঘর, ইট-কাঠ-জানলা-দরজাকে কেমন অচেনা লাগতে থাকে সীতেশদের।*

পেরেক ঠুকতে গিয়ে, কিংবা জোরে দরজা-জানালা বন্ধ করতে গিয়ে থতমত খায়। পর মুহূর্তে মনে পড়ে, আরে, এ-তো নিজেদের বাড়ি, ভয় তবে কাকে! শব্দ একটু হলেই বা কে আর চেঁচামেচি করবে? কে আর 'বাপের জন্মে তো বাড়িঘর ছিল না, দরজা-জানালার মর্ম ওরা বুঝবে কি?' বলে ঠেস মারবে? কখনো কখনো মনে হয়, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি শব্দ তুলে পেরেক পুঁতবে, অথবা দরজা-জানালা বন্ধ করবে সীতেশ। আচমকা বেয়াড়া গলায় গেয়ে উঠবে গান। যা খুশি তাই করবে নিজের ঘরে। এই নিয়ে কখনো-সখনো বাড়াবাড়িও করে ফেলে একটু-আধটু। অমনি রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে করবী, কী হচ্ছে কী? দরজা-জানালাগুলো ভেঙে ফেলবে নাকি?

ইদানিং রোজ সন্ধ্যায় জমজমাট আড্ডা বসে সীতেশের বাড়িতে। কথায় কথায়, কারণে-অকারণে হো-হো করে হেসে ওঠে সীতেশ। আর, সারাক্ষণ সমানে চলে ঐ এক আলোচনা। নিজের বাড়ি, ওটা বানাতে গিয়ে কত রক্ত, ঘাম ঝরাতে হলো, স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে তার একটি একটি হিসেব পেশ করে সীতেশ। কেমন করে ফস্কে যেতে যেতেও জমিটা পেয়ে গেল, কেমন করে মিউটেশন করালো, প্ল্যান পাশ করালো, লোন মঞ্জুর করালো—তার জন্য কত হাজার মাইল হাঁটলো, সব অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করতে করতে প্রতি সন্ধেয় বোর করে তোলে বন্ধুদের। সাত কাহন করে ব্যাখ্যা করে, কী কী অভিনব প্রভিশন রেখেছে বাড়িটাতে। কেমন করে বুদ্ধি খাটিয়ে এক হাজার স্কোয়ার ফুটের বাড়িটা এমনই প্ল্যানে বানিয়েছে, যাতে করে বাড়িটার একটা পোরশন প্রয়োজনে একেবারে সেপারেট করে ফেলা যায়। বসবার ঘর দিয়েই সিঁড়ি তুলে দিয়েছে। তাতে করে সিঁড়িঘরের স্পেসটা বেঁচেছে। বাড়তি জিনিসপত্তর তুলে রাখবার জন্য লফট রাখতে গিয়ে বাথরুমকে লো-হাইটের করতে হয়েছে। তাতে করে সিঁড়ির সেকেন্ড ল্যান্ডিংয়েই করা গ্যাছে লফটের দরজা। ফলে, কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে ওঠার দরকার নেই। ল্যান্ডিং থেকেই ঢোকা যাবে। ছাদ ঢালাই করবার সময় দক্ষিণ দিকে খানিকটা বাড়িয়ে রেখেছে। দোতলা করবার সময় ওটাই হবে ব্যালকনি। ফলে, দোতলার ফ্লোর-স্পেস বেড়ে যাবে। বক্স-জানালার তলায় একটা বাড়তি ঢালাই দিয়ে একটা করে খোপ বের করা গ্যাছে। সানমাইকার টানা পাল্লা লাগিয়ে নিলে তাতেও অনেক জিনিস ঢুকে যাবে। কথায় কথায় চলে আসে জোরে জোরে পেরেক পোঁতা, কিংবা দরজা-জানলা শব্দ করে বন্ধ করবার প্রসঙ্গ। করবীই তোলে। বলে, তিন মাসও যায় নি, এর মধ্যেই আপনাদের বন্ধুর বাড়ির ওপর সব টান ফুরিয়ে গিয়েছে। এমন করে পেরেক পোঁতে, দরজা জানলা বন্ধ করে, যেন নিজের বাড়ি নয়, ভাড়াবাড়ি।

—কী রে, এর মধ্যেই টান কমে এসেছে।

—না, না, কী যে বলিস!

—*ঠিকই বলা হচ্ছে।* করবী ঝাঁঝিয়ে *ওঠে,*—আপনারা পুরুষ মানুষেরা তো এ ব্যাপারে ওস্তাদ। আমরাও যে আপনাদের চোখে ক-দিন নতুন থাকি! বছর বছর বদলাতেন, কেবল জেল-ফাটক, আইন-আদালতের ভয়ে...। যাকে বলে, উড়তে না পেরে পোষ মানা!

এই বাড়িটার ওপর সীতেশের আর টান নেই বলছেন? বন্ধরাও রগড় জোড়ে।

—নেই-ই তো। কী জোরে জোরে পেরেক ঠোকে। দরজা-জানলা বন্ধ করে! বালতি

নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় সিঁড়ির কানাগুলোতে বালতিটা যে কতবার ঠোক্কর খায়। বাবুর খেয়ালই থাকে না।

শুনতে শুনতে সীতেশ কপালে চোখ তোলে। সারা মুখে সীমাহীন হাহাকার ফুটিয়ে বলে, কোনও লাভই হয় নি ভাই। নিজেদের বাড়ি হলেও আমরা ছেলেরা ভাড়াটে-জীবন থেকে মুক্তি পাইনে। নতুন বাড়িউলি ঠিকই জুটে যায়।

সবাই শব্দ করে হেসে ওঠে।

ইদানিং একান্ত হলেই, দুজনের মধ্যে বাড়িখানা কখন যেন সেঁধিয়ে যায় আস্ত। বাড়িটা নিয়েই যত কথা, যত স্বপ্ন...। পরিকল্পনা...। কিন্তু তার মধ্যে অস্বস্তিকর কাঁটা বিঁধে থাকে করবীর মনে, কিনা, খুব তো স্বপ্নে বিভোর দুজনেই, ওদিকে টুকরো টুকরো কত কাজই না বাকি থেকে গ্যাছে এখনো অবধি। বাইরেটা কেবল প্লাস্টার করে সিমেন্ট-গোলা জল বুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। স্নোসেম দিয়ে রঙ করা হয় নি। থ্রি-ফোল্ড সিঁড়ির ওপর কাঠের হাতল লাগানো বাকি। ছাদের সামনের দিকটায় অ্যালুমিনিয়ামের রেলিং লাগানোর ইচ্ছে, গ্রীলগুলোতে কেবলমাত্র প্রাইমার পড়েছে দু-কোট, রঙ পড়ে নি এখনো অবধি। সদর দরজায় এবং ছাদের দরজায় কোলাপসিবল গেট লাগাতে বলছে সবাই। দিনকাল নাকি একেবারেই ভালো নয়। কবে যে এসব হবে, কে জানে! সীতেশকে এসব কথা বলতে গেলেই মেঘ জমে ওর মুখে। বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটুখানি দম নিতে দাও। ওকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি? লোন শোধ বাবদ মাসে মাসে কাটা যাচ্ছে হাজার দুই টাকা। বাকি টাকায় সংসার চালানোই মুশকিল। আর, আজকাল জিনিসপত্রের যা দাম, একটা সামান্য কাজে নামতে গেলেও গাদা-গুচ্ছের টাকা চাই। হিসেব করে দেখেছে করবী, বাকি কাজগুলো শেষ করতে হলে এখনো কম পক্ষে হাজার-তিরিশেক টাকা চাই। অথচ লোন শোধ করতে গিয়ে এখন যা অবস্থা করবীদের, মাসের শেষে এমন টান পড়ে যাচ্ছে, বাড়তি টাকা বের করাই মুশকিল। সীতেশ বলে, অ্যাডিশন-অলটারেশনের খাতে কিছু লোন পাওয়া যায়, কিন্তু অত জলদি দেবে না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। বাড়তি লোন নেবার প্রসঙ্গে করবী তেমন করে বাজে না। এমনিতেই লোনের ধাক্কা সামলাতে হিমসিম অবস্থা, তার ওপর আবার লোন নিলে সংসার চালানোই মুশকিল হবে।

এমন এক পরিস্থিতিতে, মাস-ছয়েক বাদে, একদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথাটা প্রথম পেড়েছিল করবী। সেদিন খুব গরম পড়েছিল। ঘুম আসছিল না। ঘুমপাড়ানি হাওয়াও বইছিল না সেদিন। সেই ঘাম-গুমোটের মধ্যেই কথাটা প্রথম উচ্চারণ করেছিল করবী, বাড়িটার একটা পোরশন ভাড়া দিয়ে দিলে কেমন হয়!

সীতেশ নিদারুণ চমকে ওঠে। করবী বলছে এমন কথা!

আসলে, বাড়ি হওয়ার অনেক আগে থেকেই দুজনে একটা বিষয়ে বারবার একমত হয়েছিল, যত-যাই হোক না কেন, নিজেদের বাড়ি কিছুতেই ভাড়া দেবে না অন্যকে। 'বাব্বা, সাতটা শকুন মরলে একটা বাড়িউলি হয়।' এ কথা তো করবী হাজারবার বলেছে। সেই করবীর মুখে এমন কথা!

সীতেশ প্রথমটায় ভেবেছিল, বুঝি মস্করা করছে করবী। নেহাতই কথার কথা।

হেসে বলে, মন্দ কি? মাস গেলে না-হোক হাজার-দেড়েক টাকা বাড়তি এসে যাবে সংসারে। আমি কালই লোক লাগাচ্ছি।

সীতেশের বলার ধরনেই বুঝেছিল করবী, মস্করা করছে সীতেশ। কেন কি, করবীর প্রথম থেকেই ভয় ছিল, যদি কোনদিন সত্যি সত্যি বাড়িটা ভাড়া দেবার প্রশ্ন ওঠে তো আসল বাধাটা আসবে সীতেশের দিক থেকেই। সীতেশ বাড়ি ভাড়া দেবার ঘোর বিরোধী। সেই সীতেশ এমন একবাক্যে করবীর প্রস্তাব মেনে নেওয়াতেই করবী বুঝে ফেললো, মস্করা করছে সীতেশ। বললো, ঠাট্টা নয়, বাড়িটা করতে গিয়ে কত খরচ হলো বলো তো? এক কাঁড়ি টাকা লোন হলো। মাসে মাসে টাকা কাটছে, সংসারের বাজেটে টান পড়ছে, তার ওপর এখনো কত কাজ বাকি...। ওগুলো কবে শেষ হবে?

—শেষ করতে পারলে তো ভালোই হয়, তবে অনেক টাকার ব্যাপার যে।

—তবে? কোথায় পাবে অত টাকা? খালি বললেই তো হলো না। তাই জন্যেই বলছি, একটা পোরশন ভাড়া দিয়ে ঐ টাকায় কাজগুলো করিয়ে নাও। মাছের তেলে মাছ ভাজা। মাইনের টাকায় আমি সংসারটা চালিয়ে নেব কোনও গতিকে।

সীতেশ এবার আর ব্যাপারটাকে ঠাট্টার জায়গায় রাখতে চায় না। বলে, তা বলে আমার বাড়িতে ভাড়াটে? ভাবলেও হৃদকম্প হয়।

—কেন?

—রোজ অফিস থেকে ফিরে দেখবো, আমাদের বাড়ির সামনে লোক জমেছে। কী? না, 'সুন্দরমে'র ভাড়াটে—বাড়িউলিতে লড়াই বেধেছে।

—তুমি আমাকে তেমনটাই ভাব নাকি? করবী আহত হয়,—আমি ঘনশ্যাম মাইতির বউ কিংবা বাবুলের মায়ের মতো ঝগড়া করবো ভাড়াটের সঙ্গে?

--না, ঠিক তা নয়। সীতেশ অপ্রস্তুত বোধ করে,—তুমি অবশ্যই তেমনটা করবে না, কিন্তু, ঘাড়ের ওপর সারাক্ষণ একটা বাইরের পরিবার, আমাদের প্রাইভেসির ব্যাপারটাও ভাব...।

—কী যে বল তুমি! টাকা আগে, না প্রাইভেসি আগে? বাড়ির কাজগুলো যদি শেষ না হয় খারাপ লাগবে না তোমার? তার চেয়ে প্রাইভেসিটাই বড় হলো তোমার কাছে? তাছাড়া, ওরা থাকবে ওদিকে। ডাইনিং-স্পেসের দরজাটা হবে ওদের এন্ট্রান্স। ডাইনিংস্পেস, পশ্চিমের বেডরুম, স্টোররুম আর ছোট বাথরুমটা নিয়ে ওদের পোরশন, আমাদের রইলো বসবার ঘর, ব্যালকনি, দুটো বেডরুম, রান্নাঘর, আর বড় বাথরুম। মাঝখানে একখানা প্লাইউডের পার্টিশন বসিয়ে নিলেই হবে। সিঁড়িটাতো আমাদের এলাকাতেই রইলো, আমাদের বসবার ঘরের ভেতরেই সেটা, কাজেই ওদের ছাদে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। ইলেকট্রিক-মিটার, জলের পাম্পও নিজেদের থাকবে। অসুবিধাটা কোথায়?

সীতেশ শুনতে শুনতে চমৎকৃত হচ্ছিল। করবী মনে মনে অতকিছু ভেবে ফেলেছে! একেবারে ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার এলাকা ভাগাভাগির কাজও শেষ করে রেখেছে। সত্যি, মেয়েরা পারেও। সীতেশ আচমকা গুম মেরে যায়। করবীর দৃষ্টি এড়ায় না সেটা। আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত রাখে করবী। খুব নরম গলায় বলে, বি প্রাকটিক্যাল। কতগুলো বাড়তি টাকা আসবে বলতো? বাড়ির বাকি কাজগুলো তো

হয়ে যাবেই, চাই কি, একটু একটু করে দোতলাটাতেও হাত দেওয়া যাবে।

সীতেশ জবাব দেয় না করবীর কথার। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে সিলিংয়ের দিকে।

৪.

ইদানিং সীতেশের বাড়িতে সন্ধের আড্ডাগুলোতে আলোচনার প্রসঙ্গ বদলে গিয়েছে। এ কথা সে কথার পর করবী বাড়ি ভাড়া দেবার প্রসঙ্গটা তোলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের মধ্যে দুটো শিবির তৈরি হয়ে যায়। এক শিবির ভাড়া দেবার পক্ষে সওয়াল করে, অন্য শিবির বিপক্ষে। পক্ষের শিবিরেই বেশি জন। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে করবী ভাড়া দেবার পক্ষে অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করে, এবং সীতেশের বন্ধুদের এ ব্যাপারে সাক্ষী মানে। পাড়ার কারা কারা নিজেদের ছোট্ট বাড়িখানাতে কী কী ব্যবস্থা বানিয়ে নিয়ে বাড়ির একটা পোরশন ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে টাকা কামাচ্ছে, কারা কারা কেবল বাড়ির এক অংশ ভাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে দোতলার কাজে হাত দিয়েছে, করবী মুখে মুখে তার তালিকা পেশ করে। করবী কি তবে ইতিমধ্যেই দোতলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে! সীতেশ ভেবে পায় না। বলে, একতলাই শেষ হলো না, এখনই দোতলাওয়ালাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছ? দিস ইজ টু মাচ। মানুষের উচ্চকাঙ্খারও একটা সীমা থাকা উচিত।

করবী ঠোঁট উল্টে বলে, এক্ষুনিই দোতলা করতে হবে এমনটা তো বলছি নে, তবে স্বপ্ন যদি দেখেই থাকি, দোষটা কোথায়? উন্নতির স্বপ্ন কে না দ্যাখে? তবে আমি সে জন্য বলছি নে। আমি কেবল বলছি, তিনটে বেড-রুম, দুটো বাথরুম, এই মুহূর্তে আমাদের কী কাজে লাগবে? একটা পোরশন ভাড়া দিয়ে কিছু বাড়তি পয়সা আয় করে নিলে ক্ষতিটা কী? আর্থিক সাচ্ছন্দ্য তুমি চাও না?

সীতেশ নরম গলায় বলে, দ্যাখ, আমরা তো ডি-আই-জি অর্থাৎ ডবল-ইনকাম-গ্রুপ নই। সিঙ্গাল ইঞ্জিনেই আমাদের চলতে হয়। নিজেদের কোমরের জোর নিজেদেরই বুঝতে হয়।

সীতেশের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা রয়েছে এমনটা ভেবে নিয়ে মনে ব্যথা পায় করবী। সে যে চাকরি-বাকরি করে না, সীতেশকেই যে সংসারের পুরো ঘানিটাই টানতে হয়, এমন কথা সীতেশ রেগে গেলে মাঝে মাঝেই শোনায়। আসলে, সীতেশের প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিল, করবী একটা চাকরি করুক। কিন্তু করবী সেই বিয়ের পর পরই প্রস্তাবটা পত্রপাঠ বাতিল করে দিয়েছে। বলেছে, বাপরে, চাকরি-বাকরি আমার দ্বারা পোষাবে না। ন'টার মধ্যে নাকে-মুখে গুঁজে ট্রেনে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে চাকরি করতে যাওয়া, আমার ভাবতে গেলেই গায়ে জ্বর আসে। তারপর সন্ধে সাতটায় বাদুড়-ঝোলা হয়ে ঘরে ফেরা, তখন পেট জ্বলছে ক্ষিদেয়, শরীর জ্বলছে ঘামে গরমে, আর মাথায় আগুন জ্বলছে রাগে বিবক্তিতে। তারপর? সামান্য কারণে স্বামী-স্ত্রীতে গজ-কচ্ছপের লড়াই। ছোট মাসিদের দেখেছি তো। সীতেশ খুব একটা জোর করে নি। মনে মনে মেনে নিয়েছে করবীর ইচ্ছেটাকে। কিন্তু সংসারে টাকা-পয়সার টানাটানি শুরু হলেই

এবং ঐ নিয়ে করবী গজগজ করলেই, কখনো কখনো খুব রাগ হযে যায সীতেশের। তখনই সে এই চিরাচরিত খোঁচাটা মারে যে, সংসারে টাকা উপার্জনেব ক্ষেত্রে কেউ তাকে সাহায্য করে না। তাকে একাকেই পুরো দায়িত্বটা বহন করতে হচ্ছে। আর তাতেই করবীর মনে খুব ব্যথা জমে। অভিমান।

সীতেশের আজকের কথাটা করবীকে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। কিন্তু ইদানিং আর অতখানি আহত হয না করবী। অভিযোগটা তার গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। বরং ইদানীং করবী ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বলে, ও কথা বলো না, এ দেশে অনেক পরিবারেই একজন চাকরি করে, তারা ভালোই আছে।

আলোচনাটা কোন কোনও দিন খাত বদলায়। বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দেবার প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে ওরা প্রবেশ করে 'পুরুষ-নারীর মধ্যে কে ভালো' জাতীয় প্রসঙ্গে। ঐ নিয়ে কবির লড়াই চলে অনেকক্ষণ। আসলে সীতেশই আলোচনাটাকে কৌশলে অন্য খাতে বইয়ে দেয, এতদ্বারা যদি বাড়ি ভাড়া দেবার মতো অপ্রিয় প্রসঙ্গটা এড়ানো যায়। কিন্তু ভবী ভোলে না, খানিকক্ষণ বাইপাশ ধরে এগিয়ে করবীর 'বিষয়ের' গাড়ি আবার মূল পথে ফিরে আসে। এক সময বলে, সে যাই হোক, এখন তো আর চাকরি করবার বয়েস নেই, সে ভাবনা ভেবেও লাভ নেই। এক ইঞ্জিনেই চলতে হবে। তো, চলতে যখন হবে তখন অন্য কোনও দিক থেকে আরও একখানা ইঞ্জিন ফিট করা যায কিনা সেটাই ভাবতে হবে। বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিলে একটা বাড়তি ইঞ্জিন জুড়ে যাবে তোমার গাড়িতে, বুঝলে মশাই ?

সীতেশ জবাব দেয় না। কিন্তু কথাগুলো যে তার তিলমাত্র মনঃপূত হচ্ছে না সেটা ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়।

একদিন করবী প্রায় জোর করে সীতেশকে নিয়ে চলল হিমাংশু মিত্রর বাড়িতে। হিমাংশু কলেজে সীতেশদের এক ক্লাস ওপরে পড়তো। কিন্তু মফস্বলের কলেজগুলো যা হয়, চেনাজানা ছিল ভালোমতোই। কলেজের দিনগুলোতে সীতেশ বহুবার গিয়েছে হিমাংশুদের বাড়িতে। হিমাংশুও এসেছে। তারপরে একসময় কাজের ধান্ধায় কে কোথায় ছিটকে গেল। অ্যাদ্দিন বাদে হিমাংশুদের পাড়ায় ভাড়া এলে পর আবার দেখা হয়েছে দু'জনার। হিমাংশু অনেক চৌকস ব্যক্তি। বি-এ পাশ করেই চাকরির ধান্ধা শুরু করেছিল। সীতেশ যখন এম-এ পাশ করে চাকরি-বাকরি পেল, হিমাংশুর তখন বেশ কয়েক বছর চাকরি হয়ে গিয়েছে। পাশের পাড়াটার নাম বকুলতলা। হিমাংশু ওখানেই বাড়ি করেছে প্রায় পাঁচ বছর। প্রথমে একতলা। একটা পোরশন ভাড়া দিয়ে নিজেরা ছিল একটা দিকে। বছর-তিনেক দোতলা করে উঠে গেছে, একতলাটাকে দুটো অংশে ভাগ করে দুটো ভাড়াটে বসিয়েছে। করবীরা ইতিমধ্যেই হিমাংশুদের বাড়ি গিয়েছে বার-কয়। হিমাংশুর বউ দীপার সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে করবীর। গৃহপ্রবেশে হিমাংশুরা সপরিবারে এসেছিল। তারপর নতুন বাড়ি নিয়ে সীতেশরা এমনই মজে রইল, ক'মাস হিমাংশুদের বাড়িতে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

সেদিন অফিস থেকে ফিরতেই করবী বললো, চল, একবার হিমাংশুদাদের বাড়ি ঘুরে আসি।

—হঠাৎ ?

—হঠাৎ কি ? অনেক দিন যাইনি তো ওদের বাড়িতে। তাছাড়া নতুন পাড়ায় বাড়ি করেছি, সবাই প্রায় অচেনা, পুরোনো সম্পর্কগুলোকে মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার বৈকি। বিপদে-আপদে পুবোনো বন্ধু-বান্ধবেরা কত কাজে আসে।

হিমাংশুদের একতলায় দু'টো ভাড়াটে। আটশো স্কোয়ার ফুটের বাড়িখানাকে কী নিপুণ কৌশলে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলেছে, ছবি এঁকে এঁকে বোঝালো হিমাংশু। সামান্যক্ষণ কথাবার্তা বলেই সীতেশ বোঝে, হিমাংশু ইতিমধ্যেই বেশ পাকা এবং পেশাদাব বাড়িওয়ালা হয়ে উঠেছে। করবী নিজের বাড়ির এক অংশ ভাড়া দেবে শুনে উৎসাহিত দেখা গেল হিমাংশুকে। নড়ে চড়ে বসলো সে। বেশ অধ্যাপকীয কায়দায় সীতেশদের অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিল অনেকক্ষণ ধরে।

প্রথম কথা, ভাড়াটের সঙ্গো কখখনো ভাব করতে যেও না। তাহলেই ওরা মাথায় চড়তে চাইবে। এক জাতের প্রাণী রয়েছে, তারা এবং ভাড়াটেরা লাই দিলেই মাথায় চড়তে চায়। তখন ভাড়া দিতে দেরি করবে, যখন-তখন এটা-ওটা সারিয়ে দিতে বলবে, আনডিউ অ্যাডভানটেজ নেবার তাল করবে...। অনেক গাঁড়োল বাড়িওয়ালা রয়েছে, ভাড়াটের সঙ্গো রঙ-তামাশা করে, খিকখিক, খ্যাকখ্যাক...হাসিঠাট্টা...। তারা আখেরে ভোগেও। কাজেই, আহাম্মক এক, / যে ভাড়াটের সঙ্গো করে খিকখিক-খ্যাকখ্যাক। দ্বিতীয় কথা হলো ভাড়াটেকে সর্বদা পেছনের পোরশনটাতেই বসাবে। বাড়ির ফ্রন্ট সর্বদা নিজেদেব দখলে রাখবে। আহাম্মক দুই, / যে ভাড়াটেকে দেয় সামনের ভুঁই। তৃতীয় কথা হলো, ভাড়াটের সঙ্গো সর্বদা দাপটের সঙ্গো কথা বলবে। ব্যক্তিত্বের লড়াইতে সর্বদা আপারহ্যাণ্ডে থাকবে। মিনমিন করছে কি, ও তোমার ঘাড়ে চড়ে বসবে। আহাম্মক তিন, / যে ভাড়াটের সামনে করে মিনমিন। চতুর্থ কথা হলো, ভাড়াটের কাছ থেকে যেন ভুলেও টাকা ধার করতে যেও না। যেই না তুমি টাকাটি নিলে, ও মনে মনে তোমার মহাজন হয়ে গেল। তখন কথায় কথায় তোমার ওপর রোয়াবি করবে, ওর বউ তোমার বউয়ের দিকে খাটো চোখে তাকাবে, তোমাকে সারাক্ষণ সাইকোলজিক্যালি এক্সপ্লয়েট করবার চেষ্টা করবে। অনেক বাড়িওয়ালা এই ব্লাণ্ডারটি করে এবং ডোবে। কাজেই, আহাম্মক চার, / যে ভাড়াটের কাছে করে ধার। পাঁচ নম্বর কথা হলো, অনেক ভাডাটের আবার উদ্ভট সব হবি থাকে। যেমন ধর, গার্ডেনিং, নিজের থাকবার আস্তানা নেই, সখসাধ ষোলআনা। বাড়িওয়ালার ছাদের ওপর ব্যাবিলনের শূন্য-উদ্যান বানাতে চায়, অ্যাট দ্য কস্ট অফ ইয়োর রুফ। ভুলেও অ্যালাউ করো না। যখন ছাদটা পেলো না, তখন সে তোমার বাড়ির সামনের জায়গাটাকেই দখল করবার চেষ্টা করবে। তোমার বাড়ির সামনে মাত্র এক চিলতে জমি, তোমাকে মিষ্টি কথায় ম্যানেজ করে ঐ জমিতেই পুঁততে থাকবে, প্রথমে এক-আধটা গাছ, তুমি একটুখানি আস্কারা দিয়েছ কি ঐ এক চিলতে জমিটিকে গাছ-গাছালিতে ভরিয়ে ফেলবে এবং জমিটা কার্যত কিছুদিনের মধ্যেই ওর দখলে চলে যাবে। কাজেই, আহাম্মক পাঁচ, / যে ভাড়াটেকে লাগাতে দেয় গাছ। ছ'নম্বর কথা হলো, ভাড়াটের কাছে কখখনো ঘরের কথা লিক করবে না। অনেকে এই ভুলটি করে, এবং পরে পস্তায়। ভাড়াটের

মিষ্টি কথায় ভুলে নিজেদের সংসারের যাবতীয় কথা ওলাওঠার ভেদবমির মতো উগরে দেয়, আর, যেই না রিলেশনটা সামান্য স্ট্রেইন হলো, অমনি ভাড়াটে সেসব কথা রেলিস করে বলতে থাকে পাড়াশুদ্ধ সবাইকে। মনে রাখবে, ভাড়াটেকে নিজেদের গোপন কথা বলা, পাকিস্তানকে ভারতের ডিফেন্স সিক্রেট লিক করবার চেয়েও মারাত্মক। কাজেই, আহাম্মক ছয়, / ভাড়াটেকে যে ঘরের কথা কয়। সাত নম্বর কথা হলো, ভাড়াটেকে খবরদার নিজের বাড়ির ছাদ ব্যবহার করতে দিও না। ভাড়াটে ছাদে রোদ্দুর পোহাতে চাইবে, কাপড়-চোপড় শুকোতে চাইবে, গরমের দিনে খোলা হাওয়ায় বসতে চাইবে এবং এসবের জন্য বারবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করবে, তোমাদের প্রাইভেসির বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। আহাম্মক সাত, / যে ভাড়াটেকে দেয় ঘরের ছাদ। আট নম্বর কথা হলো, ভাড়াটের বাড়িতে উটকো লোকজন বেশি অ্যালাউ না করাই ভালো। লোকজন এলেই হৈ-হৈ, আড্ডা, হাট বসে যাবে তোমার বাড়িতে। কান পাতা দায় হবে। তাছাড়া, বেশি লোকজন আসা মানেই, বেশি জল খরচ, পায়খানার অধিক ব্যবহার। কাজেই আহাম্মক আট, / যে ভাড়াটেকে বসাতে দেয় হাট। ন'নম্বর কথা হলো, সর্বদা খেয়াল রেখো, ভাড়াটে যেন পাড়ার লোকের সঙ্গে বড় একটা মেশামেশি করতে না পারে। যেন পাড়াতে তার কোনও ফিল্ড তৈরি না হয। তাহলেই কিন্তু বিপদ। তুমি ভাড়াটেকে তাড়াতে কিংবা কড়কাতে চাইলে পাড়ার লোকেরা তোমার ভাড়াটের পক্ষ নেবে। আহাম্মক নয়, / যার ভাড়াটের সারা পাড়াই বন্ধুময়। এই ব্যাপারটা এনসিয়োর করার একটা প্রকৃষ্ট উপায় হলো, ভাড়াটে তোমার বাড়িতে এন্ট্রি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর বিরুদ্ধে পাড়াময় একটা হুইস্পারিং ক্যাম্পেন শুরু করে দিতে হবে। ওকে নিয়ে কিছু ড্যামেজিং গল্প ছেড়ে দিতে হবে বাজারে। ওর সম্পর্কে পাড়ার মানুষের মন বিষিয়ে দিতে হবে। আর, দশ নম্বর কথাটি হলো, বাড়িতে ভাড়াটে বসালে নিজের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে খুব সাবধান। তারা যেন কোনও ভাবেই ভাড়াটের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে না পারে। বাচ্চাদের নরম মন, কাদার তালের মতো, ওদের উইন করা সহজ। একবার ভাড়াটের সঙ্গে মিশতে দিলেই ওরা কলাটা নাড়ুটা দিয়ে তোমার ছেলেমেয়েগুলোকে দু'দিনেই বশ করে ফেলবে। তখন ওরাই হবে ঘরশত্রু বিভীষণ, তুমি ভাড়াটেকে কড়কাতে গেলে ওরাই প্রোটেস্ট করবে। তাছাড়া দু'বেলা যাতায়াত করতে করতে তোমাদের ঘরের যাবতীয় কথা পৌঁছে দেবে ভাড়াটের কানে। তোমাদের সব স্ট্র্যাটেজি, সিক্রেট ফাঁস করে দেবে। আর, ভাড়াটের সোমত্ত মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। সারাক্ষণ তোমার ছেলেটির গলায় ঝুলে পড়বার তাল খুঁজবে সে। কাজেই, দেখতে হবে, ভাড়াটের প্রতি তোমার ছেলে-মেয়েরা যেন সিমপ্যাথেটিক হয়ে না ওঠে। তাহলে শুধু তোমার নয়, ওদেরও ক্ষতি হবে। ভাড়াটেদের প্রতি সফট হয়ে গেলে, কেবল আজকেই নয়, ভবিষ্যতেও তোমার বাচ্চারা ভাড়াটে পুষতে গিয়ে কষ্ট পাবে। প্রয়োজনের মুহূর্তে ভাড়াটের প্রতি কঠোর হতে পারবে না। তাই বলি, আহাম্মক দশ, / যার ছেলেমেয়ে ভাড়াটের বশ।

এ ছাড়াও গুটিকয় মূল্যবান টিপস দিল হিমাংশু। যথা, নিজের বাড়ি ভাড়া দেবার আগে ভাড়াটের সীমানা, অধিকার, এবং টেনিয়োর সম্পর্কে একেবারে পাকা লিখিত

চুক্তিতে সই করিয়ে নেবে। তোমার বাড়ির ঠিকে-ঝি, কাপড়-কাচানি, সুইপার যাতে ভাড়াটের ঘরে বহাল না হয়, সেটাও দেখতে হবে তোমাকে। এতে করে অনেক আননেসেসারি জটিলতার সৃষ্টি হয়। কথা কেনাবেচার ব্যাপারটা তো রয়েছেই। এছাড়া তোমার কাজ করতে গিয়ে ওরা সারাক্ষণ রশির টান অনুভব করতে থাকবে, কেন না, তোমার ভাড়াটে তখন উসখুস করতে লেগেছে, কখন ঠিকে-ঝিটি তোমার বাড়ির কাজ সেরে ওদের বাড়িতে যায়। দেরি হলে, তেমন তেমন ভাড়াটিনি হলে, হাঁকডাক শুরু করে দেবে।

এতক্ষণ সীতেশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল, হিমাংশু থামলে পর বলে ওঠে, ভাড়াটিনি শব্দটা কি তোমার কয়েনেজ?

হিমাংশু নিঃশব্দে হাসে। তারা সারা মুখের রেখায় ফুটে ওঠে আবিষ্কারের অহংকার। দু'চোখ কপালে তুলে সীতেশ বলে, তুমি তো ভাড়াটেদের নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেছ দেখছি! বই-টই লিখবে নাকি?

সামান্য গম্ভীর দেখায় হিমাংশুকে। বলে, সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো ঠিকই ধরেছ তুমি। বিষয়টা নিয়ে একখানা বই লেখার ইচ্ছে রয়েছে। তুমি তো জান না, ভাড়াটেদের পাল্লায় পড়ে কতই না নাজেহাল হতে হয় বাড়িওয়ালাদের। সরকারি আইনও তো ওদেরই পক্ষে। কাজেই, সবকিছু টিপস দিয়ে যদি একখানা বই ছাপানো যায় তো বাড়িওয়ালাদের, নিদেন ট্যাক্টলেস বাড়িওয়ালাদের উপকার হবে।

রাতের খাবার খেতে খেতে কথাটা তোলে করবী।

—ঐ ব্যাপারটা কিছু ভাবলে গো?

সীতেশ সামান্য অন্যমনস্ক ছিল। অফিসে দিনকতক খুব ঝামেলা চলছে। মনটা সেই কারণেই ভালো নেই সীতেশের। করবীর কথায় ওর দিকে তাকায় সীতেশ কথাগুলো মগজ অবধি পৌঁছতে সময় লাগে। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে করবীর দিকে। বলে, কোন ব্যাপারটা?

—বাহ! ভুলে গ্যাছো? করবী যেন সামান্য বিরক্ত। —বাড়িটা ভাড়া দেবে কিনা, কিছু বললে না তো? এদিকে দীপাদি খবর পাঠাচ্ছে রোজ।

—কী খবর? খুব অন্যমনস্ক গলায় বলে সীতেশ।

—ভাড়াটের খবর, আবার কীসের খবর! করবী এবার স্পষ্টতই বিরক্ত, —কোথায় যে মন পড়ে থাকে তোমার!

হঠাৎই বেজায় রাগ জমে যায় সীতেশের মনে। কড়া করে দু'কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তাও নিজেকে কোনও গতিকে সামলে নিয়ে বলে, কী খবর পাঠাচ্ছে দীপা?

—ভাড়াটের খবর। করবী ঝুঁকে পড়ে সীতেশের দিকে, — বলছে, একটা নাকি ভাড়াটে আছে ওর হাতে। বেশ শাঁসালো পার্টি। বলছে, দেরি করলে হাত ফসকে যাবে। আমি নিয়ে আসতে বলে দিয়েছি। দেখে তো যাক। বলতে বলতে দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে করবীর। বলে, দীপাদি বলছে, যে পোরশনটা ভাড়া দিতে চাইছি, কম করেও হাজার টাকা ভাড়া হবে।

সীতেশ খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে করবীর দিকে। সহসা মাথায় রক্ত চড়ে যায় ওর। চিৎকার করে বলে, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। খাওয়া ফেলে দ্রুত পায়ে বেসিনের দিকে চলে যায় সীতেশ।

৫.

এমনিতেই আজ বিকেলে, অফিস থেকে ঘরে ঢোকার পর থেকেই, মেজাজটা খিঁচড়ে রয়েছে সীতেশের। তার কারণও করবী। একটুখানি তাড়াতাড়ি ছুটি হওয়ায় সীতেশ একটা সিনেমা দেখতে যাবার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল। হলে গিয়ে সিনেমা দেখা তো ইদানিং আর হয়েই ওঠে না। সময়ই হয় না, যতটুকু-যা সময় পায়, নিজের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে একুশ ইঞ্চির পর্দায় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। খুশির তোড়ে ফিরতি পথে দু-খানা টিকিট কিনেই বাড়ির পথ ধরেছিল সীতেশ। কিন্তু বাড়িতে পা দেওযা মাত্র তার চক্ষু চড়ক-গাছ। বারান্দা থেকেই দেখতে পায়, একটি দম্পতি করবীর সঙ্গে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরো বাড়িখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওরা। সীতেশ ঘরে ঢোকা মাত্র খুব ঘটা করে আলাপ করিয়ে দেয় করবী। —জানো, এঁরা একটা বাড়ি খুঁজছেন। দীপাদি পাঠিয়েছে। সামনের মাস থেকেই আসতে চাইছেন। বাইরের লোকের সামনে কোনও সীন ক্রিয়েট করেনি সীতেশ। গুম মেরে ছিল সারাক্ষণ। ওরা চলে যাবার পর যাবতীয় রোষ উগরে দিয়েছিল করবীর ওপর। সিনেমা দেখতে যাওয়া মাথায় উঠেছিল। সারা সন্ধে করবীর সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেনি। একা একা ব্যালকনিতে বসে বসে একের পর এক সিগারেট খেয়েছে। করবী বেশ কয়েকবার এসেছে, ঘুরঘুর করেছে সীতেশের আশেপাশে, এটা ওটা বলে অস্বস্তিকর বরফটা গলানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সীতেশ ওর দিকে তাকায়ও নি। সন্ধিস্থাপনের কোনও লক্ষণই দেখা যায় নি তার মধ্যে। একসময় বিমর্ষ মুখে ফিরে গেছে করবী।

রাতের খাবার টেবিলে সাজিয়ে সীতেশকে ডাক দেয় করবী। তার মনে আশঙ্কা ছিল, সীতেশ হয়তো খাবেই না রাতে। সীতেশ তেমনটা করে। কোনও কারণে বেজায় রাগ হয়ে গেলে সে না খেয়ে রাগটা দেখায়। কিন্তু আজ আর তেমনটা করে না সীতেশ। টেবিলে বসে নিঃশব্দে খেতে থাকে। করবীর দিকে ফিরেও তাকায় না। করবী পাতে কিছু দিতে চাইলে বাঁ-হাত দিয়ে পাত আড়াল করে। আধাআধি খেয়েই হাত গুটিয়ে নেয়। করবী ভুরু কুঁচকে শুধোয়, কী হলো? আর খাবে না? করবীর কথার জবাব না দিয়ে সীতেশ উঠে পড়ে বেসিনের দিকে এগিয়ে যায়। কথার জবাব না দিয়ে এভাবে উঠে পড়ায় করবীর মুখ অপমানে লাল হয়ে ওঠে অজান্তে। আচমকা গুম মেরে যায় সে। টেবিল থেকে এঁটো বাসনপত্র গোছাতে থাকে নিঃশব্দে। ভারী ভারী পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

রোজ রাতে, খাওয়ার পর ব্যালকনিতে গিয়ে বসে দু'জনে। সামান্য হালকা গল্পগুজব করে। সীতেশ আগে গিয়ে বসে, হেঁসেল গুছিয়ে-টুছিয়ে করবী আসে পরে। সীতেশ ততক্ষণ একটা সিগারেট ধরিয়ে টান মারতে থাকে নিঃশব্দে। কিন্তু ঐ রাতে অনেকক্ষণ কেটে গেলেও করবী এলো না। পুরো সিগারেটটাই পুড়ে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে গেল, ... করবী কী করছে এতক্ষণ! পায়ে পায়ে শোবার ঘরে আসে সীতেশ। দ্যাখে,

মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে করবী। রাগটা তখনো অবধি পড়ে নি সীতেশের। অন্যদিন কোনও কারণে করবী রাগ করলে হরেক উপায়ে তার মান ভঞ্জন করে সীতেশ। আজ আর তেমন কোনও চেষ্টাই করলো না। আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো বিছানায়।

বিছানায় দুজন দু-দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছে। আধো অন্ধকারে কেবল দুজনের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ। সময় বয়ে যাচ্ছে তিরতিরিয়ে। ...ঘুম আসছিল না সীতেশের। চিৎ হয়ে শুয়ে অন্ধকার সিলিংয়ের গায়ে চোখ বিঁধিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছে সে। শরীরের মধ্যে হুলো বেড়ালের মতো ফুলে ওঠা রাগটা একটু একটু করে পড়ে গেলে পরে তার মনে হয়, আজ সারা সন্ধে করবীর প্রতি আচরণটা একটু বেশি মাত্রায় রূঢ় হয়ে গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে বেশ লজ্জিত বোধ করে সীতেশ। কিছু একটা করা উচিৎ এমনটা ভেবে করবীর দিকে পাশ ফেরে সে। খুব নরম গলায় বলে, ঘুমোলে?

করবীও বুঝি মনে মনে সন্ধি করবার জন্য মুখিয়ে ছিল। খুব সহজ ভঙ্গিতে ঘন হয়ে আসে সে। সীতেশের বুকে হাত রাখে। খুব মৃদু গলায় বলে, রাগ কমেছে?

সীতেশ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। একসময় বলে, রাগ নয়, তোমার এই পাগলামো আর সহ্য করা যাচ্ছে না। তুমি যে কেন অমন করে ভাড়াটে বসাবার জন্য ক্ষেপে উঠেছ, সেটাই আমি বুঝতে পারছি নে।

করবী চুপ করে শুয়ে থাকে। বাঁ-হাতের তর্জনী দিয়ে সীতেশের খোলা বুকে নিঃশব্দে আঁকিবুকি কাটতে থাকে।

সীতেশ একটুখানি নরম হয়। করবীর দিকে আরও একটুখানি নিবিড় হয়। খুব অন্তরঙ্গ গলায় বলে, তুমি জানো না, ভাড়াটে বসালে বাড়ির শান্তিটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

নিচু গলায় করবী বলে, জানি।

—তুমি বুঝতে পারছো না, আমাদের প্রাইভেসির বারোটা বেজে যাবে।

—বুঝতে পারছি।

—একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবো বলে কত কষ্ট স্বীকার করে বাড়িটা বানালুম। নিজের ঘরে আবার সেই হাঁটু মুড়ে থাকতে হবে।

—জানি।

—সবই যদি জানো, তবে কেন এমন জেদ করছো? ক'টা বাড়তি টাকা পাওয়া যাবে বলে—।

অন্ধকারে করবীর লম্বা নিঃশ্বাসের আওয়াজ ভেসে আসে।

হাত বাড়িয়ে করবীকে কাছে টেনে নেয় সীতেশ। খুব নরম গলায় বলে, দ্যাখ, একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা দুজনে। একেবারে একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব একটা বাড়ি। স্বপ্নটা বহু কষ্টে সফল হয়েছে। আর কী চাই? অত টাকা নিয়ে কী হবে আমাদের? বেশ তো আছি।

করবী আরও একটুখানি ঘনিষ্ট হয় সীতেশের দিকে। ওর নরম আঙুলগুলো সীতেশের চুলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। খুব মৃদু গলায় বলে, টাকার জন্য নয় গো।

—তবে? সীতেশ মুখ ফেরায় করবীর দিকে।

করবী জবাব দেয় না। অন্ধকারে কেবল সীতেশের বুকে মুখ ঘসতে থাকে নিঃশব্দে। এক সময় খুব অস্ফুট গলায় বলে ওঠে, আমার আরও একটা স্বপ্ন রয়েছে।

—কী? সীতেশ আধো অন্ধকারে করবীর মুখটাকে পড়বার চেষ্টা করে।

খুকখুক করে গলাটা একটুখানি সাফ করে নেয় করবী। মৃদু গলায় বলে, আমি বাড়িউলি হতে চাই। অন্তত ছ'মাসের জন্য হলেও চাই।

অলৌকিক ক্ষত

মাথার ওপর অসংখ্য তারার চুমকি বসানো আকাশ। পেছনে মাইল-পাঁচেক দূরে কুচবিহার শহর। সামনে দশ-বারো মাইল পথ ভাঙলে আলিপুরদুয়ার। রাস্তার দু'ধারে অল্প ঢেউ খেলানো মাঠ। কালচে। মাঠের বুক চিরে সরু পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি। এবং মিঃ রামস্বামী।

এখন রাত এগারোটা। হু-হু করে বইছে রাতের হিমেল হাওয়া। কানের দুধার দিয়ে শনশন করে বেরিয়ে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ নিঝুম পৃথিবী। গাঁ'গুলো একবার এগিয়ে আসছে রাস্তার পাশাপাশি, আবার সরে যাচ্ছে দূরে দূরে।

চারপাশে এখন শুধু কালো অন্ধকার। মিটমিটে জোনাকি। আর, এমন ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে জাগ্রত কেবল আমরা দুটি প্রাণী।

আজ ভোর পাঁচটায় বিছানা ছাড়তে হয়েছে। তারপর, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম গেছে। সারা সন্ধে এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছি কুচবিহার শহরের পথে পথে মিঃ রামস্বামীর পিছু পিছু। এখন আর, সেই কারণেই, শরীর বইছে না। পা'দুটো অবশ হয়ে আসছে।চোখদুটো খোলা থাকতে চাইছে না। মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরাগুলো বিশ্রাম চাইছে। সব মিলিয়ে আমি আর পারছি না। যতই পারছি না, ততই রাগ হচ্ছে মিঃ রামস্বামীর ওপর। ওঁর পাল্লায় পড়েই না এই ভোগান্তি। শরীরের ওপর এই অমানুষিক নির্যাতন।

মিঃ রামস্বামীকে কিন্তু বেশ ফুরফুরে লাগছিল। তাঁর পা'দুটোতে যেন দামাল ঘোড়ার তেজ। এই ষাট ছুঁই ছুঁই বয়েসে এখনও শক্তপোক্ত ঋজু শরীর। সারা দেহে যেন যৌবনের দ্যুতি। অন্ধকারে নিশানা ঠিক রেখে অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছেন মিঃ রামস্বামী। অমি কেবলই ধুঁকছি। পিছিয়ে পড়ছি। জিভ বেরিয়ে আসছে আমার।

এক সময় প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মিঃ রামস্বামী বললেন, চল, সেন, আজ তোমাকে ভারি সুন্দর একটা নদী দেখাব। এমন নদী তুমি দ্যাখোনি।

মিঃ বালকৃষ্ণণ রামস্বামী। তখন তিনি ছিলেন সুপারেন্টেন্ডিং সার্ভেয়ার। বিরাট পদ। বাংলা-বিহার-ওড়িশা জুড়ে বিশাল এলাকার জরিপ বিভাগের কর্তা। বয়েস ষাট ছুঁই ছুঁই। সেটা অবশ্য বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। কানের পাশে কয়েক গাছি

চুলে পাক ধরেছে বটে, কিন্তু চোখের মণিদুটো পঁচিশ বছরের যুবকের মতো নানা ভাষায় চঞ্চল। শক্ত চোয়াল আর দীর্ঘ চিবুকে বলিষ্ঠ দৃঢ়তার ছাপ। লম্বায় পাক্কা ছ'ফুট। ঋজু, পেশীবহুল চেহারা।

আমি তখন সেটলমেন্টের চার্জ অফিসার। আলিপুরদুয়ারে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প চলছে। আমি সেই ক্যাম্পের চার্জে। সেই সময় মিঃ রামস্বামী এসেছিলেন জরিপ সংক্রান্ত গোটাকয়েক ক্লাস নিতে। মাসখানেক ছিলেন। ওই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দারুণ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার। সত্যি কথা বলতে কি, এমন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বিদ্যে-বুদ্ধি, নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের সঙ্গে খামখেয়ালিপনার এমন অপূর্ব মিশ্রণ বড় একটা চোখে পড়ে না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একটা খেয়ালি শিশুমন তিনি এমন সযত্নে লালন করতেন, যা উপভোগ না করে উপায় ছিল না। আর ছিল মানুষের সঙ্গে খোলামেলা হয়ে মেশবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা।

মিঃ রামস্বামী সেটলমেন্টের ছাত্রদের ক্লাস নেন, মাইলের পর মাইল ফিল্ড ওয়ার্ক করেন, সব কিছু দেখান, বোঝান, এ ব্যাপারে তাঁর কোনও ক্লান্তি নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মিঃ রামস্বামীর সঙ্গে আমার নিয়মিত গল্পগুজব চলত। নানান বিষয়ে আলোচনা করতাম আমরা।

একদিন গল্প করতে করতে মিঃ রামস্বামী বললেন, সেন, যখনই একা থাকবে, নিজের মধ্যে একান্ত হবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রশ্ন করো, হোয়াই ডু আই একজিস্ট? আমার অস্তিত্বের তাৎপর্য কী? আমি বেঁচে আছি কেন?

শুনে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি মিঃ রামস্বামীর দিকে।

মিঃ রামস্বামী বললেন, যদি প্রশ্নটা তোমার সত্তার গভীরে গিয়ে একটিবার আঘাত করতে পারে, আমি কেন রয়েছি এই দুনিয়ায়, ব্যস, আর দেখতে হবে না। ওই একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হাজার প্রশ্নের সৃষ্টি হবে। সেসব প্রশ্নের জবাবও আসবে ভেতর থেকে। তুমি বুঝতে পারবে, কী তোমার কাজ, কোনটা তোমার ভাল, কোনটাই বা মন্দ—সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে যাবে চোখের সামনে।

মৃদু হেসে বলি, এসব আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করবার বয়েস কি আমার হয়েছে? আমার বয়েস এখন সবে একত্রিশ।

সামান্য উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন মিঃ রামস্বামী, এই বয়েসই তো প্রশ্ন করবার আসল সময়, সেন। এখন থেকেই যদি প্রশ্নটা করতে থাকো অবিরত, তাহলে উত্তর পাওয়ার পরও তোমার সেইমতো কাজ করবার সময় থাকবে। বুড়ো বয়েসে প্রশ্ন করলে জবাবই বা পাবে কবে, সেইমতো কাজই বা কবে করবে?

সে কথার জবাব দিতে পারিনি।

আমাকে নীরব দেখে মিঃ রামস্বামী বলেন, কথাগুলো তোমার ভাল লাগল না মনে হচ্ছে? কিন্তু বিশ্বাস করো, সেন, আমি ক্রমাগত প্রশ্নটা করে চলি নিজেকে। গলাটা সামান্য খাটো করে বলেন, জবাবও পেয়েছি।

দিনকয়েক বাদে একদিন ক্লাসের শেষে মিঃ রামস্বামী বললেন, সেন, আমার তাঁবুতে চল। তোমাকে কফি খাওয়াব।

চললাম তাঁর অস্থায়ী ডেরার দিকে।

যেতে যেতে মিঃ রামস্বামী বললেন, তোমাদের বেঙ্গালে কফি বানাতে জানে না কেউ। সত্যি বলতে কি, তোমাদের বেঙ্গালে আসা অবধি কফি খেয়ে একদিনও তৃপ্তি হয়নি আমার।

বলি, বলেন কি! কলকাতায় তো কত ভালো ভালো কফি বানাবার রেস্তোরাঁ রয়েছে।

'ও তুমি যাই বল—।' মিঃ রামস্বামীর গলায় ছেলেমানুষী জেদ, 'কফি বানাবার আসল কায়দাটাই এখানে জানে না কেউ।'

আমার দিকে লোভ দেখানো ভঙ্গিতে তাকিয়ে মিঃ রামস্বামী বললেন, আজ তোমাকে আসল কফি খাওয়াব। দেখবে, কফি কাকে বলে। তোমারও একটা লাভ হবে। কফি বানাবার আসল কায়দাটা শিখিয়ে দেবো তোমায়। দেখো, আমার হাতের কফি খেয়ে আর কোনও কফিই ভালো লাগবে না তোমার।

তাঁবুতে পৌঁছে জামাকাপড় না ছেড়েই বেয়ারা-পিয়নদের উদ্দেশে হাঁকডাক শুরু করে দিলেন মিঃ রামস্বামী। স্টোভ লে আও, কফি লে আও, দুধ লে আও—।

সব কিছু এল। মিঃ রামস্বামী কেটলিতে জল চড়িয়ে দিয়ে গ্যাঁট মেরে বসে রইলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, প্রসেসটা শুধু মন দিয়ে দেখে যাও।

একটু বাদে একটা কাপে তিন চামচ গুঁড়ো কফি নিয়ে তাতে ফোঁটাকতক জল মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়াতে লাগলেন মিঃ রামস্বামী। মুচকি হেসে বললেন, দেখছ?

আমি নিঃশব্দে মাথা দোলাই।

বাম হাতে কাপটাকে শক্ত করে ধরে চামচ দিয়ে কাপের মধ্যেকার কফিটাকে ক্রমাগত নাড়িয়ে চলেছেন মিঃ রামস্বামী। মুখে অনর্গল ডেমোনেস্ট্রেশন দিয়ে চলেছেন।

'কিছুক্ষণ ক্লকওয়াইজ নাড়াতে নাড়াতে হঠাৎ অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ নাড়াতে হবে, বুঝলে? তাতে করে ফ্রিকশনটা কাজ করে ভালো। কফির থেকে ফেনা বেরোয়। ভালো স্বাদ হয়।'

এইভাবে, পাক্কা পনেরো মিনিট একনাগাড়ে ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ চামচ চালাবার পর একসময় থামলেন মিঃ রামস্বামী। মৃদু হেসে বললেন, দিস ইজ স্টেজ নাম্বার ওয়ান।

এরপর ওই ফেনায়িত কফির মণ্ডকে দুটো কাপে ঢেলে তাতে গরম জল, দুধ ইত্যাদি মিশিয়ে আবার নাড়ানো চলল কিছুক্ষণ। মাঝে মাঝে চামচে দিয়ে তুলে, পরখ করে, নানাভাবে যখন কফি প্রস্তুতপর্ব শেষ হল, তখন মিঃ রামস্বামীর সারা মুখে ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসি এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বললেন, নাও, এবার খেয়ে দ্যাখো, কফি কার নাম।

কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়েই চমকে উঠলাম দুজনেই। মিঃ রামস্বামীর কপালে গভীর ভাঁজ পড়ল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে আমার মুখখানাও বুঝি ঈষৎ কুঁচকে গিয়েছিল। তাই দেখে মিঃ রামস্বামী শুধোলেন, কী হল, বল তো?

হেসে বলি, কফি হল।

'না, না, তা তো হল, কিন্তু কেমন যেন লাগছে না?'

মৃদু হেসে বলি, তা একটু।

'কেন এমন হল বল তো?' মিঃ রামস্বামী বুঝি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত, 'এমনি করেই তো বানায়। এমনি করেই তো বানাতে দেখেছি বাড়ির মেয়েদের।'

আমি ওঁকে চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিই। বলি, চিনি দেওয়া হয়নি।

খানিকক্ষণ আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকেন মিঃ রামস্বামী। একসময় হো-হো করে হেসে লুটিয়ে পড়েন, পিয়ন ব্যাটা চিনির জারটাই আনেনি।

দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, নানা বিষয় নিয়ে আমার প্রায়ই আলোচনা চলত মিঃ রামস্বামীর সঙ্গে। মিঃ রামস্বামী বলতেন, সেন, আমাদের এই দেশটা এত পেছনে পড়ে রয়েছে কেন জান?

বলি, আমার মতে এর মূল কারণ অশিক্ষা।

'তার চেয়েও বড় কারণ, অভাব। যেদিকে তাকাও, শুধু অভাব, অনটন, খিদে। এ দেশের হবে কী?' আমায় চুপ করে থাকতে দেখে মিঃ রামস্বামী বললেন, বাগানে গাছ থেকে আপেল পড়ল, নিউটন তাই দেখে ভাবতে বসলেন, কিনা, আপেলটা মাটিতে পড়ল কেন? আমাদের দেশে হলে কী হত? তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে আপেলটা কুড়োত, আর গপাগপ করে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলত।

ওঁর বলবার ধরন দেখে হেসে ফেলি আমি।

সে হাসিতে যোগ দেন না মিঃ রামস্বামী। থমথমে মুখে বলেন, তুমি হাসছ সেন? কিন্তু এ ভারী ভাবনার কথা।

আজ বিকেলে, ক্লাস শেষ হওয়ার পর মিঃ রামস্বামী বললেন, চল সেন, কুচবিহার বেড়িয়ে আসি।

জিপে করে রওনা দিলাম দুজনে।

কুচবিহার শহরে পৌঁছতে তখনও মাইল তিনেক বাকি, মিঃ রামস্বামী হঠাৎ জিপ থামিয়ে নেমে পড়লেন। বললেন, চল, ওইটুকু পথ হেঁটেই যাই। গল্প করতে করতে কতক্ষণই বা লাগবে!

বুঝলাম, পাগলের পাল্লায় পড়েছি। আজ কপালে দুঃখু আছে।

জিপ চলে গেল কুচবিহারে। মিঃ রামস্বামী ওকে থাকতে বললেন মদনমোহন জিউর মন্দিরের সামনে। আমরা হাঁটতে লাগলাম দুজনে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ কুচবিহারে পৌঁছলাম। রামস্বামী বললেন, এসো, এবার খেয়ে নিই।

কুচবিহার শহরে আমরা দুজনেই নতুন। তবুও দেখলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ রামস্বামী একটা মশলা-দোসার দোকান খুঁজে বের করে ফেললেন। বললেন, এসো, দোসা খাই।

খেতে খেতে একসময় মিঃ রামস্বামীকে বলি, 'এই অচেনা শহরে আপনি অত জলদি দোসার দোকানটা খুঁজে বের করে ফেললেন কেমন করে?'

মিঃ রামস্বামী আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'ছেলেবেলায় আমরা এক ধরনের ছোট্ট ছোট্ট পাখির বাসা খুঁজে বের করতাম, মনে আছে? লেবু জাতীয় ছোট গাছের ডালে, খড়ের চালায়, বাঁশের কোটরে প্রচুর দেখা যেত ওই জাতের পাখি।'

বলি, 'হ্যাঁ, আমরাও ছেলেবেলায় দেখেছি খুব।'

'দেখেছ তো?' মিঃ রামস্বামী যেন বাড়তি উৎসাহ পেলেন। বললেন, 'দুনিয়ার সব দেশেই শিশুদের জীবন প্রায় একই রকম। আচ্ছা, আগে সেই পাখি তো খুবই দেখতে, এখন আর দেখতে পাও?'

স্বীকার করি, ওই ধরনের পাখি বহুদিন দেখিনি।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিঃ রামস্বামী বললেন, 'তা বলে ওই জাতের পাখি নেই ভেবেছ?'

'আছে?'

'খুব আছে। সংখ্যায় হয়তো বা বেড়েছে।' অল্প থেমে মিঃ রামস্বামী বললেন, 'আসলে, আমাদেরই ওই পাখি দেখবার বয়েসটাই হারিয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই বয়েসের ম্যাজিক-চোখটাই। নইলে দেখতে পেতে, তোমার বাড়ির আনাচে-কানাচে এখনও অবধি ওই পাখি গিজগিজ করছে। বিশ্বাস না হয়, তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করো, সে তোমায় ওই পাখির একশোটা আস্তানা দেখিয়ে দেবে।' অল্প থেমে মিঃ রামস্বামী নরম গলায় বললেন, 'দোসা আমার কাছে ওই পাখির মতোই প্রিয়। তাই যেখানেই যাই, দোসা তৈরির আস্তানাগুলো আমার চোখে অল্পেতেই ধরা দেয়।'

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা বাইরে বেরোলাম। অল্প দূরে মদনমোহন জিউর মন্দিরে সানাই বাজছে। মিঃ রামস্বামী বললেন, 'চলো, সানাই শুনি। তোমাদের এদেশে সানাইয়ের সুর ভারি মিষ্টি।'

ঘন্টাটাক সানাই শোনার পর বললাম, 'এবার আমরা কী করব?'

'এবার?' মিঃ রামস্বামী তিলমাত্র ইতস্তত না করে বললেন, 'চল শহরটা এবার ঘুরে ঘুরে দেখি।'

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল জিপ। আমি হাতের ইঙ্গিতে ওকে ডাকতেই পাশ থেকে হাঁ হাঁ করে উঠলেন মিঃ রামস্বামী। বললেন, 'জিপ কি হবে? জিপে চড়ে কি শহর দেখা যায়? চল, হেঁটে হেঁটে দেখি।'

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনি। তিন মাইল হেঁটে শহরে পৌঁছেছি। এখন আবার হেঁটে হেঁটে সারা শহরময় ঘোরা! কিন্তু আপত্তি করবারও তো উপায় নেই কোনও।

মিঃ রামস্বামীর পিছু পিছু হাঁটছি। উনি জোর কদমে হাঁটছেন, আর রাস্তার দু'ধারের সবকিছু অদম্য কৌতূহল সহকারে দেখছেন। জিপটা আমাদের অনুসরণ করছে পিছু পিছু। মাঝে একবার বাজারের মধ্যে ঢুকে কিছু আপেল, আঙুর আর শুকনো মিষ্টি কিনলেন।

শহর দেখা যখন শেষ হল রাত তখন প্রায় দশটা। মিঃ রামস্বামীর কথা বলতে পারিনে, কিন্তু আমি তখন যারপরনাই ক্লান্ত। বললাম, 'চলুন, এবার ক্যাম্পে ফিরি। কাল সকালে আবার...।'

'হ্যাঁ, চল, এবার ফেরা যাক।'

আশ্বস্ত হয়ে জিপের কাছে গেলাম।

হঠাৎ মিঃ রামস্বামী বললেন, 'আচ্ছা সেন, একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমরা যদি জিপটাকে ছেড়ে দিই?'

শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। বলি, 'জিপ ছেড়ে দিলে ফিরব কী করে?'

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মিঃ রামস্বামী বললেন, 'কেন, আমরা যদি ওইটুকু পথ হেঁটেই যাই?

'হেঁটে যাব? কুচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার?' আমার দু'চোখ কপালে উঠে যায়।

'হ্যাঁ, হেঁটেই যাব। কী এমন পথ? বড় জোর চব্বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার হবে।'

আমি তখন এতটাই ক্লান্ত, পারলে ওই রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ি।

আমার চোখমুখের অবস্থা দেখে বুঝি অল্প ক্ষুন্ন হলেন মিঃ রামস্বামী। বললেন, 'তুমি যেন খুবই ভাবনায় পড়ে গেলে? আরে বাবা, এখন মোটে রাত দশটা। এখন থেকে যদি শুরু করি, পৌঁছতে ক'ঘন্টা লাগবে, বল?'

বিড়বিড় করে বলি, 'তা, ঘন্টা ছয়েক তো বটেই।'

'ছ-ঘন্টা। বেশ।' কথাটা যেন খুব পছন্দ হয়েছে মিঃ রামস্বামীর। বললেন, 'এখন বাজে দশটা, তার মানে, আমরা ভোর চারটে নাগাদ পৌঁছে যাব ক্যাম্পে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে, বাথরুম সেরে, চা খেয়ে ফিল্ড-ভিজিটে বেরিয়ে পড়লেই চলবে।'

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকি মিঃ রামস্বামীর দিকে।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বিরক্তিতে ভ্রুজোড়া কুঁচকে ওঠে মিঃ রামস্বামীর। বলেন, 'তোমাদের সেটলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমাদের সার্ভে ডিপার্টমেন্টের এইখানেই তফাত, বুঝলে। আমি ষাট বছর বয়েসে যা পারি, তুমি আমার অর্ধেক বয়েসি হয়েও তার জন্য কেঁদে ফেলবার জোগাড় করছ।'

মিঃ রামস্বামীর কথায় পৌরুষে বুঝি আঘাত লাগল। বললাম, 'বেশ, চলুন, হেঁটেই ফেরা যাক।'

'গুড। এই তো চাই।' আনন্দে ঝলমল করে উঠল মিঃ রামস্বামীর চোখ-মুখ। ড্রাইভারকে চলে যাওয়ার হুকুম দিয়ে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। খুব গাঢ় স্বরে বললেন, 'আজকের রাতটা রিমার্কেবল হবে। দেখো।'

জবাব না দিয়ে পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকি আমি।

প্রথম ঘন্টায় আমরা চার কিলোমিটার মতো হাঁটলাম। মিঃ রামস্বামী অনর্গল কথা বলছিলেন নানান বিষয়ে। আমি শুধু শুনছিলাম। জবাব দিতেও ইচ্ছে করছিল না।

ভরিয়াবাট পেরিয়ে লেবেলক্রসিং। মিঃ রামস্বামী বললেন, 'ভেবো না সেন, এই তো প্রায় চলে এলাম। এরকম গোটা দুই লেবেলক্রসিং, গোটা দুই নদী, গোটা দুই বাঁক...। 'খোলটা চেকপোস্টটা এলেই তো তুমি পৌঁছে গেলে। ওখান থেকে কালজিনি নদীর লম্বা সেতু দেখা যায়। অবশ্য এই রাতের বেলায় সেতুটাকে দূর থেকে দেখতে পাবে না। সে যা হোক, কালজিনি নদীটা পেরিয়ে গেলে আলিপুরদায়ার আর কদ্দুর!'

আরও ঘন্টাটাক বাদে আমি বুঝলাম, মিঃ রামস্বামীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে কী এক মারাত্মক ভুল করেছি। এখন আমার পা'দুটো ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখদুটো জড়িয়ে আসছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শরীর আর বইছে না। মিঃ রামস্বামীর মনে তখন খুশির জোয়ার। পুলকে গদগদ হয়ে বললেন, এমন রাত আমি বহুদিন পাইনি, সেন। আই অ্যাম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ।

কিন্তু মিঃ রামস্বামীর কথার জবাব দেব কি, আমি ততক্ষণে নিজেকে একটি 'গ্রেট ফুল' ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। এমন বোকামি মানুষে করে!

দু'ঘন্টায় আমরা আট কিলোমিটার মতো পথ অতিক্রম করেছি। রাত এখন প্রায় বারোটা। একটুখানি বসতে পারলে ভাল হত। আর, ঠিক তখনই মিঃ রামস্বামী প্রায় দেবতার মতো রায় দিলেন, এসো সেন, এবার ডিনারটা সেরে ফেলি।

ততক্ষণে আমরা পৌঁছে গিয়েছি এক ছোট্ট নদীর কাছে। অন্ধকারে ছলোছলো সে নদী। মিঃ রামস্বামী জানালেন, নদীটার নাম, বংক্তি নদী। নদীর ওপরে পাকার পুল। দুজনে বসলাম গার্ডওয়ালের ওপর। ফল আর মিষ্টিগুলোকে দু'ভাগ করে এক ভাগ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন মিঃ রামস্বামী। দুজনে খেতে লাগলাম নিঃশব্দে। চারপাশটা কেমন ভুতুড়ে। শনশন হাওয়া বইছে। নদীর ভিজে বাতাস সর্বাঙ্গে এসে আছড়ে পড়ছে। বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, এই পুলের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমার মনের কথা বুঝি পড়তে পেরেছেন মিঃ রামস্বামী। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বসে থাকলেই সময় নষ্ট। চল হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতেই ডিনার সারি।

সামনেই একটা কালচেপানা গাঁ। মিঃ রামস্বামী মৃদু গলায় বললেন, গ্রামটার নাম বানেশ্বর।

—আপনি এই তল্লাটের গ্রামগঞ্জের নামও মুখস্থ করে ফেলেছেন?

—তা নয়। মৃদু হাসলেন মিঃ রামস্বামী, —এই গ্রামটা মনে রাখবার মতো। এখানে একটা বিশাল শিব মন্দির আছে। ফি-বছর গাজনের জমজমাট মেলা বসে। মন্দিরের পাশেই একটা বিশাল দীঘি রয়েছে। বিশাল বিশাল কচ্ছপ থাকে ওতে। ভারি পোষা। মোয়া দিলে কাছে আসে।

রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে ডাইনে। খানিক এগোলেই আবার একটা লেবেল-ক্রসিং।

একসময় আমি করুণ চোখে তাকালাম মিঃ রামস্বামীর দিকে।

—কী হল? কষ্ট হচ্ছে? মিঃ রামস্বামী সস্নেহে হাসেন।

অকপটে বললাম, 'আমি আর পারছিনে মিঃ রামস্বামী।'

আমার পিঠ আলতো চাপড়ে দিয়ে মিঃ রামস্বামী বললেন, 'পারবে, পারবে। পারবে না মানে? পারতেই হবে। মনে রেখো, উই হ্যাভ আ লঙ ওয়ে বিফোর উই স্লিপ।'

কোনও উপায় না দেখে নিতান্ত ব্যাজার মুখে হাঁটতে লাগলাম মিঃ রামস্বামীর পিছুপিছু।

হাঁটতে হাঁটতে খানিক বাদে মিঃ রামস্বামী আড়চোখে তাকালেন আমার দিকে। মৃদু হেসে বললেন, 'এমন বিপদে বোধ করি এর আগে কখনও পড়োনি, সেন?'

মনে মনে তখন খুবই বিরক্ত আমি। তেতো হেসে বললাম, 'আমি তো পড়িইনি, এমন বিপদে কাউকেই যেন কোনদিনও পড়তে না হয়।'

কথাগুলো বুঝি মিঃ রামস্বামীকে নিদারুণভাবে আঘাত করল। খানিক সময় নিঃশব্দে হাঁটলেন তিনি। একসময় মৃদু গলায় বললেন, 'তুমি বললেই যদি না পড়তে হত, তাহলে তো ভাবনাই ছিল না, সেন।' বলতে বলতে আমার দিকে কয়েক ঝলক তাকালেন মি. রামস্বামী। বললেন, 'কল্পনা করতে পারো? রাতদুপুরে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর এক তরুণীকে কাঁধে নিয়ে তার যুবক স্বামী ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে পনেরো মাইল দূরের হাসপাতালে? তার ডান বাহুতে তখনও বিঁধে রয়েছে একখানা তাজা বুলেট।'

চমকে তাকালাম মিঃ রামস্বামীর দিকে।

মিঃ রামস্বামী বললেন, 'তোমার লাইটারটা একবার জ্বালাও তো, সেন।'

লাইটার জ্বালাতেই মিঃ রামস্বামী তাঁর ডান বাহুটা তুলে দেখালেন। এবং আমি দেখতে পেলাম, সেখানে একটা গোলাকার কালোপানা দাগ।

আধো অন্ধকারে মৃদু হাসেন মিঃ রামস্বামী—এই দ্যাখো, সেই দাগ, এখনও মিলায়নি।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

মিঃ রামস্বামী খুব আত্মস্থ গলায় বললেন, 'বাইরের ক্ষতটা অবশ্য শুকিয়ে গিয়েছে বহুদিন, কিন্তু ভেতরের ক্ষতটা এখনও অবধি দগদগে।

শেষ লেবেল-ক্রসিংটা পেরোবার পরপরই গাঁগুলো আচমকা দূরে দূরে সরে গেল। এখন বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একটা নিঃসঙ্গ পথ। আঁকাবাঁকা। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রাচীন গাছ সর্বাঙ্গে কালিঝুলি মেখে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ধারে। অল্প পথ এগোতেই ঘরঘরিয়া নদী। এই নদীটাকে আমি চিনি। নদীর ওপর পুল দেখেই আমি একটুখানি জিরিয়ে নেওয়ার জন্য কাকুতি জানাতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মিঃ রামস্বামী এক আশ্চর্য অলৌকিক গলায় কথা বললেন।

আমি তখন মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। বয়েস বাইশ কি তেইশ। সেটা বোধ হয় উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল। স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় ইংরেজ সরকার বিপর্যস্ত। বাউণ্ডুলে তরুণ প্রাণগুলো অস্থির। জানিনে, কী করে যেন ভিড়ে গেলাম বিপ্লবীদের দলে।

আমরা জনাবিশেক যুবক তখন দিনের পর দিন অনুশীলন করি। ডাম্বেল ভাঁজি। ছোরা খেলি। বন্দুক ছোঁড়া শিখি। কৃষ্ণমূর্তি আমাদের নেতা। তাঁরই আদেশে আমরা বিশ-বাইশজন যুবক যখন-তখন প্রাণ দিতে প্রস্তুত। মাঝে মাঝে সুভাষ বোসের কথা শুনি। তরুণ রক্ত টগবগিয়ে ফুটতে থাকে।

একদিন আমাদের দলে এল শকুন্তলা। কৃষ্ণমূর্তির বোন। বুদ্ধিদীপ্ত ঋজু চেহারা। সারা দেহে লাবণ্যের সঙ্গে তেজ মিলেমিশে একাকার। আরও সুন্দর তার সহজ-সরল আচরণ। হাসি। কয়েকদিনের মধ্যেই শকুন্তলা আমাদের দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য হয়ে গেল। শকুন্তলা রোজ ব্যায়াম করে, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোরা-বন্দুক

চালায়, অবসর সময়ে দেশের সমস্যা নিয়ে ডিবেট করে...। ওর হাঁটাচলা, কথা বলবার ভঙ্গি, সব কিছুর মধ্যে এমন এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য ছিল, যা সবাইকে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিত ওর পৃথক অস্তিত্ব।

প্রথম থেকেই শকুন্তলার প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা পোষণ করতাম। কিন্তু বিপ্লবী জীবনের নিয়মকানুন বড়ই কঠোর। তাই ইচ্ছে থাকলেও শকুন্তলাকে একান্তে পেতে সাহস হত না।

একদিন দলের গোপন ডেরায় একটু আগেভাগেই গিয়েছি। দেখি, শকুন্তলা বসে বসে বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিল। ওই দিন ওর ডিউটি ছিল ওটাই।

আমায় দেখে শকুন্তলা আড়চোখে তাকাল। বলল, অ্যাতোদিন ছোরা খেলছ, এখনও অবধি লক্ষ্য ঠিক হল না কেন?

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একমনে বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে শকুন্তলা বলল, হবে কী করে? মনের মধ্যে অত চঞ্চলতা থাকলে কিছু হয়?

আমি যেন এক অদৃশ্য চাবুক খেলাম পিঠে।

বন্দুকের নল থেকে চোখ সরিয়ে শকুন্তলা বলল, যাও, ওখান থেকে দুটো ছোরা নিয়ে এসো।

শকুন্তলার কথায় স্পষ্টতই আদেশের সুর ছিল। যা লঙ্ঘন করা মুশকিল। মাথা নিচু করে চলে গেলাম ছোরা আনতে।

একটা ছোরা আমায় দিয়ে অন্যটা নিজের হাতে রাখল শকুন্তলা। বলল, এবার ডান পা সামনে বাড়িয়ে ছোরাসহ ডানহাতটা পায়ের সমান্তরালে রাখো।

রাখলাম।

—এবার আমার ছোরার দিকে লক্ষ রেখে রেডি হও। মনে রাখবে, ছোরা খেলবার সময় দুটো দিকে নজর রাখতে হয়। এক, শত্রুর ছোরা, দুই, শত্রুর চোখ। সেইভাবেই রাখো।

শকুন্তলার নির্দেশ মতো তৈরি হলাম আমি।

ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেশ ছড়িয়ে দিয়ে শকুন্তলা বলল, দেখো, কেবল শত্রুর চোখদুটোর দিকেই যেন তাকিয়ে থেকো না সারাক্ষণ।

আমি তখন বিহ্বল। অত্যন্ত সচ্ছন্দ, সাবলীল এই তরুণীর সামনে একেবারে ঘেমে নেয়ে একসা।

খানিকক্ষণ দুজনের ছোরা এগোনো-পেছোনোর পর হঠাৎ থেমে গেল শকুন্তলা। দুদিকে ঘনঘন মাথা নেড়ে বলল, তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না।

প্রতিবাদ জানিয়ে বলি, কেন?

—কী করে হবে? ঠোঁট উল্টে শকুন্তলা বলল, তুমি তো সারাক্ষণ শত্রুর চোখ দুটোর দিকেই তাকিয়ে থাকছ।

লজ্জায় লাল হয়ে আমি পুনর্বার আক্রমণ রচনা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই শকুন্তলা ছোরা ফেলে দিয়ে বলল, যাও, আজ আর তোমার দ্বারা হবে না।

দিনকতক বাদে একদিন শকুন্তলার ওপর ভার পড়ল, মাইল-ত্রিশেক দূরে আমাদের একটি গোপন আস্তানায় একটি রিভলভার পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। আমার কাজ হল, শকুন্তলাকে সারাক্ষণ দূর থেকে নজরে রেখে নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে আনা।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা মাইল দুয়েক পথ একসঙ্গে হেঁটে গেলাম। পাকা রাস্তায় উঠে শকুন্তলা বলল, এরপর থেকে আমরা কেউ কাউকে চিনিনে।

দুজনে বাসে উঠলাম। যেন অপরিচিত দুটি ছেলে ও মেয়ে। কিন্তু আমার মনে সারাক্ষণ জেগে রইল ভয়, উৎকণ্ঠা, যদি শকুন্তলার কোনও বিপদ হয়! যদি তাকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য করতে না পারি! কাজেই, সারাটা পথ শকুন্তলাকে চোখে চোখে আগলে রাখলাম যখের মতো।

ফেরার সময় বাস থেকে যখন নামলাম, তখন রাত আন্দাজ নটা। মাইল দুয়েক হাঁটলে আমাদের গ্রাম। পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমরা। খুব হাল্কা লাগছিল নিজেকে। কী এক গভীর আনন্দ হচ্ছিল মনের মধ্যে! ইতিমধ্যে আকাশে চাঁদ উঠেছে। আধখাওয়া আপেলের মতো রুপোলি চাঁদ। শকুন্তলা আর আমি পাশাপাশি হাঁটছি। গুনগুনিয়ে কথা বলছি। হঠাৎ রাস্তার ধারে হাত বাড়িয়ে শকুন্তলা শুধোলো, এগুলো কী ফুল, জানো?

দেখলাম, সাদা সাদা ফুল। থোকায় থোকায় ফুটেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় যেন মুঠো মুঠো সাদা খই। নাম জানিনে এ ফুলের। শকুন্তলাকে সে কথা বলায় সে মাস্টারনির মতো ভঙ্গি করে শুধোলো, আচ্ছা বল তো, অধিকাংশ সাদা ফুল রাতের বেলায় ফোটে কেন? রাতে ফোটা ফুলের গন্ধই বা এত তীব্র হয় কেন?

আমতা আমতা করে বললাম, জানিনে তো।

—তুমি দেখছি কিছুই জানো না! শকুন্তলা ভ্রুকুটি করে বলল।

পৌরুষে আঘাত লাগল খুবই। বললাম, আমরা বিপ্লবী মানুষ। রসকষহীন। বন্দুক-ছোরা নিয়ে দিন কাটাই। ফুলের নাম আর চরিত্র নিয়ে গবেষণা করবার সময় কোথায়?

আমার কথাগুলো বুঝি খুব উপভোগ করল শকুন্তলা। বলল, তোমাদের মতো বিপ্লবী থাকলে দেশের বারোটা বাজতে বেশি দেরি হবে না, বুঝলে?

আহত গলায় বললাম, কেন?

শকুন্তলা আমার চোখে সরাসরি চাইল। বলল, ছোরা-বন্দুক তো চোর-ডাকাতেও চালায়। তাদের সঙ্গে আমাদের তফাত কোথায়?

আমি চুপ করে থাকি। শকুন্তলার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা চালাই।

শকুন্তলা গাঢ়স্বরে বলে, কেবল ছোরা-বন্দুক চালালেই বিপ্লবী হয় না, বুঝলে? যেটা আগে চাই, সেটা হল, মনের ব্যাপ্তি। বিশালতা। একটা বিশাল মন চাই, বুঝলে? যাতে থাকবে সীমাহীন সমুদ্রের মতো স্নেহ-মমতা। দেশের কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-বেদনা বোঝার মতো অনুভূতি। এসব না থাকলে শুধু ছোরা-বন্দুক চালিয়ে কী হবে? একটু থেমে শকুন্তলা বলল, বিপ্লবী হবে কবির মতো কল্পনাপ্রবণ, নদীর মতো বেগবান, প্রেমিকের মতো রোমান্টিক, শিশুর মতো আবেগময়, সৈনিকের মতো জাগ্রত, আর সূর্যের মতো বিশ্বস্ত। তোমায় কে বলেছে, বিপ্লবীকে রসকষহীন যন্ত্র হতে হবে?

চমকে উঠলাম শকুন্তলার কথায়। ও যেন মুহূর্তের মধ্যে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিলে। বুঝলাম, আমার বিপ্লবী জীবনে শকুন্তলাই আমার প্রথম গুরু।

সেদিন শকুন্তলাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি হাঁফ ছাড়লাম। মনে তখন বিপুল আনন্দ। শকুন্তলার মতো বিশাল দায়িত্বভার আমি বহন করতে পেরেছি। তারপর থেকে আমার যেন নতুন জন্ম হল। ফলে, শকুন্তলাকে আর ছাড়া গেল না।

একসময় আমার অনুশীলনপর্ব শেষ হয়ে গেল। এবার হাতেনাতে কাজের পালা। কৃষ্ণমূর্তির নির্দেশে আমায় চলে যেতে হল মাইল বিশেক দূরেব একটা ছোট্ট গঞ্জে। সেখানে আমাদের আটজনের একটি দল শুরু করবে প্রথম অ্যাকশন।

তোমাদের বাংলাদেশ তখন মেতে উঠেছে। বিপ্লবীরা একে একে ফাঁসির দড়ি গলায় পরছেন। আমরাও মেতে উঠলাম উত্তাল সমুদ্রের মতো।

নতুন ইউনিটে যাওয়ার তখনও দিন সাতেক বাকি। একদিন শকুন্তলার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হলো। দেখলাম, সেও আমার জন্য উন্মুখ।

শকুন্তলাকে বললাম, শকুন্তলা একটা কথা বলবার জন্য আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। সবাই বলে, বিপ্লবীদের কোনও বন্ধন থাকতে নেই। সেটা ভেবেই বলার সাহস হয না।

শকুন্তলা নীরবে হাসল। বলল, কে বলে বিপ্লবীদের বন্ধন থাকতে নেই। বন্ধন না থাকলে কীসের জন্য এই সর্বস্ব ত্যাগ? বিপ্লবীরা তো পুরোপুবি ভোগে বিশ্বাসী। তারা চায় এদেশ স্বাধীন হোক। দেশের সমস্ত সম্পদ মানুষের ভোগে আসুক। সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক। সেজন্যেই তো যাবতীয লড়াই।

বলতে বলতে আমার দিকে তাকায় শকুন্তলা। আমার মনে তখনও দ্বিধা ছিল। শকুন্তলার কথাগুলো বুঝি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিলাম না। সেটা বুঝতে পেরেই শকুন্তলা বলে, দেখছ না, সংসারী মানুষগুলো সারা জীবন কী লড়াইটাই না চালিয়ে যায়! অ্যাতো প্রেরণা ওরা পায় কোত্থেকে? বন্ধনই হচ্ছে সেই প্রেরণা, যা মানুষকে পাহাড় ডিঙোতে, সাগর পাড়ি দিতে, আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। বন্ধনহীন ছন্নছাড়ারা পৃথিবীর কোনও কাজেই আসে না, তা জানো? ছন্নছাড়ার জীবন তো পথ-হারানো নদীর মতো। একটা প্রান্তরকেও শ্যামল করতে পারে না।

সেই রাতেই গাঁয়ের নটরাজের মন্দিরে গিয়ে আমরা বিয়ে করলাম।

শকুন্তলা উজ্জ্বল হেসে বলল, অ্যাতোদিনে আমরা পূর্ণ হলেম। এবার আমরা কূল পাব। পথ পাব। সার্থক, অর্থপূর্ণ হবে আমাদের লড়াই। প্রত্যাশায় ভরে রইল আমাদের ভবিষ্যত।

নতুন ইউনিটে গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে রইলাম। ততদিনে আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আমার বিপ্লবী জীবনের অনেক ঝড়বৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা জেগে রইল রামধনুর মতো বর্ণাঢ্য হয়ে।

ছোটখাটো কয়েকটা অপারেশন হল। ইংরেজ সরকার নড়েচড়ে বসল। আমরাও আরও বেশি সতর্ক হলাম। শকুন্তলা ততদিনে অন্তঃস্বত্বা। ভাই কৃষ্ণমূর্তির কাছেই থাকে সে।

ন-দশ মাস বাদে একটা বড় অপারেশন। শহরের একটা মাঝারি গোছের ব্যাঙ্ক লুট করা হবে। সব নির্দেশই এসে গেছে আগেভাগে। আমি দলের নেতা। সঙ্গে আরও পাঁচজন।

ঠিক দিনে পিস্তল উঁচিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলাম। কিন্তু পুলিশ আগে থেকেই খবর পেয়ে গিয়েছিল। তারা ব্যাঙ্কের মধ্যেই আগে থেকে ওঁৎ পেতে বসেছিল। বিপদ বুঝে সবাইকে পালাবার নির্দেশ দিয়ে ছুট মারলাম। ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা গুলি লাগল আমার ডান বাহুতে। বাঁ-হাতে সজোরে ক্ষতস্থান চেপে ধরে ছুটতে লাগলাম প্রাণপণে।

পুলিশ অবশ্য শেষ অবধি ধরতে পারল না আমায়, কিন্তু সারা শহর তখন তোলপাড়। গোপন আড্ডায় পৌঁছে দেখি, চারপাশে গিজগিজ করছে পুলিশ। বেগতিক বুঝে পালালাম। সোজা ছুটতে লাগলাম। এ শহরে আর এক মুহূর্তও নয়। কিন্তু কোথায় যাব ? কী করে যাব ? ততক্ষণে মনের মধ্যে অপরিসীম ভয় আর আতঙ্ক। মনে হল শকুন্তলার কাছেই যাই। ওখানেই আমার শেষ আশ্রয়।

বাসে যাওয়া ঠিক হবে না। ডান হাত বেয়ে রক্ত ঝরছে। মানুষজনের সন্দেহ হবে, ধরা পড়ে যেতে পারি। প্রাণপণে মাঠঘাট ফুঁড়ে ছুটতে লাগলাম গ্রামগুলোকে দূরে রেখে। মুহূর্তের তরেও থামলাম না।

সন্ধে না হতেই আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি। প্রবল ঝড়। তার মধ্যেই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি ছুটতে লাগলাম শকুন্তলার কাছে।

বিশ মাইলটাক পথ একনাগাড়ে ছুটে যখন শকুন্তলার কাছে পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় দশটা। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের মাতামাতি। প্রকৃতি একটা নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে।

দরজায় ধাক্কা দিতে খুলে গেল। ঘরের মধ্যে টিমটিমে আলো। আধো অন্ধকার। ভাঙাচোরা একটা চৌকির ওপর ময়লা শতচ্ছিন্ন বিছানায় শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল শকুন্তলা। আমাকে অকস্মাৎ ঢুকতে দেখে ভয়বিহ্বল চোখে তাকাল।

সমস্ত অবসাদ ভুলে শকুন্তলাকে প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, কী ব্যাপার ? কী হয়েছে তোমার ? কৃষ্ণমূর্তি কোথায় ?

শকুন্তলার সারা মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে গিয়েছে। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি মারা যাচ্ছি। ওগো, আমার ওকে তুমি বাঁচাও।

'শকুন্তলা—!' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

সে চিৎকারে শকুন্তলা চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে। অস্ফুট স্বরে যা বলল, তাতে আমার চোখের সামনে সারা পৃথিবী মুহূর্তে দুলে উঠল। শকুন্তলা আসন্নপ্রসবা। তার সারা দেহ জুড়ে একজন মুক্তির বেদনায় ছটফট করছে।

আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে নাকি ? কী করব, কোথায় যাব, কিছুই ঠিকঠাক ভাবতে পারছিনে। সেই মুহূর্তটার কথা মনে হলে, আমি এখনো যেন দুঃস্বপ্নে আঁতকে উঠি, সেন। ভেবে দ্যাখ, আমার ডান হাতে তাজা বুলেট নিরন্তর তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, সামনে নিজের স্ত্রী প্রসববেদনায় অচেতন প্রায়, বাইরে প্রকৃতি মেতেছে রুদ্রলীলায়।

মুহূর্তের মধ্যে আমার যেন কী হয়ে গেল। ভাবলাম, আমি যেন এই পৃথিবীর কেউ নই। আমার বুঝি শরীর, শরীরের যন্ত্রণা-বেদনা বলে কিছুই নেই। আমার বোধ, বুদ্ধি, সবকিছুই যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে।

চোখের পলকে শকুন্তলাকে তুলে নিলাম কাঁধের ওপর। চাদর দিয়ে তাকে শক্ত করে বেঁধে নিলাম পিঠে। প্রায় পনেরো মাইল দূরে একটা ছোট্ট হাসপাতাল। প্রাণপণে যদি ছুটতে পারি, তবে ভোরের আগে পৌঁছতে পারব হাসপাতালে। তারপর যা হওয়ার হবে আমার। শকুন্তলা তো বাঁচবে। বাঁচবে আমাদের দুজনের আকাঙ্খার ফসল। সে হয়তো অন্ধকার গহ্বরে এতক্ষণে পৃথিবীর আলো দেখবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে।

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আমি ছুটছি। পিঠের ওপর শকুন্তলা। বাঁধাধরা রাস্তায় নয়, মাঠঘাট ভেঙে ছুটছি। ঘনঘন বাজ পড়ছে। কড়কড় আওয়াজে বুঝি তালা ধরে কানে। বিদ্যুত চমকাচ্ছে মুহুর্মুহু। ক্ষণিকের চোখধাঁধানো আলোয় চারপাশটা দিনের আলোর মতো ঝকঝকে হয়ে ওঠে। পর মুহূর্তে সারা দুনিয়া জুড়ে যেন গর্ভেব আঁধার। মাঝে মাঝে শকুন্তলার মৃদু কাতরানি কানে আসছে। একমনে নটরাজকে ডাকছি তখন। ডাকছি আর ছুটছি।

তখনও প্রায় মাইল পাঁচেক বাকি। শকুন্তলা নেতিয়ে পড়ল আমার পিঠে। তার কাতরানি আর শুনতে পাচ্ছি না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা বুঝতে পারছি না। আমার বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠল। শকুন্তলা বেঁচে আছে তো?

কিন্তু তাও থামিনে আমি। বরং দ্বিগুণ বেগে ছুটতে থাকি পিশাচের মতো। অনেকক্ষণ ধরে ডান হাতটায় বল পাচ্ছিলাম না। সারা দুপুর, বিকেল অবিরাম রক্ত ঝরিয়ে এখন অবশ হয়ে গিয়েছে হাতটা। কিন্তু সেদিকে তিলমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে আমি পায়ে পায়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকি পথ। আমার পিঠের ওপর একতাল ভিজে কাপড়ের মতো শকুন্তলা। জীবিত কিংবা মৃত।

তখন ভোর হয় হয়। হাসপাতালে পৌঁছেই যখন শকুন্তলাকে পিঠ থেকে নামালাম—।

হঠাৎ থামলেন মিঃ রামস্বামী। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম, সেন। ঘন্টাটাক সময় বেশি লাগল। এখন ছটা বাজে।

ক্যাম্প কোথায়, আমি এখন দক্ষিণ ভারতের ওই ছোট্ট হাসপাতালের চত্বরে। আমার সামনে শকুন্তলার নিথর দেহ। সে বেঁচে আছে কিনা জানবার জন্য উদগ্রীব আমি। অস্থির গলায় বলে উঠি, আহ্, তারপর কী হল, বলুন।

ম্লান হেসে মিঃ রামস্বামী বললেন, বাকিটা শুনতেই হবে? আমরা কিন্তু ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছি।

আমার বুঝি তর সইছিল না। বলি, তা হোক, আপনার স্ত্রীর কী হল, বলুন।

মিঃ রামস্বামী বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। তারপর মৃদু গলায় বললেন, আমি বিয়েই করিনি, তার স্ত্রী!

'বিয়ে করেননি মানে? নটরাজের মন্দিরে বিয়েটা বিয়ে নয়? তাকে আপনি অস্বীকার করেন?' আমি সহসা উত্তপ্ত হয়ে উঠি।

'আমাদের গাঁয়ে নটরাজের কোনও মন্দিরই ছিল না।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন মিঃ রামস্বামী, 'বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি সত্যিই ব্যাচেলর।'

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি মিঃ রামস্বামীর দিকে। এসব কী বলছেন মিঃ রামস্বামী। তবুও শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করবার ভঙ্গিতে বললাম, কিন্তু আপনার ডান বাহুতে ওই কালো দাগ?

'ওটা? ও একটা ফোঁড়া হয়েছিল ছেলেবেলায়। তারই দাগ।' মিঃ রামস্বামী খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলেন।

মিঃ রামস্বামীকে একটি জীবন্ত প্রহেলিকার মতো লাগছিল।

একসময় ফুঁসে উঠে বলি, এই যে অ্যাতো সব বললেন, অ্যাতো সব, বিপ্লব, লড়াই, শকুন্তলা—সবকিছু বানানো?

'ওহো!' মিঃ রামস্বামীর বুঝি সহসা হুঁশ হল। মৃদু হেসে বললেন, 'ওগুলো আমার পূর্বজন্মের ঘটনা।'

'মোটেই নয়।' আমি ফুঁসে উঠি, 'এ আপনার এই জীবনেরই ঘটনা। ১৯৩৭ সালের।'

'এমন কথা অত জোর দিয়ে বল কী করে তুমি?' মিঃ রামস্বামী মিটিমিটি হাসতে থাকেন, 'তুমি তো সারা পথ ঢুলছিলে। ভুল শুনেছ হয়তো।'

'আমি এক বর্ণও ভুল শুনিনি।' আমি সহসা খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠি, 'আপনিই কেন জানি পুরো ঘটনাকে হঠাৎই অস্বীকার করতে চাইছেন।'

মিঃ রামস্বামীর দুচোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। তার মধ্যেও মূর্তিমান প্রহেলিকা হয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। কুহেলিকার মতো অস্পষ্ট হাসলেন। বললেন, তাহলে বোধ করি ঘটনাটা পরজন্মের। সে যাই হোক, অত উতলা হচ্ছো কেন? একটা ক্যাম্পে পৌঁছে যাওয়ার পর আর গল্পের প্রয়োজনটা কি?

প্রয়াগ বেজের হাই

১.

পড়্ধানবাবু আগে আগে হাঁটেন, পেছন পেছন ব্যাগ ধরে হাঁটতে থাকে কৈলাস চৌকিদাব। কুঁজো হযে মাটির দিকে চোখ নাবিযে অবলীলাক্রমে পড়ধানবাবুর ছাযার গাযে মিশে যায় সে। পড়ধানবাবু গাঁযে গাঁযে ঘোরেন, ডিলারের দোকানে যান, এখানে ওখানে মিটিং করেন, কৈলাস অল্প তফাতে বসে থাকে। পড়ধানবাবু যখন বাড়িতে থাকেন, কৈলাস তখন বাবুর জমির আল বাঁধতে বেরিযে যায। নইলে গাই দুইতে বসে। গরমেন্টের চৌকিদার তুই, হলি কিনা পড়্ধানবাবুর লগদি, তল্পিবাহক! সরকারি পাগ-পেটি ঘরের কোণে লুকিয়ে রেখে পড়্ধানবাবুব মুনোশ পরেছিস মুখে, দড়ি থাকে পড়্ধানবাবুর হাতে! টান মারলেই পিছু পিছু হাঁটতে থাকিস। সারা গাঁয়ে তুই না একমাত্তর গরমেন্টের লোক!

আগের দিনকাল আর নেই কো। সব হাতিতে খাওয়া কয়েৎ বেলের তুল্য। বাইরে ঠাটবাট, ভেতরে সারবস্তু বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আইন বলো, কানুন বলো, সব গেছে এ যুগে! কেউ আর মানছে নাই কারুকে। যে-যার শিং-এ মাটি খুঁড়ছে নিজেব মতো। হবেই তো, ঘোর কলি যে, সেদিন কুশবসান বাজারে বিডিওকে ধরে দু-চার ঘা দিযে দিল পাবলিক। কিচ্ছুটি হল? এমন প্রসঙ্গে নড়েচড়ে বসে পরমেশ্বর জানা। জিভ তার অলবলিয়ে ওঠে আগের দিনের কথা বলবার জন্য। সেসব সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের কাহিনী। ব্রহ্মচারী খালের ধারে একটা লাল পাগড়িকে ধরে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিয়েছে লোধাবা। সে নাকি সরকাবি জঙ্গালে কাঠ কাটবার জন্য ওদের ফাটকে ঢোকাবে বলে হুমকি দিয়েছিল। ওদের মধ্যে শুশুক লোধা ছিল আকাট জোয়ান। ক্ষেপে গিযে সিপাইটার পাগড়ি খুলে ফেলে দিল মাটিতে, তাবপর দৌড় মারল জঙ্গালে। বটে, বটে! পুলিশের হেনস্থায় জমায়েত পুলকিত। পরমেশ্বর জানা বলে, অত হাস নি হে। কাহিনীটা পুরা শুন। তো, বড়বাবু যথাসময়ে শুনলেন কথাটা। খেতে বসেছিলেন তিনি। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সাজিযে বসেছিলেন। খাওয়া আর হল নি। নিমিষের মধ্যে পুরো থানা ধড়া-চূড়া পরে তৈরি। পেটি খিঁচল, পাগ বাঁধল, পাকা বাঁশের লাঠি নিল হাতে। আর নিল মোটা মোটা রশি। রাতের বেলায় পুরো লোধাপাড়া জ্বলতে লাগল দাউদাউ করে। কান্নার রোল উঠল পাড়াময়, সে কান্নায় পাষাণও গলিয়া যায। সক্কালবেলায় গোটা লোধা পাড়াটাকে এক রশিতে বেঁধে থানায় ফিরলেন বড়বাবু।

পাড়ার যত মুরগী ছিল, ঐ দিয়ে ফিস্টি হল থানায়। মানুষগুলোকে, পয়লা, বাঁধা হল থামে। তারপর মার্-মার্, গন্ধর্বের মার। একজন সিপাই থামে তো অন্যজন লাঠি নেয় হাতে। তেষ্টায় ছাতি ফাটো ফাটো, টুকচান জল দাও গো জল—। ওদিকে গোষ্ঠ লাইক মুতে ভাসিয়ে দিচ্ছে থানার মেঝে। সেই মুত মাটির খুরিতে ধরে খাইয়ে দেওয়া হল অন্যকে! খা, খা, জল খা। দু-দিন দু-রাত নরক যন্ত্রণা চলল। তারপর বাছাবাছা জনা-দশেককে সদরে চালান দিয়ে বাকিদের মুচলেকা নিয়ে থানার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত নাকে খত দিইয়ে তবে ছাড়লেন বড়বাবু। পাড়ায় ফিরে গিয়ে কুঞ্জ মল্লিকের সেই যে রক্ত বমি ধরল, আর ছাড়ল নি। ওতেই মরল শালা।

সত্যি, সে এক দিন ছিল বটে! সে যুগে শাসন ছিল, বিচার ছিল, রাস্তার কুকুর মাথায় চড়বার স্বপ্ন দেখত নি। আরে বড়বাবু তো ঢের দূরের কথা, সে যুগে চৌকিদারেরই দাপট ছিল কত। এই আমাদের কৈলাস চৌকিদারের বাপ মুকুন্দ চৌকিদারের গর্জনে তখন গাঁ-ঘর কাঁপত থরথরিয়ে। শুন তবে। দশানন সাউয়ের ঝি কাঞ্চন, বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যায় না। বর নাকি মারধর করে সেখানে। স্বামী, শ্বশুর বহুবার এসে বিচার-পঞ্চাৎ করল। ফল হল নি কিছুই। দশানন সাউয়ের এক গোঁ, অমন চামারের ঘরে পাঠাব নি মেয়েকে। সেটা বোধ লেয় বাংলা একান্ন কি বাহান্ন সাল ; একদিন হল কী, দশানন সকাল বেলা গেছে মেদুনপুর শহরে। সন্ধ্যার আগে ঘুরবার সম্ভাবনা নেই। অমন মাহিন্দ্র যোগ কেউ ছাড়ে? বহুদিন যাবৎ তক্কে তক্কে ছিল কাঞ্চনের বর গয়ানাথ, সুড়ুক-সন্ধান নিচ্ছিল, যেই না দশানন গেল সদরে, অমনি পাইক-পেয়াদা জুটিয়ে হানা দিল শ্বশুরবাড়িতে। তখন বৈশাখ মাস, আকাট দুপুর, ঘরের বাইরে জনপ্রাণীটিও নেই, গয়ানাথ একেবারে ডুলি সাজিয়ে হাজির। সঙ্গো বিশ-পঁচিশ জন তাগড়া জোয়ান। ডুলিখানা লুকিয়ে রাখল সায়ের পুকুরের পাড়ে, নিজেরা গিয়ে হাজির হল শ্বশুরবাড়িতে। দশাননের বাড়িতে তখন পুরুষমানুষ বলতে একজনাও নেই। মানুষ বলতে দশানননের বউ, তিন-চারটা নাবালক বাচ্চা, আর কাঞ্চন। আর গয়ানাথের সঙ্গো বাছাবাছা বিশটা জোয়ান। কাঞ্চনকে প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে সায়ের পুকুরের দিকে দৌড় মারল গয়ানাথ। চারপাশে ঘিরে রইল বিশটা ষণ্ডা। সায়ের পুকুরের পাড়েই রয়েছে ডুলি। কোনো গতিকে কাঞ্চনকে একটি বার ডুলিতে তুলতে পারলেই ইস্তক বিস্তি কাবার। এদিকে দশাননের বউ-বাচ্চার চিল-চিৎকারে বেরিয়ে এসেছে গাঁয়ের মানুষজন। দেখেশুনে সবাই তো হাবা। ফ্যালফ্যাল করে দেখতে থাকে সুভদ্রা হরণের দৃশ্য। কী করবে, কী করণীয় ভেবে পায় না। আমি তখন সবে কলকায় আগুন দিয়ে টিকিয়া ধরাচ্ছি। তখনও আগুন ধরেনি ঠিক ঠিক। কলকা মাঝ উঠানে ফাবড়ে দিয়ে দৌড়ে যাই। গাঁ-র লোককে বলি, ভুলভুল করিয়া দেখু কী রে? মেয়েটার বাপ নাই কো ঘরে, তা বলিয়া সারা গাঁ-র চক্ষের সুমুখে অমন করিয়া লিয়া যাবে? দশানন ফিরিয়া আইলে কী জবাব দিবি অর পাশ? জগৎসুন্ধু লোক হাসবে যে রে! বলবে, বাপ ছিল নি তো কী হইছে, সারা গাঁয়ে মরদ ছিল নি? জলজ্যান্ত মেয়াটাকে শত জনের সুমুখ দিয়া লিয়াল-অ, সারা গাঁ-র মানুষ চুড়ি পরিয়া বুসিয়া রইল! শুনে গাঁয়ের মানুষের হুঁশ ফেরে। সব্বাই গিয়ে ওদের সায়ের পুকুরের পাড়ে আটকায়।

তখনও কাঞ্চনকে ডুলিতে তুলতে পারেনি গয়ানাথ। গাঁ-র লোক বলে, সিটি হবে নি। ঘরে গাজ্জেন নাই, এ অবস্থায় গাঁ'র মেয়াকে লিয়া যাইতে দুবো নি আমরা। গয়ানাথ ছোকরা কেবলই ফোঁস ছাড়তে থাকে। মোর ইস্ত্রি, মুই লিয়া যাব, তুমরা বাধা দিবার কে? চল্ মাগী, ডুলিতে উঠ্, কে কী করে দেখি। আইন মোর সহায়। এ তো আচ্ছা সাপের ছুঁচা গিলা অবস্থা! কী বুদ্ধি করি! নিজের পরিবারকে লিয়া যাচ্ছে স্বামী, আমরা বাধা দিই কুন্ আইনে? বাধা দিতে গিয়ে লাঠালাঠি হলে, মাথা-টাথা ফাটলে আইনের প্যাঁচে পড়িয়া যাবে গাঁ-র লোক। অথচ যেকোনো উপায়ে গয়ানাথকে রোখা দরকার। হঠাতই আমার মাথাতেই খেলল বুদ্ধিটা। গয়ানাথকে নিরস্ত করতে পারে একমাত্র গাঁয়ের চৌকিদার, মুকুন্দ চৌকিদার। মহারাণীর পাগ-পেটি তার কোমরে বাঁধা, তার হুকুম মানে খোদ মহারাণীরই হুকুম। কিন্তু শালা এমনই কপাল, সেই দিনই মুকুন্দ চৌকিদার গিয়েছে তার মেয়ের বাড়ি। সেটা বুঝতে পেরে গয়ানাথের আমোদ আর ধরে না। চিল্লিয়ে আকাশ ফাটাতে থাকে সে, নিজের ইস্তিরিকে লিয়া যাচ্ছি, যে সুমুন্দি গায়ে হাতটি দিবে, তার নামেই ঠুকব একনম্বর। কাঞ্চনকে নিয়ে গিয়ে ওরা তুলে দিল ডুলিতে।

তারপর?

শেষমেষ বুদ্ধিটা ভগবানই জোগালেন। বললাম, মুকুন্দ চৌকিদার নাই তো কী হয়েছে? ডাক তো রে অর ব্যাটা কৈলাসকে। পাগ-পেটি পরিয়ে লিয়ে আয় তাকে জলদি। কৈলাসের বয়েস তখন তের কি চোদ্দ। খাঁকি পোষাক আর পাগ-পেটি পরে সে ডাহা কিষ্টো ঠাকুরটির পারা খাড়া হল সুমুখে।

বলি, মহারাণীর পাগ-পেটি পরায়ে আমরা আইজকার মতন কৈলাসকেই চৌকিদার সাব্যস্ত কল্লাম। বল্ কৈলাস, মহারাণীর পেটির জোরে, দেশমাহারাজের আদেশে মুই তুমাদেরকে আড়ষ্ট কল্লম।

কৈলাসও শোনামাত্তর চেঁচিয়ে ওঠে, মুই তুমাদেরকে আড়ষ্ট কল্লম।

ব্যস, অতগুলান ষণ্ডা জুয়ান সায়ের পুকুরের পাড়ে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়া রইল, সারা দুফোর।

'দাঁড়িয়া রইল?' বিনোদ হাতির কলেজে-পড়া ছেলে অশোক হাতি চোখ বড় বড় করে তাকায়, 'বাঁধা নাই, ছাঁদা নাই, তাও দাঁড়িয়া রইল? পালালো নি ক্যানে?'

'পালাবে? গরমেন্টের লোক আড়ষ্ট করবার পরেও পালাবে? পালিয়া নিস্তার পাবে?'

'তারপর?'

'তারপর থানায় খবর গেল। সইন্ঝা নাগাদ আইলো এক কনিষ্ঠবল। মেঢ়া খেদানোর মতোন খেদিয়া লিয়া গেল সবগুলানকে। কীহে কৈলাস, মনে পড়ে সেসব দিনের কথা? বিশটা লোককে শুধু মুখের কথায় আড়ষ্ট করেছিলে সেদিন, একটা লোকও পালিয়া যাইতে পারল? সেদিন তো তুমি আইন মোতাবেক চৌকিদারও ছিলে নি।'

কৈলাস চৌকিদার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। লজ্জায় শরমে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় সে।

'আর সেই তুমি কিনা, একটা বমাল ধরা পড়া চোরকে আড়ষ্ট করতে গিয়া ভয়ের তানে কাঁপতিছ!'

কৈলাস চৌকিদারের অক্ষম নীরবতাটুকু উপভোগ করছিল জমায়েত, ঠিক সেই মুহূর্তে বিকট আওয়াজ করে হাই তুলল কেউ।

সবাই চমকে তাকায়। বিস্ময়ে থ হয়ে যায়। হাই তুলেছে, আর কেউ নয়, স্বয়ং প্রয়াগ বেজ।

২.

—আরে, গল্প শুনলে কী পেট ভরবে হে, বিচার-টিচার কী করবে, করো জলদি। এ শালা যে মজাসে গল্প শুনিতেছে বুসিয়া বুসিয়া।

—শুনতে শুনতে ঘুমিয়া পড়ছে যে। হাই উঠছে অর্। ফুঁসে ওঠে গজ আইচ।

প্রয়াগ বেজ চমকে তাকায়। সত্যিই, বাবুদের গল্প শুনতে শুনতে একেবারে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল সে। হুঁশ ছিল না একেবারেই৺ স্থানকালপাত্র জ্ঞান ছিল না তিলমাত্র। পুলিশের মারের গল্প, চৌকিদারের দাপটের গল্প..., গল্প-গাথার মধ্যে এক ধরনের নেশা থাকে, শুনতে শুনতে নেশাটা ক্রমশ গাঢ় হয়, তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। মৃত্যুভয়ও বেভ্ ভুল হয়ে যায়। প্রয়াগ বেজও ভুলে গিয়েছিল, এই এতগুলো মানুষ যে ঘিরে বসেছে, তারই বিচার করবার জন্যে। দোষ প্রমাণ করবার দরকারই হয়নি, একেবারে বমাল ধরা পড়েছে প্রয়াগ, অর্থাৎ কিনা যাবতীয় প্রমাণ একখানা পুঁটলিবন্দি হয়ে ওরই পাশটিতে শুয়ে রয়েছে। কাঁসাবাসন, কাপড়চোপড়, গয়না...। গজ আইচ, যাকে সর্বস্বান্ত করতে গিয়ে আজ ধরা পড়েছে প্রয়াগ বেজ, তার চুরি যাওয়া মালগুলো ফেরৎ চেয়েছিল। বিনোদ হাতি, গাঁয়ের গণ্যমান্য বিচারকমণ্ডলীর একজন, বেঁকে বসেছে। মালই যদি তোমার ঘরে ঢুকে গেল, তবে আর আমরা বিচার করি কীসের জোরে? মালই তো চোরের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ। যুক্তি ছিল কথাটায়। কাজেই একপুঁটুলি প্রমাণ কোলের ওপর চাপিয়ে প্রয়াগ বেজ ক্ষণ গুনছে, কখন বিচারটা শুরু হয় বাবুদের। প্রমাণ করবার দায় তো নেই, এখন কেবল বিচার করে সাজাটুকু দেওয়া। এইটুকুর জন্য সারা সন্ধে ধরে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে অপেক্ষা করছে প্রয়াগ।

গজ আইচের কথা শুনে প্রয়াগ আড়চোখে তাকায় ওর দিকে। বুকের মধ্যে সহসা গুরগুরানি ভয়। নাইমুলে ফের সুড়সুড়ানি অনুভব। কার্তিক মাইতি, প্রয়াগ যে পার্টির মিটিং-মিছিলে ইদানীং যায়, সেই পার্টির নেতা। প্রয়াগ তার এক চেলাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে কার্তিকের কাছে। কার্তিকদা, বাঁচাও। জবাবও গেছে গেছে চেলার মাধ্যমে। মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে যে চোর, তার পক্ষে ওকালতি করতে সরাসরি যাওয়ার অসুবিধা আছে। পার্টির ইমেজ খারাপ হয়্যাবে। পার্টি নজর রাখছে পুরো পরিস্থিতির ওপর। আপাতত গ্রাম্য বিচারব্যবস্থায় সরাসরি নাক গলানো ঠিক হবে না।

প্রয়াগ ক্ষণ গুনছে।

গজ আইচের অস্থিরতার কারণ রয়েছে। বিচার অন্তে চুরি যাওয়া সামগ্রী ফেরৎ পাবে সে, তার আগে নয়। সে ফের তাড়া লাগায়। গল্প পরে হবে, এখন বিচারটা শুরু হোক। বিনোদ হাতি চক্রাসনে বসেছিল বিচারকদের মধ্যমণি হয়ে। মুকুন্দর কথায় পা বদল করে সে।

'বিচারের আর আছেটো কী?' ধনঞ্জয় ঘোষ বলে ওঠে, 'হাতে নাতে ধরা পড়ছে, মাল রয়েছে চোখের সামনে, বিচার আর কী করবে? সাজাটা বলিয়া দাও, শুরু হয়্যা যাউ, রাত বাড়ে।'

প্রয়াগ বেজ মাটি থেকে চোখ তোলে না। সে কেবল কান খাড়া করে শুনতে থাকে বাবুদের হরেক প্রতিক্রিয়া।

হ্যাজাক জ্বলছে নাটমণ্ডপের খুঁটির গায়ে। আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। আলোটা যথেষ্ট নয়। হ্যাজাকটাও দুব্‌লা।

—অত বলাবলির কী আছে? পা দু-খান মুচড়িয়া ভাঙিয়া দিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

এমন কথায় যেন উৎসাহ পায় সবাই। গদাধর দাসের দিকে মুখ ফেরায়। তুমার যন্তরপাতি সব লিয়া আস্‌স ত হে গদাধর? গদাধর দাস ইঙ্গিতে সায় দেয়। যে কোনো গ্রাম্য বিচারের থানে শারীরিক নির্যাতনের নেতৃত্বটা তাকেই দিতে হয়। এ এক দীর্ঘকালের অলিখিত নিয়ম। সেই কারণে, বিচারের আসরে সে খালি হাতে আসে না। তার নিজস্ব হাতুড়ি, চিমটে, নাইলনের সুতায় বাঁধা জালের কাঠি ইত্যাদি 'যন্তরপাতি' সহকারেই উপস্থিত হয়।

গজ আইচ অস্থির গলায় বলে, তেবে আর দেরি করিয়া লাভ কী? শুরু করিয়া দও কাজকাম।

গদাধর দাস জবাব দেয় না। কাজকামও শুরু করে না সে। কেবল মিচিক মিচিক হাসে। ভারি গূঢ়, অর্থবহ সে হাসি।

প্রয়াগ বেজ মুখ তুলে তাকায় না। সে শুধু অপেক্ষা করতে থাকে। কান-জোড়া শানিয়ে রাখে বাবুদের দিকে। ঐ কানদুটো দিয়ে দেখতে চায় সমগ্র জমায়েতের মুখ। টুকরো-টাকরা কথা, অশ্লীল মন্তব্য, ভাঙা ভাঙা হাসি, খসর খসর গা চুলকানি, 'ফস' করে দেশলাই জ্বালবার আওয়াজ, —সব সারবন্দি হয়ে কানে ঢোকে ওর। সে প্রতিমুহূর্তে একজোড়া শক্তপোক্ত হাতের ছোঁয়া প্রত্যাশা করতে থাকে তার চুলের গোছায়।

'হাত-পা মুচড়ানো পরে হবে, আগে শালাকে টুকচান দোল খাবানো হউ।' এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন বিনোদ হাতি, 'দড়ি-টড়ি আননি কেউ? বাঁধবে ক্যামনে?'

বিনোদ হাতির কথায় সকলের যেন সহসা হুঁশ হয়। দড়িটড়ি কিছুই আনা হয়নি। বিরক্ত হন বিনোদ হাতি, 'তুমাদের কাণ্ডকারখানাই এমনি। চোরের বিচার হবে, দড়ি আনোনি একটা।'

শংকর বাগ অতি উৎসাহে তেতে ওঠে, 'দড়ি কী হবে হে? গামছা দিয়া কষিয়া বাঁধ্ শালাকে, হাঁটুগুলান ছেঁচিয়া দে।'

ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল মুকুন্দ আইচ। বলে, 'যা করবার করো না বাবু, কথা চিবিয়া কী লাভ? এসব কাজে অত গড়িমসি কল্লে কী চলে?'

—ঠিক। এর ওষুধ হইল, ধর্ তক্তা মার পেরেক। কথাটা কে বলল আধো অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু কথাটা তৎক্ষণাৎ সমর্থন করল অনেকেই। ঠিক, যেমন ঠাকুর, তার তেমন পূজা, মনসাঠাকুরকে উখ্ড়া ভুজা।

সবাই আস্ফালন করছিল মুখে, আসল কাজে এগিয়ে আসার উৎসাহ বড় একটা দেখা যাচ্ছিল না। সাহস পেয়ে ধীরে ধীরে মাটির থেকে মুখ তোলে প্রয়াগ। বাবুদের মতিগতি বোঝবার চেষ্টা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এমনটা তো সচরাচর ঘটে না। বিচারের থানে বসে সকলের হাতই প্রথম থেকে নিশাপিশায়। চুপচাপ বসে থাকবার ধৈর্য থাকে না বেশিক্ষণ। এদের আজ হলটা কী? মালের হদিশ না পেলেও বাবুরা মারমুখো হয়ে থাকেন। বেঁধে, ঝুলিয়ে, গায়ে জল বিছুটির ছাট মেরে, বুকে বাঁশ ডলে, আগুনের মালসা ছাতিতে বসিয়ে মালের হদিশ পেতে চান। গদাধর দাস পকেট থেকে চিমটে আর হাতুড়ি বের করে ফেলে পয়লা চটকায়। আজ বাবুরা অমন মুনি-ঋষির তুল্য ঠায় বসে কেন? প্রয়াগ বিচারপতিদের মুখের রেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করে। বেশ ফুরফুরে হালকা লাগছে সবাইকে। বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভার অভিব্যক্তি। চোখেমুখে কোনো ক্রোধ, উত্তেজনা কিংবা হিংসার লেশমাত্র নেই। বমাল চোর ধরবার পরেও বাবুরা অত ঠাণ্ডা কেন আজ? প্রয়াগ বুঝে পায় না।

ওই হয় রে প্রয়াগ! মাল না পেলে তখন বাবুদের মাথায় এক জব্বর দায় চেপে থাকে। আসামীকে চোর সাব্যস্ত করবার দায়। চোর সাব্যস্ত না হলে কার বিচার করবেন বাবুরা? সেই কারণেই, কেবল সন্দেহের ওপর ধরলে তাকে আগে চোর বানাতে হয়, তারপর বিচার। আর, চোর বানাবার জন্যই না হরেক কিসিমের নির্যাতনের ব্যবস্থা। আজকের বিত্তান্তটা আলাদা। চোর তো মালসুদ্ধু ধরা পড়েছেই। চোর তো সাবস্ত হয়েই রয়েছে। এবার কেবল সাজা দেবার অপেক্ষায়। এইসব কারণেই বাবুরা আজ বড়ই ঠাণ্ডা, নিশ্চিন্ত। ইঁদুর নিজের থাবার মধ্যে থাকলে বিড়ালের যেমন নিশ্চিন্ত ভাব। প্রয়াগ বেজ এইভাবেই যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করতে থাকে পুরো ব্যাপারটাকে।

৩.

ওদিকে বিনোদ হাতি গল্প জুড়েছেন জমিয়ে।

প্রয়াগের বাপের গল্প।

বলেন, এ শালা তার পাইছে কী? না গা-গতর, না বিদ্যা, না উপস্থিত বুদ্ধি। এর বাপ গগন বেজের ছাতির পাটা ছিল কত বড়! শালা হাঁটত যেন মহিষাসুর। এ শালার মতন কুঁজা চামচিকার পারা ছিল নাকি সে! আর বিদ্যাটা কেমন শিখেছিল যত্ন করিয়া। সাত-সাতটা দেওয়ালে সিঁদ কাটিয়া মথুর ঘোষের সর্বস্ব লিয়া গেল যেবার, মনে আছে তুমাদের? বলো না হে ধনঞ্জয়। আর, এ শালা তার কুপুত্তুর, শালা যেন ধরা পড়বার তরেই চুরি কত্তে যায়!

প্রয়াগ বেজ লজ্জায় অধোবদন হয়। মনে পড়ে বাপের মুখখানি। বাপের সঙ্গো তুলনা চলে তার? বাবুরা যে কী কথা কন! বাপের যুগে জন্মাবার মুহূর্তে খাঁটি মধু দিত মুখে। প্রয়াগদের সময়ে মধু তো মধু, চিটাগুড়ও পরিমাণ মতো জোটেনি। কী করে বাপের তুল্য হবে প্রয়াগ? তাছাড়া বাপের কালে একখানা কাজ নামালে আর সম্বৎসর দেখতে হত না। সিঁধটি কেটে একটিবার ভিতর-বাগে সেঁধাতে পেরেছ কী, ব্যস। সংসারের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী তোমার হাতের গোড়াটিতে সাজানো। বাপের মুখে তো গল্প শুনেছে প্রয়াগ, শুধু মথুর ঘোষের বাড়ি থেকে বাপ পেয়েছিল একশো সত্তর ভরি সোনা। সাতটা কেন, এমন ক্ষেত্রে সত্তরটা সিঁদ কাটতেও সাধ জাগে মানুষের। মাল হাতে পড়লে তখন সব দিগাদারি পুষিয়ে যায়। আর আজকের দিনে? সিঁধ-টিধ কেটে, প্রাণটি হাতে নিয়ে বহুকষ্টে ঘরের মধ্যে ঢুকে তুমি পাচ্ছ কী? খানকয় পুরাতন কাপড়-চোপড়, কিছু কলাই করা বাসনপত্তর, কয়েক খান রূপার গহনা আর ঘরের কোণে বস্তাটাক চাল। এতে করে কারো পোষায়? খালি, বিদ্যার দোষ দিলে চলে? বাবুরা যে ইদানীং সোনাদানা, ট্যাকাকড়ি সব শহরের ব্যাঙ্কে রেখে দিচ্ছেন, সেটা কিছু নয়? বাপের তুল্য বিদ্যাটা রপ্ত করে হবে কী? আসল থানে তো লবডঙ্কা।

'আরো ছাড়ো দেখি। সে দিনকাল আর নাই।' জীবন মাঝি মাথার ওপর ডান হাতখানা তুলে সবার নজর কাড়তে চায়, 'আগের দিনে সিপাই-দারোগাও ছিল অন্য প্রকার। অদের নামে গোটা তল্লাট দলদল করিয়া কাঁপত। 'বড়বাবু ডাকছেন' শুনলেই পেটের পিলা সেঁধিয়া যাইত। বাহ্যিপিসাব বন্ধ। মেয়াছেলারা মানসিক করত তেত্রিশ কোটি দে-দেবতার থানে।'

'বাপরে, সে এক ফাঁড়া গেছে আমার।' বিনোদ হাতি ছাতিতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'টুকচার কম জ্বাল দিবার তরেই হোক কিংবা কম রোদে দিবার তরেই হোক, ঘি'টা সামান্য মইশা গন্ধ ছাড়ছিল। থানায় দিয়ে আসার পরের দিনই তলব। বড়বাবু ডেকেছে। কান্নাকাটি পড়িয়াল-অ ঘরময়। অন্ন রুচল নি মুখে। সক্কাল বেলায় গরুর গাড়ি সাজিয়ে রওনা দিলাম। সাথে নিলাম বাদশাভোগ চাল, ক্ষীরের রাবড়ি, পাকা রুই, আর লগদে যা লিবার সে তো লিলামই। কিন্তু, কী আর বলব তুমাদের, যত থানার কাছাকাছি হচ্ছি, ততই পিসাবের বেগ বাড়িয়া যাচ্ছে...।

হাসি পাচ্ছিল সবাইয়ের, কিন্তু সাহস করে হাসতে পারে না কেউ। বাবু তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছেন, এ সময় হাসাটা অনুচিত। দুঃখের কথায় কেউ হাসে?

'আর, সেদিন শুনলাম, থানার বড়বাবুর মাথা অর্ধেকটা কামিয়া দিয়া, গোটা হাট ঘুরাল পার্টির ছোকরারা।' বিনোদ হাতি এইভাবে গল্পটার উপসংহার টানে।

বিহারী দাস, ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, তিনপুরুষ ধরে হাল ঠেললে ভাত জোটে, ইদানীং প্রায় সব পার্টির মিটিং-মিছিলেই কলকাতা যায়। মিটিং উপলক্ষ্যে কলকাতা যাওয়াটা তার কাছে ইদানীং এক জবরদস্ত নেশার মতো। বলে, কোলকাতা, সে এক জা-গা বটে! চোখ খুলিয়া যায় হে! চোখ খুলে যাওয়ার সুবাদে বিহারী দাস ইদানীং রাজধানীর অনেক খবরাখবর রাখে। বিনোদ হাতির কথার রেশ ধরে কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ পেয়ে যায় সে।

বলে, 'আরে, দারুগা ত কুন ছার, খোদ লাটসাহেবকেই আজকাল হাট-বাজার কত্তে হয় নিজের হাতে।'

'অর ঘরখানা নাকি বাজেয়াপ্ত করিয়া লিছে গরমেন্ট?'

'লিছেই ত।' বিহারী দাস বিজ্ঞভাব করে নিশ্চিত খবর জোগায়, 'আসল বাড়ির পাশেই একখানা ছোট্ট এসবেস্টারের একচালা ঘর করিয়া দিছে লাটসাহেবের তরে। আসল বাড়িখানার অর্ধেক জুড়ে সরকারি আপিস।'

'দ্যাখো দিখি!' পরমেশ্বর জানা বিস্ময়ে থ। ঝুলে পড়া চামড়ার আড়াল থেকে তার আহত চোখের দৃষ্টি তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকে, 'লাটসাহেবের ঘর কিনা এসবেস্টারের একচালা! অর চেয়ে হাতির-পোর ঘরটা ত বড় হে। কী মানুষের কী দশা হয়েছে আজকাল!'

'নাই, নাই—।' দু-হাতের তালু বারবার উলটে পালটে এক ধরনের শূন্যতার মুদ্রা রচনা করে বিহারী দাস, 'লাট সাহেব নাই, সে আপিসারও নাই, সে দিনকালও নাই। দেশে শাসন নাই, মাইন্‌ষের ভয়-ভ্রান্তি নাই, সব কিছো এক্কেরে চলিয়াল-অ।'

'এবারে যে বিডিওটা আস্‌সে, সে নাকি কেউ ঘরে ঢুকলেই হাত জোড় করিয়া ফেলে?'

সারা জমায়েত দাঁত বের করে হাসে। এক ধরনের তাচ্ছিল্যের হাসি।

'সেদিন এক কাণ্ড হয়েছে।' বিহারী দাস জমায়েতকে আরও একটি তথ্য সরবরাহ করে, 'সেদিন বিডিও আপিসে মিছিলে গিয়া দেখি, মউলগ্রামের ভানু গুচ্ছাত, চিনো ত তুমরা, দাউদচরা ভানুয়াকে চিনো নি?

—চিনি চিনি।

—সেদিন দেখি, শালা বুসিয়া আসে বিডিওর সুমুখে, চিয়ারে। আমাদেরকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বিডিও অকে ফের বুস করিয়া দিল চিয়ারে। বলে, বসুন ভানুবাবু, বসুন।

—ছ্যা, ছ্যা, এরা ফের আপিসার! সাবেক মানুষজনের নাক-মুখ ঘৃণা আর অবজ্ঞায় ভাঙচুর হতে থাকে। কতবড় চিয়ারে অধিষ্ঠান তুমার, চিয়ারের মান্যি রাখবে নি তুমি?

—এই জন্যেই ত দেশটার এই আবেস্তা!

—এরা নাকি সাহেবদের কাজ চালাবে!

—এরা লাথি-ঝাঁটা খাবে নি ত কে খাবে!

—এমন জা-গায় পড়ত ত্রিভঙ্গ দে, দে-সাহেবকে ত মনে আছে হাতির-পো? সার্কেল আপিসার ছিল, মনে নাই? বাপরে বাপ, বাঘের বাচ্চা ছিল একটি! কারুকে হাঁক মারলে বিশ হাত দূর থিকে পিসাব হয়্যা যাইতো কাপড়ে-চুপোড়ে। 'শালা' ছাড়া কথাটি কইত নি। হাতির-পো'র বাপ তখন ইউনিয়ন বোর্ডের পিসিডেন্ট। তখনই একবার আস্‌ছিল আমাদের গাঁয়ে। দেখলেই মালুম হয়, হঁ—এ এক আপিসার বটে।

—সেসব দিনকালই ছিল অন্য, সেসব মানুষই ছিল আলাদা। অদের ছিটা ফোঁটাও আইজ আর নাই।

জমায়েতের মানুষ তখন ভাবের জায়গায় দ্বিধা বিভক্ত। বয়স্ক যারা, সাবেক কালের স্মৃতি মন্থনে বিভোর, যেন যষ্ঠিমধু চিবোচ্ছে। আর, নবীন যারা, সে যুগটা দেখেনি,

তারা শুনতে শুনতেই মুগ্ধ আবিষ্ট। যেন লেবেনচুষ চুষছে দুটি বড়লোকের ছা, পাঁচ-সাতটা গরীব-সন্তান তাই দেখছে ভুলভুল চোখে। বড়লোকের ছা-র মুখের মধ্যে রসের ভিয়েন চলছে, দেখতে দেখতে অভাগার দল লোভের তানে শুকনো ঢোঁক গিলেছে। সত্যি, সে যুগটা না জানি কী এক সত্যযুগ ছিল! একটুখানি পরে জন্মাল বলেই, সোনার দিনগুলির স্বাদ পাওয়া গেল না। সোনার পাখিগুলি কবে যেন নিঃশব্দে উড়ে গেছে। আর কোনদিনও ফিরবে না।

এমনি সময়ে প্রয়াগ বেজ দ্বিতীয়বার হাই তুলল, আকাশের দিকে মুখ তুলে বেশ দীর্ঘ, সুরেলা হাই।

৪.

কার্তিক মাইতি নিজে আসেনি বটে, তবে পাঠিয়ে দিয়েছে পার্টির বাছা বাছা গুটিকয়েক জুনিয়র ছোকরাকে। তারা এখানে ওখানে জায়গা করে বসে গিয়েছে কখন, পুরোনো দিনের সুগন্ধে ভোঁ হয়ে থাকা মানুষগুলো খেয়ালই করেনি। প্রয়াগের লম্বা হাই শুনে যখন হুঁশে ফিরল, বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেল, দেখল ছোকরাগুলো নিঃশব্দে বসে রয়েছে। চাঁদমামা সামান্য হেলে পড়েছে, আর হ্যাজাক বেচারা, ক্লান্ত, অবসন্ন, নিভু নিভু। কত রাইত হইল হে?

সহসা চণ্ডাল রাগখানা চড়ে বসে। পুরো পরিস্থিতির ওপর এই রোষ।

গজ আইচই প্রথমে প্রকাশ করে সেই রোষখানা, 'উঠো, উঠো, আইজ আর বিচার হবে নি। বুঝা সারা মোর।' সপাটে উঠে দাঁড়ায় সে। দাঁড়াতে গিয়েই বুঝতে পারে, ঝিঁঝিঁ ধরেছে পায়ে।

সঙ্গো সঙ্গো সারা জমায়েত নড়ে চড়ে বসে। সত্যিই তো, আসল কাজ বাদ দিয়ে আজ যেন গল্পে পেয়েছে সবাইকে! আজ যেন কারোরই তেমন গা নেই। সেই সন্ধে থেকে সবাই যেন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে।

কার্তিক মাইতির চেলাগুলো চুপচাপ বসে রয়েছে। জমায়েতের মনে হল, ওরা কোনো কিছুতেই বাধা দিতে আসেনি, কেবল পরিস্থিতিটা সরজমিনে দেখতে এসেছে। কিন্তু তাদের চোখের তারা ভারি শীতল।

—বুসিয়া বুসিয়া ভোর হয়্যাবে নাকি?

—হুকুম দাও হাতির-পো।

—আর কেমন করিয়া হুকুম দুবো আমি? তখন থেকেই ত বলছি। মুই কি তেবে নিজেই বাঁধাছাঁদার কাজটাও করব?

সেটা ঠিক। বিচারকরা কখনই নির্যাতনপর্বে সক্রিয়ভাবে হাত লাগান না। তাঁরা কেবল রায় দিয়ে খালাস। বাকিটা করবার জন্য এ গাঁয়ের দু-ডজন হাত প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। আজই কেবল হাতগুলো কেমন যেন অসাড়।

—আরে, গদাধর দাস কি মরিয়াল-অ নাকি? তুমার যন্তরপাতি বার করো। কাঁহাতক মশা চাপড়ান যায় সারা রাইত।

—ক্যানে, মুই ক্যানে? গদাধর দাস ছাড়া কি আর লোক নাই এ গাঁয়ে? অতবড় জমায়েতের বাকি সব নপুংসক?

—কি কইলু তুই? সারা গাঁ নপুংসক?

—দেশ-মহারাজকে নপুংসক বলু তুই?

—অতবড় হিম্মত তোর?

—জিভ কাটিয়া লিতে হয়।

—চোরেব বিচার পরে হবে। আগে এ শালাকে টাঙাও হে। চোরে ত ছাইয়া গেছে দেশ। ক-টা চোরের বিচার করবে তুমরা?

—হ্যাঁ, কে চোর নয়? মাস্টার চোর, আপিসার চোর, নেতা চোব, মন্ত্রী চোর...।

—কম্বলের চুল বাছা হয়্যাবে।

—আঁঠুগুলা ছেঁচিয়া দও শালার। বলে কিনা নপুংসক!

—হাতির পো, শুনিয়া রাখো, এ শালাব বিচাব যেদি না কব তুমবা, তেবে আমি আর দেশ-মাহারাজকে একটি ছ্যাদামও চাঁদা দিবো নি।

—চাঁদা ত তুমি ঢের দাও! তিন বচ্ছরের চাঁদা বাকি পড়িযা আছে।

—মুখ সামলিযা কথা কইব হে। শুধু আমার চাঁদা পড়িযা আছে? আশু-কামার চাঁদা দিছে!

—এ্যাই, এইবার তুই মার খায়া মরিযাবি। আমার হইল কামারশালের হাপর-টানা রাগ, 'বাপ' বলতে সময় দিবো নি।

চিৎকার চেঁচামেচি ক্রমশ তুঙ্গে ওঠে। কেউ কাবোর কথা শোনে না। কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে থামাবার চেষ্টা করে। সব মিলিয়ে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা।

দেখতে দেখতে ভারি অস্বস্তি বোধ করে প্রয়াগ বেজ। মিনমিন করে বলে, 'বাবুরা থামেন, ধৈর্য ধরেন, এমন করলে কি চলে? হাতিব-পো বুসিযা আছেন, তাঁর সুমুখে--।

বিনোদ হাতি অসহায় বসে ছিলেন উত্তেজিত জনতার মধ্যিখানে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর মান-মর্যাদা নিঃশব্দে গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছিল। প্রয়াগ বেজেব কথায় তাঁর অহং-এ নিদারুণ ঘা পড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে, চিৎকার করে সবাইকে শান্ত করেন তিনি। বলেন, 'এমন কল্লে তো বিচার চালানো দায় হবে। ধৈর্য ধরিয়া বুস সবাই। বিচারটা শেষ কত্তে দাও।'

—কার বিচার আগে হবে? প্রয়াগের না গদাধরিযার?

—আমার ছিড়বি তরা। সহসা তেড়ে-ফুঁড়ে ওঠে গদাধর দাস। দেশসুদ্ধ লোক একটা চোরের বিচার কত্তে পারতিছ নি, চিনিয়া রাখছ কেবল গদাধর দাসকে! সে উঠিয়া হাতুড়ি ধরলে, তুমরা সবাই মজাসে হাততালি দিবে! তারপর, দুর্জন মনিষ্যি, যদি মোব ঘরটায় লাল ঘোড়া দৌড়িয়া দেয়, তখন? যদি কার্তিক মা'তি দলবল লিয়া মোর পুক্‌রের মাছগুলা ছাঁকিয়া লেয়?

প্রয়াগ বেজ ঝাঁ করে তাকায় গদাধর দাসের দিকে। চোখের কোণে এক চিলতে আগুন জ্বলেই নিভে যায়। মুখখান নাবিয়ে নিয়ে সে মাটিতে আঁকচিরা কাটতে থাকে নিঃশব্দে।

গদাধরের কথাগুলো জ্বলন্ত আগুনের মতো সংক্রামিত হয় সবার মধ্যে। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে সবাই। যথাসম্ভব নির্বিকার মুখে বসে থাকে পরবর্তী পরিস্থিতির প্রত্যাশায়।

বিচারের স্থলে এক ধরনের অচলাবস্থা। চোর ধরবার পর তার গায়ে হাত দেবার সাহস নেই কারো, আবার তাকে 'যা, বাড়ি যা' বলে ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। দেশ-মহারাজের মান-মর্যাদার প্রশ্ন সেটা।

উপায় বাতলায়, অবশেষে বিহারী দাস। বলে, 'আমি বলি কী, আইনকে নিজের হাতে তুলিয়া লিয়াটা ঠিক নয়। অকে বরং থানায় পাঠিয়া দিবা হউ। থানাই আইন মোতাবেক অর বিচার করুক।'

প্রস্তাবটা প্রায় লুফে ধরতে গিয়েও ফেলে দিতে হল মাটিতে। এত রাতে ওকে থানায় নিয়ে যাবে কে? থানা কি একটুখানি পথ?

'আমরা লিয়া যাব কীসের তরে? বিহারী দাসই বুদ্ধি জোগায়, 'চৌকিদার আছে কী কত্তে?'

'চৌকিদার? মানে, ঐ পড়্ধানবাবুর লগদি? সে কিনা চোরকে থানায় লিয়াবে? পড়্ধানের ব্যাগ বইয়া তার ঘাড় কুঁজা হয়্যা গেছে!'

'তাতে কী? এটা ত চৌকিদারেরই কাজ। গাঁ-ঘরের শান্তি-শৃঙ্খলা...।'

'কিন্তু সে কুথা?'

সবাই চোখ চারিয়ে দেখে। জমায়েতের মধ্যে কৈলাস চৌকিদারের টিকিটিও খুঁজে পায় না। বাবুদের গল্প-গুজবের ফাঁকে কখন সে সটকে পড়েছে।

জমায়েত গোলার মতো ফেটে পড়ে অন্ধ রোষে। আজই পিটিশন লিখা হউ উয়ার নামে। সারা গাঁর লোক দস্তখত করুক। অমন অপদার্থ চৌকিদার চাই না আমরা। শালাকে অবিলম্বে ডিসমিস করা হউ।

৫.

ঘন্টাটাক বাদে পড়ধান বাবুর বাড়ি থেকেই ধরে আনা হল কৈলাসকে।

জমায়েত হৈ-হৈ করে তেড়ে যায়। তুমার চাকরিটা আসলে কী, জানতে চাই আমরা।

কৈলাস চৌকিদার নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। বিনোদ হাতি জিরাফের মতো গলা উঁচু করে তাকায়। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কৈলাসকে।

বলে, তোমার পোশাক কুথা? পাগ-পেটি? এ কেমন ধারা ডিপ্‌টি করতে আসা তুমার?

কৈলাস অপ্রস্তুত হাসে। পোশাক তো কবে ছিঁড়িয়া ফালাফালা। আর পাগ-পেটি ঘরে।

তাহলে? কী হবে এখন? জমায়েত ভাবনায় পড়ে যায়।

বিনোদ হাতি বলে, 'প্রয়াগকে অ্যারেস্ট করিয়া থানায় লিয়া যাইতে হবে যে।'

'মুই যাবো?' কৈলাস যেন আকাশ থেকে পড়ে।

'ক্যানে?' গর্জে ওঠে পরমেশ্বর জানা, 'চৌকিদারের কাজ নয় এটা?'

'চৌকিদার কি কেবল পড়্ধানের তল্পি বইয়া ঘুরবে?'

'চোর ধরা ত ছাড়িয়া দিছ কবে, ধরিয়া দিলে তুমি থানা অবধি পৌঁছিয়া দিতেও পারবে নি?'

'তুমি তেবে কীসের চৌকিদার?'

কৈলাস স্পষ্টতই বিপন্ন বোধ করছিল, চারপাশের অবিরাম ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাকের মতো ভিজছিল সে। একসময় কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'এখন, এই রাত দুফোরে থানাতক্ক যাবো কী করিয়া? টুকচান বিচার করিযা কথা কন বাবু?'

সে কথায় আরও তেতে ওঠে পরমেশ্বর জানা।

'চৌকিদার চোর লিয়া যাবে থানায়, এতে আর ভয়ের কী আছে হে? অ্যাঁ?'

'শালা নামেই চৌকিদার। বাপের এক ছ্যাদামও পায় নি।'

'ঠিক। অর বাপ মুকুন্দ চৌকিদার, যে দেখেছে সে জানে। ইয়া টাঙ্গির তুল্য গোঁফজোড়া, মোচ লাচাতে লাচাতে হাঁটত রাস্তায়।'

'এ শালার ত গোঁফই বারাল নি সারা জীবন।'

'শালা, মুকুন্দর ব্যাটা মাকুন্দ!'

কৈলাসের ওপর ঝড়বৃষ্টি চলতে থাকে অনেকক্ষণ। সবকিছু নিঃশব্দে হজম করে সে।

'শুন কৈলাস—' অবশেষে বুদ্ধি জোগায় বিহারী দাস, 'রাইতের ব্যালায় থানা অবধি যেদি না যাইতে চাউ, তেবে আড়ষ্ট করিয়া ঘরকে লিযা যা। ভোর হইলেই লিয়া যাবি থানায়।'

সে কথায় ভয়ে কালো হয়ে আসে কৈলাসের মুখ, 'বাইতের বেলায় অকে ঘরে ঢুকাবো মুই? যেদি মারিয়া ফেলায় মোকে? যেদি দু-টুঁশা দিয়া দৌড় মারে? মোর ঘরে ফের সদর দুয়ার ছাড়া আর কুনো ঘরেই আগড় লাই। যেদি রাতভর চুরি করে?'

'ধুশ্ শালা!' পরমেশ্বর জানা শব্দের থুৎকার ছোঁড়ে, 'রাজার লোক আড়ষ্ট করার পরও পালিয়ে যাইতে পারে কোউ? সাত ধারায় কেস হয়্যাবে না?'

'এ শালা আইনের কচুটি বুঝে!'

কৈলাস চৌকিদার অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা জমায়েত ওকে 'ধিৎকার' দিতে থাকে সমানে। প্রয়াগের প্রসঙ্গ এই মুহূর্তে ভুলে গেছে বুঝি সবাই। এখন জনতার চোখে আসামী প্রয়াগ বেজ নয়, কৈলাস। পরমেশ্বর জানা তার সাদা শনের মতো চুলের গোড়া নখ দিয়ে চুলকোতে থাকে। সাবেক দিনগুলো স্মৃতিতে ভেসে বেড়ায়। সহসা প্রায় আর্তনাদ করে বলে ওঠে, 'আর একতিলও বাঁচতে সাধ নাই মোর।'

এমনি সময় প্রয়াগ বেজ খুব মোলায়েম গলায় বিনোদ হাতিকে সম্বোধন করে, 'বাবু—'

বিনোদ হাতি ঘাড় ঘুরিয়ে প্রয়াগের দিকে তাকায়।

প্রয়াগ বলে, হ্যাচাকটা এক্কেরে নিভিয়া আস্‌তেছে বাবু। কারুকে বলুন টুকচার 'পাম' দিয়া দউ।'

৬.

এক সময় প্রয়াগ বেজ তৃতীয়বাব হাই তোলে।

চুপচাপ বসে ছিল জমায়েত। হাইয়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায়। চোরের বিচার তো এই প্রথম হচ্ছে না গাঁয়ে, কিন্তু কে কবে শুনেছে, চোর বিচারের থানে নিশ্চিন্তে হাই তুলছে!

'কী রে, প্রয়াগ, ঘুম পায়া গেল নাকি?' বিনোদ হাতি ঠাট্টা মেশানো গলায় বলে।

লজ্জায় যেন মরমে মরে যায় প্রয়াগ। মাথাটা মাটির সঙ্গে নামিয়ে দেয়। বিড়বিড় করে বলে, 'আইজ্ঞা, রাইত ত কম হইল নি। সারাদিন খাটা-খাটনির পর—'

সারা জমায়েত জুলজুল কবে তাকিয়ে প্রয়াগের কথা শুনতে থাকে। আগেকার দিনকাল হলে যে কিনা এতক্ষণে পিছমোড়া হয়ে কড়িকাঠে ঝুলত, বাপরে-মা-রে চিৎকার তুলে গগন ফাটাত, তার কিনা বসে থাকতে থাকতে আলস্যে হাই উঠছে ঘন ঘন। এই নিয়ে তিনবার হল। ব্যাপারটা সবচেয়ে দাগা দিয়েছে বিনোদ হাতি আর পরমেশ্বর জানাকে। সাবেক আমলের বিচারপতি ওরা, এমন একটি সন্ধ্যার কথা ওদের বুঝি স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

কৈলাস চৌকিদারের দিকে রোষ কষায়িত চোখে তাকিয়ে থাকে বিনোদ হাতি, 'তাইলে চোরকে অ্যারেষ্ট করতে অক্ষম তুমি?'

কৈলাস বুঝি অল্প একটু ভয় পায় বিনোদের কথায়। পরক্ষণে মিনমিনে গলায় বলে, 'আমার সমস্যাটা টুকচান ভাবিয়া দেখুন বাবু। মুই আঁধার-কানা মানুষ। এ শালা মোকে একলাটি পাইয়া—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বিনোদ হাতি মাঝপথে থামিয়ে দেয় কৈলাসকে, 'রাতটা পুহাতে দও, তারপর তুমিও দেখতে পাবে, কত ধানে কত চাল। চাকরিটা তুমার কী করিয়া থাকে—। দরকার হইলে এস-ডি-ও-র পাশ যাবে সারা গাঁর মানুষ।'

কৈলাস মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে বিনোদ হাতির কথাগুলো। মটমট আওয়াজ তুলে আঙুল ফোটায়। একসময় মিনমিনে গলায় বলে, 'বিনা দোষে যদি চাকরি যায়, যাবে। তেবে আমাদেরও এসোসেন আছে।'

'কী সেন?'

'আইজ্ঞা, এসোসেন। চৌকিদার-দফাদারদের সুমিতি।'

বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় বিনোদ হাতি। বেশ কয়েকবার ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। এক সময় বলে, 'তাইলে আর কী? ছাড়িয়া দিবা হউ প্রয়াগকে। গজেন্দ্রর মাল গজেন্দ্রকে ফেরৎ দিয়া দও।'

প্রয়াগ বেজ খুব মন দিয়ে শুনছিল বিনোদ হাতির কথাগুলো। পিটপিট করে জমায়েতের দিকে তাকায় সে। পরক্ষণে ঘাড় নুইয়ে কালো আকাশের গায়ে দৃষ্টি বিঁধিয়ে আন্দাজ করতে থাকে রাত কত হল! এখন মধ্যরাত। চাঁদটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। সাতভায়া তারাও হেলে পড়েছে মাথার ওপর থেকে। অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সে। ডান হাতখানা আকাশের দিকে তুলে ধরে বগলটা নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করে।

বিনোদ হাতি ততক্ষণে কার্তিকের চেলাদের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় রত। তুমরা কী বলো হে? কী করা উচিৎ এমন পরিস্থিতিতে?

কার্তিকের চেলারা তেমন করে বাজে না। বলে, 'আমরা গ্রাম্য বিচার-আচারের মধ্যে নাক গলাতে নারাজ। গ্রামের মানুষ নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই লিবে।' প্রয়াগ বেজ ততক্ষণে বগল আঁচড়াতে গিয়ে ক্লান্ত। ঐ অবস্থায় বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে সে, 'হাতির পো, এক কাজ করুন।'

বিনোদ হাতি ঝাঁ করে তাকান প্রয়াগের দিকে।

প্রয়াগ সারা মুখে অপরাধ ফুটিয়ে বলে, 'এর চাইতে সক্কলে মিলিয়া মারিয়া ফেলুন মোকে। প্রেত্যেকে এক ঘা করিয়া লাঠি মারলেই মরিয়া চিঁড়া-চ্যাপ্টা হয্যাবো আমি।'

কেন? কেন? আতঙ্কে আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠে জমায়েতের বুক। এ কী সর্বনাশা কথা! মারিয়া ফেলবার কথা উঠল ক্যানে? কে তোকে মারিয়া ফেলতে চায়? কেন তুই বল্লু অমন কথাটা! কী সর্বনাশ!

সহসা ভ্যাঁক করে কেঁদে ওঠে প্রয়াগ বেজ, 'আমাকে লিয়া আপনারা মহা ফেসাদে পড়ছন। আমার মরিয়া যাওয়াই ভালো।'

প্রয়াগের কান্না আর থামাতে চায় না কিছুতেই। 'এ জীবন আর আমি রাখব নি। সারাটা জীবন শুধু চোর বদলাম!'

'এহ্হে। কে তোকে চোর বদনাম দিল? এখনও বিচারই শুরু হয় নি। ইস্, আবার কাঁদে।'

'চুপ মার্, প্রযাগ, চুপ মার্। কাঁদিস নি।'

'এ জীবন আমি শেষ করিয়া দুবো। ভোরের আলো আর দেখব নি। তুমরা আমার গলায় পা তুলিয়া দও।'

এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল! ব্যাটা আজ রাতেই সুইসাইড করে বসবে নাকি? বুড়া মারিয়া খুনের দায়! সবাই তখন হরেকপ্রকারে ভোলাতে শুরু করে প্রয়াগকে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে প্রয়াগ বলে, 'জীবনে কুনোদিনও দেশ-মাহারাজের বিরুদ্ধে যাই নি আমি। আজও যাবো নি। মারিয়া ফেলুন, কাটিয়া ফেলুন, তব্বো দেশ-মাহারাজের পায়ের তলায় পড়িয়া রইবো। মরতে হয় দেশের হাতে মরবো, বাঁচালে তাঁরাই বাঁচাবেন।'

কৈলাস চৌকিদারের অনমনীয় ভাবখানা যেমন সারা জমায়েতের রোষ বাড়িয়ে তুলেছিল, প্রয়াগ বেজের কথাগুলো যেন মলমের কাজ করল।

বিনোদ হাতি মোলায়েম চোখে তাকায়। বলে, 'দেশ-মহারাজকে মানিস তুই?'

'নির্ঘাৎ। দেশ-মাহারাজকে মানবো নি? অত আস্পর্দা মোর?'

'বেশ।' বিনোদ হাতি সামান্য ক্ষণ ভেবে নেয়। তারপর বলে, তাইলে, দেশ-মহারাজের হুকুমে তুই আইজ রাতে ঘরে ফিরিয়া যা। রাতটা শুইয়া থাক্ গা ঘরে। ভোর হইলেই চলিয়াবি কৈলাসের দুয়ারে। কৈলাস তোকে অ্যারেস্ট করিয়া থানায় লিয়া যাবে। বুঝেছু?'

'বুঝেছি।' প্রয়াগ বেজ উজ্জ্বল চোখে কৈলাসের দিকে তাকায়, 'কাল ভোরবেলায় মুই ঠিক পৌঁছিয়াবো কৈলাসদার ঘরে। কৈলাসদা, তুমি ভোর ভোর উঠিয়া তৈরি হয়্যা লিব। থাণ্ডায় থাণ্ডায় রওনা দিলেই ভালো।'

'পাক্কা কথা হয়্যাল-অ তেবে। লড়চড় যেন না হয়।' বিনোদ হাতি এবার কৈলাসের দিকে তাকায়। তেতো গলায় বলে, 'আর কী? শুনলি ত সব। এবার মালগুলা লিয়া যা, নিজের ঘরে রাখ্ রাইতটুকুর মতো। নাকি সেটাও পারবি নি?'

গজগজ করতে করতে কৈলাস চৌকিদার মালের পুঁটলিখানা ঘাড়ে তুলে নেয়। বলে, মোর ফের সক্কাল ব্যালায় নছিপুর যাইতে হবে। জি-আর বিলি হবে সেখানে।'

সমস্ত ব্যবস্থাটা অবাক চোখে দেখছিল সবাই। রা কাড়তেও ভুলে গেছে ওরা। এমন ব্যবস্থা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

আড়ালে তখন অনেকেই হেসে কুটিপাটি।

বিনোদ হাতি পরমেশ্বর জানার কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে বলে, 'শালা যেদি আজ রাইতেই ফেরার হয়, সারা গাঁয়ের মানটা বাঁচে।'

অশোক হাতি ভরাট গোঁফের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বলে, 'তার চাইতে অকে বলো না কেন, কাল সক্কালে মালপত্তর কাঁধে লিয়া সোজা থানায় চলিয়া যাউ। চৌকিদারকে ফের কষ্ট দিবা ক্যানে? অর নাকি ফের জি-আর বিলি আছে কাল।'

এমন কথায় হাসি চাপা দায় হয়। আবার, ঝাঁ করে চড়ে যায় রাগ। বিনোদ হাতি আর পরমেশ্বর জানা অন্যমনস্কতার ভান করে তাকিয়ে থাকেন অন্য দিকে। কলেজে পড়া ছেলেকে ধমকাতে সাহস হয় না।

সারা জমায়েত উশখুশ করছিল। বিনোদ আর পরমেশ্বরের মুখ চেয়ে বাড়ির পথ ধরতে পারছিল না কেউই। দু-জনে উঠে দাঁড়ানো মাত্তরই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে সবাই। ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে আড় ভাঙে। মটমটিয়ে আঙুলের গাঁট ফোটায়। সে এক অনির্বচনীয় মুক্তির আনন্দ!

এমনি সময়ে প্রয়াগ ফের হাই তোলে। চতুর্থ হাই। সে এক মোক্ষম হাই। মিহি বাঁশির মতো শব্দ তুলে সে হাই অনেকক্ষণ অবধি সুরেলা রেশ তৈরি করে। প্রয়াগকে হাই তুলতে দেখে সবাইয়ের হুঁশ হয় বুঝি। যেন খেয়াল হয়, রাত অনেক হয়েছে। কাজেই, সঙ্গো সঙ্গো, সবাইয়ের ঘন ঘন হাই উঠতে থাকে। ছোঁয়াচে রোগের মতো সমবেত হাই তোলার ধুম পড়ে যায়। মোটা, মিহি, লম্বা, খাটো, নানা ধরনের, হরেক চরিত্রের হাই। হাই তুলতে তুলতে রওনা দিল ওরা যে-যার ঘরের দিকে। এ-গলি ও-গলি ধরে তাদের পায়ের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল সারা গাঁয়ে।

প্রয়াগ নিজেও এক ফাঁকে মিশে যায় একটি দলে।· যেন আসামী নয়, সেও বিচার করতে এসেছিল অন্যদের মতো।

কারুর মুখে কথা ছিল না। সারা সন্ধে জুড়ে এক অপমানজনক তামাশার শরিক ছিল ওরা। নিজেরাই প্রাণের আশ মিটিয়ে তামাশা করেছে নিজেদের সঙ্গো। সেই অপমানে পুড়তে পুড়তে নিঃশব্দে পথ ভাঙছে ওরা। মনে হচ্ছে, বুঝি বা কোনো চুরির কেসে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল সবাই, কোনো গতিকে ছাড়া পেয়ে রাতের আঁধারে মুখ লুকিয়ে ঘরে ফিরছে।

কুটুম-কাটাম

ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়ে ওতোল আর সুচাঁদ থামল।

কৃষ্মা সবিস্ময়ে লক্ষ করছিল কেঁদ গাছের মরা ডালটাকে। সূর্য তখন লাল কাকুঁরে ডাঙায় বিছিয়ে দিয়েছে রোদ্দুর। যতই দেখছিল, বসসিক্ত বিস্ময়টা বেড়ে যাচ্ছিল ততই। সত্যিই, সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে সে! দুটো হাত, দুটো পা, মুণ্ডু..., মুণ্ডুর মধ্যে চোখ, মুখ, মায় দু-চোখেব চাপা হাসিটাও একটু নজর করলে চেনা যায়। পা এবং মুণ্ডুর মধ্যে যে মোটাসোটা ডালটি, ওটাই তো ধড়। ধড় মানেই উদর, তার ওপরে বুক, বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডও নির্ঘাৎ। হৃদপিণ্ড যদি থাকে, মুখটাতে হাসিটিও যা টলটলে, তবে কী ঐ শুকনো ডালের অভ্যন্তরে সেটা ধুক্‌পুক্‌ করছে না? নিশ্চয়ই করছে, বলতে বলতে কৃষ্মা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। যদিও কিঞ্চিৎ কৌতুক ছিল ঐ হাসিতে, তাও সমগ্র ব্যাপাবটা একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়ে রইল ওর মনে। গাছের একটা শুকনো ডাল বৈ তো নয়, তার শরীরে একটি নিটোল মানুষের অবয়ব, মায়, কৃষ্মার কল্পনা অনুযায়ী, হৃদপিণ্ডও রয়েছে ভেতরে! গাছটার তলা দিয়ে নিরাসক্ত পায়েই হেঁটে যাচ্ছিল ওরা চারজনে, হঠাৎ ওতোল আর সুচাঁদ যদি না দেখাত ওটাকে! ওতোল বলে, এভাবেই তো আমরা চিনি, এভাবেই চিনতে হয়।

দেখতে দেখতে বারংবার শিহরিত হচ্ছিল কৃষ্মা। উৎপল সুচাঁদকে বলল, ডালখানা কাট্‌।

সুচাঁদ তরতরিয়ে উঠে যায় গাছের ডালে, একঘেয়ে শব্দ তোলে হাত-করাত।

সুশীতল বটব্যাল ছিলেন অল্প তফাতে। ভিড়-ভাট্টা বড় একটা তাঁর ধাতে সয না। তাঁর মধ্যে নিরন্তর এক শিল্পী-সুলভ বিচ্ছিন্নতাবোধ, জাতীয় পুরস্কারটা পাওয়ার পর আরও বেড়েছে। জঙ্গালের এদিকটা বড় মায়াময়। পাশ দিয়ে লাল টকটকে গ্রাম্য রাস্তা, দূরে বিশাল দীঘির উঁচু কাঁকুরে পাড়, একটি নিঃসঙ্গ তালগাছ...। সকাল থেকে ক্যানভাসের গায়ে ধরে ফেলেছেন এমনিতরো বেশ কয়েকটি দৃশ্যপট। আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে এখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাতলা জঙ্গালের গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায়।

সুরজিৎ, কৃষ্মার স্বামী, বসেছিল পাতলা জঙ্গালের কিনারে একটা মহুল গাছের তলায়। হাতে জ্বলছে দামী সিগারেট। এই সাতসকালেও সে বেশ খানিকটা মহুয়া চড়িয়েছে। চোখদুটো এখনই তার ভাসাভাসা লাগছে। থেকে থেকে শিস দিচ্ছিল

সুরজিৎ। কাঠ-কুটো, শেকড়-বাকড় নিয়ে এসব পাগলামি তার আসে না। শান্তিনিকেতন আর আর্ট কলেজে পাশ করা কৃষ্ণার চোখে কাঠ-কুটোর যে রূপ ধরা পড়ে, সুরজিতের তা পড়ে না। ইণ্ডিয়ান অয়েলের ম্যানেজমেন্টে অ্যাকাউন্ট্স-লেজার আর ব্যালান্সশীটে কোম্পানীর লাভ-লোকসানের যে রূপখানি ফুটে ওঠে, সুরজিৎ তাই দেখেই মুগ্ধ। কৃষ্ণা যখন বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে উৎপলের সাহায্যে শুকনো ডালপালা আর শেকড়ের মধ্যে হরেক ভঙ্গিমার মানুষ আর জীবজন্তুর শরীরের অভিব্যক্তি চিনছিল, সুরজিৎ তখন মহুলতলায় বসে বসে সাবাড় করেছে এক বোতল তাজা মহুয়া। তাই, কৃষ্ণা যখন কাটা ডালটিকে হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল সুরজিতের কাছে, আবেগে উচ্ছল হয়ে বোঝাতে চাইল, শুকনো একটা সাধারণ ডালে কী আশ্চর্য এক শিল্প-সামগ্রী লুকিয়ে ছিল 'দুষ্টু ছেলের মতো', তখন মেহেদীর রঙে রাঙানো ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সুরজিৎ কেবল নিঃশব্দে হেসেছে।

ক্ষেপে গিয়ে কৃষ্ণা ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, 'তুমি একটা বেরসিক যা-তা।'

'আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন ম্যাডাম?' সুরজিৎ ফিক ফিক হাসতে থাকে, 'আমি তেলের বেওসায়ী সেটাই আমার একমাত্র শিল্পের জগৎ। আমার শুধু এটাই সান্ত্বনা, আমার ঘরনী একজন স্বনামধন্য শিল্পী, গুণী মহলে তাকে প্রেজেন্ট করেই আমার সুখ। আমার শুধু একটাই অহংকার, এই দেশের মহিলারণ্যে আমি তাঁর মতো একজন শিল্পীকে আবিষ্কার করেছি।'

এমন ব্লান্ট খোসামুদিতেও বেশ মজা পায় বুঝি কৃষ্ণা। চোখের তারা নাচিয়ে বলে, 'তা হলে এই শিল্পমেলায় আসা কেন? না এলেই পারতে।'

সুরজিৎ বালকের মতো হাসে। বলে, 'আমি এসেছি স্রেফ মহুয়া খেতে। খাঁটি তাজা মহুয়া।'

কৃষ্ণা নাচার হয়ে ঘাড় বাঁকায়। সহসা তার নজর পড়ে সুশীতল বটব্যালের দিকে।

কৃষ্ণা উচ্ছ্বসিত ডাকে, 'সুশীতলদা, দেখবেন আসুন, কী এক দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা।'

দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান সুশীতল, পুরু লেন্সের চশমার আড়ালে একজোড়া উজ্জ্বল চোখ। কাঠের মূর্তির চেয়ে দিনের দ্বিতীয় প্রহরের কৃষ্ণাই বুঝি বেশি টানে ওঁকে।

বিকেলের মিষ্টি রোদ্দুরে পিঠ পেতে বসেছে ওরা। উৎপল শোনাচ্ছে তার 'অভিব্যক্তি'র ইতিহাস। বেলেতোড় থেকে মাইল দুয়েক দূরে, পীচরাস্তার ধারে ছায়া-ছায়া জায়গাটা এমনি এমনি পড়ে থাকত। লাল কাঁকুরে মাটির বুক চিরে গরম হাওয়ার ভাঁপ উঠত রোজ দুপুরে। পাশেই একটা পুকুর, তার পাড়ে অজস্র পলাশের ঝোড়... জায়গাটা দেখা মাত্তর পছন্দ হয়ে গেল উৎপলের। জমিটাকে সাফ-সুতরো করে নিয়ে বেড়া দিল, ঘর বানাল, মাটির দেওয়াল খড়ের ছাউনি। গোলাকার চালাঘর, দেওয়ালহীন, বসে কাজ করবার জন্য। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করল গাছের মরা ডাল,

শেকড়। ধীরে ধীরে 'কুটুম-কাটাম'-এ ভরে গেল ঘরদোর, আঙ্‌না, আরো দু'খানা চালাঘর বানাল উৎপল, তারপর আরও একখানা, মুক্তমঞ্চ বানাল কদম গাছের তলায়। গুণীজনেরা আসতে লাগলেন একে একে, এলেন, দেখলেন, মুগ্ধ বিস্ময়ে শিহরিত হয়ে ফিরে গেলেন তাঁরা। আবার এলেন, বারবার। ততদিনে ওতোল আর সুচাঁদ এসে ঠাঁই নিয়েছে উৎপলের একান্ত সংসার 'অভিব্যক্তি'তে। কথায় কথায় সুচাঁদ আর ওতোলের প্রসঙ্গ ওঠে। সুচাঁদটা ছিল রোগা, শীর্ণ প্যাকাটিব মতো গড়ন, হাত-পায়ের গাঁটগুলো প্রকট। মাথায় ছোট ছোট কদম-ছাঁট চুল, মুখখানা ঘোড়ার মতো লম্বাটে। বাপ ছিল জাতে ধোপা, জীবনে কাপড় কেচেছে ঢের, উপোস করেছে তাবও বেশি। তার বাহান্ন বছরের জীবনে উল্লেখ করবার মতো কিছুই ঘটেনি তেমন। কেবল বছর বিশেক আগে কুলপি এলাকার একজন লোক বাবা তারকেশ্বরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে এসেছিল ওর পা-ধোয়া-জল খাওয়ার জন্য। ঐ খেয়ে তার দীর্ঘ দিনের অম্লশূল নাকি সেরে গিয়েছিল এবং তার জন্য লোকটি ফি-বছর নতুন কাপড় পাঠায় এখনও, এমনটা দাবি করে সুচাঁদের বাপ। গল্পটা সুচাঁদের সামনে কারণে অকারণেই ফাঁদত বাপ, ভয়টা বুঝি, সুচাঁদ যেন বাপকে হেনস্তা করবার মতো মারাত্মক ভুল তার জীবনকালে না করে। সুচাঁদ সুযোগ পেলেই গল্পটা ফাঁদত বন্ধুদের কাছে।

একখানা তে-কাঠি লাঠি নিয়ে রাস্তার ধারে বসে হাঁড়িকাঠ বানাচ্ছিল সুচাঁদ। পাশেই দড়িতে বাঁধা ছিল একটা প্রমাণ সাইজের ক্যাঁকলাস। একটু বাদে হাঁড়িকাঠে ঢুকিয়ে বলি দেওয়া হবে ওকে। উৎপল তখন ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে-গাঁয়ে, বনে-জঙ্গালে। কাঠ-বাঁশ, টাকা-পয়সা লোকজন এবং কুটুম-কাটাম বানাবার উপকরণ খুঁজে বেড়ায়। এবং এই সবকিছুর পেছনে তার দিন-রাত একাকার। হাঁড়িকাঠখানা তুলে নিয়ে উল্টে দেয় উৎপল এবং সুচাঁদকে বুঝিয়ে দেয়, কেমন করে হাঁড়িকাঠের দুধারের দুটি বাহু মুহূর্তের মধ্যে একজন রোগাপানা ঢ্যাঙা মানুষের দু-খানা ঠ্যাং হয়ে যেতে পারে। সুচাঁদও বুঝতে পেরে মজা পায়, বার বার হাড়িকাঠখানাকে উল্টে দিয়ে দেখতে থাকে ঢ্যাঙা মানুষটাকে। এমন ভাবে দেখে, যেন নিজেকেই দেখছে।

ওতোল, ওর মা নেই, বাপ আছে কিনা বলা মুস্কিল, কারণ বাপ যে কে, সেটাই জানা নেই। বলতে পারত ওর মা, কিন্তু সে তো এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, ওতোল তখন খুবই ছোট। উৎপলের ধারণা ওর নাম অতুল, মানুষের মুখে মুখে সে আজ ওতোল। পেট মোটা ওতোল / ঠিক যেন এক বোতল। ছড়া কাটবার সুবিধের জন্যই নামটা বদলে নিয়েছে হয়তো বা সমবয়সী ছেলেরা। বাস্তবিক, ওতোল বয়সের তুলনায় বাঁটকুল, পেটমোটা থলথলে শরীর, ওপরটা মাথা অবধি সরু, ঠিক যেন বোতল একটা। চোখদুটো মার্বেলের মতো গোল, নাক চ্যাপটা, ফোলা গাল, ঠোঁটদুটো রবারের মতো ফোলানো, মাথায় বুরুশের মতো খোঁচাখোঁচা লালচে চুল। কৃষ্ণা ওদের দিকে তাকিয়ে বহুকষ্টে হাসি চাপে। বলে, 'লরেল-হার্ডির পকেট এডিশন!' সেই ছেলেবেলায়, ওতোল বারবার একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হত, 'এই ওতোল, তোর বাপ কে রে?' ভুলভুল করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্যাখন-হাসি ছেলেটা ধীরে ধীরে সেদ্ধ আমের

মতো বিবর্ণ হয়ে যেত। চারপাশে এবং মাথার ওপর আকাশের দিকে বারংবার চোখ চারিয়ে, সম্ভবত নিজের জন্মদাতাকেই খুঁজে বেড়াত ও। কালে কালে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল ছেলেটা। 'ওতোল, তোর বাপ কে রে?' কী আশ্চর্য, এমন প্রশ্নে ওর চোখ মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'তুই।' তৎক্ষণাৎ কাঠ-কাঠ জবাব ওতোলের। পঞ্চজনের সুমুখে এমন জবাবে মাথা কাটা যায় প্রশ্নকর্তার। ঐটুকু বাচ্চার মুখে এমন স্বতঃস্ফূর্ত জবাব, স্রেফ আশা করা যায় না। কানের লতি জ্বলতে থাকে, নাকের ডগায় ঘাম জমে। বার কয়েক এমনিভাবে বেইজ্জৎ হয়ে, এমন প্রশ্ন করবার সাহস আর পেত না কেউ। কিন্তু আমি 'কম্‌লি ছাড়লেও', 'কম্‌লি' তো আমাকে ছাড়নেওয়ালা নয়। তাই পথে-ঘাটে, মেলায়-পার্বণে আচমকা সামনে এসেই দ্যাখন-হাসি ছোঁড়াটা অকপটে বলে বসে, তুই আমার বাপ বটে। বলে, বেছে বেছে তাদেরই, যারা কোনো না কোনো সময়ে ওকে বাপের খবর শুধিয়ে বিব্রত ও বিধ্বস্ত করে মজা লুটেছিল। আচমকা, বিনা প্ররোচনায়, একহাট মানুষের সামনে এমন কথা শুনে ওরা বিস্ময়ে 'থ' হয়ে যায়, অপ্রস্তুতের একশেষ। চারপাশের মানুষজন ঠোঁট টিপে হাসে। মানী লোকটি কথা না বাড়িয়ে গা ঢাকা দেন। এমন এক কথা এটা, বলছে এমন একটা হা-ঘরে বাচ্ছা, এই নিয়ে বিচার-পঞ্চাৎও করা যায় না, চিৎকার-চেঁচামেচি করলে আরও জানাজানি আরও লোক-হাসানি হবে। অতএব, এমন পরিস্থিতিতে, কিলটি হজম করে কেটে পড়াই শ্রেয়। কিন্তু ততদিনে ব্যাপারটা এক ধরনের নেশায় পরিণত হয়েছে। ওতোল সুযোগ পেলেই একে ওকে 'বাপ' বলে দাবি করে। মেলায়-পার্বণে সামনে গিয়ে হাত পেতে দেয়, 'তুই আমার বাপ, মেলা দেইখ্‌বার পইসা দে'। বখাটে ছোকরার দল, এর থেকে রসের সন্ধান পেয়ে যায়। এলাকার মান্যি-গন্যি লোক, যাদের ওপর বিভিন্ন কারণে রাগ-আক্রোশ রয়েছে ওদের, মেলার মধ্যে ওদের দিকেই লেলিয়ে দেয় ওতোলকে। প্রথমে একটা জিলিপি ধরিয়ে দেয় হাতে। বলে, 'উই প্রয়াগ বাবুর থিকে 'বাপ' বলে যা আদায় করতে পারবি, তার ডবল দিব তুয়াকে।' ওতোল পঞ্চাতের মেম্বর প্রয়াগবাবুর সামনে গিয়ে ঘ্যানর-ঘ্যান্‌র করতে থাকে সমানে, 'তুই আমার বাপ, মেলা দেইখ্‌বার পইসা দে।' প্রয়াগবাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বিষয়টিকে বেশি রসাল, বেশি গাঢ় হতে না দিয়ে তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একটি সিকি বের করে ধরিয়ে দেন ওতোলের হাতে। ওতোলকে, কাজেই, ছোকরারাও দেয় আটআনা। অকস্মাৎ সহজতম পথে আয়ের এমন অভিনব সুযোগটি আবিষ্কার করে, ওতোলের গোলাকার চোখের মণিতে বিচ্ছুরণ ঘটে। মেলার সব কটি দিনই পদ্ধতিটিকে আঁকড়ে ধরে সে। শেষের দিকে ওতোল, এলাকার মান্যিগণ্যি ব্যক্তিবর্গের কাছে এক নিদারুণ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে সবাই। কেউ দয়াপরশ হয়ে একটা ছেঁড়া চাদর কিংবা পুরনো জামা দিলে, ওতোল সারা গাঁয়ে চাউর করে বেড়ায়, আমার বাপ দিয়েছে। মান খোয়াবার ভয়ে ওতোলকে সাহায্য করাও বন্ধ করে দিল পড়শীরা।

বেশ ভদ্দর লোক দেখে, বেলেতোড়ের গাজনের মেলায় উৎপলকে তার শিকার ঠাউরেছিল ওতোল, 'তুই আমার বাপ, পইসা দে মেলা দেখব।' উৎপল আগেই

শুনেছিল ছেলেটির কথা। এবার মুখের ওপর সরাসরি চোখ ফেলে ছেলেটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ও। আপাত-রুক্ষ মুখখানির আড়ালে কোথায় যেন এক অসহায়, অনাথ শিশু সারাক্ষণ মা আর বাবার জন্য কাঁদছে। গোলাকার চোখের মণিতে সর্বক্ষণের গুপ্ত বিষাদ। উৎপল বলে, 'ঠিকই তো, তুই তো আমার ছেলেই, এই নে পয়সা, এবার থেকে বাবার কাছে থাকবি তো?'

পয়সা হাতে নিয়েও কাঠ-কাঠ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওতোল, 'কোথায় তুমার ঘর?'

'সে কী!' উৎপল যেন যার-পর-নাই বিস্মিত, 'নিজের বাবার বাড়িটিও চেন না? ঐ তো ছান্দার গাঁয়ে ঢুকতে, পুকুরের পাড়ে—।'

'উই যিখ্যেনে শুখা ডাল-শিকড় দিয়ে মূর্ত্তি বানায়?'

উৎপল নিঃশব্দে মাথা দোলায়, 'যাবিনে?'

এক ধরনের তীব্র সংশয়ে দুলতে থাকে ঐটুকু বাচ্চা। চোখের মণিতে ঠিকরে পড়ে তার ছায়া।

এখন অনেক বড় হয়েছে ওতোল, পুরনো প্রসঙ্গ উঠলে লজ্জা পায়।

গুণীজনেরা আসতে শুরু করেছিলেন সকাল থেকে। দুপুরের মধ্যে 'অভিব্যক্তি'র প্রাঙ্গণটি ভরে গেল। কদম গাছের তলায় মুক্তমঞ্চ, সাজানো হল চেয়ার-টেবিল, ফুলের ঝাড় আর আল্পনা দেওয়া কলসী দিয়ে। সামনের মাঠে পাতা হল জাজিম, নিমন্ত্রিতদের জন্য। মাঠের অন্য অংশে সাজানো হয়েছে 'কুটুম-কাটাম'-এর প্রদর্শনী। কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে আসা ছেলে-মেয়ের দল হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেখানে। দু-চোখ ভরে অতুল বিস্ময়ে দেখছে গাছের শুকনো ডাল এবং শেকড় দিয়ে তৈরি অনুপম শিল্পকীর্তিগুলিকে। শিল্পের এ এক আশ্চর্য জগৎ!

কলকাতা থেকে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী সুশীতল বটব্যাল গতকাল থেকেই রয়েছেন। আজ সকালে এসেছেন ময়ূখ রায়, অর্ণব বসু, অর্কপ্রভ সেন এবং আরো অনেক নামকরা শিল্পী। প্রতি বছরই আসেন এঁরা 'অভিব্যক্তি'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে। লাল মাটি আর শাল-মহুলের রাজ্যে, এক আশ্চর্য উদ্যানে, আকাশের তলায় এক অলৌকিক শিল্পময় জগৎ অপেক্ষা করে থাকে ওঁদের জন্য, হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সকাল থেকে ওতোল আর সুচাঁদের একদণ্ড বিরাম নেই। বিভিন্ন গ্যালারি থেকে 'কুটুম-কাটাম' গুলোকে নামিয়েছে, ঝাড়পুছ করেছে, সাজিয়ে দিয়েছে আকাশের তলায় মুক্ত গ্যালারিতে। মুক্ত প্রদর্শনীর একপাশে কর্মশালা, শুকনো ডাল আর শিকড় ডাঁই করে রেখেছে ওখানে। এতগুলি মানুষের রান্না-বান্না, খিচুড়ি-তরকারির পংক্তিভোজন আকাশের তলায়, এলাহি ব্যাপার। সুচাঁদ-ওতোলকে সে দিকেও লক্ষ-নজর রাখতে হয়েছে, হাত লাগাতে হয়েছে প্রয়োজনে। দুপুরে পরিবেশন, পাতা ফেলা, নিকোনো, সব কিছুতেই থাকতে হয়েছে তাদের। এখন, এই বিকেলে, কর্মশালায় বসতে হয়েছে যন্ত্রপাতি নিয়ে। একটা সাধারণ শুকনো ডাল কিংবা শিকড় কেমন করে ন্যূনতম কাটা-

ছাঁটার ফলে একেবারে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে, ওরা নিমন্ত্রিতদের হাতে-কলমে দেখাচ্ছে তা। দেখতে দেখতে বিস্ময়ে 'থ' হয়ে যায় আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, এমন কী খ্যাতিমান শিল্পী অর্ণব বসুরাও, ছেলেদুটো যেন যাদুকর, শুধু হাতের ছোঁয়ায় কাঠের টুকরোগুলো হয়ে যাচ্ছে ঢ্যাঙা সেপাই, ভুঁড়িওয়ালা ব্যবসায়ী, একতারা হাতে বাউল, জাল ফেলতে উদ্যত জেলে, হরিণ, ঘোড়া, উড়ন্ত পাখি, বাঘ, সিংহ, কুমীর...। হরেক মুদ্রা তাদের শরীরে, চোখে-মুখে হাজাবো অভিব্যক্তি। ওঁরা ভুলভুল করে দেখছিলেন, শুকনো কাঠ-কুটোর ভেতর থেকে চুষে নিচ্ছিলেন রস। তাই দেখে সুচাঁদের মুখে ছলকে ওঠে কৌতুক, ওতোলের রবারের মতো ঠোঁটদুটো ভিজে যায় হাসির রসে।

সুশীতল বটব্যাল আর ময়ূখ রায়দের সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনীটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল উৎপল। সঙ্গে কৃষ্ণা আর সুরজিৎও ছিল। চোখের সামনে সারিসারি পাটাতন দিয়ে তৈরি অস্থায়ী গ্যালারী। শয়ে শয়ে মূর্তি সাজানো। উৎপল একে একে ব্যাখ্যা করছিল এদের জাত, সংগ্রহের উৎস এবং অভিব্যক্তিগুলো।

সুশীতল বটব্যাল বলেন, 'দারুণ! চোখ সরাতে পারছি নে।'

ময়ূখ রায় : কলকাতায় একটা প্রদর্শনী করেন না কেন? হৈ হৈ পড়ে যাবে।

'উঁহু', চোখ নাচিয়ে জবাব দেয় উৎপল, 'তাহলে তো আপনারা আর আসবেন না অতখানি পথ ভেঙে, এদের কাছে।'

'রাইট।' পাদপূরণ করেন অর্ণব বসু, 'শিল্প কেন যাবে? শিল্পের রসিককেই আসতে হবে শিল্পের কাছে।'

'কুটুম-কাটাম মানে কী?' পাশ থেকে শুধিয়ে বসে সুরজিৎ। সুরজিতের এমন ব্লান্ট প্রশ্নে কৃষ্ণা কেমন অস্বস্তি বোধ করে।

'অবন ঠাকুরের দেওয়া নাম।' উৎপল ব্যাখ্যা করে বোঝায়, 'সম্ভবত, কেটে কুটে বানানো এই 'কুটুম'গুলি, এমনটাই ভাবতেন তিনি। তাঁর শিল্পের সংসারে এগুলো ছিল কুটুম অর্থাৎ অতিথি।'

'এগুলোর মধ্যে তোমার তৈরি কোনগুলো? না কি সবগুলোই ঐ সুচাঁদ আর ওতোল বানিয়েছে।' কৃষ্ণা শুধোয়।

উৎপল আড়চোখে দেখে নেয় কৃষ্ণাকে, 'না, আমার কাজও রয়েছে বৈ কি?'

'কোনগুলো? চিনিয়ে দাও।'

উৎপল এবার সরাসরি চোখ রাখে কৃষ্ণার চোখে, 'চিনে নিতে হবে।'

কথাটা উপস্থিত সবাইয়ের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহের সঞ্চার করে। শয়ে শয়ে 'কুটুম-কাটামে'র মধ্যে কোনগুলো গুরুর তৈরি, কোনগুলো শিষ্যদের, তা খুঁজে বের করবার জন্য যেহেতু শিল্পমনস্ক চোখ লাগে, সবাইয়ের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এক-একজন এক-একটি মূর্তিকে চিহ্নিত করে। এটাই নিশ্চয়ই তোমার, দেখেই বোঝা যায় এ পাকা হাতের কাজ। না, না, ওটার চেয়ে এটা আরো জীবন্ত, ওস্তাদী হাতের ছোঁয়া আছে এর সারা অঙ্গে। তুমুল আলোচনা চলে, তর্কাতর্কি, বচসা, উৎপল সারাক্ষণ মুখে কুলুপ এঁটে মিটিমিটি হেসে যায়।

কৃষ্ণা আদুরে গলায় বলে ওঠে, 'এবার বলে দাও উৎপলদা। প্লীজ। আমি যে 'রানার'-টাকে দেখালাম ওটা নিশ্চয়ই তোমার কাজ?'

উৎপল নিঃশব্দে হাসতে থাকে, 'খোঁজো, খোঁজো, খুঁজলেই পাবে।'

'তুমি বলবে না?' কৃষ্ণার গলায় চাপা অভিমান।

'আমি তো বলতেই পারি। কিন্তু তাতে আমার শিল্পীর অহংকারটুকু ভেঙে যাবে না? উৎপল চক্রবর্তী হেন শিল্পী, কলকাতার আর্ট কলেজের এক কালের সেরা ছাত্র, তার হাতের কাজ অন্ধকারেও চেনা উচিত। আমাকে যদি নিজেকেই চিনিয়ে দিতে হয়—।'

'রাইট, উৎপল ঠিকই বলেছে।' বললেন সুশীতল বটব্যাল, 'আমরাই চিনে বের করব, প্রত্যেকে একটা করে। উৎপল, তোমাকে কিন্তু কথা দিতে হবে, বিদায় নেবার আগে তুমি জানিয়ে দেবে কার কার আন্দাজ মিলল।'

'একটা নয়, আপনারা প্রত্যেকে দুটো করে খুঁজুন।' উৎপল অজান্তে যোগ দিয়ে ফেলেছে খেলায়, 'একটা করে খুঁজলে প্রবেবিলিটি অনেকখানি কমে যায়।'

কলকাতার শিল্প-চত্বরে গম্ভীর, আত্মগরিমায় ভারি-সারি মানুষগুলি, এই অনাবিল প্রকৃতির কোলে এসে নিমেষে বদলে গেছেন বুঝি। খোলস ছেড়ে তাদের পেয়ে বসেছে ছেলেমানুষী খেলায়।

সুচাঁদ আর ওতোল তাদের কর্মশালায় বসে বসে উপভোগ করছিল বড়দের ছেলেমানুষী কাণ্ড। ঠিক যেন কানামাছির খেলায় মেতেছেন দাদাবাবু আর দিদিমণিরা। সুচাঁদরা যেন পাশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে সেই খেলা। চোখবাঁধা ছেলেটি শেষ অবধি কাকে ছুঁতে পারে, তাই দেখবার বাসনা প্রকট হয়ে ওঠে ওদের চোখে-মুখে। সুচাঁদের ক্ষুদে‍ক্ষুদে চোখদুটি মিটিমিটি জ্বলতে থাকে, ওতোলের রবারের মতো ঠোঁটদুটি আকর্ণ বিস্তৃত হয়।

একসময় চকচকে থালার মতো গোল চাঁদ উঠল জঙ্গালের মাথায়। সারা সন্ধে হৈ-হৈ করে কেটেছে। অনুষ্ঠানও শেষ হল ন-টার মধ্যে। পংক্তিভোজন শেষ হল দশটায়। এবার শুরু হবে সারারাত্রিব্যাপী লোকগীতি আর লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান। সারা জেলার সব প্রান্ত থেকে অনেক দল আসে প্রত্যেক বছর, এবারও এসেছে।

সারা সন্ধে প্রত্যেকে দুটো করে মূর্তি নির্বাচন করেছে। রেখেছে যে-যার মনে। কাল সকালে পেশ করবে একে একে। কৃষ্ণা এক ফাঁকে সুচাঁদ আর ওতোলকে ডেকে নেয় কাছে। 'এই, বল্ তো রে, এগুলোর মধ্যে কোনগুলো উৎপলদার কাজ? দশটা করে টাকা দেব তোদের। চুপি চুপি বলে দে, কেউ জানবে না।' ছেলেদুটো এ-ওর মুখের দিকে তাকায়, মিটিমিটি হাসতে থাকে, বলতে চায় না কিছুতেই। ওরাও যে খেলাটার মধ্যে মজা খুঁজে পেয়েছে বেজায়। উৎপল আবার নৈশভোজের আসরে দারুণ এক টোপ দিয়েছে, যার আন্দাজ ঠিক হবে, সে পেয়ে যাবে 'কুটুম-কাটাম' দুটো। আগুনে ঘি পড়বার মতো ব্যাপারখানা, ছেলে-ছোকরার দল তো বটেই, সুশীতল বটব্যালের মতো প্রবীণ গুরুগম্ভীর মানুষও ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। বলেন, 'দিতে হবে কিন্তু। পরে পিছু হটলে চলবে না।'

উৎপল কপাল টান টান করে বলে, 'পিছু হঠবার প্রশ্নই ওঠে না সুশীতলদা।'

একমাত্র সুরজিৎই নির্বিকার। তার কোনো আঠা নেই ঐ খেলায়। সারাটা সন্ধে সে ছাতিমতলায় নিঃসঙ্গ বসে মহুয়া পান করেছে। ঢুলু ঢুলু চোখে বলেছে, 'ওসব বাবা শিল্পীদের এলাকা, আমি ট্রেসপাসার হতে চাইনে। যাদেব মামলা, তারাই লড়ুক, আমি আপাতত আর একটা বোতল পেলেই খুশি।'

কৃষ্ণা কটমট করে তাকায় সুরজিতের দিকে, চোখ দিয়ে ধমকে দেয়। বলে, 'দেখছ উৎপলদা, শান্তিনিকেতন আর আর্ট কলেজের ছাত্রী হয়ে কেমন মানুষের হাত ধরেছি। তেল ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।'

সুরজিতের মুখখানা এমন শীতের রাতেও তেলতেলে লাগছিল। বলে, 'তোমাদের হল আর্ট ফর আর্ট'স সেক, আমাদের হল আর্ট ফর পিপল্‌স্‌-সেক। আমরা দিনরাত খাটি, তেল জোগাই, তাতে গাড়ি-ঘোড়া, কলকারখানা চলে, ক্ষেতে ফসল ফলে, ঘরে বাতি জ্বলে, মানুষ খেয়ে পরে বাঁচে। এ কি কম শিল্প, বলো?' অস্পষ্ট জড়ানো উচ্চারণে কথাগুলো বলে সুরজিত।

কৃষ্ণা ক্ষেপে-টেপে একসা হয়ে বলে, 'তোমাকে এখানে নিয়ে আসাই অন্যায় হয়েছে। সবাই কী ভাবছে বলো তো?'

'জানি। পদ্মবনে দাঁতাল হাতি। কিন্তু কিছুই করবার নেই ম্যাডাম, কাজই আমার কাছে একমাত্র শিল্প, তার বাইরে কোনো শিল্প ধরা পড়ে না এই কেজো চোখে।'

কৃষ্ণা একটা অসহায় নাচার ভঙ্গি করে। এমন মানুষকে নিয়ে পারা যায় না আর!

সকালে চটপট তৈরি হয়ে নেয় সবাই। রাতভর ফোক-এর জলসায় ডুবে ছিল ওরা। চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তা নিয়ে তিলমাত্র আক্ষেপ নেই কারো মনে। ক্লান্ত রাতজাগা মুখগুলো তৃপ্তিতে টই-টুম্বুর। এবার আনন্দের হাট ছেড়ে ফিরে যাওয়ার পালা। কিন্তু একটা ছোট্ট কাঁটা বিঁধে আছে প্রতিটি বুকে। উৎপলের হাতের কাজগুলো খুঁজে বের করবার খেলার ফলাফলটা বেরোয়নি এখনো। একে তো মুফতে দু-দুটো 'কুটুম-কাটামে'র মূর্তিলাভের সম্ভাবনা, তার চেয়েও বড়, শিল্পীর নিজস্ব অহংটিকে তৃপ্ত করা। শয়ে শয়ে মূর্তি থেকে পাকা হাতের ওস্তাদী কাজগুলি খুঁজে বের করবার মতো শিল্প-জ্ঞান যে, প্রত্যেকেই ভাবছে, তারই রয়েছে শুধু।

কৃষ্ণার আর তর সয় না। সে উত্থাপন করে প্রসঙ্গটা। 'কালকের ঐ খেলাটার কী হল, উৎপলদা? নাকি মূর্তিগুলো দান করতে মন চাইছে না তোমার?'

খোঁচাটা গায়ে মাখে না উৎপল। বলে, 'আমি তো দেবার জন্য হাত ধুয়ে বসে রয়েছি। তোমাদেরই তো নেবার গরজ দেখছি নে।'

সুচাঁদ আর ওতোল তখন রাত জাগা শরীর নিয়ে অতিথিদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। যাঁরা চান করে নেবেন, তাঁদের জন্য বালতি বালতি জল ভরে দিয়েছে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাথরুমে। নিমগাছে চড়ে দাঁতন ভেঙে দিয়েছে। সম্মানিত অতিথিদের বাক্স-প্যাঁটরাগুলো হাতাহাতি করে জড়ো করছে সদর গেটের মুখে।

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকেও ওদের চোখ এবং কান বড়ই সজাগ! তাবা মুহূর্তে বুঝে ফেলে, কালকের ঐ মজার কানামাছি খেলাটা শুরু হবে এবার।

কৃষ্মা বলল, 'ঐ রানার আর বাউলটা। দুটোই মাস্টারপিস।' উৎপল মাথা নাড়ে, 'হল না।'

সুশীতল বটব্যাল বলেন, 'তিমির পিঠে মানুষ আর মৎস্যশিকারী জেলে।' উৎপল আবারও মাথা নাড়ে।

একে একে বলে যান সবাই। ছুটন্ত-ঘোড়া আর আহত সিংহ, গণেশের মূর্তি আর আদিবাসী রমণী, নটরাজ আর নৃত্যরতা নারী, মায়ের কোলে শিশু এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশু...।

উৎপল মাথা দোলাতেই থাকে। এক সময় শেষতম প্রতিযোগীও বলে ফেলে নির্বাচিত মূর্তিদুটির নাম। উৎপলের মুখের সেই হাসিখানি আর নেই। এক গাঢ় বিষাদে ভরে গেছে ওর মুখ। এক ধরনের পরাজয়-বোধ যেন পুরোপুরি গ্রাস কবে ফেলে ওকে।

থমথমে গলায় বলে, 'তোমরা কেউ বলতে পারলে না! তার মানে, আলাদাভাবে চিনে নেবার মতো কোনো ছাপ এখনও পড়েনি আমার কাজে! কী আর করা যাবে!'

এমন কথায় বুঝি অস্বস্তি জমে সবাইয়ের মুখে। মানুষটা কষ্ট পেল, তার হাতের কাজ আলাদাভাবে চেনা গেল না। ভদ্রতা করে বলা যেত, না, না, তা কেন, আমাদেরই চোখ তৈরি হয়নি এখনও। কিন্তু, এখন, এই সুন্দর সকালে, এমন আন্তরিক পরিবেশে কেউই বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারল না কথাগুলো।

সুরজিৎ বসেছিল একটা কাঠের গুঁড়ির ওপরে। ও তো জানে না, ওটা একটা বিশালকায কচ্ছপ। সারা রাত ধরে মহুয়া খেয়েছে ও। এখনও পুরোপুরি হ্যাং-ওভার চলছে। ভোরের কনকনে হাওয়া ওর ভারি জ্যাকেট ভেদ করে ঢুকছে ভেতরে। সূর্য উঠেছে। লাল টকটকে কমলালেবুর মতো ঝুলে রয়েছে পুব আকাশে। সিগারেট নয়, সুরজিৎ একখানা চুরুট ধরিয়ে টানছে।

কৃষ্মা কাছে গিয়ে ওর ভাবগতিক লক্ষ করে। বলে, 'বাবা, কূর্ম-বাহন, বাড়ি ফিরতে হবে, নাকি বসেই থাকবে ঠায়?'

সুরজিৎ মুখ ফেরায়, ভাবলেশহীন থমথমে মুখ, কিন্তু ভাল করে নিরিখ করলে বোঝা যায় একেবারে মজে রয়েছে লোকটা।

কৃষ্মার কথায় বোকার মতো হাসে।

বলে, 'তোমাদের শিল্প চেনার কম্‌পিটিশনে আমি নাম এন্‌ট্রি করাতে পারি?'

সামান্য চমকে ওঠে কৃষ্মা। তার ভ্রু-সঙ্গমে ঈষৎ ভাঁজ পড়ে। তাও খরখরে গলায় বলে ওঠে, 'তুমি তো এ সবের ঢের বোঝ! কাল থেকে সমানে মহুয়া খেলে আর ঢুললে।'

'স্টিল—যদি এনট্রি নিতে চাই—?' সুরজিতের ঠোঁট থেকে বোকা বোকা হাসিখানি মিলোয় না, 'কী রে উৎপল, একবার চান্স নেব নাকি?'

সুরজিতের প্রগলভতায় কৃষ্মা ঈষৎ বিব্রত, বিরক্ত। চুপ করে ওকে দেখতে থাকে সে।

সুরজিৎ সবার শরীরে তুলির মতো বুলিয়ে আনে দৃষ্টি, 'বলি তবে?'

দু-হাতে দু-খানা করে সুটকেস বাগিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে সুচাঁদ আর ওতোল। একেবারে মুষড়ে পড়েছে ওরা, মজার কানামাছি খেলাটা জমল না।

সুরজিৎ বলে, 'দুটো নাম বলব তো? তবে বলি, এই লরেল আর হার্ডি।'

থমকে দাঁড়িয়েছে সুচাঁদ আর ওতোল, স্বল্প পরিচ্ছদে এই শীতের সকালে অল্প অল্প কাঁপছে, আবার অধিক পরিশ্রমে ঘাম জমেছে মুখে। এবং সকলে তাকিয়ে দেখল কী উজ্জ্বল ভাষাময় চোখদুটি, কুৎসিত দুটি অবয়বের মধ্যে, কী জীবন্ত!

উৎপল ভাষাহীন দাঁড়িয়ে ছিল তফাতে। সুদূর দিগন্ত ছুঁয়ে তার দৃষ্টি এইমাত্র ফিরে এল লোকালয়ে। সারা মুখ জুড়ে দ্রুততম ভাঙচুর হল। দু-চোখের মণিতে ফুটে উঠল অপরিসীম কৃতজ্ঞতা আর কচি ছাতিমপাতার মতো উজ্জ্বল আনন্দ। সহসা ছুটে এসে সে দুহাত দিয়ে জাড়িয়ে ধরে সুরজিৎকে। সুরজিতের ঢুলু ঢুলু চোখদুটো তখনও কৌতুকে হাসছিল। বলে, 'দে এবার, মূর্তিদুটোকে দিয়ে দে আমায়। দে—দে—দে—।'

হত্যাকারীর জবানবন্দী

১.

গেটের সামনে একটা বিশেষ গাড়ি—নাম্বার প্লেটের ওপর চোখ বুলিয়েই রজত দত্ত মুহূর্তে বুঝে ফেলেন গাড়িটা কার। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের মধ্যে ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ে একরাশ মূল্যবান কাচের আসবাব। নিদারুণ অস্বস্তিতে ভরে যায় বুক। সঙ্গে সঙ্গে মগজের মধ্যে কিছু সারবন্দী চলমান বায়োস্কোপের ছবি ...।

তেরোই ফেব্রুয়ারিব দুপুর, বিকেল ..। সামনে ইট বৃষ্টি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর কাজের শার্সি দেওয়া জানলাগুলোর ওপর। দাউদাউ করে জ্বলছে তিনখানা জীপ। সাঁই সাঁই লাঠি ঘোরাচ্ছে পুলিশ। টিয়ার গ্যাসের শেলগুলো ফাটছে। সহসা গুলি চালাতে শুরু করল আক্রান্ত পুলিশ। ছত্রভঙ্গ জনতা যেদিকে পারছে পাগলের মতো দৌড়ুচ্ছে। সহসা ছেলেটা রজতের এক্কেবারে চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ল একদলা দোমড়ানো মোচড়নো কাগজের মতো। রক্তে ভেসে গেল তার বুক। পা'দুটো ছটফট করতে লাগল কাটা পাঁঠার মতো। ডান হাতের মুঠি খামচে ধরল পাশের একগুচ্ছ সবুজ ঘাসকে। তারপর আচমকা নিঃস্পন্দ হযে গেল ওর কচি শরীরটা। পশ্চিম আকাশ তখন ডুবন্ত সূর্যের আলোয় লালে-লাল। মনে আছে, বাঁহাত দিয়ে নিজের মুখটা কয়েক মুহূর্তের জন্য ঢেকে ফেলেছিলেন রজত, এবং স্পষ্ট মনে আছে, ঐ হাতে বারুদের গন্ধ পেয়েছিলেন তিনি।

মগজের মধ্যে বায়োস্কোপের ছবিগুলো অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করছিল, ওরই মধ্যে গাড়ির নাম্বার প্লেটটার ওপর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি বেঁধালেন রজত।

তিন-কামরাওয়ালা আট ফ্ল্যাটের হাউসিং-এর সদর দরজায় সুদৃশ্য গেটের গায়ে অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে ততক্ষণে। টুনি-বাল্বগুলো, রঙ-বেরঙের, মিটিমিটি জ্বলছে। গেট পেরোলেই সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে উঠলে পিসিমাদের ফ্ল্যাট। তিনতলায়। ঢুকবেন কি ঢুকবেন না ভাবছেন রজত, এমনি সময়ে সুতপন, পিসিমার বড় ছেলে, এগিয়ে এল হন্তদন্ত হয়ে, কী ব্যাপার রজতদা, এত দেরি?

দেরি হওয়ার অনেকগুলো কারণ ছিল। একে একে সেগুলো খোলসা করে বোঝাবেন, এমনটা ভেবে এসেছিলেন রজত। কিন্তু উপস্থিত তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল পাল্টা একটি প্রশ্ন, 'অনিমেষ রায় এসেছেন মনে হচ্ছে? গাড়ি দাঁড়িয়ে!'

'অনেকক্ষণ!' খুব হড়বড় করে কথা বলছে সুতপন, 'প্রায় সবাই এসে গেছে। শুধু তুমি, মণিকাকা, প্রবালদা...এমনিতরো জনাকয়। তোমার দেরি হল কেন?

'অনিমেষ রায় তোদের পরিচিত?'

'তুমি জানো না? রায়পিসে তো পিসিমার মেজো ননদের বর।'

একটু বুঝি বিবর্ণ লাগছিল রজতের মুখ, চোখের তারায় দুর্ভাবনা। হঠাৎ সেটা নজরে পড়ল সুতপনের। বলল, কী ব্যাপার বল তো? তুমি কি ওঁকে চেন না কি? এনিথিং রং?

একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন রজত। তারপর খুব অন্যমনস্ক গলায় বলেন, 'ওঁকে আর কে না চেনে! সারা রাজ্যে, এখন, ওয়ান অব্ দ্য প্রমিনেন্ট ফিগারস্। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান। বিধানসভায় বিরোধী দলের তুখোড় নেতা। ওঁর বক্তৃতায় ময়দান, বিগ্রেড কেঁপে ওঠে...।' খুব টেনে টেনে কথাগুলো বলছিলেন রজত। সুতপন বুঝতে পারছিল না, এগুলো স্তুতি না নিন্দা।

বলে, 'তোমার সঙ্গো আলাপ আছে?'

আবার জবাব দিতে বিলম্ব করেন রজত। বুক ভরে দম নেন। এবং নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বেগবান হাওয়ায় কাগজের নৌকার মতো ভাসিয়ে দেন একটি মাত্র শব্দ, নাহ্। শব্দটা ভাসতে..., ভাসতে..., ভাসতে... সুতপনের চারপাশে পাক দিতে থাকে অবিরাম। সুতপনের দুচোখে সামান্য বিস্ময়। ততোধিক অস্বস্তি। অনিমেষ রায়ের আগমনে রজতদার প্রতিক্রিয়াটুকু ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে কিঞ্চিৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সেটা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারে সুতপন। বলে, চলো, তোমার সঙ্গো রায়পিসের আলাপ করিয়ে দিই। এমনিতে বেশ গম্ভীর, রাশভারি, একটা 'বাঘ-বাঘ' ইমেজ থাকলেও রায়পিসে কিন্তু ভারি মজার মানুষ। তোমার ভাল লাগবে, দেখো। সবাই যা ভাবে, রায়পিসে কিন্তু তেমনটি নয় মোটেও। এমন ফুর্তিবাজ আর...। সুতপন এমন ভাব করছিল, যেন পারলে রজতকে টানতে টানতে নিয়ে যায় অনিমেষ রায়ের কাছে। কিন্তু রজত তেমন করে বাজেন না। কেমন যেন মিয়োনো চোখে তাকান। বলেন, আচ্ছা সে হবে'খন। তুই যা। আমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনি মোড়ের দোকান থেকে। এমন কথায় সুতপনের বিস্ময়ের পারদটা এক ঝটকায় অনেকখানি ওপরে উঠে যায়। অনিমেষ রায়ের সঙ্গো আলাপ করবার এমন সোনা-বাঁধানো মওকা পেয়ে গিয়েও কোনো আহাম্মক যে সিগারেট কেনাটাকে তার চেয়েও বেশি জরুরি মনে করে, তা যেন ছিল সুতপনের সুদূর কল্পনারও বাইরে। সে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রজতের দিকে।

রজতের পকেটে সিগারেট ছিল। তাও তিনি বললেন এমন। আসলে, তিনি সুতপনের প্রস্তাবটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। কারণ, এই মুহূর্তে অনিমেষ রায়ের মুখোমুখি হতে একেবারেই ইচ্ছে করছে না তাঁর। এমন এক আনন্দময় পরিবেশে, যখন অতিথি অভ্যাগতরা সবাই রয়েছে এক্কেবারে উৎসবের মেজাজে, ঠিক তেমন মুহূর্তে রজত এমন একজনের মুখোমুখি হতে চান না, যিনি এই মাসদুই আগে রজতের উদ্দেশ্যে 'বর্বর' 'রক্তলোলুপ', 'হিংস্র পশু', 'শয়তান', 'নরকের কীট', ... এক কথায় কটুক্তিকর কোনো মন্তব্য করতেই বাকি রাখেননি। রজতের মগজের মধ্যে বায়োস্কোপের

ছবিগুলো নড়াচড়া করছিল অবিরাম, প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে অনিমেষ রায় বলেছিলেন, রজত দত্তর মতো হিংস্র, রক্তলোলুপ, প্রভুর পা-চাটা পুলিশ ইংরেজ আমলেও আমি দেখিনি। বলেছিলেন, বর্বরতায় ঐ পুলিশ অফিসারটি যেকোনো মধ্যযুগীয় রক্তপিপাসু শাসককেও লজ্জা দেবে। প্রভুর পদলেহনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুভক্ত কুকুরটির কীর্তিকেও ম্লান করে দেবে সে। ওর সার্ভিসের তকমা খুলে নেওয়া উচিত। বলেছিলেন, যে স্বাধীনতার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি, এ-দেশের হাজার হাজার শ্রমিক-কৃষক বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে যে স্বাধীনতা এনেছে, সেই স্বাধীন দেশের যে পুলিশ অফিসার কেবলমাত্র প্রভুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এক নিষ্পাপ স্কুল ছাত্রের কচি বুক গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে দিতে পাবে, তার উর্দি টেনে খুলে নেওয়া উচিত। তার দু-কাঁধের ঝকঝকে অশোকস্তম্ভ ছিঁড়ে নেওয়া উচিত। আমরা এই রক্তপায়ী পশুর অবিলম্বে পদচ্যুতি দাবি করছি। এবং পুরো ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং মৃত ছাত্রটি পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবারও দাবি জানাচ্ছি। পরের দিন অর্থাৎ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সমস্ত খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল এসব। এমনকী, সাংবাদিকদের সামনে ছাত্রটির মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে করতে অত বড় মানুষটা নাকি চোখের জল চেপে রাখতে পারেননি। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

পরের দিন বন্‌ধ ডেকেছিল অনিমেষ রায়ের দল। বন্‌ধ মোটামুটি সফলও হয়েছিল।

রাজনৈতিক নেতাদের এ ধরনের পিলে চমকানো মন্তব্যে চাকরির প্রথম দিকে খুব আপসেট হয়ে পড়তেন রজত। এখন সব সয়ে গেছে। এখন আর এসব মন্তব্যে তেমন গা করেন না। বর্বর, শয়তান, পদলেহী কুকুর—এসব বিশেষণ এখন অঙ্গের ভূষণ হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই অন্য পরিস্থিতিতে হয়তো অনিমেষ রায়ের এমন 'গভীর ক্ষুর চালিয়ে দেওয়া' মন্তব্যগুলোকে তেমন আমলই দিতেন না রজত। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনিমেষ রায়ের ব্যবহৃত বিশেষণগুলো একটি একটি করে অভ্রান্ত বুলেটের নিশানায় বিন্ধ হয়ে গিয়েছিল রজতের হৃৎপিণ্ডে এবং মস্তিষ্কে। কারণ, তাঁর নিজেরই কেমন জানি মনে হচ্ছিল, ঐ একই বিশেষণগুলো বারে বারে উঠে আসছে তাঁর বুকের অন্তর্গত কোনো নরম ও স্পর্শকাতর প্রদেশ থেকে। বাস্তবিকই, ছেলেটির মৃত্যুতে একেবারেই মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। ছেলেটি ওঁর চোখের সামনে লুটিয়ে পড়েছিল। সেদিন বিকেলে ক্লান্ত বকুলের একটি মালার মতোই ছিল তার লুটিয়ে পড়বার ভঙ্গি। সেই কলেজ-জীবনে দু'এক পংক্তি কবিতা রজতের বুকের যে জায়গা থেকে উঠে আসত, চোখের সামনে ছেলেটিকে লুটিয়ে পড়তে দেখে ঐ জায়গা থেকেই চকিতে উঠে এসেছিল এই একটিমাত্র উপমা। 'দুপুরের রোদ্রে ক্লান্ত এক বকুলের মালা।' খুব রোগাটে গড়ন ছিল ছেলেটার। গায়ের রঙ ছিল পাকা ধানের মতো। চোখদুটি ছিল ভাসাভাসা, নিষ্পাপ। লুটিয়ে পড়বার মুহূর্তে সে এক ঝলক তাকিয়ে ছিল রজতের দিকে। সে দৃষ্টিতে কোনো রোষ কিংবা ঘৃণা ছিল না। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন রজত, ছেলেটির নাম সুকুমার, গরীব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

ক্লাস সেভেনে পড়ছিল। লেখাপড়ায় নাকি খুবই ভালো ছিল। আর, সেদিনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তার কোনো ভূমিকাই ছিল না। সে যাচ্ছিল তার অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে। তার জামার পকেটে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন পাওয়া গিয়েছিল। ঝাঁঝরা বুকের থেকে চোঁয়ান রক্তে ভিজে গিয়েছিল কাগজখানা।

একটা সম্ভবনাময় প্রাণ আচমকা হারিয়ে গেল অকারণে, প্রস্তুতিহীন। এবং উপলক্ষ্য হয়ে রইলেন রজত দত্ত। কারণ, ঐ তেরোই ফেব্রুয়ারির বিকেলে ডি—এম অফিসের সামনে অনিমেষ রায়ের আইন-অমান্যের কর্মসূচী রুখবার চূড়ান্ত দায়িত্বে ছিলেন তিনিই। একটা চরম সংকটময় মুহূর্তে গুলি করবার হুকুম গুলির চেয়েও তীব্রগতিতে ছুটে গিয়েছিল তাঁরই মুখ থেকে। কিন্তু এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও এখন কি আর কেউ বিশ্বাস করবে যে তেমন হুকুম ছুটে গিয়েছিল রজতের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে! প্রথম থেকেই কড়া ব্যবস্থা নেবার হুকুম থাকলেও রজত দত্ত শেষ মুহূর্ত অবধি গুলি চালাতে চাননি। কিন্তু কর্মসূচির শুরু থেকেই অনিমেষ রায় বক্তৃতায় এমন আক্রমণাত্মক ছিলেন, এমনভাবে ধাপে ধাপে জনতাকে উত্তেজিত করছিলেন, বাড়তি ফোর্স এনেও সামাল দেওয়া গেল না। অনিমেষ রায়ের বক্তৃতার মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হল ইট বৃষ্টি এবং প্রবল ভাঙচুর। ডি-এম অফিসের সামনের গাড়িগুলোতে আগুন ধরানো হল। তাও প্রথমে লাঠি চার্জেরই আদেশ দিয়েছিলেন রজত। তারপর, টিয়ারগ্যাস। অবশেষে, পরিস্থিতি যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল, বাধ্য হয়ে গুলি চালাবার নির্দেশ দিতে হল। কারণ, ক্রমাগত ইট খেতে খেতে ফোর্সও ক্রমশ হোস্টাইল হয়ে যাচ্ছিল। গুলির সামনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল মারমুখী জনতা। যে যেদিকে পারছিল পালাচ্ছিল। রজত নিজেও কোমর থেকে সার্ভিস-রিভলভার বের করে তাক করেছিলেন মারমুখী জনতার দিকে। কয়েকটা গুলিও ছুঁড়েছিলেন এলোপাতাড়ি। আর, ঠিক সে মুহূর্তেই সুকুমার নামের বারো-তেরো বছরের মিষ্টি কিশোরটি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল রজতের একেবারে সামনেই। আহত হয়েছিল আরও দশ-বারো জন। হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল তাদের। জনা পাঁচেকের অবস্থা গুরুতর ছিল। শেষ অবধি হাসপাতালে মারা গিয়েছিল একজন।

অনিমেষ রায়ের মন্তব্যগুলোকে খুব একটা পাত্তা না দিলেও ঐ নিরাপরাধ ছেলেটার কথা মনে পড়লেই মনটা খারাপ হয়ে যেত রজতের। বড়ই নিষ্পাপ ছিল মুখখানা। গুলি লেগেছিল বুকে। এখনও ঐ রক্তাক্ত শরীরটা মনে পড়লেই রজতের বুকের মধ্যে তীব্র প্রদাহ শুরু হয়।

বনধ্ এর পরের দিনই অনিমেষ রায়ের নেতৃত্বে শ'পাঁচেক যুবক চড়াও হয়েছিল জেলা পুলিশ দপ্তরের সামনে। রজতের উদ্দেশে অগ্নিবর্ষী ভাষণ দিয়েছিলেন অনিমেষ রায়। বর্বর, রক্তলোলুপ, পশু, জহ্লাদ,—রজতের সম্পর্কে কোনো বিশেষণই বাদ রাখেননি তিনি। পুলিশ দপ্তরের দোতলায় নিজের চেম্বারে বসে বসে সবই শুনছিলেন রজত দত্ত। সেদিন অবশ্য তেমন একটা বাড়াবাড়ি করেননি অনিমেষ রায়। শুধু 'ছাত্র হত্যাকারী,

জহ্লাদ' রজত দত্তর গ্রেপ্তার এবং চরম শাস্তি দাবি করতে করতে তিনি মিছিল করে চলে গিয়েছিলেন ডি-এম অফিসের দিকে।

আস্তে আস্তে অবশ্য থিতিয়ে গিয়েছে পুরো ব্যাপারটা। ওপরওয়ালারা রজতকে পুরোপুরি প্রোটেক্শন দিয়েছেন। একটা বিভাগীয় তদন্ত অবশ্য শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

তা বলে রজতের বুকের পাষাণভার একতিলও হালকা হয়নি এ ক'মাসে। ঐ ছেলেটার কথা ভেবে এখনও তার বুকের মধ্যে যখন-তখন তীব্র প্রদাহ শুরু হয়।

দোকানের সামনে অবধি গিয়েও সিগারেট কিনলেন না রজত। পায়ে পায়ে ফিরে এলেন। জীপ থেকে উপহারের প্যাকেটটা নিলেন। তারপর ক্লান্ত চরণে সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠলেন। সুতপন ফ্ল্যাটের মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, তুমি কোথায় ছিলে রজতদা? মা তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

রজত সামান্য হাসেন। মৃদু গলায় বলেন, 'এই তো। পিসিমা কোথায়?

বলতে বলতে বিজয়া এলেন। বললেন, 'এতক্ষণে পিসিমাব কথা মনে পড়ল? আয়, আয়।'

রজত খুব সঙ্কুচিত পায়ে ঘরে ঢুকলেন।

২.

তিন কামরার ফ্ল্যাটটিকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ঘরে ঘরে সিলিং থেকে দোল খাচ্ছে বহুবর্ণ বেলুনের ঝাঁক। সুতপনের বউ শিপ্রা কচি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে মাঝের ঘরে। বাইরের বসবার ঘর থেকে ওদের দেখতে পেলেন রজত। বাচ্চাটাকেও সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। ওরই মুখে-ভাত উপলক্ষ্যে আজ এই অনুষ্ঠান। চার তলার ছাদে প্যাণ্ডেল বেঁধে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। একদিকে সোফা পেতে অভ্যাগতদের বসবার ব্যবস্থা। তিনতলার ফ্ল্যাটেও গিজ-গিজ করছে লোক। রজত তাদের কাউকে কাউকে চেনেন, অনেককেই চেনেনা না। তাঁর চোখদুটি খুব সন্ত্রস্তভাবে খুঁজতে থাকে অনিমেষ রায়কে।

অনিমেষ রায় যে সুতপনদের আত্মীয় সেটা রজত জানতেন না। জানবার কথাও নয়। এমনিতে পিসিমাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক থাকলেও পিসিমার ননদের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সম্পর্কে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তার ওপর পিসির ননদের যে বছর বিয়ে হয় তার বছরখানেক বাদে রজতও আই-পি-এস ট্রেনিং সেরে পোস্টিং পেয়েছিলেন নর্থ-বেঙ্গালে। সেই থেকে আজ কত বছর তিনি কলকাতা-ছাড়া। পিসিমাদের সঙ্গে বলতে গেলে যোগাযোগই ছিল না। কালেভদ্রে কলকাতা এলে এক-আধ ঘন্টার জন্য যেতেন। কোনোবারে তাও হত না। বছর দেড়েক তিনি ফিরেছেন। তাও খোদ কলকাতায় নয়। কলকাতার লাগোয়া একটি জেলায়। অ্যাডিশন্যাল এস-পি। ব্যস্ততা আর ঝঞ্ঝাটে এই দেড়টা বছর যে কীভাবে কেটেছে রজতের!

অনিমেষ রায়, যতটুকু জানা গেল সুতপনের মুখ থেকে, পিসিমার মেজ ননদের বর। পিসিমার মেজ ননদরা থাকেন বেহালার দিকে। ওদের সঙ্গে বলতে গেলে

কোনোই যোগাযোগ নেই রজতের। কাজেই পিসিমার নন্দাইকে চেনার কথা নয়। কিন্তু সম্পর্কটা জানা হয়ে যাওয়ার পর রজতের অস্বস্তিটা যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, অনিমেষ রায়ের ব্যবহৃত বিশেষণগুলি। আজ সেই মানুষটির মুখোমুখি হতে চলেছেন রজত। রাজনৈতিক নেতা এবং কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার হিসেবে নয়, একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দু'জন আত্মীয় হিসেবে। রজতের সারা শরীর শিরশির করে উঠল। তিনি কল্পনা করলেন আগন্তুক পরিস্থিতিখানি। সুতপন বা অন্য কেউ অনিমেষ রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে রজতের। অনিমেষ রায় রজতের নাম শুনেই ঈষৎ চমকে উঠবেন। চোখ তুলে তাকিয়েই দেখতে পাবেন সেই মানুষটিকে, যাকে তিনি 'বর্বর', 'রক্তপিপাসু', 'জহ্লাদ' ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখখানা চাপা বিদ্বেষে ভরে যাবে। এমনও হতে পারে, তিনি সেই ঘৃণা মেশানো মুখখানা ফিরিয়ে নেবেন অন্যদিকে। এমনও হতে পারে, মনের মধ্যে পুষে রাখা যাবতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ সহসা লাগামছাড়া হয়ে বেরিয়ে এল অভ্যাগত মানুষজনের সামনেই, ছিপিখোলা সোডার বোতলের মতো ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায়। ঠোঁটদুটি চেপে, বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখা যাবতীয় ঘৃণা ভুরুসঙ্গমে জড়ো করে, তিনি বলে উঠতে পারেন, একটা নিষ্পাপ দুধের ছেলেকে এমন ঠান্ডা মাথায় গুলি করে মেরে ফেললে? তুমি মানুষ না অন্য কিছু? তোমাকে আত্মীয় বলে ভাবতেই ঘেন্না হচ্ছে আমার। অ্যাই, তোমরা সবাই জান কি, এই লোকটা কিছুদিন আগে এক নিরপরাধ ফুলের মতো ছেলেকে গুলি করে মেরেছে কেবল শাসক দলকে তুষ্ট করতে? মানুষের উচ্চাকাঙ্খা কত বিকৃত হয়ে ওঠে, দ্যাখো। বলবেন কি সত্যি সত্যি অতখানি রূঢ় কথা, এমন একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে? এতখানি অবিবেচক কি হবেন এই প্রবীণ মানুষটি? কতদিন ধরে রাজনীতি করেছেন তিনি। যতই না কেন বেদনার্ত হোক বুক, যতই বিদ্বেষ জমুক সেখানে, এমন একটা পারিবারিক মিলনের আসরে কি প্রকাশ করে ফেলবেন মনের অতখানি অসূয়া? কিন্তু, যদি সত্যি সত্যিই সর্বসমক্ষে বলে ফেলেন এসব, কী কর্তব্য হবে রজতের? আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন কি তিনি? বলবেন কি যে, আপনি মিছিমিছি আমাকে দোষারোপ করছেন পিসেমশাই। সেদিন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল, ট্যাকল্ করতে না পারলে আমি সাসপেন্ড হয়ে যেতাম।

—সাসপেনশনের ভয়ে তুমি একটা কচি ছেলেকে অকারণে মেরে ফেলবে? বিনা দোষে? এই তোমার শিক্ষাদীক্ষা? রুচি? চাকরি বাঁচাতে গিয়ে তুমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলবে? তোমাদের চেয়ে তো ব্রিটিশ আমলের পুলিশের মনুষ্যত্ব বেশি ছিল।

রজত এর উত্তরে কী বলবেন? আদপেই কিছু বলবেন কি? কারণ, ততক্ষণে ওঁদের দু'জনকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে যত আমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয়-পরিজন। সবাইয়ের চোখ রজতের ওপরেই নিবদ্ধ। সবাই ওঁকে বিদ্বেষপূর্ণ চোখে দেখছে। সবাই ওঁকে দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করছে। সাংবাদিক সম্মেলনে হাপুসনয়নে কেঁদেছিলেন অনিমেষ রায়। বলা যায় না, আজও হয়ত ছেলেটার মৃত্যুর ঘটনা বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ ভিজে গেল। বলা যায় না, হয়ত কথা বলতে বলতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা

কোনো আত্মীয়ের তেরো-চোদ্দ বছর বয়েসী ছেলেকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে বললেন, এই রকম, ঠিক এই বয়েসী একটি ছেলে। এমনই রোগা। এমনই টানাটানা চোখ। ইস্কুলে ফার্স্ট হত। মায়ের জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছিল। বল দেখি, কী এমন করতে পারে ঐটুকু দুধের বাচ্চা যে তাকে গুলি করে মারতে হল? অনিমেষ রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আত্মীয়ের বাচ্চা ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে রজতের দিকে। ওর বয়েসী বাচ্চাগুলোও বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকবে রজতকে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে সুকুমারের চোখে কোনো ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ দেখেননি রজত। কিন্তু তাঁর কোনোই সন্দেহ নেই, তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলোর চোখ থেকে ঝলকে ঝলকে উপচে পড়বে অসূয়া। ঘিরে থাকাদের মধ্যে দু'একজন, যারা ঠিক আত্মীয় নয়, সুতপনের অফিসের বন্ধুবান্ধব বা ঐ গোছের কেউ পেছন থেকে ফুট কেটে বসতে পারে, আজকাল তো এসবই হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টের অর্ডার দেখেননি? এদেশে পুলিশই হল সবচেয়ে হিংস্র, সংগঠিত এবং সরকার অনুমোদিত খুনে-গুন্ডাবাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরতে পারে পাশের জন, এই তো সেদিনও সুপ্রীম কোর্ট বলেছে, দেশের অন্তত কিছু পুলিশের স্থান এইমুহূর্তে হওয়া উচিত জেলে। পিসিমা এবং সুতপনের অবস্থা তখন অবশ্যই সঙ্গীন। তাঁরা চাইছেন না, এই অপ্রিয় অস্বস্তিকর আলোচনাটা আর এক মুহূর্ত চলুক, আবার অনিমেষ রায়ের মতো জবরদস্ত মানুষটিকে চুপ করতে বলতেও সাহসে কুলোচ্ছে না। বলা যায় না, যদি ঝাঁ করে বলে বসেন, বিজয়া, তুমি তো বলবেই। রজত যে তোমার ভাইপো। তাছাড়া মরেছে যে অন্যের ছেলে। কিন্তু ধরো, তোমার ছেলেটাকে যদি কোথাও পুলিশ এমনি করে মেরে ফেলত?

ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারেননি রজত, কখন তিনি ঘামতে শুরু করেছেন। বাঘের গন্ধ পেয়ে হরিণের যেমন ত্রস্ত চাউনি, তেমনি করে চোখ চারাতে থাকেন চারপাশে। কিন্তু না, বসবার ঘরে নেই অনিমেষ রায়। তবে কি মাঝের ঘরে, যেখানে সুতপনের বউ শিপ্রা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে, ঐ ঘরেই রয়েছেন তিনি! কিন্তু পুলিশের স্বভাবজাত অনুমান ক্ষমতায় রজত বোঝেন, যেভাবে সমবয়েসী মেয়েগুলো শিপ্রা আর তার বাচ্চাকে ঘিরে কলকল করছে, অতবড় রাশভারি মানুষটা ওঘরে থাকতেই পারেন না। খুব সাহসে ভর করে পায়ে পায়ে মাঝের ঘরের দিকে এগোতে থাকেন রজত। হাতে ঢাউস উপহারের প্যাকেট।

রজতের অনুমানই ঠিক। অনিমেষ রায় ঐ ঘরে নেই। তবে কি তিনি দ্বিতীয় বেডরুমে বসে রয়েছেন? সম্ভবত তাই। রজত শিপ্রার হাতে প্যাকেটখানা তুলে দেন। বাচ্চাটার গাল টিপে দেন আলতো। তারপর ধীরপায়ে চলে আসেন বাইরের ঘরে। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। ক্যাটারারের ছেলেগুলো কফির ট্রে নিয়ে এলে খুব অন্যমনস্কভাবে তুলে নেন একটা কাপ। সারা বুক জুড়ে এক ধরনের অস্বস্তি পাতলা মেঘ। মনের গুমোটটা বেড়ে চলেছে সেই কারণেই! পাশের ঘরেই রয়েছেন অনিমেষ রায়! যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারেন! হঠাৎই চোখাচোখি হয়ে যেতে পারে রজতের সঙ্গে! আর, তারপরই পরপর ঘটে যেতে পারে এগুলোই, যা এতক্ষণ ধরে ভেবেছেন রজত!

সুতপন খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়েও থেমে গেলেন রজত। খুব চাপা গলায় বললেন, অ্যাই সুতপন, অনিমেষ পিসে কোথায় রে? ওই ঘরে?

'উঁহু। ও ঘরে তো আমার শ্বশুড়-শাশুড়ি, ঘুমোচ্ছেন। সারাদিন খুব ধকল গেছে তো ওঁদের।'

'অনিমেষ পিসে কি তবে চলে গিয়েছেন?'

'চলে যাবেন? এক্ষুনি? তিনি গল্প জুড়েছেন ছাদে। ওখানেও তো গেস্টদের বসবার জায়গা হয়েছে। তুমি যাও না, সোজা চলে যাও ছাদে।'

কিন্তু রজতের চোখে কোনো উৎসাহ দেখতে পায় না সুতপন। বলে, 'আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমায়। চলো, আলাপ করিয়ে দিই।'

রজত তাও বড় একটা বাজেন না। বলে, 'কী করছেন তিনি?'

'কী আবার করবেন?' সুতপন ঠোঁটের ফাঁকে হাসে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও কী করে? তিনি এখন ত্রিলোচনবাবু, কীর্তিনাথ বাবুদের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় মগ্ন।'

'ওরা কারা?'

এই পাড়ার অনিমেষ পিসেদের দলের নেতা। ওদের সঙ্গে বসে দলের পরবর্তী প্রোগ্রামের স্ট্রাটেজি তৈরি করছেন বোধ হয়। তুমি যাবে তো বলো, পৌঁছে দিই।'

রজত অল্পক্ষণ থমথমে মুখে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, 'না, থাক। বড্ড টায়ার্ড লাগছে। একটুখানি বসি। পরে যাব।'

সুতপন চলে যায়। রজতের জিভে কফি বিস্বাদ লাগে। অনিমেষ রায়ের অকরুণ মুখখানি চোখের সামনে ভাসতে থাকে শুধু।

রাজনৈতিক নেতাদের হাঁড়ির খবর রাখতে হয় পুলিশকে। অনিমেষ রায়ের চরিত্রও রজতের অজানা নয়। ষাটোর্ধ্ব এই প্রবীণ, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জেল খেটেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই হাতে পেলেন স্বাধীনতা। সেই থেকে আজ চারদশক কেন্দ্র এবং রাজ্য রাজনীতিতে কখনো রুলিং পার্টিতে কখনো অপোজিশনে তিনি নিজের স্থানটি বেশ পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। বর্তমানে, বিরোধী দলের নেতা হিসেবেও তিনি সমান প্রাধান্য ও গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। এমনকী ক্ষমতাশালী দলও তাঁকে রেয়াৎ করে। বাইরে বজ্রের মতো কঠোর, কিন্তু অন্তরে কুসুমের মতো কোমল এবং গরিব, অসহায় মানুষের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল—এমন একটা ইমেজ তাঁর সম্বন্ধে তিলতিল গড়ে উঠেছে জনমানসে। বেশ পাকাপোক্ত ইমেজ।

৩.

রাত ন'টা নাগাদ সুতপন আবার এল। সে ছিল ছাদে। অভ্যাগতদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করছিল। রজত বসে বসে কেবলই ভাবছিলেন, আজ অনিমেষ রায়ের সঙ্গে দেখাটা না হলেই ভালো হয়। এমন পারিবারিক আন্তরিক পরিবেশে এমন সাক্ষাৎকার বাঞ্ছনীয় নয়। যতটা আশঙ্কা করছেন রজত, ততটা না হলেও কিছুটা গরল তো ঝরবেই। নিদেন যদি ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় মুখ বেঁকিয়ে অন্য দিকে চলে চান

অনিমেষ রায়, রজতের পক্ষে সেটাই কি কম পীড়াদায়ক হবে? একবার ভেবেছিলেন পিসিমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, মাথা ধরেছে, পেট কামড়াচ্ছে গোছের কিছু অজুহাত খাড়া করে, দু'টো সন্দেশ মুখে দিয়ে কেটে পড়বেন সুতপনের অসাক্ষাতে। পরে যদি সুতপন রাগ করে, অভিমান করে, দুটো কড়া কথা শুনিয়েই দেয়, সেটাও অনেক বেশি সহনীয় হবে। কিন্তু পিসিমার সামনে কথাটা আলতো পাড়তেই তিনি এমন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, থতমত খেয়ে চেপে গেলেন রজত। স্থাণুর মতো চেয়ার আঁকড়ে বসে রইলেন আর ভাবতে লাগলেন, কখন অনিমেষ রায় এ বাড়ি ছাড়েন। তিনি ব্যস্ত মানুষ, কত বড় ভি-আই-পি আদমি, একটা সামান্য মুখে-ভাতের অনুষ্ঠানে এসে কতখানি সময়ই বা ব্যয় করতে পারবেন! তাও কিনা বউয়ের দাদার নাতির মুখে ভাতে। রজত আশা করছিল, যে কোনো মুহূর্তে তিনি উঠে পড়তে পারেন আড্ডা ভেঙে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারেন সোজা একতলায়। গাড়িতে চড়ে ভোঁ করে বেরিয়ে যেতে পারেন। রজত প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিল তেমনটা। যদি বিদায় নেবার জন্য একঝলক ঢোকেনও এঘরে, দু'এক মিনিটের 'চলি বিজয়া, চলি বৌমা', 'আবার আসবেন। আসেন না তো', 'সময় পাইনে' গোছের বিদায় সম্ভাষণ, তো রজত না হয় ঐটুকু সময় উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। নচেৎ ম্যাগাজিনের পাতায় মুখখানি আড়াল করে কোনো গতিকে কাটিয়ে দেবেন সময়টুকু। অবশ্য যদি শেষ মুহূর্তে সুতপন আদিখ্যেতা করে আলাপ করাতে না আসে। এইসব সাতসতের ভাবনার অতলে যখন একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছেন রজত, ঠিক তখনই সুতপন এসে বলল, 'এই রজতদা, অনিমেষ পিসে তোমায় ডাকছেন।'

'আমায়!' মুহূর্তে ধ্বক করে ওঠে রজতের বুক। মুখখানা ব্লটিং পেপারের মতো সাদা হয়ে যায়। এতক্ষণে তিনি নিজেকে সঠিক অর্থে বিপন্ন মনে করেন। সহসা পুনরায় ঘামতে শুরু করেন তিনি। বলেন, 'কোথায় তিনি?'

'ছাদে। তুমি এতক্ষণ যাওনি কেন?'

'আমার কথা কী করে জানলেন উনি?'

'আমিই বলেছি।'

'কিছু বলছিলেন আমার সম্পর্কে?'

'না, তেমন কিছু নয়। তোমার নাম শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ওকে ডেকে নিয়ে আয় ওপরে।'

এতক্ষণে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে রজতের। এতক্ষণ ধরে যা ভাবছিলেন, কল্পনা করছিলেন, সব কিছুই এক মূর্ত রূপ পেতে চলেছে। এ সময়ে কী করা উচিত হবে, ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না রজত। না, অনিমেষ রায়ের প্রোগ্রামে গুলি চালানোর জন্য তিলমাত্র অস্বস্তি নেই রজতের মনে। এমনকী গুলিতে আহত মানুষজন, হাসপাতালে মারা যাওয়া লোকটির জন্যও নেই কোনো গ্লানি। লাঠি চার্জ করা, টিয়ার গ্যাস ফাটানো, গুলি করা এসব তো পুলিশের চাকরির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনিমেষ রায়ের সেটা বোঝা উচিত। সম্ভবত বোঝেনও। কারণ, তিনি দীর্ঘকাল শাসক

দলের একজন ছিলেন। তাঁর সময়েও লাঠি, কাঁদানি গ্যাস, গুলি সবই চলেছে। এসব সিলি প্রশ্নকে ফেস করা কিছু কঠিন হত না রজত দত্তর মতো ঝানু আই-পি-এস অফিসারের পক্ষে। কিন্তু রজতের যা কিছু অস্বস্তি ঐ বাচ্চা ছেলেটাকে ঘিরে। খুব পবিত্র নিষ্পাপ ছিল সে। কোনো দোষই করেনি। মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে যাচ্ছিল। সে অধিকার পুরোপুরিই ছিল তার। পথ চলার অধিকার। এবং সেই অধিকারকে যাতে কেউ খর্ব করতে না পারে, সেটা দেখার দায়িত্ব ছিল পুলিশেরই। পুলিশ সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বরং উলটে গুলি করে মেরেছে ঐ পথচারী কিশোরকেই। নিতান্তই প্ররোচনাহীন, অন্যায়, অপ্রয়োজনীয় এবং অনৈতিক হয়েছে কাজটা। পুলিশ একেবারে উন্মত্তের মতো গুলি চালিয়ে ছিল সেদিন। একটা সুশিক্ষিত সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষে এতখানি উন্মত্ততা বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণ মানুষের ধন-প্রাণ সুরক্ষার জন্য যাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে রাষ্ট্র, অস্ত্র হাতে নিয়ে তাদের এই অন্ধতুল্য আচরণ ক্ষমারও অযোগ্য। দোষী নির্দোষের ফারাকটা তাদের শিক্ষিত চোখে মুহূর্তেই ধরা পড়া উচিত ছিল। অন্ততপক্ষে পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বারো-তেরো বছরের একটা রোগা-প্যাটকা ইনোসেন্ট দুধের ছেলের, পুলিশের গুলি তো দূরের কথা, লাঠিরও লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল না। আর রজত কিনা একেবারে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক গুলি চালিয়ে দিলেন একেবারে ওর বুক লক্ষ করে! নাহ্, কোনো কৈফিয়ত নেই, কোনো অজুহাতই চলে না এমন কাজের। ন্যূনতম আত্মরক্ষার সুযোগ নেই তাঁর। অনিমেষ রায়ের মুখোমুখি হতে যা কিছু অস্বস্তি রজতের, তা এইখানেই। প্রাচীন জমানার মানুষ তিনি, নীতিবোধটা টনটনে, প্রতিটি বক্তৃতায় যুবসমাজের মধ্যে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনবার কথা বলেন, বিবেকের শাসন মেনে চলার উপদেশ দেন। যদি, সুকুমারকে হত্যা করবার প্রসঙ্গটা তুলে, তিরস্কারের ভঙ্গিতে নয় খুব কোমল, অনুত্তেজিত ভঙ্গিতেও রজতের বিবেকের জায়গাটা ছুঁতে চান? ঐ জায়গায় তো রজত এমনিতেই গো-হারান হেরে বসে আছেন। ঐ ঘটনাটার জন্য এই ক'মাস তো তিনি নিজেই নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না।

সুতপনের দিকে মুখ ফেরান রজত। খুব বিধ্বস্ত গলায় বলেন, 'থাক না। এই তো বেশ আছি। মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

'ধরবেই তো। ছাদে কেমন ফুরফুরে হাওয়া, আর তুমি কিনা এই বন্ধ ঘরে! চলো, চলো।' সুতপন প্রায় টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রজতকে।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে এবার সত্যিই একটু ভয় করছে রজতের। বলির পাঁঠার মতো লাগছে নিজেকে।

সুতপন চাপা গলায় বলে, 'বেশ ভালো করে আলাপটা জমিয়ে নাও। এ রাজ্যে বিরোধী দল হলে কী হবে, অনিমেষ পিসের হাত বেজায় লম্বা। আখেরে ফল পাবে।

৪.

ছাদের দক্ষিণ ঘেঁষে খোলা আকাশের তলায় ভারি সোফায় গা এলিয়ে বসেছেন অনিমেষ রায়। এক মাথা সাদা চুল। কাঁচা-পাকা মোটা ভুরুর তলায় রাগী গোলাকার

ঠেলে ওঠা চোখ। বাজপাখির মতো খাড়াই নাক। দৃঢ় ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট। ঠেলে ওঠা চোখ মানেই প্রভুত্বপরায়ণতার লক্ষণ। অনিমেষ রায়কে দেখে প্রথম দর্শনে অধস্তন যে কেউ দমে যাবেই। সারা মুখমণ্ডল জুড়ে এমনই এক বজ্রগাম্ভীর অভিব্যক্তি।

সামনের সোফায় দু'তিন জন বয়স্ক মানুষ। রজত আন্দাজ করলেন, এরা-ই সেই লোকাল নেতার দল। সুতপন আগে আগে, পেছনে মাপা-পায়ে হেঁটে গিয়ে অনিমেষ রায়ের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ান রজত।

অনিমেষ রায় দু'জনের ওপরেই এই ঝলক করে দৃষ্টি ফেলেন। দৃষ্টিটা রজত... সুতপন করতে করতে রজতের মুখের ওপর স্থির হয়ে থেমে যায়। সামনের সোফাখানি ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে অনিমেষ রায় বলেন, 'বসো'। রজত পুতুলের মতো বসেন।

সুতপন বলে, 'এঁকে চিনতে পারছেন তো পিসেমশাই? এ হল রজতদা—'

বাম হাতখানা আলতো নেড়ে সুতপনকে থামিয়ে দেন অনিমেষ রায়। লোকাল নেতাদের বলে 'তোমরা এবার বসে পড়ো এই ব্যাচে। রাত হল।' লোকাল নেতারা বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে পড়েন।

সুতপনের দিকে তাকান অনিমেষ রায়। বলেন, 'এখানে দঁড়িয়ে করছ কী? যাও গেস্টদের দেখভাল করো। আজকের দিনে এটা তোমার আব্বল্ ডিউটি।'

সুতপন চলে যায় তদারকির কাজে। ততক্ষণে আরও ঘামতে শুরু করেছেন রজত। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে একান্ত হতে চাইছেন অনিমেষ রায়। এটাকে পরবর্তী নাটকের প্রস্তুতিপর্ব বলে মনে হয় তাঁর। রজত যেন সহসা ভীষণ একা হয়ে যান। নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ অসহায় লাগতে থাকে তাঁর।

এতক্ষণে রজতের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান অনিমেষ রায়। মোটা ভুরুর তলায় রাগী চোখদুটি এখন স্থির। খুব মৃদু গলায় শুধোন, 'কেমন আছ?'

'ভালোই। আপনি?' বলতে গিয়েই রজত টের পান গলাটা শুকনো লাগছে। একটু জল পেলে ভাল হত।

'ঐ, চলে যাচ্ছে।' একটা নতুন চুরুটে অগ্নিসংযোগ করেন অনিমেষ রায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় টানের ধোঁয়া ছেড়ে দেন। তৃতীয় টানের ধোঁয়াটুকু মুখের মধ্যে কিছুক্ষণ আটকে রেখে তারপর ছাড়তে থাকেন গলগল করে। অকস্মাৎ রজতের দিকে দ্ব্যর্থহীন তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, 'তোমার যেন এই স্টেশনে ক'বছর হল?'

রজতের বুকের মধ্যে আচমকা হাতুড়ির ঘা। খুব মিনমিনে গলায় জবাব দেন, 'বছর দেড়েক।'

'আর কদ্দিন থাকতে হবে?'

রজত খুব অনিশ্চিত চোখে তাকান। বলেন, 'কী করে বলি? মনে হয়, আরও বছর খানেক।'

'এস-পি হতে আর কত দেরি?'

'দেরি আছে। এখনও বছর-তিনেক।'

একমনে চুরুট খেতে থাকেন অনিমেষ রায়। চোখের মণিদুটি নৈশ আকাশের ওপর জ্বলন্ত, স্থির।

একসময় দৃষ্টিটা নামিয়ে আনেন অনিমেষ রায়। একটু একটু করে রজতের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন। দেশ, সমাজ, রাজনীতি...।

খুব সঙ্কোচের সঙ্গে কথা বলছিলেন রজত। গল্পগুজব করছিলেন বটে, কিন্তু মনটা ভয় পাওয়া খরগোসের মতো ত্রস্ত ছিল সারাক্ষণ। মনের মধ্যে টেনশনটা জমাট বাঁধছিল ক্রমশ। রজত প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলেন, অনিমেষ রায় এই বুঝি তুললেন ঐ তিক্ত প্রসঙ্গটা! এই বুঝি ক্ষতস্থানটায় খোঁচা মারলেন! অথচ অনিমেষ রায় ১৩ই ফেব্রুয়ারির প্রসঙ্গটা কিছুতেই তুলছিলেন না। ব্যাপারটা এমনই অস্বস্তিকর আর কষ্টদায়ক যে রজতের টেনশনটা হু-হু বেড়ে যাচ্ছিল। যেন দাঁতের ফাঁকে শক্তগোছের কোনো খাদ্যবস্তু আটকে রয়েছে। এমন কিছু যন্ত্রণা যে তা নয়, কিন্তু কাজকর্ম, ব্যস্ততার মধ্যে জিভটা অজান্তে চলে যাচ্ছে ওখানে, মনটা যেন পড়ে রয়েছে ওখানেই, অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েও রেহাই মিলছে না। কাজেই, অপরাধীরা যেমন মনের তাড়নায় অন্তত একটিবারের জন্য চলে যেতে চায় অকুস্থলের কাছাকাছি, ঠিক তেমনই রজতও পায়ে পায়ে এগোতে থাকেন ১৩ই ফেব্রুয়ারির ঘটনাটির দিকে, এক সময় পৌঁছে যান তাঁর কৃতকর্মের জায়গাটিতে, যাকে পুলিশি ভাষায় বলে, অকুস্থল। একসময় নিজেই প্রসঙ্গটা তোলেন তিনি। বলেন, 'সেদিন যা ঘটে গেল..., পিসেমশাই, আমার অ্যাত্তো খারাপ লাগছে।'

অনিমেষ রায় চকিতে তাকালেন রজতের দিকে। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কোন ব্যাপারটা বলো তো?'

'ঐ যে, সেদিন, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, আইন-অমান্যর দিনে—।'

'ও—।' বলতে বলতে থমথমে হয়ে ওঠে অনিমেষ রায়ের মুখ, 'হ্যাঁ, তা গেল। খুবই ঝঞ্ঝাট গেল।' একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন অনিমেষ রায়। তারপর বলেলেন, 'তোমাদের সার্ভিসে এই জমানায় খুব ঝঞ্ঝাট বেড়েছে, না?'

'হ্যাঁ—। খুবই হ্যাজার্ডাস হয়ে গেছে সার্ভিসটা। এই দেখুন না, সেদিন আচমকা এমন পরিস্থিতি...।'

'হবেই। আরও বাড়বে।' বলতে বলতে বুঝি গাঢ় ভাবনায় ডুবে গেলেন অনিমেষ রায়। সহসা পুনরায় ভেসে উঠে বললেন, 'তোমাদের বর্তমান প্রভুরা সবচেয়ে ঘৃণা করত পুলিশকে। সবচেয়ে বেশি ভোকাল ছিল পুলিশের বিরুদ্ধেই। পুলিশকে আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে কৃষ্ণকায় অংশ বলে মনে করত। এখন পুলিশই ওদের একমাত্র সহায়।'

একটু থামেন অনিমেষ রায়। চুরুটে বার-দুই অন্যমনস্ক টান দেন। তারপর বলেন, 'তুমি তোমাদের সিনিয়র অফিসারদের জিজ্ঞেস করো, এতখানি পুলিশ-নির্ভর সরকার আর কখনোই ছিল না।' বলতে বলতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন অনিমেষ রায়। বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকেন, 'পুলিশ এতখানি ক্ষমতা কোনো দিনই পায়নি। দেখছি তো, জেলায় জেলায় এস-পি-রা যেন এক-একজন অঘোষিত মন্ত্রী। ডি-এম-এর কথা তারা শোনেই না। পাত্তাই দেয় না ডি-এম-কে। বরং ইদানিং তাদের ডিক্টেট করছে। তুমি কী বল? করছে না?'

রজত চুপ করে থাকেন। এসব অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। উচিতও নয়। হাজার আত্মীয় হলেও অনিমেষ রায় একজন বিরোধী দলের পোড় খাওয়া নেতা। তিনি তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশাসনের হাঁড়ির হাল জেনে নেবার চেষ্টা করবেনই।

রজত কথা ঘোরাবার চেষ্টা করেন। বলেন, 'পরিস্থিতি সর্বত্রই বদলাচ্ছে পিসেমশাই। কিন্তু আমি বলছিলাম সেদিনের ব্যাপারটা। বাচ্চাটা যেভাবে চোখের সামনে গুলি খেয়ে..., আসলে, আমি প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলাম, যাতে গুলি চালাতে না হয়, লাঠিধারী পুলিশ সেই কারণেই বেশি সংখ্যায় মোবিলাইজ করেছিলাম। টিয়ারগ্যাসের শেলও অনেক ছিল। ভেবেছিলাম, ওতেই সামলে নিতে পারব। বিশেষ করে আপনি যখন রয়েছেন। রাজ্যস্তরের দায়িত্বশীল নেতা আপনি, মবকে কি অতখানি আনরুলি হতে দেবেন? কিন্তু আচমকা পরিস্থিতি এমনই বদলে গেল, যেভাবে ইটবৃষ্টি শুরু হল, অফিস ভাঙচুর আর গাড়িগুলোতে আগুন লাগানো হল...! তবে গুলি চালাবার আগে আমি সব্বাইকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন কোমরের নিচে চালায়। চালিয়েও ছিল ঐভাবেই। আচমকা ওই ছেলেটা যে কীভাবে গোলাগুলির মধ্যে এসে পড়ল..., কী করে যে গুলিটা ওর বুকে বিঁধল..., আপনি হয়ত ভাবছেন আমরা বুঝি সত্যি সত্যি, ইচ্ছে করেই... তাছাড়া, ঐটুকু এক বাচ্চাকে মেরে আমাদের কী লাভ বলুন! অথচ, ঐটুকু এক কচি বাচ্চা...।

'হুঁ'। থমথমে মুখে চুরুট খেতে থাকেন অনিমেষ রায়। খুব ভেজা গলায় বলেন, 'দ্যাট ওযাজ ভেরি স্যাড। ওর বিধবা মা'টা একেবারে একা হয়ে গেল! তবে আমার কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, ঐ বিশেষ গুলিটা ছুটে এসেছিল তোমার রিভলভার থেকেই।'

রজতের অপরাধের শরীর থেকে 'আমরা'র খোলসটাকে এভাবেই একটানে ছিঁড়ে ফেলেন অনিমেষ রায়। রজত যেন সহসা উদোম, একা হয়ে যান। কিংবা এতক্ষণ 'আমরা'র থেকে রজত যে নিজেকে সামান্য একান্নবর্তী ও নিরাপদ ভাবছিলেন, অনিমেষ রায় সেই আশ্রয়টুকু একটি বাক্যাংশের সাহায্যে নিঃশেষে ধ্বংস করে দেন। রজত নিজেকে নিরাশ্রয়, অসহায় বোধ করেন। করুণ, বিধ্বস্ত কন্ঠে বলে ওঠেন, 'পিসেমশাই, আপনি বিশ্বাস করুন—।'

'বাই দ্য বাই—।' সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন অনিমেষ রায়, 'ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়্যারিটা শেষ হতে আর কত দেরি?'

'ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়্যারি শেষ হয়ে যাবে অল্প দিনের মধ্যেই।' খুব অন্যমনস্ক গলায় বলতে থাকেন রজত, 'কিছু হয়ত হবেও না আমার। কিন্তু ছেলেটা তো তাতে করে বেঁচে উঠবে না। অথচ—।'

রজতের কথাগুলো অনিমেষ রায়ের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। কারণ, তিনি তখন আকাশের দিকে মুখ তুলে একদৃষ্টিতে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখছেন। সহসা দৃষ্টি নামিয়ে বললেন, 'সুতপন বলছিল, তুমি নাকি এককালে কবিতা-টবিতা লিখতে? শোনাও না এক-আধটা। এককালে তো আমিও লিখতুম।'

রজত বুঝতে পারেন, অনিমেষ রায় ঐ তিক্ত প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইছেন। এটা

সম্ভবত তাঁর কাছেও এক শোকের স্মৃতি। তিনিও তো পরের দিন দৌড়ে গিয়েছিলেন ছেলেটার বিধবা মায়ের কাছে। টাকা-পয়সাও কিছু দিয়েছিলেন। শোকের স্মৃতিকে কেইবা চাগিয়ে তুলতে চায়! কিন্তু এই মুহূর্তে রজতের উথাল-পাথাল আবেগ যেন বাধা মানছে না কিছুতেই। অনিমেষ রায়ের দেওয়া বিশেষণগুলো যেন তাঁর শরীরে জোঁকের মতো গেঁথে গিয়েছে। আজ অ্যাদ্দিন বাদে, সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও যদি হেলায় হারান রজত, যদি অনিমেষ রায়ের কাছে বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারির সেই মর্মন্তুদ ঘটনার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পেশ করতে না পারেন, সে খেদ বুঝি তাঁর সারা জীবন রয়ে যাবে। বিশেষ করে, অনিমেষ রায় ওঁর আত্মীয়, এটা জানার পর খেদটা নিঃসন্দেহে আরও বাড়বে।

রজত কবিতার ধারপাশ দিয়ে না গিয়ে বলতে থাকেন, 'আপনার হয়ত মনে হয়েছে' ছেলেটাকে গুলি করবার পর—।'

'ঐ তারাটাকে চেন?' সহসা রজতের কথার মধ্যেই আকাশের দিকে তর্জনী তাক করে শুধোন অনিমেষ রায়।

তারা দেখবার প্রতি তিলমাত্র উৎসাহ ছিল না রজতের। তিনি বলতে থাকেন, 'ছেলেটা যখন চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ল—।'

অনিমেষ রায় কয়েক পলক নিমেষহীন তাকান রজতের দিকে। বলেন, 'ব্যাপারটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছ না, মনে হচ্ছে?' ঈষৎ ভর্ৎসনা ফুটে ওঠে অনিমেষ রায়ের গলায়।

রজত সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। খুব বিচলিত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'আপনি বিশ্বাস করুন, পিসেমশাই, সত্যিই ভুলতে পারছিনে। আপনি আমাকে বর্বর, জহ্লাদ, জানোয়ার যাই ভাবুন না কেন, বাচ্চাটার জন্য আমার সত্যি সত্যিই পরিতাপের সীমা পরিসীমা নেই। আহা, একেবারে ফুলের মতো নিষ্পাপ ছেলেটি, পড়াশুনোয়ও নাকি ভাল ছিল...। আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না পিসেমশাই। আমি নিজেও চিরকাল পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম। ঐ ঘটনার পর থেকে কেবলই ভাবছি, পড়াশুনো করে, ভাল রেজাল্ট করে, কমপিটিটিভ পরীক্ষায় যে পাশ করলাম, সে কি মানুষকে খুন করবার জন্য!'

অনিমেষ রায় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন রজতের দিকে। বাম হাতে দু'আঙুলের ফাঁকে চুরুটখানা নিঃশব্দে জ্বলছিল। তাই দেখে রজত বলেন, 'আপনি হয়ত বা ভাবছেন, আমি সুযোগ পেয়ে কুমিরের কান্না কাঁদছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঐ দিনের পর থেকে আমি ভাল করে খেতে পারিনে, ঘুমোতে পারিনে, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি, যদি কোনোদিন ঐ ছেলেটার বিধবা মা আমার অফিসে চলে আসেন! যদি চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে ফেরৎ চান ছেলেকে!'

অনিমেষ রায় তিলেকের জন্য চোখ সরান না রজতের থেকে। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রজতের মুখের প্রতিটি রেখাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জরিপ করতে থাকে। চুরুটে টান মারবার কথাটাও বুঝি মনে থাকে না তাঁর।

রজত বিড়বিড়িয়ে বলে চলেন, 'আমি ঠিক করে ফেলেছি, যত খারাপ পরিস্থিতিই সৃষ্টি হোক না কেন, গুলি আর চালাব না কিছুতেই।'

অনিমেষ রায় তখনও এক দৃষ্টিতে দেখছিলেন রজতকে। দেখতে দেখতে তাঁর চোখের কোণে চলকে ওঠে চাপা হাসির ঝিলিক। এতক্ষণে চুরুটের কথাটা বুঝি মনে পড়ে তাঁর। একখানা লম্বা টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়েন। তারপর খুব শ্লেষ মাখানো গলায় বলে ওঠেন, 'রিয়েলি! একেবা.ঃ ঠিক করে ফেলেছ? চাকরিটা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলনি তো?' বলতে বলতে সহসা হো-হো করে হেসে ওঠেন অনিমেষ রায়। হাসি থামিয়ে খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলেন, 'পুলিশের এতবড় অফিসার তুমি, মেয়েমানুষের মতো কথা বলতে লজ্জা করছে না তোমার? পুলিশ অফিসার হয়েছ যখন, ডিউটি তো তোমাকে করতেই হবে। নইলে ওপরওয়ালা কি তোমায় মুখ দেখে প্রমোশন দেবে?

'ডিউটি অবশ্যই করব। কিন্তু আমার এই হাত দিয়ে ফায়ার করা আর কখনোই সম্ভব নয়।'

অনিমেষ রায় তখনও মিটিমিটি হাসছিলেন। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকেন, 'তাই নাকি? তাহলে আর কোমরে রিভলভারটা ঝুলিয়ে রাখা কেন? তোমার ডিপার্টমেন্ট থেকে একখানা মাউথ অরগ্যান চেয়ে নিও। বেশ বসে বসে বাজাবে।'

রজত বুঝি নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সহসা অনিমেষ রায়ের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলেন তিনি। দেখেন, অনিমেষের রায়ের ঠেলে ওঠা চোখ দুটিতে অপরিসীম শ্লেষ। আর, চেপে রাখা দুটি ঠোঁটের পিচকিরি দিয়ে খুব সূক্ষ্ম কৌতুক মেশানো হাসি, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মতো ছিটিয়ে চলেছেন রজতের ওপর। ভিজিয়ে দিচ্ছেন রজতের সারা শরীর।

এবং তাঁর হাতের চুরুট থেকে নীলাভ ধোঁয়া সরলরেখায় উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

ঘাতক

১.

গজ বাউরী পাঁঠার চারটি পা' অদ্ভুত কৌশলে খিঁচে ধরতেই 'মা-মা' ডাকটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল পাঁঠার মুখে। আকাশ বাতাস আকুল করা সে ডাক ভেসে ভেসে মিশে গেল শিয়ারবিঁধার রটন্তি-কালীর মন্দিরের বাতাসে।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠল ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘন্টা।

সমুদ্রের মতো শত কন্ঠের গর্জন : মা, মাগো, করালবদনী, নৃমুণ্ডধারিণী। দয়া কর্ মা। তুষ্ট হ'।

করালী বাগ্‌দীর হাতের খাঁড়া হাউইয়ের মতো সাঁই করে উঠে গেল আকাশে। পর মুহূর্তে আছড়ে পড়ল ছাগশিশুর কালো কুচকুচে ঘাড়ের ওপর। মুহূর্তে দু'ফাঁক হলো শরীর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। মুণ্ডু আর ধড় ছিটকে পড়ল দু'দিকে। আর উল্টোদিকে সটান লুটিয়ে পড়ল করালী বাগ্‌দী।

সেটাই ছিল পাঁচশ বাহাত্তরের মধ্যে শেষ পাঁঠা।

ওপাশ থেকে তীরবেগে ছুটে এলো দীর্ঘদিনের সাগরেদ গজ বাউরী। বড় ছেলে রটন্তীপ্রসাদ। রক্তমাখা হাত ওদের। ঐ হাতে রক্তের নদী থেকে ধরাধরি করে তুলল করালীকে। সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শোওয়ালো অল্পদূরে। শুকনো জায়গায়।

জলের ঘটি নিয়ে ছুটে এলো পীতাম্বর মহাপাত্র! রটন্তী-কালীর স্থায়ী পুরোহিত। ওপর থেকে করালীর ওপর জলের ছিটে দিতে লাগল সমানে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়লে লাগল। ওঁ কালী কালী মহাকালী, চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী...। মাগো, জীবের কল্যাণে তুই-ই তো খড়্গরূপিনী হয়ে ছাগের পশুজন্ম বিনাশ করলি মা। ঘাতক তো উপলক্ষ্য মা। ওর সাথে আর ছলনা কেন?

একনাগাড়ে মন্ত্রঃপূত জল ছিটোতে থাকে পীতাম্বর মহাপাত্র। শীতের শেষরাতে ঠাণ্ডা কন্‌কনে জল পেয়ে করালীর শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

চারপাশে অনর্গল গুঞ্জন উঠেছে তখন। কেন অমন্‌টা হলো? এর চেয়ে কতো বেশি বলি দিয়েছে করালী বাগ্‌দী। কোনদিনও তো এমনটি ঘটে নাই। চিরকালই ও বলির আগে যেমনটি, বলির পরেও তেমনটি।

কেউ বলল, 'বুড়া হয়েছে তো। আশির উপর উম্বর। এ বয়েসে রাতভর অতো ধকল সয়?'

'কি কথা বল হে!' ঝাঁঝিয়ে ওঠে বিশ্বাসে-অন্ধ পুটিন্দর রাণা, 'বলি দিতে ফের শরীরের ধকল হয় নাকি? পাঁঠা কি উ কাটে?'

'তেবে?'

'আরে উয়ার সাধ্যি কি, রাতভর হাজার হাজার পাঁঠা একনাগাড়ে কাটে! মায়ের মহিমা ছাড়া কিছো হয়?'

কথাটা অনেকেরই মনে ধরে। অমন পাশবিক শ্রমসাধ্য কম্মোটির পেছনে নির্ঘাৎ কোন অলৌকিক শক্তির সহায়তা রয়েছে. নইলে আশি বছরের হাড়-জিরজিরে বুড়ো, সে কখনও দেড়হাজার পাঁঠা একনাগাড়ে কেটে যেতে পারে? অথচ নেশাভাঙ করে না যে শরীরে বাড়তি বলের যোগান পাবে। এমনিতে চব্বিশ ঘন্টা তাড়ি-পচানীতে আকণ্ঠ হয়ে থাকলেও বলির দিনে সেসব চিজ্ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। অথচ গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের মতন সে ঢুলুঢুলু চোখে সারারাত হেতার তোলে, নাবায়। তোলে, নাবায়। চারপাশে রক্তের নদী বয়ে যায়। গোড়ালি অবধি ভিজে যায়। কিন্তু হাত কাজ করে যায় যন্ত্রের মতন।

এসব দেখেশুনে প্রত্যক্ষদর্শীর মনে বিশ্বাসটা গাঢ় হয়। সত্যি। ঘাতকের আইজ্ঞা কুনোই ক্যাদ্দানি নাই। সব ক্যাদ্দানি যিনি বলি নেন, উয়ারই। উনি স্বয়ং হেতারের উপর ভর করেন। বলির সময় লোহার হেতার জীয়ন্ত হয়ে ওঠে। হেতারের গায়ে আঁকা চোখগুলান্ দেইখেছেন তো? দু'দিকে দু'টা চোখ? বলির টাইমে হেতার উঠানামার তালে তালে চোখের পাতাও খোলে-বোঁজে। তাবাদে যারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে, তারা দেখেছে, দুটো চোখের একটায় রোষ, অন্যটায় টলোমলো জল। শুনে হৈ হৈ করে ওঠে জমায়েত। অনেকেই অমন দুর্লভ দৃশ্য দেখেছে বলে দাবি করে। কেউ কারুর চেয়ে কম যেতে চায় না। বলে, মায়ের দয়া ভিন্ন কেউ ফের এসব পারে? দিন দিন অতো প্রাণী-হত্যার পাপ বইতে পারে একটা মানুষ? মা লিজেই যে লিজ অঙ্গো ধারণ করেন সব পাপ। উয়ার দেব-অঙ্গো সব পাপ গিয়ে লী—ন হইয়েঁ যায়।

পীতাম্বর মহাপাত্র ঠোঁটে বিধ আঙুল ছুঁইয়ে সিঁ-সিঁ শব্দ করে। একদম চুপ করে যাবার ইঙ্গিত সেটা। জমায়েত থম্ মেরে যায়। কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া সব শুনশান্। জলের ছিটে দিতে দিতে করালীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল পীতাম্বর মহাপাত্র। ভ্রু-জোড়া ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল তার। সারা মুখে দুনিয়ার বিস্ময় যেন ঝরে পড়ছিল।

নিঃসাড়ে শুয়েছিল করালী বাগ্দী। চোখদুটি বোঁজা। সাদা গোঁফ-দাড়ি, মাথায় সাদা জটা, রক্তে-ঘামে-কাদায় মাখামাখি। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল শরীরটা। ঠোঁটজোড়াও তিরতির করে কাঁপছিল। বিড়বিড় করে কিছু বলছিল করালী।

পীতাম্বর মহাপাত্র হাঁটু গেড়ে বসে পাশটিতে। মাথা ঝুঁকিয়ে শুনবার চেষ্টা করে করালীর কথাগুলো।

অগ্নি।' অগ্নি। অগ্নি।

এক নাগাড়ে বলে চলেছে করালী। কান পেতে তা শুনছে পীতাম্বর মহাপাত্র।

'কি বইল্ছে?' জনতার উৎসুক প্রশ্ন।

'বলছে, অগ্নি।' নিরাসক্ত গলায় বলে পীতাম্বর মহাপাত্র, 'আগুন চাচ্ছে মুখে। মরণ কামনা কচ্ছে মায়ের কাছে।'

'আহা—! ছেইলা আবদার ধরেছে গো মায়ের পাশ!' ভক্তিতে আপ্লুত পুটিন্দর রানা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে ভেউভেউ করে।

হৈ-চৈ শুনে জমায়েতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণকিশোরের পুরো দলটা।

করালীর মরবার কথা শুনে ওরা হাসে। ইয়ারা-সব বলে কি! মায়ের সাথে কথাবার্তা চলছে করালীর? মরবার তরে মায়ের পাশ বায়না ধরেছে উ?

'আগুনকে অগ্নি বলছে কেন.' কৃষ্ণকিশোর শুধোয়।

পীতাম্বর মহাপাত্রের মুখ বিরক্তিতে ভরে যায়। কথা চলছে স্বয়ং দেবীর সাথে। সে কি চুয়াড়-চাঁড়ালের ভাষায় হবেক্? সে হবেক্ দেবভাষায়।

'দেবভাষা করালী জানে?'

'করালী জানবেক্ ক্যানে? কি সব উজবুকের পারা কথা! যিনি মুককে বাচাল করেন, করালীর মুখে ভাষা জোগাবেন তিনিই।' পীতাম্বর পরম তাচ্ছিল্যে দু'হাত নেড়ে বলে, 'উসব তুমরা বুঝবে নাই হে ছগ্‌রার দল! দু'পাতা ইন্‌জিরি পইড়ে তুমাদ্যার ড্যানক্ গজিয়েছে।'

'বটে তো! দেব মাহাত্ম্য বুঝা সকলের কম্মো লয়।'

'ঠিক। ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ, তক্কে বহু ধুর।'

করালীর অল্প খিঁচুনি উঠেছে ততক্ষণে। কাঠির মতো হাত-পাগুলো ক্রমশ শক্ত হয়ে আসছে।

দেখেশুনে কৃষ্ণকিশোর বলে, 'দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একে বাঁচাতে হলে এক্ষুণি মহেশ ডাক্তারকে ডাকুন। সে এসে কোরামিন-টোরামিন দিক্।'

'কোরামিন!' সামনে যেন ভূত দেখছে পীতাম্বর মহাপাত্র, 'মায়ের সাধনা করতে গিয়ে আচ্ছন্ন হইয়ে পড়েছে ভক্ত, বাহ্য-চেতনা লোপ পেইয়েছে, সমাধি হইয়েছে সাময়িক, তার জ্ঞান ফিরাতে কে কবে কোরামিন ফুঁড়েছে হে?'

'কিন্তু ঐ জ্ঞান যদি না ফেরে, তখন পুরো পুজো-কমিটি ভুগবেন কিন্তু।' কৃষ্ণকিশোর মৃদু হুমকি দেয়।

'জ্ঞান ফিরাবার মালিকই জ্ঞান ফিরাবেন। যিনি জ্ঞানহারিণী, তিনিই জ্ঞানদায়িনী। তুমি-আমি কে হে?'

বলতে বলতে সহসা করালীর দিকে চোখ পড়ে পীতাম্বর মহাপাত্রের। দু'চোখ কপালে উঠে যায়। পাশে বসে থাকা নরেন হাড়িকে বলে, 'এই লরিয়া, দ্যাখ্, দ্যাখ্। করালীটার ভাগ্যিখানা দ্যাখ্।'

লরিয়া হাড়ি কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে করালীর সর্বাঙ্গ। এবং হ্যাজাকবাতির উজ্জ্বল আলোয় দ্যাখে, করালীর সারা শরীরের লোম শজারুর মতো খাড়া হয়ে উঠেছে।

'রোমাঞ্চ! সুগন্ধি স্বেদ!' আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে পীতাম্বর মহাপাত্র, 'শালা বাগ্‌দীর কুলে জনম লিয়ে কুথায় উঠেছে দ্যাখো হে।'

বলতে বলতে পীতাম্বরের সারা শরীর ঠকঠক্ করে কাঁপতে থাকে। হাতের

ঘটিটিকে বাগিয়ে নিয়ে মন্দিরের দিকে ছুটে যায়। কৃষ্ণকিশোর বিড়বিড় করে বলে, 'এ শালা করালী বাগ্‌দীর ডবল নিমুনিয়া কোউ ঠেকাতে পারবেক নাই।'

'অবশ্য যদি জ্ঞানটা ফিরে।'

পীতাম্বর মহাপাত্র ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। হাতে একখানা কাঁসার গেলাস।

করালীর মুখের সামনে গেলাসটা ধরে দেয় পীতাম্বর। 'লে, খেইয়ে ফ্যাল্‌তো বাপ্। মায়ের চন্নামিত্তো। মরা মানুষ বাঁচে।'

ধীরে ধীরে গেলাসভর্তি পঞ্চামৃত করালীকে পান করিয়ে উঠে দাঁড়ায় পীতাম্বর ঠাকুর। দুধ-গুড়-মধু-ঘি এবং মহুয়ার মদের এক পাঁচমেশালি গন্ধে ম' ম' করতে থাকে চারপাশ। এবং খানিকবাদে চোখ খোলে করালী।

প্রথমটা সে কিছুই বুঝতে পারে না। খালি চারপাশে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকায়।

ধীরে ধীরে স্মৃতিটা ফিরে আসে। সবকিছু মনে পড়ে। পাশে বসে থাকা রটন্তীপ্রসাদ আর গজ বাউরীর উপর চোখ পড়ে। ওদের সারামুখে লেগে রয়েছে এক অকৃত্রিম তৃপ্তির হাসি। যেন কোনও অলৌকিক জগৎ থেকে এইমাত্র ফিরে এলো দেবতাদের আশীর্বাদধন্য করালী বাগ্‌দী।

পায়ের দিকে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণকিশোরের দল। ফিক্‌ফিক্ করে হাসছিল।

ওদের অনেকক্ষণ ধরে দেখল করালী। মিনমিনে গলায় বলল, 'সিনানে যাবো মুই।'

'যাবে। এখন টুকচার জিরাও।' করালীর মাথায় হাত বোলাতে থাকে রটন্তীপ্রসাদ।

শুয়ে শুয়ে কৃষ্ণকিশোরের সাথে বার কয়েক চোখাচোখি হলো করালীর। কৃষ্ণকিশোর হাসে। বলে, 'কিগো করালী দাদু, এ যাত্রাও ফিরে এলে তুমি? আমরা ভাবলাম, মরবে।'

সে কথার জবাব দেয় না করালী বাগ্‌দী। উল্টোদিকে পাশ ফিরে শোয়।

এ ছগ্‌রাগুলান মোর মরণ চাচ্ছে! মাঝে মাঝেই বলে, ও করালী দাদু, এবার মর গো। আর কতো প্রাণীর প্রাণোলাশ করে যাবে তুমি? দুনিয়ার কালা পশুগুলান লিরন্তর চেয়ে চেয়ে ক্ষণ গুণছে। কখন্ তুমার মরণ হয়! হুঁঃ, আমার মরণ হলেই কালা পশুগুলান বাঁচবেক্? আমার রটন্তী নাই? রটন্তীপ্রসাদ? আমার আগের তিনপুরুষ কি বেঁচে রয়েছে এখ্‌নতক্? তাবলে কি বলি বন্দো রয়েছে ঠাগ্‌রের থানে? এ হলো বংশের ধারা। ডুলুং নদীর জলের পারা। এক জল বয়ে যায় নীচালীর পানে। অন্য জল সে থান পূরণ করে। ফাঁকা থাকে না তিল-প্রমাণ ঠাঁই।

সত্যি বটে। কামেশ্বর বাগ্‌দীর ছেইলা পুইলা হচ্ছিল নাই। বউটা বাঁজা জীবন বয়ে বেড়ায়। ইখান উখ্যান হত্যা দেয়। পীরের থানে ঢিল বাঁধে। শিয়ারবিঁধার চামুণ্ডা-কালীর থানে 'লিরম্বু' হত্যা দিল তিনদিন তিনরাত। তৃতীয় লিশিতে মা স্বপন দেখালেক : অরে কামেশ্বরিয়ার বউ, তুয়ার মরদকে বল্, মোর থানে ঘাতক হয়ে বলি দিক পশু। তুয়ারা হ' শিয়ারবিঁধার চামুণ্ডা-কালীর ঘাতক বংশ। তুয়ার ভুবনভুলানো ছেইলা হবেক্। তার বাহু হবেক্ কলা গাছের গুঁড়িটি। তার অঙ্গের বর্ণ হবেক্ সোনার পারা। পলাশ পুষ্পের পারা আঁখি। বউয়ের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে কামেশ্বর বাগ্‌দী ছুটল মহাপাত্রের বাড়ি। বিতাং করে বলল সব। সেই বছর রটন্তী-কালীর পুজোয় কামেশ্বর বাগ্‌দী হেতার

তুলল হাতে। আর বছর না ঘুরতেই বউয়ের কোলে ছেইলা। স্বপনের শেষ দিকটা অবশ্যি পুরাপুরি মিলে নাই। কলাগাছের মতন বাহু হলো বটে, কিন্তু গায়ের রঙ ভুষা কালির পারা। বউ বলল, 'ঠিক শুইনেছিলাম মুই। সোনার বন্নো হবেক্।'

কামেশ্বর বলে, 'দুশ্ শালী! তিনদিন তিরাত উপবাস। আধাচেতনে কি শুনতে কি শুইনেছিস্।'

বউ ভাবে, হবেক্ও বা!

সেই কামেশ্বর বাগ্দী হলো করালীর ঠাকুদ্দার বাপ। চামুণ্ডা-কালীর থানে হত্যা দিয়ে পাওয়া ছেলে। নরনারায়ণ মহাপাত্র বাতলে দিলেক ছেলের নাম। চামুণ্ডাপ্রসাদ।

চামুণ্ডা বাগ্দীর ছিল তিন ছেলে। একটা জন্মপাগল ছিল। মেজোটি বাল্যকাল থেকে নিরুদ্দেশ। শোনা যায়, গড়বেতার দিকে কোথায় যেন ডেরা বেঁধেছিল। বিয়ে থাও করেছিল। তার বংশও এখন ওই দিকের কোন্ এক ঠাকুরের ঘাতক। ছোট ছেলে কদম বাগ্দী। শিয়ারবিঁধায় সেই চালিয়ে যাচ্ছিল ঘাতক বংশের ধারা। কদম বাগদীর একমাত্র ছেলে করালী। তার এখন চার কুড়ির উপর উম্বর।

চার কুড়ি! অতো? করালীর নিজের সেটা বিশ্বাস হয় না। এ হলো, উই লিরন্তর মরণ-চাওয়া ছগ্‌রাগুলার রটনা। ভাবতে ভাবতে নিজের গায়ে হাত বুলোতে থাকে করালী বাগ্দী।

গায়ের শুখা চাম, যেন চোত-বোশেখের আমশি। কুঁচকে কুঁক্‌ড়ে সে চামের গায়ে এখন অজস্র খাল-খোবর। তার মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য। যেন সোসর বালির ওপরে অবিরাম হেঁটে চলে বেড়িয়েছে শয়ে শয়ে লাল পিঁপড়া। ঐ কোঁচকানো কারুকার্যের ফাঁকে ফাঁকে খড়ি ফুটেছে সাদা হয়ে যেন শুখা দিনের আমসির গায়ে নুন জমেছে। শরীরময় অসংখ্য ছোটো বড় শিরা উপশিরা চামড়া ঠেলে উঠেছে। শিরার মাঝে মাঝে গিঁট। যেন হাতে-পায়ে তেঁতুল বীচির মালা। হাতে-পায়ে কোনও আঙুলেই নখ নেই। ক্ষয়ে পচে সব সাফ। দু'পায়ের চামড়ায় অজস্র ফাট। কালো ময়লা জমেছে ফাটের মধ্যে। হাতের বুড়া আঙুলদুটো যেন এক-একটি কাছিমের মুণ্ডু।

কৃষ্ণকিশোর শিয়ারবিঁধা ইস্কুলের মাস্টার। করালীর হাতের বুড়ো আঙুলগুলো দেখে বলে, 'এ হচ্ছে খুনীর হাতের আঙুল। মাথায় বেঢপ মোটা। গোড়োয় সরু।'

শুনে, ক্ষেপে টং হয়ে যায় করালী বাগ্দী।

২.

পীচ রাস্তাটা ঝাড়েক্‌গ্রাম থেকে এসে চলে গেছে ফুলকুসমার দিকে। বাঁ দিকে একটা বোল্ডার বিছানো রাস্তা ডুংরীর গায়ে গায়ে সাপের মতো উঠেছে। চলে গেছে একেবারে কাঁকরাঝোর।

শিয়ারবিঁধা মোড়ের মাথায় মউল গাছটার তলায় গণপতির চায়ের দোকান। দুনিয়ার যত ছগ্‌রার জমায়েত এখানে। ফুলুরী দিয়ে চা খায়। কলকল কথা কয়। ইস্কুলের মাস্টার কৃষ্ণকিশোর সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে একটা খবরের কাগজ এনেছে দোকানে। পালা করে কাগজ পড়ে সবাই। মাঝে মাঝে কোনও এক খবর নিয়ে তুমুল তর্কে মেতে ওঠে।

আজ করালী বাগ্‌দীর দিনটা প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে খারাপভাবে। ঘর থেকে বেরোবার মুখেই শরীরটা গুলিয়ে উঠল। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। বার দুই পাতলা বাহ্যিও হয়ে গেল। তার মধ্যেই গুটিগুটি রওনা দিয়েছিল করালী বাগ্‌দী। না দিয়ে উপায় আছে? মায়ের পূজা বলে কথা!

ঐ অবস্থায় হেঁটে হেঁটে করালী বাগ্‌দী কোনক্রমে পৌঁছেছিল ঐ মউল গাছতক্! ঐখানেই নেতিয়ে পড়েছিল গাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে।

ছগ্‌রার দল হৈ হৈ করে ছুটে এসেছিল। বুকে মাথায় জল চাপড়েছিল। কয়েক চোল খাইয়েওছিল! অল্প সুস্থ বোধ করছিল করালী বাগ্‌দী। গাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে হাঁফাতে লেগেছিল। বুকখানা ওঠানামা করছিল হাঁপরের মতো।

দুলাল শুধোয়, 'এই ঠায়-দুফোরে কুথা যাবে গো করালী দাদু?'

'জানিস নাই তুই?' শুকুর প্রধান অবাক হয়, 'আজ শিয়ারবিঁধায় রটন্তী-কালীর পূজা লয়? করালী দাদু চলেছে বলি দিতে।'

শুনেই কল্‌কল্ করে উঠেছিল ছগরার দল।

'করালী দাদু, ইবার তুমি মর।'

কিন্তু জবাব দেবে কি, তখন আর চোখদুটোকেই কোনওমতে খুলে রাখতে পারছে না করালী বাগ্‌দী। কি যেন একটা হচ্ছে মাথার মধ্যে। শরীরের এ'পাড়ায় ও'পাড়ায় অনেক উপসর্গ ঘাই মারে ইদানীং। দু'হাত যখন-তখন ঝিমঝিম করতে থাকে। পিসাব্ বসে উঠবার কালে ঝাঁ করে মাথা ঘুরে যায়।

মাথার ওপর সুয্যিখানা ঝুলছে। মোড় থেকে রটন্তী-কালীর থান আধ ক্রোশও নয়। করালী বাগ্‌দী বসে বসে শুধুই ভাবছিল। এই স্বল্প পথটুকু সে অতিক্রম করতে পারবে তো সন্ধিপূজার আগে!

ঠিক এমনি সংকটের কালে অগ্নির কথা মনে পড়ে। কোথায় আছে অগ্নি! কার ঘরের ঘরণী হয়ে রাজ-রাজেশ্বরীর মতো সংসার ধর্ম পালন করছে, কে জানে!

তামাইজুড়ির দিক থেকে হনহনিয়ে আসছিল জ্ঞান ঘোষ। গজগজ করছিল সমানে।

'জ্ঞান কাকা গো—' চায়ের দোকান থেকে ডাক পাড়ল কৃষ্ণকিশোর, 'কুখেকে এলে এই ভরদুপুরে?'

রাগে ফুলতে ফুলতে পাশে এসে দাঁড়াল জ্ঞান ঘোষ।

বলল, 'দ্যাখো দেখি, একটা ফাল্ বানাতে দিয়েছিল্যাম তামাজুড়ির হাড়ো কামারের পাশ। ত' আজ দশদিন ঘুরাচ্ছে। এ বেলা গেলে, উ বেলা এসো। উ বেলা গেলে, সে বেলা এসো। আজ বলেছিল, দিবেক্ই। গেলাম। ত', বল্‌লেক্, আজ হবেক্ নাই। আজ নাকি বলির হেতার বানাচ্ছে। কাল বেলপাহাড়ী না কুথায় যেন পূজা। এদিকে তিল বুনবার সময় বয়ে যায়!'

'তো এর জন্য অতো রাগ করবার কি আছে গো?' কৃষ্ণকিশোর যেন অল্প বিস্মিত, 'এ'তো দুনিয়ার চিরকালের নিয়ম। চাষের ফালের বদলে চিরকালই তো আগেভাগে বলির হেতারটা বানিয়েছে সব যুগের কামার।'

এ মাস্টারটা বড় রহস্যময় কথা কয়। ঘাড় তুলে মাস্টারকে দ্যাখে করালী বাগ্‌দী। সব সময় উয়ার সব কথার 'কুড়' খুঁজে পাওয়া দায়।

কৃষ্ণকিশোর বলে, 'এই ধরো, যে মানুষ-জাত কোটি কোটি টাকা খরচা করে মানুষ মারবার হেতার বানাচ্ছে, সে কিন্তু আজতক্ক করালী দাদুর গায়ের উই সামান্য ঘা'গুলা সারাতে পারে নাই।'

শরীরের ঘা'গুলোর কথা এতক্ষণ ভুলে ছিল করালী বাগ্‌দী। কথাটা শোনা মাত্র শরীরের খাঁজে খাঁজে চুলকুনি শুরু হলো। করালী বাগদী দু'হাত দিয়ে পাগলের মতো চুলকাতে লাগল সর্বাঙ্গ। অঙ্গময় চাকাচাকা দাগ। ঘা। বর্ষায় আরও দগদগিয়ে ওঠে। অন্য মরসুমে টুকচান ঘুমায়। কেউ বলে দাদ। কিন্তু এ দাদ নয়। এ অন্যরকম। দহিজুড়ির শশধর কোবরাজ বলে, একজিমা। করালীটার বড় শক্ত জাতের। সারা কঠিন। যদিও বা সারে সময় লিবেক ঢের। সারবার পরেও ঘটবে আরও এক বিপত্তি। বাঘকে খেদাড়ে সেই বাসায় হবেক্ ঘোষের বসবাস। এক্‌জিমার বদলে হবেক্ হাঁপানী। সে আর ইহ জন্মে দেহ ছের্ড়ে যাবার লয়।

ছগ্‌রার দল বলে, 'চর্মরোগ তো হবেক্‌ই। উই শরীরে কম পশুরক্ত সারা জীবনে মেখেছে করালী বাগদী। কম কাঁচা রক্ত পান করেছে বলির পর?'

এদের আলোচনার উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। দেশ-মহাদেশের গন্ডী পেরিয়ে এরা চষে বেড়ায় বিশ্বভুবন। বর্তমান থেকে এগিয়ে পিছিয়ে ওরা বারবার ঘা' মারতে থাকে অতীত আর ভবিষ্যতের দরজায়। কোন্ দেশে নাকি আজ দশ বছর চলছে খরা এবং দুর্ভিক্ষ। অনাহারে পিপাসায় আর বন্দুকের গুলিতে মরেছে কয়েক হাজার মানুষ।

'অথচ হিসেব কষে দেখা গেছে—' কৃষ্ণকিশোর বলে, 'একখানা বন্দুকের গুলি বানানোর যা খরচ, তাতে নাকি ছ'খানা বড় সাইজের রুটি কেনা যায়।'

এ মাস্টারটার মুখে যত আজব কথা শুনতো পারো! এই তো কিছুদিন আগে, ওর তরেই শিয়ারবিঁধা গাঁয়ে ষোলআনার মিটিং বসেছিল। ইস্কুলের বই না পড়িয়ে মাস্টার নাকি ছেলেদের সামনে বলির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছিল। কোন্ দেশের কোন্ এক কালো কবিকে যারা ফাঁসিতে লটকাল, তাদের সাথে পীতাম্বর মহাপাত্র আর করালী বাগদীর তুলনা করছিল। শুনেই ক্ষেপে বোম্ হয়ে গিয়েছিল শিয়ারবিঁধার প্রাচীন ব্যক্তিবর্গ। এ কি কথা! তুমি মাস্টার। ছাত্রদের পিতৃতুল্য। তুমি উয়াদ্যার বিদ্যা শিক্ষা দিবে। ইখ্যেনে 'পলিটিস্' করতে তুমাকে পাঠিয়েছে গরমেট্?

পীতাম্বর মহাপাত্র ছাতিতে চাপড় মেরে বলেছিল, 'টেনেস্‌ফার কইরে দুবো হে—'

গাঁয়ের ছোকরারা পেছনে থাকায় সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল কৃষ্ণকিশোর।

কিন্তু স্বভাব কি কারুর যায়?

দিনসাতেক আগে রটন্তী-কালী পূজা উপলক্ষ্যে ষোলআনার মিটিং বসল। আচমকা গাঁয়ের ছগ্‌রাগুলোকে জুটিয়েপুটিয়ে কৃষ্ণকিশোর সেখানে হাজির। কি? না, বলি বন্ধ করতে হবেক্।

বলি বন্ধ করবার কথায় বুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাগে পীতাম্বর মহাপাত্রর। সে তেতে উঠে বলেছিল, 'তুয়ারা বললেই কি বন্ধ হবেক্? চোদ্দ পুরুষের বিধি ইট্যা!'

গাঁয়ের মুখ্যিয়া শিরোমণি লায়েক। পীতাম্বরকে ঠাণ্ডা করে সে। কৃষ্ণকিশোরকে আদর করে বসায় পাশটিতে। বলে, ইবার বলুন তো মাস্টার, বলিতে অতো আপত্তি কিসের?

'বড় আদিম প্রথা ওটা। বড় আসুরিক!' কৃষ্ণকিশোরের সাফ সাফ জবাব, 'শত শত হাজার হাজার অবোলা জীবকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ্যে মারা হচ্ছে, এ ভারি নারকীয় দৃশ্য। বিশেষ করে বাচ্চাদের মনের বড় ক্ষতি হয়।'

'তুমি মাস্টার। মাস্টারের মতন থাকো হে।' ফের তেতে ওঠে পীতাম্বর মহাপাত্র, 'আদার ব্যাপারী তুমি। জাহাজের খোঁজে তুমার দরকার নাই।'

'আছে।' শক্ত গলায় জবাব দেয় কৃষ্ণকিশোর, 'বাচ্চাগুলোকে তৈরি করবার ভার আমার উপরই দিয়েছেন আপনারা। দিয়েছে সরকার। কাজেই, ওদের ক্ষতিটা আমাকে দেখতে হয়।

'দ্যাখ্যো—।' পীতাম্বর ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'বামুনের ছেইলা তুমি। লিখাপড়া করেছো। তুমি যদি হেন কথা বল—। বলি কিসের তবে দিবা হয় জান তুমি?'

'কিসের তরে ফের। বিনা পইসায় মদো-মাতালদ্যার মাংস খাবার ধান্দা ইট্যা।' পেছন থেকে ছগ্‌রাদের কে যেন বলল কথাটা।

'কে বটে? কে বললি কথাটো?' ভিড়ের মধ্যে রাগী চোখদুটোকে ছোটাতে থাকে পীতাম্বর মহাপাত্র, 'ইস্! দু'পাতা ইন্‌জিরি পইড়ে আশ্‌শুলা হয়েছেন পাখি!'

রাগে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে পীতাম্বর মহাপাত্র।

শিয়ারবিঁধা কালীর থানে বলি অবশ্যি অঢেল হয়। বলির পর পিছলি-চাল একখানা পূজা 'কুমেটি'কে দিতে হয়। ধড়খানা লিয়ে যায় ব্রতী। মুণ্ডুগুলো পায় পীতাম্বর আর করালী। সেটা ফের ভাগাভাগি হয় চেলাদের মধ্যে। বলি তো আর একলার দ্বারা হয় না। করালী তো কেবল হেতার বাগিয়ে খাড়া থাকে। পশুকে হাড়িকাঠে সেঁধানো, উয়ার ঠ্যাং চারটি পেছন থেকে খিঁচে ধরা, বলির পর মুণ্ডুগুলো গুছিয়ে রাখা, কাটা গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরোনো রক্তের ধারায় ক্ষিপ্রহাতে মাটির মালসা পেতে দেওয়া—এসবের জন্য অন্তত জনা-দুই চেলা লাগে। পূজার জোগাড় যন্তরের জন্য পীতাম্বরেরও থাকে জনা-দু'তিন জোগাড়দার। সব মিলিয়ে আট-দশ জনের মধ্যে ভাগাভাগি হয় সে মুণ্ডু। অবশ্য সমান ভাগে নয়। কিন্তু পাঁচ-ছশো মুণ্ডু, যেভাবেই ভাগাভাগি হোক না কেন, প্রত্যেকে যথেষ্ট পায়। সেই সুবাদে বলির পরে ক'দিন মাংস খায় করালীরা। বন্ধু-স্বজনদের ডেকে এনে খাওয়ায়। শীতকালে পুজো, তাই রক্ষে। নইলে তিন-চার বেলা রাখা যেত না ঐ মাংস। বলির মাংস বিকতে নাই। কাজেই, একে ওকে বিলিয়ে দিতে হয়। লাভের গুঁড় পিঁপড়ের খায়।

তা না হয় হলো। বছরে পার্বণের ক'টা দিন মাংসটাংস খাওয়া যায়। তাই বলে শুধু মাংস খাবার লালসায় এ বলি, অমন কথা মুখ ফুটে বলে কেউ? একি শুধু পাঁঠাটাকে এক কোপে কেটে ফেলা? এ হলো জ্ঞানখড়্গ দিয়ে প্রবৃত্তির বিনাশ। কত তার নিয়ম। কত তার উপাচার। প্রথমে খড়্গটাকে সিনান করাতে লাগে। তার গায়ে চোখ আঁকতে হয়। এক অক্ষরী বীজমন্ত্র লিখতে হয়। পূজা করতে হয় হেতারকে। ওঁ

হ্রীং কালী কালী বজ্রেশ্বরী লোহদণ্ডায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব শক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ। ওঁ খড়্গায় খরধারায় শক্তি কার্যার্থ তৎপর, / পশুচ্ছেদ ত্বয়া শীঘ্র, খড়্গানাথ নমস্তুতে। শুধু হেতার লয়, পূজা করতে হয় অন্য 'আবরণ' দেবতাদেরও। মহাদেব, ঘোটক, মুণ্ডমালা, পানপাত্র, ডাকিনী-যোগিনী, শিবা—সবাইকে। মায়ের থানে পূজা পড়ে ব্রতীর কল্যাণে। ঘাতকের নামেও পূজা পড়ে। মা গো, ঘাতক তুমার আদেশে কাজ করছে মা। উয়ার যেন কোনও অকল্যাণ না হয়।

বলির পরেও কত ক্রিয়াকাণ্ড! প্রথমে পশুটির ঘাড় থেকে একগুচ্ছ লোম কেটে মাটির মালসায় রাখা হয়। সাথে থাকে পাকাকলা। বলির পর পশুর রক্ত ঐ মালসায় ধরে রাখা হয়। ঐ রক্ত বটুক ঠাকুরের নামে নিবেদন করা হয়। আরও আছে। প্রথমে পশুর শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে একশো-আটখান্ খণ্ড নিয়ে বিভিন্ন বীজমন্ত্রসহ সেগুলো হোমাগ্নিতে আহূতি দেওয়া হয়।

'এ শুধু পাঁঠা কেটে মাংস খাওয়া লয় হে।' পীতাম্বর মহাপাত্র ভক্তিভাবে গদগদ হয়ে বলে, 'এ হলো শাস্ত্র মাফিক ক্রিয়াকর্ম। উপরওয়ালার সাধনা।'

'উপরওয়ালাকে দেইখেছো তুমি?' পেছন থেকে ইলচি কাটে শুকুর প্রধান।

'উয়াকে কী ফের দেখা যায়? উনি কি চর্মচক্ষে দৃশ্যমান?'

'দ্যাখো নাই, তবু বলছো, আছে? বুদ্ধু আর কাকে বলে!'

দু'দিনের ছগ্‌রার অমন পাকা পাকা কথা শুনে ক্ষেপে যায় পীতাম্বর মহাপাত্র। বলে, 'যাকে বাপ বলে ডাকিস্, সে যখন বাপের কম্মোটি কচ্ছিল, তখন কুন ঝোপের আড়ে খাড়া হয়ে তা দেখেছিলি বাপ্? তাইলে বল্, উয়ার ঔরসে জনম্, সিট্যা যখন দেখি নাই, তখন বাপ্‌কে বাপ বলে নাই মানবো। বল্।' কাঁধের গামছাটাকে বার-দুই সামনে ঝাড়ে পীতাম্বর মহাপাত্র, 'হুঃ। দুনিয়ার সব-কিছো দেখলে তবে বিশ্বাস করবেক্ এই অর্বাচীনের দল!'

ছগ্‌রাগুলোকে মোক্ষম যুক্তিতে একেবারে কুপোকাত করে দেবার সুবাদে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ পেতে থাকে পীতাম্বর। অকারণে ঘন ঘন দুলতে থাকে।

ছগ্‌রার দল বড়ই বেয়াড়া।

ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'বাপকে বাপ বলে মানি কিংবা না মানি, এ বছর বলি দিলে মানবো নাই আমরা।'

'দিলে কি করবি শুনি?'

'সে তখন দেখতে পাবে। আগে থেকে নাই বলবো।

এদের আস্ফালনে বুকের মধ্যে বাঁশাপাতার কাঁপন ওঠে। তবুও সাহসে বুকখান্ বাঁধতেই হয়। এ দুনিয়ার বেঁচে বর্তে থাকতে হলে একটি ভাবকে সর্বদা চাগিয়ে রাখতে হয় : আমি মরতে ভাই পাই না, সেই কারণে আমি কোনও শালাকেই ভয় করি না।

ঐ ভাবে তাড়িত হয়ে পীতাম্বর মহাপাত্র হুঙ্কার ছাড়ে, 'যা, যাহ্। যা কইর্‌বার করিস্। মা চামুণ্ডার চরণে যদি মতি থাকে, তবে তুয়ারা মোর ছিঁড়বি।'

৩.

করালী বাগ্‌দী ইদানীং খাটাবাটা করতে পারে না। সারাদিন কেবল হাঁফায়। শুধু বলির সময়টুকু সে আশ্চর্য রকমের চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

যে দ্যাখে সে অবাক হয়। কী করে যে ঐ বুড়ো হাড়ে ভেল্কি লাগায় মানুষটা!

করালী বাগ্‌দী শোনে, আর মনে মনে হাসে।

কি বলি দেখেছে ইয়ারা! পাঁচ-ছশো বলি দেখে ভিরমি খায়! বলি হতো সাঁতড়ার ভূইঞাদের গড়ে। সিংহবাহিনীর থানে। ছাগ-মোষ দু'হাজার পেরিয়ে যেত। মোষের ঘাড়ে খাঁটি গাওয়া ঘি' মালিশ করা চলত সাতদিন আগে থেকে। তার জন্য হাড়িকাঠ, হেতার—সব আলাদা। সে হেতার ঘাতক ছাড়া কেউ তুলতেই পারত নাই। করালীর মামার বংশ ছিল উখানকার ঘাতক বংশ। সিংহবাহিনীর থানে ওরাই বলি দিত মোষ।

এসব কথা আজকালের ছগ্‌রারা মানবেক নেই। করালী জানে। আসলে আগের দিনের মানুষের বিশ্বাসটা বড় গাঢ় ছিল! দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল। দেবতারাও সে যুগে কৃপা পরবশ হয়ে উয়াদ্যার মহিমা দেখাত মানুষকে। এ যুগে সবকিছু কেমন যেন ফিকে হয়ে এসেছে।

তবুও আছে। কিছো কিছো আছে। এখনও ঐ বিশ্বাসের ঘোরে মানুষ আসে করালীর দুয়োরে।

করালীর বাড়ির সুমুখে এক চিলতে উঠোন। মাঝখানে এক ঝাপুড়ঝুপা বন-তুলসীর গাছ। অজস্র জটা তার। উঠোনের এক কোণে একটি লঙ্কাজবার গাছ। প্রায় বারো মাসই ফুল ফোটে। উঠোনটাকে সারাক্ষণ ঝাঁটপাট দিয়ে ঝকঝকে করে রাখে করালী।

দীর্ঘকাল বোধকরি দাড়ি-গোঁফ কামায়নি করালী। মাথায় তেল পড়েনি বহুকাল। শনের মতো সাদা চুল, দাড়ি-গোঁফ—সব মিলিয়ে সে এক কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা তার।

মাটির দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গি। তাতে মা কালীর বহু প্রাচীন ফটো। ধুলো, ধুঁয়ো, সিঁদুরে, তেলচিটে একাকার। ফটোর তলায় শুকনো জবা ফুলের ডাঁই। করালী জানে, ঐ শুকনো ফুলের কতো দাম।

বহুকাল ধোর লাল ছাড়া অন্য কোনও রঙের কাপড় পরেনি সে। লাল কাপড়ে রক্তের ছিটে বোঝা যায় না। ওর সাদা জটা, দাড়ি-গোঁফের সাথে লাল বস্ত্র এবং মুখের কোঁচকানো চামড়ার কারুকার্য মিশে করালী আকারে অবয়বে এক ভয়ঙ্কর জীব।

পীতাম্বর মহাপাত্র কোনকালে ওকে শিখিয়ে দিয়েছিল গুটিকয় কথা। আজও প্রবল জেরার মুখে পড়লে করালী ঐ কথাগুলো আউড়ে যায় তোতা পাখির মতো।

ছগ্‌রার দল বলে, 'করালী দাদু, প্রাণীহত্যা মহাপাপ। উটা ছেড়ে দাও তুমি?'

করালী বলে, 'বলি লয় আইজ্ঞা। বলির মাধ্যমে মায়ের সাধনা।'

'প্রাণীহত্যা করে সাধনা করিস তুই?'

ঘোর মাখানো চোখে হাসে করালী। বলে, 'এ দুনিয়ায় সাধনা কি এক প্রকারের আইজ্ঞা? সাধনার প্রকার ভেদ আছে। কেউ বাঁশি দিয়ে সাধনা করে। কেউ অসি দিয়ে। আমার আইজ্ঞা অসি দিয়ে সাধনা।'

এইসব কারণে অনেকে বিশ্বাস করে, শুধু ঘাতকই নয়, করালী গোপনে গোপনে তন্ত্রসাধনাও করে। এবং খানিকটা সিদ্ধিলাভও সে করেছে। কাজেই প্রতি মঙ্গলবার, শনিবার তার কাঁড়াডুবার উঠোন ভরে যায়। গোপন রোগব্যাধি, মামলা, কন্যার বিবাহ, পুত্রলাভ, বন্ধ্যাত্বনাশ, ভ্রূণবিনাশ—কতো কারণেই যে মানুষ ভিড় করে করালীর উঠোনে! মায়ের পায়ের শুকনো ফুলের কুচি নিয়ে চলে যায় ভক্তিভরে। মাদুলিতে ভরে.

ধারণ করে। হাজার ছাগ বলি দেওয়া হেতার বড় মূল্যবান চিজ। সেই হেতারের একটুকরো কেটে নিয়ে মাদুলি করে ধারণ করলে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধি সেরে যাবেক্। করালীর ঘরে ওরকম হেতার রয়েছে তিনচারটা। ফি' শনি-মঙ্গলবার ওর থেকে একটু একটু কেটে সে বিতরণ করে। মূল্যটা ধরে নেয় প্রণামীর সাথে।

ইদানিং করালীর মনে একটি বাসনা জেগেছে। ঘরের সামনে মায়ের একটি মন্দির বানাবে। কুলুঙ্গি থেকে মা'কে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে মন্দিরে। চারপাশে অত নাম যে মায়ের, তার কি কুলুঙ্গিতে বসবাস শোভা পায়? দু'একজন বাছাবাছা ভক্তকে সে মনের বাসনাটা নিবেদন করেছে। আশাও পেয়েছে। দেখা যাক। মনে মনে বড় আশা করালীর। মায়ের একটা পাকাপাকি থান হলে ভক্ত সমাগমও বাড়বে। মায়ের সামনে বসে ওষুধ বিলোবে করালী। অস্ত্রজাত ওষুধ। সেই ধারা চালিয়ে যাবে ছেলে রটন্তীপ্রসাদ। তার ছেলে। এখনই কুলঙ্গির কালীকে লোকে ডাকতে লেগেছে, 'করালী কালী'। এ নাম ছড়িয়ে পড়বে দেশে দেশান্তরে। মায়ের সাথে সাথে বিশ্বভুবন ছড়িয়ে পড়বে করালী বাগ্‌দীর নামও।

এসব সাত-সতেরো কথার মধ্যেই চোখের সামনে ভাসতে থাকে অগ্নির মুখ। তেমন আর একটি মুখ এ জীবনেও আর দেখল নাই করালী। অগ্নি বড় ভালোবাসতো করালীকে। কিন্তু বড় তেজ ছিল মেয়ার। বড় একগুঁয়ে জেদ ছিল। টো-টো করে পাড়াময় ঘুরে বেড়াত। এর-ওর পিছু লাগত। জ্বালিয়ে মারত সবাইকে। কেবল বশ মানতো একটি মানুষের কাছে। করালী। করালী তখন নবীন যুবা। তার সারা শরীরে সাপের মতো পেঁচানো পেশী। সর্বদাই যেন লকলক করত। কোমর ছিল সিংহের মতো সরু। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলের রাশ। নিশুতরাতে বাঁশি বাজিয়ে শোনাত অগ্নিকে। সারাদিন হাজার দস্যিপনা করেছে যে মেয়ে, পিঠের ওপর ছড়ি ভেঙে দু'টুকরো করেও যাকে চেৎ মানানো যায়নি, করালীর বাঁশির সামনে ফণা নাবিয়ে নেতিয়ে পড়েছে সে। একেবারে গলে জল হয়ে গিয়েছে। তখন তো ভারি সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারত করালী। তখন তার হাতে ছিল অসির বদলে বাঁশি। ঐ বাঁশি দিয়ে সে হাজার জনের জমায়েতকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দিয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা। বাবুরা বাহবা দিয়েছেন, ইনাম দিয়েছেন। গোলকের বাজন দলে ভর্তি হয়েছে সে। দলের বায়না বেড়ে গেছে। বাজন-দলের সাথে দুর-দূরান্তে চলে গেছে করালী। নিজের ঘরে তালাইয়ের ওপর শুয়ে শুয়ে ঠা-ঠা দুপুরে কিংবা নিশুতরাতে একলাটি চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে অগ্নি। করালীকে নিয়ে মনের মধ্যে হাজার রকমের উবুর-ডুবুর খেলেছে।

সে বড় সুখের দিন ছিল। বড় মিষ্টি বেদনার দিন।

একদিন বাদ সাধল করালীর বাপ।

করালীকে ডেকে বলল, 'বাপ আমার, বুড়া হল্যাম। ধকল আর সইতে লারি। এবার মোর ঘাড়ের বোঝা নিজের ঘাড়ে লাও। বংশের ধারা যেন না থামে।'

অগ্নি শুনে রেগে কাঁই। বলে, 'খবরদার। বলি দিতে নাই যাবে তুমি। জীবহত্যা মহাপাপ।'

একি কথা! করালী হতভম্ব হয়ে যায়। ঐ টুকুন মেয়া কয় কি?'

অগ্নি করালীকে বোঝায়, 'মা ফের বলি ল্যায়? যখন বলি হয়, মা তখন মুখ ঘুইরে রাখে উল্টাদিকে।'

এ কি কথা শুনায় এ মেয়া! এ কি আচানক কথা! কিন্তু অগ্নির কথা মানবার উপায় ছিল না করালীর। কৌলিক প্রথা থেকে সরে আসবার উপায় ছিল না। বুকে ছিল দুরন্ত ভয়। পাকে পাকে জড়ানো আজন্মের সংস্কার।

একদিন বাঁশিকে বিসর্জন দিয়ে হাতে অসি তুলে নিল করালী।

চরম রোষে অগ্নি বলেছিল, 'তুই হাতে হেতার ধরলি। মোর সাথে তুয়ার সম্পর্ক ঘুচল্যাক্।'

সেই থেকে অগ্নি গাঁ ছাড়ল। আর ফিরল না। খাতরার দিকে কোথায় যেন তার মাসির বাড়ি। সেখানেই বসবাস জুড়ল সে।

অগ্নি আজ কোথায় আছে কে জানে? কেমন যে আছে অগ্নি! তার অগ্নি! বাঁশির বদলে অসি হাতে তুলে নিয়ে প্রথম যে প্রাণীটিকে বলি দিয়েছিল সে।

যাবার বেলায় করালী ছলছল চোখে শুধিয়েছিল, 'আর ফিরবি নাই?'

ভারি করুণ চোখে হেসেছিল অগ্নি। বলেছিল, 'ফিরবো। যদি কুনোদিন বাঁশি দিয়ে ফের ডাকিস্।'

সে বাঁশি আর জীবনে কোনওদিনও ধরা হলো না করালীর। ভারি ভারি হেতারগুলো আজীবন টেঁসে রইল হাতে।

অগ্নিকে আর ফেরানো হলো না।

তবুও জীবনের এই শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অগ্নিকেই সারাক্ষণ মনে পড়ে। ওর মুখখানিই বার বার ঘাই মারে। ভাঙাচোরা মনের মধ্যে রুপোলী ফলুইয়ের দল পিঠ ওলটায় বার বার!

নিজের ঘরের মাটির দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট আয়না বসিয়েছে করালী। ঝলা কাচ। চারপাশটা মাটি দিয়ে লেপে দিয়েছে। ঘসা আয়নার পারদ মাঝে মাঝে উঠে গিয়েছে। সেই জায়গাগুলোতে শুধুই কাচ। রোজ চানের পর ঐ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় করালী। মাথা আঁচড়ায়। সেই ফাঁকে নিজের মুখখানাকেও জরীপ করে। আয়নার পারদহীন জায়গাগুলোতে করালীর মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না। ফলে আয়নায় মুখের কিছু অংশ অদৃশ্য হয়ে থাকে।

রোজ অন্তত একটিবার ঐ আয়নার সুমুখে নিজেকে হাজির করে করালী। অগ্নির জন্য মন খারাপ হলেও ঐ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজের মুখের এককালের নরম ভাঁজগুলো খুঁজে বেড়ায় সে।

আজ যদি হঠাৎ অগ্নি ফিরে আসে কোনও মন্ত্রবলে, করালীকে চিনতে পারবে কি?

ভাবতে ভাবতে বুকের মধ্যে অসহ্য মোচড় লাগে।

৪.

বলিস্থানের পাশাপাশি নিঝঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে করালী বাগদী। ডান কান ঠাণ্ডা মাটিতে চেপে চোখ বুঁজে নিথর হয়ে গেছে। তখন শেষরাত।

ইদানিং অন্ধকারে মাটিতে কান চেপে শুলেই এক অলৌকিক বাজনার আওয়াজ আসে কানে। কোথায়, কোন্ সুদূরে যেন বেজে চলেছে অগুনতি কাঁসরঘন্টা, ঢাক-ঢোল।

অস্পষ্ট, তবে অবিরাম বেগে চলেছে সে বাদ্যি। আর সব আওয়াজ ভেদ করে ভেসে আসছে একটি ছাগশিশুর অন্তিম 'মা-মা, ডাক। ছুরির ফলার মতো অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে সে ডাক সরাসরি করালীর মস্তিষ্কে গিয়ে বিঁধছে।

ভূমিশয্যা ছেড়ে সহসা ধড়ফড় করে উঠে বসে করালী। চারপাশে চোখ চারায়। শূন্য রক্তাক্ত বলিস্থান। খাঁ-খাঁ নিশুত রাত। ক্লান্ত হ্যাজাকের ম্লান আলো। মন্দির চত্বরে একাধিক মানুষের ঘুমন্ত ছবি।

আশ্চর্য! শব্দটা কোত্থেকে আসছিল! করালী জানে, শব্দটা ওর চারপাশে আছে। ভীষণভাবে আছে। ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করছে ওকে। শুয়ে পড়ে মাটিতে কান চাপলেই শব্দগুলো ফের ফালা ফালা করতে থাকবে করালীর মগজ।

রাবণ রাজার চিতার কথা শুনেছে করালী। সে চিতা নাকি ত্রেতা থেকে জ্বলছে। আজও কান দু'হাতে চাপলেই চিতার হু-হু আওয়াজ পাওয়া যায়। করালীও সেটা পরখ করেছে বহুবার। তেমনই কি এই বসুমন্তার মাটির সাথে মিশে রয়েছে এক অবিরাম বলির বাজনা? সেই সৃষ্টিলগ্ন থেকে? নইলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই মাটির বুকে কান পাতুক, নিরন্তর ঐ বলির বাজনা আর অসহায় পশুর অন্তিম চিৎকার ভেসে আসে কেন?

বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না করালী। ধুপ করে শুয়ে পড়ে। দু'চোখ বোঁজে।

চোখের সুমুখে কত টুকরো টুকরো দৃশ্য। ছবি।

একটি কুচকুচে কালো ছাগশিশু। তার কপালে দগদগে সিঁদুর। গলায় জবাফুলের মালা। সে স্থির নীলাভ চোখে দেখতে থাকে করালীকে।

করালী জানে, এটি সাধারণ পশু নয়। বলির জন্য বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে একে। এর শরীরে কোনও খুঁত নেই। এখনও সঙ্গম করেনি সে। পরম সুলক্ষণযুক্ত এই পশুটি প্রায় আট-দশ ঘন্টা কাল তার বধ্যভূমির পাশাপাশি বসবাস করেছে। একসময় তাকে 'সিনান্' করানো হয়েছে। কপালে দেওয়া হয়েছে সিঁদুর। মস্তকে ছড়ানো হয়েছে মেথি। তার গলায় চড়েছে রক্তজবার মালা। অবোধ পশু কি বুঝেছে কে জানে। তখন থেকেই তার শরীরে কাঁপুনিটা শুরু হয়েছে। ঐ কাঁপুনির মধ্যেই সে দাঁড়িয়েছে লাইনে। একসময় এগোতে এগোতে সে হাজির হয়েছে পীতাম্বর মহাপাত্রের সামনে। পীতাম্বরের তখন দেখে শুনে কাজ করবার অবসর নেই। সামনে এখনও দু'শো ছাগলের লাইন। সে কখনও চোখ মুদে, কখনও চোখ আকাশের দিকে তাক করে পরম নিরাসক্তি নিয়ে আউড়ে যাচ্ছে পশুর উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্র। ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে। বিশ্ব-কর্মণে ধীমহী। তন্নোজীব প্রচোদয়াৎ—। বলতে বলতে ঘটি থেকে খানিকটে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে পশুর পায়ের দিকে। এতদ্ পাদ্যং, ওঁ ছাগপাশবে নমঃ। যান্ত্রিক হাতে তুলে নিচ্ছে একমুঠো জবাফুল আর বেলপাতা। গলা অল্প চড়িয়ে শুরু করেছে সম্প্রদানের মন্ত্র। ওঁ বলি গৃহ্যং মহাদেবি/পশুং সর্বগুণান্বিতাম্/ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম। অর্ধেক বেলপাতা, ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে দেবীর পায়ের দিকে। বাকি অর্ধেক পশুর দিকে। যার মানসিক সে এতক্ষণ চরম উৎকণ্ঠায় ভুগছিল। ধীর গলায় বলে ওঠে, 'খা, খা'। মায়ের প্রসাদী ফুল। খেইয়ে মুক্ত হ'। ছাগপশুটি ফুল-বেলপাতা খাওয়ায় মন দিতেই, সেই ফাঁকে পীতম্বর মহাপাত্র ঝুঁকে পড়ে ছাগের কানে বীজমন্ত্র দিয়েছে। আং হুং ফট্। আহা-হা! মৃত্যুর আগে কানে বীজমন্তর লিয়ে পরপারের দিকে রওনা হলি রে! তুয়ার মতন ভাগ্যবান পশু আর

ক'টা রয়েছে? এই বীজমন্তরের শক্তিতে তুয়ার পশুত্ব লাশ হবেক্। শিবত্ব প্রাপ্তি হবেক্। কতো পশুই তো জন্মায় এ দুনিয়ায়। ক'জনার ভাইগ্যে অমনটি জুটে? মাদি গুলানের তো মুক্তির কুনো উপায় নাই। শাস্ত্রে সাফ বলে দিয়েছে, বলির ক্ষেত্রে স্ত্রী পশু সর্বদাই বর্জনীয়। বাকি রইল মদ্দাগুলান। উয়াদ্যার কিছু মরছে কশাইয়ের ছুরিতে। শুধু অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান পশু দেবীর সম্মুখে সিঁদুর-মেথি মেখে, প্রসাদী ফুল খেযে কানে বীজমন্তর লিয়ে মরতে পাচ্ছে! তুইও উয়াদ্যার একজন। যা, যা, ছাগজনম্ থিকে মুক্ত হয়ে বৈকুন্ঠে যা!

পশু হয়তো কথাগুলো বোঝে, নইলে চোখদুটি পরম নিশ্চিন্ততায় অমন ঢুলে আসবে কেন? মরণের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অমন নিস্পৃহ হওয়া যায়?

আধা চেতনে পশুটির সঙ্গে ফের চোখাচোখি হলো করালীর। স্থির নীলাভ একজোড়া চোখ। কী ঠাণ্ডা! কী ভয়ঙ্কর!

আচমকা হু-হু করে অগ্নির কথা মনে হলো তার। অগ্নিকে নিয়ে অনেক কথা। অনেক স্মৃতি। অনেক ছবি।

মনে হলো, অগ্নি বুঝি পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন করালীর রক্তমাখা সাদা চুলে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বহুদূর থেকে যেন ভেসে আসছে পীতাম্বরের মন্ত্র পাঠ। ওঁ খড়্গায় খর ধারায়—। খড়্গটাকে যেন দেখতে পাচ্ছে করালী। এক অক্ষরী বীজমন্ত্র লেখা খড়্গের ধাতব শরীর ভেদ করে যেন লক্ষ লক্ষ লাল জিহ্বা লক-লক করে ঝুলছে।

'বাবা—।'

ছেলে রটন্তীপ্রসাদের গলার আওয়াজে চোখ খুলল করালী।

রটন্তী বলল, 'দোলা বেঁধেছি। চল, তুমাকে ঘরে লিয়ে যাই।'

এখন আর কোনও কথার জবাব দিতে পারছে না করালী। চোখদুটো খুলে রাখতেই পারছে না সে। শতাধিক ভীমরুল যেন একখানা চাক্ বেঁধেছে মগজে। রক্তের মধ্যে বিষ জ্বালা শুরু হয়েছে। করালী বেশ বুঝতে পারছে, ভেতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। একজন কেউ ভিতরবাগে রয়েছে। সে নিরন্তর এটা ওটা খুট্খাট্ ভাঙছে। শুকনো ডালের মতো।

চার-পাঁচজনে পাঁজাকোলা করে করালীকে তুলল। সযত্নে শুইয়ে দিল খাটিয়ায়। জনা-চারেক খাটিয়া তুলে নিল কাঁধে। চলতে লাগল ধীরেপায়ে।

অল্প চোখ খুলেছে করালী বাগ্দী। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। চোখদুটো যেন পাতালপুরী থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

বলিস্থানে চাপ চাপ রক্ত। মাটির সাথে মিশে থিক্থিক করছে। আট-দশটা কুকুর রক্তভোজ শুরু করেছে পরম উল্লাসে।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাড়িকাঠটার দিকে তাকাল করালী বাগ্দী। বেলকাঠের তৈরি অতি প্রাচীন হাড়িকাঠ। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে কালচে রঙ ধরেছে গায়ে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে সরু হয়ে গিয়েছে।

পাশে পাশে হাঁটছিল গজ বাউরী।

করালী অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'এ খুঁট্যাটা একদম ক্ষয়ে গিছে রে। এ খুঁট্যায় আর কাম চলবেক্ নাই। সামনের বচ্ছর খুঁট্যাটা পালটাস্।'

প্রায়োপবেশন

১.

কমঃ ভানুজ্যোতি বিশ্বাস সব ব্যাপারেই 'লুক বিফোর য়্যু লিপ' নীতিতে বিশ্বাসী, যা করেন বেশ ভেবে-চিন্তে করেন, এক পা এগোতে হলেও বেশ গুনে-গেঁথে হিসেব করে এগোন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ভাববার জন্য এক মুহূর্তও সময় নিলেন না। প্রস্তাবটা ওঠা মাত্রই ঝাঁ করে বলে বসলেন হংসাসন মাইতির নাম। কমঃ হংসাসন মাইতিই যোগ্য ব্যক্তি। তিনিই এই কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেবেন। আর তারপর থেকেই হংসাসন ফি-রাতেই দেখে চলেছে, উলটে পালটে, একটা বীজতলা মাড়ানোর স্বপ্ন এবং একটা মরা ব্যাঙের উলটে থাকবার ছবি।

সেদিন হংসাসনের নামটা উচ্চারণ করেই কমঃ ভানুজ্যোতি এমন অনুকম্পাভরে তাকিয়েছিলেন হংসাসনের দিকে, যা বাংলা অনুবাদে হবে : অনেকদিন তোমাকে যথাযথ গুরুত্ব দিই নি বলে অভিমান হয়েছে? দ্যাখ, কেমন একটা সুযোগ করে দিলাম তোমায়। এমন কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ বড় একটা আসে না সকলের কপালে। তুমি পেলে, তুমি ভাগ্যবান। যদিও ভাগ্যটাগ্য আমরা মানি নে। ভানুজ্যোতির সারা মুখ স্নেহরসে সিক্ত হয়ে ওঠে। যেন স্নেহশীল বাবা তাকাচ্ছে ছেলের দিকে। অনেকদিন নতুন জামা কিনে দিই নি বলে অভিমান হয়েছে? এই নাও, দুটো কিনে দিলাম একসঙ্গে। এমনিতেই মোটা থলথলে শরীরখানি সর্বক্ষণ অকারণে ঘামে, চুরচুরিয়ে ঝরণা বয় শরীর বেয়ে। ভানুজ্যোতির কথা শোনামাত্তর দ্বিগুণ বেগে ঘামতে শুরু করে হংসাসন। চোখ-মুখের অভিব্যক্তি বদলাতে থাকে দ্রুত। ভানুজ্যোতি যদিও দু'চোখ দিয়ে স্নেহরস ছিটিয়ে চলেছেন, তবুও ঠিক উপড়ে ফেলা লতার মতো মানুষটা ঝিমিয়ে যেতে থাকে দ্রুত। তার মধ্যেও কোন মতে উচ্চারণ করে, আমি? মানে, মানে—আমি পারব তো?

'কেন পারবে না?' ভানুজ্যোতি বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাসেন, 'তুমিই যোগ্যতম ব্যক্তি।'

খুব বিপন্ন চোখে এদিক ওদিক তাকায় হংসাসন। জরীপ করতে থাকে শুভার্থী, শত্রুপক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। শুকিয়ে যাচ্ছে শুভার্থীদের মুখ। ছিপিখোলা সোডার বোতলের মতো হাসি উপচে বেরোতে চাইছে শশধর দাসের মুখ-চোখ দিয়ে। কোন গতিকে হাসি চেপে শশধর বলে, কমঃ ভানুজ্যোতি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। এই

কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে হংসাসনের চেয়ে যোগ্য মানুষ আমাদের সারা এলাকায় আর একজনও নেই। এতে পার্টির দুটো লাভ হবে। এক, কর্মসূচীটা সফল হলে আমরা ঐ এলাকায় একটা শক্তপোক্ত মাটি পাব এবং দুই, একজন রোগা ছিপছিপে কমরেড পাব। বলতে বলতে এক ঝলক হাসি বুঝি ছলকে পড়ে যাচ্ছিল বাইরে, শশধর কোন গতিকে সামলে নেয়। কিন্তু কারও নজরে না পড়লেও হংসাসনের নজর এড়ায় না সেটা। সহসা মনে পড়ে যায় সেই একদিনের কথা, যেদিন পার্টির সদরদপ্তরে ভানুজ্যোতি যা নয় তাই বলে তিরস্কার করেছিলেন হংসাসনকে। শশধর তো তখন উপস্থিত ছিল সেখানে। তখন সবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজেছে।

একটা বড়সড় কর্মীবৈঠক চলছিল সদর দপ্তরে। কলকাতা থেকে দু'চারজন নেতা এসেছিলেন। আর ছিলেন জেলার নেতা ভানুজ্যোতি। তিনিও আসলে কলকাতারই মানুষ। জেলা সদরের কলেজে এসেছিলেন অধ্যাপক হয়ে, সেই পঁচিশ বছর আগে। সেই সুবাদে আজ পঁচিশ বছর এই জেলার রাজনীতির সঙ্গে একটু একটু করে জড়াতে জড়াতে এখন জেলার একনম্বর নেতা। কলকাতার নেতারা আজকাল এই ধরনের ছোটখাটো বৈঠকে পুরো সময় থাকেন না। উদ্বোধনী ভাষণ-টাসন দিয়েই কেটে পড়েন। কাজেই ভানুজ্যোতির ওপরই পড়েছিল সারা বৈঠকের পরিচালনার ভার। বৈঠকের শেষে যখন সবাই একে একে বিদায় নিচ্ছে, তখনই ভানুজ্যোতি বলেছিলেন, হংসাসন, একটু থেকো। হংসাসন বসেছিল। অন্যেরা চলে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, শশধর দাস কিন্তু নড়ে নি ঘর থেকে। খানিকটা অন্যমনস্কভাব দেখিয়ে, খানিকটা 'জরুরি' কিছু কথা সেরে নেবার অজুহাতে সে চেয়ার আঁকড়ে বসে ছিল ভানুজ্যোতির ডানদিকে। আসলে, হংসাসন বোঝে, ওকে ভানুজ্যোতির পাশে একলা রেখে শশধর দাস স্বস্তি পাবে না একতিল। কে জানে, যদি একান্তে পেয়ে ভানুজ্যোতিদাকে পটিয়ে-পাটিয়ে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে কিছু একটা বাগিয়ে নেয় হংসাসন ! সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, এখন কত দায়, কত দায়িত্ব, টাকাপয়সা, গাড়ি-পেট্রোল, ভলেন্টিয়ারদের দু'বেলা টিফিন, মিল ...। অর্থ, ক্ষমতা, সবকিছুর একেবারে চূড়ান্ত। এমনি সময়ে হংসাসন যদি কোন গতিকে একখানা ভাইটাল পোস্ট বাগিয়ে নেয়, বড় ক্ষতি হয়ে যাবে শশধরের। আর, এরা পারেও মানুষকে পটাতে। এরা কুহক জানে। শশধর তো এসব কস্মিনকালেও শিখল না। কেবল এলাকার সংগঠনকে মজবুত করতে করতেই তার শরীর দিয়ে পঞ্চাশটা বসন্ত পেরিয়ে-গেছে নিঃশব্দে। তখন হংসাসন কোথায় ! সে তখন বাপের বেনামী জমিজিরেত রক্ষা করতেই তৎপর। এখন মজবুত হয়েছে সংগঠন, বেড়েছে অর্থবল, লোকবল, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে বসন্তের কোকিল।

হংসাসন মাইতির ঠাকুর্দা ছিল রাঁঢ়খোর জমিদার। বাপ ছিল কুখ্যাত জোতদার। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে আটষট্টিতে মজুরদের ওপর গুলি চালিয়েছে নিজের বন্দুক থেকে। তার ছেলে কিনা ভায়া 'যুব' ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে সংগঠনে। এখন মাঝারি মানের নেতা। তার উপস্থিতিতে ইদানিং সর্বদাই শশধর দাসের চেয়ার টলোমলো।

কাজেই হংসাসন সদরে এলে শশধর ইদানিং স্বস্তি পায় না মনে। জেলার নেতারা ওর সঙ্গো একটু বেশিক্ষণ কথা কইলে, শশধর ঈর্ষায় জ্বলে যেতে থাকে। অথচ এমনই ওর কুহকবিদ্যা, একটু একটু করে ভিজিয়ে দিচ্ছে জেলার নেতাদের মনের শুকনো মাটি। কত কিছু উচ্চাশার উচ্চফলনশীল বীজ বুনে চলেছে শশধরের অগোচরে। বড় ভয় করে। হংসাসনকে তাই পারতপক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করে না শশধর। চোখের মণির মতো আগলে রাখে সর্বক্ষণ।

সবাই চলে যাবার পর ভানুজ্যোতি বলেছিলেন, এবারের পঞ্চায়েত ইলেকশানের মিটিংগুলোতে তুমি যেও না হংসাসন। তুমি বরং অফিসে বসে অফিস সামলাও। হাজার হাজার পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট যাবে, সে সব গুছিয়ে রেখো, দেখে শুনে বিলি করো। অন্তত এই ইলেকশানটা শেষ না হওয়া অবধি তুমি পাবলিকের সামনে বেরিও না।

হংসাসনের পক্ষে এটা মৃত্যুদণ্ডের সামিল। ইলেকশন উপলক্ষ্যে প্রতি সভায়, প্রতি মঞ্চে, জনগণের সামনে মহিমময় রূপে হাজির হওয়া, অমৃতবর্ষী কন্ঠে জনতার সামনে ভাষণ দেওয়া, একজন নেতার পক্ষে এ যে কতখানি কাঙ্খিত এক সুযোগ! সেই সুযোগখানি আচমকা চলে যেতে বসেছে তার। মিযোনো খই হয়ে আসে মুখ। খুব মিনমিনে গলায় হংসাসন বলে, 'কেন ভানুদা, আমার অপরাধ?'

'অপরাধের কথা নয়।' ভানুজ্যোতির সারামুখে চাপা বিরক্তির রেশ, 'বড্ড কথা উঠছে।'

'কি নিয়ে?' হংসাসনের গলায় নিদারুণ সংশয়।

'এই তোমার শরীরটাকে নিয়ে।' হংসাসনের বপুখানার ওপর এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ভানুজ্যোতি, 'শরীরখানা কী বানিয়েছ বল তো? শালবনির বজরং অয়েল মিলের মালিক কেশোরামকেও হার মানায়।' একটুখানি থামেন ভানুজ্যোতি। তারপর তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলেন, 'সর্বহারার নেতা তুমি। তোমার শরীর হবে শুকনো কঞ্চির মতো। বোশেখ মাসে শুকিয়ে ডাং হয়ে যাওয়া হেলে সাপের মতো। তা নয়, ফুলছ, দিন দিন জয়ঢাক হচ্ছ। বপু বাড়াবে তো তুমি 'বাপু'র দলে যাও। সেখানে বপুর খুব কদর।'

নিজের বপুখানাকে দু'চোখ দিয়ে কখনই পুরোপুরি দেখতে পায় না মানুষ। এমন কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও নয়। হংসাসন নিজের গদার মতো বাহু, থলথলে বুক, এবং বিশাল ভুঁড়িখানা দেখে আন্দাজ করে নেয় অবশিষ্ট প্রত্যঙ্গের আকার। এবং সব মিলিয়ে পুরো বপুখানির আকৃতি। জয়ঢাকই বটে। মিথ্যে নয় কথাটা।

ভারি অসহায় চোখে তাকায় হংসাসন।

বলে, 'কি করব দাদা, আমি তো ইচ্ছে করে ফুলছি না।'

'যে করেই ফোল, ফুলছো তো? পাবলিক দেখছে তো?' ভানুজ্যোতির কন্ঠস্বর ক্রমশ অকরুণ হয়ে ওঠে, 'অত খাও কেন? এ্যাঁ? অতখানি খায় কেউ? তোমার খাওয়া তো লোকমুখে প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে।'

হংসাসন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভানুজ্যোতির দিকে। মুখমণ্ডলে গাঢ় বেদনা জমে। কী যে বলে এরা! খুব নাকি খাই! কীই বা খাই? কীই বা মেলে আজকের দিনে? সে ছিল আগের দিনকাল। বাড়ির চারপাশে তিন-তিনটে দীঘি। গোয়ালে দশ-বারোটা দুধেল গাই। দীঘির চারপাশের জমিগুলোতে অঢেল সবজি।

চাষের ধানের চাল। নিজের জমির আখের গুড়। আম, কাঁঠাল, লিচু, সফেদার বাগান...। সে দিনকালই ছিল আলাদা। হ্যাঁ, খেয়ে গেছেন বটে আমার বাপ-ঠাকুরদাঁরা। সেসব গল্প শুনেছি ঠাক্‌মা-দিদ্‌মা আর গাঁয়ের মুরুব্বিদের মুখে। একটা কাঁঠাল কখনো দুজনে খাননি। খেয়ালের বসে দশ-সেরি দুধের কড়াইখানা চোঁ-চোঁ করে খালি করে ফেললেন মেজদাদু। পনের-সেরি খাসি কেটে রেঁধে দু'দাদুতে সাফ করে দিয়েছিলেন তাঁদের যৌবনে। সেসব খাওয়াই বা কোথায়, সেসব বপুই বা কই! আমরা পেয়েছি নিতান্তই ছিটেফোঁটা। নেক্‌স্‌ট্‌ জেনারেশন তাও পাবে না। নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকে হংসাসন। সেসব দিনের তুলনায় বলতে গেলে আধাপেটা সিকিপেটা থাকি আমরা। সিলিং-এ ঝুলতে ঝুলতে দম আটকে মরবার জোগাড় আমাদের, খাবো কি!

'সিলিং? সিলিং মানে?' ভুরুজোড়ায় ভাঙচুর হয় ভানুজ্যোতির।

'ল্যান্ড সিলিং।' বলতে বলতে সহসা কঠিন হয়ে ওঠে হংসাসনের মুখ। বলে, 'আপনারা বুঝবেন না, সে ট্র্যাজিডি শহরে হয় নি।'

ভানুজ্যোতি বুঝি সামান্য অস্বস্তিবোধ করেন। গ্রামাঞ্চলের কমরেডদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই এক অসুবিধে চিরকালই বোধ করেন তিনি। গাঁয়ের কমরেডরা চিরকালই শহরের কমরেডদের ঈর্ষা করে। গ্রামে তিরিশ বিঘে জমি, দাম মেরে কেটে তিন লাখ, সে কিনা জোতদার, শ্রেণীশত্রু। শহরে দোতলা বাড়ি, আটলাখ দাম, সে কিনা কমরেড! তিরিশ বিঘে থেকে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে নেট লাভ বছরে দশ-বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ কিনা মাসে হাজার টাকা। শহরে ছোট্ট চা-মিষ্টির দোকানে দৈনিক লাভ একশো টাকা অর্থাৎ কিনা মাসে তিন হাজার। শহরের একজন স্কুল মাস্টার মাইনে-টিউশানি মিলে সাত-আট হাজার কামায়। অথচ তিরিশ বিঘার মালিক বুর্জোয়া, আর স্কুলমাস্টার কিংবা চায়ের দোকানের মালিক কমরেড! কী যে আপনাদের বিচার ভানুদা! ভানুজ্যোতি এদের বোঝাতে পারেন না, বুর্জোয়া আর প্রোলেতারিয়েত ঠিক সম্পত্তি কিংবা আয়ের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় না, আরও অনেক অনেক ফ্যাক্টর কাজ করে। আসল হল মানসিক গঠন...। এভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ভানুজ্যোতি। বুঝেছে কিনা, কতখানি বুঝেছে, কে জানে! আজও তেমন করেই প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'এমন করে বোল না, হংসাসন। শহরেও সিলিং আছে। আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট। শোন নি?'

'শুনেছি। ঐ অ্যাক্ট পর্যন্তই। কাজের বেলায় ঢু-ঢু। শ্রীরাধিকার যেমন আয়ান ঘোষ। যাগ্‌গে, বলছিলাম খাওয়ার কথা। তো, এই মাগ্গিগণ্ডার দিনে পেটপুরে ডাল-ভাত খাওয়াই তো দুঃসাধ্য। বাজারে যেন আগুন লেগেছে। কোনও জিনিসটাই নাগালের মধ্যে নেই। যারা চাকরি-বাকরি করে, শহরে থাকে, মাসকাবারি কামায়, তারা তবুও কিনতে টিনতে পারে। কিন্তু গাঁয়ের মানুষের হাঁড়ির হাল যদি দেখতেন!'

ভানুজ্যোতি পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিলেন হংসাসনের দিকে। বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'তুমি বলছ এসব কথা? বাজারে যেন আগুন লেগেছে? কোনও জিনিসটাই নাগালের মধ্যে নেই? পার্টির একজন দায়িত্বশীল নেতা হয়ে...।' প্রবল বিস্ময়ে ভানুজ্যোতি মাঝপথেই থেমে যান।

চুপ করে বসে থাকে হংসাসন। তার মুখমণ্ডলে নির্লিপ্ত সরলতা। অনুশোচনা কিংবা ক্ষোভ কোনটারই লেশমাত্র নেই।

ভানুজ্যোতিকে বিচলিত মনে হয়। বলেন, 'প্রকাশ্যে এসব বলছো না তো?'

'না, না।' জিভ কাটে হংসাসন, 'তাও আবার বলি!'

'যাগগে, কিছুই খাচ্ছ না তো এমন ফুলছো কেন?'

'এমনি, এমনি। ডাক্তার বলেছে, এটা রোগ। ডিজিজ। শুধু জলমাত্র খেয়ে থাকলেও ফুলতে থাকব। বিশ্বেস না হয় কমঃ ডাঃ দত্তকে ফোন করুন।'

ভানুজ্যোতি মুহূর্তকাল চুপ করে থাকেন। একটু সহানুভূতির মেঘ জমে বুঝি হংসাসনের জন্য। সামান্য নরম গলায় বলেন, 'তা সে যে কারণেই হোক, পাবলিক তো তা বুঝবে না। তারা তো যা-নয়-তাই ভাবছে। বিরোধীরা অবলিক্ রেফারেন্স দিচ্ছে।'

'কি দিচ্ছে বললেন?' হংসাসন সামান্য উৎকর্ণ হয।

'অবলিক রেফারেন্স।' ভানুজ্যোতি পুনরায বিরক্ত, 'বাঁকা মন্তব্য।'

'তা করলেই বা।' হংসাসনের গলায় সামান্য উষ্মা, 'অসুখ-বিসুখ তো হতেই পারে।'

'হতেই পারে?' মনে মনে বেজায় ক্ষুন্ন হন ভানুজ্যোতি কিন্তু দুয়োরে দুয়োরে গিযে তুমি তো বোঝাতে পারবে না যে ঐ রকম ফুলে যাওযাটা তোমার এক কিসিমের ব্যাধি। তার চেয়ে তুমি বরং কিছুদিন অন্তরালে থাক। তুমি আন্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাও। অন্তত এই নির্বাচনের সময়টুকু। জানোই তো, পার্লিযামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে নির্বাচনটাই হল ফাইন্যাল ম্যাচ। ফাইন্যালে তোমাকে খেলাতে পারছি নে হংসাসন।'

হংসাসন বেশ কিছুক্ষণ বোবা বনে যায়। পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে থাকে। এক সময় ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে।

বলে, 'বিজয়-উৎসবে বেরোব তো?'

'সে—বিজয় হোক, তারপর তো উৎসব!' নিদারুণ বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে ভানুজ্যোতির মুখের খাঁজেভাঁজে, 'যে হারে ফুলছো তোমরা, যেভাবে রটাচ্ছে বিরোধীরা, যেভাবে ক্ষেপছে পাবলিক...।'

পাশে বলে পুরো নাটকটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল শশধর দাস। মনে মনে নির্ঘাৎ কুলকুলিয়ে হাসছিল সে। হংসাসনের সারা শরীর জুড়ে বিছের কামড়ের জ্বালা। ঐ অবস্থায় সে বাস ধরে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

মনে তার সুখ ছিল না একতিল।

২.

পঞ্চায়েত নির্বাচনে হংসাসনকে প্রকাশ্যে আসতে দেওয়া হয় নি। সে ছিল অন্তরালে। উইণ্ডস্ক্রিনের আড়ালে। কিন্তু সারাক্ষণ তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে রইল, কী করে রোগা হওয়া যায়! গ্রামের হাইস্কুলের গেম-টিচার পরমেশবাবু পরামর্শ দিলেন, ব্যায়াম করুন। দিনে পাঁচমাইল দৌড়োন। দুশোবার ওঠবোস করুন।

হংসাসন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে গুনে গুনে দু'শো বার ওঠ-বোস করে। দিনমানে দৌড়ুলে সে এক দৃশ্য হবে, সন্ধ্যের আঁধারে খালি ধানক্ষেতের মধ্যে দৌড়য়।

একদিন অন্ধকারে দৌড়ুতে গিয়ে এক দশাসই ষাঁড়ের সঙ্গে মুখোমুখি কলিশন। আহত হয়ে সাতদিন শুয়ে রইল বাড়িতে।

মুরারিমোহন গাঁয়ের ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার। ছিপছিপে কঞ্চির মতো চেহারা। বাতাসে দোল খায়। হংসাসন লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে থাকে মুরারিমোহনের দিকে, এমন কঞ্চির মতো শরীর কীভাবে রেখেছ বলতো?

—ভেরি সিম্পল। সকালে দু'কাপ লেবু চা। নো দুধ, নো চিনি। দুপুরে তিনকাপ ভাত, সবজি, ডাল, একপিস মাছ, এককাপ টক দই, ব্যস। বিকেলে এককাপ লিকার চা, দুটো ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট। রাতে দু'খানা হাতে গড়া রুটি, সামান্য সবজি, আর পাতলা ক্রিম-ফ্রি দুধ এক কাপ। ব্যস।

'মাত্র তিনকাপ ভাত... ? দু'খানা রুটি... ? হংসাসন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মোক্ষম বুদ্ধি জোগায় রঘু ডোম। ওকেও ডাক্তার রাতে দু'খানা মাত্তর রুটি খেতে বলেছে। ওর নাকি ব্লাড-সুগার হাই।

'খাচ্ছিস ?'

'নিচ্চয়। ডাক্তারের কথা অমান্যি কল্লে রোগ সারবে ?'

'কি করে পারলি রে ?'

'খুব সোজা। সাড়ে সাতশো আটার রুটি খেতাম রোজ রাতে। বারোখানা রুটি হত। তো, বউকে বললাম, ঐ আটায় দু'খানা রুটি বানিয়ে দে। ডাক্তারের হুকুম।'

'ধুশ শালা। ইয়ার্কি মারছিল নেতার সঙ্গে ? ভাগ।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটি গ্রামপঞ্চায়েত ছাড়া সবগুলো এলো হংসাসনদের দখলে। কেবল করঞ্জাপুর গ্রামপঞ্চায়েতটা পেয়ে গেল সুধন্য বৈরাগীর দল। প্রধান, উপপ্রধান সব বানাল ওরাই। হংসাসনরা সেখানে মাইনোরিটি। সুধন্য বৈরাগীর দল বিজয়মিছিল বের করল, হরেক উপচারে বিজয়উৎসব করল..., বিজয়-মিছিলে দু'চারটে চোরাগোপ্তা পেটো ঝাড়া বাদে হংসাসনরা আর কিছুই করতে পারল না। নিজেদের বিজয়মিছিলগুলোতে হংসাসন সামিল হল বটে, বিজয়উৎসবে আবির-টাবির মাখল বটে, মঞ্চে উঠে বক্তৃতা-টক্তৃতা দিল বটে, তবে সবই ম্রিয়মান ভাবে, খানিকটে ঐ রানার্স-আপে দলের ট্রফি নেওয়ার মতো, মাথা নীচু, চোখের কোল ভেজা...। উইনার্স ট্রফিটা সবক্ষেত্রেই পেল শশধর দাস, বিজয় গর্বে, উন্নত শিরে, কশেরুকা টানটান করে...।

হাতে না মেরে ভাতে মারা—এ অতি প্রাচীন কৌশল। ফলে, হাজার ছুতোনাতায় পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ করঞ্জাপুরকে অর্থবরাদ্দ করা প্রায় বন্ধ করে দিল। চৈত্র-বৈশাখে ব্লকের সর্বত্র যখন মাটি-কাটার কাজ চলছে, তখন করঞ্জাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষেতমজুররা কাজ বিহনে ধুঁকতে লাগল। সর্প হয়্যা দংশ তুমি, ওঝা হয়্যা ঝাড়—। ঠিক সেই মুহূর্তে ভানুজ্যোতি জেলান্তরের এক গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন, এলাকার ক্ষেতমজুরদের কাজকর্মের দাবিতে করঞ্জাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অফিসের সামনে অনশন শুরু করতে হবে। আমরণ অনশন। মাটি কাটার কাজ দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও—'স্লোগানে ভরিয়ে দিতে হবে করঞ্জাপুরের আকাশ বাতাস। এবং সেই অনশন ধর্মঘটের নেতৃত্বে কে থাকবে, এমন প্রশ্নটা যখন উঠল, ভানুজ্যোতি তিলমাত্র দ্বিধা না করে ঘোষণা করলেন হংসাসনের নাম।

৩.

জীবনে এমন কিছু ব্যাপার থাকে, একেবারে চোখে না দেখলে তার স্বাদ তিলমাত্র বোঝা যায় না। লোকমুখে শুনে সেই বস্তুর স্বাদ আন্দাজও করা যায় না। হংসাসনের কাছে অনশনও সেই জাতীয় এক অনাস্বাদিত বিষয়। এক-আধবেলা ক্ষিদেয় থাকলে পেটে মোচড় মারে, মাথা ধরে যায়, শরীর দুর্বল লাগে, এমন অভিজ্ঞতা তার ক্বচিৎ কদাচিৎ হয়েছে। কিন্তু ঐ ক্ষিদেকে রবারের মতো ক্রমাগত টেনে বাড়াতে থাকলে, একদিন, দুদিন, তিনদিন, সেই ক্ষিদের অনুভূতিটা ঠিক কী রূপ ধারণ করে, সে ব্যাপারে হংসাসনের কোনই অভিজ্ঞতা নেই। মজুর ক্লাসের লোক, যারা হংসাসনের জমিতে সম্বৎসর খাটাবাটা করে, শুনতে পায় হংসাসন, তারা নাকি নাগাড়ে একদিন দু'দিন, কাজকাম না জুটলে, না খেয়েই থাকে। তখন তাদের শরীরে ঠিক কেমন অনুভূতি হয়, জানতে ভারি ইচ্ছে করে হংসাসনের। কিন্তু সরাসরি এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করতেও সংকোচ হয, তাই, পরোক্ষভাবে, কতকটা 'কথার পিঠে কথা' গোছের প্রসঙ্গ তোলে হংসাসন। দু'তিন দিন না খেলে কেমন লাগে হে? শরীর কি খুব দুর্বল হয়্যা যায? লোকগুলো আলগোছে হাসে। অপমানিতের হাসি। বলে, সে কথা শুনিয়া কী লাভ বাবুর? যার ব্যথা, সে বোঝে। হংসাসন কিছুতেই তো খোলসা করে বলতে পারে না যে এটা তারও 'ব্যথা' হতে চলেছে দু'দিন বাদে। সে আমরণ অনশনে বসতে চলেছে পার্টির নির্দেশে। আমরণ অনশন! অর্থাৎ কিনা ক্ষিদের চোটে মরা! ভাবতে গিয়ে হংসাসনের শরীরে শীতল শিহরণ বয়ে যায়। নাভিমূল সুড়সুড় করে ওঠে অচেনা ভয়ে।

হংসাসনের সঙ্গে যে পাঁচজন পার্টিকর্মী অনশনে বসবে, তারা সব মজুরশ্রেণীর লোক। এর আগেও বেশ কিছু অনশন কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছে। হংসাসন লক্ষ করে, তাদের চোখেমুখে কোনও ভাবান্তর নেই। আর ক'দিন বাদে যে তারা কাটাতে চলেছে কিছু অনিশ্চিত খাদ্যহীন দিন, তার জন্য কোনও দুশ্চিন্তাই নেই ওদের চোখে মুখে। বরং নিতান্ত মজুর শ্রেণীর লোক হওয়া সত্ত্বেও পার্টি যে তাদের এমন করে ফোর-ফ্রন্টে আনতে চাইছে, এতেই যেন ওরা কৃতার্থ, বিগলিত।

হংসাসন তার সহযোদ্ধাদের একান্তে শুধোয়, ক্ষিদেয় থাকতে পারবি তো তোরা? কষ্ট হবে না?

মানুষগুলো হাসে। বলে, আমাদের কথা ছাড়ুন হংসাসনদা, আমাদের তো ভাদর মাস থিক্যে পরের আষাঢ় অবধি, এই ক'টা মাস যা একটুচার উপাসে কাটে। তারপর, শাঁওন মাস এলেই তো তাল পাকবে। তাল কুড়াব, আর খাব। অর্থাৎ কিনা, হংসাসন যেটুকু মর্মোদ্ধার করল, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়?

এদিকে, পার্টির ছেলেরা এন্তার পোস্টার সাঁটছে এখানে ওখানে। দেওয়ালে দেওয়ালে মোটা হরফে বেশ কায়দা করে লিখছে তাদের অনশন কর্মসূচীর কথা। আগামী অমুক তারিখে করঙ্গাপুর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ভুখা মজদুরদের কাজের দাবিতে কমঃ হংসাসন মাইতির নেতৃত্বে আমরণ অনশন কর্মসূচীকে সফল করুন। হংসাসন নিঃশব্দে লক্ষ করে পার্টির ছেলেদের লেখালেখি। যেন এক উৎসব লেগেছে ওদের। সর্বত্র দেওয়াল লিখনে হংসাসনের নামটা বেশ মোট হরফে লিখেছে ওরা। পঞ্চু

বোসটা বড়ই ফাজিল। বলে, তোমার বপুর সঙ্গে সজাতি রাখিয়া নামটাও বেশ বোল্ড করিয়া দিছি কমরেড। হংসাসন পারলে এক থাপ্পড় কষায় পঞ্চুকে।

সমবয়েসী বন্ধুরা শুনে হেসেই আকুল।

বলে, 'হংসাসন ভয় পাস নি। তোর শরীরে যা স্টোরেজ রয়েছে, অনেকদিন চলবে। উটেরা যেমন কুঁজ গলিয়ে মাসের পর মাস বেঁচে থাকে।'

বউ বলে, 'তুমি নাকি আমরণ অনশনে বসবে? খেতে দিতে একটুচার দেরি হলে তো চেঁচিয়ে সারা বাড়ি মাথায় তোল।'

'তোমার খুব পুলক জেগেছে, মনে হচ্ছে?' হংসাসন ঝাঁ করে ক্ষেপে যায়।

'পুলক নয়, আমার ভয় কচ্ছে।' বউ ঝর্ণারাণী মুখ টিপে হাসতে থাকে, 'শেষে না বড়সড় কোনও কেলেংকারি করে লোক হাসাও।'

'কেলেংকারি? কি রকম?'

'ধর, একবেলাতেই হেদিয়ে পড়লে। এক মুঠো ভাতের জন্য কেঁদে গোকুল ভাসালে।'

হংসাসন গুম মেরে যায়। তার জীবনের এক চরম সংকটময় মুহূর্তে চারপাশের সবাই যে ওকে নিয়ে মজা করছে, এমন কি নিজের বউও, এটা ভাবতে গিয়ে তার বুকখানা নিঃশব্দে ভাঙতে থাকে।

সেদিন রাতে হংসাসন কিছুই খেল না।

বউ বলে, 'খাবে না কেন? খিদা নাই?'

'খিদা আছে, কিন্তু খাবো নি।'

'প্র্যাকটিস?' ঝর্ণারাণী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

হংসাসন মুখে কিছু বলে না। কেবল তার দু'চোখ দিয়ে অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙে, হংসাসন বুঝতে পারে, বেশ কাহিল লাগছে শরীর। খিদের চোটে নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলছে। তাও সকালবেলাটা উপোস দেয় সে। দুপুরের দিকে আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না ওর। নাহ্, উটের নিয়ম মানুষের ক্ষেত্রে খাটে না।

আই-সি-ডি-এস'এর স্কীম চলছে গাঁয়ে। ওদের অঙ্গনাদি-ওয়ার্কাররা বাচ্চাদের লপসি খাওয়ায় রোজ দুপুরে। মাসে মাসে লোক জমায়েত করে পুষ্টি-অপুষ্টি নিয়ে আলোচনাচক্র বসায়। তেমনি এক আলোচনা সভায় মাসখানেক আগে প্রজেক্ট অফিসার, বিহঙ্গা সমাদ্দার ব্যাখ্যা করছিলেন অপুষ্টি মানুষকে ধীরে ধীরে কেমন করে মৃত্যুর দোরগোড়ায় এগিয়ে দেয়। হংসাসনও ছিল সেই আলোচনাসভায়। তবে মন দিয়ে তেমন কিছুই শোনে নি। আসলে সেদিন মাংস হয়েছিল বাড়িতে। ভরপেট মাংস-ভাত খেয়ে একটা জম্পেশ ঘুম লাগাবার ধান্দা ছিল তার। কিন্তু পুষ্টিকেন্দ্রে আমন্ত্রিত হিসেবে তাকে যেতেই হল। সারা বিকেলটা বড় ঘুম ঘুম লাগছিল। মন দিয়ে শোনার অছিলায় সে চোখ মুদে মাঝে মাঝে একটুখানি ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে, আলোচনাটা শোনা উচিত ছিল তার।

দিন কয়েক বাদে, কর্মসূচীর ঠিক আগের দিন, কি যেন এক কাজের অছিলায়

হংসাসন পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হল আই-সি-ডি-এস অফিসে। লোক-দেখানো কাজকর্ম চুকেবুকে গেলে, সে গেল প্রজেক্ট অফিসারের ঘরে। এ কথা সে কথার পর কথাটা পাড়ল।

'সেদিন আপনার বক্তৃতাটা খুব ভাল হয়েছিল'।

'কবে বলুন তো?'

'ঐ যে, আমাদের গাঁয়ের পুষ্টিকেন্দ্রে আপনি বক্তৃতা দিলেন। অপুষ্টির নানা স্তর নিয়ে আলোচনা করলেন।'

'ও হো। আপনি শুনেছিলেন?'

'নিশ্চয়। খুবই ইনটারেস্টিং কিন্তু ব্যাপারটা।'

'খুবই।'

ইনটারেস্টিং শব্দটা হংসাসনের নিজের কানেই খট করে বাজে। বলে, মানে, খুবই ট্রাজিক।

বিহঙ্গ সমাদ্দারেরও হঠাৎই খেয়াল হয়, অপুষ্টিজনিত মৃত্যুপ্রক্রিয়াকে একটা ভুল অকরুণ বিশেষণে ভূষিত করে ফেলেছে হংসাসন। তিনিও তাতে যান্ত্রিকভাবে ডিটো মেরেছেন নেহাতই অন্যমনস্কতায় অথবা অনভিজ্ঞতায়। দীর্ঘদিন ঐ নিয়ে কাজ করতে করতে একটা পেশাসুলভ যান্ত্রিকতা এসে গেছে বিষয়টার প্রতি, একেবারেই ক্যাজুয়েল এ্যাপ্রোচ। হংসাসন আচমকা বিষয়টার শরীরে এক কোট মানবিক রঙ লাগাবার চেষ্টা করতেই সামান্য সচেতন হয়ে ওঠেন বিহঙ্গ সমাদ্দার। গলা ঝেড়ে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ, ট্রাজিক তো বটেই। যে কোনও মৃত্যুই ট্র্যাজিক। মৃত্যু হল জীবনের সেই করুণ পরিসমাপ্তি যা কিনা—।

সমাদ্দার সাহেব দার্শনিক হয়ে উঠতে চাইছেন দেখে সতর্ক হয়ে ওঠে হংসাসন। সমগ্র আলোচনাটা মৃত্যুরহস্যের দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে সে প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরায়। বলে, অনশন থেকে মৃত্যু অবধি কতগুলি যেন স্টেজ রয়েছে? সেদিন খুব ভাল বলছিলেন।

সরকারী প্রকল্প বোঝাবার জন্য বক্তৃতা, তারও যদি দু'দুবার প্রশংসা হয়ে যায় এক সিটিং-এ, তবে বক্তা সরকারি কর্মচারীটি তো আর ঋষি বিশ্বামিত্র নন যে মেনকার হাজার লাস্যেও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবে না তিলমাত্র। ফলে বিগলিত বিহঙ্গ সমাদ্দার ভাল ছাত্র পেয়ে, আজকের মতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার সংকল্প পরিত্যাগ করে, 'আপনার দেখছি সব বিষয়েই সমান উৎসাহ, এমনটা আজকের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না' বলেই শুরু করলেন বক্তৃতা।

দেখুন, শরীরে খাদ্য না ঢুকলে অপুষ্টিজনিত লক্ষণগুলি পর্যায়ক্রমে ফুটে উঠবে আপনার শরীরে।

'আমার শরীরে?' প্রায় আঁতকে ওঠে হংসাসন।

'সরি, যার শরীরে খাদ্য ঢুকছে না, তার শরীরে। অপুষ্টির প্রথম স্টেজ হল, ম্যারাস্‌মাস। কালো চুল বাদামি হতে থাকবে। চুল উঠতে থাকবে। শরীরের ত্বক

অমসৃণ হতে থাকবে। মানুষ রোগা হতে আরম্ভ করবে। পেটটা শরীরের তুলনায় বড় দেখাবে।'

হংসাসন গোগ্রাসে গিলছিল বিহঙ্গ সমাদ্দারের কথাগুলো। শুনতে শুনতে তার একখানি হাত অজান্তে উঠে আসে তার ভুঁড়ির ওপর। বিহঙ্গ সমাদ্দারের দৃষ্টি এড়ায় না তা।

বলেন, প্লীজ নোট ইট। পেটটা সত্যি সত্যি বড় হয়ে যাবে না। বড় দেখাবে। খিটখিটে মেজাজ হবে। চোখ গর্তে ঢুকতে থাকবে। চোখের তারার রঙ ফ্যাকাসে হতে থাকবে। শরীরে প্রচুর খোস-প্যাঁচড়া, চুলকানি হবে, কিন্তু চালমুগরার তেল কিংবা অন্য মলমাদি লাগালেও ফল পাওয়া যাবে না, এবং সব চেয়ে বড় কথা, খাদ্যপ্রাপ্তির স্পৃহায় মানুষটি ক্রমশ ব্যাকুল হয়ে উঠবে এবং খাদ্য পাওয়ার জন্য যা যা করা সম্ভব, করবে, যা যা সম্ভব নয়, তাও করবে। খাদ্য না পাওয়ার যা যা অড-রিঅ্যাকশন্‌স্‌ সবই হতে থাকবে। কখনও হিংস্র হয়ে রুদ্ররূপ ধরবে, কখনও আর্তনাদ করে কাঁদবে। এবং খাদ্যের জন্য যতকিছু নীতিবিগর্হিত কাজ, সবই করতে চেষ্টা করবে। ইন ফ্যাক্ট, খেতে না পাওয়ার যা কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা মানুষ এই স্তরেই বারো আনা ভোগ করে।

সমাদ্দারসাহেব একখানা সিগারেট ধরান।

পরের পর্যায় হল, ম্যারস্‌মিক কোয়াসির্কার। এই স্টেজে ম্যারাস্‌মাস্‌ পর্যায়ের প্রতিটি লক্ষণ আরও ডিস্টিংক্ট, আরও সার্প হয়ে উঠবে। হাত-পা কাঠি কাঠি হয়ে যাবে। এই পর্যায়েই মানুষ মানুষের মাংস খায়। এই পর্যায়েও যদি পেটে পুষ্টিকর খাদ্য পর্যায়ক্রমে পড়তে থাকে, রোগী আস্তে আস্তে সামলে নেবে এবং সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু এর পরের স্টেজটি হল বিপজ্জনক। ভেরি ড্যামেজিং এবং অন্যভাবে নেবেন না, অ্যামেজিং। আপনার জন্য চা বলি ?

'এ্যাঁ ? চা ? চা কি ? চা কেন ?'

সমাদ্দারসাহেব সহসা সচেতন হয়ে ওঠেন। হংসাসনের মুখের ওপর তাবৎ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি বেঁধান। ভুরুজোড়া অজান্তে কুঁচকে ওঠে। সামান্য গলা চড়িয়ে বলেন, হংসাসনবাবু—, আমি আপনার চায়ের কথা বলছি। আপনার জন্য চা আনাব ?

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে হংসাসন। ভেসে উঠেছে ওপর-জলে। ধাতস্থ হয়েছে। কিঞ্চিৎ লজ্জাও পেয়েছে। বলে, আমি একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম বিষয়টার গভীরে। একেবারেই হুঁশ ছিল না।

সমাদ্দারসাহেব এতখানি মনোযোগী ছাত্র তাঁর চাকারিজীবনে দ্বিতীয়টি পান নি। খুব মোলায়েম গলায় বলেন, আপনার জন্য চা আনাব ?

'হ্যাঁ, সঙ্গে বিস্কুট। দু'খানা।'

আবার অবাক হয়ে তাকান বিহঙ্গ সমাদ্দার। আজ যেন হংসাসন কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করছে। লোকটার হল কি ?

তৃতীয় পর্যায়ের নাম কোয়াসির্কার। খুব খারাপ, আই মিন, ইনহিউম্যান শোনালেও বলছি মশাই, এই স্টেজটা কিন্তু রিয়েলি ইনটারেস্টিং।

'ইনটারেস্টিং !'

'ইয়েস। ভেরি ইনটারেস্টিং। এবং আগেই বলেছি, অ্যামেজিং। এই স্টেজে পৌঁছে মানুষের তিলমাত্র খিদে থাকবে না। আই মিন, খিদের কোনও অনুভূতিই থাকবে না। এবং অ্যামেজিং ব্যাপার হল, শরীরটাকে বেশ মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট মনে হবে। রোগীর আত্মীয়স্বজনের স্বস্তি হবে, পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে মানুষটা গায়ে-গতরে বাড়ছে। কিন্তু অ্যাকচুয়্যালি, খাবার তিলমাত্র নিতে পারছে না ওর শরীর। সে একটু একটু করে সিংক করছে। ব্যাপারটা ইনটারেস্টিং নয়?

হংসাসন চমক খেয়ে হুঁশে ফেরে। শুকনো ঠোঁট চাটতে থাকে। ফ্যাকাসে মুখে বার দুই ঢোক গিলে বলে, ভেরি ইনটারেস্টিং।

আসলে তখন রোগীর জিভে স্বাদ বলে কিছু থাকবে না। তার মগজে সাড় বলে কিছু থাকবে না। সে বসে আছে তো বসেই থাকবে, শুয়ে আছে তো শুয়েই থাকবে, তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই থাকবে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাবে, পাশ ফিরে শোবার কথাটা তার মনেই হবে না। সে চোখের পলক ফেলতেও ভুলে যাবে। যে খাবারের জন্য সে আগের স্টেজে যা-নয় তাই করেছে, সেই খাবার তার সামনে ধরে দিলেও খেতে চাইবে না। সুস্বাদু লোভনীয় খাবার দেখলেও তার মধ্যে তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা দেবে না।

'অত বিতাং করছেন কেন?' সহসা সামান্য রূঢ় হয়ে ওঠে হংসাসন, 'বোঝা গেছে ব্যাপারখানা।'

'বোঝা গেছে তো?' মিষ্টি হাসেন বিহঙ্গ সমাদ্দার, 'এই স্টেজে আর রোগীকে কেবল, খাবার খাইয়ে বাঁচানো যাবে না। তাকে তখন পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলতে হবে। প্রথমে তার জিভের সাড় ফেরাতে হবে।'

'কেমন করে?'

'খাদ্য বস্তু চটকে, মণ্ড করে, ঐ মণ্ড তার জিভে ঘসে ঘসে সাড় ফেরাবার চেষ্টা চালানো হবে। জিভে সাড় ফিরলেই ধীরে ধীরে স্বাদও ফিরে আসবে।'

সমাদ্দারসাহেব ব্যাপারটা আরও ব্যাখ্যা করবার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু তার আগেই, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হংসাসন শুধিয়ে বসে, 'মানুষ কতদিন না খেয়ে বাঁচতে পারে?'

সমাদ্দার সাহেব একটু অস্বস্তিতে পড়ে যান। হংসাসন এমন ব্যাকুল চোখে তাকিয়েছিলেন, যেন ওটা ওর নিজস্ব জীবন-মরণের প্রশ্ন। বলেন, ইট ডিপেন্ডস্।

'তবুও, একটা সাধারণ টাইম-লিমিট রয়েছে তো? পাঁচদিন—সাতদিন—দশদিন—'

'যতীন দাস আটবট্টি দিন না খেয়ে বেঁচেছিলেন'।

'কোন্ যতীন দাস? করঞ্জাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য যে?'

বিহঙ্গ সমাদ্দার অবাক চোখে তাকান হংসাসনের দিকে। বলেন, 'আজ দেখছি আপনি সত্যিই খুব ডিসটার্বড্। আমি স্বাধীনতা-সংগ্রামী যতীন দাসের কথা বলছি।'

'ও— , — সরি। আমি— মানে— আচ্ছা, উঠি। পরে কথা হবে।' আচমকা উঠে দাঁড়ায় হংসাসন। যান্ত্রিক পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বিহঙ্গ সমাদ্দার অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

আই-সি-ডি-এস অফিস থেকে বাসস্ট্যান্ড দশ-বারো মিনিটের পথ, হংসাসন থপথপিয়ে

দৌড়ুতে দৌড়ুতে সাত-আট মিনিটেই পৌঁছে যায়। বিকেল চারটেয় একটা বাস ছাড়বে জেলা সদরের দিকে। হংসাসন কোনও গতিকে ধরতে চায় বাসখানা। সন্ধ্যের আগে পৌঁছে যেতে চায় পার্টির সদর দপ্তরে। ভানুজ্যোতিকে সাফ সাফ জানিয়ে দিতে চায়, তার পক্ষে আগামীকালের অনশন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার জন্য যদি পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেয়, ত্যাও সই। ঝাঁকের কই ঝাঁককে ফিরিয়া যাবো।

বাসটা ছেড়ে দিচ্ছিল, হংসাসন একলাফে উঠে পড়ে শেষ মুহূর্তে।

৪.

দরজার মুখে হংসাসনকে দেখামাত্রই ভানুজ্যোতি ডান হাত নাচিয়ে এক অনির্বচনীয় মুদ্রা গড়েন।

খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। আমার কোনও দোষ নেই হংসাসন, আমি তোমার ভালই চেয়েছিলাম।

'কি ব্যাপারটা?' হংসাসনের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

'ব্যাপার হল, অভাগা চোর যে পথে যায়, হয় কুকুর ডাকে, নয় রাত পোহায়।'

'কী বলতে চাইছেন? খুলে বলুন ভানুজ্যোতিদা, এই টেনশন আর সইছে না।'

'বলছি যে, কপালে নেই ঘি, তার ঠকঠকালে হবে কি?'

'মানে?'

'মানে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ কপাল খারাপ হলে নল রাজার পোড়া মাছটিও ধোওয়ার সময় পালায়।'

'অত ভনিতা করবেন না। ভাল লাগছে না। ঝেড়ে কাশুন ভানুজ্যোতিদা'। খুবই রূঢ় গলায় বলে ওঠে হংসাসন।

ভানুজ্যোতি হকচকিয়ে যান। পরমুহূর্তে সামলে নেন। বলেন, 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি হংসাসন, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তোমার প্রতিপক্ষ এতটাই চতুর!'

'শশধর দাস যে শেয়ালের চেয়েও চতুর একথা আজই মনে হল আপনার? পার্টির কে জানে না সেকথা?'

'শশধরের কথা হচ্ছে না হে। হচ্ছে সুধন্য বৈরাগীর কথা।' ভানুজ্যোতি ঈষৎ বিরক্ত, 'ব্যাটা পঞ্চায়েতের অন্য ফান্ড ভেঙে আগামীকাল থেকে কিছু কিছু মাটি কাটার কাজ শুরু করছে। ওদের দলের রাজ্যশাখাও নাকি বেইজ্জতি ঠেকাতে কিছু টাকা-পয়সা দিয়েছে। নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ যাকে বলে। পঞ্চায়েতের অন্য ফান্ড ভাঙবার তদন্ত অবশ্য আমরা করাবোই, কিন্তু উপস্থিত, কর্মসূচীটা বান্চাল হয়ে গেল। ভেরি সরি, হংসাসন।'

ততক্ষণে সহসা কুলকুলিয়ে ঘামতে শুরু করেছে হংসাসন। মাথার ওপর বনবনিয়ে পাখা ঘুরছে, তবুও তার সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে ঘামে।

দেখে ভারি মায়া হয় ভানুজ্যোতির। বলেন, 'দুঃখু করোনা হংসাসন। গোল্ডেন

চান্সটা তোমার হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু জানোই তো, এক মাঘে শীত যায় না। আবার সুযোগ আসবেই। তখন যাতে তোমাকেই চান্সটা দেওয়া হয়, পার্টি সেটা দেখবে। যাও, এখন বাড়ি যাও।'

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে ছিল হংসাসন। সহসা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করে সে, এক সময় ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে। কান্না তার থামতে চায় না কিছুতেই, যা দেখতে দেখতে কমঃ ভানুজ্যোতি ভুল বোঝেন, বুঝিবা সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া হওয়ার মনোবেদনাজনিত এ রোদন।

সেই রাতে বীজতলা মাড়ানোর স্বপ্নটা দেখে সে পুনরায়, আর বীজতলার পাশেই পেটফোলা ব্যাঙটা আকাশের দিকে দু'ঠ্যাং তুলে চিত হয়ে পড়ে থাকে।

পুলকরেখা

রোজদিন ভোরের আলো না ফুটতেই মনোহর চি-চি করে ডাক পাড়ে, কইরে, অ নৈতন বউ, উঠলি? আমি বারাবো কখন? দকান খুইল্‌ব কখন? আর, সুবাসী বিরক্তিতে পাশ ফিরে শোয়। নিত্যিদিন ভোর না হতেই কানের কাছে বড় ঘ্যানর ঘ্যানর করে লোকটা। বড্ড জ্বালায়। মনোহর ফের ডাক পাড়ে, অ নৈতন বউ। সুবাসী এবার কাঁসরের মতো বেজে ওঠে, কী বইল্‌ল্যাম তুমাকে? রোজ রোজ রগড় কর ক্যানে? লিত্যিদিন হাজার কাপ চা বানাও, উখ্যেনেই ত এক কাপ খেইয়ে লিতে পার। তা লয়...। আমার ঘুম পাচ্ছে। বলতে বলতে বালিশের মধ্যে মুখখানা গুঁজে দেয় সুবাসী। চোখ বোঁজে। মনোহর ঠায় বসে থাকে দাওয়ায়।

প্রাণের বন্ধু পঞ্চানন মাঝি বলে, দ্বিতীয় পক্ষের বউ, টুকচান মুখ-ঝামটা ত দিবেক্‌ই। সইয়ে লিতে হবেক।

মনোহর সহ্য করে। তাও দিনের প্রথম চা-টি সে বউয়ের হাতে না খেয়ে বেরোতে চায় না। গজগজ করতে করতে বউ কোনোদিন বানিয়ে দেয়, কোনোদিন দেয় না।

চা খেয়ে দোকানে যায় মনোহর। ততক্ষণে ভোলা দোকানের ঝাঁপ খুলে উনুনে আঁচ দিয়েছে। মনোহর ঢাউস কেটলিতে জল চড়িয়ে দেয়। দেখতে দেখতে এসে যায় সুধন্য গোয়ালা। পাঁচ সের দুধ মেপে দিয়ে চলে যায়। চায়ের জল ফুটতে না ফুটতে হাজির হয় আশেপাশের জনাদশেক মানুষ, দিনের প্রথম চায়ের গেলাসটি মনোহরের হাত থেকে না নিলে যাদের চলে না। মনোহর একে একে চা ধরিয়ে দেয় সবার হাতে। গেলাসে প্রথম চুমুকটি দিয়ে 'আহ্' গোছের তৃপ্তির আওয়াজ তোলে ওরা। ওদের সবাইয়ের ঘর-গেরস্থি রয়েছে। চা বানানো হয় প্রতিটি বাড়িতে। কিন্তু মনোহরের 'মনোহরণ চা' না পেলে তাদের দিন যেন শুরু হতেই চায় না। মনোহরণ চা। এই নামেই ডাকে সবাই মনোহরের চা-কে। মনোহর দোকানের সামনে একখানা সস্তা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে, 'মনোহরের মনোহরণ চা'। জল, দুধ, চা, চিনি এবং আরও কয়েকটি বস্তুর সে এক আশ্চর্য রসায়ন। সে রসায়ন-বিদ্যা কেবলমাত্র মনোহরেরই করায়ত্ত। সোনামুখি বাজারে কম করেও দশ-ডজন চায়ের দোকান। কিন্তু মনোহরের মনোহরণ চা, তার স্বাদই আলাদা। সোনামুখি বাজারে মনোহরের চায়ের দোকান আজ বিশ বছর, কিন্তু রসিকের দল খেয়াল করেছে, মনোহরের চা কখনোই এমনটা হত না। বাড়িতে নতুন বউ অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষটি আসার পর হাতখানা যেন খুলেছে মনোহরের।

সকালের ভিড়টা আটটার মধ্যেই হালকা হয়ে যায়। বাবুরা সব চা খেয়ে বাজারে ছোটে। বাজার নিয়ে গেলে রান্না হবে। ওরা সব নাকে মুখে গুঁজে অফিসে যাবে। ব্যবসাদার, ঠিকেদাররা যে-যার ধান্দায় দৌড়বে। কিন্তু তাই বলে বেশিক্ষণ পাতলা থাকবে না দোকানের ভিড়। মফস্বল থেকে যারা হাজারো কাজে শহরে আসে, তাদের একটা বড়সড় অংশ মনোহরের দোকানে এসে বসে। চা-বিস্কুট-তেলেভাজা দিয়ে প্রাতরাশ সারে। তরঙ্গার নিজের হাতের তৈরি নারকোলের নাড়ু দিয়ে জল খায়। দোকান পুনরায় গমগম করতে থাকে।

কাঁটায় কাঁটায় ন-টায় তরঙ্গা আসে। ভেতরের বেঞ্চিতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ, ঘাড়, গলা পরিপাটি করে মোছে। বলে, দাও দাদা, বেশ খাসা কইর‍্যে এক কাপ বানাও দেখি।

রোজদিন তরঙ্গা আসে ঠিক তরঙ্গের মতো। সারা অঙ্গে হিল্লোল তুলে হাঁটে। তার শরীরের দুলুনিতে চারপাশের হাওয়ায় মিষ্টি তরঙ্গ ওঠে। যখন রিনরিন করে হাসে, যেন জলতরঙ্গ বাজে। আর, মনোহর নজর করে, তরঙ্গার সময়ের সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিত্যিদিন নিয়ম করে আসে জনাকয় ছোকরা। আশেপাশের পাড়াতেই থাকে ওরা। লক্কা পায়রার মতো অবয়ব তাদের, ঘাড় অবধি ফুরফুরে চুল...। তারা সব সম্পন্ন মানুষের বকে যাওয়া ছেলে। তরঙ্গা যখন ভেতরের বেঞ্চিতে বসে ঘাড়, গলা মোছে, ছোকরাগুলো বাইরের বেঞ্চিতে বসে খোসগল্পের ফাঁকে ফাঁকে চোরাচাউনি হানতে থাকে। তাদের অলবলে চোখের দৃষ্টি তরঙ্গার শরীরের এপাড়ায় ওপাড়ায় চরে বেড়ায়। মনোহরের কোনোই সন্দেহ নেই, ছোকরাগুলো রোজ চা-খাওয়ার অছিলায় তরঙ্গাকেই দেখতে আসে। সম্ভবত তরঙ্গাও সেটা জানে।

বিশ-বাইশ বছর বয়েস তরঙ্গার। শ্যামলা রঙ। চোখ-মুখ কাটা-কাটা, ধারাল। সারা শরীর জুড়ে যৌবনের ঢল নেমেছে। সর্বক্ষণ উথাল-পাথাল ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। বিয়ে হয়েছিল ছান্দারের এক যাত্রাওয়ালার সঙ্গে। সে ব্যাটা বছরের ন-মাস অপেরাদলে ঘুরে বেড়ায়। তরঙ্গার তাতে প্রবল আপত্তি ছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু মান-অভিমান, ঝগড়া-কলহ, কিছুতেই লোকটিকে নিবৃত্ত করা যায়নি। রেগে-মেগে বাপের বাড়িতে চলে এসেছে তরঙ্গা। এখানেই থাকে। বাপটা বুড়ো হয়েছে, যেকোনো দিন টেঁসে যেতে পারে। মা-টার চোখে ছানি, সারা অঙ্গে বাত-বেদনা। ভাই ভাউজের চোখের বালি এখনই, বাপ-মার অন্তে কী অবস্থা হবে তা আগাম আন্দাজ করতে পারে তরঙ্গা। বিয়ে হওয়া মেয়েদের ক্ষেত্রে ভাই-ভাউজের সংসার ক্রমশ নরক হয়ে ওঠে। কোথাও কোনো গতি না হলে আজীবনকাল ঐ নরকেই থাকতে হবে। আজ থেকে সেই ভাবনায় অস্থির তরঙ্গা। প্রাণপণে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে চলেছে।

নিজের কথা বলতে গিয়ে বারেবারেই চোখ ভিজে আসে তরঙ্গার। বলে, এছাড়া আমার কুনো চারা নেই মনোহরদা। বাপ-মা চোখ বুজলেই ভাই-ভাউজ পরের দিনই খেদাবেক। নারকোল, চিনি, ছোট এলাচ কিনে নিজের হাতে নাড়ু বানায় রোজ। সোনামুখি বাজারে আনামাত্রই বিক্রি হয়ে যায়। লাভের পয়সাটুকু সরিয়ে রেখে বাকি পয়সায় ফের কিনে নেয় নারকোল, চিনি, ছোট এলাচ। সোনামুখি বাজারে ইতিমধ্যেই তরঙ্গার নারকোল নাড়ুর নাম

ছড়িয়েছে। মনোহরের চায়ের দোকানে রোজ দু-কেজি নাড়ু বাঁধা। কখনো তার চেয়েও বেশি লাগে। বাজারে ফেলবার আগে মনোহরের নাড়ু আলাদা সরিয়ে রাখে তরঙ্গা। ফেরার পথে দিয়ে যায়। সেটা তার স্বস্তিতে জিরোবার সময়, মনের সঙ্গে কথা কইবার সময়, মনের কথা অপরকে বলবার সময়...। সে ধীরেসুস্থে দোকানে ঢোকে, বসে, চা খায় বার তিনেক। অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গাছা করে। বাড়ি ফেরার কোনো চাড় থাকে না। সে ভুলেই যায়, তার কোনো বাড়ি রয়েছে, ঘর রয়েছে, আশ্রয় রয়েছে। মনোহরই মাঝে মধ্যে তাড়া লাগায়। তুই ঘর যাবি নাই? কত বেলা হইল্যাক! ঘরে তুয়ার জটিলা-কুটিলা দু-দুটা ভাউজ! তরঙ্গা চমকে তাকায়। কথার একটা জিলাপি-প্যাঁচে ওকে কেমন অভিসারিণী রাধা বানিয়ে দিল মনোহরদা! অর্থাৎ কিনা নিজেকে বোধ করি বানিয়ে ফেলল কেষ্টঠাকুর। চায়ের দোকানটাকে কদমতলা, আর সামনের পিচ-রাস্তাটাকে কুলকুল যমুনার জল। মনোহর বলেনি, কিন্তু তরঙ্গা কল্পনায় বানিয়ে ফেলে এতসব, এক লহমায়। মনোহরের মুখের পানে তাকিয়ে ফিক করে হাসে। মনোহরও ফেরৎ দেয় হাসি। তরঙ্গার মনে হয় বড় নিষ্পাপ সে হাসি। কোনো মালিন্য নেই। বড়ই ধন্দে পড়ে যায় তরঙ্গা। কথাটা কি মনোহরদা ভেবে চিন্তে বলেছে, না কি কেবল কথার পিঠে কথা? তরঙ্গা মনোহরের সারা মুখে চোখ ছুঁইয়ে কষ্টিপাথর ঘষে। একসময় জোরে জোরে পা নাচাতে থাকে। বলে, যাব, তা অত আঁটুপাঁটু কীসের? ঘরে আর কে আমার তরে দু-চোখ জ্বেইলে বুইসে রইছে! ঘরে গিয়ে ইখন কইর্‌বটা কী? দু-মুঠা ভাতে-ভাত ফুটাব। সিনান করে খাব। একটা লম্বা ঘুম দিব। নাড়ু বানাতে বইস্‌ব সেই বিকালবেলায়। বলতে বলতে যেন একটু একটু করে উদাস হতে থাকে তরঙ্গা, একটু একটু করে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তখন তার চোখের মধ্যেকার সর্বক্ষণের ঝিলিক মারা আলোটুকু পাখির মতো ফুরুৎ করে উড়ে যায় সামনের নীল আকাশে। আর, নিজের একান্ত পোষাপাখিটি, খাঁচাছাড়া, উড়ে বেড়াচ্ছে নাগালের বাইরে, তরঙ্গা যেন হারানিধি ফিরে পাওয়ার উদগ্র বাসনায় হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকে থিরপলকে, দৃষ্টিটা বিঁধিয়ে রাখে নীল আকাশের গায়ে। ঐটুকু সময় সে তিলমাত্র নিজের মধ্যে থাকে না। মনোহরকে ঠেলা মেরে তার ঘুম ভাঙাতে হয় রোজ। মনোহরকেই এটা-সেটা বলে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, হাসিয়ে-টাসিয়ে, ফিরিয়ে আনতে হয় তরঙ্গার পাখিটাকে, রোজদিন।

রোজদিন ঠা-ঠা দুপুরে ঘরের পানে রওনা দেয় সে। তার আগে নয়।

অন্য কারো দোকান হলে অ্যাদ্দিনে টি-টি পড়ে যেত। তরঙ্গা আর মনোহরকে নিয়ে কতই না গল্পগাথা রটত চারপাশে। কিন্তু মনোহরের ক্ষেত্রে মানুষজনের ভাব-ভাবনা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। মনোহরকে যারা দীর্ঘকাল চেনে, তারা সকলেই জানে, মনোহরের আর যাই থাক, চরিত্রের দোষটা তিলমাত্র নেই। বড় সৎ প্রকৃতির মানুষ সে। বড়ই ভদ্র সুজন। তার ওপর ঘরে তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ। লাউডগার মতো লকলকে সবুজ। মনোহর সারাক্ষণ বউ-বউ করে পাগল। বউটা আবার বড্ড নাক-উঁচু। মনোহরকে সে তিলমাত্র পাত্তা দেয় না। কথায় কথায় ঠোঁট ওলটায়। বোকা হাবা বলে টিটকিরি করে সর্বক্ষণ। দোজবরকে এমনিতেই কোনো মেয়ে ষোলআনা ভালোবাসতে পারে না। তার ওপর মনোহরের শরীরে এমন কোনো বাঁধুনি নেই, যা দিয়ে বিশ বছরের যুবতী

মেয়েকে আকৃষ্ট করা যায়। এমনিতেই তো মনোহরের বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। দেখতে লাগে আরও খানিক বেশি। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। কপাল জুড়ে উঁকি মেরেছে টাক। চোখেমুখে এক ধরনের বোকাবোকা সরল-সরল ভাব। তেমন মুখের পানে তাকিয়ে একটা বিশ বছরের জোয়ার-সামলানো মেয়ে কী আর বাড়তি সুখই বা পাবে! সুবাসী মনোহরের ঘর করছে বটে, একটা ছেলেও এসেছে কোল জুড়ে, কিন্তু স্বামীকে নিয়ে তার তিলমাত্র গর্ব আছে বলে মনে হয় না। মনোহর বোঝে, স্বামীকে নিয়ে সুবাসীর দুঃখ রয়েছে মনের গভীরে। সোনামুখি গার্লস স্কুলে এইট অবধি পড়া মেয়ে সে। বিয়ের আগে প্রেম-ট্রেম করেছে। সিনেমা-টিনেমা দেখেছে এন্তার। বাংলা-হিন্দি ফিলিমের হিট গানগুলোর দু-এক কলি, প্রথম যখন আসে মনোহরের সংসারে, মাঝেমাঝেই লেগে থাকত ঠোঁটের ডগায়। একটা গাইয়ে পাখির বসবাস ছিল ওর মধ্যে। ধীরে ধীরে সেই পাখিটা নিস্তেজ হয়ে এল দানাপানির অভাবে। দানাপানি জোগানোর কথা ছিল মনোহরের। সুবাসীর বুকের মধ্যেকার সেই রোমান্টিক পাখিটাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব ছিল ওরই। কিন্তু মনোহর তা পারেনি। কী করে পারবে? তার পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই শরীরে রূপের লেশমাত্র নেই। বুকের মধ্যে জমে নেই কোনো বাড়তি আবেগ। সে ইনিযেবিনিয়ে বিনুনি পাকাবার ভঙ্গিতে কথা বলতে জানে না। তার কোনো কামদেবীয় ছলাকলা নেই। তাকে দেখে সুবাসীর বুকের মধ্যে একতিলও বাড়তি জোয়ার আসে না। বরং সামান্য ভাঁটার টান অনুভব করে সে। মা-বাপ চাইলে এদেশের মেয়েদের এখনও অবধি গাধার গলায় বরমাল্য পরাতে হয়। সেই কারণেই এমন মানুষকে বিয়ে করতে হয়েছে সুবাসীকে। নিজের মতামতের মূল্য থাকলে কোনো মতেই রাজি হত না। এমন কথা সে ইদানীং প্রকাশ্যেই বলে, স্বাভাবিক গলায়। মনোহরের কানেও আসে তেমন কথা। শুনে, আলাভোলা হাসে সে। বলে, ঠিকই তো বলে সুবাসী। বিশ বচ্ছরের সোন্দরী কইন্যা, উয়ার হইল্যাক বুড়া-আধড়া বর। ভালো লাগে?

এমনিতে মনোহরের প্রতি কোনো অসূয়া নেই সুবাসীর। মানুষটা তো ভালোই। অতি সংসারী, বিশ্বস্ত, কর্তব্যজ্ঞান নিখুঁত। খুবই দায়িত্বশীল। সুবাসীর প্রতি দৃষ্টি থাকে ষোলআনার জায়গায় আঠার আনা। তার যাবতীয় সুবিধে-অসুবিধে আগাম বুঝে ফেলে। সুবাসী যা চায়, এনে দেয়। দু-কথা শোনালেও মুখ বুজে হজম করে। ওর কোনো সখ-সাধই অপূর্ণ থাকতে দেয় না। বাচ্চাকেও পাগলের মতো ভালোবাসে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু তবুও, একজন নারী তার নিজস্ব পুরুষকে যে-চোখে দেখে থাকে, সুবাসী মনোহরের মধ্যে সেই বস্তুটিই পায় না। একেবারে রসকষহীন। আলাভোলা, সরল জাতের মানুষ। এমন মানুষের চোখে চোখ মিলিয়ে, শরীরে শরীরে মিলিয়ে, হাসিতে হাসি, কথায় কথা মিলিয়ে তিলমাত্র সুখ নেই সুবাসীর। ওর দিকে তাকালে বাড়তি শিহরণ জাগে না। বিছানায় গা ঘেঁষে থাকলেও ফুটন্ত দুধের মতো উথলে উঠতে চায় না শরীর। সহবাস যেটুকু হয়, যান্ত্রিকভাবেই হয়ে যায়। সুবাসী কোনো বাড়তি তাগিদ বোধ করে না সে জন্য, কোনো বাড়তি আনন্দও হয় না রমণকালে। ইদানীং সে এক অতি অনৈতিক প্রক্রিয়ায় খানিকটা আনন্দ আহরণের প্রয়াস চালায়। মিলনকালে অন্ধকার বিছানায় সে মনোহরের জায়গায় মন্টুদাকে কল্পনা করে। তার মুখখানিই ভাসিয়ে রাখে মনের আয়নায়। ঐটুকু সময়ে সর্ব অঙ্গ সহকারে মনোহর সুবাসীর কাছে

ষোলআনা মন্টুদা হয়ে যায়। এমনটা ভাবতে পারলে মনে বড় সুখ পা

আসলে, কেবল শয্যার অংশীদার নয়, সব অর্থে একজন সাথী লাগে প্রত্যেক নারীর। প্রতিটি পুরুষের। সেই কারণেই ঘর বাঁধা। শুধু রমণ-মিলনের জন্য তো নয়। সে তো থাকেই, থাকবেই, সব মানুষের জীবনে, ফলের মধ্যে বীজের মতো। কিন্তু এ ছাড়াও আরও বহুৎ কিছু থাকে, যার জন্য একজন মনের মতো সঙ্গী খোঁজে এ দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ। পা মিলিয়ে হাঁটবার সঙ্গী, মনের কথাটি শোনার সঙ্গী, তার সুখ কিংবা দুঃখের মুহূর্তগুলির অংশীদার, এগুলোও কিছু কম কাম্য নয়। তাবাদে, অর্থ, সম্পদ, সন্তান, নিরাপত্তা, এসব তো কাম্যই। সুবাসী শেষেরগুলো পাচ্ছে ঠিকঠাক। কিন্তু প্রথমগুলো ওর কাছে অপ্রাপ্ত থেকে গেল। তার মানুষটির হাঁটা-চলার মধ্যে, কথা বলার মধ্যে, সুবাসীর দিকে তাকাবার মধ্যে কোনো ছিরিছাঁদ নেই। নেহাতই আটপৌরে সেই ধরন। সুবাসীর মনে ভরে না। কানের কাছে ডগমগ প্রেমের গান গাইলেও লোকটির কোনো বাড়তি প্রতিক্রিয়া হয় না। গান গাইতে বললে চেরা চেরা গলায় মান্ধাতার যুগের কীর্তন গায়। বাইরে যত না, ভেতরে ভেতরে একেবারে বুড়িয়ে গেছে লোকটি। এমন বুড়ো-বুড়ো কাঠি-কাঠি রসকষহীন মানুষের সঙ্গকামনা কেনই বা করতে চাইবে এক যুবতী রমণী! কেনই বা তার সঙ্গে পা মিলিয়ে হেঁটে সুখ পাবে, তার সঙ্গে আমোদ ফূর্তি করতে চাইবে, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে থাকবে, শরীরে শরীর মিলিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে চাইবে, কেনই বা!

একদিন হাসতে হাসতে বলেই ফেরে সুবাসী, তুমার গায়ে কেমন বুড়া-বুড়া গন্ধ!

মনোহর এমন কথায়ও হাসে। আশ্চর্য! এমন কথায়ও রাগ হয় না মানুষটার! হীনমন্যতা জাগে না! বলে, হাঁ—সাতচল্লিশ গিয়ে আটচল্লিশে পড়লাম। আর দু-বছর বাদে পঞ্চাশ!

সুবাসীর মনে হয়, নিজের বয়েসটাকে সর্বদাই মনের মধ্যে বাঁধিয়ে রাখে মনোহর। নিজের পকেটেই রাখে যত্ন সহকারে। পাছে বয়েসের হিসেবটা হারিয়ে যায় মুহূর্তের বেভ্ভুলে। ওটাই তার আসল রোগ। নিজের বয়েসটাকে সে এক পলকের জন্য ভোলে না। ভুলতে চায় না। মানসাঙ্কের হিসেব কষবার ভঙ্গিতে সারাক্ষণ বিড়বিড়িয়ে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তার বয়েস এত হল, তত হল। সুযোগ পেলেই সে তার বয়েস বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটা তুলবেই। আসলে, বয়েসটাকে যে সদাসর্বদা ভুলে থাকতে হয়, কেবল এই প্রক্রিয়াতেই যে বয়েসের ওপর টেক্কা মারা সম্ভব, এটাই বোঝানো যায় না মানুষটাকে। সুবাসী লোকটার এই একটা ব্যাধিকে তাড়াতে পারল না কিছুতেই। চেষ্টা চালিয়ে চালিয়ে সে এখন পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়েছে। ইদানীং সে মনোহরকে তার যৌবনের সঙ্গী পদ থেকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে। ঘর-গেরস্থালির সব কাজ করে। মনোহরের সেবাযত্নও যথাসাধ্য। কিন্তু তার যুবতী মনটা মনোহরের সঙ্গ পায়ও না, চায়ও না। সে ইদানীং একা একা যতটুকু সম্ভব আমোদ-ফূর্তি করে। একা একা সুখ আহরণে বেরোয়। একা একা গান গায়। একা একা হাসে। কখনো, কচিৎ-কদাচিৎ, মনোহর ওকে ওসব ব্যাপারে একটু আধটু সঙ্গ দিতে চাইলে, ইদানীং সেটা অসহ্য লাগে সুবাসীর। ওকে যতখানি সম্ভব তাচ্ছিল্য করে এক ধরনের

মজা পায়। পূজা-পার্বণে, মেলায় কিংবা যাত্রা-সিনেমায় যেতে হলে সে পাড়ার সমবয়সী বউ-ঝিদের সঙ্গেই যায়। সেই দলে মনোহরকে কেউ ঢোকাতে চাইলে অমনি ঠোঁট উলটে তা বাতিল করে দেয় সুবাসী। উ গিয়ে কী কইর্‌বেক? উয়ার দকান দেইখ্‌বেক কে? মেলায় গিয়ে ঠায় একঠাঁই খাড়াই থাইক্‌বেক। যাত্রার আসরে বইসে ঢুলবেক। আর, তাকে চিনে না যারা, দেখ্‌বা মাত্তর জিগাবেক, হ্যাঁ লো সুবাসী, খুড়শ্বশুর নাকি বটঠাক্‌রের সাথ মেলায় আইছিস, তুয়ার বর কুথা লো? অবলীলাক্রমে কথাগুলো বলে ফেলে সুবাসী, হি-হি করে হাসতে থাকে। সই-গঙ্গাজলরা ফ্যালফ্যাল চোখে সেই হাসিখানি দেখতে থাকে। বাস্তবিক, নিজের যৌবনের সঙ্গীর পদ থেকে মনোহরকে বাতিল করে দিয়েছে সুবাসী। মনোহরের শরীরের বুড়ো-বুড়ো গন্ধটা পাকাপোক্তভাবে লেপটে গিয়েছে ওর ঘ্রাণে। তার যৌবন সদা-সর্বদা নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মণ্টুদাকে নিয়ে ভরিয়ে ফেলতে চায় তার বুকের মধ্যেকার একান্ত গেরস্থালি। কল্পনায়।

মণ্টুদাকে প্রথম জীবনে ভালোবেসেছিল সুবাসী। প্রথম জীবনের ভালোবাসার রঙটা বড় পাকা হয়। মনোহরের সঙ্গে যখন ওর বিয়ের উপাড় আসে, শোনা মাত্তর বাপ-ভাইয়েরা আহ্লাদে আটখানা। শান্ত-শিষ্ট, বুদ্ধিমান-বিবেচক মানুষ। চায়ের দোকানের কল্যাণে সংসারটি সচ্ছল। চরিত্র ভালো। নেশাভাঙ নেই। তার ওপর একেবারে সাফ-সুতরা সংসার। ওপক্ষের কোনো বাচ্চা নেই। এমন একখানা সাজানো সংসারের একচ্ছত্র মালকিন হবে সুবাসী। আগের পক্ষ সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গেছে, ও শুধু যাবে নিরঙ্কুশ ভোগ করতে। দোষের মধ্যে শুধু এই, দোজবর, বয়েসটা সামান্য গড়ানির দিকে। সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না কেউ। পুরুষ-মাইন্‌সের ফের বইস! সোনার ফের বাঁকা-ত্যাড়া! ঢের ঢের শহুরে চাকুরিয়া বাবুরা অমন বইসে পথম বিয়া করে। সুবাসী তখন মণ্টুদার স্বপ্নে বিভোর। দিদি মারফত ইচ্ছেটা চালান করেছিল মায়ের কাছে। মায়ের থেকে বাপ অবধি পৌঁছেছিল কথাটা। শুনে তো বাপ রেগে কাঁই। উই সুয্য দাসের ব্যাটা? উটাকেই পছন্দ সুবাসীর? উটার আছে কী? লক্কা-পায়রার পারা ঘুইরে বেড়ায় পাড়াময়। খালি বাপের হুটেলে ভাত ধ্বংস, সিনিমা হলে সিনিমা দেখা, আর বখাটে ছগ্‌রাগুলানের সাথে দিনরাত আড্ডা-গুলতানি। অমন অপগণ্ড ছগ্‌রার হাত ধইর্‌তে চায় সুবাসী? বউকে খাবানো দূরের কথা, উয়ার লিজ্যার ভাতেরই ত ঠিক-ঠিকানা নাই। কাজেই মনের ইচ্ছেটা মনের মধ্যেই গিলে ফেলতে হয় সুবাসীকে। মনোহরের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যায়।

আগে ভয় পেত, সংকোচ বোধ করত, এখন সুবাসী একটু একটু করে নিজের বুকের মধ্যেকার একান্ত গেরস্থালিটিকে দেখায় মনোহরকে। অবলীলায় বলে চলে মণ্টুদার গল্প। মণ্টুদা কী পরিমাণ চোখে-মুখে, কত তার গুণ, সুবাসীকে কতখানি চাইত, কামনা করত, সুবাসীকে তুষ্ট করবার জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করত—সাতকাহন করে সেই গল্প করতে পারে মনোহরের কাছে। বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলে। ভয় পায় না। ভয় পাওয়ার কথাটা মনেই হয় না তার। কুমারী জীবনের রোমান্সের গল্প যে স্বামীর কাছে গোপন রাখতে হয়, সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছে সুবাসী। স্বামীও যে একজন পুরুষ, তার শরীরেও যে পুরুষসুলভ হিংসা-ঈর্ষার বসবাস রয়েছে, এই বিশ্বাসটাই হারিয়ে

ফেলেছিল সে। তবে মেয়ে তো, যত বোকাই হোক, পুরুষের চেয়ে কম। যত খোলামেলাই হোক, পুরুষের চেয়ে কম। ফলে, ওর প্রতি মন্টুদার চোরাটানের কথাটাই বিতাং করে বলে সে। মন্টুদার প্রতি ওর মনোভাবের প্রসঙ্গটা সাবধানে চেপে যায়। কেবল মিষ্টি হেসে, ভ্রুভঙ্গি করে, ঠোঁট উল্টে এমন ভাব করে যেন বাঞ্ছিত কোনো পুরুষ একেবারে শত চক্ষুর সুমুখে চকচকিয়ে চুমু খেয়ে ফেলেছে, চুমুটা না পারছে সে গিলতে, না পারছে ওগরাতে। তবে তেমন করে বলবার সুযোগ আসে অন্যের কাছে, সমবয়েসী পড়শি অথবা সই-গঙ্গাজল তারা। মনোহর ভুলেও কদাপি তেমন প্রশ্ন তোলে না। মন্টুদার কথা বলতে বলতে সুবাসীর মুখ ব্যথা হয়ে গেলেও মনোহরের মুখের রেখায় তিলমাত্র ভাঙচুর হয় না, ভ্রুসঙ্গমে ভাঁজ পড়ে না তিলমাত্র, চোখের তারায় সামান্যও অস্থিরতা জাগে না। বরং চরম নিরাসক্ত গলায় মনোহর কচিৎ-কদাচিৎ বলে বসে, হাঁ—উঠতি বইসের ছগ্‌রা উ, টাট্টু ঘড়ার পারা তো হবেক্‌ই। সুবাসী শুনে আশ্চর্য মানে। গা জ্বলে যায় তার।

গরম চায়ের গেলাসে পরপর দু-চুমুক দিয়ে তরঙ্গা বলে ওঠে, দাদা গো,, তুমার হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধাই রাইখ্‌ত্যে হয়।

আঁচে হাওয়া দিচ্ছিল মনোহর। আড়চোখে তরঙ্গার দিকে তাকায়। আলাভোলা মুখখানায় আলতো দেমাকের ছোঁয়া লাগে। আর, তাই দেখে তরঙ্গা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। মনোহর বুঝতে পারে না হাসির গূঢ় রহস্য। আসলে মনোহরের মুখের গড়নটাই এমন। খুব সিধে-সাদা তার ছাঁচ। সেই ছাঁচের ওপর দিলখোলা হাসির সামান্য আলো ছড়ালেই সারা মুখ একেবারে সকালের সোনারোদ্দুরে ভরে যায়। আর সেই সোনার সঙ্গে যদি সামান্য পরিমাণে দেমাকের সোহাগা মেশে তো সে এমনই এক অপরূপ ভঙ্গি নেয় যে তরঙ্গা তার হাসিটা থামাতেই পারে না। প্রিয় মানুষের চোখে যে অভিব্যক্তি সরল-সরল লাগে, যারা দেখতে পারে না তাদের কাছে সেটাই ভোঁদাই-ভোঁদাই। যে হাসি দেখে তরঙ্গা অবাক নয়নে চেয়ে থাকে, সুবাসীর কাছে সেটাই লাগে নেহাতই ম্যাড়ম্যাড়ে।

চা খেতে খেতে তরঙ্গা বলে, তুমার বউ চা খায় দাদা?

—খায় বৈকি। আলগোছে জবাব দেয় মনোহর, চা ফের কে নাই খায় এ দোনিয়ায়?

—তুমার বউয়ের কী মজা! দু-বেলা অমন চা খেইতে পায় উ। তরঙ্গার চোখে লোভাতুর দৃষ্টি।

মনোহর মনে মনে হাসে। বাড়িতে তার চায়ের সঙ্গে একেবারেই বৈরী সম্পর্ক। দোকানে রোজ পাঁচশো কাপ চা বানায়, কিন্তু বাড়িতে? সকালে এক কাপ, বিকেলে এক কাপ, কিন্তু সেটাও সুবাসী বানিয়ে না দিলে তার আর খাওয়া হয় না। তাই নিয়ে মাঝে মধ্যেই গোল বাধে। বউ বলে, একটা দিন এক কাপ চা কইর‍্যে লিতে কী হয় তুমার? অ্যাঁ? আমার বলে ঘুম পাচ্ছে। মনোহর গোঁ ধরে বসে, লয়। তুই উঠ। আমি উসব নাই পারি।

—নাই পার মানে কী? বউ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দকানে তেবে লিত্যিদিন পাঁচশো হাজার কাপ চা কে বানায় বটে?

—সে তো দকানে। বাড়িতে চা বানানো আমার দ্বারা হবেক নাই।

—বাড়িতে আর দকানে চা বানানোয় কুনো ফারাক রয়েছে বুঝি?

—আছে, আছে। মনোহর রহস্যময় হাসে, সে তুই বুঝবি নাই।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লিত্যিদিন রশি টানাটানি।

বাপের বাড়ির কেউ এলে সুবাসী হয়তো বলল, চা-টা আজ তুমিই কর না গো। খেইয়ে সুখ হবেক উয়াদ্যার।

—পাগল! মনোহর তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেয় প্রস্তাবটা। নিজের ঘরে আরও একটা চায়ের দকান খুলি আর কী!

শোনামাত্র সুবাসী রেগে কাঁই।

মনোহর ওকে বুঝ্ দেবার চেষ্টা করে। বলে, এ হইল্যাক তুয়ার সংসার। বটে কিনা? ত, তুয়ার সংসারে চা কইর‍্যে খাবাবি তুই। চাওয়ালার চা ক্যানে দিবি কুটুমকে?

—ঘরে তুমি চাওয়ালা?

—লয়? চা বানালেই চাওয়ালা।

নাচার হয়ে অবশেষে হার মানে সুবাসী। উনুন জ্বেলে চা বসায়। চায়ের জল যত ফুটতে থাকে। তার চেয়ে দ্বিগুণ ফুটতে থাকে সে নিজে। মানুষটা ওর সব দাবি-আবদার বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়, কেবল ঐ চা করতে বললে যে কেন এতখানি গোঁয়ার আর জেদি হয়ে ওঠে! সুবাসী ভেবে কূল পায় না।

সংসারের এসব খুঁটিনাটি কথা তরঙ্গাকে বলে না মনোহর। ফলে, হয়তো বা তরঙ্গা এমন ধারণাটি বয়ে নিয়ে ঘরে ফেরে যে মনোহরের ভাগ্যবতী ঘরোয়ালিটি দিনে পঞ্চাশবার মনোহরের সোনাহাতের সোনা চা খেয়ে একেবারে মজে রয়েছে।

চাটুকু শেষ করে তরঙ্গা তার নাড়ুর ঝাঁপিটি খোলে। চিকচিকি কাগজের ব্যাগে ভরা নাড়ুগুলি সাবধানে ভরে দেয় দোকানের কাচের জারে।

চা ছাঁকতে ছাঁকতে মনোহর বলে, আরও কেজি দুয়েক লাইগ্‌থ রে। কাল ত দু-কেজি লাড়ু সইন্‌ধা পহরেই শেষ।

তরঙ্গা শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কাল বইল্‌লে নাই, ইখন আমি বাড়তি লাড়ু পাই কুথা?

—তুই বানাবি নাই বিকাল নাগাদ?

—বানাব তো। কিন্তু লিয়ে আইবেক কে? বলতে বলতে তরঙ্গার চোখের মণিজোড়া সহসা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তুমি বিকালে গিয়ে লিয়ে আইতে পারবে, দাদা?

—আমি? মনোহর ইতস্তত করে, আমি কি সময় পাব? দকান বন্ধ কইর‍্তে ঠায় দুফোর। তারপর ঘরে যাব, সিনান কইর‍্ব, খাব...। বরং ভোলাকে পাঠাই দুবো এক ফাঁকে।

—না —। তরঙ্গা বাচ্চা মেয়ের মতো আবদার জোড়ে, তুমাকেই যেইত্যে হব্যেক। বলো, যাবে?

মনোহর হ্যাঁ, না কিছুই বলে না। সে চোখের সুমুখে গেলাস তুলে ধরে লিকারের রঙ পরীক্ষা করতে থাকে।

গলাটাকে খাদে নামিয়ে এনে তরঙ্গা বলে, তুমার সাথ একটা কথা রয়েছে দাদা। যেইও, বলব।

৩.

দুপুর না গড়াতেই পায়ে পায়ে হাঁটা দেয় মনোহর। তরঙ্গার দুয়োরে পৌঁছুবার আগেই রোদ্দুরের তেজ কমে আসে।

তরঙ্গা বুঝি ঘর-বার করছিল। তারা সারা মুখে ফুটে ওঠে সাফল্যের হাসি। চট-জলদি একখানা তালাই পেতে দেয় দাওয়ায়।

মনোহর বলে, বুসব নাই। দকান খুইল্‌তে হবেক। ভোলাটা উনানে আঁচ দিল্যাক কিনা কে জানে!

—ইস! তরঙ্গা ভুরুজোড়ায় এক অপরূপ ভঙ্গি করে, এক্ষুণি যাবে কী? পথম আইলে, এক কাপ চা না খাবাই ছাইড়ব তুমাকে?

মনোহরকে বসিয়ে রেখে সাত-তাড়াতাড়ি চা বসাতে ছোটে তরঙ্গা।

কেউ আদর করে কিছু দিতে চাইলে না করতে পারে না মনোহর। আর, তরঙ্গাটা সব ব্যাপারে এমন লেপটে ধরে! আসলে মেয়েটার মধ্যে এক ধরনের ছেলেমানুষী রয়েছে। চলন-বলন দেখে পাঁচজনায় উল্টেপাল্টা ভেবে নেয় বটে, তবে মনোহরের বিশ্বাস, মেয়েটা খারাপ নয়। আসলে, ওর সময়টা চলছে খারাপ। বিবাহিত জীবনের পাকাপোক্ত ঘাটটিকে হারিয়ে এখন হাওয়ার ঠেলায় এলোমেলা উদ্দেশ্যহীন ডিঙ্গা। অনাগত দিনগুলোকে নিয়ে দিনরাত ভাবছে মেয়েটা। যে কোনো গতিকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য মরিয়া। কিন্তু একটা সহায় সম্বলহীন যুবতীকে সাহায্য করবে অথচ তার দাম চাইবে না, এমন মানুষ তো এ সংসারে বিরল। শুধু মনোহরের সামনে এলে ওর চোখের কোণা অজান্তে চিকচিকিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে ওঠে, দাদা, তুমি বড় ভালো। মনোহর পরখ করে দেখেছে, তরঙ্গার এমন কথায় কোনো মালিন্য নেই। খুব নিষ্পাপ উচ্চারণ। কিন্তু দুনিয়া তো অত সরল নয়, পাঁচজনে, কাজেই, বাঁকা চোখে তাকায়, বাঁকা ইঙ্গিত করে। কী আর করা যাবে!

চায়ের কাপটা সুমুখে নামিয়ে দিয়ে তরঙ্গা বলে, খাও দাদা। ক্যামন হইল্যাক কে জানে? তুমার মতন মনিষ্যিকে চা দিতে লজ্জা।

—ক্যানে? চুমুক দেবার আগেই মুখ তোলে মনোহর।

—বা-রে, তুমি হইলে চা বানানোর রাজা।

মনোহর নিঃশব্দে হাসে। চুমুক দেয় চায়ে। তরঙ্গা ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বলে, কেমন হয়েছে দাদা?

মনোহর তাকায়। চোখের কোণে হাসি। বলে, দারুণ।

— দারুণ না ছাই। তুমি মিছে বইল্‌ছ।

—না রে, ভালোই হয়েছে।

—তুমার মতন হয় নাই।

মনোহর এবার হেসে ফেলে, তা অবশ্যি হয় নাই।

—ক্যানে হয় নাই? তরঙ্গা পুনরায় অবুঝ হয়, সেদিন যেমন যেমন বইল্‌লে, ঠিক তেমন করেই ত বানালাম। তবে?

মনোহর হাসে। সে হাসিতে সামান্য দেমাক।

তরঙ্গা একেবারেই ভেঙে পড়ে। খুব অসহায় গলায় বলে ওঠে, তুমার মতন চা বানাতে পারি না ক্যানে দাদা? বলো? ক্যানে পারি না? সবই তো দিই মাপে মাপে। যেমনটি তুমি বইলেছ। তেবে?

সত্যি বটে, মনোহরের দোকানে বসে চা খেতে খেতে তরঙ্গা মাঝে মাঝেই বায়না ধরে, চা তিয়ার করাটা আমাকে শিখাই দিবে, দাদা?

—চা তিয়ার করা শিখে তুই কী কইর্‌বি? কাকে বানাই দিবি চা? বলেই বেজায় অপ্রস্তুতে পড়ে যায় মনোহর। তরঙ্গার ক্ষতস্থানে অজান্তে সামান্য খোঁচা দিয়ে ফেলেছে।

তরঙ্গা সেকথা গায়েই মাখে না। বলে, তুমি শিখাই দিবে কিনা বলো না?

মনোহর চা বানানোর রসায়নটা বোঝায় তরঙ্গাকে। বলে, চা তিয়ার কইর্‌বার আসল কথা হইল্যাক মাত্রাজ্ঞান। কত কাপ চায়ে কতখানি চা, কতখানি চিনি, কতখানি দুধ...।

দু-দিন বাদেই তরঙ্গা এসে হল্লা জুড়ে দেয়, দাদা গো, হচ্ছে নাই। যেমনটি বইল্‌লে, মাপ কইর্‌য়ে দিল্যাম। তব্বো—।

মনোহর আবার হাসে। বলে, শুধু ঠিক মাপে দিলেই তো হইল্যাক নাই। সময় জ্ঞান থাকা চাই। জল কতখানি ফুইট্‌ল্যে দুধ, চিনি, আর কতক্ষণ বাদে চা-পাতি, এলাচদানা—।

দু-দিন বাদে তরঙ্গা ফের এসে হামলে পড়ে, দাদা গো হচ্ছে নাই। মাপ মেইনেছি, সময় মেইনেছি, তব্বো—। বলতে বলতে অভিমানে ভেঙে পড়ে, তুমি ঠিকঠাক শিখাওনি। ষোলআনা বিদ্যা দাও নাই।

মনোহর জানে, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। মাত্রাজ্ঞান আর সময়জ্ঞান। এই দুটি বস্তুর ওপর একটা মানুষের চরিত্র নির্ধারিত হয়। এদুটো কেউ চাইলেই ঠিক রাখতে পারে না। সেই শিশুকাল থেকে তিলতিল গড়ে তুলতে হয়। আসলে, মনোহরের নিজস্ব বিশ্বাস, চা বানানোটা ঠিক শেখার বস্তু নয়। ওটা থাকে তার রক্তে, চরিত্রে।

তরঙ্গার দিকে অবোধ বালকের মতো তাকায় মনোহর। বলে, দিয়েছি তুয়াকে ষোলআনাই। তেবে—।

—তেবে কী? তরঙ্গার দুচোখে অসহায় রোষ।

মনোহর হাসে। দু-চোখ দিয়ে যেন হাত বুলিয়ে দেয় তরঙ্গার পিঠে। বলে, আসলে, চা, চিনি, দুধ আর এলাচদানা, —এ বাদেও আরও একটা চিজ লাগে রে।

—সেই চিজটা কী? সেটার কথা বল নাই ক্যানে?

—সেটা হইল্যাক বটে দিল্‌। দুনিয়ার সব চিজ তিয়ার করতেই সেটাই লাগে। সেটাই দিস নাই তুই। তুয়ার দিল্‌টা তো উইড়্যে বেড়াচ্ছে। থির নাই একঠাঁই।

আজও মনোহরের চা খাওয়ার ফাঁকে কথাটা তোলে তরঙ্গা। একেবারে নাছোড়বান্দা।

চায়ের গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মনোহর বলে, উই যে, বলল্যাম সেদিন, চা তিয়ার কইর্‌তে আরও একটা চিজ লাগে।

—বাজে বোকো নাই। তরঙ্গা এবার সত্যি সত্যি খেপে যায়, তুমি শিখাবে না, সিটাই বল সাফ সাফ। চোখের কোণা চিকচিকিয়ে ওঠে তরঙ্গার।

মনোহর ভারি বিপাকে পড়ে। একটা সমঝোতা চায়। বলে, শুধুমুদু কাঁদিস

ক্যানে ? চা-টা তো ভালোই তিয়ার কইরেছিস। রোজ রোজ কইর্‌তে কইর্‌তে...। আচ্ছা কাল যখন দকানে যাবি, আমার সাইক্ষাতে হাতেনাতে কইর্‌বি।

ততক্ষণে মনোহরের মুখের ওপর সরাসরি চোখ রাখে তবঙ্গা। ভেজা চোখে তাকায়। বলে, তুমাকে তাইলে মনের কথাটা খুল্যে কই দাদা। নাড়ুতে আমাব পুষাচ্ছে নাই। বিক্রিবাটাও তেমন হয় না। আজকাল কত কিসিমের মিষ্টি উঠ্যেছে বাজারে। চিনি-নারকোলের ঢ্যালা কে কিনে খাব্যেক বলো ?

—তো, তুয়ার ইচ্ছাখান কী ?

—সিটাই বইল্‌বার তরে তুমাকে ডেকেছি। তরঙ্গা সামান্য ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে, ঘরের সুমুখে একটা চায়ের দকান খুইল্‌বার ইচ্ছা। খইদ্দার পাব। তার উপর যদি তুমার পারা চা তিয়ার করাটা শিখে নিতে পারি, তো...। মনোহরের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এবার আকাশের গায়ে থাপনা করে তরঙ্গা। বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে, জীবনটা তো বরবাদ হইয়ে গেল্যাক। পেটটা তো কুনো গতিকে পাল্‌তে হব্যেক। বলতে বলতে এক সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে তরঙ্গা।

৪.

পাড়ার সমবয়েসীদের সঙ্গো মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে যায় সুবাসী। মনোহরের দোকানের সুমুখ দিয়েই যায়। ঐ সময়টা সুবাসী অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। গড়গড়িয়ে চলে যায় ওদের ভ্যান-রিসকা। চায়ের দোকানটা পেরিয়ে গিয়ে তবে সহজ হয সুবাসী। সই-গঙ্গাজলেরা ঠেস দিয়ে কথা কয়। থামবি নাকি লো টুকচান, ও সুবাসী, তুযার মরদের দোকানে এক কাপ কইর‍্যে চা খাবাবি নাকি ? তুয়ার মরদ নাকি চা বানায অমৃত্তের তুল্য। বারবার মরদ শব্দটা সুবাসীর মনের চিকন পর্দাখানিকে ছুঁয়ে যায়। সিনেমা হলে যেমন একটা আলোর রেখা পর্দার ওপর পড়বা মাত্তর নিমেষে ছবি হয়ে যায়, ঠিক তেমনই, মরদ শব্দটা আলো হয়ে বুকের পর্দায় পড়বামাত্রই একখানা ছবি তৈরি হয়ে যায় মনে। মরদের ছবি। ছবিখানা যদিও বা মন্টুদার সঙ্গো খানিক মেলে, মনোহরের সঙ্গো তিলমাত্র নয়। কাজেই সুবাসী সঙ্গীদের কথাগুলো শুনেও না শোনার ভান করে। অন্যমনস্কতার ভান করে পেরিয়ে যায় পথটা। মাঝে মাঝে মনে হয়, সঙ্গীরা খুব সরলভাবে কথাগুলো বলে না। বাঁকা শ্লেষের মিশেল রয়েছে তাতে। ওর স্বামী যে চা-ওয়ালা, সেটাই কান কামড়ে বুঝিয়ে দিতে চায় ওরা। সেদিন ইস্টিশনে বইসে রইছি, একটা চা-ওলা কানের পাশটিত্যা এমন জোরে হাঁকল্যাক, অ্যাই-চা-গ্রম-। শুনতে শুনতে অন্য সঙ্গীরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। সুবাসী হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে যায়। 'একটা চা-ওলা'-র মধ্যে চা-ওয়ালার প্রতি যে তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে সেটাই হজম করতে কষ্ট হয় ওর।

টগর যেদিন বলল, হা—দ্যাখ গে যা সুবাসী, তুয়ার মরদ ক্যামন যোগেন দাসের ঝি তরঙ্গার সাথ লটর-পটর কচ্ছে, শুনে সুবাসী খিলখিলিয়ে হাসে। বলে, শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। সারাক্ষণ যে মানুষটা কেবল বুকে কফ জমা আর গাঁটে গাঁটে বাতের গপ্প শুনায়, সে কিনা অন্য মেয়ার সাথ লটকাবেক ! উয়াকে তো তুয়ারা চিনিস

না। বাস্তবিক, মনোহর সম্পর্কে তেমনটা স্বপ্নেও ভাবে না সুবাসী। ওকে কোনো যুবতী মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে কিছু ভাবতে গেলেই সুবাসীর কলকলিয়ে হাসি পায়। বলে, অন্য কথা বল্, মাইন্‌ব। ইট্যা লয়।

শুনে জেদী হয়ে ওঠে টগর। চোখদুটোকে আকাশে তুলে দেয়। বলে, হা—দ্যাখ, বিশ্বাস না হয় তো যেকুনো দিন চইলে যা না তুয়ার মরদের দকানে। দু-ঘড়িটাক বেলায় যাবি। দেইখ্‌বি, ক্যামন ফুল ফুট্যেছে বিন্দাবনে।

সুবাসী কানেই তোলে না কথাটা। বলে, কী যে বলু তুই? আমার চাইতে তুই বেশি চিনু উয়াকে? উ বটে একটা মাক্‌ড়া পাথরের চাঙড়। কুন মেয়া সখ কর‍্যে বসবেক উয়ার উপর! বসত্যে গেলেই পাছায় ফুটবেক। বলতে বলতে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ে।

টগর গাল ফুলিয়ে বলে, তাই হোক তেবে। তুয়ার মরদ, তুই বুঝবি। আমার কুন্ কচুপুড়াটা!

ইদানীং দুপুর বেলায় খেতে আসতে খুব দেরি হয়ে যাচ্ছিল মনোহরের। হাঁড়ি জেগে বসে থাকতে হয় বলে সুবাসী ক্ষেপে টং।

মনোহর বলে, কখন থিক্যে উঠব-উঠব কচ্ছি। কিন্তু তরঙ্গাটা আর নাই উঠে। উয়ার কথা আর ফুরোয় না।

তরঙ্গার প্রসঙ্গে সুবাসীর মনে তিলমাত্র প্রতিক্রিয়া হয় না। শুধু হাঁড়ি জেগে বসে থাকতে হয় বলেই সে ঝামরে ওঠে, গল্পগুজব কইর‍্যে হইলে পরে-পশ্চাতে কর। আমি রোজরোজ হাঁড়ি জেইগে বইসে রইতে লারব। আমার পষ্ট কথা।

ধীরে ধীরে জনে জনে তরঙ্গা-মনোহর উপাখ্যান বাড়ি বয়ে এসে জানিয়ে যায় সুবাসীকে। সুবাসী মন দিয়ে শোনে। চিন্তিত হওয়ার ভান করে। কিন্তু কথাগুলো তার মনের অন্দর অবধি পৌঁছয় না। সে যে তার মানুষটার লগার তেজ ভালো করেই চেনে। শুধু তরঙ্গা কেন, এ দুনিয়ার কোনো মেয়ামানুষের সঙ্গে ভাব জমানোর তিলমাত্র ক্ষমতা নেই মানুষটার। সেই মনটাই যে তার মধ্যে অনুপস্থিত। সে যে একটা মাকড়া পাথর। রসকষহীন পাথর। শুধু, তরঙ্গাটা রোজ রোজ বিনি-পয়সায় চা-বিস্কোট খাওয়ার লছনায় আসে কিনা সেটাই ভাবতে থাকে সুবাসী। নেহাত আর্থিক কারণেই ভাবনাটা আনাগোনা করে মনে। আলাভোলা মানুষটাকে হয়তো বা ঠকিয়ে খাচ্ছে ছিনার মাগী।

তরঙ্গার প্রসঙ্গটি মনোহর নিজের থেকে তোলায় কথাটা পাড়বার সুবিধে হয়ে যায় সুবাসীর। বলে, অত বেলা অবধি কী করে মেয়েটা?

—কী আবার করবেক? মনোহর আলগোছে জবাব দেয়, চা-ফা খায়, গল্প-গুজব করে।

—চা যে খায়, দাম-টাম দেয়?

—দাম দেয় বৈকি। বিনি-পয়সায় ফের চা খায় নাকি কোউ?

—সিট্যা হলেই ভালো। সুবাসীর ঠোঁটজোড়া নিজের থেকেই বেঁকে যায়।

ইদানীং সুবাসী লক্ষ করছে, মনোহরের মধ্যে একটা চেকনাই ভাব আসছে। সেই নীরস, কাঠকাঠ ভাবখানা যেন নেই ততখানি। মাকড়া পাথরের চাঙড়টাকে সামান্য

ভিজে ভিজে লাগে ইদানীং। দুপুর বেলায়, চানের সময়, কাপড়-চোপড়গুলোকে যত্ন করে কাচে। পরিপাটি কবে নীল দেয়। আগে হপ্তায় একবার দাড়ি কামাত কিনা সন্দেহ, এখন একদিন অন্তর কামায়। মাথার চুলে সাবান ঘষে হপ্তায় একদিন। সব মিলিয়ে বেশ ছিমছাম থাকবার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে ওর মধ্যে।

নানা জনে নানা ইঙ্গিত করে। পুরুষ মানুষ নাকি চিরটাকাল বেওয়াবিশ কুত্তার জাত। যার খোলায় গাঢ় ফ্যানভাত পাবেক, উয়ার পেঁচ-পাড়াতেই ডেরা বাঁধবেক। পুরুষ মাইন্‌সের নাকি বইস বলে কিছু হয় না। বরং বয়স যত বাড়ে, রস নাকি ততই গাঢ় হয়। এক্কেরে, যাকে বলে, দুধ মেইরে ক্ষীর। ব্যাপারটা নিয়ে পরিহাস করতে গিয়েও সুবাসীর ইদানীং খিচ লাগে মনে। মনোহরের অকস্মাৎ পরিবর্তনগুলো যেন বেশি বেশি করে নজর কেড়ে নেয়। সন্দেহ ধীরে ধীরে দানা বাঁধে অজান্তে। যত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যাই করুক, যতই না কেন হেসে উড়িয়ে দিক, এ-দেশের মেয়েরা, স্রেফ নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে, একটু বেশি মাত্রায় সন্দেহপ্রবণ। এক সময় সুবাসীকেও একটা অচেনা সন্দেহ একটু একটু করে কুরে খেতে থাকে। তার তো মনোহরের সামনে কোনো কালেই রাখঢাকের ব্যাপার নেই, কাজেই কথাটা একদিন সরাসরিই পাড়ে সে। বলে, উই ভাতারছাড়ীর সাথ নাকি খোব লটরপটর কচ্ছ আজকাল ? ব্যাপারটা কী বটে ?

—যাহ্, কী যে বলু ! মনোহর হেসেই উড়িয়ে দেয়, এই বইসে ফের দুশরা মেয়া ! তুই কি পাগল হইলি ?

—আমি পাগল হব ক্যানে ? সুবাসী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, দুনিয়ার লোক তুমাদ্যার রঙ্গের কথা বইল্‌তে বইল্‌তে পাগল। যা রটে, কিছো তো বটে।

মনোহর আবার হাসে। বলে, লোকের কথা ছাড়্। তুয়ার লিজ্যার কী মনে হয়, সিট্যাই বল্।

সুবাসী কেমন দোটানায় পড়ে যায়। মানুষটা সম্পর্কে আর যাই ভাবুক, চরিত্রহীন, লম্পট, অমনটা তার মনে ঘাই মারে না কোনোকালেই। শুধু যে বয়েস হয়েছে তাই নয়, শুধু যে রসকষহীন পাথর গোছের তাও নয়, এ সংসারে আসা অবধি সে জনে জনে যা শুনে এসেছে এতকাল, তাতে করে মনোহরকে চরিত্রহীন, পরনারীতে আসক্ত এমনটা ভাবাই কষ্টকর। পাড়ার প্রত্যেকটি মানুষ মনোহরের চরিত্রের প্রশংসাই করে এসেছে চিরকাল। কোনোদিন তাকে তিলমাত্র বেচাল হতে দেখেনি কেউ।

সুবাসী চুপ করে থাকে। একটু বাদে বলে, আমি না হয় নাই ভাবলাম, চারপাশের মানুষজন তো উল্টা-পাল্টা ভাইব্‌ছে। সিট্যাও তো ভালো লয়।

—চারপাশের মানুষজনের কথা বাদ দে। মনোহরের গলা সহসা কর্কশতার সীমানাটিকে ছোঁয়, মানুষ হইল্যাক মাছির জাত। মুখে মুখে নোংরা বয়ে বেড়ানোতেই উয়াদ্যার সুখ।

—কিন্তু মেয়াটা লিত্যিদিন আসে ক্যানে তুমার পাশ ? উয়ার কাম্‌টা কী উখ্যেনে ? উয়ার বাড়ি-ঘর নাই ?

—নাই। মেয়াটার কপাল ফাটা। মনোহরের গলাতে চাপা সমবেদনা, বরটা আঘাটায় বেঘাটায় যাত্রা গেয়ে বেড়ায়। যোবতী মেয়া বাপের দোরে পইড়ে রয়েছে

বারোমাস তিরিশ দিন। ভাই-ভাউজরা উয়াকে দিনরাত চাবলায়। আসে। নারকোলের নাড়ু দিয়ে যায়। দু-দণ্ড মনের কথা কয়। কাঁদে। চইলে যায়। তাবলে...। মনোহর এবার মোক্ষম যুক্তি প্রয়োগ করে, তাবাদে, যোবতী মেয়ার সাথ ফস্টিনস্টি কইর্‌বার বইস আছে আমার? বল্?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে সুবাসী। দুলতে দুলতে এক সময় থেমে যায় দোলনা। সুবাসী শান্ত হয়। তার বিশ্বাস হয়, মেয়েটার মনে যদিও বা কোনো পাপ থাকে, এ মানুষটা এসবের মধ্যে নেই। উয়ার সেই ক্ষমতাই নাই যে। থাকলে সুবাসী জানতে পেত। বউয়েরা সেটা সবার আগে জানতে পারে।

৫.

আজ দোকানটা বন্ধ করতে একটু দেরিই হয়ে গেল মনোহরের।

ঘরে পৌঁছেই দেখে বাচ্চাটা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দাওয়ায় চুপটি করে বসে রয়েছে সুবাসী। বেজায় গম্ভীর লাগছে ওকে। চোখদুটো খরিশ সাপের মতো দপদপিয়ে জ্বলছে।

মনোহর বাড়িতে পা রাখা মাত্রই সামনে এসে টানটান হয়ে দাঁড়ায় সুবাসী, এতক্ষণ কুথা ছিলে তুমি।

—কুথায় ফের থাকব? মনোহর বিস্মিত, দকানে ছিলাম।

—মিছা কথা। ডাহা মিছা কথা। সুবাসীর দু-চোখে থিকথিক করে বিষ, পচু বইল্‌ল্যাক, সইনঝা থিকে তুমি দকানে ছিলে নাই। কুথা গিছলে?

—সইন্‌ঝা থিক্যে? মনোহর মনে করবার চেষ্টা করে, সইন্‌ঝা ব্যালায় তো দকানে ছিলাম। পচুকে তো দেখি নাই।

—পচু মিছা কতা বইল্‌বার ছেলা লয়। ইদানীং তুমার ড্যানক গজাইছে একজোড়া। সব খবর পাই। দুমদাম পা ফেলে ঘরে ঢুকে যায় সুবাসী। পিছু পিছু ঘরে ঢোকে মনোহর। বলে, শুধুমুদু পরের কথায় লাচিস লাই। পচু একটা লাব্বাক।

—দুনিয়ার সক্কলে লাব্বাক, তুমি কেবল সাউধ্! সত্যি কথাটা বইল্‌তে লারছ যে উই ভাতারছাড়ীর সাথ সিনিমায় গিছলে?

—সিনিমায়! মনোহর আকাশ থেকে পড়ে, সিনিমা আমি দেখি নাকি?

—ইদানীং দেখছ। সব খবরই পাই। আর লুকাঁই রাইখত্যে লারবে তুমি। মেয়াটা তুমাকে খাচ্ছে। উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে সুবাসী।

মনোহর ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় সুবাসীর কথাগুলো। বলে, যত সব বাজে ভাবনা ইদানীং খেইলছে তুয়ার মনে। ছাড় দিখি উসব। খেইতে দে।

—ছাই দুবো। সুবাসী হিংস্র হয়ে ওঠে সহসা, উনান থিক্যে বাহার কইর‍্যে কুলার বাতাস দিয়ে থাণ্ডা কইর‍্যে রেখ্যেছি। তুমি ইখ্যেনে সিখ্যেনে লটর-পটর কইর‍্যে বেড়াবে, আর আমি তুমার তরে পঞ্চব্যঞ্জন রেইঁধে আঁচল-চাপা দিয়ে বইসে রইব মাঝরাত তক্ক? বলতে বলতে সহসা উন্মাদিনীর পারা দেওয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করে সুবাসী। চিল-চিৎকার জোড়ে। প্রথমে মনোহরের বাপ-মা, চোদ্দগুষ্টিকে গালাগাল দেয়, নিজের বাপ-মা, ভাইদের শাপ-

শাপান্ত করে, আপন অদৃষ্টকে দোষ দেয়, এক সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। মনোহর ঘরের মধ্যিখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে পাথর হয়ে যায়। এক সময় তার ঠোঁটের কোণে পলকের তরে উঁকি মারে ভারি রহস্যময় হাসি। উঁকি মেরেই মিলিয়ে যায়।

এক সময়ে ঘুরে দাঁড়ায় সুবাসী। মনোহরের দিকে হিংস্র চোখে তাকায়। বলে, আমি আর থাইক্‌ব নাই এ ঘরে। নুনাকে লিয়ে কালই চইলে যাব বাপের দোর। আর জীবনেও এ সন্‌সারের মুখোদশ্‌শ্‌ন কইর্‌ব নাই। থাকো তুমি উই ভাতারছাড়ীকে লিয়ে। উয়াকে বিয়া করো। তা-পর দিনরাত চা তিয়ার করা শিখাও।

সুবাসীকে আজ একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। মনোহর অবাক চোখে দেখতে থাকে ওকে। বউটা তার চিরকালই একটু বেশি মুখরা। বিশেষত মনোহরের ক্ষেত্রে তার জিহ্বাখানি সর্বদাই একটু বেশি মাত্রায় ধারাল। কিন্তু আজ বুঝি একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। মনোহর থম মেরে বসে থাকে মেঝের ওপর। সুবাসীকে একটুখানি ঠাণ্ডা হওয়ার সময় দেয়। একসময় বলে, যা খুশি বল, যা খুশি কর, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল্‌তো, তুয়ার কি সত্যিসত্যি বিশ্বাস হয়, একটা মেয়ার সাথ গল্প-গুজব করলেই আমি উয়ার সাথ লটকাই যাইতে পারি? আমার কি আর সে বইস আছে?

—পার, পার, পার। সাপিনীর মতো ফণা তুলে দাঁড়ায় সুবাসী। বলে, বিশ্বাস্‌ হয়, হয়, হয়। পুরুষ মাইন্‌ষের ফের বইস! সুধীর জেঠা সত্তর বছর বইসে গুযাল-কাড়্‌নির প্যাটখ্যান্‌ তাইলে কইর্‌ল্যাক কী কইর‍্যে? বলো? তুমাদ্যার মৌচাকে অঢেল মধু। সব বইসেই ঝরে। জাইন্‌থে কিছো বাকি নাই আমার!

মনোহর কথা বলে না। স্থির, শান্ত হয়ে বসে থাকে। বুঝতে পারে, নিদারুণ ক্রোধে পাগল হয়ে আজ রান্নাবান্না কিছুই করেনি সবুাসী। রান্নাঘরে ঢুকে ঢকঢকিয়ে জল খায় সে। কলতলায় গিয়ে হাত-পা ধোয়। ফিরে এসে দেখে মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে সুবাসী। চৌকি থেকে ছেলেটাকেও নিয়ে নিয়েছে পাশে।

মনোহর ধীরপায়ে গিয়ে চৌকিতে শুয়ে পড়ে।

রাত তখন অনেক।

ধীরে ধীরে পারদটা নামছিল। শরীরের মধ্যে কিলবিলিয়ে ওঠা সাপগুলো একটু একটু করে নেতিয়ে পড়ছে। শান্ত হয়ে আসছে সুবাসীর মনটা। বুকের উনুনের গনগনে আগুনটা নিভছে।

অন্ধকারে বাচ্চাটা ভয় পায় বলে একখানা জিরো বাল্ব জ্বলতে থাকে সুবাসীর শোবার ঘরে। বাল্বটা জ্বলছিল। ঝাপসা আলোয় ভরে গিয়েছে ঘর। সুবাসী সেই আলোয় ঘাড় ঘুরিয়ে মনোহরকে দেখে। পা দু-খানা ভাঁজ করে নিঃসাড়ে শুয়ে রয়েছে মনোহর। সুবাসী বুঝতে পারে না, জেগে রয়েছে, নাকি ঘুমিয়ে।

আসলে, পাঁচজনে সর্বদা পাঁচ কথা বলে মনটা এমন বিষিয়ে দেয়! চারপাশে উল্টা-পাল্টা কত ঘটনাই তো ঘটছে। আর, মানুষ যে কখন কীভাবে বদলায়! তা বলে, নিজের মানুষটাকে অতখানি খারাপ ভাবারও তো কোনো যুক্তি নেই। এতদিন তো দেখছে মানুষটাকে বেচাল তো কিছুই নজরে পড়েনি আজ তক্ক। লোকটার স্বভাবেই

নেই তেমনটা। অথচ রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কত কটূ-কাটব্যই না করল লোকটাকে! রাতভর না খাইয়ে রাখল। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চলে সুবাসী। পচুর কথাগুলোকে মগজের মধ্যে ক্রমাগত খেলাতে থাকে। কী বলেছিল পচু? সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে মনোহরকে দেখেনি। ভোলা বলেছে, মাল কিনতে গেছে। বাকিটা তো মনের মধ্যে সুবাসীই সারা সন্ধে বসে বসে রচনা করেছে। মাল কিনতে তো যেতেই পারে ব্যাপারী। মাল না কিনলে দোকান চলবে কী করে? সন্ধেবেলায় দোকানে হাজির না থাকলেই সে তরঙ্গার কাছে যাবে, এটা কোনো কথা হল? তাছাড়া, মধু গোপের দোকানে যে সে সন্ধ্যেবেলায় গিয়েছিল, তার তো হাতে-নাতে প্রমাণ। যে সন্ধ্যায় মধু গোপের দোকানে মাল কিনতে যেতে পারে না মনোহর, একটু রাত হলে মধুই তার দোকানের ছোকরা মারফত সব মাল পৌঁছে দেয় মনোহরের বাড়িতে। নিজের গরজেই করে সেটা। এমন একটা চালু চায়ের দোকানের মাসকাবারি মালের যোগানদার সে, সর্বদাই ভয়, কোনো লালসায় পড়ে মনোহর না অন্য কোনো দোকান থেকে মাল কিনতে শুরু করে। কোনো ঝুঁকিই তাই নিতে চায় না মধু গোপ। সামান্য সময় অপেক্ষা করে নিজেই পাঠিয়ে দেয় যাবতীয় মাল। আজ তো কই মাল পাঠায়নি মধু গোপ। মাল তবে মনোহর খোদ দোকানে গিয়ে নিয়ে গেছে। ইস্, এই ব্যাপারটাই খেলল না সুবাসীর মাথায়? আসলে, রাগের গুরু নেই। মুরুব্বিদের বচন। রাগে অন্ধ হয়ে যায় মানুষ। তখন চারপাশের কোনো কিছুই তার নজরে পড়ে না।

সুবাসী আড়চোখে তাকায় ঘুমন্ত মনোহরের দিকে। নিঃসাড়ে শুয়ে রয়েছে মনোহর। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার ঘুমন্ত শরীরখানা ওঠানামা করছে। আবছা আলোয় মনোহরের মুখখানা অস্পষ্ট। সুবাসীর মনে হয়, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। যাবেই তো। কখন সেই দুপুরে খেয়েছিল মানুষটা। তারপর আর কিছুই পড়েনি পেটে। খিদে পেটে শুয়ে পড়তে হয়েছে। কাল আবার সকাল না হতেই দোকানের ধকল।

সুবাসীর মনে হয়, এই বয়েসে মানুষটার একটু বেশি মাত্রায় যত্নআত্তি প্রয়োজন। দিনরাত গরুর মতো যে খাটে, সে তো সংসারেই মুখ চেয়ে। সুবাসী আর বাচ্চাটার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যই। ভাবতে ভাবতে অনুশোচনায় ভরে যায় সুবাসীর সারা মন। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। অনুশোচনা যতই বাড়তে থাকে, মনোহরের ওপর রাগও হয় তত। তোমারই বা অত ভালমানুষ হওয়ার দরকার কী? বেশি খাণ্ডারপনা করলে দু-চারটে চড়-চাপড় লাগিয়ে দিতে পার না? নিদেন ধমক-চমকও তো দিতে পার। মেয়ামানুষ ঠেঙায় জব্দ। মুরুব্বিদের বচন। নিজের বউকে শায়েস্তা করতে পার না, কীসের মরদ তুমি! আসলে, মানুষটা ভেতরে ভেতরে বেজায় ভালো। শান্ত প্রকৃতির। আর, সুবাসীকে মনে মনে ভালোবাসে খুব।

একসময় উঠে বসে সুবাসী। পায়ে পায়ে গিয়ে চৌকির পাশটিতে দাঁড়ায়। মনোহরের গায়ে আলতো হাত রাখে।

মনোহর চোখ খোলে। সুবাসীর সঙ্গে চোখাচোখি হয় তার। খুব নরম গলায় সুবাসী বলে, চলো। উঠো। কিছো খাও। খিদা পেটে লিদ আসে?

সুবাসীকে দেখতে দেখতে উঠে বসে মনোহর। লম্বা করে হাই তোলে। বলে, রাগ কইম্‌ল্যাক?

এবং সেই মুহূর্তে সুবাসী লক্ষ করে, মনোহরের মুখে বিষাদের লেশমাত্র নেই। বরং বেশ কয়েকটি পুলকরেখা ফুটে উঠেছে ওর মুখমণ্ডলে। সুবাসী ধন্ধে পড়ে যায়। এমন অশান্তির পরও এত পুলক কেন মানুষটার? মনে হচ্ছে যেন একটা দারুণ সুখ-স্বপ্ন দেখে এইমাত্র ঘুম ভাঙল ওর। তাও, নিজের খাণ্ডার আচরণের জন্য সুবাসী মরমে মরে থাকে। মনোহরের হাতখানি ধরে বলে, চলো। উঠো।

মনোহর পুনরায় হাই তোলে, এত রাইতে কী আর খাব?

—যা হোক কিছো খাও। মুড়ি, চিড়া...।

মনোহর উঠে দাঁড়ায়। কলতলায় গিয়ে পেচ্ছাব করে। ফিরে এসে দেখে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মুড়ি আর নাড়ু, সাজিয়ে বসে রয়েছে সুবাসী।

—তুই খাবি নাই?

—খাব। মৃদু গলায় জবাব দেয় সুবাসী।

—বেড়ে লে। একসাথে খেইয়ে লে। রাইত বহুৎ হইল্যাক।

পাশাপাশি বসে, বহুদিন বাদে, খুব তৃপ্তি করে খায় দু-জনে। অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছিল সুবাসীর বুক। মানুষটাকে যা নয় তাই বলেছে সে। হয়তো বা কোনোই দোষ নেই ওর। আসলে, ইদানীং খুব সন্দেহ হচ্ছিল লোকটার ওপর। সন্দেহটা দিনদিন বাড়ছিল। সেই আগুনে তিলতিল জ্বলছে সুবাসী। জ্বলতে জ্বলতে আগুনটা ছুঁইয়ে দিতে চেয়েছে নিজের মানুষের বুকে।

ভেতর-ঘরে নুনা ঘুমোচ্ছে। দু-জনে বারান্দায় বসে ঘন হয়ে। অনুশোচনাটা প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু কেমন করে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারছিল না সুবাসী। অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিল। আচমকা লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ওঠে, তুমাকে কত কথাই না শুনাল্যম। মাঝে মাঝে কী যে হয় আমার!

অন্ধকারে শরীরখানি লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দে হাসছিল মনোহর। বলে, বাদ দে উসব কথা। সন্‌সারে বাস কইর্‌তে হলে উসব একটু-আধটু হবেক্‌ই। পাশাপাশি ঘটি-বাটি থাইক্‌লেও অমন ঠোকাঠুকি হয।

—তুমি না জানি কী-নয়-কী ভাবলে আমাকে! আমার অমন খ্যারাব মু' হইয়েছে আজকাল...। অমন হুটহাট রাগ হইয়েঁ যায়...।

মনোহর জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে। তার ঠোঁটের ডগায় উঁকিঝুঁকি মারে চোরা হাসি।

সুবাসী আরও ঘন হয়ে আসে। গলাটাকে খাদে নামিয়ে বলে, আসলে, আমি তো জানি, তুমি অমনটা লও। কেবল পাঁচজনার কথায়...।

মনোহর মিটিমিটি হাসছিল। আর তাই দেখে ভাবনায় সারা হচ্ছিল সুবাসী। এত হাসে কেন মানুষটা? এমন ঘটনার পর হাসি আসে কেন? একি রহস্যময় আচরণ মানুষটার! কেন অমন অস্বাভাবিক পুলক? ভাবতে ভাবতে ভয় জমে সুবাসীর মনে। অচেনা আশঙ্কা। একসময় মনোহর মুখে খোলে। বলে, একটা কথা বইল্‌ব তুয়াকে?

সুবাসী মনোহরের চোখে চোখ রাখে। ভয়ে ভয়ে তাকায়। মনোহর খুব নরম গলায় বলে, আমি তুযাব উপর রাগি নাই। বিশ্বাস কর্। বরং বড়ই ভালো লাগছিল আমার।

সুবাসী অবাক হয়। তার চোখেমুখে অবিশ্বাস ফুটে ওঠে। সংশয়ে দুরুদুরু করে বুক।

সুবাসীর দিকে খুব রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকায় মনোহর। গলাটা এক্কেবারে খাদে নামিযে বলে, যে মরদকে উয়ার বউ সন্দেহ করে না একতিল, সে মবদের কুনোই দাম নাই। বিড়বিড় করে বলতেই থাকে মনোহর, যে মরদকে উয়ার বউ বাইরে ছেইড়ে দিযে লিশ্চিন্ত থাকে, তেমন মরদের বাঁচা-মরা সমান। সে বড় অপ্মান রে। সহসা সুবাসীকে কাছে টেনে নেয় মনোহর। বলে, তুই ইখন থিক্যে আমাকে রোজ সন্দেহ কবিস, বুইঝ্লি? বলতে বলতে হো-হো করে হেসে ওঠে মনোহর।

পকেটমারের মুখ

আজকাল ট্রেনে বাসে খুব সাবধান বাপধন। পকেট সামলে। ট্রেনে বাসে আজকাল পকেটমার গিজগিজ করছে।

কথায় কথা বেড়ে যায়। বুঝতে পারি, দুনিয়ার প্রত্যেকটি ব্যাপারেই মানুষের জ্ঞান কত বিশাল। পকেটমারদের বেলাতেও।

চন্দন মুরুব্বির মতো বলে, "পকেটমারদের গ্যাংগুলোর মধ্যেও ইনার স্ট্রাগ্‌ল বেড়ে গেছে আজকাল। রাজনৈতিক দলগুলোর মতোই। লিডারশিপ্ নিয়ে কোন্দল। সেই কারণেই একটা দল ভেঙে তিনটে দল হচ্ছে। দলগুলো ভারি করার জন্য রিক্রুটমেন্ট চলছে আনকোরা। অপারেশনের এলাকাগুলোও ভাঙচুর হচ্ছে। তাই নিয়েও কোন্দল বাড়ছে।

"সবচেয়ে বড়ো কথা।" মুকুল কথার পিঠে খেই ধরে, "এই ক্রাইসিসের দিনে ওদের কোড্ অব কণ্ডাক্টও যাচ্ছে পালটে। একটা অবক্ষয় এসেছে ওদের মধ্যেও।"

আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে শুনি ওদের কথা। পকেটমার, তার আবার কোড অব কন্ডাক্ট! অবক্ষয়!

"এই দ্যাখ্ না" মুকুল আবার ভাষণ শুরু করে, "গুণী" ওস্তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় কতো দিনের। বাবা ওকে এক জব্বর কেসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই থেকেই আলাপ। বছর পাঁচেক আগে একবার পার্কসার্কাস এলাকার ভিড় ট্রামে আমার মানিব্যাগটা হাপিস্ হয়ে গেল। ভাগ্যিস্ টের পেয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গেই। ট্রাম থেকে নেমে ছুট মারলাম গুণী ওস্তাদের ডেরায়। এবং ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমার ব্যাগ আমার সামনে হাজির। একটা নয়াপয়সাও এদিক ওদিক হয়নি। কেমন প্রিন্সিপ্‌ল্ দ্যাখ্ ওদের মধ্যে! তোর আমার কাছে চোর, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কতো সাধু! ওস্তাদের কাছে জমা দিয়েছে পুরো মানিব্যাগটা। একটা নয়া পয়সাও সরায়নি।

অথচ এই মাসখানেক আগে আবার পাকসার্কাস এলাকায় আমার মানিব্যাগটা খোয়া গেল। ছুটলাম গুণী ওস্তাদের কাছে। খানিকক্ষণ গুম মেরে রইল ও। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "এ লাইন বহুৎ গন্ধা হয়ে গিয়েছে খোকাবাবু। বসুন, দেখি।"

ঘন্টা দুয়েক বাদে গুণী ওস্তাদ ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁসে গলায় বলল, "বহুৎ শরম কি বাৎ খোকাবাবু। ওটা বোধ হয় আর মিলবে না। খোদার হাতে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি যান্ আপনি। যদি পাই, পাঠাব আপনার বাড়িতে।"

কথায় কথায় কতো দুঃখ করল গুণী ওস্তাদ। ওর কাছে হাতের কাজ শিখে বড় হয়েছে যে-ছোকরা, সেই এখন দল ছেড়ে গিয়ে অন্য দল গড়েছে। যে এলাকায় আমার মানিব্যাগ হাপিস হয়েছে, সেটা এখন ওর এলাকা।

গুণী ওস্তাদ কতো আক্ষেপ করল, "আজকাল এ লাইনে সব বেজন্মার দল ঢুকেছে। হারামিরা না মানে লাইনের কানুন, না রাখে তার ইজ্জত।"

"ব্যাগটা পেলি শেষতক্?"

মুকুল রহস্যময় হাসি হাসে। বলে, "ব্যাগের খুঁটিনাটি আমাব কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল গুণী ওস্তাদ। টাকা পয়সার পরিমাণও। দিনদুয়েক বাদে ও আমার বাড়িতে পাঠাল মানিব্যাগ এবং পুরো টাকাটা। কিন্তু আমি দেখেই বুঝলাম এ সে ব্যাগ নয়। টাকার ডিনোমিনেশনও আমার সঙ্গে মেলেনি।"

"তা হলে?"

"ব্যাটা মান বাঁচিয়েছে।" মুকুল কপালে ভাঁজ তুলে বলল, "ডেস্ক্রিপশন অনুযায়ী একটা মানিব্যাগ কিনে টাকাটা নিজের পকেট থেকে গচ্চা দিয়ে পাঠিয়েছে।"

"হাজার হোক সাবেক দিনের লোক তো", চন্দন সিদ্ধান্ত টানে, "ওদের মধ্যে ভ্যালুজগুলো এখনও আছে।"

পকেটমারের কথা রোজ রোজ শুনতে শুনতে ব্যাপারটা নিদারুণভাবে সংক্রামিত হয়েছে আমার মধ্যে।

আজকাল ভিড় বাসে ঝুলতে ঝুলতে আমার মধ্যে সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি জমতে থাকে। চারপাশের মানুষগুলোর দিকে সন্দেহভরা চোখ নিয়ে তাকাই। আমার সর্বদাই মনে হয়, পকেটের কাছাকাছি দু'চারটে হাত সর্বদাই সক্রিয়। আমি চমকে চমকে উঠি। তাকাই এর-ওর মুখের পানে। আপাত নিরীহ মানুষগুলোর মুখ। কিন্তু আমার মনে হয়, যেন একটা অপ্রস্তুতভাব গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওরা। কোনো দোষ করে ধরা পড়ে গেলে যেমন কাঁচুমাচু মুখ করে মানুষ।

তখনই সন্দেহ হয়, লোকটার মতলব ভালো নয়।

আচমকা আমার পায়ের ওপর চাপ পড়ে। আমি কাতরে উঠি। মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। তখনই আঁচ করি, আমার পকেটগুলোর আশেপাশে গোটাকতক হাত নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে।

বাসে উঠে সেই কারণেই আমি একতিল স্বস্তি পাই না আজকাল।

অর্চনা বাস থেকে নেমেই ধমক দেয় আমায়। বাসের মধ্যে অমন উস্খুস্ করো কেন? কী ভাবে বল তো চারপাশের মানুষ?

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি দিনকালের ধরনধারন। পকেটমারদের দৌরাত্ম্যের কথাও বলি ওকে।

অর্চনা আরো রেগে যায়।

"সারা বাস শুধু পকেটমারেই বোঝাই? তুমি একটা কী গো? ঘর-ফিরতি ছাপোষা মানুষের দল অস্থির হয়ে ফিরছে। নিজের জ্বালায় মরছে ওরা। আর তুমি কিনা পকেটমার ঠাওরাচ্ছ ওদের!

চন্দন-মুকুলরাও শুনে হাসাহাসি করে।

"এ একটা ম্যানিয়া। ধীরে ধীরে ইন্‌কিওরেবল্ হয়ে দাঁড়াবে!"

"ম্যানিয়া নয়। তোরা বুঝিস্ না।" আমি ওদের প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করি।

"ধুস্ শালা"। আমাকে টিট্‌কিরি দেয় ওরা, "বাসের তাবৎ প্যাসেঞ্জারই তোমার পকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে?"

"কি আশ্চর্য, আমি টের পাই যে! ওদের মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি।"

"ডাক্তার দেখা। এমন ম্যানিয়া ভালো নয়।" মুকুল আমায় জ্ঞান দান করে। কথায় কথায় তর্ক বেড়ে যায়। চন্দন রেগে উঠে বলে, "মানুষের মুখ দেখলেই তুই বুঝতে পারিস্ ও পকেটমার? তুই কি অন্তর্যামী নাকি?"

"আমি পকেটমারের ঐ রকম মুখ দেখেছি যে। অবিকল ঐ রকম মুখ।"

আমি ওদের ঘটানাটা শোনাই সংক্ষেপে। একদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে রাজ রেস্টুরেন্টের উল্টোদিকে আর্য ফ্যাক্টরির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। একটা দশ নম্বর থামতেই আচমকা শোরগোল উঠল। দশ নম্বরটা চলে যেতেই আমি দেখলাম, একটা লোক প্রায় ডজনখানেক পেশীবহুল হাতের মুঠোয় লোফালুফি হচ্ছে। ঘূর্ণি বাতাসের মধ্যে খড়কুটোর মতো। কিল-চড়-লাথি-ঘুষি চলছে। একে একে ওর স্যাণ্ডো গেঞ্জি, নীল স্ট্রাইপের পাজামা, ভেতরের আণ্ডারওয়ার, সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে জনতার হাতে চলে গেল। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে লোকটা নেতিয়ে পড়ল নর্দমায়।

এতক্ষণে বুঝি হুঁশ হল বীরপুঙ্গাবদের। যাশ্ শালা মরে গেল নাকি?

"আমি বাবা কিচ্ছুটি জানি না"—গোছের ভাব করে কেটে পড়ল একে একে সবাই। জায়গাটা মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল।

আচমকা উলঙ্গ লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুট মারল। পলকের মধ্যে রাস্তা পার হয়ে আমার কানের পাশ দিয়ে তীরের মতো বেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে আমার নজর পড়ে গেল লোকটির মুখের দিকে। চোখেমুখে একরাশ আশঙ্কা মেশানো অপরাধী মুখ। গরুচোরের মতো।

পকেটমারের ঐ মুখ আমি ভুলিনি। আজও মুখটা ছবির মতো আঁকা হয়ে আছে মনে।

ব্যাপারটা আমাকে দিনে দিনে ভাবায়। নিরীহ প্যাসেঞ্জারই যদি হবে, তাহলে চোখে মুখে অমন দোষী দোষী ভাব কেন? গরুচোরের মতো চাউনি কেন?

দিন দিন অমন অপরাধবোধ বেড়ে যাচ্ছে কেন মানুষগুলোর চোখে মুখে? এর জবাব খুঁজে পাই নে।

মানুষ কি ভীষণ দোষ করছে আজকাল? ভেতরে ভেতরে কি পাপের পাহাড় জমাচ্ছে সবাই?

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। পাশ দিয়ে হুশ্‌হুশ্ করে বেরিয়ে যায় যাত্রী-বোঝাই বাস। গিজগিজ ভিড়ের মধ্যে প্যাচ্‌প্যাচে গরমে আইঢাই করতে থাকে মানুষগুলো। বাসের দেওয়ালে হাত ঠেকিয়ে জানালার দিকে ঝুঁকে থাকে এক চিলতে হাওয়ার জন্য। মানুষগুলোর মুখ পলকের জন্য ধরা পড়ে আমার চোখে।

এ যেন বন্দী মানুষের মুখ। অসহায়, ভয়-সন্ত্রস্ত।

আচমকা বাসটাকে যেন পলিশের কালো জাল দেওয়া গাড়ি বলে মনে হয় আমার। ভেতরে একরাশ আসামি যেন ঠাসাঠাসি চলেছে জেল লকআপে। তাবৎ মানুষের এতো অপরাধবোধ কিসের?

আমি চিরকাল দেখে আসছি, এ সমাজে একদল শুধু অপরাধের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে। তারা তিলে তিলে শুষে নিচ্ছে কোটি কোটি মানুষের বাতাস। তারা আবহাওয়াকে ক্রমশ বায়ুহীন করে তুলেছে।

অন্যদিকে অসংখ্য মানুষ সেই অপরাধের শিকার। শুধু বাসে নয়, —ঘরে—বাইরে, অফিসে-ফুটপাথে, সমাজে-সংসারে তারা এক চিলতে হাওয়ার জন্য মুখ ছুঁচোলো করে আকাশের দিকে লম্ফ মারছে।

ভাবতে গিয়ে আমার সহসা মনে পড়ে গেল সেই নীচু ক্লাশের বিজ্ঞানের বইয়ের ছবিটার কথা।

অক্সিজেন না হলে প্রাণী বাঁচে না—সেটা প্রমাণ করতে কাচের ঢাকনা দেওয়া লম্ফমান ইঁদুরের ছবি। তখনি, সেই বয়সে ছবিটার দিকে তাকালেই মনে আতঙ্ক জাগত। কেমন যেন মনে হত, ঐ কাচের জারের মধ্যে এক চিলতে বাতাস নেই। মনে হত ঐ লম্ফমান ইঁদুরটার এক চিলতে হাওয়ার ভীষণ প্রয়োজন। আমার সারা শরীর শিরশির করত তখন।

মুহূর্তে মনে পড়ে যায় পাশের ছবিটার দৃশ্য। ইঁদুরটা জারের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে। মরে গেছে ওটা। মরা ইঁদুরটাকে দেখে কিন্তু কোনো আতঙ্ক জাগত না মনে। ইঁদুরটার জন্য কোনো দুঃখবোধও না। মরে তো গেছে, ব্যস। আর তো বাতাসের দরকার নেই ওর।

আসলে মৃতদের নিয়ে কোনো ভাবনা নেই আমার। যত ভাবনা ঐ মৃতপ্রায় মানুষগুলোর জন্য, যারা এক চিলতে নির্মল হাওয়ার জন্য উন্মত্তের মতো ছুটছে। আমার মধ্যে তেমন মানুষের সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেশি। তাদের উন্মত্ততা দেখতে দেখতে আমিও ভেতরে একটা শ্বাসকষ্ট অনুভব করি।

কিন্তু তেমন মানুষ যেন কমে আসছে দিন দিন। আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না তেমন মুখ। এখন অধিকাংশ মুখেই কেমন যেন গরুচোরের ছায়া।

"পকেটমারকে সন্দেহ করতে করতে তুই একদিন সারা মানুষজাতটাকেই সন্দেহের চোখে দেখবি।" চন্দন আমাকে জ্ঞান দেয়, "কিন্তু মনে রাখিস, মানুষ অমৃতের পুত্র। কেউ পকেটমার হয়ে জন্মায় না এ পৃথিবীতে।"

আমারও তো বিশ্বাস ছিল সেটাই। মানুষ ঝকঝকে কাঁসার থালাটির মতো মুখ নিয়ে জন্মায়। ধীরে ধীরে কী করে অমন মালিন্য গ্রাস করে ওদের?

বস্তিটার মুখেই একটা বারোয়ারি রক। আমরা দু'তিনজনে বসে আড্ডা মারি সেখানে। দিনভর দেখি বস্তির কাঁটা-সার বাচ্চাগুলোকে।

একটা বারোয়ারি কলতলা। সেখানে দিনভর জল নেবার লড়াই। খাঁ-খাঁ দুপুরে সেখানে সর্বাঙ্গ উদোম করে চান করে বস্তির মেয়েরা। লাজ সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে। পথ

চলতি মানুষেব চোখ ছুরিব মতো বিঁধে যায় ওদের গায়ে। নিরুপায় হযে শত হাতে অঙ্গ সামলায় ওরা।

সন্ধে নাবতে না নাবতেই সারা বস্তি আঁচের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হযে ওঠে। চোখে আঁচল চাপা দিযে হাঁটা-চলা করে সবাই। গ্রীষ্মের রাতে হাওয়ারা থমকিযে দাঁড়ায় বস্তির মুখে। ভেতরে ঢোকে না।

তখন বস্তির ভেতর এক কাঁড়ি মেয়ে-পুরুষ সেদ্ধ হতে থাকে গরমে।

গলির মুখ থেকে সোজা পীচ রাস্তা ধরে বেশ খানিকটে হাঁটলে সাজানো গোছানো পাড়া। শৌখিন নিটোল মানুষের দল সর্বাঙ্গ এলিয়ে বাস করে সেখানে। সেই পাড়ার একেবারে শেষে ছিমছাম তিনতলা বাড়িটা কুমারকান্তি সেনের। বস্তিটা ওরই।

সকালবেলা আড্ডা দিতে দিতে একসময় ফিসফিস্ করে উঠল মুকুল, "দ্যাখ্ দ্যাখ্।"

দেখলাম, কুমারকান্তির বুড়ো চাকরটা হেলতে দুলতে বেরিয়ে আসছে বস্তি থেকে। ডানহাতে একশিশি ঘি। বাঁহাতে ঝুলছে একটা প্রমাণ সাইজের মুরগি।

"দক্ষিণা আদায করে ফিরছে শালা।" চন্দন গলা নামিয়ে মন্তব্য করে।

বস্তির একেবাবে শেষ মাথায় থাকে কুন্দ বুড়ী। ঘি বেচে সংসাব চালায সে। বুঝলাম, ঘিটা ওর থেকেই বাগিযেছে বুড়ো।

"ভাড়া-কে ভাডা নেয। এসব উপরি।" চন্দন চাপা গলায় বলে।

"গরিবের ঘাড় ভেঙে খেয়ে খেয়ে মজাসে আছে রে এরা।" মুকুলেব চোখমুখ কষ-কষ করে রাগে।

"ধরবি শালাকে?" আমি উঠে দাঁড়িযে বললাম।

মুহূর্তে ওরা নিভে গেল যেন।

"থাক্। কী হবে ঝামেলা বাড়িয়ে?" চন্দন আড় ভাঙতে ভাঙতে বলে, "ওরা সব পায়াভারি আদ্‌মি। ওদের সাথে পারা দায়।"

আসলে, বস্তিগুলোর ওপর মালিকের অত্যাচারের কথা জানে সবাই। তেমন গা করে না কেউ। মুখ বুজে সয়ে যায়।

আড্ডাটা জমে উঠেছিল। আজ কারুর কাজকর্ম নেই। মুকুলের কারখানা লকআউট। চন্দন এবং আমি বেকার।

সকাল থেকেই তাই লকআউটের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখছিল মুকুল। কেমন করে এরা যখন খুশি মানুষের খিদের অন্ন কেড়ে নেয, কেমন করে একটি মাত্র কাগজে হাজার হাজার সংসার উপবাসের জন্য তৈরি হয।

"রুখে দাঁড়াতে পারিস্ নে?" আমি গন্‌গনে চোখে তাকাই।

মুকুল জবাব দেয় না। গুম মেরে বসে থাকে।

আমার বাঁ পকেটের কাছাকাছি একটা হাত নড়াচড়া করছে। আমি মুহূর্তে সজাগ হলাম। আমার বাঁ দিকে রয়েছে মুকুল। আমি আচমকা ঘাড় ঘোরালাম। হাতের নড়াচড়া থেমে গেলে তৎক্ষণাৎ।

মুকুল শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। তার ভাবলেশহীন মুখের আড়ালে একটা দোষী দোষী ভাব। একটা ধরা পড়ে যাবার লজ্জা।

আমার মন মুহূর্তে ঘৃণায় রি রি করে উঠল।

ঠিক সেই সময় বস্তির মধ্যে তুমুল শোরগোল। বুকফাটা কাতর আর্তনাদ। বাজখাঁই গলায় চিৎকার।

"ঐ দ্যাখ্। কার আবার কপাল পুড়ল।" চন্দন গলায় হা-হুতাশ ফুটিয়ে বলে।

বস্তিতে এসব আকছার হচ্ছে। সামান্যতম কারণে মালিকের লোক এসে ধুন্দুমার কাণ্ড জুড়ে দেয়। জিনিসপত্তর, কাঁথা-বালিশ, বাক্স-প্যাঁটরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় বাইরে। ট্যাঁ-ফো করলে মালিকের গুণ্ডা এক ঘুষিতে নাক থেঁতো করে দেয়।

মাঝে মাঝেই কান্নার রোল ওঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। এসব গা'সওয়া ঘটনা।

কান্না-আর্তনাদ এবং হুংকার একসাথে বাড়ছিল। বারোমেশালি কলরোলটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল গলির মুখে।

আমরা পাথরের মতো বসে রইলাম।

একটু বাদেই দৃশ্যটা দেখা গেল। একটি যুবতী মেয়ের চুলের গোছা চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল এক বিশালকায় মস্তান। মেয়েটি বুক ফাটিয়ে কাঁদছিল। তার পাদুটো মাটিতে ঘস্‌টে যাচ্ছিল বারবার।

পেছনে আরও জনাচারেক মস্তান এবং কুমারকান্তির পোষা চাকরটা। ফি-মাসে ভাড়া এবং দক্ষিণা আদায় করতে ওই আসে।

লোকটা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিল, "চালাকি পেয়েছিস ? ভেবেছিল মেয়েমানুষকে ঘরে ঢুকিয়ে রাখলে আর ঘরের দখল নিতে পারব না ? চালাকি ?"

লোকগুলোর পেছনে একটা মাঝারি গোছের শোভাযাত্রা। বিভিন্ন বয়সের মেয়ে-মদ্দ, কাচ্চা-বাচ্চা ভিড় করে এগুচ্ছে পিছু পিছু।

ভাবলেশহীন দৃষ্টি সবার। পাথরের মতো নিষ্কম্প। কেবল মেয়েটার পাশে পাশে যে রোগাপানা লোকটি হাঁটছিল, তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল বার বার। এবং মেয়েটির আঁচল জাপটে ধরে হাপুস্ নয়নে কাঁদছিল একটা বছর চারেকের বাচ্চা।

মস্তানগুলোর চোখের দৃষ্টিতে হিংস্র লালসা। আধখোলা নারীদেহের ওপর তাদের লোভী চোখ। চোখ তো নয় যেন লক্‌লকে জিভ্, চেটে চেটে খাচ্ছে সারা শরীর।

মাঝে মাঝে গায়ের পেশী ফুলিয়ে হুংকার ছাড়ছিল ওরা। "কোন্ শাল্লা মায়ের দুধ খেইচিস্ আয় সামনে। এগিয়ে আয়।" চারপাশে চোখ ঘোরাতে লাগল ওরা।

চন্দন ফিসফিস করে বল্‌লো, "চল্ কেটে পড়ি এখান থেকে। ঝামেলা বাড়বে।"

চন্দনের কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল মুকুল। সাথে সাথে আমিও। তিনজনে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলাম উল্টোদিকের রাস্তা ধরে।

পেছন থেকে গর্জে উঠলো এক মস্তান, "পালাচ্ছিস্ কেন বে খান্‌কির বাচ্চারা। দাঁড়া। বাধা দে। একটাকেও আর মায়ের কোলে ফিরতে দেব না আজ।"

কথাটা কানে পৌঁছতেই চন্দন ছুটতে লাগল। পিছু পিছু আমরাও।

ছুটতে ছুটতে তাড়া লাগাল চন্দন, "জোরে ছোট্। শালারা তাড়া করতে পারে আমাদের। ভাবতে পারে, আমরা বুঝি বস্তিরই ছেলে, পুলিশ-টুলিশে খবর দিতে চলেছি।"

কথাটা যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল আমাদের পিঠে। প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম আমরা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে।

পেছনে কয়েকটা এলোমেলো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ঘুরে দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না তখন।

বেশ খানিকটা ছুটলে মুকুন্দর পানের দোকান। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম ওখানে। এবং কিছু ফিরে দেখলাম কেউ কোথাও নেই।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল তিনজনের। গল্‌গলিযে ঘামছিলাম। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আমরা পরস্পর চোখাচোখি করে হাসলাম।

"শালা, যত্তোসব শুকনো বিপদ।" বলল মুকুল।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনখানা সিগারেট কিনলাম আমরা। এবং তখনি দোকানের আয়নার দিকে তাকিয়ে ভীষণ চমকে উঠলাম আমি। আয়নায় একটা পকেটমারের মুখ।

পিছু ফিরে কাউকে দেখতে পেলাম না। আরে, কোথায় গেল লোকটা ? আয়নার দিকে ফের তাকাতেই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। মুখখানা আমারই। কিন্তু এ কী অবস্থা হয়েছে আমার মুখের ! এ যে অবিকল ঐ পকেটমারের মতো মুখখানা হয়েছে আমার ! ঐ রকম আশঙ্কায় কালো দোষী-দোষী মুখ ! কী আজব ব্যাপার ! মানুষের মুখ এমন মুহূর্তে পাল্‌টে যায় ?

আচমকা আমার মগজে বিদ্যুতের ঝলক। মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করে ফেলি কারণটা।

অবিশ্রাম ছুটে পালাতে পালাতে আমাদের মুখে কালো ঘাম জমে। ক্লেদ।

ঐ ক্লেদাক্ত মলিন মুখখানাকে তখন ঠিক পকেটমারের মুখের মতো লাগে।

অসুখ

অন্ধকারটা ভালো লাগছে। বড় নিরাপদ আশ্রয়, কখনো কখনো, এই অন্ধকার।

বেডরুমে আলো জ্বলছে। দীর্ঘ ট্রেনজার্নিতে ক্লান্ত বুবুন বুঝি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে। তৃণা বোধ করি কোনও এক শক্ত ডিজাইন তুলছে উলের কাঁটায়। ব্যালকনির অন্ধকার পরিসরে আমি চুপটি করে বসে আছি। ঠিক বসে নেই, হাতে, পায়ে, কনুইতে, পিঠে, জানুতে অবিরাম চিমটি কাটছি। আমাদের পার্কসার্কাস এলাকায় মশার দৌরাত্ম্যটা বেশি। অন্ধকারে মশাদের উল্লাস বেড়ে যায়। মানুষকে অন্ধকারে পেলে ওরা আকণ্ঠ তৃষ্ণায় মৃগয়া শুরু করে। আমার খালি গায়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা বসেছে। তারা হূল ফুটিয়ে আমার শরীরে অসংখ্য সুড়ঙ্গ তৈরির কাজে লিপ্ত।

রাতের ব্যালকনি পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় স্থান। মনে হয় নিজের মধ্যে নিজে বসে আছি। মনে হয়, মায়ের জরায়ুর মধ্যে রয়েছি। মনে হয় ...। ডালহাউসি পাড়ার যে বেসরকারি ফার্মটিতে সপ্তম কিংবা অষ্টম স্থানাধিকারী আমি বেশ কড়া এক্সিকিউটিভ হিসেবে পরিচিত, সেই অফিসের ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক দিবাকর দত্ত-র যদি ছ'টি-মেয়ে থাকে, একটিরও বিয়ে না হয়, তবে তার বড়মেয়ের পাকাদেখার দিনে, এম-ডি সাহেব অফিস ইন্‌স্‌পেক্ট করবেন জেনেও ওকে ছুটি দিতে হবে স্রেফ একটিমাত্র কারণে যে, তার বড় মেয়ের বয়েস তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে এবং এরপর আর তার বিয়েই হবে না! একে তো আমি, অফিসে, ডিসিপ্লিনের উর্ধ্বে কোনও কিছুকেই স্থান দিইনে, তার ওপর বিশ্বাস করি, এই বাঙালি জাতটা ছুটি পেলে আর কিছুই চায় না। কাজেই, আমি বললুম, 'নো'। খুব স্পষ্ট, ঋজু উচ্চারণ। ফলে, তেইশে ফেব্রুয়ারি, সেটা ছিল ছুটির দিন, আচমকা আমার পার্ক সার্কাসের সাজানো ফ্ল্যাটে এল ছলছল চোখে দিবাকর দত্ত এবং বসবার ঘরে, চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে ঝুপ করে জড়িয়ে ধরল আমার ডান পা-খানা 'দয়া করুন স্যার। কন্যাদায় বড় দায়।'

প্রাথমিক হকচকানিটা কেটে যেতেই আমি ঝট করে পা সরিয়ে নিই। আর, ঠিক তখনই আবিষ্কার করি ব্যাপারটা। পায়ের যে অঞ্চলটা জাপটে ধরেছিল দিবাকর, সেই অঞ্চলে তিলমাত্র সাড় নেই। ফ্ল্যাট থেকে প্রায় তাড়িয়েই দিই দিবাকরকে। কিন্তু আমার আতঙ্কিত ভাবটা আরো প্রকট হয়। একটা মানুষ জাপটে ধরল আমার পা, আমি জানতেই পেলমু না? যে.পা ধরে, তার মানসিক অনুভূতির কথা বলতে পারিনে, তবে পায়ের অধিকারীটির নির্ঘাৎ এক ধরনের সুখানুভূতি হয়, কারণ, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের

স্নায়ুমণ্ডলী সেই উত্তমর্ণতার খবরটি মগজ মারফৎ পাঠিয়ে দেয় অতৃপ্ত অহং-এর কাছে এবং তাতে বিপুল সুখানুভূতি ঘটে, এবং যৎপরোনাস্তি নীলাভ স্বেদ ঝরে। এক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটল না কেন? সত্যিসত্যিই আমার পা'টা জাপটে ধরেছিল তো দিবাকর? ওর আঙুলের ত্বকের সঙ্গে আমার পায়ের ত্বকেব সংযোগ ঘটেছিল তো সত্যিসত্যি? ভাবতে ভাবতেই আমার মধ্যে মৃদু কাঁপুনি শুরু হয়েছে। একটা সেমিনারের টুকরো টুকরো অংশ যেন ক্রমাগত বেজে চলেছে মগজের মধ্যে। ভেসে উঠেছে ডাঃ দে-মুন্সীর ভরাট গলা ঃ ভযটা ঐ রোগকে নয়, ভযটা মানুষকে, যারা, রোগটা সেরে গেলেও, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, সেরেছে, এবং নানা প্রক্রিযায় ঘৃণা করতে থাকে ভূতপূর্ব রোগীকে, আজীবনকাল, প্রজন্ম ধরে, বাট, অ্যাজ আ ডক্টর, আমি বলব, প্রাইমারি স্টেজে ধরা পড়লে এ রোগ সেরে যায়। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি হল, শরীরের কোনও কোনও জায়গায়, প্রধানত আনকেয়ারড-ফব অংশগুলিতে ফ্যাকাসে স্পট পড়বে এবং ঐ জায়গাগুলোতে কোনও সাড থাকবে না। ঐ অসাড়তা ক্রমশ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়বে। ক্রমশ কানের লতি ফুলতে থাকবে, নাকের চুড়ো ভোঁতা হবে, হাতে পায়ে রস জমবে, জ্বর আসবে মাঝে মাঝেই ...। আসলে, কুষ্ঠরোগ নিয়ে মানুষের আতঙ্কের মূল কারণ হল, সরাসরি সামনে এসে থাবা তুলে দাঁড়ায় না। সে আসে অতি সন্তর্পণে। নিঃশব্দে। শরীরের একেবারে অবহেলিত অনালোকিত অংশে বাসা বাঁধে। প্রাথমিক স্তরে তার আগমনবার্তা টেরই পায় না মানুষ।

আমি ডান পা-টা ওপরে তুলি। গোড়ালির কাছাকাছি হাত বুলিয়ে অসাড় জায়গাটা পরীক্ষা করি। কোনও ফ্যাকাসে ছোপ রয়েছে কি?

বিপন্ন মানুষের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমার তেমন কোনও পূর্ব-ধারণা নেই। ভীষণ কোনও কৌতূহলও নেই। আটলান্টিকের মাঝখানে জাহাজখানা ডুবছে, থইথই জল আকাশের দিকে লক্ষ ফণা তুলে নাচছে, কিংবা দাউদাউ করে মাথার ওপর বাড়িখানা পুড়ছে, ঘরের ভারি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, ভেতরে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সদ্য-প্রসূতি মা পাগলিনীর মতো বন্ধ দরজায় ঘা মারছে অবিরাম—তেমন কোনও বিপন্ন পরিস্থিতি আমার সামনে কখনো ঘটেনি। গৃহদাহের ঘটনা একটা ঘটেছিল বটে, তবে সেও আমার পরোক্ষ-দর্শন। ঘটেছিল একরাতে, আমাদের গাঁয়ে। আগুন লেগেছিল, গভীর রাতে, শেখ জামালের কোঠাবাড়িতে। সারারাত ধরে পুড়েছিল বাড়িখানা। আমি তখন গাঁয়ের বাড়িতে ছিলাম। মাঝরাতে আর্তনাদ উঠল, আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা দেখলুম দোতলার জানালা দিয়ে। সারা গ্রাম ঝেঁটিয়ে দৌড়চ্ছিল আগুন নেভাতে। একবার মনে হয়েছিল, যাই। পরমুহূর্তে মনে হল, আমি আর গিয়ে কী করব? শহরে থেকে থেকে আমার তো সেই আগেকার দামাল অভ্যেসগুলো আর নেই। তাছাড়া, সামনে আমার পরীক্ষা।

আমার মনে পড়ল, বছরটাক আগের এক সন্ধের কথা। আমাদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকেই একটা ওষুধের দোকান। পাড়ার একেবারে শেষের বাড়ির ছেলেটা, প্রবাল না কী যেন নাম, একটা ওষুধ কিনে ফিরছিল বাড়ির দিকে। এমনি সময়ে জনা চার-

পাঁচ ছোকরা, 'এই তো রে, মাল তো এখানে' বলেই ঘিরে ধরল ওকে। ছেলেটার হাতে ওষুধের শিশি, চোখে-মুখে ভয়, আতঙ্ক। ওরা বলল, চল্ বে, কবরডাঙার ক্লাবে। বাতচিৎ আছে। ছেলেটা মিনমিনে গলায় বলল, 'বাবার ভীষণ বাড়াবাড়ি, ডাক্তার বসে রয়েছে ঘরে, ওষুধটা দিয়ে আসি।

'ওসব কথা ঢের শুনেছি। চল্, চল্, নেপালদা তোর জন্য বসে রয়েছে।' ছোকরাগুলো ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় কবরডাঙার দিকে।

অন্ধকার ব্যালকনিতে বসে নিঃশব্দে দেখছিলুম দৃশ্যখানা। ছেলেটাকে নিয়ে ওরা একসময় মিলিয়ে গেল মোড়ের মাথায়। ব্যালকনির ধারে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম। ছেলেগুলোর বয়েস সতেরো-আঠারোর বেশি নয়। একটু ধমকধামকও দিতে পারতুম। নিদেন প্রবালের বাড়িতে গিয়ে খবরটা অন্তত দেওয়া যেত। কিন্তু আমি বসেই রইলুম। আজকের দিনে প্রতি ব্যাপারে হামলে পড়া এক ধরনের বোকামো। কে জানে ছেলেটাকে নিয়ে ওরা কী করবে! তেমন কিছু ঘটলে আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ওদের টার্গেট হয়ে যাব। তারপর একদিন বাগে পেলেই ওরা আমাকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যাবে ওদের কবরডাঙার ক্লাবে। তৃণা টেরও পাবে না।

সেদিন ঝুঁকি নিতে না চাইলেও ছবিটা তো এখনো ভাসে। বিপন্ন মানুষের নিজের হাতে আঁকা ছবি। আটলান্টিকের মধ্যিখানে ডুবন্ত জাহাজ, জামাল শেখের স্ত্রী-পুত্র, কিংবা প্রবাল নামে ছেলেটার মুখ। তবে এসব আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যেতে পারি, এটাই বাঁচোয়া।

বর্ধন সাহেব, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, তাঁর বাংলোয় জোর তলব। অফিস ছুটির পর গেলুম। বিশাল লাউঞ্জের মাঝখানে ভারি ভারি সোফা-কোচ পাতা। পায়ের তলায় পুরু কার্পেট। চা-বিস্কিট দিয়ে গেল। বেশ দামি বিস্কিট। আমরা বাড়িতে এমনটা খাইনে। এমনসময় বস-এর বছর-পাঁচেকের ছেলেটি নাচতে নাচতে এসে দাঁড়াল। বেশ মোটাসোটা আর ভীষণ ফর্সা। দেখলেই আমার বাৎসল্যরস বেড়ে যায়। আদর করতে ইচ্ছে করে।

বলল, 'বাসু-আংকল্, আমরা কখন শপিং-এ যাব?'

বর্ধনসাহেব গেছেন গল্‌ফ্ ক্লাবে খেলতে। মেমসাহেব সাজগোজ করছেন, আমাকে নিয়ে শপিং-এ বেরোবেন। মাঝে মাঝেই এমনটা হয়। সেদিন রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি নে। পার্ক-সার্কাসের দু'কামরার ফ্ল্যাটে বুবুনকে নিয়ে একলাটি থাকে তৃণা। বিমর্ষ হয়, নিঃসঙ্গ, ভয় পায়, রুষ্ট হয়। দেরি হওয়ার কারণটা লুকোতে চাইনে তৃণার কাছে। তৃণা বিদ্ধ হয়, ক্ষুব্ধ অভিমানে ফুঁসে ওঠে, কথা বন্ধ করে দেয় সে রাতে। ওকে আমি বোঝাতে পারিনে যে এটা দরকার। বাঙালি মেয়েগুলো বড়ই অবুঝ। এদিকে ভীষণ অ্যামবিশাস, আবার বাড়াবাড়ি রকমের ইমোশন্যাল। এমন করলে চলে?

বস-এর বাচ্চাটার দিকে হেসে বলি, 'যাব, মাষ্টার রনি, মা তৈরি হলেই যাব। এই নাও, বিস্কিট খাও।'

ভীষণ নাক কুঁচকে মাথা দোলায় রনি, 'এ বিস্কিট আমি খাইনে। এ বিস্কিট তো জিম খায়।'

আমি দু-আঙুলের ডগায় বিস্কিটখানা ধবেছিলুম। তখনই টের পাই, দুটো আঙুল দিয়ে বিস্কিটখানা ধরে রয়েছি বটে, কিন্তু আঙুলের সঙ্গে বিস্কিটের কোনও সংযোগ ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। কোনও অনুভূতিই পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছে, আমার দু-আঙুলের ফাঁকে কোনো বস্তুই নেই। কী করে এটা হল? কবে হল? আমি থরথর করে কাঁপতে থাকি। ঐ দুটো আঙুলে কলম চেপে ধরে আমি তো রোজ লেখালেখি করি। তখন তো খেয়াল হয়নি ব্যাপারটা। আসলে, লেখার সময় আঙুল দিয়ে কলমটাকে বাগিযে ধরা হয় বটে, কিন্তু তখন আসল কাজ মগজের। আঙুলের অনুভূতি-টুতির কথা তখন মনেই আসে না।

তৃণাকে এসব কথা বলা যায় না। কাউকেই বলা যায় না। ওরা সকলেই আমাকে স্বাস্থ্যবান নীরোগ বলেই জানে। এককালে আমি খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলুম। অনেক শীল্ড-কাপ-মেডেল এখনও আমাদের পুতুল সাজানোব ক্যাবিনেটে শোভা পায়। ছাত্রজীবনে রোজ ব্যায়াম করেছি, ডাম্বেল ভেঁজেছি। তখন আমার শরীরের প্রতিটি পেশী, শিরা-উপশিবা, সতেজ ও মজবুত ছিল। আমার বন্ধুরা এসব জানে। তৃণাও শুনেছে এসব গল্প। ওরা আমাকে অন্য ধাতের মানুষ বলেই জানে। দেহে-মনে এক নিটোল সুস্থ মানুষ। সেই কারণেই শরীরের অসাড় জায়গাগুলো নিয়ে আমার ব্যক্তিগত আতঙ্কগুলো ওদের জানানো চলে না। রণক্ষেত্রে একক সৈনিকের মতো দশদিকের আক্রমণ একলাকেই সামাল দিতে হয়। এই নিদারুণ ব্যূহের মধ্যে অন্য কাউকে, বিশেষ করে তৃণাকে, নিতে চাইনে আমি। ও এসবের বাইরেই থাক।

তৃণার সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? উলের ডিজানইটা নিখুঁত হল তো? উঠে দাঁড়ালুম। বসবার ঘরে গিয়ে অ্যাটাচিটা খুলে ধরতেই হলুদ রঙের ফাইলখানা লাফিয়ে চলে এল আমার হাতে। ফাইলখানা হাতে নিয়ে আমি দু'দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি; পিঠে কে যেন মৃদু চাপড়ায়। চাপড়ানিটা বড় ভালো লাগে। ফাইলটা নিয়ে ব্যালকনিতে এসে বসি। কাগজপত্তরগুলো অল্পস্বল্প ওলটাই। নিরুপম বিশ্বাসের মুখটা স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে। নিরুপম আমার থেকে বছর-দুয়েকের ছোটই হবে। ঋজু শরীর, চোখে মুখে প্রত্যয়। এক কলেজেই আমি ছিলুম দু'ক্লাস উঁচুতে। আমার কলেজ জীবনের সেই তেজ দেখে সে আমার ভক্ত হয়ে উঠেছিল। সেটা টের পেলুম সাতাত্তরের একুশে জুন। ও সুপারভাইজার হিসেবে আমার কাছে জয়েন করতে এসেই চিনে ফেলল আমায়। গদগদ গলায় বলল, আপনাকে কি ভোলা যায়? আপনিই তো হোস্টেলের রেশনের চিনি ব্ল্যাকে বেচে দেবার জন্য সুপারকে বারো ঘন্টা ...। নিরুপমের সেদিনের কথাগুলো মোটেই খোসামুদি ছিল না। কারণ, নিরুপম বিশ্বাসরা এ *যুগেও সেই বিরল জাতের মানুষ, যারা কোনও কিছুর জন্যই নিজেদের বিক্রি করে না।* সেই তেজই ওর কাল হয়েছে। ওব ব্যাচের সব সুপারভাইজাবই দু'ধাপ উঠে গিয়েছে। ও যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সেখান থেকেই ও আমাকে এখনও ভীষণ শ্রদ্ধা করে।

নিরুপম যে একটা বড়সড় বিপদে পড়বে, এটা জানতুম। আগে বুঝতুম না, এখন বুঝি, মানুষকে কোনও না কোনও একটা সময়ে এসে একটু-আধটু অ্যাডজাস্ট করতেই

হয়। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসও সেই কথাই বলে। নিরুপমকে এসব বোঝানোর চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। এই সমাজে, সংসারে তার সঙ্গে বর্তমানে আমার নিদারুণ ফারাক। বোঝালেও সে বুঝত না, আমি জানি।

বর্ধন সাহেব সাব-অর্ডিনেটদের কাউকে টেলিফোন করলে, কথা শেষ করেই আচমকা রেখে দেন। অপরপক্ষ চমকে ওঠে। ক্ষুব্ধ, অপমানিত বোধ করে। কিন্তু কিছুই করবার নেই, বর্ধন সাহেবের ফোন করবার ধরনটাই এমন। নিরুপম নাকি তেমন অবস্থায় পড়ে ফের ফোন করেছিল সাহেবকে, লাইনটা কেটে গিয়েছিল স্যার। অপারেটর বলল, আপনি নাকি কেটে দিয়েছেন। আমি বললাম, তা কী করে হয়? কথাই শেষ হয়নি। তাছাড়া আমাদের সাহেব পাক্কা আট বছর বিলেতে ছিলেন, তিনি ওরকম করতেই পারেন না। তিনি এটিকেট জানেন।

হপ্তাটাক বাদে বর্ধন সাহেবের ঘরে আমার তলব পড়েছিল। নিরুপমের নামে দুর্নীতির একগাদা অভিযোগ। আমাকেই তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে হবে। তদন্তের রিপোর্টটা কেমন হবে, আমি ততক্ষণে আন্দাজ করে ফেলেছি। চলে আসার আগে আমার পিঠে একটা আহ্লাদি চাপড় মারেন বর্ধন সাহেব, য়্যু আর দ্য রাইট ম্যান ফর্ দিস জব।

গেল মাসে আমার মাসতুতো ভাই এসেছিল। এখানকার কলেজে ভর্তি হতে চায়। মেসোর কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। ভয় হল, ভর্তি হতে পারলে, আমার কোয়ার্টারেই থাকতে চাইবে নিশ্চয়ই। মাসী ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখবেন। বড় শহরে থাকবার এই এক জ্বালা। আত্মীয়-পরিজন সবাই মুখিয়ে থাকে। তৃণা শোনামাত্রই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন একটা শীতল বাতাবরণ বজায় রেখে মাসতুতো ভাইকে বলে দিয়েছি, ফর্ম ফিল-আপ করে যাও। নাম উঠলে জানাব!

অফিস বেরোনোর মুখে তৃণা শুকনো মুখে বলল, ও এখানে থেকে পড়বে নাকি?

বলি, দূর, দূর, ও যা নম্বর পেয়েছে, কলকাতার কোনও কলেজেই চান্স পাবে না।

আমাদের একমাত্র ছেলে বুবুন। সবাই বলল, মিশনে দাও। পড়াশুনো ভালো হবে, ক্যারেক্টারও তৈরি হবে। মিশনের ছেলেদের কি ক্যারেক্টার ভালো হয়? জানিনে। মিশনের ছেলেগুলো তাদের ভালো ক্যারেক্টার নিয়ে কোথায় যায়, সে খোঁজও রাখিনে। তবুও সবাইয়ের পীড়াপীড়িতে আর তৃণার জেদে বুবুনকে পুরুলিয়ার মিশনে ভর্তি করে দিয়েছি। সে ওখানে ভালোই আছে। পড়ে; খেলে, দু-বেলা প্রার্থনা করে, স্বামীজীদের কাছে ত্যাগ শেখে, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েই খালাস।

নিরুপমের তদন্তের রিপোর্টখানা লিখতে লিখতে বেশ রাত হয়েছিল সেদিন। সবদিক থেকে বেশ বেঁধেছেঁদেই লিখতে হল। নিরুপম যাতে এই ফাঁস কেটে বেরোতে না পারে তেমনভাবেই লিখেছিলুম রিপোর্টটা।

ওঘরে তৃণা শুয়ে শুনে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি বাথরুমে গেলুম। খুব একটা তেষ্টা নেই, তাও জল খেলুম। তারপর শোবার ঘরে ঢুকলুম। অকারণে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। সারা মুখের মধ্যে আমার সবচেয়ে গর্ব করবার বস্তুটি হল নাক। অমন

খাড়াই ধারাল নাক সচরাচর বিরল। বন্ধুরা চিরকালই বলত, আমার ব্যক্তিত্বের বারো আনাই নাকি কেন্দ্রীভূত রয়েছে ঐ নাকে। তৃণাও স্বীকার করে, এমন তীক্ষ্ণ নাকের অধিকারী কোনো পুরুষকে যেকোনো মেয়ের ভালো লাগবে। ধারাল নাকের মানুষেরা নাকি বুদ্ধিমান, স্বাধীনচেতা হয়। তারা পৃথিবীতে নাকি মাথা উঁচু করে চলতে ভালোবাসে। সারা মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে নাকের কাছটিতে এসে আচমকা থেমে যায় হাত। নাকটাকে তো মোটেই ধারাল লাগছে না। চারপাশে মাংস জমেছে, চুড়োটাকেও কেমন ভোঁতা ভোঁতা লাগছে। আমি ভুল দেখছিনে তো! আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি! আমার শরীরে কি সত্যি সত্যি—! আমি ডুকুরে কেঁদে উঠি। প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করি, আমার ধারাল নাক ভোঁতা হয়ে যাওয়া, শরীরের স্থানে স্থানে অসাড়তা, ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে? তেইশে ফেব্রুয়ারি? প্রবালের মৃত্যুর দিনে? জামালের ঘর পোড়ার রাতে, যেদিন মাসতুতো ভাইকে বিদেয় করে দিলুম, যেদিন নিরুপমের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্টটা লিখলুম? নাকি তারও আগে, অনেক অনেক আগে?

বুবুনের স্কুলের ছুটি হয়েছে। আজই ফিরল সে। আমরা দু-জনে ওকে রিসিভ করতে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলুম। তখনও ট্রেন আসতে দেরি আছে। প্ল্যাটফর্মের কলে মুখ-হাত ধুয়ে নিই। তৃণা আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্টলে কফি খাই। ইতস্তত পায়চারি করি।

বুবুন নামল বন্ধুদের সঙ্গে। ছুটে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, তারপর জড়িয়ে ধরল আমাকে। ওর মাথাটা ঠেকল আমার বুকের মাঝখানে। সেই মুহূর্তে টের পেলুম, আমার শরীরের নিচের দিকটা, একেবারে বুক অবধি অসাড়। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন কোনো কল্যাণীয় পায়ে হাত ছোঁয়ালেই সে সংবাদ কোনও এক রহস্যময় পথ বেয়ে সরাসরি বুকে পৌঁছে যেত। অথচ, ঐ মুহূর্তে, আমার শরীরের অর্ধেক জুড়ে লেপটে রয়েছে আত্মজর শরীর, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, যা আঁকড়ে রয়েছে আমার শরীর, তা বুবুনের ছায়ামাত্র। ছায়ার সঙ্গে ছায়ায় মিলনে কোনও অনুভূতি জাগে না।

কোথায় যেন ঝুরঝুর করে মাটি খসে খসে পড়ছে। টুপটাপ শব্দে অবিরাম জল পড়ছে কোথাও। কুটকুট করে কিছু কাটছে ইঁদুর জাতীয় কোনও প্রাণী। দূরে যেন একপাল কুকুর ডেকে চলেছে অবিরাম। অন্ধকার ব্যালকনির দেওয়ালে একটা টিকটিকি সম্মোহিনী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে একটা পোকার দিকে। পোকাটা স্থির ...। পাশের বাড়ির পাঁচিলে একজোড়া বেড়াল কর্কশ গলায় ঝগড়া বাধিয়েছে।

পাশের ঘরে, এই মুহূর্তে, বুবুনকে কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে তৃণা। আমি নিরালম্ব ব্যালকনিতে রাত জাগছি। রাত বাড়ছে। গাঢ় হচ্ছে। উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা কালো রঙের ষাঁড় শুয়ে শুয়ে অলস-চোখে জাবর কেটে চলেছে। এই মাঝরাতেও রাস্তার কলে সর্বাঙ্গ উদোম করে চান করছে এক ভিখিরি। দেখতে

দেখতে আমার অবগাহন-তৃষ্ণা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। আমি কি চান করতে যাব এখন? শীতল জলের সংস্পর্শে এলে নাকি ক্লান্ত বিশুদ্ধ দেহকোষগুলি সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে অবগাহন স্নান করতে পারলেই কি আবার সাড় ফিরে আসবে আমার শরীরের নষ্ট প্রত্যঙ্গগুলিতে?

সন্ধ্যেবেলায়, আবার নিরুপমের ফাইলখানা খুলে দেখছিলুম। রিপোর্টটাকে আবার নতুন করে লিখলুম। বেশ বাঁধুনি দিয়ে লিখতে গিয়ে অনেকখানি সময় লাগল। নিরুপমটা এ যাত্রা বেঁচে যাবে। মাসতুতো ভাইকে একখানা চিঠি লিখলুম। তারপর সারা সন্ধে এই ব্যালকনিতেই বসে রয়েছি।

আমার দীর্ঘকালের বিশ্বাস, মশার মতো অকৃতজ্ঞ প্রাণী দুনিয়ায় দুটি নেই। যার রক্তে প্রাণ ধারণ করে, তাকেই হুলের জ্বালায় অস্থির করে তোলে। আজ, এই মুহূর্তে, মনে হচ্ছে, আমার এ ধারণা ঠিক নয়। মশাগুলো মহানন্দে হুল ফোটাচ্ছে আমার সর্বাঙ্গে। আমি চমকে চমকে শিউরে শিউরে উঠছি। খুশির জোয়ারে ভাসছি যেন। মশককুলের প্রতি এক ধরনের গাঢ় কৃতজ্ঞতায় দ্রব হচ্ছি। আহা, হুল ফোটালে কী আশ্চর্য যন্ত্রণাময় অনুভূতি! আহা! আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করছি, অন্ধকার ব্যালকনিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আমার সারা শরীর জুড়ে বসুক, হুল ফোটাক, রক্ত খাক, আমার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়ুক। আমি যেন ওদের সামনে আমাব অনাবৃত শরীরটাকে নৈবেদ্যর মতো সাজিয়ে বসে আছি। হুলের দংশনজনিত যন্ত্রণা তো কেবল যন্ত্রণাই নয়, সর্বাঙ্গে সাড় ফিরে আসার অভিজ্ঞানও সেটা।

রাত আরও গভীর হলে আমি ঐ রাস্তার ভিখিরিটার মতো উদোম হয়ে স্নান কবব আজ।

পৌষ-পরবের কুশীলব

১.

বর্তন লোহারদের ট্রাক এসে পৌঁছলো হাড়মাস্‌ড়া বটতলায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক দশাসই হনুমান আছড়ে পড়লো শিবমন্দিরের চুড়োয়। বর্তনরা দৃশ্যটা দেখলো। তখন ঠায় দুপুর।

হনুমানটার বিশাল বপু। বেজায় তাগড়া। শিবমন্দিরটা বহুকালের পুরোনো। বেঢপ উঁচু।

এককালে চুন-সুরকির প্লাস্টারের ওপর চিকন পালিশ ছিল। চাঁপা-হলুদ রঙের পালিশ। তেলতেলে মসৃণ। রঙ-টঙ চটে গেলেও ঐ তেলতেলে ভাবটা এখনো রয়েছে। দীর্ঘদিন বৃষ্টির জল খেয়ে তার গায়ে জমেছে পুরু শ্যাওলা। অত উঁচু মন্দির, কিন্তু তার বেয়াড়া গড়ন। মাটি থেকে হাত তিরিশেক খাড়াই দেওয়াল। চুড়োটা কাছিমের পিঠের মতো ঢালু। মাঝে কোনও ঢাল নেই। ধাপ নেই। খাঁজকাটা, বাঁকচুর কিচ্ছু নেই। এমন কি দরজার মুখে জগমোহনও নেই। গম্বুজাকৃতি চুড়োর মধ্যিখানে এক বিশাল ত্রিশূল। আকাশের দিকে উদ্ধত। ঐ ত্রিশূলের গোড়ায় খানিক চক্রাকার কারুকার্য।

মন্দির থেকে হাত বিশেক তফাতে একটা পুরোনো তল্লা-বাঁশের ঝাড়। বেশ পাকা পাকা তল্লা-বাঁশ, হলুদ হয়েছে। হনুমানটা অনেকক্ষণ ধরে দোল খাচ্ছিল একখানা তল্লা বাঁশে চড়ে। খুব মজা পেয়ে গিয়েছিল ব্যাটা। একটা পাকল গোছের বাঁশের আগার দিকে চড়ে বার বার ঝুলে পড়ছিল। বাঁশের নাম তল্লা! আগায় ধরে বেঁকিয়ে গোড়ার সাথে লাগিয়ে দিলেও ভাঙবে না। বরং খুব দামী স্প্রীং-এর মতো বাঁশটা হনুমান শুদ্ধু নেমে যাচ্ছিল মন্দিরের চুড়োয়। হাত-তিন-চার ওপর থেকে ফের ফিরে যাচ্ছিল স্বস্থানে। নিশ্চয়ই খুব মজা লাগছিল হনুমানটার। মন্দিরের চারপাশে যাদের বসবাস, তারা বললো, সেই সকাল থেকে হনুমানটা খেপে খেপে দোল খাচ্ছিল বাঁশে চড়ে। একসময় হনুমানের শরীরের বাড়তি বলপ্রয়োগে বাঁশখানা অনেকখানি নেবে এলো। এবং প্রায় অর্ধ-গোলাকার হয়ে তার ডগাখানি হনুমানশুদ্ধু মন্দিরের চুড়ো ছুঁলো। আর হনুমানটা চক্ষের পলকে ত্রিশূলটাকে জাপটে ধরে বাঁশটাকে ছেড়ে দিল। বাঁশের ডগা স্বর্গে উঠে গেল তৎক্ষণাৎ। হনুমানটা ত্রিশূল আঁকড়ে ধরে দেখলো সেই দৃশ্য। পরক্ষণেই, বর্তন লোহারদের আকাশ-ফাটানো স্লোগানে চমকে তাকালো বটতলার দিকে।

আগামীকাল, একত্রিশে ডিসেম্বর, রাজ্যব্যাপী ভোট। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের শয়ে শযে ক্ষেতমজুর এখন নাবাল খাটতে গেছে পূবের জেলাগুলিতে। বর্ধমান-হাওড়া-হুগলী—এসব এলাকায় কাজও মেলে, মজুরের দরও বেশী। পশ্চিমা মজুরের কদরও খুব। চাষের মরসুমে যারা গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে ভাদ্রের শেষে। আবার গিয়েছিল অঘ্রাণে। অধিকাংশ এখনো ফেরে নি। ধানকাটার মরসুম শেষ হয়ে এলো। কিন্তু বেশির ভাগ মজুর ফিরবে না। নাবাল দেশে মাটি যেন সোনা। সেচের জল অঢেল। সেখানে আমন ওঠার সাথেসাথেই রবি চাষ শুরু হয়ে যায় সেচের জলে। মজুররা থেকে যায় সেই কারণে। এমন বেয়াড়া সময়ে ভোট হলে তাই নেতাদের বিপদ রাখবার ঠাঁই হয় না। বহু নিশ্চিত ভোট নষ্ট হয়ে যায় শুধু বেয়াড়া মরসরুমটার জন্য।

একদিন বর্তনের দলের নেতারা মিটিং ডাকলো উলুবেড়িয়া বাজারে। মাইকে হাঁকড়ে বললো, 'ভোটের আগের দিন দেশে ফিরে যা সব। বহু ভোট নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কি কইরে যাব আইজ্ঞা? মালিক ছাড়বেক ক্যানে? এখন ক্ষেতে-মাঠে কত কাজ! তা বাদে, দু'পিঠের বাসভাড়া, দু'দিনের মজুরী।'

নেতারা বললো, 'সেসব আমরা দেখছি। মোট কথা সবাইকে ভোট দিতে হবেই। ভোট দেবার অধিকার যে কত বড় অধিকার, সে তো তোরা বুঝলি না। এই দুনিয়ায, শুধু ভোট দেবার অধিকার চেয়ে কত মানুষ লড়ছে, মরছে।

আচানক ব্যাপার, দিন কয় বাদে মালিকরাই বলল্যাক কথাটা। যা তোরা দেশে। ভোট দিয়ে আয়। আগের দিন যাবি। ভোটের পরের দিন ভোরে এসে মাঠে নামবি। দু'পিঠের ভাড়া পাবি। দু'দিনের মজুরীও। তোদের নেতাদের সাথে মিটিংযে ঠিক হয়েছে এসব। জ্বালাতন! এ এক নতুন নিয়ম চালু হলো দেশে। তোরা ভোট দিবি, আমাদের কি তার খরচ বইতে হবে! জুলুম আর কাকে বলে!

প্রথম প্রথম রাজি হয়নি মালিকপক্ষ। কিন্তু কিছুদিন বাদে যখন মালিকদের দলের নেতাদের কাছ থেকেও একই চাপ এলো তখন আর সামাল দেওয়া গেল না।

বর্তনের গেরস্থ একদিন শুধোলো, 'কাকে ভোট দিস্?' বর্তন লোহার ততদিনে বুঝে ফেলেছে প্রশ্নের তাৎপর্য। দাঁত গিজুড়ে বললো, 'তুমার-আমার একদল।'

মিছে কথা না বললেও ক্ষতি ছিল না। কারণ তদ্দিনে সব দলের পৃথক পৃথক চাপে মালিকপক্ষ নীতিগতভাবে মেনেই নিয়েছে ব্যবস্থাটা। দু'দিন সবেতন ছুটি। যাতায়াতের ভাড়া। এ তাদের দিতেই হবে। তোমাদের জমিনে যারা বারোমাস ঘাম ঝরায়, তাদের এই সামান্যতম গণতান্ত্রিক সুযোগটুকু ব্যবহারের পথ করে দিতে হবে বৈকি! নইলে যদি ঐ অছিলায় আচমকা লেবার বয়কট হয়? তখন কেঁদে কূল পাবে না।

উলুবেড়িয়ায় রাতের ট্রেনে চেপে, শেষরাতে বাঁকুড়া ইস্টিশনে নেমেছে বর্তনরা। পার্টিকর্মীরা মোতায়েন ছিল। ভোর হতে না হতে পায়দলে গোবিন্দনগর মাঠে। তখন সকাল সাতটা। বাঁকুড়া শহর থেকে গোবিন্দনগরটা বেশ দূরে। নতুন বাসস্ট্যাণ্ড গড়ে উঠছে সেখানে। এখনো শেষ হয়নি। চারপাশে বিশাল খাঁ-খাঁ ডাঙা ছিল। কিন্তু বর্তনরা দেখলো, মাঠখানাকে চেনা দায়। সারা মাঠ জুড়ে গিজগিজ করছে মুনিষ-কামিনের দল।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি দলের ট্রাক সারবন্দী দাঁড়িয়ে। ট্রাকের মাথায় যে-যার দলের ফেস্টুন।

কাতারে কাতারে নাবাল মজুর, হৈ-হৈ করে এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দলের ট্রাকের দিকে। স্থানীয় নেতা ও দলের কর্মীরাই বেছে নিচ্ছে নিজের দলের মানুষ-জনকে। কেউ কেউ ফেস্টুন দেখেই শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। সারা গোবিন্দনগর জুড়ে যেন এক বিশাল মেলা বসেছে। শ্লোগান পাল্টা শ্লোগানের বাণ ডেকেছে চারপাশে। ভোট দিবেন-বাঁচতে, হাতুড়ি-তারা-কাস্তে। ভোট দিবেন কী-সে, কাস্তে-ধানের শী-ষে। এই, — কেউ খাবে আর কেউ খাবে না / তা হবে না, তা হবে না। থাকতে দুধে-ভা-তে / ভোট দিন হা-তে। ... দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে বর্তনদের শরীরে শিহরণ জাগে। ইস্ কি এক পরব লেইগেছে গো—দেশে !

তালডাংরার মানু ঘোষ বর্তনদের চেনে। ছুটে এসে পুরো দলটিকেই পাকড়াও করে সে। অত দেরি ক্যানে রে? চল্, চল্। হাড়মাস্ড়ার ট্রাক হু-ই খাড়া আছে উদিগে।

বর্তন লোহার বললো, দাঁড়া বাপু। ভোখে জীবন যায়। আগে দু'টা পেটে পুরি।

হৈ-হৈ করে তেলেভাজার দোকানে ঢুকলো বর্তনের দল। মুড়ি আর চপ কিনে, শালপাতায় মেখে, কোঁৎ কোঁৎ করে খেতে লাগলো গোগ্রাসে। আসার সময় তো মালিক বাসভাড়া বাদেও একদিনের মজুরি আগাম দিয়েছে। চিন্তাটা কি!

লাল ধুলো উড়ছে। নাবাল মজুররা গিজগিজ করছে মাঠময়। সব দলের নেতা-কর্মীরা হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি জুড়েছে। মাইকে ঘনঘন ঘোষণা চলছে। কোন্‌দিকের ট্রাক ছেড়ে যাচ্ছে। কোন্ দিকের ট্রাক অল্প বাদে ছাড়বে।

বর্তনদের মুখে খুশির ঝলক। লক্কা-পায়রার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে ওরা মাঠময়। চারপাশে চেনামুখ অনেক। রতনপুর, তালডাংরা, মড়াশোল, হাড়মাসড়া, চোখরঙ্গা—সব গাঁয়ের মানুষ ঘোরাঘুরি করছে কাছেপিঠে। দেখাশোনা, কোলাকুলি, কুশল-বিনিময়। ফুর্তির বাণ ডেকেছে মানুষগুলোর চোখেমুখে। শীতের সকাল নরমপায়ে দুপুরের দিকে এগোচ্ছে।

২.

বাঁশটা হাতছাড়া হতেই হনুমানটা মুহূর্তের জন্য কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। ভীষণ বোকা বোকা লাগছিল ওকে। ত্রিশূলটাকে দু'হাত দিয়ে অল্প ঝাঁকালো বার কয়। চুড়োর অর্ধ গোলাকার ভুঁই। পুরু শ্যাওলায় ঢাকা। পা দিতেই হড়কে গেল বার-দুই। পশুসুলভ অনুভূতি থেকে সে বুঝলো, ঐ কাছিমের পিঠের মতোন ঢালু ও শ্যাওলাময় জায়গায় হাঁটতে যাওয়া বিপজ্জনক। এবং উঁচু চুড়ো থেকে পাকা চাতালে লম্ফ মারাও আত্মহত্যার সামিল। ত্রিশূলটাকে ছেড়ে দেওয়াও মুর্খামি। কাজেই ত্রিশূলটাকে দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে সে পরিস্থিতির অগ্র-পশ্চাৎ ভাবতে বসলো।

হাড়মাসড়ার বটতলা। এখান থেকে লোহারপাড়া মাইলটাক। মাঝে এক বিশাল

ধানের ক্ষেত। ট্রাক থেকে নেবেই চারপাশে তাকায় বর্তন লোহার। বটতলার দিকে চোখ পড়তেই ওর চক্ষু চড়কগাছ। আই বাস! এ যে আইজ্ঞা যজ্ঞ লেইগেছে! শুধু এখানেই নয়, ট্রাকে চড়ে আসতে আসতেও বর্তনরা দেখেছে, প্রায় সারা পথ জুড়ে উল্লাস। ঝাঁ ঝাঁ করে ছুটে চলেছে ট্রাকগুলো। ট্রাকের মাথার চড়ে নাবাল মজুররা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মাতোয়ারা। হাড়মাসড়ার তাবৎ নাবাল-ফেরৎ মজুর-কামিন থানা গেড়েছে বটেরতলায়। কেউ নিজেদের ঘরে অবধি যায় নি। তারা এখন ঘরে গিয়ে করবে কি? খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো বটতলাতেই। আজ দু'বেলা। কাল দুপুরে। ঘর-সংসার ফেলে কতদিন বিদেশ-বিভূঁইয়ে রয়েছে লোকগুলো। আচমকা পৌঁছে তারা খাবার জোগাড় করতে পারবে কেন? নেতারা বুঝেছেন। বিবেচনা আছে বলতে হবেক। বর্তন মনে মনে লক্ষবার সাধুবাদ জানায়। প্রতি পাড়ায় একজন নেতা আছে দলের। ঐ নেতার ওপরই সবকিছুর ভার। শুধু বরাদ্দের টাকায় অত মানুষের তিন-বেলা হয় না। পাড়ার নেতারা তাই সম্পন্ন গেরস্থদের দোরে দোরে ঘুরে সংগ্রহ করেছে কিছু চাল-ডাল। কেউ ইচ্ছেয় দিয়েছে। কেউ অনিচ্ছেয়। ঐ দিয়ে সবাইয়ের খিঁচুড়ি ভোজের ব্যবস্থা। দেখেশুনে বর্তন লোহার তাজ্জব বনে যায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বটতলায়। দূর থেকে হেতম সিং হেঁকে ওঠে, 'ই বর্তন, তুই ইখেনে ক্যানে রে? তুয়ার পাড়ায় তো পৃথক রান্নার বেবস্থা হইয়েঁছে। ভা-গ্।'

হেতম সিং-এর রগড়টা বুঝতে পারে বর্তন। সেও মজা করে জবাব দেয়, 'হউ। খুড়া গ, আমি দু'থানেই খাবো।' বলতে বলতে মিষ্টি হাসে বর্তন। বসে পড়ে হেতম সিং-এর পাশটিতে। বলে 'কদ্দিন বাদে দেখা হলো। আগে টুকচান বসি তুমাদ্যার পাশ। সুখ-দুখের কথা-টথা কই। চুটা-ফুটা থাইক্‌লে দাও একটা। ই ট্যাপকা, সুফলকে বল্যে দিস, যাচ্ছি টুকচান বাদে। খাবো উখ্যেনে।'

ট্যাপ্‌কা হল বর্তনের পড়শী। সে ধরেছে লোহারপাড়ার পথ। বললো, 'জলদি আইসো। খিঁচুড়ি ফুরাই গেলে কেউ দায়ী হব্বেক নাই।'

বর্তন মৌজ করে চুটায় টান মারে। নীলচে ধোঁওয়া ছাড়ে। শীতের সোনালী রোদ্দুর মিঠে গন্ধ ছড়ায় চারপাশে। বটের ঝাঁকড়া ডালপালার ছাঁক্‌নি গলে দু'দশ দানা সোনার টুকরো ঝরে পড়ে মাটিতে, মানুষগুলোর গায়ে-মুখে-পিঠে।

বটের তলাটা জুড়ে দখল নিয়েছে বহু মানুষ। পাশাপাশি পাড়া থেকে খেজুরপাতার তালাই এনে পেতে দিয়েছে পার্টির লোক। কোত্থেকে একটা সস্তা ট্রানজিস্টার এনে গাছের তলায় বসিয়ে দিয়েছে কেউ। চড়া গান বাজছে। বসে-শুয়ে গল্প-গুজব করছে সবাই। রঙ-তামাশায় মশগুল। কাল সারারাত ট্রাকের মাথায় জেগেছে যারা, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে। তাস খেলছে কেউ কেউ। টোয়েন্টিনাইন। চারজনে খেলছে। পাশে তিনগুণ লোক সাপোর্ট দিচ্ছে। সহর্ষে তুরুপ করছে, মাটিতে তাসশুদ্ধ ইয়াব্বড় চাপ্পড় মেরে। সাপোর্টারদের উল্লাসে আকাশ-বাতাস উতরোল।

অল্প তফাতে তালা পুকুরের পাড়। সারসার অর্জুন গাছ। গুঁড়িতে অজস্র কুঁজ। কুঁজের গায়ে বিকট চোখ। অর্জুনগাছের তলায় সার সার মাকড়া পাথরের উনুন। ধোঁয়া

উঠছে আকাশ চিরে। কালো কুচকুচে কড়াইতে খিচুড়ি চড়েছে। খিচুড়ি তো নয়, চাল-ডালে হলুদভাত। ব্যস, গরমা-গরমা ওতেই মাৎ। ওরই গন্ধে ম-ম করছে শীতের বাতাস। মেজাজ ঠিক রাখা দায়।

বর্তন চুটা খেতে খেতে চারপাশের সবাইকে দেখছিল। নির্বাক হাসি বিনিময় করছিল এর-ওর সাথে। অনেক চেনা লোক চারপাশে। অকারণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই। ফুর্তির সায়রে ভাসছে সব। বটের ডালে চড়ে বসেছে তিলক লোহার। গান ধরেছে উচ্চস্বরে। টুশু গান। বর্তনের দিকে চোখ আড়ে সে ঃ তুই অ্যালি ভাই, আর একজনা কৈ?

আমি ভিজাইঁছিল্যম চিঁড়া-দই/তুই আলি ভাই ...।

ওদিকে তাসের আড্ডায় জমে গেছে ভালুক লোহার। এককালে প্রাণের বন্ধু ছিল দুজনায়। এখন দু'জনেই মিছরির ছুরি। ভালুককে দেখা ইস্তক কৌশল্যাকে খুঁজতে লেগেছে বর্তন। জমায়েতের মধ্যে নিঃশব্দে চিরুনি চালাচ্ছে দু'চোখ। কৌশল্যার সাথে নাবালেই ভাব হয়েছিল বর্তনের। সে এখন ভালুক লোহারের গৃহিনী। ফি-বচ্ছর ওরা অন্য জেলায়, অন্য নাবালে চলে যায় খাটতে।

প্রচণ্ড উল্লাসে তুরুপ করলো ভালুক। চারপাশে জয়ধ্বনি দিচ্ছে সাপোর্টাররা। পিটখানা কুড়িয়ে নিতে নিতে নজর পড়ে যায় বর্তনের ওপর। হেই—। কখন এইলি? বর্তন দূর থেকে হাসে। হাতের ইঙ্গিতে বোঝায়, এক্ষুনি। তাসশুদ্ধ বাঁ'হাত সজোরে নেড়ে বর্তনকে কাছে ডাকে ভালুক। বর্তন হাসে। হাতের মুদ্রায় 'তিষ্ঠ' ভঙ্গি এনে নিরস্ত করে ওকে।

চুটাটা শেষ করেই উঠে দাঁড়ায় বর্তন। চলি খুড়া। ভালুক না ডাকলেও একসময় পায়ে পায়ে ওর কাছে যেতোই বর্তন। অন্য এক তাগিদ আছে যাওয়ার। কৌশল্যা।

ভালুক লোহার আড়চোখে চাইলো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বর্তনকে দেখলো।

বললো, 'তুমার তো এই বটতলায় থানা গাড়ায় কথা লয়। বেপাড়ায় নামা ক্যানে? ধান্দাটা কি বটে?'

ছেলেবেলার প্রাণের স্যাঙাত এমন কথা বললে সেটাকে নেহাত রগড় বলেই ধরে নেওয়া উচিত। কিন্তু ভালুক লোহারের ক্ষেত্রটাই আলাদা। তার কথায় গুপ্ত বিষের সন্ধান পায় বর্তন।

তাও হেসে শুধোয়, 'কৌশল্যা আসে নাই?'

'কৌশল্যা?' চকিতে তাস থেকে মুখ তুললো ভালুক। পলকের তরে বর্তনকে দেখলো। ফিক করে হাসলো।

বললো, 'কৌশল্যা তো যায় নাই নাবালে। উয়ার বাপের বাড়িতে আছে। আট মাসের পুয়াতী। এই দিলাম গুলাম। সামলাও হে—।'

কৌশল্যার বাপের বাড়ি বিবরদা। এখান থেকে মাইল সাত-আট। কিন্তু বর্তন লোহার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল সেখানে। কৌশল্যাকে দেখলো। তার পোয়াতী শরীরের চেকনাই। লজ্জার ভারি হয়ে আসা চোখের কোল। ডিমালু গেঁড়ি-হাঁসের মতো দুলে দুলে হাঁটা, —সব নিরিখ করলো লোভী-লোভী চোখে। তারপর ফিরে এল

বটতলায়। ভালুক তখন প্রলয় তক্ক জুড়েছে প্রতিপক্ষ ভীম সিং-এর সাথে। সে নাকি কঠিন মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভুলটি করে, ফের শুধরে নিতে চায়। হায় রে, তাও কি হয়! ভালুক লোহার প্রবল বেগে দু'হাত নাড়াতে থাকে ভীম সিং-এর মুখের ওপর। হয় না। দুনিয়ার কুথাও নাই হয় সিট্যা।

বটতলা থেকে চোখ চারালেই চারপাশে রুখু মাঠ, খাঁ-খাঁ। ডাঙা-ডুংরী খাঁ-খাঁ। ন্যাড়া শালের বন। গাছের তলায় অজস্র শুকনো পাতা। হাওয়ায় উড়ছে।

বর্তন নড়েচড়ে উঠলো। পা বাড়ালো লোহারপাড়ার দিকে। বুকের মধ্যে চিনচিন ব্যথা।

হেতম সিং পিছু থেকে হাঁক মারে, 'ইখ্যেনে চাটি খিঁচুড়ি খেইয়েঁ যা ভাইপো। হে-ই ভাইপো!'

বর্তন জবাব দেয় না। সে পায়ে পায়ে এগোতে থাকে বাড়ির দিকে।

ঘরে পৌঁছে বর্তন দেখে, বুড়ি মা দাওয়ায় বসে বসে ক্ষণ গুনছে।

বর্তনকে দেখে বুড়ি খনখনিয়ে ওঠে, 'কুথা ছিলি বাপ ইতোক্ষণ? দুনিয়ার মজুর-কামিন ফিরে এল্যো ঘর, আমার ঘরেরটি আর নাই আসে! চেইয়েঁ চেইয়েঁ চোখের জল মইরে যায়, বাপ!'

বর্তন হাসে। মোটা চাদরখানা ছুঁড়ে দেয় দাওয়ায়। গায়ের গেঞ্জিটা খুলে ফেলে। বলে, 'সিনান্‌টা সেইরে আসি। উদিকে খিচুঁড়ি খাবার ধুম লেইগে গেছে।'

শীতের দুপুরে লোহারপাড়ায় মৌলতলার বাতাস উতরোল। খিচুড়ি-ভোজ জমে উঠেছে। মৌল গাছের তলায় শালপাতার পাত পেড়ে বসে গেছে সবাই। সুফলের দল পরিবেশন করছে। গরমখিঁচুড়ি সাপুটে খাচ্ছে। সপাৎ-সপাৎ আওয়াজ উঠেছে হাওয়ায়। গন্ধ ছুটেছে দিগ্বিজয়ে।.

বর্তন পৌঁছানো মাত্রই হৈ-হৈ করে উঠল অনেকে। 'হেই বর্তন—! বট্‌তলায় খিচুঁড়ি দিল নাই তুয়াকে? মেইরে খেদালো?'

বর্তন টিটকিরিগুলো উপভোগ করে। দাঁত গিঁজুড়ে হাসে। বলে, 'উখ্যেনে খেয়্যেঁছি হে। ইখ্যেনেও খাব।'

'উখ্যেনে কলাটি ছাড়াঁই দিয়েছে তুয়াকে। বইসে যা শালা। আর ডাঁট মাইর‌্‌ত্তে হবেক্‌ নাই।'

বর্তনের লালচে চুলের গোছা বেয়ে টপটপিয়ে জল ঝরছে।

সুফল লোহার হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়, 'বইসে যাও পাতা লিয়ে। দেরি কিসের?'

'তুমরা খাবে নাই?' নেহাৎ ভদ্রতা বশে শুধোয় বর্তন।

'আমাদের খাবার ঠিক আছে? দুটা বাউরীপাড়ার অর্ধেক লোকও নামে নাঁই ইখনতক্ক।'

'বল কি!' বর্তন অল্প বিস্ময় বোধ করে, 'বিকাল যে গড়াঁই গেল।'

'আর বিকাল।' সুফলের ঠোঁটে উদার হাসি, 'কাল রাতে যারা বাসে চইড়তে পারে নাই, উয়ারা আর বাসও পাবেক নাই। সব বাস চইলে যাবেক কলেজ মাঠে

ভোটবাবুদের বইতে। উয়াদ্যার রেলই ভাল। মার্টিন রেলে আসতে পারে বর্ধমানের কিছু মজুর। হাওড়ার মজুরেরা আইবেক খড়ক্পুর হইয়েঁ বড় রেলে।'—

'যেদিকে রেল নাই?'

'কি করে—।' সুফল কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত, 'পার্টি কুনো বেবস্থা কইর্বেক নির্ঘাৎ। টেরাক ভাড়া কইরে বা অন্য কুনো উপায়ে—। অত মানুষ, না ফিরলো তো—।'

কথাবার্তার ফাঁকে শালপাতা টেনে নিয়ে বসে গেছে বর্তন। সুফল খিঁচুড়ি ঢেলে দিল পাতে। অন্যদের ফেরার সমস্যা ভুলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একরাশ হলুদ খিঁচুড়ির মধ্যে আকন্ঠ ডুবে গেল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আরো একখানা ট্রাক এসে থামলো হাড়মাসড়ার বটতলায়।

চঞ্চল হয়ে পড়ে সুফল। চেঁচিয়ে বলে জগৎ বাউরীকে, 'খিঁচড়ির শেষ কড়াটা নামলো হে? এ টেরাকে বোধ লেয বাউরীপাড়ার বহুৎ লোকই নাইম্লো। জ্বাল লাগাও, জ্বাল লাগাও।'

খেয়েদেয়ে উঠে দাঁড়ালো বর্তন। পেট চিড়চিড় করছে। যেন হার্ডপাম্প দেওয়া ফুটবল। পেটে হাত বুলোতে বুলোতে এক অন্য জাতের তৃপ্তি। কারণ, এই ভরপেট নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি মালিকের ক্ষেতে নাবতে হবে না আজ। নুয়ে নুয়ে সাঁঝপহর অবধি ধান কাটতে হবে না। এখন একটা চুটা ধরিয়ে মৌজ করে টানতে থাকা। তারপর মউল গাছের তলায় টানটান হয়ে শুয়ে থাকা, রোদ্দুরে পিঠ ঘুরিয়ে। ইতিমধ্যে তাসের আসর সাজিয়ে বসে গেছে কেউ কেউ। অতি চ্যাংড়ারা খো-খো খেলার প্ল্যান ভাঁজছে। পেটের ভার অল্প কমলেই নেমে পড়বে ওরা। বর্তন চাটাইতে লম্বা হয়ে শুলো। পাশে বসেছিল তিলক লোহার। চাপা গলায় বললো, 'সইন্ঝায় পচাই চলবেক। জানো ত?'

'পচাই!' বর্তন নড়েচড়ে শোয়, 'পচাই কুথা মিলবেক?'

'আছে!' চোখ টিপে হাসে তিলক, 'সুফল বইল্লো। মোট আশি কেজি চাল উঠেছিল চাঁদায়। তার ষাট কেজি খিঁচড়িতে লেইগেছে। বিশ কেজির পচাই বসেছে পশুপতি লোহারের দোরে। পশুপতির হাতের পচাই। বেপারখান্ বুঝ তেবে।'

পাশ দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিল সুফল লোহার। ব্যস্ততার মধ্যেও নির্বাক হাসি বিনিময় হয়। সুফল বলে, 'বইসে বইসে কি করিস, তিলক?'

তিলক লোহার হাসে। বলে, 'ভাবছি মার কথাই হে।'

বলতে বলতে মনের পুলকে গান ধরে তিলক লোহার,

'আহা, মন সরে না শ্বশুরঘর য্যাতে
ও তুই কি দিলি ভাই পানপাতে মন
সরে না শ্বশুরঘর য্যাতে।'

গাইতে গাইতে সুফলের দিকে বাঁহাতখানা উদারভাবে মেলে ধরে তিলক লোহার, 'ও তুই কি দিলি ভাই পানপাতে—'। দু'চোখ নতুন আধুলির মতো চকচক করে ওঠে। বর্তন লোহারের বুকখানাও তিড়িং তিড়িং নৃত্য জুড়ে দেয়।

পাশ ফিরে শোয় বর্তন। শীতের বিকেল দ্রুত নরম হয়ে আসে। শুকনো হাওয়ায়

ঠোঁট ফেটেছে। ধুলো উড়ছে। নরম লাল ধুলো। আয়েসে বুঁজে আসে চোখ। বুকেব মধ্যে পরবের বাদ্যি বাজে। টুপরব আসছে। আর ক'দিন বাদে। এমনি সময়ে কৌশল্যার কথা মনে পড়ে।

সন্ধ্যে নাগাদ পশুপতির উঠোনে পচানির আসর জমে ওঠে। পশুপতি লোহারের তৈরি পচানি এ তল্লাটের সেরা। একখানা মাটির মালসা নিয়ে বসে গেল বর্তন। চোঁ-চোঁ চুমুক মারে মালসার মুখে। ভেতরটা গরম হতে থাকে। অন্ধকার নেমে আসে। ধেয়ে আসে কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া। নেশা জমতে থাকে। হু-হু হাওয়ায় ভেসে আসে টুশু গানের সুর। বর্তনের চোখের সামনে ছবি তৈরি হতে থাকে। একের পর এক ছবি। পৌষ-পরবের ছবি। কৌশল্যাকে নিয়ে পোরকুলের মেলায় যাওয়ার ছবি। শিলাবতী নদীর জলে টুশু ভাসানের ছবি। এক মালসায় ছবিখানা জমে। পরের মালসায় ভেঙে যায়।

উঠোনের এককোণে মাধো সিং চোঁ-চোঁ পচানি গিলছে। ব্যাপারটা প্রথম নজরে আসে পশুপতির। মাধো সিং হলো বিরোধী দলের। বর্তনদের যারা বিরোধী দল, তারা সংখ্যায় কম। তারা আজ ভোজের ব্যবস্থা করেছে আশু রায়ের খামারবাড়িতে। মাধো সিং দুপুরের খাওয়া ওখানেই খেয়েছে। কিন্তু ওদের জন্য সন্ধ্যেয় বুঝি পচানির ব্যবস্থা নেই। সেই কারণে পচানি-খোর মাধো পায়ে পায়ে এসে বসে গেছে উঠোনের এক কোণে।

পশুপতি চিৎকার করে ওঠে, 'তুই শালা গাছেরও খাবি, তলারও কুড়াবি? শালা ধান্দাবাজ! ভাগ, জলদি ভাগ্।'

পশুপতির চিৎকারে সবাই ঘুরে তাকায়। পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করে।

মাধো সিং-এর মুখে বোকা বোকা হাসি। বোঝা গেল, পশুপতির বাখান্‌গুলো তার কানের অন্দর অবধি পৌঁছায় নি। একখানা চেরা লকড়ি নিয়ে চরম রোষে ছুটে যাচ্ছিল পশুপতি লোহার। সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে, থাম্, থাম্ বেচারা আশা লিয়ে আইঁছে, না হয় খেলোই দু'মালসা।

শীতের রাত গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। নেশাটা জমতে থাকে। দু'চোখ লাল হয়ে ওঠে। ঠোঁটজোড়া ফুলে ওঠে। মুখের হাসিটা ক্রমশ নিষ্পাপ হয়ে আসে। উঠোনের এক কোণে বসে জড়ানো গলায় গান ধরেছে তিলক লোহার,

রাজকাটার গাঁজা দোকানে
লিশা লাইগ্যে গেল এক টানে
রাজাকাটার গাঁজা দোকানে ...।

দু'হাত সামনে মেলে ধরে গাইছে তিলক। চারপাশে কেউ কেউ তাল দিচ্ছে। কেউ বা উরুতে আলতো চাপড় মেরে মেরে গেয়ে উঠছে গলায় গলা মিলিয়ে। কাল সকালে, ভোর ভোর, শীতে দলদল থরতে থরতে শিশিরে ভেজা ধান ঠেলতে ঠেলতে মালিকের ক্ষেতে যাওয়া নেই। দিনভর নুয়ে নুয়ে ধান কাটবার বালাই নেই। আহা..হা, কী মজা হে!

একসময় তিলক লোহার উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে এগিয়ে যায় মাঝ-উঠোনে।

সহসা আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে চিৎকার করে ওঠে, একটা লয, পার্টিকে দু'টা ভোট দিবো হে ...।

৪.

সকালবেলায় মউলতলায় একটাই আলোচনার বিষয়। কাল দুপুর থেকে হনুমানটা ঠায় বসে আছে মন্দিরের চুড়োয়। কিছুতেই নামতে পারে নি। ভোখে-শোষে হয়তো বা কাহিল। খুবই মুষড়ে পড়েছে বেচারা। দু'চোখ জুড়ে ভয়, আশঙ্কা। মউলতলায় পৌঁছেই কথাটা কানে আসে বর্তনের। পাড়ার ছেলেরা নামানোর চেষ্টা করেছে অনেক। একখানা তল্লা বাঁশ পাঁচ-ছ' জনে মিলে বেঁকিয়ে তার ডগাটি মন্দিরের চুড়ো অবধি নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাঁশের গোড়ার দিকটাতে টান মেরে বাঁশের ডগা অতখানি বাঁকানো যায় নি। একটা বাঁশের ডগা কোনগতিকে নুইয়ে এনেছিল মন্দিরের চুড়ো অবধি, ঐ বেয়ে নেমে আসার জন্য বাববার পীড়াপীড়ি জুড়েছিল। ছোকরার দল প্রবল চিৎকার করে উৎসাহ জুগিয়েছেল হনুমানটাকে, কিন্তু তাতে করে সাহস তো বাড়েই নি, বরং তার বদলে ভয় বেড়ে গেছে আরও। বার-দুই ভেংচি কেটে সে সংশয়ে দুলতে দুলতে আঁকড়ে ধরেছে ত্রিশূলটাকে। বাচ্চাগুলো খাদ্য হিসেবে কাঁচা পেয়ারা ছুঁড়ে মেরেছে চুড়ো লক্ষ্য করে। তাতে বেচারি দ্বিগুণ আতঙ্কে ত্রিশূল ধরে দাপাদাপি জুড়েছে। শেষমেষ মুরুব্বিরা ধমকে তাড়িয়েছে বাচ্চাদের, 'রেহাই দে উয়াকে! তুয়াদ্যার উপ্কার উয়ার সইবেক নাই। শেষমেষ ভয়েব তানে যেদি লম্ফ-টম্ফ মারে, ত' ছাতি ফেইট্যা মরবেক।'

গতকালের পচানির ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি। শরীরটা বেশ হাল্কা ফুরফুরে লাগছিল বর্তনের। বহুদিন অত বেলা অবধি শোবার সুযোগ পায় নি। আলসেপানা শরীরটাকে মহুলের তলায় থাপ্না করে সে হনুমানের সংকটঘটিত আলোচনা শুনতে থাকে নিবিষ্ট হয়ে।

হনুমানকে নিয়ে গবেষণা এগিযে চলে। কেউ কেউ বলে, 'চূড়া থিক্যে সাহস করে ঝাঁপটা দিতে পারলে মরবেক নাই। বড় জোর ঠ্যাং-ঠুঙ্গা মচকাবেক।'

'কিন্তু সে সাহস কি উয়ার হবেক? অবোধ জীব। উয়ার উপর ভয় পেইয়েছে।'

ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে ভোর সাতটায়। লোহার পাড়ার সবাই ভোট দেবে হাড়মাসড়া গার্লস স্কুলে। কিন্তু সে এখন নয়। দুপুরের পর। বড়সড় ঘরের গিন্নিবান্নিরা খাওয়া-দাওয়া সেরে তখনি আসবেন ভোট দিতে। সুফল লোহারের নির্দেশ, বর্তনরাও ঐ সময়েই ভোটের লাইনে দাঁড়াবে।

হাতে তাই অঢেল সময়। বর্তন ভাবলো, কি করা যায় অতিরিক্ত অতোখানি সময় নিয়ে? কি করা উচিত?

গেরস্থের গরুর গোঠ লাল ধুলো উড়িয়ে চলেছে জংগলের দিকে। তাদের গলার ঠরকা ঠর্ ... র্র্—ঠর ... র্র্ বাজছে। খেজুর রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঘরে ফিরছে নয়ন দাস। একটা ফেতি-কুত্তা খান-চার-পাঁচ বাচ্চা নিয়ে ঘুরঘুর জুড়েছে মউলতলায়।

বাচ্চাগুলো মায়ের বাঁটে মুখ দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে।

মউলতলায় রান্নার আয়োজন শুরু হয়েছে। উনুনে আগুন পড়েছে। চাল-ডাল ধোওয়া চলছে। দুপুরেও খাওয়া-দাওয়া করবে নাবাল মজুরদের দল। বিকেল থেকে ট্রাক বোঝাই শুরু হবে হাড়মাসড়ার বটতলা থেকে। নাবাল মজুর ফিরে যাবে নাবালে। কাল ভোরের মধ্যে হাজির হতে হবে মালিকের ক্ষেতের পাশটিতে।

বর্তন পায়ে পায়ে গেল পশুপতি লোহারের উঠোনে।

আসাটা বৃথায় যায় নি। বর্তন দেখলো, সকাল বেলাতেই পশুপতির উঠোনে বসে গিয়েছে পচাইয়ের আসর। গত রাতের অবশিষ্ট পচাইয়ের কথাটা মনে ছিল অনেকেরই। সকাল না হতেই তারা ভনভনে মাছির মতো ভিড় করেছে। কেউ কেউ রাতে ঘরেই ফেরে নি। চাদর মুড়ি দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলি হয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে পশুপতির দাওয়ায়। সকালে উঠে ফের মালসা নিয়ে বসেছে। বর্তনও একটা মালসা নিয়ে বসে গেল।

দুপুর বেলায় ভরপেট খিঁচুড়ি খেয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়ালো বর্তনরা। ভদ্দর ঘরের বউ-ঝি, গিন্নিবান্নিরা যারা মূলত বিরোধী দলের ভোটার খাওয়া-দাওয়া সেরে, মুখে পানের খিলি গুঁজে, পাটভাঙা কাপড় পরে, পায়ে আলতা লাগিয়ে হেলতে দুলতে আসছে দল বেঁধে। বর্তনদের প্রায় পুরো পাড়া তার আগেই এসে—দখল করে নিয়েছে লাইন। জ্যাম করে দিয়েছে বুথ-ঘরের মুখ। হল্লা বাধিয়েছে অকারণে। দু'তিনটে হোমগার্ড আর চৌকিদার মিলে লাইন ঠিক করতে হিমসিম খাচ্ছে। এ'এক মজার খেলা। বর্তনরা জানে। অকারণে, লাইনের মধ্যে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি। শীতের বিকেলেও সবাই ঘেমে-নেয়ে একসা। ভদ্দর ঘরের বউঝিরা অমন ভিড়ভাট্টায় দাঁড়াতে চাইছে না। সামনের থেকে আচমকা ঠেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে লাইন। মা-জননীদের অনেকেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছে অশান্ত লাইনের ভাব্-গতিক। ওদের দলের কর্মীরা হাজার বুঝিয়েও ওদের লাইনে ভেড়াতে পারছে না। এ দৃশ্য বর্তনদের কাছে নতুন নয়। তারা জানে, লাইনে যারা কোনো গতিকে দাঁড়িয়েছে তারাও টিকবে না বেশিক্ষণ। কারণ, ইতিমধ্যে মা-জননীদের পেছনেই ওরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বাউরীপাড়ার জনা ত্রিশ-চল্লিশ মেয়েকে। সামনের পেছনের দু'দিকের ঠেলায় ওদের বারো আনা একটু বাদেই বেরিয়ে যাবে লাইন থেকে। অত ধকল ওইসব আয়েশী শরীরে সইবে না। গাল পাড়তে পাড়তে ধরবে যে-যার ঘরের পথ। কর্মীরা হাজার মেহতন করেও তাদের ধরে রাখতে পারবে না।

বর্তন যখন ভোট দিয়ে বেরোলো তখন ডালে-পালায় বেলা। রোদ্দুরের রং লালচে। হাতে আর সময় নেই। এখনই ট্রাকে রওনা না দিতে পারলে বাঁকুড়ায় রাতের ট্রেন ধরতে পারবে না। মা এবং পিসি এখনো রয়েছে লাইনে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে দৌড় দিল হাড়মাসড়ার বটতলার দিকে।

বটতলায় জনা-পঞ্চাশ লোকের জটলা। একখানা ট্রাক বোঝাই হয়ে রওনা দিয়েছে আধ-ঘন্টাটাক আগে। ঐ ট্রাক না ফিরে আসা অবধি বর্তনদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

লাল-চাকিব মতো সূর্য ডুবছে তালাপুকুরের পশ্চিমপাড়ে। পাখি-পাখাল দল বেঁধে উড়ে চলেছে যে-যার আস্তানার দিকে। হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বটতলায় এবং আশেপাশে অসংখ্য এঁটো শালপাতা উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরে এঁটোকাঁটার দখল নিয়ে ঝগড়া লাগিয়েছে একপাল কুকুর। দেখতে দেখতে বর্তনের মনটা ভারি হয়ে আসে। ইস্, কত জলদি ফুরাঁই গেল, আনন্দের মেলাটি! আবার তাকে ফিরে যেতে হবে পরবাসে। কাঁধ দিতে হবে জোয়ালে। সেখানে সকাল থেকে সন্ধে অবধি মালিকের ক্ষেতে হাড়ভাঙা খাটালি।

তিলক লোহার যাবে বর্ধমান। বাঁকুড়া অবধি এক ট্রাকে। বটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে সে। ডুবন্ত সূর্যের ম্লান আলো তার মুখের এক পাশে পড়েছে। ধীরলয়ে গান ধরেছে তিলক লোহার,

এতবড় পৌষ-পরবে রাখিলি মা পরের ঘরে
পরের মা' কি বেদন বুঝে, পুড়াঁই মারে অন্তরে। ...

গানটা শুনতে থাকে বটতলার তাবৎ-নাবাল মজুর। গানের করুণ সুরটি বুকের মধ্যে ঘাই মারতে থাকে নিঃশব্দে। টুশুর মাস চলছে। সন্ধে হলেই ঘরে ঘরে টুশু-পুজা, টুশু-গান। দিনকয় বাদে পৌষপরব। টুশুর ভাসান। এখ্যান পরবে আস্‌কা-পিঠার ধুম। কাঁসাই নদীর দহে পোরকুলের টুশু মেলা। এই, সবকিছু পেছনে ফেলে এদের চলে যেতেই হবে এক অদৃশ্য শেকলের টানে।

দুটো মাত্তর দিন। গালগল্পে, রঙতামাশায়, ভুরিভোজে আর আলসেপনায় স্বপ্নের মতো কেটে গেল। হায়, স্বপ্নটা কেন স্থায়ী হয় না! কেন ফি-মাসেই ভোট ডাকেন না বাবুরা? দু'দিনের শেকল-ঢিলা ছুটি। ট্রাকের মাথায় চড়ে, সারা অঙ্গে লাল ধুলো মেখে, হৈ-হৈ করে ঘরে ফেরা। দিনভর রঙে-রসে মজে থাকা। মউলতলায় শালপাতার পাত পেড়ে খিঁচুড়ি-ভোজ। সন্ধ্যেবেলায় অঢেল পচানীর মাতাল আসর। আ-হা, কেন ডাকেন না বাবুরা! বর্তনদের সারা মুখ জুড়ে এখন স্থাযী বিষাদ!

ট্রাক ফিরে এলো। ভনভনে নীলমাছির মতো রঙ। তার গর্জনে কেঁপে ওঠে বটতলার লাল মাটি। নেতারা তাড়া লাগান্ উঠ্, উঠ্, উঠ্। জলদি কর্ রে। তুয়ারদ্যারকে ছেঁইড়ে, আরো চার ট্রিপ মারতে হবেক ইয়াদ্যার। উঠ্, উঠ্, উঠ্।

ট্রাকে চড়বার পূর্ব-মুহূর্তে, ঘনিয়ে আসা সন্ধের আলো-আঁধারিতে, বর্তন দেখলো বিপন্ন হনুমানটি শ্যাওলা-ধরা মন্দিরের চুড়োয় একতাল পাথরের মতো স্থির। এখন তার নিষ্প্রভ চোখের মণিজোড়ায় মৃত্যুর ছায়া দুলছে। সন্ধে নামছে। চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে কাকের ডানার মতো অন্ধকার। একটু একটু করে নিঃসাড়ে ঢেকে ফেলছে ওর সারা শরীর। জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বসে রয়েছে অবোলা জীবটি। কে জানে, ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে নেবে পড়া ঐ শ্যাওলা-ধরা পিচ্ছিল চুড়ো থেকে জীয়ন্তে তার মুক্তি ঘটবে কিনা!

সকালে অনেকে বলছিল, লম্ফ দিলে হনুমানটা নাকি বেঁচে যেতেও পারে। বড়জোর ঠ্যাং-ঠুং মচকাবে। বর্তনের মনে হল, প্রতি মুহূর্তে এমন নিদারুণভাবে বিপন্ন হয়ে থাকার চেয়ে ওর লম্ফ দেওয়াই সংগত।

খাঁচা

১.

অলকেশ বসে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল, সুলতা হন্তদন্ত হয়ে এল।

অলকেশের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'এই, একটু এসো না এদিকে। জলদি।'

'কি হল? দেখছ না, দাড়ি কামাচ্ছি।'

'এসোই না একটু।' তর সইছে না সুলতার। অলকেশের পেছনটিতে দাঁড়িয়ে সমানে পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে।

বাধ্য হয়ে উঠতে হয় অলকেশকে। মুখের আধখানা ঢাকা থাকে সাবানের ফেনায়। সুলতা মাঝে মাঝেই এমন উৎপাত জোড়ে। বাচ্চা মেয়ের মতো অবুঝ হয়ে যায়। অলকেশ মেনে নিয়েছে।

অলকেশকে উঠতে দেখে সুলতা ততক্ষণে পা বাড়িয়েছে বাইরের দিকে। অলকেশ অনুসরণ করে। সদর-দরজার পরেই গ্রীল দেওয়া চিলতে বারান্দা, দু'তিন ধাপ সিঁড়ি, ছোট্ট উঠোন, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের কপালের মতো, দু'চারটে পরিপাটি মরসুমী ফুলের গাছ, নীচু পাঁচিল ও গেট।

বারান্দায় পা দিয়েই অলকেশ হতভম্ব। লোকটা গ্যাঁট হয়ে বসেছে সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে। চারপাশে কলকল করছে কয়েক ডজন পাখি। সুলতা উজ্জ্বল হেসে বলে, 'কী সুন্দর পাখি দ্যাখ! খাঁচাসহ বেচবে বলছে। কিনব একটা?' সুলতা আদুরে গলায় বায়না ধরে।

সুলতার দিকে একপলক তাকিয়ে কষ্টে হাসি চাপে অলকেশ। ওর এই ধরনের ছেলেমানুষি সে আজই দেখছে না। সুলতার মাথায় অনেকগুলো পোকা রয়েছে। কোন পোকাটি যে কখন নড়েচড়ে বেড়াবে তার ঠিক থাকে না। বলে, 'তা আমায় কি করতে হবে?

'বা-রে! দরদাম করে দাও।'

সুলতার ইঙ্গিতে পাখিওয়ালা ততক্ষণে এগিয়ে দিয়েছে একখানা খাঁচা। টিয়ে পাখি। বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর ছটফটে।

সুলতার খুশি আর ধরে না, বলে, 'এইটেই নিই, কি বল?'

'দ্যাখ—' অলকেশ হাল্কা চালে বলে।

'দ্যাখ কি?' সুলতা ক্ষেপে ওঠে, 'তোমায় তবে নিয়ে এলাম কেন? বাচ্চা দেখে একখানা বাছবে তো।'

হেসে ওঠে অলকেশ, 'কোনটা বাচ্চা, কোনটা বুড়ো, আমি বুঝব কি করে? আমার তো সবগুলোকেই বুড়ো মনে হচ্ছে।'

গোমড়া মুখে তাকায় সুলতা। গলা থেকে অভিমান ঝরে পড়ে, 'তোমাকে ডাকাটাই ঘাট হয়েছে। চাই নে পাখি, যাও।'

সুলতা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জেদি মেয়ের মতো। পাখিওয়ালা বুঝতে পারে না, কি করা উচিত।

শেষ অবধি একটা পাখি পছন্দ করে কেনা হয়। দরদাম করে, দাম মিটিয়ে, অলকেশ ভেতরে পা বাড়ায়। সুলতা তখন খাঁচা নিয়ে উধাও।

সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফিরেই অলকেশ দেখে, সুলতা খাটের ওপর উপুড় হয়ে একখানা বই পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। অলকেশকে দেখে উঠে বসে। চোখ বড় বড় করে বলে, 'জানো, ওকে রোজ একটা করে কাঁচালঙ্কা খাওয়াতে হবে। আর দু'বেলা ছোলার ছাতু। লিখেছে এইখানে।'

অলকেশ আড়চোখে দেখে নেয় বইখানা। পশু-পাখি পোষার ওপর একখানা বই পড়ছে সুলতা। 'এটি জুটল কোত্থেকে?' ভ্রু কুঁচকে তাকায় অলকেশ।

সে কথার জবাব না দিয়ে সুলতা ত্বরিত পায়ে চা করতে চলে যায়।

অলকেশকে চা-জলখাবার দিয়ে পাশে বসে সুলতা। চোখ বড় বড় করে বলে, 'জানো, ওটা ভীষণ রকমের পাজি। সারাদিন ঠোঁট দিয়ে খাঁচার তার কামড়েছে। আর, ওর দিকে আঙুল নিয়ে গেলেই কামড়াতে আসে।' খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সুলতা। মিষ্টি প্রশ্রয়ের হাসি।

সে কথার জবাব দেয় না অলকেশ। বলে, বর্ধন সাহেব আসবেন। একটু বাদেই। যাও, পরিষ্কার হয়ে নাও।'

অলকেশের কথা গায়ে মাখে না সুলতা। বলে, 'আমি আজ বই দেখে দেখে একখানা লিস্ট বানিয়েছি। তুমি কালই ওগুলো এনে দিও লক্ষ্মীটি। বল, দেবে তো?'

সুলতার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে অলকেশ। বলে, 'কী যে ছেলেমানুষি কর না। আচ্ছা, দেবো এনে। যাও, এবার পরিষ্কার হয়ে নাও।'

গাড়ির চাবিখানা হাতে দোলাতে দোলাতে অলকেশদের বসবার ঘরে ঢোকেন বর্ধন সাহেব। সন্ধে তখন আন্দাজ সাড়ে আটটা। অলকেশ অপেক্ষা করছিল। বর্ধন সাহেবকে খাতির করে বসাল সোফায়। সুলতা তখন শোবার ঘরে পাখিটার সঙ্গে খুনসুটিতে ব্যস্ত।

বর্ধন সাহেবের এই প্রথম আসা নয়। গেল মাস দুয়েকের মধ্যে তিনচার বার এসেছেন অলকেশের বাড়িতে। অলকেশের পক্ষে সেটা সৌভাগ্যই বলতে হবে। খানিকক্ষণ অলকেশের সঙ্গে অফিস-সংক্রান্ত গল্পগুজব করেন বর্ধন সাহেব। দেওয়ালে চোখ চারিয়ে ছবিটবিগুলো দেখেন। তারপর উসখুস করতে থাকেন। একসময় বলেন, 'মিসেস রায় কি নেই বাড়িতে?'

অলকেশও উসখুস করছিল তখন থেকে। ঘন ঘন ভেতর-ঘরের দিকে উঁকি মারছিল। অন্যদিন এতক্ষণে চা-জলখাবার নিয়ে সুলতা এসে যায়। আজ তাকে অন্য নেশায় পেয়েছে।

'না, না, ঘরেই রয়েছে।' অপ্রস্তুতের হাসি হেসে অলকেশ বলে, 'আসলে একটা টিয়েপাখি কিনেছে আজ। তাই নিয়ে বোধ হয়—।'

'টিয়ে পাখি ?' বর্ধন সাহেবের দু'চোখ কৌতুকে ভরাট হয়ে আসে, 'কই, কেমন পাখি, দেখি।'

ভেতরে চলে যায় অলকেশ। খানিক বাদে সুলতা ঢোকে বসবার ঘরে। পেছনে খাঁচা হাতে অলকেশ।

বর্ধন সাহেব পাখিটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখেন। গম্ভীর গলায় বলেন, 'এটা ঠিক টিয়ে নয়।'

'তবে ?' চমকে ওঠে সুলতা।

সুলতার চমকে ওঠাটা বেশ উপভোগ করেন বর্ধন সাহেব। নরম গোছের হাসেন। বলেন, 'এটার নাম চন্দনা। গলায় লাল ডোরা দেখছেন না, টিয়েদের এটা থাকে না।'

সুলতা যেন আকাশ থেকে পড়ে। ওর ধারাল ঝকঝকে চোখদুটো বিস্ময়ে ঘন হয়ে আসে। অলকেশ বলে, 'আপনি কি জুওলজির ছাত্র ছিলেন স্যার ?'

ভারি রহস্যময় চোখে অলকেশের দিকে তাকান বর্ধনসাহেব। নজরটা সুলতার ওপর দিয়ে তুলির মতো বুলিয়ে আনেন। বলেন, 'জুওলজির ছাত্র আমি নই, তবে পাখি চিনি ভালই।'

বর্ধন সাহেবের সামনে চা-মিষ্টি নামিয়ে দেয় সুলতা। উল্টোদিকের সোফায় বসে নিজের কাপ টেনে নেয়।

সুলতার দিকে এক পলক তাকিয়ে বর্ধন সাহেব বলেন, 'ঘরে আপনার সময় কাটে না, বুঝতে পরি। তাই এমন পাখি কেনার ঝোঁক।'

সুলতা জবাব না দিয়ে শুধুই হাসে। বর্ধন সাহেবের ফর্সা গোলগাল মুখখানা সহসা ভারি অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বর্ধন সাহেব বলেন 'কিছু একটা করেন না কেন ? কোনও চাকরি-টাকরি ?' টিপয়ের ওপর কাপখানা ঠক করে রেখে দিয়ে বলেন, 'আজকাল তো মেয়েদের জন্য অনেক রকমের চাকরি।'

অলকেশ নিঃশব্দে হাত মটকাতে থাকে। আসলে, বর্ধনসাহেবের কাছে যা নিতান্তই সোজা, অলকেশরা সেটাই পেতে হিমসিম খায়। মৃদু হেসে বলে, 'চাকরি করবার ওর ভীষণ শখ। চেষ্টাও করছে অনেক জায়গায়।'

পাইপ ধরাবার ফাঁকে সুলতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেন বর্ধন সাহেব। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, 'হয়ে যাবে। চেষ্টা করলে কি না হয়।'

ঘন্টাখানেক বাদে বিদায় নেন বর্ধন সাহেব।

যাবার বেলায় বলেন, 'একদিন মিসেস রায়কে নিয়ে আসুন না আমার বাংলোয়।

যে কোনদিন সন্ধেয়।' ভরাট হাসেন বর্ধন সাহেব, 'অবশ্য ব্যাচেলরের বাংলোতে অত সুন্দর চা মিলবে না। সেটা আগাম জানিয়ে রাখলাম।'

রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে অলকেশ বিরক্তি মাখানো গলায় বলে, 'তুমি তখন বসবার ঘরে আসছিলে না কেন?'

সুলতা জবাব দেয় না। সে একমনে ক্রিম ঘষতে থাকে মুখে।

অলকেশ বলে, 'উনি কি ভাবলেন বল তো?'

আদুরে গলায় সুলতা বলে, 'বা রে, ও যে তখন খেতে চাইছিল না কিছুতেই।' বলতে বলতেই সুলতা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, 'কি নাম রাখা যায় বল তো ওর?'

অলকেশের গলা দিয়ে নিদারুণ বিরক্তি ঝরে পড়ে, 'কি যে ছেলেমানুষি কর না তুমি মাঝে মাঝে।'

সুলতা স্বামীর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ফিরিয়ে নেয় মুখ। সহসা দু'চোখ থমথমে হয়ে ওঠে।

নিজের গলাটা অলকেশের কানেও যেন বেসুরো বাজে।

একটুখানি চুপ থেকে বলে, 'উনি কিন্তু ইচ্ছে করলেই তোমায় একটা চাকরি দিয়ে দিতে পারেন।'

ফর্সা গালদুটো বেলুনের মতো ফুলিয়ে সুলতা বলে, 'চাইনে আমার চাকরি।'

অলকেশ নাচার হয়ে পাশ ফিরে শোয়।

২.

অনেক ভেবেচিন্তে সুলতা পাখিটার নাম রাখল 'ঝুম'। ওকে নিয়েই মশগুল থাকে সারাদিন। অলকেশ অফিসে বেরিয়ে গেলেই শুরু করে পাখিটার তত্ত্বতালাশ। অলকেশ হেসে বাঁচে না। ঝুম! পাখির নাম, ঝুম! সুলতা গায়ে মাখে না। সে সারা বিকেল ধরে খুনসুটি চালায় ওটার সঙ্গে। সারা সন্ধেও। অলকেশ মনে মনে হেসে খুন হয়।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতে অলকেশ বলল, 'জানো, অফিসে একটা সিনিয়র একজিকিউটিভের পোস্ট খালি হয়েছে।'

সুলতা কান খাড়া করে শোনে। জবাব দেয় না। অলকেশ বলে, 'হকদার আমরা তিনজন। দেখা যাক, কি হয়। বর্ধন সাহেব অবশ্য খানিকটা আশা দিয়েছেন।'

চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় অলকেশ। বলে, 'ভালো কথা, বর্ধন সাহেব আজ সন্ধেয় যেতে বলেছেন ওঁর বাংলোয়। রেডি হয়ে নাও।'

ঠোঁট উলটে সুলতা বলে, 'যেতে হয় তুমিই যাও না। আমি আবার কেন? আমার ওই অফিসের আলোচনার মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করে না।'

'বোকার মতো কথা বলো না।' অলকেশের গলায় বিরক্তি চাপা থাকে না, 'চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন দু'জনকেই। একা গেলে চলে? তাছাড়া, অফিসে এত অফিসার থাকতে আমাকে আলাদা করে—।'

শেষ অবধি বেরোতেই হয় সুলতাকে। রাস্তায় নেমে অলকেশ এক প্রস্থ চোখ

বুলিয়ে নেয় সুলতার বেশবাসের দিকে। বলে, 'এই শাড়িটা পরলে? আলমারি থেকে আর একটা না হয়—।'

বাংলোয় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে বর্ধন সাহেব সুলতাকে শুধোন, 'আপনার পাখি কেমন আছে?'

ঠোঁট টিপে হাসে সুলতা।

বর্ধনসাহেব বলেন, 'আমার কাছে কিন্তু পাখির ওপর বই রয়েছে অনেক। আপনি নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন এক-আধটা।'

সুলতা জবাব দেয় না।

সারা সন্ধে অনেক গল্পগুজব হল। বর্ধন সাহেব সুলতাকে পাখিদের বিচিত্র স্বভাবের কথা বোঝালেন অনেকক্ষণ ধরে। অলকেশ বসে বসে উসখুস করল সারাক্ষণ।

বাড়ি ফিরেই সুলতাকে একচোট বকুনি লাগায় অলকেশ, 'সারাক্ষণ খালি পাখি-পাখি করলে, কাজের কথাটা পাড়তে দিলে না।'

চোখ বড় বড় করে তাকায় সুলতা। অতি কষ্টে হাসি চাপে। বলে, 'আমি আবার কোথায় পাখি-পাখি করলাম? যা বলবার, তোমার বর্ধন সাহেবই তো বলে গেলেন।'

'তা হোক।' গোমড়া মুখে অলকেশ বলে, 'একফাঁকে নিজের চাকরির কথাটা অন্তত বলা উচিত ছিল তোমার।'

সুলতা কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে অলকেশের দিকে। তারপর খিলখিলিযে হেসে ওঠে। কৌতুক মেশানো গলায় বলে, 'চলছে পাখির গপ্পো, আর আমি তুলব চাকরির কথা? তুমি কী গো?' নরম হাত দিয়ে অলকেশকে আলতো ঠেলা দেয সুলতা।

অলকেশ মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। তাই দেখে আরও হাসি পেয়ে যায় সুলতার।

৩.

পাখিটা বেশ চালাক চতুর হয়েছে।

সকালের আলো দেখেই চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডাকতে থাকে। অলকেশের ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্তি মাখানো গলায় বলে ওঠে, 'কি আপদ জোটালে বল তো? সকালের ঘুমটাই মাটি।' বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ মটকে হাসে সুলতা। স্বামীকে আরও ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য বলে, 'ডাকবেই তো। ট্রেনিং পাচ্ছে যে রোজ।' অলকেশের গায়ে আলতো ঠেলা দিয়ে সুলতা বলে, 'ও আসলে চা-চা করে চেঁচায়। তোমায় চা দিতে বলে।'

অলকেশ বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শোয়।

ইদানিং আরও এক জ্বালা হয়েছে সুলতার। খাঁচার পাশ দিয়ে আনাগোনা করবার জো নেই ওর। সুলতাকে দেখলেই পাখিটা সমানে ডানা ঝাপটাতে থাকে। খাঁচা দিয়ে ঠোঁটখানা বের করে দেয়। লাল টুকটুকে ঠোঁট। সুলতা আহ্লাদে নাক কুঁচকে বলে, 'আহা, সোহাগী, টিপে দিতে হয় ঠোঁটখানা!'

দিনকযেক বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুলতার 'ঝুম'কে দেখতে এলেন বর্ধন সাহেব।

'কই, আপনার পাখি কোথায় ?'

লাজুক হেসে সুলতা বলে, 'ও ঘুমোচ্ছ।'

বর্ধনসাহেব পাখি-প্রসঙ্গে আর যান না। বলেন, 'আপনার নাকি শরীর খারাপ ?'

'ও মা! কে বললে ? আমি তো ভালোই আছি।' অবাক হয়ে লজ্জা পেয়ে সুলতা স্বামীর দিকে তাকায়।

বর্ধন সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়েন। অলকেশের দিকে তাকিযে থাকেন জিজ্ঞাসু চোখে।

অলকেশ বিব্রত বোধ করে। সুলতার দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করে। বলে, 'আজকেই সকালে তুমি যে বললে, তোমার শরীর ভীষণ খারাপ।'

কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ে সুলতার। কারণটাও মনে পড়ে। বর্ধনসাহেব নাকি ক'দিন ধরেই বলছিলেন, একবার বকখালি বেড়িয়ে এলে হয় না ? তিনজনায় মিলে, কোনও ছুটির দিনে। অলকেশ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হতে পারে নি। সুলতার সঙ্গে কথা না বলে—। বর্ধন সাহেব বলেছিলেন, 'অসুবিধে কিসের ? গাড়ি রয়েছে তো। সকালে যাব, সন্ধেয় ফিরব।' সেই প্রসঙ্গটাই আজ সকালে সুলতার সামনে তুলেছিল অলকেশ। শুনেই সুলতা প্রবল আপত্তি তুলেছিল। অলকেশও নাছোড়বান্দা, না যাওয়ার কি হয়েছে, বলবে তো ? তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। কি জবাব দেবে সুলতা, কি করে বোঝাবে মানুষটাকে! জানলা দিয়ে চোখদুটোকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'আমার শরীর খারাপ। ভীষণ খারাপ।' সুলতা বুঝতে পারে, অলকেশই অফিসে কথাটা বলেছে বর্ধন সাহেবকে। সুলতা মনে মনে ভীষণ লজ্জা পায়। ভারি রাগ হয় অলকেশের ওপর। এটা-ওটা বলে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে। অলকেশও কি যেন একটা অজুহাত দিতে চায়।

বর্ধন সাহেব কিন্তু সে সবের ধার-পাশ দিয়েও গেলেন না। বললেন, 'সে যাক গে। শরীর যখন ভালই আছে, তবে তো আমাদের প্রোগ্রামটা হতে বাধা নেই।'

সুলতা আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকায়। ফর্সা কপালখানি সহসা ঘেমে ওঠে তার। রাগটা পারদের মতো চড়তে থাকে অলকেশের ওপর।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পাখির খাঁচাটাকে নিয়ে আলতো নাড়াচাড়া করছিল সুলতা। পাখিটা ঘুমোচ্ছিল। সুলতা বারে বারে জাগিয়ে দিচ্ছিল ওটাকে।

হঠাৎ অলকেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'যাই বল বাপু, তোমাদের ওই বকখালি না কোথায় যেন প্রোগ্রাম, ওতে আমি নেই।'

বিরস বদনে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে অলকেশ। তেতো গলায় বলে, 'তুমি যে কোন ধাতুতে গড়া, বুঝি নে। যাচলে সোনা রাং হয়ে যায় তোমার কাছে। অতবড় মানুষটা, অত করে সাধছে—। সান্যাল কিংবা বাসু এমন প্রস্তাব পেলে তো লুফে নিত।'

সুলতা একদৃষ্টিতে দেখছিল স্বামীকে। পড়বার চেষ্টা করছিল ওর মুখের রেখাগুলো। সহসা চোখের কোলদুটি ভারি হয়ে আসে ওর।

৪.

গাড়িতে যেতে যেতে বর্ধন সাহেব বললেন, 'আপনার পাখিটা কার কাছে রইল?' একটু থেমে নিজেই বললেন, 'ওটাকেও সঙ্গে আনতে পারতেন। গাড়ির ওপর বসিয়ে দিতাম খাঁচাটাকে।'

সুলতা জবাব দিল না। এমনিতে পাখিটার জন্য মনটা কেমন করছিল তার। সারাদিনের খাবার, জল, দিয়ে এসেছে খাঁচায়। তবুও পাখিটার কথাই ঘুরে ফিরে মনে আসে তার। সুলতা বোধ করি জবাবের দায় এড়াতেই চোখদুটোকে জানালা দিয়ে পাঠিয়ে দিল বাইরে।

দিনভর ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তিনজনায়। বর্ধন সাহেব সুলতাকে অনেক জাতের পাখি চেনালেন। মাঝে মধ্যে দু'একটা নালায় জল জমে ছিল, হাত ধরে পার করালেন সুলতাকে। ভীষণ উজ্জ্বল লাগছিল বর্ধন সাহেবকে। গুনগুনিয়ে একটা ইংরেজি গানের সুর ভাঁজছিলেন অবিরাম। পৃথিবীটাকে তারিফ করছিলেন নানাভাবে। দুপুরের খাবারটা সারা হল একটা গাছের তলায়। সুলতার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে থাকতে দেখে নিজের সুগন্ধি রুমালখানা এগিয়ে দিলেন। সুলতার চুলের মধ্যে থেকে শুকনো পাতা সযত্নে তুলে ফেলে দিলেন। কারণে-অকারণে অনেক প্রশংসা করলেন সুলতার। সুলতা সারাক্ষণ চুপটি করে রইল, কখনও কখনও একটু বা হাসল। অলকেশও সারাক্ষণ চোখে-মুখে তরতাজাটি থাকতে চেয়েছে। মাঝে মাঝে হেসে উঠেছে, প্রাণখোলা হাসি। সুলতার জন্য এক ধরনের অহংকারবোধ পোষণ করতে করতে তার সময় কেটে যায়।

রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফেরে ওরা। বর্ধন সাহেব ওদের নামিয়ে দিয়ে যান একেবারে দোরগোড়ায়। মুখ-হাত ধুয়ে অলকেশ বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে। সুলতা খাঁচার পাশটিতে দাঁড়িয়ে ছিল। আলতো করে দোলাচ্ছিল খাঁচাটা। অলকেশের মন থেকে খুশি খুশি ভাবখানা যায়নি তখনও।

পেছন থেকে সুলতাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বর্ধনসাহেব ভীষণ খুশি হয়েছেন আজ, বুঝলে? তুমিও আজ ভারি সুন্দর ম্যানেজ করেছ। এত্তো ভাল লাগছে না!'

সুলতা পাখিটাকে জাগাবার চেষ্টা করছিল। অলকেশের কথার জবাবে কিছুই বলে না সে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে বাইরের অন্ধকারের দিকে। আচমকা জোরে জোরে দোলাতে থাকে খাঁচাটা। টাল সামলাতে গিয়ে জেরবার হয়ে যায় পাখিটা। বারবার জোরে জোরে ডানা ঝাপটাতে থাকে। পলকহীন চোখে সেই দৃশ্য দেখতে থাকে সুলতা। শরীরটা কেবল কেঁপে কেঁপে ওঠে বারকয়েক।

একটু বাদে সুলতাকে ছেড়ে দেয় অলকেশ। বলে, 'যাও, শুয়ে পড। ভীষণ টায়ার্ড তুমি।'

৫.

চৌরঙ্গি ধরে হাঁটছিল সুলতা। এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিল। ধর্মতলার

ওদিকটায় গেলে বাসগুলোতে ওঠা যাবে এই ভেবে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছিল সে। এমনি সময় পাশে এসে ব্রেক কষল বর্ধন সাহেবের গাড়ি। মুখ বাড়িয়ে বর্ধন সাহেব বলেন, 'আরে, কি আশ্চর্য, এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছেন?'

ফর্সা মুখখানা মুহূর্তে রাঙা হয়ে ওঠে সুলতার। চারপাশে তাকিয়ে কিছু যেন খুঁজতে থাকে ব্যগ্র হয়ে। বর্ধন সাহেব বলেন, 'উঠে আসুন। পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে।'

সুলতার কপালটা অলক্ষ্যে টানটান হয়ে ওঠে। বিপন্ন গলায় কিছু বলতে চাচ্ছিল, তার আগেই বর্ধন সাহেব অস্থির গলায় বলেন, 'কুইক। ট্রাফিক জমে যাচ্ছে পেছনে।'

মনের বিরূপতা সত্ত্বেও সুলতাকে উঠে পড়তে হল। গাড়ি চালিয়ে দিলেন বর্ধন সাহেব।

'কোত্থেকে ফিরছেন এই শেষ দুপুরে?'

সুলতা মৃদু গলায় বলে, 'এক বন্ধুর বাড়ি থেকে।'

আড়চোখে হাসেন বর্ধন সাহেব, 'এখন যাবেন কোথায়?'

'বাড়িতে।' সুলতা আঁচল দিয়ে মুখখানা মোছে।

'ব্যস, আর কোনও প্রোগাম নেই?'

সুলতার গলা ঈষৎ কেঁপে ওঠে। বলে, 'বাড়ি গিয়ে জলখাবার বানাবো। উনি তো বলে গেছেন একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন আজ।'

'কে? রায়? ওর ফিরতে দেরি হবে আজ। ওকে একটা জরুরি কাজে ওয়ার্কশপে পাঠিয়েছি।' স্টিয়ারিং বাম দিকে ঘুরিয়ে বর্ধন সাহেব বলেন, 'সিনিয়র একজিকিউটিভের পোষ্টটাতে লোক নেওয়া হবে তো শিগগির। এ সময়ে খানিকটা কাজ দেখানো দরকার।' বলতে বলতে ব্রেক-এ চাপ দিয়ে গাড়ি থামালেন বর্ধন সাহেব। নিজে নেমে, উল্টো দিকে গিয়ে সুলতার দরজাটা খুলে ধরলেন।

সুলতা ইতস্তত করেছিল। এক গাল হেসে বর্ধন সাহেব বলেন, 'আরে নামুন না। আমি তো আপনাকে কংগোর জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছি না।'

সুলতার মনের শক্তি কে যেন হরণ করে নিয়েছে অজান্তে। কলের পুতুলের মতো নামে সে। বর্ধন সাহেব বলেন, 'বেজায় ঘেমে গিয়েছেন। ঠাণ্ডা কিছু দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিন।'

কাফে থেকে বেরিয়ে ফের গাড়িতে স্টার্ট দিলেন বর্ধন সাহেব। সুলতা বোবার মতো পাশটিতে বসে।

যেতে যেতে বর্ধন সাহেব বলেন, 'কি ব্যাপার? আজ চুপচাপ?' ঠোঁটের কোণে হাসেন, 'বাঘ-ভাল্লুকের পাল্লায় তো আর পড়েন নি।' বলেই স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দিলেন বাঁয়ে।

সুলতার চোখদুটো অতিমাত্রায় সজাগ হযে ওঠে। আড়চোখে একপলকে দেখে নেয় বর্ধন সাহেবের মুখখানা। কিন্তু কোনও কথা শুধোতে সাহস পায় না।

নিউ মার্কেটের সামনে গিয়ে নামেন বর্ধন সাহেব। সুলতার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'একটুখানি বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।'

সুলতা বুকের মধ্যে একরাশ প্রশ্ন জমিয়ে বসে থাকে ঠায়।

খানিকবাদে ফিরে এলেন বর্ধন সাহেব। হাতে একগোছা তাজা রজনীগন্ধা। সুলতার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'ধরুন'।

সুলতা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। বর্ধন সাহেব আবার বললেন, 'কই, ধরুন।'

কাঁপা কাঁপা হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দেয় সুলতা। রজনীগন্ধার গোছাখানি ধরে। তারপর অসাড় হয়ে আসা শরীরখানা এলিয়ে দেয় পেছনে। গলা গলিয়ে ঘামতে থাকে।

ঘরে ফিরে সুলতা দেখে, অলকেশ ফিরেছে। সুলতা যেন কিছুতেই তাকাতে পারে না ওর দিকে। সামনে এসে কথা খুঁজে পায় না।

অলকেশের কোনও ভাবান্তর নেই। খুশি খুশি গলায় বলে, 'বর্ধন সাহেব নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তাই না? কোথায় দেখা হল?' অল্প থেমে অলকেশ বলে, 'লোকটা বড় ভাল। হার্টটা বিশাল।'

এতক্ষণে স্বামীব চোখের ওপর চোখ রাখে সুলতা। মনের কোণে জলভবা মেঘখানা গাঢ় হয়। ভারি ভারি পা ফেলে বাথরুমে ঢুকে পড়ে সে।

সেই সন্ধ্যায় কথাটা সোজাসুজি পাড়ে সুলতা। 'দেখ, তোমার বর্ধন সাহেবের মতিগতি আমার একদম ভাল লাগছে না। আমি কিন্তু মনে মনে অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

অবাক চোখে তাকায় অলকেশ। গম্ভীর হয়ে ওঠে মুখ। বলে, 'তোমরা মেয়েবা যে কী, বুঝতে পারিনে। একটা মানুষ একটুখানি তাকালেই তোমরা ভাবো বুঝি প্রেম করতে চাইছে।' সুলতাকে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বলে অলকেশ, 'মনের এই অসুখগুলোকে সারাও দেখি।'

বড় অসহায় চোখে সুলতা তাকায় স্বামীর দিকে। অলকেশ পাত্তা দেয় না সে চাউনিকে। সুলতাকে বোঝাবার চেষ্টা করে হাজার যুক্তি দিয়ে। বলে, 'অত বড় মানুষ, কত বড় চাকরি করেন, মেয়ের দরকার থাকলে একটা বিয়ে করে ফেলতে পারতেন না? ওঁর সঙ্গে প্রেম করবার মেয়ের অভাব নাকি?'

ফ্যালফ্যাল করে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে সুলতা। ওর মুখের রেখাগুলোকে পড়বার চেষ্টা করে অনেকক্ষণ ধরে। এক সময় নামিয়ে নেয় মুখ।

সহসা বুক জুড়ে কান্না জমে তার। মনে পড়ে তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। যখন অলকেশ নামের যুবকটি ছিল সবদিক থেকে একজন সাধারণ মানুষ। সুস্থ, সবল আর বাচ্চা ছেলের মতো সরল। পাখি, ফুল, ছবি, গান, আবৃত্তি যা দেখত, শুনত, তাই ভাল লাগত তার। কেবল একটা বিষয়েই নিদারুণ পাগলামো ছিল। সেটা হল, সুলতা। ওকে নিয়েই অতি সাধারণ একটা শান্তির সংসার গড়বার স্বপ্ন তার দু'চোখ বেয়ে চোঁয়াত অবিরাম। তখন অলকেশ চাকরি পায়নি, বিয়ে করেনি। আটপৌরে দিনের সেই আটপৌরে মানুষটি আজ আর বেঁচে নেই। যে বেঁচে আছে, সে এক প্রবল প্রভুত্ব পরায়ণ উচ্চাকাঙ্খী পুরুষ, যার ঝকমকে চোখের কোলে মেদ জমছে, একটু একটু করে। জেতার মোহে পাশার ছকে সে তার সর্বস্ব নিয়েও বাজি ধরতে রাজি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পলকহীন তাকিয়ে ছিল সুলতা। ঘরের এককোণে পাখির খাঁচাটা দুলছে। পাখিটা ঝিমুচ্ছে। মশারির মধ্যে শুয়ে সুলতা খাঁচাটাকে নির্নিমেষ

দেখছে। ঘরের আলোটা জ্বলছিল, খাঁচার ছায়া পড়েছে মশারির ওপর। অলকেশ আর সুলতার সারা বিছানাটা প্রায় পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে একখানা বিশাল খাঁচার ছায়া।

আকাশে মেঘ করেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুমোটও খুব। আজ রাত্রে হয়তো বা বৃষ্টি হবে। হাওয়া দিচ্ছে। সেই হাওযায় খাঁচাটা জোরে জোরে দুলছে। সুলতাদের মশারির ওপর খাঁচার ছায়াটাও প্রবলভাবে দুলছে।

সে রাতে, অলকেশ ঘুমিয়ে পড়লে, খাঁচাটার সামনে এসে দাঁড়াল সুলতা। এতক্ষণে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলতে পারল সে।

৬.

হপ্তাটাক বাদে বর্ধন সাহেবের বাংলো থেকে নেমন্তন্ন পায় অলকেশরা। কি এক উপলক্ষ্যে যেন পার্টি দিচ্ছেন বর্ধন সাহেব। অলকেশ এব আগে কোনোদিন বর্ধন সাহেবের ব্যক্তিগত পার্টিতে যায়নি। নিমন্ত্রণটা অপ্রত্যাশিত।

সুলতার যাবার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কিন্তু মুখ ফুটে সেটা বলল না সে। কি হবে বলে? মানুষটা বুঝবে না। বরং উল্টো বুঝতে পাবে সুলতাকে।

ঠিক সময়ে সেজেগুজে যখন পৌঁছল, বর্ধন সাহেবের বিশাল ড্রইংরুম তখন জমে উঠেছে পুরোপুরি। সুলতাকে দেখেই বর্ধন সাহেব প্রায় ছুটে এলেন। সুলতার ফর্সা কাঁধের ওপর পুরো হাতখানা চাপিয়ে দিযে চোখে-মুখে কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলেন, 'তুমি ভীষণ অন্যায় করেছ সুলতা। তোমার অভাবে মজলিশটা মাটি হতে বসেছিল।'

সুলতার কানের লতি গরম হয়ে ওঠে। দুটো ব্যাপার বুঝে ফেলে সে। এক, বর্ধন সাহেব ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা পান করেছেন, এবং দুই, সেই সুবাদে মিসেস রায তাঁর কাছে বেমালুম 'সুলতা' হয়ে গিযেছে। সুলতা আলতো ঝাঁকুনি দিয়ে বর্ধন সাহেবের হাতখানা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ওটা এমনই টেঁসে বসেছে যে অল্পস্বল্প ঝাঁকুনিতে তাকে সরানো অসম্ভব বলে মনে হয সুলতার। একটু জোরে ঝাঁকুনি দেবে কিনা ভাবতে ভাবতে সুলতা তাকায় অলকেশের দিকে। দেখে, অলকেশ বেশ এনজয় করছে ব্যাপারটা। তার সারা মুখে ফুটে উঠেছে এক ধরনের চাপা দেমাকি হাসি। কাজেই সুলতার কাঁধের ওপর শক্ত হয়ে বসে থাকে বর্ধন সাহেবের হাত। ওর সারা শরীর জ্বলতে থাকে, নাক দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোতে থাকে, বমি-বমি ভাব ঠেলে আসে গলার দিকে।

বর্ধন সাহেব প্রায় টানতে টানতে সুলতাকে নিয়ে আসেন ড্রইংরুমের মাঝখানে। উপস্থিত অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে জড়ানো গলায বলেন, 'ইনি মিসেস সুলতা রায়, ভারি মিষ্টি মেয়ে, আর এঁরা হলেন যথাক্রমে—।' একে একে সবাইয়ের সঙ্গে সুলতার পরিচয় করিয়ে দেন বর্ধন সাহেব। সবাই পুতুলের মতো হাত তুলে নমস্কার করে। পার্টির অন্য মেয়েগুলোর চোখ ঝিকমিক করতে থাকে ঈর্ষায়, নিদারুণ ঈর্ষায়। সুলতা বুঝতে পারে একে একে নামগুলো আউড়ে গেলেন বটে বর্ধন সাহেব, কিন্তু সুলতার কানে কিছুই ঢোকেনি। কানের মধ্যে তার ভোঁ-ভোঁ শুরু হয়েছে তখন। বর্ধন সাহেব

ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। একখানা সোফার ওপর বসালেন। নিজেও বসলেন পাশটিতে। সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল অলকেশ।

বর্ধন সাহেব ভরাট গলায় বলেন, 'অলকেশ, য়ু এনজয়। ইট-ড্রিঙ্ক, ডু হোয়াট এভার য়ু লাইক। পার্টিতেও নিজের বউকে আগলে আগলে ঘোরা এক ধরনের মেন্টাল কেস।'

'ইয়েস, স্যার।' অলকেশ গেলাস হাতে চলে যায় অন্য দিকের সোফায়।

সে সন্ধ্যায় সারাটাক্ষণ বর্ধন সাহেব সুলতাকে প্রায় আঁকড়ে রইলেন। 'মিষ্টি মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে' বলে প্রায় অস্থির করে তুললেন। অন্য মেয়েগুলো ঈর্ষায় পুড়ছিল। সুলতাকেও অন্যদিনের চেয়ে বেশ হাসিখুশি, ঝরঝরে মনে হল অলকেশের।

অনেক রাত অবধি চলল হুল্লোড়। সুলতাকে সঙ্গ দেবার ফাঁকে বারবার উঠে যাচ্ছিলেন বর্ধন সাহেব। সবাইকে চিয়ার-আপ করে আসছিলেন। এর-ওর গেলাসে জোর করে ঢেলে দিচ্ছিলেন মদ। 'টেক টেক, ইয়ং-ম্যান। নাইট ইজ স্টিল টু ইয়ং।'

গভীর রাতে বর্ধন সাহেবের সখের টয়োটাতে চড়ে ফিরেছিল অলকেশরা। পেছন সিটে ওরা মাত্র দু'জন। অত্যধিক পান করবার দরুণ হাঁটতে গিয়ে অল্প অল্প টলছিল অলকেশ। ঢুলঢুল চোখে বোকা বোকা হাসি। শব্দগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল ঠোঁটের ডাগায়। তাই দেখে খুব প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে হেসেছিলেন বর্ধন সাহেব। সুলতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'সাবধানে নিয়ে যেও।' বর্ধন সাহেব নিজেও টলছিলেন।

ফাঁকা রাজপথ কাঁপিয়ে গাড়ি ছুটছিল ঝড়ো বেগে। দু'পাশ থেকে উদ্দাম হাওয়া জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ওদের গায়ে।

যেতে যেতে অলকেশ জড়ানো গলায় শুধোয় 'কেমন লাগল পার্টি? বললে না তো?'

সুলতা ঝকঝকে চোখে তাকায়। খুব গাঢ়স্বরে উচ্চারণ করে, 'খুব ভাল। দারুণ এনজয় করেছি।'

সুলতার আজকের কথাগুলো কেমন বেখাপ্পা ঠেকে অলকেশের কানে। সুলতা বিদ্রুপ করছে না তো? মুখ ফিরিয়ে ওকে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে অলকেশ। না, সুলতার চোখে-মুখে ঠাট্টা-বিদ্রুপের লেশমাত্র নেই। তিলমাত্র ক্লান্তিও নেই ওর মুখের রেখায়। বরং আরও উজ্জ্বল আর খুশি খুশি লাগছে।

অলকেশের দিকে তাকিয়ে হাসে সুলতা। বলে, 'বড় সাহেব যেমন করে সারাক্ষণ কাটালেন আমার সঙ্গে, তোমার বন্ধুদের বউগুলো যেভাবে পিটপিট করে দেখছিল, আমার মজা লাগছিল খুব।'

শুনতে শুনতে কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছিল অলকেশ। নেশাটা গাঢ় হচ্ছে, নাকি কেটে যাচ্ছে? সুলতাকে ঢুলঢুলু চোখে দেখবার চেষ্টা করে সে। ভারি রহস্যময়ী লাগছে ওকে। যেন অনেক দুরের, খুব অচেনা কোনও নারী।

ফিকফিক করে হাসছিল সুলতা। বলে 'বাড়ি গিয়ে না কুরুক্ষেত্র বাধায় ওরা। ওদের ওয়ার্থলেস হাজবেন্ডগুলোকে আজ কাছে ঘেঁষতেই দেবে না, দেখো।'

সান্যাল-বাসুদের মুখগুলো মনের মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাসছিল। গাড়ির মধ্যে আধো অন্ধকারে মিটিমিটি হাসতে থাকে অলকেশ। দু'চোখ নেশার আবেশে জড়িয়ে আসে যেন। বলে, 'ওদের তো আর সুলতার মতো বউ নেই। বেচারার দল!'

'আর তোমাদের বর্ধন সাহেব, এমন আমুদে মানুষ, অত বড় কোম্পানিব এম-ডি, অথচ একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো।' খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সুলতা।

'তোমার ভাল লেগেছে বর্ধন সাহেবকে?'

'অন্তত কোনও প্রিটেনশন নেই। মনে মনে যা চান মুখে তা প্রকাশ করতে একতিল দ্বিধা করেন না।'

'রাইট। বরং কথার চেয়ে কাজে একটু বেশি প্রকাশ করে ফেলেন। হিজ অ্যাকশন স্পিক্স লাউডার দ্যান হিজ ওয়ার্ডস।' জড়ানো গলায় কথাগুলো বলে অলকেশ। আরও ঘন হয়ে আসে সুলতার দিকে। বলে, 'চুপি চুপি জানাই তোমায়, ফাইনাল সিলেকসনটা আজ এক ফাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন সাহেব। বুঝতে পেরেছ, কে সিলেক্টেড হল?'

সুলতা আরও গাঢ় চোখে তাকায়। নিঃশব্দে আঙুল ছোঁয়ায় অলকেশের বুকে। সুলতার হাতটাকে দু'হাতের মধ্যে সজোরে চেপে ধরে অলকেশ। বার-দুই ঢেঁকুর তোলে। চাপা গলায় বলতে থাকে, 'কোনও কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে ...। আরো কী সব বিড়বিড় করে বলতে থাকে অলকেশ। তার সারা মুখ ভিজে যায় ঘামে।

সুলতার কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে ঘরে ঢোকে অলকেশ। ওকে বিছানায় বসিয়ে সুলতা ঢুকে পড়ে বাথরুমে।

পাখিটা এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। এইমাত্তর অলকেশদের কথাবার্তা, পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকিয়েছে। বিছানায় বসে বসে নিদ্রালু চোখে পাখিটাকে দেখতে থাকে অলকেশ।

একসময় পায়ে পায়ে এগোয় এবং ধীরে ধীরে এই প্রথম পাখিটার খাঁচার সামনে মুখোমুখি দাঁড়ায়। গভীর রাতে পাখিটার সঙ্গে এই প্রথম চোখাচোখি হয় তার।

পাঁঠার চোখ

পাঁঠা কাটতে কাটতে, মরতে থাকা পাঁঠাটার সঙ্গো রোজ চোখাচোখি হয় খুদু কশাইয়ের।

ঘন তুঁত রঙের একজোড়া মণি! ভীষণ জীবন্ত আর কঠিন!

চারটে পা শক্ত করে বেঁধে, গলাটাকে দু'পায়ের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে, বাঁ হাত দিয়ে পাঁঠার নীচের ঠোঁটটাকে টেনে ধরে খুদু। ডান হাতের ধারালো ছুরিখানা নীচের পাটির সীমানাতে ঠেকায়। পাঁঠাটা কুস্তির ফাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে খুদুর কাণ্ডটা। বিহ্বল চোখে।

নীচের পাটিতে ঠাণ্ডা ছুরিখানা ছুঁইয়ে খুদু একটু থামে। পর মুহূর্তে শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে সাঁই ... সাঁই ঘসতে থাকে ছুরিখানা। সর্ব শরীর দিয়ে চমক খায় পাঁঠাটা। একটা বিকট চিৎকার করে ওঠে। প্রাণপণে ঝাঁকুনি মারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দড়িটাতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তুঁত রঙের মণি। গলা থেকে তীক্ষ্ন চিৎকার তীরের ফলার মতো ছিটকে বেরিয়ে যেতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে।

খুদুর ছুরি ততক্ষণে পৌঁছে গেছে নলির কাছাকাছি।

বার দুয়েকের টানে 'কিচ' করে কেটে যায় নলিটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়ে। বুকফাটা চিৎকারটা গোঙ্গানির রূপ নেয়। যন্ত্রণা আর আতঙ্কে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা চোখদুটো ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা আর কঠিন হয়ে আসে। তখন ওদুটোকে নীল মার্বেলের আধখানা লাগে।

চোখদুটো স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে খুদুর দিকে, এক দুর্বোধ্য ভাষা নিয়ে। ঐ সময়েই পাঁঠাটার সঙ্গো রোজ চোখাচোখি হয় খুদুর।

নলি পেরিয়ে ছুরি এগিয়ে যায়। চড়াই ভাঙতে থাকে তখন। পাঁঠার গা প্রবল আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে ওঠে। সামনের সবুজ ঘাসের ওপর তাজা রক্ত চাপ চাপ জমে কালচে হয়ে ওঠে। একসময় খুদুর ছুরি পাঁঠার দু'কানের ওপর দিয়ে ঘাড়ের পাশে এসে থামে। তারপর অল্পক্ষণের কসরতেই ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়।

মুণ্ডুটা ধরা থাকে বাঁ হাতে। ধড়টা মাটিতে পড়ে চার পা ছুঁড়তে থাকে অল্পসল্প। ঠাণ্ডা চোখদুটো তখনও তাকিয়ে থাকে খুদুর দিকে। নিষ্পলক। আবার চোখাচোখি হয়।

কোমর টান টান করে দাঁড়াতে গিয়ে অল্পক্ষণের জন্য নিজেকে কেমন ক্লান্ত লাগে

খুদুর। অনেকক্ষণ নুয়ে থাকার জন্য কোমরে টান পড়ে। বাব-দুই সামনে-পেছনে করে গায়ে কয়েকটা ঝাঁকি খায়। তারপর অবলীলাক্রমে মুণ্ডুটা ফেলে দেয় টসটসে কলা পাতার ওপর।

তারপর ... সারাটা সকাল ... খুদু মাংস বেচতে বেচতে বেহুঁশ হযে যায়। সূক্ষ্ম ওজন নিয়ে কুটকচাল করে খদ্দেরের সাথে। খারাপ মাংস চালিয়ে দেবার কসরৎ চালায় সারাক্ষণ। গুনে গেঁথে দাম নেয়। কিন্তু সারাক্ষণ স্মৃতির মধ্যে ঐ চোখাচোখির দৃশ্যটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। জলের ওপর এক বিন্দু তেলের মতো।

কাজেই, জলের ওপর থেকে ঐ ছড়িয়ে পড়া তেলটুকুকে চুষে নেবার জন্য সন্ধ্যে নাগাদ দু'চার ঢোঁক তরল পদার্থ ঢালতে হয় গলায়। শরীরে সারাক্ষণ একটা নেশা নেশা ভাব থাকেই। ফলে অতি অল্পেই সে বেহেড হয়। আর বেহেড হলেই মনের মধ্যে ঐ তীব্র স্মৃতিটা মরে আসে। তখন পাঁঠার দুটো তুঁত রঙের চোখ এবং বিকট আর্তনাদের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় তাব ঘর-সংসার, বউ, কমলি, মনিব। এই সবকিছুর রসায়নে আস্তে আস্তে একটা বিচিত্র অনুভূতির শিকার হয়ে পড়ে সে। সুখ-দুঃখ একাকার হয়ে যায়। তার যাবতীয় ইহলোক-পরলোক, ভূত-ভবিষ্যৎ, পাপপুণ্য সব জট পাকিয়ে ধোঁওয়া ধোঁওয়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

ঠিক সেই সময়ে কিছু বিচিত্র ভাবনা তার মনটাকে আলতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে হারিয়ে যায়।

এক ঢোঁকে অনেকখানি গিলে ফেলে খুদু 'আ-হ্' গোছের একটা শব্দ করলো। শব্দটার সাথে একরাশ দম আটকানো হাওয়া হুশহুশ করে বেরিয়ে গেল।

খুদু ওপরের দিকে তাকালো নিরাসক্ত চোখে।

আকাশে অসংখ্য তারা। জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

চোখদুটো অল্প বুঁজলেই ঐ চোখাচোখির দৃশ্যটা। যন্ত্রণায় আতঙ্কে ফেটে পড়তে চায় পাঁঠার চোখ দুটো। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়। তখন ঐ চোখ-দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভীষণ ভয় করে। মনে হয়, কোটরের মধ্যে একজোড়া নীল মার্বেল যেন প্রচন্ড বেগের মাথায় রয়েছে। টান মারা গুলতির মতো। কোনক্রমে চামড়ার বন্ধনী অল্প ঢিলে হলেই মার্বেল দুটো গুলির মতো ছুটে এসে ঠক্ করে বাজবে খুদুর কপালের মধ্যিখানে।

আজকাল প্রায় সন্ধ্যেতেই নেশার ঝোঁকে তার ভয়টা বিচিত্ররূপ ধরে। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা চোখদুটোকে স্পষ্ট দেখতে পায় সামনে।

প্রবল আতঙ্কে সে কপাল ঢেকে ফেলে দু'হাতে।

ঈশেন কোণে বাঁশ ঝাড়। সেখানে জমাট আঁধার। তার তলা দিয়ে হেঁটে কমলি ফিরে এলো ভর সাঁঝবেলায়। আবছা আঁধারে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়ালো।

কমলির গায়ে চোখ ঘসতে ঘসতে খুদু শুধোলো, কে উখ্যেনে?

—মুই, কমলি।

—এই সাঁঝের ব্যালায় কুখিকে?

কমলি জবাব দেয় না।

কমলি ছেলেবেলায় কেমন ভীতু ছিলো। গভীর রাতে ঢাককদমের ডালে 'হুক হুক' করে পেঁচা ডাকতো। কমলি কাঁটাটি হয়ে সেঁধিয়ে যেতো মায়ের কোলে। সেই কমলি আজকাল রাতেবেরাতে ঝোপেঝাড়ে ঘুরে বেড়ায় কিসের টানে!

খুদু কমলির মুখের দিকে চেয়ে রইলো নিস্পলক। ওর কপালের লাল টকটকে সিঁদুরের টিপটি তখন দেখা যাচ্ছিল না আঁধারে। কিন্তু খুদু যেন তা দেখতে পেলো স্পষ্ট। কপালের লাল টিপটাকে একটা দগদগে ঘা বলে মনে হচ্ছিলো।

কমলির কপালের দগদগে ঘায়ের কারণটা বুঝি খুদু বুঝতে পারছিলো অস্পষ্ট। তার মনে হচ্ছিল, এ কোনও ছুটে আসা নীল মার্বেলের কাজ বুঝি। তীরের মতো ছুটে এসে একটা সোজাসুজি বিঁধেছে কমলির মাঝ কপালে। আর একখানা ওর চুলের মাঝ বরাবর সিঁথি চিরে বেরিয়ে গেছে।

খুদু চোখ ফেরাতে পারে না। কমলির চোখ, মুখ, নাক, চিবুক একে একে জরিপ করে, কপালের মাঝখানটিতে এসে বার বার থেমে যায় চোখ।

খুদু আস্তে আস্তে নিজের কপালে বাঁ'হাতখানা বুলোতে লাগলো। একটা সম্ভাব্য ক্ষতস্থান খুঁজতে লাগলো সেখানে।

কমলি যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো, ও বাবা, কি হোল? মাথা ধরেছে?

সে কথার জবাব না দিয়ে আচমকা ডুকুরে কেঁদে উঠলো খুদু।

কমলি পায়ে পায়ে কাছে এলো, ও বাবা? কাঁদিস ক্যানে?

উত্তরে খুদুর কান্নাটা বেড়ে যায়।

বাপের নেশা করাটা বড় পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু ইদানিং নেশা করার পর খুদুর মধ্যে কিছু অচেনা ব্যবহার লক্ষ করছে কমলি।

আজকাল সন্ধ্যেবেলায় ভরপেট নেশা করে, খুদু আকাশের দিকে নিস্পলক চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বিজাতীয় গলায় চিৎকার করে ওঠে। কমলি ভয় পেয়ে যায় ভীষণ। খুদুর বউ ছুটে আসে। মা মেয়েতে ধরাধরি করে খুদুকে শুইয়ে দেয় দাওয়ায়।

খুদুর বউ গজগজ করে, দুনিয়ার লোক লিশা-ভাঙ করে, কোউ তুমার পারা রঙ্গো করে না লিত্যিদিন।

খুদু দু'চোখ বুঁজে বুঁদ হয়ে শুয়ে থাকে। জবাব দেবার দরকার বোধ করে না। কি হবে জবাব দিয়ে? ওরা কি করে জানবে, আকাশের জ্বলজ্বল তারাগুলোকে অসংখ্য নীল রঙের চোখ বলে মনে হয় খুদুর। মনে হয়, এক্ষুণি বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে চোখ জোড়ায় জোড়ায় তীরের মতো ছুটে এসে ঠং ঠং করে বাজবে কপালে।

বেস্পতিবার খুদুর ছুটির দিন। সকাল বেলায় সে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল হরেন দাসের উঠোনে।

পাড়ার শেষ প্রান্তে হরেনের কোঠাবাড়ি। বারান্দায় চৌকির ওপর বসে হরেন কি একটা লিষ্টি বানাচ্ছিল। খুদুকে দেখে বিরক্তিতে ঘন হয়ে এলো চোখ। সক্কালবেলায়

কোন্ বায়নাক্কা নিয়ে এসেছে কে জানে! হয় আগাম মজুরী চাই, নয় ধার-কর্জ চাই, নয় পুরোনো কাপড় চাই। নিদেন ঝাড়ের একখানা বাঁশ চাই, ঘর বানাবার তরে। বায়না ছাড়া কথা নেই এদের।

হরেন যেন সহসা ব্যস্ত হযে উঠলো ভীষণ। কাজে ডুবে যাওযার ভান করলো সে।

খানিক দোনামনা করে খুদু গলাটা অল্প ঝাড়লো।

—একটা আর্জি আছে, হরাদা।

হরাদা! এই ডাকটাই আজকাল সইতে পারে না হরেন। এখন তার কোঠা-বাড়ি, জমি জিরেত। নিজের হাতে পাঁঠা কাটা ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন। এখন লোক রেখে ব্যবসা চালায়। পাঁঠার ব্যবসা ছাড়াও আজকাল অন্য দু'একটা ব্যবসা ফেঁদেছে সে। এখন সে জাতে উঠতে চায়। ভদ্দর পঞ্চজনার সাথে এক আসনে ওঠাবসা করে। পঞ্চায়েতের একটা আসনে দাঁড়াবার ওর ইচ্ছে। দু'চারজন সবে মান্যিগণ্যি করতে শুরু করেছে তাকে। আর এরা কিনা ঐ 'হরা'দা ছাড়লো না। হরাদা কি রে? হরেন্দ্রবাবু বলতে পারিস নে? কিংবা শুধু 'বাবু'।

খুদুর ডাকটা যেন শুনতে পেলো না হরেন। মনোযোগ দিয়ে লিষ্টি বানাতে লাগলো।

দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করতেই একেবারে বাঘের ঝাপট নিলো হরেন।

—পারবো নাই। তুদের খাঁই মিট্যাতে পারবো নাই মুই। খাসীর সাথে ভেট্ লাইকো, কাটার মজরী লিয়ে বস্যে রয়্যেছিস ছ'মাসের। আবের আইছিস্ এক ছো লিয়ে।

"আমি ধার ক'জ্যের লেগে আসি নাই হরা'দা।" খুব ঠাণ্ডা আর নির্বিরোধ গলায় খুদু বললো, "আইছি একটা অন্য কথা বলবার লেগে।"

চোখ কটমট করে হরেন খুদুর দিকে তাকায়।

—কি কথা?

—পাঁঠাগুলানকে আগের মতোন কাটল্যে ক্যামন হয়?

—ক্যামন করে?

—ঘাড়ের পাশে, এক কোপে। য্যামন আগে কাটত্যাম।

—ক্যানে? কি লাভ উয়াতে?

খুদু সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। চোখদুটো অসহায় হয়ে ওঠে। বলে, ঐ ঠোঁটের পাশ থিক্যে ঘস্যে ঘস্যে কানতক্ ... বড্ড ছটকায় আর চিল্লায়। ক্যামন য্যান্ লাগে ত্যাখন।

বলতে বলতে খুদুর গা'টা কেমন গুলিয়ে ওঠে।

হরেন এমন আজব কথা জীবনে শোনেনি। ফ্যালফ্যাল করে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো খুদুর দিকে। বিস্মিত চোখের মধ্যে একটা হিংস্র রাগ জমতে লাগলো। ঠোঁটটা বার-দুই চেটে নিয়ে বললে, অন্য কুথাও কাজকাম জুটালি না কি রে, খুদু? ই কাম ছাড়ত্যে চাস?

খুদুর সারা শরীর সহসা কেঁপে কেঁপে উঠলো। ভয়ে ভয়ে সে তাকালো হরেনের দিকে।

—কাট্ না। য্যামন খুশী কাট্ । মানা কবতিছে কে?

হরেন মুখের মধ্যে জমে ওঠা থুথুটা 'চিরিক' করে ফেলে দিল উঠানে। বললো, ঘাড়ে কোপ মেরে্য কাটল্যে চামড়া যে টুক্ কম পড়বেক, তার দামটা কেট্যে লুব তুযার মজুরী থিক্যে? ব্যস্। মিট্যে গেল ঝামলা।

খুদু বুঝছিলো, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পাঁঠার যন্ত্রণার সংগে হরেনের লাভ লোকসানের প্রশ্নটা গভীরভাবে জড়িত।

খানিকক্ষণ বোবার মতো দাঁড়িয়ে থেকে, ... এক সময় পেছন ফিরে পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগলো সে।

—শোন্।

হরেনের ডাকে পিছু ফিরলো খুদু।

—কমলিটার কি করতিছিস? ভাবল্যি টাবল্যি কিছো?

আচমকা ছ্যাৎ করে উঠলো খুদুর বুকখান্। হরেন আবার সেই কথা পেড়েছে। দিন সাতেক আগে খুদুকে পায়ের তলায় বসিয়ে কথাটার সূত্রপাত করেছিল হরেন।

—মেয়া মাইন্সের একট্যা ঠ্যাই চাই, বুঝল্যি। যার হাতে দিলি, সে তো চ্যাঙ্গা দ্যাখালেক। পন্দর টাকা লগ্দা গুন্যে লিয়ে আন্য মেয়ার সাথে পগার পার। এখন এ মেয়্যা কি কর্যে কাট্যাবেক সারাটা জেবন? যোবতী মেয়া মাইন্সের—।

খুদুর বুকখান্ কেঁপে কেঁপে ওঠে। কোনও জবাব দিতে পারে না সে।

কথায় কথায় আরও অনেক কিছু বলেছিলো হরেন।

—কশাইখানাটা আর চালাবো নাই রে। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়। দু'দিন বাদে পঞ্চায়েতের মেম্বার হল্যে—। ব্যাচে দুব উট্যা।

একটা সর্বনাশের শব্দ পাচ্ছে খুদু। একটা তলিয়ে যাবার আভাস। কশাইখানা হাত বদল হলে কশাইও পাল্টাবে নির্ঘাৎ। খুদু দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকে শেষ কথাটা শোনার তরে।

—তুই কিনে লে' না উট্যা।

—মুই?

—হঁ। লিজেদ্যার মধ্যে থাইক্লো তাহলে চিজট্যা।

খুদুর সারা অঙ্গে বিদ্যুত্যের শিহরণ খেলে যায়। এ ক্যামনধারা ইল্চি করে হরা'দা? এ ক্যামনধারা ইল্চি?

—ট্যাকার কথা ভাবছিস তো? খেপে খেপে দিবি। মাসে মাসে। তুয়াতে আমাতে ঠিক থাইক্ল্যে টাকা লিয়ে ভাবনা কি?

খুদুর সারা গা যেন শিরশির করে ওঠে প্রবল উত্তেজনায়। হরেনের পা' দুটো জড়িয়ে কাঁদতে সাধ যায়। বিহ্বল খুদু একসময় মেঝের ওপর ধপ করে বসে পড়লো।

হরেন মিটিমিটি হাসে। করুণা বিলোতে গিয়ে মোলায়েম হয়ে উঠেছে ওর মুখ। খুদু যেন সুমুখে স্বয়ং ভগবানকে দেখছিল। করুণাময় ভগবান!

এবার শুধু খাসী কিনবার পুঁজিট্যা জুট্যাত্যে পারল্যে—।

—দুট্য খাসীর দাম না হয় আগাম দুব্যোব তুয়ারে। ঐ পুঁজি ঘুরায়্যে ফিরায়্যে ব্যবসা দাঁড় করাবি তুই।

—অত দয়া কি তুমার হবেক হে হরা'দা? প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে খুদু বলে ওঠে।

হরেনের চোখে একটা অচেনা হাসি ঝিলিক মেরেই থেমে গেল। বললো, হবেক কি আর শুধু শুধু? ঐ ... ... চিজটা লিজ্যেদ্যার মধ্যে রাখবার তরে ... আর কি।

খুদু ব্যাপারটার দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছিল। সেটা বুঝতে পেরে হরেন বললো। সাঁঝের ব্যালায় তুয়ার দোরে একটিবার যাবো, যা। কমলিকে বলিস, য্যান্ আচ্ছাটি করে গেঁড়ির ঝাল-চচ্চড়ি রাধ্যে রাখে মোর তরে। আর ...।

সব শুনে বউ চোখের জলে বুক ভাসায়।

—ক্যাবল আসবেক-যাবেক, ব্যস্? তাবপর কিছো একটা ভালো-মন্দো হয়ে গেলে, ত্যাখন? ত্যাখন তার ভাব বইবেক কে?

বউকে পীড়াপীড়ি করতে গেলে হয়তো বলে বসবে সেই মোক্ষম কথাটি। তুমি তো খাসীর মান্‌সো ব্যাচতে। এ যে আন্য মান্‌সো বিকতে লকরবকব করে তুমার মন!

বাপ হয়ে এমন কথাটা শুনতে—।

তবুও একদিন বউকে থম্ মেরে যেতেই হোল। হরেন দাসের একটা মোক্ষম কথা একেবারে সরাসরি লক্ষ্যবিন্ধ করেছিল।

—মেয়ারা হোল গে লতার জাত। একটা টেকসই মাচান তার চাই, চারাবার তরে। না'লে ভুঁয়ে ভুঁয়ে চারাবেক। ইদিক সিদিক। এ দলবেক, উ মাড়াবেক। গরু-ছাগ্‌লে মু দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবেক। তুমরা আর ক'দিন? তারপর?

হরেন দাসের মতো উৎকৃষ্ট 'মাচান' আর পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, এ হোল গে নিজেদের বাঁচা-মরার সওয়াল। কাজেই খুদু বোঝাপড়ায় আসে। কথাবার্তা পাকা হয়। হরেনও দু'তিনটে কাগজে কিসব লিখে টিপছাপ করিযে নেয় খুদুর।

ইদানিং সন্ধ্যেবেলায় উঠোনে মদ গিলতে গিলতে সবই টের পায় খুদু। আঁধারে পা ঘসে ঘসে হরেন আসে। খুদুর প্রায় পাশ দিয়েই ঢুকে যায় ঘরে। খুদু দেখেও দেখে না।

বউটা তবুও মাঝে মাঝে গজগজ করতে ছাড়ে না। ঝাপট্ মেরে থামিয়ে দিতে হয় তাকে। মেয়েদের বেশি আস্পর্ধা দিতে নেই। কতো কষ্টে যে দু'বেলা চাট্টি ভাতের জোগাড় করতে হয়, মেয়া মাইন্‌সে তার বুঝবেক কি?

কমলির মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকায় খুদু। কমলির চোখদুটোর নড়াচড়া যেন কমে আসছে দ্রুত। হঠাৎ দেখলে পাথর পাথর লাগে। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন অচেনা মুখ। যেন এ-ঘরের, এ-সংসারের কেউ নয়।

ইদানিং সন্ধ্যা পহরে মাঝে মাঝে কমলির সঙ্গেও চোখাচোখি হয খুদুর। পাথর পাথর চোখ নিয়ে কমলি থিরপলকে তাকিয়ে থাকে।

কমলির চাউনিটাও ইদানিং সইতে পারছে না খুদু। চোখাচোখি হলেই মাথাটা নুয়ে আসে আপ্‌সে।

ইদানিং বউকে নিয়ে আরও একটা সমস্যা বেড়েছে। যখন তখন শুধিয়ে বসে এক বেয়াড়া প্রশ্ন।

—আসা-যাওয়ার তো বিরাম নাইকো। দুকানটা ছাড়ার তো নামটি করে না দাসের পো?

—নাইস্যান্স মোর নামে পাল্টাতে হবেক তো। টাইম লাগবেক।

—নাইস্যান্স পরে হবেক। দুকানটার দখল ছাড়ত্যে দোষ কি? ইখনতক্ কেনে মজ্‌রী দিয়ে খাসী কাটাচ্ছে? দুকানটা তুমি পাবে কবে?

খুদু এমন প্রশ্নে বিপন্ন বোধ করে। এটা তো তারও প্রশ্ন। হরেনের সঙ্গে তো তেমন কথাবার্তাই হয়েছিল।

এখন হরেনকে কথাটা বলতে গেলে সে হাওয়ায় দু'চোখ ভাসিয়ে জবাব দেয়, হবেক, হবেক। তর যে সইছে নাই তুয়ার?

অথচ সাঁঝের ব্যালায় খুদুর ঘরে আসার কামাই নেই হরেনের। বউ তাড়া লাগায়, কি গো, জবাব নাই যে মুয়ে?

চতুর্দিক থেকে খুঁচানি খেয়ে আধমরা হয়ে আসে খুদু। মরিয়া হয়ে ঝাপট মারে বউকে।

—তুয়ার অতো কথায় কাম্‌টা কি রে? মেয়ামানুষ, মেয়ামাইন্‌সের মতোন থাইক্‌ত্যে লারিস? দাঁতগুলান ভেঙ্গ্যে দুব, অমন জ্বালাল্যে পুড়াল্যে।

শেষ অবধি আর বউয়ের দাঁত ভাঙ্গে না খুদু। সকালে পাঁঠার দাঁতের মাড়ির পাশটিতে চরম আক্রোশে ঘসতে থাকে ছুরি। ওর অন্তিম যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠা কান্নাটা দু'কান ভরে শুনতে থাকে খুদু। কেমন যেন মানুষের কান্নার মতো শোনায় সেটা।

এইভাবেই, রোজ সকালে কয়েক জোড়া আর্ত দৃষ্টি ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে উঠে যায় ওপরের দিকে। আর খুদুর দৃষ্টিখানা ওপরের থেকে নীচে নামতে থাকে ছুরির ফলার মতো।

বাচ্চা বয়েসে কমলিটা ভারি মুখরা ছিল। ছোট্ট ঠোঁটদুটো নাড়িয়ে কলকলিয়ে ঝগড়া করতো মায়ের সাথে।

খুদুর বউ মুখঝামটা দিয়ে বলতো, এ খাণ্ডার মাগী যে কার ঘরে যাবেক! জ্বালায়্যে পুড়ায়্যে খাক্ করো্যে ফেলাবেক সব।

মায়ের সব আশঙ্কাকে মিথ্যে করে দিয়ে সেই মেয়েটা ইদানিং এক্কেবারে বোবা বনে গেছে। এখন সে সারাদিন পুতুলের মতো নড়েচড়ে ঘুরে বেড়ায়। ঠাণ্ডা হিম চোখে তাকায় সকলের পানে। কোন কিছুতেই বিকার নেই তার। তবু রোজ বিকেলে সে অভ্যেসবশেই কপালে ডগডগে সিঁদুরের টিপ পরে। সিঁথিতে মোটা করে রক্তাক্ত সিঁদুর লেপতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে এবং ঐ বেশে সন্ধ্যের আগে আগে সে রোজ বাপের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঐ সময়েই মেয়ের সাথে রোজ চোখাচোখি হয় খুদুর।

ঘর থেকে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এলো কমলি। নিঃশব্দে বাপের ছায়া মাড়িয়ে পেরিয়ে গেল উঠোনটা। সপ্তমীর চাঁদের মরা আলোয় খুদু কমলিকে দেখতে দেখতে আচমকা *চেঁচিয়ে উঠলো, এই কমলি, ইদিগ আয়।*

কমলি ঘুরে দাঁড়ালো! নিঃশব্দে এগিয়ে এলো বাপের কাছটিতে।

—কি বলতিছ?

কমলির দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না খুদু। উস্‌খুস করতে লাগলো নিজের মধ্যে। সহসা চণ্ডালের রাগ চেপে গেল মাথায়।

গলা চড়িয়ে বললো, খালি চকরবকর কর্‍্যে পাল্যে যাচ্ছিস যে? বাপের ঠাঁই বসত্যে পারিস নাই টুকচান্?

কমলি ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে ছিলো বাপের দিকে। উত্তর দেবার কিছুই নেই তার। অকারণে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো সে।

সেই সময়েই চেরাগলার ডাক ভেসে এলো ভেতর থেকে। —কমলি কুথা গেলি রে? পান কি পেসব করতিছিস তুই?

কমলি চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাপের দিকে চকিতে এক পলক তাকিয়ে পিছু ফিরতে গেল সে।

মুহূর্তে যেন বাঘের গর্জন ভেসে এলো খুদুর কন্ঠ চিরে। —খবদ্দার! যাবি নাই তুই। চুপটি কর্‍্যে বস্যে থাক ইখ্যেনে।

একটা মৃদু ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল কমলির পা।

—আরে, এ্যাই কমলি?

হরেনের গলায় এখন রীতিমত ঝাঁঝ।

মুহূর্তে চাবুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালো খুদু। তীরের মতো সাঁ করে ছুটে গেল ঘরের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, শালা, কোলের বউটি পেয়েছ্যো উয়ারে? সাঁঝপহরে এস্যে হাঁকডাক জুড়েছ ত্যাখন থেক্যে?

প্রথম ঘুসিটা এলোমেলো পড়লো হরেনের কাঁধের কাছে।

মুহূর্তের জন্য বুঝি হকচকিয়ে গিয়েছিল হরেন। পলকের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। বিছানার ওপর থেকে গামছাখানা তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরলো দুহাতে। এবং...

পরের ঘুসিটা তুলতে গিয়ে খুদু একেবারে গেঁথে গেল হরেনের বাঁ হাতে। হরেনের চোখ মুখ পালটে যাচ্ছিল দ্রুত। চিবুক শক্ত হয়ে আসছিল। তার ভেতরের দীর্ঘ বছরের কশাই রক্তে উত্তাপ ফিরে এসেছে আবার। গামছার ফাঁসটাকে শক্ত করতে করতে সে এক পলক তাকালো খুদুর দিকে। তারপর এক ঝাঁকুনিতে তাকে বসিয়ে দিল মেঝের ওপর।

দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে বললো, নেকাপড়া মতোন তুই হাজারটি ট্যাকা ধারিস্ মোর পাশ। খিয়াল আছে রে শালা?

খুদুর মনে একসঙ্গো অনেক প্রশ্ন ভীড় করলো। বিস্ময়ে ভরাট হয়ে এলো ওর চোখ।

সে চোখে চোখ রেখে সাপের মত হিস্‌হিসিয়ে হরেন বললো, য্যাতোদিন ট্যাকা শোধ না হবেক, ত্যাতোদিন রোজ আসবো সাঁঝের ব্যালায়। কুন্ শালা ঠেকায়, দেখবার চাই মুই।

খানিকটা শ্বাসকষ্টের দরুন, খানিকটা বিস্ময়ের ধাক্কায় খুদুর চোখদুটো ক্রমশ বেরিয়ে আসছিল কোটর থেকে। হাঁ করে কতোকিছু বলার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কথার বদলে একটা অস্পষ্ট গোঙ্গানীতে ভরে গেল সারা ঘর।

মা-মেয়ের চিল-চিৎকারে বাতাস খান্‌খান্‌। দুপদুপিয়ে ছুটে আসে পড়শীর দল।

খুদু ওপরের দিকে চোখ তুলে চেয়ে রইলো হরেনের দিকে। অপলক।

প্রবল শ্বাসকষ্টের মধ্যেও হরেনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। যেমন করে রোজ সকালে আর একজোড়া চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হয় তার।

সকালে সে থাকে ওপরে। অসহায় প্রাণীটি থাকে নীচে।

এখন সে নীচে। হরেনের দু'পায়ের মধ্যে। তার যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি ফোয়ারার মতো উঠছে ওপরের দিকে। হরেনের দৃষ্টি নেমে আসছে, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো।

টানাপোড়েন

হাটের মধ্যে এলোমেলো ঘুরছিল পরাণ। গুড়-হাট ধরে বাঁযে বাঁকলেই মুদি-সাঁই। ওটা পেরোলে ডাইনে কাপড়পট্টি, বাঁযে মিঠাই-তেলেভাজার দোকান। কাপড়পট্টি ধরে খানিক এগোলেই চোখদুটো চমকায়! মনোহারী দোকানগুলো শুরু হচ্ছে ওখানেই। হরেক মালের মনোহারী চিজ। রবারের বল থেকে মাথার কাঁটা, ফিতে, ফুলেল তেল, গন্ধ-সাবান, আয়না-চিরুনি থেকে কাশীদাসী মহাভারত—কত কি যে সাজিযে বসেছে! আর আছে কাচের পাল্লা দেওযা চ্যাপটা বাক্স। ঐ বাক্সেই সাত রাজার ধন মণি-মাণিক্যের মেলা। মোটা কাগজে গহনার ছবি। তার গায়ে আটকানো হরেক গয়নাগাঁটি। পরাণের আপাতত একজোড়া মাকড়ি কেনার গরজ। সেই সুবাদে ঘুরেফিরে মনোহারীপট্টিতে এই নিয়ে বার-চারেক এলো, গেল। ঘুরেফিরে সব রাস্তাই কি মনোহারীপট্টিতে ঠেকেছে! বিকিকিনি যা করার ছিল, তা চুকেবুকে গিয়েছে পয়লা চটকায়। তারপর শুরু হয়েছে এই টানাপোড়েন। যাচ্ছে, আবার ফিরে ফিরে আসছে।

মাঝেমাঝেই পরাণের গলা জড়িয়ে ধরে চাঁপি। কাজকামের ফাঁকে ফাঁকে ফিসফিসিয়ে খোলসা করে মনের বাসনাটা। একজোড়া পাশা-ঝুমকা মাকড়ির তরে আবদার জানায় আদুরে গলায়। গলে যেতে যেতে পরাণ কথা দিয়েছে চাঁপিকে। লৈতন বউয়ের মনের ভাঁপনটা জুড়োবে সে। একজোড়া মাকড়ি বৈ তো লয়। কত আর দাম!

আজ সকাল সকাল চাঁপি পড়ি কি মরি চাট্টি ফুটিয়ে দিয়েছে। ফ্যানে-পান্তায় এক জামবাটি খেয়ে ঝুড়িটাক লুড়কি-বেগুন মাথায় তুলে খাজরার হাটের দিকে রওনা দিয়েছে সে। সারা রাস্তা চাঁপির মুখখানাই উঁকিঝুঁকি মারছিল মনে। বড় আহ্লাদ হচ্ছিল পরাণের। ফোলা-ফোলা দু'খান ঠোঁট চাঁপির। সর্বদাই ভেজা ভেজা থাকে। ঐ ভেজা ভেজা ঠোঁটের আবদারখান—শুনলেই অর্ধেক প্রাণ অজ্ঞান। লৈতন বউয়ের পর্‌থম্ আবদার বলে কথা। পরাণের মনের মধ্যে ভোঁওরের মতো গুনগুনাচ্ছিল সারা পথ। হাটে পৌঁছে ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে বিক্রিবাটা শেষ। কেনাকাটা যা করার শেষ হতে আরও ঘন্টাটাক। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে মনোহারীপট্টির আনাচেকানাচে আনাগোনা।

অনেকক্ষণ ধরে দোকানের খুঁটি ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল পরাণ। কাচের বাক্সটার পানে নিশানা করে। পকেটে ঝনঝনাচ্ছিল পাঁচ সিকে পয়সা। পাথর বসানো দুল ছিল অনেকগুলো। লাল-সবুজ সাদা। কিন্তু মাকড়িই চাই তার। গোটা দুই মাকড়িও রয়েছে কিন্তু পাশা-ঝুমকা নয়। খানিক উসখুস করে পকেটের পয়সাগুলোর মধ্যে আঙুল নাড়ালো পরাণ। দোকানদার আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'কি চাই গো?'

পরাণের কথামতো মাকড়িদুটোকে বের করে চোখের সুমুখে তুলে ধরল দোকানি। ঝিকমিকিয়ে উঠল ওগুলো। পরাণ হাতে নিযে নেড়েচেড়ে দেখল। চাঁপির কানে পরিয়ে দিয়ে আঁচ করার চেষ্টা করল মনে মনে। চাঁপির মাথাটাকে নাড়িয়ে দিল অল্প। মাকড়িদুটো দুলতে লাগল চাঁপির দু'কানে। দুলুনিটা ভাল লাগল না পরাণের। বয়েসটা যেন বেশি বেশি লাগছে।

'দাম কত?' পরাণের নিস্পৃহ জিজ্ঞাসা।

উলটেপালটে দেখেশুনে দাম বলল দোকানি, 'ছ' টাকা চার আনা।'

'এ্যাঁ! আঁৎকে উঠল পরাণ, 'বলে কি!' বলেই হনহনিয়ে এগিয়ে গেল পরাণ।

'আরে যাও ক্যানে?' দোকানি পেছন থেকে হাঁক পাড়ে, 'তুমারো ত' একটা দাম আছে, না কি?'

আরে, ছো ছো! নিজের মনে থুৎকার দিল পরাণ। এ মাকড়ি চাঁপির কানে মানাবেই না।

অল্প তফাতে গিয়ে পকেটের পয়সাগুলো ফের গুনলো পরাণ। ঠিকই আছে। পাঁচ সিকে। পয়সাগুলো আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে নাড়াতে লাগল পরাণ। ভাবছিল হরেক কথা। ভাবতে ভাবতে পরাণের মুখে একচিলতে ম্লান হাসি খেলে গেল। পয়সাগুলা তো আর খইয়ের ধান নয়। পাকিটটাও নয় খোলা। হাজার নাড়ালেও খইয়ের মতো ফুটে ফুটে বাড়বে না। আসলে ভুলটা তার হয়েছে প্রথম পহরেই। বিক্রিবাটা সেরেই পয়লা চটকায় মাকড়িটা কিনে নেওয়া উচিত ছিল। অন্য সওদাপতি হতো পরে। কিন্তু সেটাও বা কি করে হয়? কেজি দশেক বেগুন বেচে সাকুল্যে পেয়েছিল সতেরটি টাকা। সংসারের বিশাল হাঁ বুজোতে এ টাকা তো নস্যি। কোন জিনিসটা বাদ দিতে পারত পরাণ? বাবুই দড়ি কিনতে হয়েছে দেড় কেজি। দাম পড়েছে দু'টাকা চার আনা। সেই তেরেশ্‌শাল বছরে ছাওয়া হয়েছিল ঘরটা। রলা-বাতাগুলোতে ঘুণ ধরেছে। রাতে-বেরাতে হাওয়া একটু ঝাপটা মারলে ওগুলো উঁ-উঁ শব্দে কাঁদতে থাকে নাকি সুরে। বর্ষা-বাদলার দিনে ঘরের চালটি তো যেন ছিরাধিকের ছেন্দ কোম্ভ। চালের গায়ে পড়ার আগেই মেঝেতে পড়ে জল। কাজেই ঘরটা ছাইতে হবে যেকোনও গতিকে। সেই কারণেই দড়ি কেনা। লাঙলের ফাল কিনেছে একটা। ওটাও বাদ দেওয়া যেত না। এখন হাল বেচার মরসুম। ফাল না হলে বেকার হয়ে যাবে হালটা। হাড়-জিরজিরে বলদ-দুটো রেহাই পাবে বটে, কিন্তু পরাণের ঘরের চালে ফিঙে নেচে বেড়াবে। চুলার বুকটা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হবে। আর, পরাণদের পেটে আগুন জ্বলবে। তা, ফাল কিনতে লাগল সাড়ে তিন টাকা। সারা হপ্তার যৎকিঞ্চিৎ তেল-নুন-মতিহার পাতা। মাটির হাঁড়ি একটা। সে সবই টাকা পাঁচেক। এই তো, আর তো কিছু কেনেনি পরাণ। এগুলো না কিনলে চলে? হঠাৎ চমকে উঠে পকেটে হাত পুরলো পরাণ। সাকুল্যে তো দশ টাকা বার আনা হল। তাহলে তো আরও সওয়া ছ'টাকা থাকার কথা। বৎসহারা গাভীর

মতো হেদিয়ে পড়ল পরাণ। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগল পাগলেব মতো। কপালে জমলো বিন্দু বিন্দু ঘাম। আধুলিদুটোকে বারবার পরখ করে দেখল, আসলে টাকা কিনা। তিন-চারবাব গোনাগুনি করে এলিয়ে পড়ল পরাণ। না, পাঁচ সিকেই। মাথার মধ্যে কিলবিলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল হিসেবের পোকাগুলো। না, হিসেব ঠিকই আছে। পরাণ জিনিসপত্তরগুলো কাঁধে তুলে একটু ফাঁকা জায়গার খোঁজে ছুটল।

প্রায় হাটের বাইরে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সব নামালো পরাণ। খানিক আগে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশটা এখনো গোমড়া মুখে তাকিয়ে রয়েছে হাট-ফেরতা মানুষগুলোর দিকে। নতুন ফন্দি আঁটছে মনে মনে। মাঝে মাঝে ছিটিয়ে দিচ্ছে জল। মজা দেখছে। এক-হাট লোকের ছুটোছুটি, মাল সামলানো। দেখতে দেখতে যেন আকাশের মুখে হাসি খেলে যাচ্ছে এক চিলতে। চারপাশে চিকচিকানি রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ছে খানিক সময়ের জন্য। রোদ্দুর তো নয়, যেন মজা দেখা হাসি।

সেঁতসেঁতে মাটির ওপর থাবড়ে বসল পরাণ। একে একে জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখল সামনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কোনও জিনিস হিসেবে বাদ পড়েছে কিনা। সাকুল্যে ছ'টি জিনিস। দাম তো দাঁড়ায় দশ টাকা বারো আনাই। এ তো ভারী ধাঁ-ধাঁ! পরাণের গা বেয়ে কালো ঘাম ঝরতে লেগেছে ততক্ষণে। মাকড়ি কেনা মাথায় উঠেছে তার। করকরে পাঁচটি টাকা গায়েব হয়ে গেল, পরাণ নিজেকে সামলে রাখে কি করে? কিন্তু কোথায় গায়েব হল? বেসামাল তো কোথাও হয়নি সে। সব জায়গায় গুনে-গেঁথে দাম দিয়েছে জিনিসের। ফেরত পয়সাও গুনে নিয়েছে বার বার। সিকি-আধুলিগুলোকে হাতের চেটোতে ঘষে ঘষে পরখ করেছে, সিসের কালচে দাগ পড়ে কিনা। তবুও দেবতাদেরও বেভ্ভুল হয়। কোথাও কম ফেরত নিয়েছে নির্ঘাত। কিংবা বেশি দিয়ে ফেলেছে।

প্রথমে কামারশালে গেল পরাণ। এক হাতে হাপরের দড়ি ধরে আগুনটা গনগনে করছিল নিধু কামার। অন্য হাতে বঁটির ডগাটা গুঁজে দিচ্ছিল আগুনে। গনগনে আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। পরাণ আগলবাগল হয়ে বলল, 'ও কামারের পো, ফালের দাম কত লিলা তুমি?'

লাল টকটকে মুখে তাকালো নিধু কামার। চোখের লালচে শিরাগুলো প্রকট হল। ভুরু কপালে তুলে বলল, 'ক্যানে? সাড়ে তিন টাকা। যা দাম তাই।'

ভুলটা ধরিয়ে দেবার ভান করে পরাণ ম্লান হেসে বলল, 'তুমাকে আমি পাঁচ টাকা বেশি দিয়ে ফেল্‌ছি।

ঘামে ভেজা মুখখানাকে গামছায় মুছে নিতে নিতে নিধু কামার ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'পাঁচ টাকা বেশি দিছ? কি করে?'

পাঠশালার গুরুমশাইয়ের মতো নিধুকে বোঝাতে থাকে পরাণ, 'তুমাকে পরথমে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম মুই। তুমি বললে, বউনি হয়নি। মনে পড়ে? মুই তখন এ-পাকিট ও-পাকিট হাল্‌টে মোট সাড়ে তিন টাকা দিলাম। কিন্তু আগের পাঁচ টাকা ফেরত লিতে ভুলে গেছি মুই।' ব্যাপারখানা ঠিক ঠিক বোঝাতে পেরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরাণ।

ফ্যালফ্যাল করে পরাণের দিকে তাকিয়ে ছিল নিধু কামার। লাল টকটকে চোখ দুটোকে বোলাচ্ছিল পরাণের সর্বাঙ্গে। সহসা রুদ্রমূর্তি ধরল সে, 'দিনের ব্যালায় হপন দেখছ না কি হে? বউনি হয়নি, ও র'ম কতা কয়েছি মুই? রাধাকান্ত সাউকে একটা দা' বিকেছি। দেড় টাকা দাম। অইটাই তো দিলাম তুমাকে।'

আমতা আমতা করে পরাণ আরও কি যেন বোঝাতে চাইছিল। তার আগেই নিধু ক্ষেপে গেল মোষের মতো। 'শালা, গাঁজা খাবার পইসায় টান পড়েছে, নয়? এখন নিধু কামারের পঁগাটি মারার তাল খুজছ?'

পরাণ আর দাঁড়ায় না। মুহূর্তে মিশে যায় পাশাপাশি ভিড়ের মধ্যে। কামারের সংস্পর্শে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। আগুনের মধ্যে অষ্টপ্রহর বসবাস ওর। মাথায় আগুন জ্বলছে। তাতা বঁটি নিয়ে আচমকা তেড়ে আসতে পারে। নিধু কামারের চোখ দুটোর কথা মনে হতেই শিউরে ওঠে পরাণ। কাশিয়াড়ের বাজারে পূজার সময় মহিষাসুরেব মুখের ওপর লাল ইলেক্‌টিরি আলো পড়ে ঠিক এমনটি দেখায়। ঐরকম ভাঁটার মতো গনগনে চোখ। শালা মহিষাসুর একটা! নিধু কামারের শেষের কথাগুলোয় বুকের মধ্যে বড় দাগা পেয়েছে পরাণ। শালা বলে কিনা, গ্যাঁজার পয়সায় টান পড়েছে! দেশ-ভুঁইযে তার বলে কত খ্যাতি, নাম! সে কিনা টানবে গ্যাঁজা! কীর্তনের দলের মধ্যে তার গান শুনে কত ঘরেই না তার গলায় পরিয়ে দেয় গুলাচ ফুলের মালা। ব্যাটা কামার তুই বুঝবি কি ধর্মের মাহিত্ত্য? ঘর-সংসার শিকেয় তুলে তুই শালা ছেনি-বাটালি নিযে কাটালি জীবনভর। শালার কথাখান শুন দেখি! চাঁপির তরে একজোড়া মাকড়ি কিনতে না পেরে সেই তখন থেকেই বলে টনটনাচ্ছে বুকটা। পাঁচটা টাকার তরে সগ্গো-মত্ত-পাতাল চষে ফেলছে। আর ব্যাটা কামার কিনা এক টোকায় বুঝে ফেলল গ্যাঁজার কথা। মনের ভাঁপনটা ওগরাতে ওগরাতে দড়িপট্টির দিকে চলল পরাণ। যাগ্‌গে। মনকে প্রবোধ দেয় পরাণ, কামার কি করে বুঝবে পরাণের মনের ভাঁপনটা? ওর বউও নেই, সংসারও নেই। শুধু এই হাপরশালা আর চোলাইয়ের ভাটিখানাই সম্বল ওর। ওব্যাটা বুঝবেই বা কি করে, নৈতন বউ আবদার ধরলে কলজের কোন থানে ঘা মারে সেটা। কিন্তু সত্যিই কি পাঁচটা টাকা বেশি দিয়েছিল পরাণ? খোদায় মালুম। পরাণের তো খেয়ালই নেই কোনও কথাই। বানিয়ে বানিয়ে বউনি-টউনির কথা তো বলতেই হবে। বেপদের টাইমে বাক্যি যুগান মা সরেস্বতী। শালা কামারের পো কি দূর থেকে পরাণকে দেখেই টাকা পাঁচটি হাতে নিয়ে খাড়া থাকবে? পাঁচ কথা বলে তার মন ভেজাতে হবে না?

দড়িপট্টি আর মুদি-সাঁই ঘুরে মনটা অসাড় হয়ে এলো পরাণের। দুনিয়ার কি যে হাল হল! হাতের জল কবজি পেরোলেই খতম। আর ফিরবে না চেটোয়। করকরে পাঁচটা টাকা দিন-দুপুরে কে না কে হাতিয়ে নিলে! মনটা কুচলা ফলের মতো তেতো করে পরাণ এলোমেলো ঘুরতে লাগল হাটের মধ্যে। মনে মনে চাঁপিকে বোঝাতে লাগল হাজার স্তোকবাক্য দিয়ে।

আচমকা যেন বিজলী চমকালো পরাণের মাথায়। পেয়ে গেছে টাকাটা। মিলে গেছে হিসেব। জগৎ পাল তিন কেজি বেগুন কিনেছে। ছ'টাকাই দাম হয়। কিন্তু এক

গাঁয়ের লোক, তার ওপর মহাজন, দরাদরি করতেই হার মেনেছে পরাণ। পাঁচ টাকাতেই দিয়েছে তিন কেজি বেগুন। কিন্তু দামটা দেয়নি। বলেছে, খুচরা নেই। কি আর করে পরাণ। না বলতে ভরসা হয়নি। কিছু টাকা ধার নিয়েছিল জগৎ পালের থেকে। আসল তো আসল, সুদটাই দেওয়া হয়ে ওঠেনি এখনতক্কো। বারকয়েক তাগাদা দিয়েছে ইতিমধ্যেই। আজ দশজনের মধ্যে বেগুনের দাম নিয়ে বেশি চটকালে হাটে হাঁড়িটি ভেঙে অপদস্থ করে দিত সর্বসমক্ষে। মহা খিঁটকেলে লোক ও। পরাণ ব্যাকুল হয়ে হাটের মধ্যে খুঁজতে লাগল জগৎ পালকে।

কাপড়পট্টি পেরিয়ে মুগ-কলাইপট্টি ধরে পরাণ এগোচ্ছিল ন্যাড়াপানা শিমূল গাছটাকে নিশানা করে। ওর তলায় খাসি টাঙিয়ে মাংস বেচছে কসাইরা। অল্প তফাতে ঝুড়ির মধ্যে ঢাকা দেওয়া থলথলে শুয়োরের মাংস। লাল টকটকে রক্ত। চাকা-চাকা করে কাটা। ঐখানেই হাট শেষ। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে গরুর-গাড়িব মেলা। গাঁ-গঞ্জ থেকে গরুর-গাড়ি নিয়ে এসেছে গেরস্থরা। সামনে চাষের মরসুম। মজুরে-কামিনে এলাহি কাণ্ড। চৈতালি বৈতাল, কাঁচা বিউলি, পায়াভরা বালি-গুড়, নুনের বস্তা, শালপাতার আঁটি, ঘর ছাইবার বাবুই-দড়ি—সব বোঝাই করেছে গাড়িতে। হাটে আসবার সময় মিলবে না এখন দু-তিন মাস। চাষের ক্ষেতেই দিনভর কেটে যাবে সবার।

গাড়ির কাছে জগৎ পাল নেই। মুনিশটা আনমনে বসে বসে খিরা খাচ্ছিল। মনিবের হাল-হদিস দিতে পারল না সে। পরাণ দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো। জগৎ পালের তাগড়া বলদদুটো অলস চোখে খড় চিবোচ্ছিল। প্রায় এক-মানুষ উঁচু ওগুলো। সারা গায়ে তেল চুইয়ে পড়ছে। বলদগুলোর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পরাণ ফের ছুটল হাটের দিকে। নষ্ট করার মতো সময় নেই তার। বিকেল গড়িয়ে আসছে।

শিমূল গাছের তলায় জগৎ পালকে পাওয়া গেল। মাংস কিনছিল। সিনার কাছটা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। পরাণ পেছনে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। দেড় কিলো মাংস কিনছে জগৎ পাল। চাপানো বাটখারা দেখে পরাণ মালুম করল। ওদের ভারী জমবে আজ রাতে! লাল টকটকে তাজা মাংসের তালগুলো সাজানো। খাসির মুণ্ডুটা একপাশে রাখা। পলকহীন দুটি চোখে তুঁত-রঙের মণি। করুণ উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। ঠাসা খদ্দেরদের ভিড় ফুঁড়ে সে চাউনি চলে গিয়েছে কত দূরে!

ভিড়ের মধ্যে তড়পাচ্ছিল জগৎ পাল। একে-ওকে ঠেলে-ঠুলে খোলসা করছিল জায়গা। খারাপ মাংসগুলো বেছে বেছে নামিয়ে দিচ্ছিল পাল্লা থেকে। পরাণ একপলক ভাবল। এ সময়ে, পঞ্চজনার সাক্ষাতে বেগুনের দামটা চাওয়া কি ঠিক হবে? শালা ক্ষেপে যেতে পারে। আবার দেরি করতেও সাহস হয় না। বিজোড় দাঁতগুলো গিজুড়ে বলতে পারে, 'যা ছিল, অই দিয়েই তো মাংস খদ্দি কল্লাম রে। আগে বইল্‌তে হত।' মনে মনে বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে পরাণ। চাঁপির মুখখানা ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে। পরাণ এগিয়ে গিয়ে ডাকল জগৎ পালকে, 'মামু গ, একবারটি ইদিগে আইস।'

যা ভেবেছিল পরাণ, তাই হল। পরাণ রা'টি কাড়তেই চকিতে ফণা তুলল জগৎ পাল, 'কয়েকটি টাকার তরে মাহাজনের মতোন তাগাদা লাগাচ্ছু যে রে! মোর কত টাকা পাওনা আছে তোর পাস, খিয়াল আছে? সুদের খাতে যদি কাটি লেই টাকাটা, কি বলার থাকে তোর?'

গর্জন তুলতে তুলতে জগৎ পাল ফের ঢুকে গেল মাংসাশীদের ভিড়ে। পরাণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। চোখদুটো নিজের অজান্তে ছলছলিয়ে উঠল। আনমনা পরাণ হাঁটতে লাগল হাটের ভেতরের দিকে। এর-ওর গা বাঁচিয়ে চলতে লাগল। মানুষের ছোঁয়াটা অসহ্য লাগছে তার।

জগৎ পালকে চাঁপির ব্যাপারটা বললে হতো। কচি বউটার মনের ইচ্ছেখানার কথা খোলসা করা উচিত ছিল তার। মামু গো, তুমার ভাইনজা-বউর তরে একজোড়া...। দূর দূর! পরাণ নিজের মনে গাল পাড়ে। জগৎ পালকে সে ভালই চেনে। এসব কথায় গলতো না একতিল। আটখানা হাল চলে তার ক্ষেতে। আলের ওপর গামছা পেতে ছাতা মাথায় দিয়ে ঠায় বসে থাকে জগৎ পাল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ফালের ডগার দিকে। আঁতর ছাড়ি যাও ক্যানে গো ভুঁইয়ার পো? বঁটা আরও চাপ্ রে ভূষণা। ফালের ডগা ভাসি যায় ক্যানে? বড় কঠিন লোক জগৎ পাল। আজীবন ফালের ডগার দিকে তাকিয়ে থেকে পিশাচের মতো চোখদুটোকে বানিয়েছে। কচি বউয়ের আবদার-আহ্লাদের কথা ঘাই মারে না ওর মনে।

গুড়পট্টির কাছাকাছি কেদার গোপের সাথে দেখা। একপায়া গুড় নিয়ে দরাদরি করছিল সে। রথের মেলায় মেঠাইয়ের দোকান দেয় কেদার। এ তারই প্রস্তুতি। পরাণ দাঁড়ালো ওর পাশটি ঘেঁষে। দেখতে লাগলো কেদারের সাথে দোকানদারের দড়ি টানাটানি খেলা। খানিকবাদে পরাণকেই সাক্ষী মানলো কেদার গোপ। কও না হে, বিশ টাকা কুন অলেহ্য দামটা বলছি মুই?

মুচকি হেসে পরাণ বলল, 'বিশ টাকা? মুই হলে ষোলর উপরে উঠতাম নি।'

দোকানদার ঝাপটা নিল পরাণের ওপর। পরাণ গায়ে মাখলো না। গাঁয়ের পড়শীর জন্য এটুকু না হয় সে সইলোই। পড়শী নইলে বলেছে কেন? শেষমেষ বাইশ টাকায় রফা হল। টাকা-পয়সা গুনে-গেঁথে দিয়ে পরাণের দিকে ফিরল কেদার গোপ। কি হে, ঘর ফিরবার কদ্দুর? চল, এক সাথেই যাই। গাড়ি ত আসসে মোর। কথায় বলে, ভাত ছাড়বি, সাথ ছাড়বি নি।

'সে তো একশো বার।' পরাণ মাটিতে পড়তে দেয় না কথাটা, 'জব্বর কথাটি কয়েছ। হাট-বাজারও চুকে গেছে মোর। কেবল টুকচার ওষোধ কিনবার ছিল। তুমার ভাই-বউয়ের কাল থিকে জ্বর।'

'তো কিনে লি' আইস না হে এক ঝটকায়।'

পরাণ যেন তাল খুঁজছিল এতক্ষণ। ঝাঁ করে বলে বসল কথাটা, 'কিনি লি' আসতে পারি তো লিমিষের মধ্যে। তারপর তুমার গাড়ির সাথেই রওনা দিতে পারি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা। পইসায় টুকচার কম পড়েছে। তুমার কাছে টাকা পাঁচেক হবে?' আশায় আশায় পরাণ তাকালো কেদার গোপের দিকে।

কেদার গোপ চুপসে গেছে ততক্ষণে। মরিয়া হয়ে পরাণ বলল, 'কাল সকালেই ফেরত. পাবে তুমার টাকা। জগৎ পাল তিন কেজি বাত্তিক লিল। পইস্যাটা দিল নি। কইল, কাল সকালে দিবে।' ব্যাপারটাকে জোরদার করবার জন্য পরাণ জুড়ে দেয়, 'আট হালের চাষী। তিন কেজি বাত্তিকের দাম লগদা দিতে পারে না। কাণ্ডখান্ দেখ দিকি।'

কেদার গোপ পয়লা চটকায় যেটুকু দোটানায় ছিল, সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে। পারলাম নি হে। একটা ছ্যাদামও নাই পাশে। কিনা-কাটায় সব শেষ। যাই হে। বেলা যায়। গাড়ি ত' চলবে ঠুকুর...ঠুকুর...।' কথার মাঝেই গুড়ের পায়াটা ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে দৌড় মারলো কেদার গোপ। পরাণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। ভিড়ের মধ্যে কেদার গোপ হারিয়ে গেল তক্ষুনি। কেবল তার কাঁধের ওপর গুড়ের পাযাটি এঁকেবেঁকে দিক পালটাচ্ছিল ঘন ঘন। পরাণ তাই দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে।

আনমনা হয়ে হাঁটছিল পরাণ। হুঁশ হলে দেখল, সে এসে গেছে মনোহারী-পট্টির কাছেই। কাচের পাল্লা দেওয়া বাক্সের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে উঠল গহনাগুলো। পরাণ অন্যমনস্ক হয়ে হাত পুরলো পকেটে। পয়সাগুলো নিয়ে খই ভাজতে লাগল ফের।

বিকেল গড়িয়ে এসেছে প্রায়। গাছপালা দিয়ে আকাশের শেষ রোদ্দুর সুঁচালো হয়ে বিঁধে গিয়েছে ভিজে মাটির এখানে ওখানে। দোকানের আধ-ছেঁড়া ত্রিপল কিংবা খেজুর পাটির ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সোনার চাক্তির মতো লালচে রোদ্দুর। পরাণ পাশা-ঝুমকো ছেড়ে সাধারণ মাকড়ির খোঁজে দাঁড়ালো একটা দোকানের সামনে। যা হোক একজোড়া মাকড়ি হলেই হল। মানালেই হল চাঁপির কানে। দামের সাথে সম্পর্ক কি? কম দামেও অনেক সময় কত ভাল জিনিস মেলে বাজারে। দেখেশুনে কেনাটাই আসল। দামটা শুনে চাঁপি যদি গাঁইগুঁই করে তো দামটা বাড়িয়ে বললেই হবে। মেয়েমানুষের বুদ্ধি তো। কুঁচ ফলের দাম দশ টাকা বললে, তাই নেবার তরে আগলবাগল হয়। পরাণ অনেকক্ষণ দেখেশুনে একজোড়া সাধারণ মাকড়ি বাছলো। মাঝখোনে সবুজ রঙের পাথর বসানো। বড় পছন্দ হল তার। ছোটর ওপর ভালই। চাঁপির কানের লতিতে লাগবে কম। কিন্তু দামটা শুনে দমে গেল পরাণ। পৌনে চার। বাপ রে বাপ! টিনের চিজের অত দাম।'

'টিনের লয় হে। রোল-গোল। সোনার পারা চিজ।'

'লোক হাসানি কথাটি আর কয়ো নি হে। রোল গোল যদি সোনার পারা হয়, তেবে—।' গজগজ করতে করতে পিছু হঠছিল পরাণ। দোকানদার লাটাই ছাড়তে থাকে। তুমার দামটা কও হে, শুনি। ফিরে দাঁড়ালো পরাণ। অলক্ষ্যে হাত পুরলো পকেটে। খই ভাজলো খানিক। 'এক দাম শুনি রাখ। একটি টাকা দুবো পুরোপুরি।'

দোকানদার একপলক তাকালো। উই উদিকে যাও হে। উই লম্ফওয়ালাকে বল। একজোড়া তিয়ারী করি দিবে। দামটাও দু'চার আনা কম পড়বে।

মেজাজটা অনেকক্ষণ ধরে তেতো ছিল। দোকানদারের টিটকিরিতে মাথায় রক্ত চড়ে গেল পরাণের। চেঁচিয়ে ফাটিয়ে একসা করলে সে। সাড়ে তিনটাকার মাহাজনী লিয়ে অত দেমাগ ভালা না হে। অ'রম দোকানদারিতে পিসাব করি দেয় পরাণ মাঝি।

লোক জড় হল চারপাশে। হাট-ফিরতি মানুষ মুখ ফিরিয়ে তাকালো। দোকানদারও চেঁচাচ্ছিল। সাক্ষী মানছিল একে ওকে। পরাণ চেঁচাতে চেঁচাতে হাঁটা দিল।

আগের দোকানটায় পৌঁছল পরাণ। হাঁপাচ্ছিল। দম নিল। পছন্দ করা মাকড়িটা নিয়ে ফের দরদাম জুড়লো। শুরু হল দড়ি টানাটানি খেলা। আড়াই টাকায় রফা হল শেষমেষ। কিনতে হলে এই দামে কিনতে হয়। পবাণ ভেবেচিন্তে অন্য পথ ধরল।

'তুমার ঘর শালুয়া নয়?' পরাণ শুধোলো।

'না গো। বিনন্দপুর।'

'হঁ, হঁ, বিনন্দপুরই বটে। উদিগে ত' কুটুম-ঘর মোর। দেখেছি তুমাকে।'

দোকানদার বাজলো না তেমন করে।

খানিক উসখুস করে পরাণ কথাটা পাড়লো, 'চিজটা ত' মন্দ নয়, কিন্তু সমস্যা হইচে একটা। পইসাটা টুকচার কম পড়েছে। অবশ্যি, প্রত্যেক হাটবারে আইসি ত' মুই। আনাজ-পাতি আনি ত'। সামনের হাটবারে তুমার টাকা তুমি পাই যাব।'

মুখ ব্যাজার করলো দোকানদার, 'পাল্লি নি হে। আইজ লগদ কাল ধার। এই গোষ্ঠিয়া, জলদি গুছা-আ রে মালপত্তর। রাত বাড়ে।' সহসা বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে দোকানদার। বাঁ-হাতে ময়লাপানা একতাড়া নোট ধরে ডান হাতে গুনে চলে ক্ষিপ্র গতিতে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী চলতে থাকে যন্ত্রের মতো। ঠোঁটদুটোও অল্প কাঁপতে থাকে সেই সঙ্গে।

পরাণ ঠায় খাড়া হয়ে খানিকক্ষণ দেখতে থাকে প্রক্রিয়াটা।

সূয্যিদেব ডুব মেরেছেন অনেক আগে। খাজরার হাটখোলায় ঝাপসা আঁধার দ্রুত পা ফেলে নেমে এসেছে। হাটুয়ার দল অনেকক্ষণ রওনা দিয়েছে বাড়ির দিকে। দু'চারজন যারা রয়েছে এখনো, তারাও পালাই পালাই করছে। ফেরত-পয়সা গুনে দেখারও সময় নেই তাদের। হাতের মুঠোয় চেপে ছুট মারছে সঙ্গীর দিকে। দোকানদারেরাও জলদি-হাতে মাল চাপাচ্ছে গরুর-গাড়িতে। হ্যারিকেন-লন্ঠন জ্বলে উঠেছে এখানে ওখানে। বারভাজার তে-কোণা টেবিলে দাঁড়ানো বাদামের চূড়োয় বসানো লম্ফের ঢাউস শিষ আকাশের পানে উঠেছে।

এই ভাঙা হাটের মধ্যিখানে ফাটা বাঁশটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পরাণ। চারপাশের সবকিছু ছাড়িয়ে তার চোখের সমুখে চাঁপির মুখখানা শেষবারের মতো ভেসে উঠল নিঃসঙ্গ কবুতরের মতো বিষণ্ণ। মনটা সহসা গুমরে কেঁদে উঠল তার, 'হায় গো, আগে যদি কিনতাম মাকড়িটা!'

'দিনভর শুধু ইসিড়-বিসিড় কিনে খুয়ার করলাম সময়। হায় গ', আসল চিজটাই কিনা হইল নি।'

বনমহোৎসব

১.

তারপর, চলেছি তো চলেছি...। দিনভর...। জঙ্গল আর নাই ফুরায়।

—খাবা-দাবা কী কইর‌্লে?

—জঙ্গালে ফের খাবার অভাব! মহেশ্বর কোটাল দরাজ মুখে হাসে, —গাছে গাছে পাইক্যে রয়্যেছে ইয়াইযা বেল। একটা খেইলেই পেট ভইরে যায়। তাবাদে, ভ্যাঁচ, ভুঁড়ুব, আঁকো, পেইক্যে রয়েছে থকায়-থকায়। গুড়ের মতন মিঠা। বনকুঁদরি আর বন-পটলেব লতায় জালি ধরেছে অগাধ। খেইতে যেন কচি কাঁকুড়। একটা বড়-মোরগ পেঁইযে গেলাম আচমকা। পুড়িয়ে খেলাম ছ'জনায়। ধুস, সারাদিন খেঁইয়ে খেঁইয়ে আলা! যাগগা, যা বলছিলাম, জঙ্গাল যেন আর ফুরায় না...। হেনকালে সুয্যিদেব পাটে বসলেন।

অকস্মাৎ মঞ্চের পর্দা নতুন বউয়ের মত সসঙ্কোচ ধীর লয়ে খুলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হই-হই করে ওঠে তাবৎ দর্শক।

মহেশ্বর কোটালের দল বসেছিল খানিক তফাতে। গল্প থামিয়ে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ায় তারা। মটমট আওয়াজ তুলে হাতে-পায়ের গাঁট ফোটাতে থাকে। লগ্ন এল বুঝি! সদানন্দ, কোথায় হে?

এমনি সময় মাইকে কার গমগমে গলা, —এরপর নৃত্য পরিবেশন করবে—।

মুখ ব্যাজার করে পিছিয়ে যায় মহেশ্বর কোটালের দল। ফের যে-যার জায়গায় বসে পড়ে ঝুপঝুপ করে।

শুরু হল নাচ। সঙ্গে সমবেত গলায় গান—এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে—।

মহরম মল্লিক বলে, ইয়াদ্যার লাচগান যে থামে না আর!

—এ-তো কলির সইনঝা হে। মেঘনাদ শিকারি পাশ থেকে বলে ওঠে, —ইয়ার পর লাটক হবেক, তারপর বাবুরা কথা কইব্যাক। তারপর—।

কদম্ব লোহার বলে, তুমার গল্পটা তবে শেষ কর জ্যাঠা।

বুড়ো মহেশ্বর কোটাল, জঙ্গালের কথায় তার দু-চোখে ঘোর নেমে আসে। কত নিবিড় জঙ্গাল যে দেখেছে সে! কত তার মহিমা! কত তার বিপদ! কত ভয়, কত ভরসা! কত আনন্দ, আশ্রয়! বড় খেদ মহেশ্বরের বুকে, সেসব দিনের অরণ্য সে তার উত্তরপুরুষকে দেখাতে পারল না। শুধু তাদের গল্প শুনিয়েই ক্ষ্যান্ত হতে হল। মহেশ্বর

কোটাল ফের শুরু করে। পুরোনো দিনের গল্প শুনতে শুনতে ফের বুঁদ হয়ে যায় চারপাশের জমায়েত।

অল্প দূরে মঞ্চের ওপর চলতে থাকে অরণ্য-বিষয়ক নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক...। চলতে থাকে কানাপাথর দুর্গাসুন্দরী হাইস্কুলে বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত বনমহোৎসব, যা একদিন উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী, পনের বছর আগে। আজও ফি-বছর বেশ জমজমাট করে বনমহোৎসব পালিত হয় এই স্কুলে। এ বছরও হচ্ছে। খাতরা এবং বাঁকুড়া থেকে তাবড় মানুষেরা এসেছেন। আবৃত্তি-গান-নাচ-নাটক। খাতরা থেকে এসেছে মাইক। বাঁকুড়া থেকে ডেকরেটর।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর বৃক্ষরোপণের পালা। তারপর উপস্থিত সব্বাইকে ছোলা-মুড়ি বিতরণ। এটাও স্কুলের বহুদিনের ঐতিহ্য।

আর, ওই ছোলা-মুড়ির টানেই আজ স্কুল-চত্বরে এসে ভিড় করেছে মেঘনাদ শিকারি, মহেশ্বর কোটালের দল। মঞ্চ থেকে অল্প তফাতে বসে ক্ষণ গুণছে ওরা। কখন বাবুদের নাচ-গান-কথা বলা শেষ হয়। কখন ছোলা-মুড়ির ঠোঙাভর্তি ঝুড়ি নিয়ে হস্টেলের রান্নাঘর থেকে মুখ দেখায় স্কুলের পিয়ন সদানন্দ।

২.

বনবিহারীবাবু তখন থেকেই দৌড়াদৌড়ি করছেন। একবার স্টেজে, সেখান থেকে রান্নাঘরে। ওখান থেকে মাননীয় অতিথিদের কাছে। একে স্লিপ দিচ্ছেন, ওকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাকে ধমকাচ্ছেন। হাজার হোক, পুরো অনুষ্ঠানটির সুনাম-দুর্নাম যে ওঁর ওপরই নির্ভর করছে। মাথার ওপর হেডমাস্টারমশাই থাকলেও তিনি তো অতিথিদের পেছনের সারিতে শিবনেত্র হয়ে বসে রযেন আর, স্কুলের সেক্রেটারি নীলমাধববাবু তো অনুষ্ঠানের সভাপতিটি সেজে ডি-এফ-ও এবং এস-ডি-ও-র মাঝখানটিতে থানা গেড়েছেন। কাজেই, স্কুলের বায়োলজির শিক্ষক হিসেবে বনবিহারীবাবুর ওপরই যত ঝক্কিঝামেলা। এটা তো ঠিক, গণ্ডগ্রাম হলেও কানাপাথর দুর্গাসুন্দরী হাইস্কুলের বনমহোৎসব শুধু এই জেলায় নয়, সারা রাজ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি হলে আর রক্ষে থাকবে না। তা, এখনও অবধি ঠিকঠাক চলছে। নীলমাধববাবুর সেজ ছেলে অমলজ্যোতি কলকাতায় তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরে কাজ করে। সেই সুবাদে আজকের অনুষ্ঠানটি আকাশবাণীর প্রাত্যহিকী, স্থানীয় সংবাদ ও জেলার চিঠিতে প্রচারিত হবে। তাছাড়া, কলকাতার খবরের কাগজগুলোতেও দু-চার লাইন ছাপা হবে। উপস্থিত দু-একজনের নাম তাতে থাকবেই। ফলে, আজকের অনুষ্ঠানে সব্বাই এসেছেন। বি-ডি ও, রেঞ্জার, জেলা কৃষি অফিসার, এস-ডি ও, ডি-এফ-ও—কেউই বাদ নেই। রাজা-রাজড়ার মত খানাপিনা, সঙ্গে খবরের কাগজে নাম ছাপানো। প্রচারটচার আর কে না চায় এ দুনিয়ায়!

নীলমাধববাবুর সময়টা খুব ভাল যাচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি রুলিং পার্টিতে ঢোকবার জন্য লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তেমন একটা পাত্তা

পাচ্ছেন না কোথাও। চারপাশের কত কত রাঘব-বোয়াল সুযোগ মত ঢুকে পড়ল নীলমাধববাবুর চোখের সামনে। কিন্তু নীলমাধববাবুর বেলায় কেন যে এত কড়াকড়ি! অথচ একটিবার কোনও গতিকে রুলিং পার্টিতে ঢুকতে পারলেই ধুলিমুঠি সোনা। তখন সামান্য একজন ডি-এফ-ও আর এস-ডি-ও-র মাঝখানটিতে বসে খেজুরে আলাপ করতে হয় না ঘন্টার পর ঘন্টা। এ বছরের অনুষ্ঠানে আসার জন্য সভাধিপতিকে ভীষণ ঝুলোঝুলি করেছিলেন নীলমাধববাবু। তাতে অল্প চিঁড়ে ভিজেছে। শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন তিনি। কথা দিয়েছেন সামনের বছর আসবেন। তার মানে এক বছর বাদে। এ-ক বছর! অনেক সময়!

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। সেই ফাঁকে পাশটিতে বসে নীলমাধববাবু ডি-এফ-ও-'' সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

—ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ নই, জানি আমি ভাবী বনস্পতি—। মঞ্চের ওপর মিনমিনে গলায় সুকান্তের 'চারাগাছ' আবৃত্তি করছিল একজন।

—আরে, এখনও তো চারাগাছ মাত্তর। কচি গলা ক্ষীণ তো হব্যেকই।

সরল মন্তব্যগুলো ভেসে আসছিল দর্শকদের ভেতর থেকে।

বনবিহারীবাবু একদণ্ড দাঁড়িয়ে পড়লেন। পকেট থেকে একচিলতে কাগজ বের করে দেখলেন। আবৃত্তির পর গান রয়েছে। তারপর নীলমাধববাবুর সেজ ছেলে অমলজ্যোতির আবৃত্তি। সে শুধু এই অনুষ্ঠানটির জন্য কলকাতা থেকে বাড়ি এসেছে। ওর আবৃত্তির পর শুরু হবে একাঙ্ক নাটক। 'একটি গাছ একটি প্রাণ'। বনবিহারীবাবুরই লেখা। নাটকের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বনবিহারীবাবুর বুকে কে যেন দুরমুশ পেটাচ্ছে।

বনবিহাবীবাবু লক্ষ করলেন, অমলজ্যোতিটা কেমন .যেন উদ্ধত হয়ে গেছে। এককালে যে ওঁর ছাত্র ছিল, সেটা বোধ করি ভুলেই গেছে। তাও খাটো করে হাসলেন বনবিহারীবাবু। বললেন, একটু বাদেই আমার লেখা ওয়ান-অ্যাক্ট শুরু হবে।

অমলজ্যোতি নির্লিপ্ত গলায় বলল, আ'হা।

কথাটাতে তেমন ভরসা পেলেন না বনবিহারীবাবু। বললেন, যদি ভাল লাগে তবে দেখিস, যদি সরকারি প্রযোজনার আওতায় আনা যায়। আজকাল তো তোদের দপ্তর থেকে এসব হচ্ছে-টচ্ছে।

অমলজ্যোতি মাথা দুলিয়ে সায় দেয়।

কাগজের টুকরোখানা ফের পকেটে গুঁজে বনবিহারীবাবু ছুটলেন মাননীয় অতিথিবৃন্দের কাছে।

৩.

আজও জঙ্গলে ঢুকলে মহেশ্বের কোটালের মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। সাবেক আমলের জঙ্গল এখনও রয়েছে টুকটাক। সেখানে ঢুকে কী শান্তি! কেমন ছায়াছায়া অন্ধকার। আর, কী এক বিচিত্র গন্ধ! বুকটা থিতিয়ে আসে নিমেষে। সেইসব গল্পই সে বলে সুযোগ পেলেই। আজও বলছিল।

লব মাদোড়ের বইস কম। সে বালখিল্যের মত শুধিয়ে বসল, দিন দিন জঙ্গালে ঢুইক্যে কী কইর্‌তে, দাদু? মোদ্যার তো দু-ঘড়িও সিরকানার জঙ্গালে বইস্‌তে মন চায় না।

—ধুস শালা। মহেশ্বর কোটাল ধমকে ওঠে নাতির বয়েসী লবকে, —তুয়ারা ঢুকিস সরকারি জঙ্গালে। সরকারি জঙ্গাল হইল্যাক য্যান লরেশ কুচলানের ব্যাটার বিলাতি বউটি। উয়াতে ছায়া ভি নাই, মায়া ভি নাই। সেসব দিনের গাছ-গাছাল কুথা রে, যাকে বাপের মতন আঁকড়ে ধরা যায়! সবুজটি দেইখ্যে ছুইট্যে গেলাম, পাশে গেলেই মনটা ফ্যাসফ্যাসে হইয়েঁ যায়। একটা ফাঁকা ফাঁকা রোগা রোগা গাছের জঙ্গাল। চকচকে সাদা ছাল। ফুলে বিলাতি সাবুনের গন্ধ। এরপর মহেশ্বর কোটাল আগের দিনের জঙ্গালের মহিমা ব্যাখ্যা করতে থাকে। বলে, দশ-বিশজনার দল একসঙ্গে সেঁধাতাম জঙ্গালে। চইলেছি তো চইলেছি...। জঙ্গালেই আহার-বিহার। লিশিযাপন। পরের দিন ফের চলা শুরু...। তখন জঙ্গালই মোদ্যার ঘর। সেসব দিনের কথা আজও মনে বড় ঘাই মারে গ—। মহেশ্বর কোটালের কথাগুলো উপস্থিত সবাইকে ছুঁয়ে যায়।

লোধা-সাঁতাল-লোহার-মাদোড়, জঙ্গালই ওদের প্রাণ। জঙ্গালেই খাদ্য, আশ্রয়। জঙ্গালই মা-বাপ-বউ। জঙ্গালের নিবিড় ছায়াতেই মেয়ে-মরদে ভাবসাব হয়। মন খারাপ হলে ওরা ছুটে যায় জঙ্গালে। মন ভাল হলেও তাই। জঙ্গালকে কখনও অচেতন বলে মনে হয় না এদের। বরং মনে হয়, সে যেন এক বিশাল সচেতন, স্পর্শকাতর সত্তা। নিরন্তর জাগ্রত।

—সেই জঙ্গাল কেইট্যে সাফ কইরে দিল্যাক ঠিকাদার। মহেশ্বর কোটাল আক্ষেপ করে বলে, নিলামে যতটা বন লিল্যাক, তার দ্বিগুণ বন কাইট্‌ল্যাক। বহু মনীষ্যি তার ভাগ পাইল্যাক। মাঝে মাঝে ঝাঁটি-চোরদের ধইরে কেস দিল্যাক বিটবাবু। চোর বদলাম দিল্যাক মোদ্যারকে। মোরা নাকি জঙ্গাল কাটি। বলতে বলতে মহেশ্বর কোটালের দু-চোখে জ্বলে ওঠে অক্ষম ক্রোধ। ময়লা গামছা দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলে, দুনিয়ায় বিচার নাই হে।

৪.

চুপচাপ বসে থাকলে ডি-এফ-ও সাহেবের হাই ওঠে। তাই নিয়ে রোজ খোঁটা খান গৃহিণীর কাছে। এখনও অনুষ্ঠানের অনেক বাকি। এইমাত্র একাঙ্ক নাটক 'একটি গাছ একটি প্রাণ' শেষ হল। বনবিহারীবাবু এক ফাঁকে এসে কানে কানে বলে গিয়েছিলেন, স্যার, আপনাদের সরকারি স্লোগানের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাম রেখেছি একাঙ্কের। কেমন লাগল বলবেন। তেমন মন দিয়ে কিছুই দেখেননি ডি-এফ-ও সাহেব। ওসব নাটক-ফাটক তাঁর ভাল্লাগে না। বললেন, ভালই তো।

এখন বক্তৃতা চলছে। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ চলবে। মাননীয় অতিথিই চার-পাঁচজন। তার ওপর রয়েছেন বনবিহারীবাবু, নীলমাধববাবু...। বিকেলের আগে শেষ হলে হয়! ডি-এফ-ও সাহেবকে ঘন ঘন হাই তুলতে দেখে নীলমাধববাবু হাসলেন।

—সাহেবের কি ঘুম হয়নি রাতে?

—নাহ। লজ্জিত গলায় বলেন ডি-এফ-ও সাহেব, —ফি রাতে সারপ্রাইজ পেট্রলিংয়ে বেরোতে হচ্ছে তো। জঙ্গলটঙ্গল টিকিয়ে রাখাটা ভারি কঠিন হয়ে উঠেছে আজকাল।

—অথচ বন্ধুগণ—। গমগমিয়ে বক্তৃতা করছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, —জঙ্গলকে যে-কোনও মূল্যে টিকিয়ে রাখতেই হবে। কারণ, দেশে অন্তত তেত্রিশ ভাগ বনভূমি না থাকলে সে দেশের সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না। খরা হবে, ভূমিক্ষয় হবে, বায়ু দূষিত হবে...। মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই অবধি বলে তিনি আড়চোখে ডি-এফ-ও সাহেবের দিকে তাকিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েশন কামনা করলেন। জবাবে ডি-এফ-ও সাহেব আবারও হাই তুললেন।

—আসলে, আমি যা বুঝি, কাজের মানুষের একঠাই চুপচাপ বসে থাকাটাই বিড়ম্বনা। নীলমাধববাবু এমন যুক্তিসহকারে ডি-এফ-ও সাহেবের ঘন ঘন হাই তোলাটাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন—তাহলে আসুন, এই ফাঁকে একটা কাজের কথা সেরে নিই। আমার বড় ছেলেটা বি-এ ফেল করে বসে রয়েছে পাঁচ বছর। এখানে-ওখানে খুচরো ঠিকেদারি করছে-টরছে। ওকে যদি পাকাপাকিভাবে একটা ঠিকেদারি পাইয়ে দিতেন—। আপনাদের দপ্তরে তো অঢেল কাজ।

জঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একনাগাড়ে চিৎকার করছিলেন রেঞ্জ অফিসার। তাতে করে নীলমাধববাবুর আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটছিল। বিরক্ত হয়ে রেঞ্জ অফিসারের দিকে তাকালেন তিনি। ডি-এফ-ও সাহেবও তাঁকে ইঙ্গিতে বসে পড়তে বললেন।

—আমার বড়ছেলের ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি দেখলে ভাল হত স্যার। নীলমাধববাবু আগের কথার খেই ধরেন আবার—এমনিতেই তো জঙ্গলগুলো দিন দিন লোপাট হয়ে যাচ্ছে। বেশি দেরি হলে...।

—জঙ্গল যারা ধ্বংস করছে, তারা দেশের শত্রু। রেঞ্জার সাহেব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—তাদের কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হবে। একটি গাছও যাতে কাটা না পড়ে, সেটা আমরা দেখছি। দেখব। পাশাপশি, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে গাছ লাগাব। সারা দেশকে সবুজ, শ্যামল করে তুলব। ...রেঞ্জার সাহেবের গলা ভারি হয়ে আসছিল। আবেগমথিত কণ্ঠে—এই পৃথিবীকে শিশুদের বাসযোগ্য করে যাব আমি—বলেই ধপ করে বসে পড়লেন তিনি।

সভাপতির ভাষণে নীলমাধববাবু টেক্কা মারলেন সবাইকে। বললেন, গাছের হাজার-একটি উপকারের কথা শুনলেন। আরও আছে। এই দেশে যদি কোনওদিন বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে, তাহলে সরকারের পুলিস-মিলিটারির সঙ্গে লড়াই চলবে সাধারণ মানুষের। তখন জঙ্গলই হবে মানুষের দুর্গ। সেখানে লড়াকু মানুষ পাবে নিরাপদ আশ্রয়, বনজ খাদ্য এবং লড়াইয়ের লাঠি। যেমনটি ঘটেছিল ভিয়েতনামে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে দেশে দেশে, যুগে যুগে। (আহা-রে! এখন যদি সভাধিপতি থাকত, শুনতে পারত কথাগুলো।)

জলযোগান্তে বৃক্ষরোপণের পালা। স্কুলের একপ্রান্তে অসংখ্য ঝুরিওয়ালা বিশাল

বৃদ্ধ বট। তার তলায় চারটি গর্ত পাশাপাশি। গর্তের চারপাশে চালের গুঁড়োর আল্পনা। বালতিতে জল, তোয়ালে, রেকাবিতে ফুল-চন্দন, ধান-দূর্বা, জ্বলন্ত প্রদীপ...। স্কুলের মেয়েরা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছে শাঁখ হাতে নিয়ে। ফটোগ্রাফাব অ্যাপারচার ঠিক করে তৈরি। অতিথিদের নিয়ে অকুস্থলের দিকে যেতে যেতে নীলমাধববাবু ডি-এফ-ও-র উদ্দেশে বললেন, তাহলে, স্যার, জঙ্গালের নিলামেব সময় একটা খবর নিশ্চয়ই পাচ্ছি ?

—ও সিয়োর। ডি-এফ-ও সাহেব মোলায়েম হাসলেন।

গাছের তলায বৃক্ষরোপণের আয়োজন দেখে অতিথিরা চমৎকৃত। বলেন, তোফা ব্যবস্থা।

—কিন্তু গর্তগুলো গাছের তলায় খোঁড়া হয়েছে কেন ? আচমকা শুধিয়ে বসলেন এস-ডি-ও সাহেব—গাছের তলায় গাছ লাগিয়ে লাভ কি ?

এমন কথায় উদ্যোক্তারা কেমন হকচকিয়ে যান। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল স্কুলের কনিষ্ঠ পিয়ন মদন। তার মনে হল, প্রশ্নটা বুঝি তাকেই করা হয়েছে। খুব চালাক-চতুর ছেলে মদন। এস-ডি-ও সাহেবেব প্রশ্নে সে একটুও ঘাবড়াল না। ঝটিতি জবাব দিল, এখানেই তো ফি-বছর লাগানো হয়, স্যার।

এস-ডি-ও সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। কিন্তু ওদিকে সদানন্দ ততক্ষণে ছোলা-মুড়ি বিতরণ শুরু করে দিয়েছে। মহেশ্বর কোটালের দল চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে ওকে। দু-মুঠো বেশি পাবার জন্য হইহল্লা জুড়েছে। ওদের সমবেত চিৎকারে এস-ডি-ও সাহেবের মৃদুকন্ঠ চাপা পড়ে গেল।

তসলিমা অথবা ঠাকুরচকের অস্লেশ

১.

দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে অস্লেশ প্রায় একযুগ বাদে ঠাকুরচক গাঁয়ে ফিরে এল। এসেই হুঙ্কার ছাড়ল, বদল্ দুজ্ঞা, সব কুছ বদল দুজ্ঞা।

যথাসময়ে প্রেমময়ের কানে গেল কথাটা। স্কুল ছুটির পর আদিবাসী পাড়ায় ডাইন-বিরোধী মিটিং করতে গিয়ে পার্টির ছেলেদের মুখেই শুনলেন। অস্লেশ নাকি এ ক'বছরে একেবারেই বদলে গিয়েছে। বলছে, উনবিংশ শতাব্দীতে পড়িয়া রইছে আমাদের এই গ্রাম। নইলে এখনও ভূত-প্রেত-ডাইনে বিশ্বাস করে কেউ? মা-কালীর নামে পাঁঠাবলি চলে? ঠাকুর খাবে বলিয়া এত এত চাষের জমি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে দখল করিয়া রাখে পুরুত সাজিয়া একটি মাস্তর লোক? অর্ পায়ের তলায় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে সারা গাঁর মানুষ? এসব আর চলতে দিবা উচিৎ নয়। প্রেমময় ধৈর্য ধরে শোনেন। শুনতে শুনতে বিস্মিত হন। ছেলেটার এতখানি পরিবর্তন হয়েছে! মুখে বলেন, ঠিকই তো বলেছে। সবকিছু বদলিয়া দিবার সময় এটা। আর কতকাল আমরা পিছু ফিরিয়া হাঁটব? অকে একবার আমার সাথে দেখা করতে কইবি ত।

অস্লেশের আসল নাম অমলেশ। ছেলেবেলায় কানাই দাসের ব্যাটা অমলেশ দাসকে চিনতা না, ঠাকুরচক গাঁয়ে এমন একটা মানুষ পাওয়া দায়। অসম্ভব ডানপিটে ছিল, সামান্য ক্ষ্যাপাটেও। আর, অসম্ভব খামখেয়ালি। কখন যে কী করে বসবে, আগাম আন্দাজ পাওয়া যেত না মোটেই। গাঁয়ে কেষ্টযাত্রার দলে পালাগান গাইতে গাইতে বৃন্দা কিংবা ললিতাবেশী অমলেশ আচমকা গেয়ে উঠত খোদ কেষ্ট কিংবা রাধার মুখের গান। আসর জুড়ে হাসির হররা ছুটত। অমলেশ খুব মজা পেত তাতে। ঠাকুরচক স্কুলে প্রেমময়ের কাছেই হাতেখড়ি ওর। ওঁর কাছেই পড়েছিল ক্লাস ফোর অবধি। তখনই, প্রেমময়ের মনে আছে, পড়াশুনো ছাড়া আর সবকিছুতেই মন ছিল তার। গেরস্থের বাগানের আম-জাম-নারকোল-পেয়ারা চুরি করে খাওয়াটা ছিল তার নিত্যিদিনের কেচ্ছা। আদিবাসী পাড়ায় মুরগী চুরি করতে গিয়ে বার-কয় ধরা পড়ে উত্তম-মধ্যম খেয়েছে। শেষরাতে গেরস্থের গোয়ালে ঢুকে দুধেল গাইয়ের পেছনের পা রশি দিয়ে টেসে বেঁধে ঠিক বাছুরের মতো বাঁটে মুখ লাগিয়ে চুকচুকিয়ে দুধ খেত। ঐ অবস্থায় ধরা পড়ে গিয়ে মার খেতে খেতে ওর পিঠ ফেটেছে। ছেলেবেলা থেকেই পেটরোগা

ছিল অমলেশ। প্রায়ই চোঁয়া ঢেঁকুর উঠত তার, গলা বুক জ্বলত। পেটে গ্যাস জমে থাকত সারাক্ষণ। গাঁয়ের যে কোবরেজ মশাই ওর চিকিৎসা করতেন, তাঁর মতে, অমলেশের ছিল বায়ু-প্রধান শরীর। বায়ুর প্রকোপ বাড়লে মানুষ সারাক্ষণ বকবক করে, বিচার বিবেচনা কমে যায়। অমলেশেরও হয়েছে সেই অবস্থা। অম্বল-অজীর্ণ থেকেই শরীরে গ্যাসের উৎপত্তি হয়। অম্লরোগ না সারলে অমলেশের এই উদ্ভট বজ্জাতি কাজকর্ম কমবে না। কিন্তু সারল না। যতই বয়েস বাড়ল অমলেশের অম্লরোগ ততই প্রকট হতে লাগল। সমবয়েসীদের কাছে অমলেশ হয়ে গেল অম্লেশ। নতুন সন্ধি শেখা সেভেন-এইটের ছেলেগুলো তার নতুন নামের সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখিয়ে দিল, অম্ল + ঈশ = অম্লেশ। অর্থাৎ অম্ল রোগের রাজা। অমলেশ ক্ষেপে ফায়ার হয়ে যেত। কিন্তু অম্লেশ নামটা তার গায়ে ক্রমশ এঁটে বসে যেতে লাগল।

ঠাকুরচক গাঁয়ের জুনিয়র হাইস্কুলে ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল অম্লেশ। তারপরেই ইতি। কিছুদিন গাঁয়েই আকাম-বাকাম করে কাটাল, তারপরই তো ঘটল সেই ঘটনাটা, যার ফলে তাকে গ্রাম ছাড়তে হলো রাতারাতি। গাঁয়ের জাগ্রত কালীমাতার পুরোহিত অম্বিকা চক্রবর্তীর ছ'মেয়ের মধ্যে কনিষ্ঠা পাঁচিকে একদিন আসন্ন-সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে প্রেম-নিবেদন করে বসল। যেমন-তেমনভাবে নয়, কালিমাতার মন্দিরের সামনের বেলগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দু'হাতে পাঁচিকে একেবারে জাপটে ধরে প্রেম নিবেদন। এক হেঁচকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাঁচি ঘরের পানে দে-দৌড়। মুহূর্তে সারা গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ দীঘিটি, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। আর তারই প্রবল ঝাপটায় সেই রাতেই গ্রামের বুক থেকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেল অম্লেশকে। একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সেই অম্লেশ আজ এ্যাদ্দিন বাদে ফিরে এল গাঁয়ে।

বন্ধুরা ওকে চিনতেই পারে না। অম্লেশই চেঁচিয়ে নিজের পরিচয় জানান দেয়। কীরে শালারা, চিনতে পারলি নি? আমি অম্লেশ। ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার, এ্যাদ্দিন বাদে সে নিজেই নিজের নাম এইভাবে উচ্চারণ করল। অম্লেশ। বন্ধুরা ওকে দেখে হতবাক হয়ে যায়। অম্লেশকে সত্যিসত্যিই চেনা দায়। খ্যাংরা কাঠির মতো রোগা লম্বাটে শরীর। ঘাড় অবধি লতানো চুল। পরনে বেল-বটম প্যান্ট, ফুল-ফুল প্রিন্টেড সার্ট। গলায় চাকতি, হাতে বালা, পায়ে নাগরা। মুখে সর্বদা মদ-গাঁজার গন্ধ, সর্বদাই ঢুলুঢুলু চোখ। দেখতে দেখতে বন্ধুদের মনে বেশ সম্ভ্রম জাগে।

বন্ধুদের কাছে প্রবাসী জীবনের গল্প শোনায় অম্লেশ। গ্রাম থেকে পালিয়ে সোজা পৌঁছেছিল বেলদা বাজারে। এক মারোয়াড়ির গোলদারি দোকানে কাজ করেছিল কিছুদিন। সেখান থেকে খড়্গপুর। অবশেষে কলকাতা। কলকাতায় নানা ঘাটের জল খেয়েছে। কোন এক অপেরা দলে ঢুকেছিল। সাইড-ভিলেনের পার্ট করত। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ফিরে এসেছে, গাঁয়ের টানে।' বলে, নিজের গ্রাম, নিজের মাতৃভূমি, তাকে ছাড়িয়া কি থাকা যায়! যে গাঁয়ে জন্মেছি, তার তরেও তো কিছো করা দরকার। বলতে বলতে ঢুলু ঢুলু হাসে অম্লেশ, তরা আমাকে অম্লেশ বলিয়াই ডাকবি।

অমলেশের চাইতে অম্লেশ ঢের ভালো। অনেক স্মার্ট। শহরে না গেলে এসব বুঝা যায় না। তরা যাকে সিনিমায় অমিতাভ বচ্চন বলিয়া ডাকু, শহরে তাকে ডাকে অমিতাভ্। হিন্দি সিনিমা তো বড় একটা দেখু নি তরা, হিন্দি সিনিমায় হিরোদের নামগুলানই এমনতরো। প্রশান্ত নয়, প্রশান্ত্, হেমন্তকুমার সিখ্নে হেমন্ত্কুমার। পরমেশ সিখ্নে পর্মেশ। বন্ধুরা শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে যায়।

২.

প্রেমময় যখন পার্টিতে ঢোকেন তখন তিনি ছিলেন যুবক। প্রায় দু'দশক পার্টি করা হয়ে গেল তাঁর। চুলের গাছিতে পাক ধরল। কিন্তু এই ঠাকুরচক গ্রামের অবস্থা যেমন ছিল দু'দশকেও বড় কিছু বদলায়নি। বিশেষ করে মানুষের মানসিক গঠন যেখানেই ছিল প্রায় সেখানেই থেকে গেছে। ইতিমধ্যে ঠাকুরচক জুনিয়র হাইস্কুলটি হাইস্কুল হয়েছে। মাঠে মাঠে শ্যালো বসেছে। কাঁচা রাস্তা মোরাম হয়েছে। সারা গাঁয়ে পড়াশুনো জানা ছেলে-ছোকরার সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু প্রেমময়কে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়, গ্রামের মানুষের মনোভাব বড় একটা বদলায়নি। আজও কালীমাতার মন্দিরে নিয়মিত পাঁঠাবলি চলে, গাজনে আগুন-ঝাঁপ এবং দন্ডীকাটার অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের সংখ্যা বেড়েছে. জাতের বিচার কিছুই কমেনি। সন্ধ্যে হলেই ইদানিং 'রাম নারায়ণ রাম' গান শুরু হয় কোরাসে। শিক্ষিত ছেলেপিলেরাই ভিড়েছে সেই দলে। লাভের মধ্যে, ইস্কুল-হোস্টেলের পাশে জগৎ মাইতি বানিয়েছে ভিডিও হল। সম্বৎসর সেখানে রগরগে হিন্দি ছবি দেখানো হয়, আর শিবারাত্রি উপলক্ষ্যে উপোসী মেয়েরা সারারাত জেগে ওখানে 'বাবা তারকনাথ' আর 'জয় সন্তোষী মা' দেখতে দেখতে চোখের জলে বুক ভাসায়। এমন কি সনাতন বেরার বি-এ পাশ মেয়ে মাধবীও সেই বুক-ভাসানোর দলে ভিড়ে যায়। কেবল ঠাকুরচকই নয়, চারপাশের সমস্ত গাঁয়ে-গঞ্জে ঐ একই ছবি। এখনো সুযোগ পেলেই গাঁয়ের কাউকে ডাইন বানিয়ে গ্রামসুদ্ধ লোক বিচার বসিয়ে দেয়। দু'দশক ধরে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার প্রচার চালিয়েও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারেননি প্রেমময়রা। বরং কেমন জানি মনে হয়, ইদানিং ঐ ব্যাপার-স্যাপারগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঠাকুর-দ্যাবতার পুজো-আচ্চায় ধুমধাম আরও বাড়ছে। হত্যে-মানসিকের ধুম পড়ে গেছে যেন। দু'দশক আগে যেসব দ্যাবতার নাম শোনেনেই নি, সেইসব নতুন নতুন ঠাকুরের পুজো-আচ্চা শুরু হয়েছে ঘটা করে। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, স্কুল-কলেজে পড়াশুনো করা ছেলেরা, যাদের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করতেন প্রেমময়, তারাও দলে দলে ঐ সব হুজুগে গা ভাসিয়েছে। তাদেরই উৎসাহটা যেন ইদানিং বড্ড বেশি লক্ষ করেন প্রেমময়। এমন কি, প্রেমময়ের পার্টির সমর্থক, সদস্যদের অনেকেই যে মনে মনে এইসব কাজকর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল, প্রেমময় তা উপলব্ধি করেন। প্রেমময় একটু একটু করে বুঝতে পারছেন যে কাজটা মোটেই সহজ নয়। মানুষের মন থেকে ধর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদিকে সমূলে উৎখাত করা ভীষণ ভীষণ কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এটা একটা

দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। ধৈর্য ও অধ্যবসায়সহকারে একটু একটু করে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। সেইভাবেই এগোচ্ছেন প্রেমময়। এগোচ্ছেন, পেছোচ্ছেন, আবার এগোচ্ছেন...। জনাকয় মানুষ এখনও অবধি খুব শক্তপোক্তভাবে রয়েছে ওঁর পাশে। সদানন্দ, গোপেশ্বর, কুমুদ, শশধর...। এঁদের নিয়েই তিনি নিঃশব্দে চালিয়ে যাচ্ছেন এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করা ছাড়াও, চারপাশের গ্রামগুলোতে একাধিক নাইট-স্কুল চালান। হোমিওপ্যাথিটা শেখা ছিল। অনাথ-আতুরদের বিনে পয়সায় চিকিৎসা করেন। বন্যায়-খরায় সাহায্য করবার জন্য একটা ত্রাণসমিতি গড়েছেন। ভূত-ডাইনসহ যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার চালাচ্ছেন, গ্রামে গ্রামে মিটিং করছেন। গত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বর হয়েছেন। তাঁরই উৎসাহে গাঁয়ে একটা পুষ্টিকেন্দ্র হয়েছে। গাঁয়েরই তিনটি পড়াশুনো জানা মেয়ে কাজ করছে সেখানে। সনাতন বেরার মেয়ে মাধবী কাজ করছে গ্রামেরই সমবায় সমিতিতে। এসব দেখেশুনে গাঁয়ের বহু বাবা-মা তাদের মেয়েদের ঝটপট ভর্তি করে দিয়েছে স্কুলে। গ্রামেগঞ্জে এখনও জমি-জায়গা নিয়ে অনেক কিসিমের ভ্রষ্টাচার চলে। তেভাগার লড়াইতে হাত পাকানো প্রেমময় এখনও গ্রামের গরিব মানুষদের জমি-জমার হাজারো লড়াইতে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। অনেক ঝুঁকি নিয়ে, নিগ্রহ সয়ে, প্রাণ তুচ্ছ করে তিনি একটু একটু করে এগোচ্ছেন। গ্রামের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে হরেক শিকলে বেঁধে রেখেছে আপামর মানুষকে। এখানে প্রগতিশীল চেতনার কথা বারোআনাই অচল পয়সার সমতুল্য। কারণ, এই বিশাল গ্রামের বারোআনা মানুষই হতদরিদ্র, নিরক্ষর। দারিদ্র্য আনে অসহায়তা, নিরক্ষরতা আনে অজ্ঞানতা, চাপ চাপ অন্ধকার। প্রেমময় সেই চাপ চাপ অন্ধকারকে দু'হাতে ঠেলতে ঠেলতে এগোচ্ছেন। কখনো বা পেছোচ্ছেনও।

অম্লেশ শুনতে শুনতে ঢুলুঢুলু হাসে।

বলে, প্রেমময় স্যার-এর পথ ধরিয়া হাঁটলে এসব বুজরুকি হটাতে আরও একশো বচ্ছর লাগিয়াবে। এভাবে কুনোদিনও শালাদিগের বোধোদয় হবে নি। এদের তরে লাগবে অন্য ওষোধ। যেমন ঠাকুরের তেমন পুজা, মনসা ঠাকুরকে উখড়া-ভুজা।

বলে, টুকচার সবুর ধর, আমি শালাদের এক্কেরে টাইট করিয়া দুবো। সর্বপ্রথম ধরতে হবে ঐ শালা পুরুত ঠাকুরকে। শালা লম্পট!

৩.

কালীমাতার পুরোহিত অম্বিকা চক্রবর্তী যে একের নম্বরের লম্পট তাতে কারোরই কোনও সন্দেহ নেই। বহুবার মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারিতে ধরা পড়ে দেশস্থ বিচারে জরিমানা দিয়েছে সে। যখন চ্যাংড়া-জোয়ান ছিল, বাপটি যায় মরে। অম্বিকার ওপরই কালীমাতার পূজা-আচ্চার দায়দায়িত্ব পড়ে। পূজা করবে কি, মন্ত্রই তো জানত না অম্বিকা। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে, সজোরে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সে উচ্চস্বরে সিনেমার গান গাইত। শোন বন্ধু, শোন, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা/ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা...। সবাই ভাবত বুঝি মন্ত্র পড়ছে পুরুত ঠাকুর। কে যেন

একদিন ওর বুজরুকি ধরিয়ে দিয়েছিল। দেশস্থ সকলের হাতে-পায়ে ধরে, জরিমানা দিয়ে তবেই রেহাই পেয়েছিল অম্বিকা। গ্রামশুদ্ধ সবাই জানে ওর গুণপনার কথা। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পায় না। জাগ্রত কালিমাতার পুরোহিত সে। মায়ের সঙ্গো একান্তে নাকি কথা কয়। তাকে চটিয়ে কেই বা মায়ের কোপে পড়তে চাইবে? অগ্রেশ কোনও কালেই ঠাকুর-দ্যাবতায় বিশ্বাস করে না। ইহজীবনে ঠাকুরকে চেয়ে সে কোনও কিছুই পায়নি। লাট্টু, ঘুড়ি, পরীক্ষায় পাশ, পাঁচি—কিছুই না। কাজেই অম্বিকার প্রতি তার ভয়-সম্ভ্রমের প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে, পাঁচির সঙ্গো প্রেম করবার সুবাদে যেভাবে তাকে গ্রামছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে দীর্ঘকাল, তাতে করে অম্বিকা চক্রবর্তীই যে তার সমাজ-সংস্কারের প্রথম টার্গেট হবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নাই।

ফলে, বন্ধুদের কাছে 'শয়তানদের টাইট দেবার' কড়ার যেদিন করল অগ্রেশ, তার দু'চারদিনের মধ্যেই, একদিন সকালে, গ্রামের মানুষ সবিস্ময়ে দেখল, কালিমন্দিরের সামনের বেলগাছের গুঁড়িতে সাঁটানো রয়েছে লাল কালিতে লেখা একখানি পোস্টার :

কালীঠাকুরকে ইয়ে করি, অম্বিকাকে ইয়ে করি,

অম্বিকার মেয়ে পাঁচিকে বিয়ে করি।

দেখামাত্রই ক্ষেপে যায় গাঁয়ের মানুষ। পাঁচিকে না হয় বিয়ে করতে চাইলি, জোয়ান ছোকরা, ঠিক আছে। কিন্তু ঠাকুরের পুরুতকে ইয়ে করতে চাস তুই? তিনি কিনা মায়ের পূজারী, মায়ের সঙ্গো একান্তে কথাবার্তা কন, তাঁর নামে এমন অশ্লীল মন্তব্য! সবচেয়ে মারাত্মক কথা, মা কালীকেও ইয়ে করতে চাস্ তুই? কী স্পর্ধা! কত দূর দূর গ্রাম থেকে নিয়মিত পাঁঠা আসে যাঁর কাছে, শয়ে শয়ে রোগী-তাপী মানসিক করে, হত্যে দেয়, ফল পায়, তুই কিনা তাঁরই ইয়ে করতে চাস! এতখানি সাহস তোর? সাপের পাঁচ-পা দেখেছু? সবাই একজোট হয়ে বলে, সিধা করিয়া দিবা হউ ছোকরাকে। একদল বলে, আমাদেরকে কিছুই করতে লাগবে নি। মা স্বয়ং অর বিচার করিয়া দিবন। শালার জিভ খসিয়াবে, হাত-পা পড়িয়াবে, দুনিয়ার লোক দেখবে সে দৃশ্য। দুটা দিন সবুর ধর তুমরা। অন্য দল বলে (তার মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তীও রয়েছে), মা কবে বিচার করবন, তার তরে বুসিয়া রইবো আমরা? মার অপমান কি আমাদিগের অপমান নয়? সারা গাঁর অপমান নয়? বলে, মা'র বিচার মতো করবনই। কুনো সন্দেহ নাই তাতে। কিন্তু আমরা গাঁ'র অতগুলো মানুষ কি মরিয়া গেছি যে হাত-পা গুটিয়া বুসিয়া রইবো? কতখানি অপমান বল দেখি! কাজেই লোক ছোটে অগ্রেশের বাড়িতে। লোক ছোটে ক্লাবঘরে। ভূতদীঘির পাড়ে। ভিডিও হলে। কিন্তু অগ্রেশকে কোথাও পাওয়া গেল না। সে যেন বেমালুম হাওয়ার সঙ্গো হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

পোড় খাওয়া মানুষজনের কেউ কেউ বলে, কুথ্থাও নয়, শালা নির্ঘাৎ কাঁটাশর গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। অরাই লুকিয়া রাখছে শালাকে। যে কাণ্ডটা করিয়া গেছে স্বয়ং মা'কে লিয়া, তাতে করিয়া কাঁটাশর গাঁয়ের লোক ছাড়া আর কুনো গাঁ-ই আশ্রয় দিবেনি ঐ পাষণ্ডকে।

তবে চল, দল বাঁধিয়া কাঁটাশর গাঁয়ে চড়াও হই। ঠাকুর-দ্যাবতা লিয়া ব্যাপার, জান যায় সেও ভি আচ্ছা।

কালিমাতার মন্দিরের সামনে, বেলগাছের তলায় জড়ো হয় ঠাকুরচক গাঁয়ের চোদ্দ আনা মানুষ। লাঠি-সড়কি জুটিয়ে নেয়। বাঁশঝাড় থেকে ঝটপট বাঁশ কেটে বানিয়ে নেয় লাঠি। অম্বিকা চক্রবর্তী ঘন ঘন স্লোগান দেয়, জয় কালী চামুণ্ডার জ-য়। শত শত কন্ঠ গর্জন তোলে, জয় কালী চামুণ্ডার জ-য়। কেবল কোবরেজ মশাই মিনমিনে গলায় বলতে থাকেন, 'ধরিয়া কি করবি অকে? অর বায়ু কুপিত। আলফাল বকবেই। অর চিকিৎসা দরকার।' কেউ কানই দেয় না তাঁর কথায়।

দু'গাঁয়ের মধ্যে যখন একেবারে রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখনই, একেবারে শেষ মুহূর্তে হাজির হন প্রেমময়। উত্তেজিত জনতাকে সামাল দেবার চেষ্টা করেন। বলেন, হঠকারিতা না করিয়া ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবো তুমরা। একথায় আরও ক্ষেপে যায় জনতা। অম্বিকা চক্রবর্তীর দল একেবারে তেড়েফুঁড়ে ওঠে। বলে, তুমার জন্যই ত গাঁয়ে এসব হচ্ছে হে। তুমরাই ত ছেলা-ছোগরাদের দিনরাত বুঝাচ্ছ, ঠাকুর-দ্যাবতা নাই, পূজা-আচ্চা সব ভুয়া, তুমরাই ত লাই দিয়া দিয়া এদের মাথায় তুলেছ। এখন মা'র শাপে যদি গাঁয়ে মড়ক ধরে, খরা হয়, বন্যা হয়, তুমি সবাইকে বাঁচাবে?

সেদিন প্রায় মার খেতে খেতে বেঁচে যান প্রেমময়। ঠাণ্ডা মাথায় প্রায় ঘন্টাটাক ধরে ওদের বোঝাতে থাকেন।

বলেন, অমলেশ কাজটা অবশ্যই ভাল করেনি। এ তার বিকৃত রুচিরই পরিচয়। কিন্তু তুমরা যে কাঁটাশর গাঁয়ে লাঠি-সড়কি লিয়া হামলা করতে যাচ্ছ, অমলেশ যে ঐ গাঁয়েই রয়েছে তার কুনো প্রমাণ আছে তুমাদের পাশ?

—উই গাঁ' ছাড়া আর কুন গাঁয়ে গিয়া লুকাবে উ? আর কেই বা আশ্রয় দিবে অকে?

—এটা যদি ঠিকও হয়, তাও তো প্রমাণ চাই। নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া এমনভাবে হামলা করা কি ঠিক? বিচারে তুমরা হারিয়া যাবে।

কথাটা অবশেষে যুক্তিযুক্ত ঠেকে অনেকের কাছে। ফলে, সে যাত্রা কাঁটাশর অভিযান স্থগিত থাকে। কিন্তু ঠাকুরচকের বেশির ভাগ মানুষের মন থেকে এ বিশ্বাস কিছুতেই যায় না, কাঁটাশর গাঁয়েই লুকিয়ে রয়েছে অম্লেশ। শুধু তাই নয়, অনেকে এমনটাও বিশ্বাস করে বসে যে অম্লেশের এমন হঠকারিতার পেছনে কাঁটাশর গাঁয়ের মানুষের প্রচ্ছন্ন উস্কানি রয়েছে। পেছন থেকে উস্কে দিয়ে এখন তারিয়ে তারিয়ে মজা দেখছে ওরা, ফলে কাঁটাশর গাঁয়ের ওপর রেগে কাঁই হয়ে থাকে ঠাকুরচকের মানুষ। এবং ঐ গাঁয়ের যেসব মেয়েদের ঠাকুরচকে বিয়ে হয়েছে সেইসব বউড়িরা ওদের শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীদের হাতে চড়-চাপড় খায় এবং ঠাকুরচকের মানুষ প্রায় অলিখিত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে যে আর কোনওদিনই তারা বাপের ঘরে যেতে দেবে না কাঁটাশরের মেয়েদের এবং কাঁটাশরের কোনও মানুষকে পথেঘাটে একা একা পেলে ওদের হাড়মাস এক করে দেবে।

হপ্তাটাক বাদে ভূতদীঘির পাড়ে ঠা-ঠা দুপুরবেলায় আচমকা অম্লেশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় প্রেমময়ের।

ঝাঁকড়া জাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল অম্লেশ। প্রেমময়কে দেখে মিটিমিটি হাসতে থাকে। বলে, কাজটা ঠিক করিনি মাস্টারমশাই?

প্রেমময় কি জবাব দেবেন ভেবে পান না। খুব আত্মবিশ্বাসী গলায় অম্লেশ বলে, একটা ধাক্কা দেবার দরকার ছিল।

প্রেমময় শুধোন, কোথায় ছিলে এ ক'দিন?

অম্লেশ ঢুলুঢুলু হাসে। বলে, বালিগুমার শ্মশানে। ঝাঁকড়া, শ্যাওড়া গাছটার মগডালে।

প্রেমময় গম্ভীর মুখে তাকান। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেন, এভাবে হয় না অমলেশ। এটা কোনও পথই নয়। মাঝের থেকে তুমি দু'গাঁয়ের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছিলে। আর, আমাদের কাজকর্মও স্রেফ তোমার জন্যই একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। মানুষজন একেবারে ক্ষেপে রয়েছে। আমাদের কুসংস্কার-বিরোধী মিটিং-টিটিং সব বন্ধ। এমন কি পার্টির সাহসী ছেলেরাও কাজে নামতে ভয় পাচ্ছে।' অম্লেশের চোখের ওপর সরাসরি চোখ রাখেন প্রেমময়। বলেন, 'লড়াই করা আর পেছন থেকে চিমটি কাটা এক নয় অমলেশ।'

অম্লেশ মিটিমিটি হাসছিল তখনও। বলে, একটা কথা বলব মাস্টারমশাই?

—কি কথা?

—আমার পথই ঠিক। একদিন সেটার প্রমাণ পাবেন। আসলে, এসব করার ফলে চারপাশে আমার পপুলারিটি বাড়ছে তো, সেটাই সইতে পারছেন না।

৪.

ঠাকুরচক আর কাঁটাশর, পাশাপাশি দুটি গ্রাম। মধ্যে একখানা বিশাল ধানের মাঠ, নাম আলোচালের মাঠ, আর পচাখাল নামে একটি খাল। খুব গভীর আর খতরনাক এই পচাখাল। ঘোর গ্রীষ্মের দু-তিন মাস ছাড়া সে-খালে এমন স্রোত আর ঘূর্ণী যে পারাপার হওয়াই দুষ্কর। একখানা কাঠের সরু পুল রয়েছে খালের ওপর। এককালে ঐ পুল দিয়েই যাতায়াত করতো দু'গাঁয়ের মানুষ। এখন আর তার দরকার হয় না। দু'গাঁয়ের মধ্যে যাতায়াত তো দূরের কথা মুখ দেখাদেখিও আজ পাঁচ-ছ' বছর বন্ধ। কেউ কাউকে সইতে পারে না। কথায় কথায় দাঙ্গা লাগবার উপক্রম। কাঁটাশরে আড়াই-তিনশো পরিবারের বাস। তার মধ্যে গরিব আর অন্ত্যজ মানুষই চোদ্দআনা। ঠাকুরচক গাঁয়ে দেড়শোর বেশি পরিবার বাস করে না। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই উচ্চবর্ণের মানুষ। অর্ধেক মানুষের অবস্থা বেশ সচ্ছল। চারপাশের গাঁয়ের মানুষজনের ধারণা, দুটি গাঁয়ের মধ্যে একটা গোপন উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এক ধরণের হীনমন্যতা ও অহমিকার দ্বন্দ্ব। আসলে, চারপাশের মানুষজন বিশ্বাস করে, ঠাকুরচক গাঁয়ের অধিকাংশ উচ্চবর্ণের মানুষই জলের দামে চোরাইমাল কিনে বড়লোক হয়েছে

এবং কাঁটাশর গাঁয়ের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরাই সেই মালের যোগান দিয়ে এসেছে। এতকাল ব্যাপারটা স্বাভাবিক কারণেই চাপা ছিলো। কিন্তু দু'গাঁয়ের মধ্যে বাদ-বিসংবাদটা হু-হু করে বেড়ে যেতেই পুরো ব্যাপারটা প্রকাশ্যে আসার সুযোগ পেয়ে গেল। যে কারণে বাদ-বিসংবাদের মূল সূত্রপাত, তার মূলে স্বয়ং চামুণ্ডা কালী এবং তার পূজারী অম্বিকা চক্রবর্তীর অবদানই সর্বাধিক।

ঠাকুরচক গাঁয়ের মা চামুণ্ডাকালী চারপাশের দশ-বিশটা গাঁয়ের মধ্যে অতিশয় জাগ্রত দেবী হিসেবে বিখ্যাত। সেই সুবাদে মায়ের থানে নিয়মিত পাঁঠা মানত আসে ঢের। আগে তাবৎ পাঁঠা বলি দিতো মায়ের থানের তিন পুরুষের ঘাতক কাঁটাশর গাঁয়ের মুকুন্দ দোলুই। বলি দেবার পারিশ্রমিক হিসেবে যে কাটা মুণ্ডুর অর্ধাংশ পেতো। দু'গাঁয়ের রেষারেষির সূত্রপাত ঐ পাঁঠাবলি নিয়ে। একসময় অম্বিকা চক্রবর্তীর মনে হলো, সামান্য হেতার ওঠানো-নামানোর জন্য মুকুন্দ দোলুইকে খামোখা কাটা মুণ্ডুর আধাভাগ দেওয়াটা নেহাৎই লোকসান। ফলে, এক রাতে সে স্বপ্নাদেশ পেলো, হাঁ রে অম্বিকা, আর কদ্দিন উপাসে রাখবি আমাকে?

অম্বিকা চক্রবর্তী স্বপ্নের মধ্যে বলে, সে কী মা! এত যে পাঁঠাবলি দিয়ে উচ্ছর্গ কচ্ছি তুমার নামে?

—উই মাঝির হাতের মাংস খায়া জাত খুয়াবো আমি? যদি তুই নিজের হাতে বলি দিয়া উচ্ছর্গ করিস তো খাবো, লচেৎ উপাসীই রইলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে অম্বিকা তার স্বপ্নের কথা সাড়ম্বরে ডেকে ডেকে শোনায সবাইকে। শুনে গাঁয়ের মানুষ তো ভয়ে-শোকে পাথর। মা তবে উপোসী রয়েছেন এতকাল! কী অন্যায় কথা! অম্বিকা, তুমাকেই তবে বলি দিবার কাজটা করতে হবে।

—আমি? বামুনের পুত্র হয়্যা আমি কিনা হেতার ধরবো? আঁতকে ওঠে অম্বিকা। '—কী আর করা? মা যে চাইছেন।'

শেষ অবধি অম্বিকাকে রাজি হতেই হলো। মায়ের আদেশ বলে কথা! কাজেই মুকুন্দ দোলুই ছাঁটাই হয়ে গেলো এবং হেতার ধরলো স্বয়ং অম্বিকা চক্রবর্তী। কাটা মুণ্ডুর ষোলআনা তারই প্রাপ্য হলো। একা একা আর কত মাংসই খাওয়া যায়, কাজেই অম্বিকা কুটুম-বাটুম, সখা-স্যাঙ্গাৎদের মধ্যে মাংস বিলোতে লাগলো এন্তার। খেপে কাঁই হয়ে রইলো কাঁটাশর গাঁয়ের মাঝি সম্প্রদায়। কিন্তু মায়ের স্বপ্নাদেশের ফলেই ব্যাপারটা ঘটেছে বলে তারা আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেলো না।

মানুষের লোভ প্রায় রবারের ফিতের মতো, টানলে কেবল বেড়েই যায়। বলি দিতে দিতে অম্বিকা চক্রবর্তী লক্ষ করে, কাটা মুণ্ডুর সঙ্গে পাঁঠার ঘাড়ের যতটুকু অংশ চলে আসে, সেটা নিতান্তই কম। ধীরে ধীরে ঘাড়ের বেশি অংশ কাটা মুণ্ডের দিকে রাখবার উদ্দেশ্যে সে হরেক কসরত করতে লাগলো এবং একদিন কাঁটাশরের মৃত্যুঞ্জয় সেনাপতির মানসিক পাঁঠাটিকে কাটতে গিয়ে ঘাড়ের একেবারে ধার ঘেঁসে এমন কোপ বসালো যে কাটা মুণ্ডুর সঙ্গে পাঁঠার সামনের দু'খানি পা-ও বেমালুম চলে এলো। পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এলো বাইরে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। এমনিতে তো

অম্বিকার ওপর কাঁটাশরের মাঝিদের পুরনো রাগখানা ছিলোই, এবার যেন আগুনে ঘি পড়লো। শুরু হলো কলহ, মারামারি, দু'গাঁয়ের মানুষেরই মাথা ফাটলো। শেষ মুহূর্তে প্রেমময়ই বহু কষ্টে থামিয়েছিলেন দু'পক্ষকে। কিন্তু তারপর থেকে কাঁটাশরের মানুষ চামুণ্ডাকালীর থানে মানতও করে না, পূজাও দেয় না, দু'গাঁয়ের মধ্যে কথাবার্তা, মুখ দেখাদেখি বন্ধ এবং আজ অবধি বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়ে না।

চাপা রোষ যা তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছিলো, অগ্রেশ গাঁয়ে ফিরে আসার পরপরই তা দাউদাউ করে জ্বলবার উপলক্ষ্য পেয়ে গেলো। কারণ, অগ্রেশ গাঁয়ে ফেরার সাত দিনের মধ্যেই কাঠের পুলেব গায়ে একাধিক পোস্টাব পড়লো :

ঠাকুরচক,
চুরির টাকায বড়লক।

ছড়াটি দেখতে দেখতে চৈত্রের আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো চারপাশের গাঁয়ের মানুষজনের মুখে মুখে। বিশেষ করে, কাঁটাশর গাঁযের বাসিন্দারা বড়ই মজা পেয়ে গেলো। এমন মজাদার ছড়া পেয়ে কাঁটাশর গাঁয়ের ছেলে-ছোকরার দল যেন বহুদিন বাদে বর্ষার জল পাওয়া মাছ! তারা হাটে-ঘাটে-মাঠে চেঁচিযে-ফাটিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলো সেই ছড়া। এমনকি একদল ছোকরা খোল-করতাল সহযোগে কাঠের পুলের ওধারে দাঁড়িয়ে সুর দিয়ে তারস্বরে গাইতে লাগলো ছড়াটিকে, ঠিক গানের মতো করে। ফলে, সামান্য দিনেই দু'লাইনের ছড়াটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সবাই ভেবেছিলো এবার বুঝি রক্তারক্তি আর ঠেকানো যাবে না। কিন্তু খুব বিস্ময়করভাবে একেবারে গুম মেরে গেল ঠাকুরচকের মানুষ। আসলে ব্যাপারটা এমনই ডেলিকেট, ঐ নিয়ে বেশি হৈ-চৈ বাধালে নিজেদের কেলেঙ্কারির কথাই প্রকাশ পাবে, এই কারণেই এই মৌনতা। ছ্যারকা গুয়ে লাঠি আছড়ালে তো নিজেদের মুখেই এসে পড়বে। চুপ মেরে গেল বটে, কিন্তু সবাইয়ের বিশ্বাস হলো যে, এহেন কাজের পেছনে অগ্রেশের হাত অবশ্যই রয়েছে। কারণ, কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর ঠাকুরচকের চেযে কাঁটশরের মানুষের সঙ্গেই তার দহরম-মহরমটা বেড়েছে।

ঠাকুরচকের মানুষ এমন কাছিমের মতো মুখ গুটিয়ে বসে থাকায় কাঁটাশরের ছোকরাদের চিল্লানিটা অনেক গুণ বেড়ে গেলো। কাঁহাতক আর একতরফা শোনা যায় এহেন অপমানকর কথাবার্তা, ফলে ঠাকুরচকের ছোকরারাও পাল্টা ছড়া লিখে টাঙিয়ে দিল কাঠের পুলে :

হাভাতিয়া কাঁটাশর
পেটের জ্বালায় নিশাচর।

শুধু টাঙিয়ে দেওয়া নয়, ওরাও খোল-কত্তালযোগে ছড়াটিকে সুর বেঁধে গাইতে লাগলো কাঠের পুলের এ-পাড়ে দাঁড়িয়ে।

জোঁকের মুখে বুঝি নুন পড়লো এবার। কাঁটাশর গাঁয়ের দাপাদাপি ক্রমশ বন্ধ হয়ে এলো।

৫.

মাসটাক অজ্ঞাতবাস সেরে একসময় প্রকাশ পেলো অগ্রেশ। একদিনেই জনসমক্ষে

এলো না। কিস্তিতে কিস্তিতে এলো। প্রথমে হপ্তাটাক আসতো রাতের আঁধারে গা লুকিয়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তো। ভোরের আগেই ফের বেপাত্তা হয়ে যেতো। ইতিমধ্যে অম্লেশের বাবা কানাই দাস দেশ-বিচারে জরিমানা দিয়েছে। মানুষের সেই চণ্ডাল রাগও থিতিয়ে এসেছে। চাষের মরসুমও এগিয়ে আসছে। মানুষজন ব্যস্ত হয়ে পড়ছে চাষের কাজে। সাহস পেয়ে অম্লেশ একটু একটু করে গাঁয়ের মধ্যে বসবাস শুরু করলো। তবে বেশিরভাগ সময়েই ঘরের মধ্যে থাকতো।

ক্রমে ক্রমে সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গো দেখা-সাক্ষাৎ বাড়তে লাগলো তার। তাদের সুমুখেই অম্লেশ ফের হুমকি দিলো, অম্বিকা চক্রবর্তীর দেবোত্তর সম্পত্তি চাষ করাটা দেখাচ্ছি এবার। প্রেমময় স্যার তো আজ দু'যুগ লড়াই করিয়াও কিচ্ছু করতে পারলো নি। এবার আমি কী করি, দ্যাখ।

দেবোত্তর জমির দখল নিয়ে অম্বিকা চক্রবর্তীর ওপর প্রেমময়দেরও বহুদিনের রাগ রয়েছে। চামুণ্ডা কালীর নামে প্রায় পঞ্চাশ বিঘের ধানীজমি। এককালে গাঁয়ের দশ-বারোজন গরিব মানুষ বর্গায় চাষ করতো। বছর পাঁচ-ছয় হলো, অম্বিকা একাই চাষ করে। ধান তোলে নিজের খামারে। অনেকদিন ধরেই জমিগুলো নিজ হাতে চাষ করবার তালে ছিল অম্বিকা। প্রেমময়ের কাছেও গোপনে দরবার করেছিলো ঐ নিয়ে। প্রেমময় এবং পার্টির অন্যরা কিছুতেই এমন প্রস্তাবে রাজি হয়নি। বলেছিল, সেটা হয় না, চক্রবর্তী। দশ-বারো জনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লিয়া একজনের গলায় ঢালতে পারি না আমরা।

বেশ কিছু দিন গুম মেরে বসেছিল অম্বিকা। একদিন আচমকা মায়ের স্বপ্নাদেশ পেলো সে।

মা বললেন, অম্বিকা রে, আমি যে বহুৎ দিন উপাসী আছি।

অম্বিকা বলে, কেন মা? এখন তো নিজহাতেই পাঁঠাবলি দিয়া উচ্ছর্গ কচ্ছি তুমায়।

মা খেপে গিয়ে বললেন, মাংস কী দিয়া খাব? তরা কি শুধু শুধু মাংস খাউ? ভাত লাগে না?

অম্বিকা বলে, সে কী মা! পঞ্চাশ বিঘা জমিনের ধান, তুমি একলা খাও।

'থোঃ-থোঃ' মায়ের মুখ ঘেন্নায় বেঁকে যায়, খাবো কি? ধোবায় চাষ করে জমিন, পরমান্নে আমি সেদ্ধ কাপড়ের গন্ধ পাই। জেলে চাষ করে জমিন, ভাতে কী আঁশটিয়া গন্ধ! নাপিত চাষ করে জমিন, খিচুড়িতে প্রায়ই নখ আর চুলের টুকরা পাই। শুঁড়ি চাষ করে জমিন, সাদা অন্নে মদের গন্ধ!

অম্বিকা দু'হাত জড়ো করে বলে, কিন্তু মা-গো, অরাও তো তুমারই সন্তান। অরা গরিব লোক, তাই জমিনটুকু চাষ না করলে অরা খাবে কী?

দু'চোখ সহসা রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে মায়ের। প্রচণ্ড রোষে কাঁপতে থাকেন তিনি। বলেন, ঠিক আছে। তবে অরাই খাউ। আমি উপাসে থাকি।

চামুণ্ডাকালীর খাণ্ডার রোষ দেখে ততক্ষণে ভয়ে অম্বিকার প্রাণখানি উড়ে গেছে। ঠকঠকিয়ে কাঁপতে থাকে সে। বলে, মা গো, সন্তানের উপর বিরূপ হয়ো নি।

'চুপ কর্!' অম্বিকাকে থামিয়ে দিয়ে ঝামরে ওঠেন চামুণ্ডাকালী, 'যে সন্তান তার মাকে উপাসী রাখে সে আবার সন্তান! ঝাঁটা মারি অমন সন্তানের পিঠে।' বলেই চামুণ্ডা কালী অম্বিকার পিঠে ঝাঁটা দিয়ে পরপর তিনবার মারলেন। দেশস্থ সব্বাইকে ঘটনাটা বলতে বলতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে অম্বিকা। ঝাঁ করে গেঞ্জিটা খুলে ফেলে। খোলা পিঠখানা উপস্থিত সবাইকে দেখায়, 'দ্যাখ সবাই, এখনও পিঠে ঝাঁটার দাগ লাগিয়া রইছে।'

সমবেত সবাই সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে, অম্বিকার পিঠে অসংখ্য সরু সরু দাগ। মেদবহুল মানুষ মাদুরের ওপর শুলে পিঠে যেমন দাগ পড়ে, ঠিক তেমনই দাগে ভরে গেছে অম্বিকার পিঠ। দেখতে দেখতে গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে সবাইয়ের, বলে, তা'পর, তা'পর?

অম্বিকা ফের শুরু করে স্বপ্নটা।

বলে, মা-গো, অরাও যে তুমারই সন্তান।

মা বলেন, সন্তান তো বটেই, তবে কিনা পূর্বজন্মের পাপে অরা ধোপা, নাপিত, শুঁড়ি, জেলের ঘরে জন্ম লিয়েছে। এই জন্মেই যদি অরা আমার সেবার অধিকার পায়া যায়, তাইলে আর বামুন হইতে চাইবে ক্যানে মানুষ? মুড়ি-মিশ্রি সব এক হয়্যাবে যে।

অম্বিকা বলে, তাইলে তুমার কী হুকুম, মা?

মা বলেন, 'এবার থেকে তুই নিজে চাষ করিয়া খাবাবি আমাকে। লচেৎ এই মরসুমেই আমি অন্য কুথাও চলিয়াবো।'

অম্বিকা বলে, 'টুকচার সময় দাও মা। দেশস্থ পঞ্চজনাকে শুধাই, তারা কী বলে—'

দেশস্থ পঞ্চজনার তখন তো স-মে-মি-রা অবস্থা। ভয়ে কাঁটা হয়ে আসছে শরীর। মায়ের কোপে পড়ে আবার কী-না-কী অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ কেউ ধমকে ওঠে অম্বিকাকে, 'তুমি আবার টাইম লিতে গেলে ক্যানে হে? আচ্ছা বুদ্দু তো তুমি! মায়ের অতো কথার পরও ফের টাইম নিলে? তুমিই গাঁ-টাকে ডুবাবে দেখি!'

প্রেমময়দের কানে আসতেই একেবারে খেপে উঠেছিলেন ওঁরা। এটা যে গরিবগুলোকে উচ্ছেদ করবার একটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা গ্রামবাসীকে বোঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

শুনে গ্রামের লোক তো খেপে ফায়ার। প্রেমময়কে এই মারে তো সেই মারে। বলে, চক্রান্ত! তরা ত সবকিছোতেই চক্রান্ত দেখু। শেষমেষ মা যদি খেপিয়া-টেপিয়া যান, তার দায় কি তরা লিবি?

তাও প্রেমময় অনেক করেছিলেন। গরিব মানুষগুলোকে উচ্ছেদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো তিনি। কিন্তু সফল হননি কিছুতেই। শেষ অবধি তো বর্গাদাররা নিজেরাই সরে দাঁড়ালো। জোর করে

জমি চাষ করতে গিয়ে মায়ের কোপানলে পড়তে চায়নি ওরা। ফলে, পঞ্চাশ বিঘে জমি রাতারাতি চলে গেছে অম্বিকা চক্রবর্তীর হাতে। সে-ই চাষ করায়, ধান তোলে নিজের খামারে। বর্গাদার হিসেবে নিজের ভাগ আগেভাগেই নিয়ে নেয়। মায়ের অংশের ধান সাদা অন্ন, পরমান্ন, খেচরান্ন রূপে মায়ের প্রসাদ হয়ে যাওয়ার পর ওরই ভোগে লাগে।

প্রেমময়ের আক্ষেপের সীমা-পরিসীমা নেই। পঞ্চাশ বিঘে ধানী জমি, দু'বিঘা করে বর্গায় দিলে পঁচিশটা গরিব পরিবার বেঁচে যেতো। কিন্তু এমনই ধর্মের চাকায় বাঁধা সে জমি, প্রেমময়দের কোনও ক্ষমতাই নেই অম্বিকার হাত থেকে কেড়ে নেয়। সারা গ্রামই বিরুদ্ধে চলে যাবে।

অম্লেশ বলে, প্রেময় স্যার তো হার মানলো, এবার আমার খেল্‌টা দ্যাখ।

দিন কয় বাদে মন্দিরের সামনের বেলতলায় পোষ্টার পড়লো ঃ

এত জমির ধান খায় একলা ঠাকুর
এর চেয়ে পোষা ভাল বিলাতি কুকুর।

পোস্টারখানা দেখে গাঁয়ের মানুষ নির্বাক হয়ে যায়। মুখ দিয়ে রা বেরোয় না কারো। মা চামুণ্ডা নাকি বিলাতি কুকুরের চেয়েও অধম! কী দুঃসাহস! কী মহাপাপ!

'ধর্‌ শালাকে।' উন্মত্তের মতো নেচে ওঠে ঠাকুরচকের মানুষ, 'শালাকে আজ মায়ের সুমুখে বলি দুবো।'

'শুধু অকেই নয়।' জনতার মধ্যে কেউ কেউ রায় দিয়ে বসে, 'গাঁয়ের সবগুলা নাস্তিককে ধরিয়া আনিয়া টাঙ্গিয়া দাও বেলগাছের ডালে। শালারা বড্ড বাড়িয়া গেছে।'

শয়ে শয়ে মানুষ অম্লেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড় মারে। কিন্তু পাখি ততক্ষণে ভাগল্‌বা। কানাই দাসকে টেনে হিঁচড়ে বের করা হয়। দু-চারখানা লাঠির ঘা পড়ে যায় ওর পিঠে, কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও অম্লেশকে পাওয়া যায় না কোথাও।

এমনি সময়ে কে যেন খবর দেয়, অম্লেশকে কাঠের পুল পেরিয়ে কাঁটাশর গাঁয়ের দিকে দৌড়ে পালাতে দেখেছে। কাঠের পুলটি পেরিয়েই নাকি সে সংবাদদাতার উদ্দেশ্যে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, এবার তরা আমার ছিঁড়বি।

সঙ্গে সঙ্গে জনতার গতি ঘুরে যায় কাঁটাশরের দিকে। লাঠি-সড়কি সহযোগে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ পাগলের মতো দৌড়তে থাকে।

খবরটা যখন প্রেমময়ের কানে এসে পৌঁছায়, ততক্ষণে আলোচালের মাঠে রক্তগঙ্গা বইতে শুরু করেছে। চলেছে দু'গাঁয়ের মানুষের মুখোমুখি মরণপণ লড়াই।

অমৃতের ছেলেমেয়ে

লাক্সারি বাসটা চন্দ্রকোনা রোড পেরিয়ে গেল ঝাঁ ঝাঁ আওয়াজ তুলে।

রিক্তা মৃদু গলায় বললো, 'এই, জানলাটা একটুখানি খুলে দাও না। দম আটকে আসছে।'

পুরু গদিতে গা' এলিয়ে বসেছিল বিত্রজিৎ। রিক্তার কথায় বিব্রত বোধ করে। শীতের রাত। বাস ছুটছে ঝড়ের বেগে। দু'পাশের ধু-ধু মাঠ আর জংগলবাসী উদোম বুনো হাওয়ার দল হা-হা রবে ছুটে আসছে। উন্মত্ত আক্রোশে ধাক্কা মারছে কাচের শার্সিতে। ঢুকতে চাইছে ভেতরে। বিত্রজিৎ জানে, জানলা খোলা মাত্রই হিংস্র নখদাঁত নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রথমেই রিক্তার ওপর। ঠাণ্ডাটা রিক্তার একদমই সয় না। অল্পেতেই বুকে কফ জমে। বিত্রজিৎ একটু দোনামনা করছিল।

এমনি সময় রিক্তা বেশ বিপন্ন গলায় ফের বললো, 'একটুক্ষণের জন্য খুলে দাও না গো।'

রিক্তার গলায় অস্থিরতা ছিল। আকুতি। বিত্রজিৎ জানে, অল্প গুমোটে রিক্তার দম আটকে আসে।

ভীষণ বিপন্ন বোধ করে বিত্রজিৎ। রিক্তার জন্য। চারপাশে ক্রুদ্ধ চোখে চায়। একটা অচেনা রাগ রি-রি করে চড়ে বসে মাথায়। ঘুষিতে ওদের নাকগুলো ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে। মনের মধ্যে রাগটাকে বহুকষ্টে ঘুম পাড়ায় বিত্রজিৎ।

রিক্তাকে বলে, 'তুমি চাদর দিয়ে ভালো করে ঢেকে বসো। আমি অল্পক্ষণের জন্য জানলাটা খুলে দিচ্ছি।'

বিত্রজিৎ এক ঝটকায় জানলাটা খুলে দিলো। একরাশ কনকনে হাওয়া তীরের ফলার মতো মুহূর্তে ঢুকে গেল বাসের মধ্যে। রিক্তা একটা আরামসূচক শব্দ করলো। হাঁ করে দম নিতে লাগলো সে।

পেছন থেকে নীল সোয়েটার পরা ছোকরাটি খেঁকিয়ে উঠলো, 'আবার জানলা খুললেন কেন? কী বিপদ!'

বিত্রজিৎ আড়চোখে দেখলো ছোকরাকে। জনা চার-পাঁচ একসাথে উঠেছে। ঠিক পেছনের দুটো কোচে চলেছে এরা। কথায়বার্তায় জানা গেছে এই ছোকরাটির নাম ঝংকার। বড় জ্বালাচ্ছে তখন থেকে। চিৎকার চেঁচামেচি আর চটুল কথায় কানপাতা দায়। আর সিগারেট খাচ্ছে অজস্র। বাসে উঠেই সেই যে শুরু করেছে, একটার পর

একটা চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। বাসের অধিকাংশ পুরুষ যাত্রীই সিগারেট খাচ্ছে। কিন্তু এদের মতো অতো ঘনঘন নয়। ভেতরের বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। বাসময় একটা নীলাভ আস্তরণ ভাসছে। একটা উগ্র কটু গন্ধ। চোখ জ্বলছে।

বিত্রজিতের ইচ্ছে করছিল ছোকরার গালে কষে এক থাপ্পড় লাগায়। তার বদলে যথাসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'জানলা তো আপনাদের জন্যই খুলতে হচ্ছে। যা সিগারেট খাচ্ছেন তখন থেকে।'

'টুরিস্ট বাসে সব্বাই সিগারেট খায় দাদা।' ঝংকারের পেছনের সিট থেকে ভেসে আসে কথাগুলো।

'এ—তো আর নার্সারি স্কুলের বাস নয়।' ঝংকারের গলায় তরল শ্লেষ।

অযথা বাগবিতণ্ডায় না গিয়ে জানলাটা ফের বন্ধ করে দিল বিত্রজিৎ। ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রবহমান স্রোতখানা আচমকা বন্ধ হয়ে যেতেই বাসের ভেতরের অস্বস্তিকর গুমোটটা আবার গ্রাস করতে লাগলো ওদের।

রিক্তা সারামুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললো, 'এর জন্যেই বাস জার্নি আমার ভাল্লাগে না। মাথা ধরে গেল।'

বিত্রজিৎ অস্বস্তিবোধ করে। রিক্তা তো প্রথম থেকেই আপত্তি করেছিল। 'ওরে বাবা, বাসে অতোটা পথ? আমি নেই।' বিত্রজিতই ওকে নানান যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিল। খুব সুন্দর বাস। নতুন। ঝকঝকে। লাক্সারি কোচ। এ তো আর লাইনের ঝরঝরে বাস নয়। তাছাড়া শীতকালে বাসজার্নি করে অতো কষ্ট হয় না। গুমোট নেই। ঘাম নেই।

স্ট্যাণ্ডে বাসটাকে প্রথম দেখেই রিক্তার দু'চোখে খুশির ঝলক। সত্যি, বাসখানা ভারি সুন্দর। ভেতরে ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে যায়! ঠিক যেন ছবিতে দেখা এরোপ্লেনের ভেতরটা। রুপোলি মেঝে। আকাশি নীল রঙের দেওয়ালে ম্যাচ করা বাহারী পর্দা। সবকিছু ঝকঝকে তকতকে। ছবির মতো।

জানলার দিকে রিক্তাকে বসিয়ে পাশে বসেছিল বিত্রজিৎ। একটা মৃদু সুগন্ধ পাচ্ছে। গোটা বাস জুড়ে গন্ধটা ভাসছে। বিত্রজিৎ গন্ধটার উৎস সন্ধানে এদিক ওদিক তাকালো। ড্রাইভারের সিটের সামনে ধূপ জ্বলছে। স্বপ্নের মতো ধোঁওয়া ভাসছে হাওয়ায়। বিত্রজিৎ নাক ভরে নিঃশ্বাস নিল। বাস তখনো ছাড়েনি।

বিয়ের পর কোথাও বেরোনো হয়নি। রিক্তা বারকয়েক তাড়া দিয়ে থিতিয়ে গ্যাছে। ইদানিং বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গ উঠলেই ওর মুখে অভিমানের মেঘ জমতো ঘন হয়ে। বেড়াতে যেতে কার না ইচ্ছে করে! কিন্তু আজকের দিনে বেড়াতে যাবার ঝক্কি কম নয়। ছুটি পাওয়া। দৌড়ঝাঁপ করে টিকিট কাটা। রিজার্ভেশন। হোটেল বুকিং। বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধা-ছাঁদা। বড়ই হয়রানি ব্যাপার। তার ওপর পথের সব উটকো বিপদ। ছিনতাই, মাস্তানি, চাঁদা, অ্যাক্সিডেন্ট। টুরিস্টপ্লেসের হোটেলগুলোও আজকাল আর আগের মতো নিরাপদ নয়। ঘোরাঘুরি জায়গাগুলোতেও ঝোপেঝাড়ে ওঁৎ পেতে থাকে কতো রকমের বিপদ। সামান্য আনন্দের বিনিময়ে বড় বেশি উৎকণ্ঠা। পাল্কির ভাড়া মেটাতে বৌটাই বিকিয়ে যায়। পোষায় না। আচমকা এই টুরিস্টবাসের খবরটা বিত্রজিতের কানে এসেছিল। লাক্সারিবাস, যাত্রী নিয়ে পুরী যাবে। থাকা খাওয়ার

বন্দোবস্ত ওরাই করবে। থোক টাকা গুণে দিলেই নিশ্চিন্তি। সাতপাঁচ ভেবে দু'খানা টিকিট কিনে ফেলেছিল বিত্রজিৎ।

বিয়ের পর দু'জনে এক সঙ্গে বেড়ানো বলতে গেলে এই প্রথম। তাই ভেবে বিত্রজিৎ একটু উত্তেজিত বোধ করছিল মনে মনে।

বাসে বসে রিক্তা খুব খুশি। বললো, 'আজ ঘুমোবো না সারা রাত।'

রিক্তার আনন্দটা বিত্রজিতের মধ্যেও সংক্রামিত হ'ল তৎক্ষণাৎ। জীবনের এ এক চিরকেলে সাধ। এমনি এক স্বপ্নের বাসে ভ্রমণ করবে গভীর রাতে। শন্‌শন্‌ বইবে হাওয়া। দ্রুত পিছিলে যাবে রাস্তাঘাট, মাঠ-বন, চেনা পৃথিবীর চালচিত্র। একসময় স্বপ্নের আলো-আঁধারির মধ্যে চোখের সামনে এক সীমাহীন ফেনায়িত সমুদ্র! তার বুকে অবিরাম ঢেউ। যেন অজস্র সাদা গাভীর পাল! আর, এক আশ্চর্য গুরুগুরু আওয়াজ. এ এক চিরন্তন স্বপ্ন। মানুষের।

এই বাসে আরও পাঁচ-ছটি তরুণ দম্পতি চলেছে। তাদের তিন-চারজনের বাচ্চাও আছে সাথে। দুর্গাপুর স্ট্যাণ্ডেই সহযাত্রীদের একটা ছোট্ট জরীপ করে নিয়েছে বিত্রিজিৎ। খুব ফরসা একটি মেয়ে গায়ে অনেক গয়না পরে দাঁড়িয়েছিল একট ফুটফুটে বাচ্চাকে বুকে চেপে। তার গায়ে ছিল গাঢ় কমলা রঙের কার্ডিগান। তার সুদর্শন স্বামী পায়চারী করছিল পাশে। ওরা বোধ করি চার-পাঁচটা সীট পেছনে বসেছে। মধ্যবয়স্ক কিছু লোক একসাথে চলেছে। এক অফিসের বোধ হয়। বিত্রজিতদের ঠিক পেছনে রয়েছে ঝংকারের দল।

কিছু মানুষ বাস ছাড়বার আধ ঘন্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে কাদা। এখন বোধ করি তাদের মধ্যরাত।

আধঘন্টার মধ্যেই স্বপ্নিল পরিবেশটা ভাঙতে শুরু করেছিল। বিত্রজিতের পেছনে বসেই ঝংকারের দল হেঁড়ে গলায় গান ধরেছিল। তাদের সমবেত চিৎকার বাসের মসৃণ দেওয়ালগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানছিলো।

সুন্দর নিরিবিলি এক মায়াময় পরিবেশকে খামোখা শব্দের ঘা মেরে মেরে টুকরো করে কি যে সুখ পায় এরা! কেন যে কলরবের আবর্জনায় ভরিয়ে তোলে নির্জনতার পবিত্র বুক!

বাসের সমস্ত জানলা বন্ধ করে অধিকাংশ মানুষ সিগারেট ধরিয়েছিল। ধীরে ধীরে ধূপের গন্ধটা উবে গিয়েছে কখন। তার বদলে এক তীব্র কটু গন্ধে ভরে গেছে সারা বাসের বুক।

তখন থেকে উসখুশ করতে শুরু করেছে রিক্তা। একটুবাদে নিচু গলায় বললো, 'আশ্চর্য! একবাস মানুষ সারারাত নিঃশ্বাস নেবে। বাচ্চারা রয়েছে। একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

সামনে একটা ঢাউস প্লেট। তাতে গাঢ় লাল অক্ষরে লেখা, নো স্মোকিং। রিক্তা ইঙ্গিতে ওটা দেখালো বিত্রজিতকে।

বললো, 'তুলে দিলেই পারে।'

রিক্তার পুঞ্জীভূত ক্ষোভটা গায়ে না মাখবার চেষ্টা করলো বিত্রজিৎ। এদেশে কোনটা আর নিয়ম ধরে চলে! আইন-কানুন-নিয়ম সব নিজের জায়গায় থাকে। মানুষ তাদের সুবিধে মতো বানিয়ে নেয় আইন। নোটিশগুলো ঝুলে ঝুলে প্রাঙ্গণের শোভাবর্ধন করে। মানুষ তার পাশেই ঝুলিয়ে দেয় আরও এক অদৃশ্য নোটিশ। সেইভাবেই চলে তারা।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ বিষ্ণুপুরে পৌঁছুলো বাস। সবাই নাবলো। রিক্তার মাথাটা দপদপ করছিল। বিত্রজিৎ ওকে নাবিযে নিয়ে গেল বাইরে। মুখেচোখে জলের ঝাপটা নিলো রিক্তা। কড়া চা খেলো।

বললো, 'এমনি করে বন্ধ বাসে ধোঁওযার মধ্যে কী করে যে যাবো সারাটা রাত!'

বিত্রজিতের মুখেও সংশয়ের ছায়া। তাও বলে, 'ভেবো না। একটুবাদেই ঢুলতে থাকবে সব। প্রথম দু'এক ঘন্টা ছট্‌ফটানি।'

বিষ্ণুপুরে জনা বিশেক লোক উঠলো মালপত্তর সহ। প্যাসেজে দাঁড়ালো ওরা। মালপত্র রাখলো। বিত্রজিৎ বাসে উঠে দেখলো, গিজগিজ করছে মানুষ। পা ফেলবার উপায় নেই।

ভুরু কুঁচকে বললো, 'এ কী! টুরিস্ট বাসে এরা কেন?'

কেউ ওর প্রশ্নের জবাব দিলো না। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামালো না কেউই। কেবল প্যাসেঞ্জারদের কেউ কেউ বিজাতীয় চোখে তাকালো ওর দিকে।

ঝংকারের দল হৈ হৈ করে উঠে পড়লো বাসে। মাঝ বয়েসি দলটিও উঠলো।

ওদের মধ্যে থেকেই একজন 'চোখে-মুখে' গাছের, পান চিবোচ্ছিল ভস্‌ভস্‌ করে। হাতের ধরা ছিল চুনসহ পানের বোঁটা। মুখে জমে থাকা পানের পিক সামলে বললো, টুরিস্ট বাসেও স্ট্যান্ডিং বাওয়া?

'দেখেছেন?' বিত্রজিৎ যেন সহসা একজন সহযোদ্ধা পেলো। বললো 'একটু আরামে যাবো বলে ডবল পয়সা দিলাম। এই গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি ভাল্লাগে?'

সহযাত্রীটি সবজান্তা হাসি হাসেন। বলেন, মালিক তো বাসে যাচ্ছে না। এই ফাঁকে দুটো বাড়তি পয়সা কামিয়ে নেবার মতলব আর কী!' বলেই পরম নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বসে পড়েন তিনি। বিত্রজিৎ স্থাণুর মতো বসে থাকে।

বাস ঝড়ের গতিতে ছুটছে। খুলে দেওয়া জানলাগুলো বন্ধ হয়ে গেল ঝটপট। আবার নিশ্ছিদ্র হয়ে গেল সারা বাস।

একটা করে সিগারেট ধরিয়েছে সবাই। সাহস পেয়ে প্যাসেজে দাঁড়ানো লোকগুলিও বিড়ি-সিগারেট ধরালো। নীল ধোঁওয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ভাসতে লাগলো সারা বাসের আকাশে। অন্ধকার নেবে এসেছে চারপাশে। দু'ধারে ন্যাড়া ন্যাড়া মাঠগুলো নিঃশব্দে আঁধার গিলছে। গাছগুলো দাঁড়িযে রয়েছে কালিঝুলি মেখে মুখে।

রিত্তার খুশি খুশি ভাবখানা পাখনা মেলে উধাও কখন। এখন তারও চোখে মুখে বিরক্তি। বিবমিষা।

একসময় রিত্তা মাথাটা এলিয়ে দেয় বিত্রজিতের গায়ে। বিত্রজিৎ শঙ্কিত হয়ে তাকায়।

'খারাপ লাগছে?'

চোখ বুঁজে ছিল রিত্তা। জবাব দেয় না। বিত্রজিৎ পেছনের ছোকরাদের কটু-কাটব্যকে পাত্তা না দিয়ে একটুক্ষণের জন্য খুলে দেয় জানলা।

আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে জনপথ। রাস্তায় লোক চলাচল কমছে। দূরে দূবে কালো তাঁবুর মতো গাঁ'গুলোতে আলো জ্বলছে মিটিমিটি। একটা লম্বা কাঠের ব্রিজের ওপর দিয়ে ঝমাঝম্ আওয়াজ তুলে পেরিয়ে গেল বাসটা।

জানালাটা নাবিয়ে দিলো বিত্রজিৎ।

বাস থামলো মেদিনীপুরে। রাত তখন আন্দাজ ন'টা। প্যাসেজের যাত্রীরা নেবে গেল। বাসের টুরিস্ট যাত্রীরাও নেমে গেল। রাতের খাওযা সেরে নিতে হবে এখানেই।

বাস থেকে নাবতে গিয়ে মেঝের দিকে নজর পড়লো বিত্রজিতের। সারা শরীব গুলিয়ে উঠলো তার। যে ঝকঝকে রুপোলি মেঝেখানা সে দেখেছিল বাসে উঠবার সময়, এখন তার তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই! সিগারেটের টুকরো, ছাই, দেশলাইয়ের পোড়াকাঠি, সিগারেটের খালি প্যাকেট, ঠোঙা, বাদাম আব কমলার খোসা, আরও অনেক কিছু চিবড়ে-ছোবড়ায় থিকথিক করছে বাসের মেঝে। কারো ওয়াটার বটল লিক করেছে বুঝি। জল গড়িয়ে পড়েছে বাসময়। তার ওপর হাঁটাহাঁটি করছে মানুষ। এখন কাদায়, জলে, জঞ্জালে মেঝেটাকে আর চেনা যায় না।

দেখতে দেখতে এক ধরনের চাপা বিষণ্ণতা যেন তিলতিল ছেয়ে ফেললো বিত্রজিতকে। বাসটা তার একার নয়। সে নিছক শতখানেক যাত্রীর একজন। তবুও তার একারই যেন কান্না পেতে লাগালো বাসটার দুরবস্থা দেখে। একটা সুন্দর ছবির মতো বাস, এই অল্পক্ষণের মধ্যে তার কী হাল করলো এই মানুষগুলো! অথচ পুরো রাতটাই ওদের কাটাতে হবে এই বাসে। দু'দিন এই বাসে চড়ে ঘুরতে হবে। ফিরে আসতেও হবে এই বাসে চড়ে।

বাস ছাড়বার মুখে জনা বিশ-পঁচিশ যাত্রী মালপত্তর নিয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠলো। বোঁচকাবুঁচকি নাবিয়ে রেখে দাঁড়ালো ঠেলাঠেলি করে। প্যাসেজটাতে আর তিল ধারণের ঠাঁই রইলো না।

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। রাস্তা এখন ফাঁকা। সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলেছে বাইরের হাওয়া। বাস ছুটছে ঝড়ের বেগে।

ভেতরে সিগারেট খাওয়া ক্রমশ বাড়ছে। বাসের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিকষ অন্ধকারে বাসের মধ্যে এখন কয়েক ডজন জ্বলন্ত চোখ। পায়ের তলায় প্যাচপ্যাচে কাদা আর জঞ্জাল। মাথায় ওপর একতাল জমাট বিষাক্ত বন্ধ হাওয়া।

চারপাশে উৎকট গরম। উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে, বমি আসে। বুকের মধ্যে আইঢাই করে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালো বিত্রজিৎ। অন্ধকারের মধ্যে বাসের সব্বাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমার একটা নিবেদন ছিল। এইটুকু জায়গার মধ্যে আমরা বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছি প্রায় শতখানেক মানুষ। তার মধ্যে অন্তত জনা সত্তর ক্রমাগত বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছেন। বাসের দরজা-জানলা বন্ধ। ভেবে দেখুন, বাসের মধ্যে রয়েছেন বৃদ্ধ, মহিলা ও বাচ্চারা। হাঁপানী-রোগীও থাকতে পারেন। সুস্থ মানুষেরও এমন পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়বার কথা। অনুরোধ, দয়া করে কম সিগারেট খান এবং মাঝে মাঝে এক আধ মিনিটের জন্য খুলে দিন জানলা।'

বিত্রজিৎ থামে। সারা বাস একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। গোটা দুয়েক চাপা হাসির আওয়াজ। আলগোছে গলা ঝাড়ে কেউ। কাঁচের চুড়ির অস্পষ্ট টুং-টাং বাজনা।

'দাদা কী পরিবেশ বিজ্ঞানী না কি?' অন্ধকারে পেছন থেকে ভেসে আসে তরল গলা।

'পরিবেশ মন্ত্রীর পদটা এমন লোককে দেওয়া হয় না কেন?'

'এ দেশে কিছুই ঠিকঠাক হয় না।'

'ঠিক বলেছেন, যার হাত আছে, তার ভাত নেই। যার ভাত আছে তার কাজ নেই।'

ঘৃণায় অপমানে রি-রি করে উঠলো বিত্রজিতের সারা মন। তীক্ষ্ণ গলায় বললো, 'ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না? জানেন, সবাইয়ের, এমন কি নিজেদেরও কত ক্ষতি করছেন আপনারা?'

'থামুন মশাই। কী শুরু করলেন মাঝরাতে?' বাসের মাঝখান থেকে কে যেন খেঁকিয়ে উঠলো, 'দিলে ভাতঘুমটা কেঁচিয়ে। সারারাত আর ঘুম এলে হয়। যত্তো সব!'

'ঘুমোন। সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন। তলায় তলায় সর্বনাশ যা হবার হয়ে যাক।' বিত্রজিৎ অক্ষম ক্রোধে গনগনে হয়ে ওঠে।

'বসুন বসুন।' কে একজন ভারি গলায় আদেশের সুরে বলে, 'বাসের মধ্যে সিগারেট খাওয়া নতুন কিছু ব্যাপার নয়। অতো চেঁচামেচির কিছু নেই?'

'দাদা কি এদেশে ছিলেন না? সদ্য এয়েছেন না কি, দাদা?'

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল বিত্রজিৎ। রিক্তা ওকে হাত ধরে বসিয়ে দিলো। চাপা গলায় বললো, 'ছেড়ে দাও। ঝগড়া-ঝাঁটি করে লাভ নেই। সবাই যদি এমনি করে যেতে পারে, আমরাও পারবো।'

ক্লান্ত বিধ্বস্ত বিত্রজিৎ শরীরটা এলিয়ে দিল সীটের পিঠে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল সে। বুকের মধ্যে এক তুমুল মোচড়। মগজে ধিকিধিকি ক্রোধ। গলায় আটকে আসা নিষ্ফলা কান্না।

কান্নাটা অন্য কিছুর জন্য।

বিষাক্ত হাওয়ায় দম আটকে আসার জন্য নয়। মাথা ঝিমঝিম কিংবা গা বমি-বমির জন্যও নয়। মৃত্যুকেও ভয়ে করে না বিত্রজিৎ। শুধু দুঃখ—বুক ভাঙা এক দুঃখ। কতো

স্বল্প সময়ে কতো অনায়াসে ইন্দ্রপুরীর মতো বাসাখানাকে নরকে পরিণত করে ফেললো এরা! ভেঙে চুরমার করে ফেললো এর সমস্ত স্বপ্নিল নির্মাণ! পায়ের নখ দিয়ে বয়ে আনলো জঞ্জাল। আয়নার মতো মেঝেটাকে. কেমন শুয়োরের খোঁয়াড় বানিয়ে ফেললো!

আধো তন্দ্রার মধ্যে ছিল বিত্রজিৎ। তার মধ্যেও গোঙানির আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরে কানে আসছিল। অস্পষ্ট, কিন্তু একঘেঁয়ে সে আওয়াজ।

আচমকা বাসের মাঝখান থেকে মহিলার আর্তকন্ঠ ছিঁড়ে খান্‌খান্‌ করে দিলো বাসের জমাট আস্তরণ।

'এই শুনছো? খোকন অমন গোঙাচ্ছে কেন?'

'সে কী!' তড়াক করে উঠে বসলেন ভদ্রলোক।

'এই দ্যাখো, কেমন খাবি খাচ্ছে।'

মহিলার চিৎকারে জেগে উঠেছে সারা বাস।

'উহ্! কী গরম!'

'কী বিষাক্ত ঝাঁঝালো গন্ধ!'

'আহ্, দম আটকে আসছে।'

'জানলাগুলো খুলে দিন।'

'ওগো, জানলা খোল। মরে গেলাম।'

আচমকা সারা বাস জুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দম নিচ্ছে সবাই। হাঁস-ফাঁস করছে। বাচ্চারা গোঙাচ্ছে।

কান্নার রোল উঠেছে বাসময়। এক সমবেত মরণ আর্তনাদ।

বাসের মধ্যে তিলমাত্র দম নেবার হাওয়া নেই। সারা বাসখানা যেন এক ভাজা তামাক ভর্তি উত্তপ্ত কড়াই।

বিষাক্ত বায়ুভর্তি কাঁচের জারের মধ্যে রাখা একপাল ইঁদুরের মতো লাফ-ঝাঁপ জুড়েছে এক বাস মানুষ। অন্ধকারে ঠেলাঠেলি করে একসাথে যেতে চাইছে জানলার কাছে। জানলার ছিটিকিনি ধরে আনাড়ির মতো ঝাঁকি মারছে সমানে। পাগলের মতো নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়ছে। সমানে মাথা খুঁড়ছে জানলার শার্সিতে।

কিন্তু অমৃতের পুত্রদের নির্মল হাওয়া দিয়ে বাঁচাবার জন্য বাসের একটি জানলাও খুলছে না কিছুতেই।

অতীনের নিজের বাড়ি

১.

তারপর, একদিন অতীনকে আমরা পুরোপুরি হারিয়ে ফেললাম।

সেই আমাদের কথাশিল্পী গায়ক-চিত্রকর-আড্ডাবাজ অতীন, —যার কাছে আমাদের ছিল এমনই এক আকাশপ্রমাণ প্রত্যাশা যে, সে ভবিষ্যতে আর একখানা 'নীলকন্ঠ ...' লিখে সবাইকে চমকে দেবে, কবে যেন একটু একটু করে হারিয়েই গেল। 'একটা কালজয়ী উপন্যাসে হাত দিয়েছি, শেষ হলেই শোনাবো তোদের।' বলেই সেই বছর দেড়েক আগে একটু একটু করে চোখের আড়ালে চলে গেল সে। তারপর ... আমরা তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে, তার জন্য হা-হুতাশ করতে করতে, তার প্রতি ক্রুদ্ধ হতাশ হতে হতে, আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা একদিন আড্ডায় এসে, আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে সে ঘোষণা করলো, উপন্যাসটা শেষ করেছি, কবে শুনবি, বল্ ?

অতীন কোনও স্বেচ্ছানির্বাসনে যায় নি, বরং বলা যায়, আমরাই এককালে ওকে ধরে বেঁধে নির্বাসনের পথ দেখিয়েছিলাম। সঙ্গে কোনও লক্ষ্মণ অবধি দিই নি। কেবল সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে সে তার নির্বাসিত জীবনটাকে বয়ে বেড়াচ্ছিল এতকাল। বড় আশা ছিল আমাদের মনে, নির্দিষ্ট চোদ্দটি বছর পেরোলেই, রামচন্দ্রের মতো, সে ফিরে আসবে অযোধ্যায়, আবার গ্রহণ করবে তার ছেড়ে যাওয়া রাজ্যপাট। কিন্তু ফিরে আসা তো দূরের কথা, কালেভদ্রে দেখা হলে সে চোখেমুখে কপট হতাশা ফুটিয়ে বলতো, হয় না, বুঝলি, এ এমনই এক কাজ, কিছুতেই সময়ে শেষ তো হয়ই না, বরং অনেকেই এমনটা বলেন যে, এই ধরনের কাজ নাকি কখনোই শেষ হয় না। এ নাকি, সর্বার্থে, অ্যা নেভার-এন্ডিং আর্ট। একটি চির-অসমাপ্ত শিল্প। কপট হতাশা এই কারণে বললুম যে, যখন কথাগুলো বলতে থাকতো অতীন, তখন তার সারা মুখমন্ডল থেকে যেন মধু ঝরতো, যা দেখে আমাদের মনে বটের আঠার মতো গাঢ় প্রত্যয় জন্মাতো, পঞ্চবটী বনে না জানি কত সুখেই রয়েছে সে!

আসলে, অতীন ছিল আমাদের সবাইয়ের চেয়ে সবদিক থেকে অন্যরকম। কয়েকটা বাছা বাছা লিটল-ম্যাগাজিনে গল্প-উপান্যাস লিখে ততদিনে বেশ আশা জাগিয়েছে সে, তার ওপর ওর গানের গলাটিও ছিল চমৎকার। ছবিও আঁকতো। একটুখানি বামপন্থী চিন্তাভাবনার মানুষ ছিল অতীন। কথায় কথায় মার্কসবাদের বন্দনা

গাইতো। ঐ নিয়ে আমরা টিপ্পনি কাটলেও গায়ে মাখতো না। আর, কী সুন্দর আড্ডা মারতো, কী মৌলিক ঢংয়ে কথা বলতো! ও যেখানে যতক্ষণ থাকতো, জায়গাটা শৈল্পিক সৌরভে একেবারে ম-ম করতো। কেবল আড্ডায় এসে মুষড়ে থাকতো, গুম মেরে যেত, যেদিন বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝামেলা হতো। একটা-দুটো দিন ওর মনের খুশিটাই হারিয়ে যেত, যেটা আমাদের মতো আড্ডাবাজ বন্ধুদের কাছে ছিল একটা বিরাট লোকসান। বাস্তবিক, অতীনের গোমড়া মুখ আমাদের কাছে একেবারেই অসহ্য ছিল। আর, যে কিনা হরণ করেছে ওর মুখের হাসি, এবং সেই সুবাদে আমাদের সবাইয়ের আনন্দের উৎসমুখটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে যার কালো হাত কাজ করেছে, সেই পাষণ্ড বাড়িওয়ালাকে উচিত শিক্ষা দিতে নিশপিশ করতো মন। বলতাম, একদিন উচিত শিক্ষাটা দিয়ে দেবো নাকি? শালা, গলির মোড়ে, একদিন, রাতের বেলায় যখন বাড়ি ফেরে হাতব্যাগে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে..., শালা, সংস্কৃতির শত্রু...! যদিও সব্বাই জানতুম, ওটা একটা কথার কথা, রাতের বেলায় গলির মোড়ে একজনকে অ্যাট্যাক করবো, সে রুচিও আমাদের কখনোই হবে না, সাহসও নয়, কাজেই পুরো ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অন্য অ্যাঙ্গাল থেকে দেখতে শুরু করেছিলুম আমরা, অতীনের আড্ডার বন্ধুরা যারা সব্বাই ওর ষোলআনা খাঁটি শুভানুধ্যায়ীও বটে। আর, ঐ অন্য অ্যাঙ্গাল থেকে দেখতে গেলেই অতীনের ওপরও খুব রাগ হয়ে যেত আমাদের, কিনা, এত ভালো একটা চাকরি করে, দেশেও নাকি অনেক সম্পত্তি রয়েছে, বেচে দিলে কোলকাতাতেই একজোড়া বাড়ি হয়ে যায়, অথচ সর্বদা একটা চাল-চুলো নেই ভাব, ভাড়াবাড়িতে থাকে ..., বাড়িওয়ালার মুখঝামটা খায় ...। আসলে, গুছিয়ে সংসার না করাটাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে এনে ফেলেছিল অতীন। অতীনের বউ বোধ করি বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। শেষের দিকে আর ঐসব নিয়ে খিটিমিটি করতো না অতীনের সঙ্গে। আমরা উসকে দিতে চাইলেও আর তেমন করে বাজতো না। মুখময় শীতল হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলতো, কাকে দোষ দেবো রজতদা, নিজের কপালকেই দোষ দিই। কারোর থাকে না, কারো বা থাকে কিন্তু পাকে না। আর না পাকলে আপনি খাবেন কী করে?

—মানে?

—মানেটা খুবই সহজ। সম্পদ থাকলেই ভোগ করা যাবে, কে বলেছে আপনাকে? ধনদৌলত থাকবার জন্য কপাল চাই, কিন্তু থাকলেই যে তা ভোগ করা যাবে তারও কোনও মানে নেই, কেন কি, ধনদৌলত ভোগ করাবার জন্যও কপাল চাই। সীতার কথাই ধরুন না। রাজনন্দিনী, রাজবধূ, দৌলত-সম্পদের ইয়ত্তা নেই, কিন্তু বনবাসেই ফল-মূল খেয়ে কাটাতে হলো সারাটা জীবন। আমরা হচ্ছি সীতা ক্ল্যানের মেয়ে।

তারপর থেকেই আমরা অতীনের বউকে সীতা, জানকী ইত্যাদি নামে ডাকতুম। অতীনের বউ হাল ছেড়ে দিলেও আমরা ছাড়ি নে, বরং আরও শক্ত করে ধরি। একটা বাড়ি করবার জন্য অতীনের পেছনে সমানে লেগে থাকি সবাই। ব্যাটা খালি এড়িয়ে যেতে চায়। বেশি চেপে ধরলে বলে, ধুশ, কে যায় অত ঝামেলায়! জমি কেনা,

মিউটেশন, কন্‌ভারশন, প্ল্যান তৈরি করানো, পাশ করানো, তারপর গিয়ে ইট, বালি, সিমেন্ট, মিস্ত্রী জোগাড় করা, ...মেলা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। নরুন পেতে গিয়ে নাকটাই না চলে যায়।

—নরুন! নাক! মানে? কার নাক?

মুচকি হাসে অতীন, সে তোরা বুঝবি নে। গীতার প্রথম অধ্যায়টা পড়লে খানিক বুঝতে পারতিস, কেমন করে নরুনটি পেতে গিয়ে নাকটিই চলে যায়। বলতে বলতে কেমন উদাস হয়ে যায় অতীন। দৃষ্টি ছুঁইয়ে দেয় সুদূর দিগন্তের গায়ে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে আপন মনে, ... কুরুক্ষেত্রের মাঠে কৌরব-পাণ্ডব দুই পক্ষের সৈন্য-সমাবেশ হয়েছে, দু'পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, একসময় অর্জুনের রথ এসে থামলো দু'পক্ষের মধ্যিখানে। অর্জুন দেখলেন, দু'পক্ষের সৈন্যদের মধ্যেই রয়েছেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা। বুঝতে পারলেন, রাজ্য পেতে হলে তাঁকে ঐসব আত্মীয়দের বধ করতে হবে, অর্থাৎ নরুনটি পেতে গিয়ে নাকটি হারাতে হবে। অতীন আমাদের দিকে খুব আবিষ্ট চোখে তাকায়, ...তাছাড়া, সাহিত্য বল্‌ সংস্কৃতি বল, ভালোগোছের একটু-কিছু করবার পক্ষে জীবনটা বড়ই ছোট রে, তারই একটা বড়সড় অংশকে খামোখা ইটকাঠ-পাথরের মধ্যে চাপা দিয়ে লাভ কি!

—শালা, ফিলোজফি মারাচ্ছো! আমরা কষে ধমক লাগাই ওকে, — বাড়িওয়ালা তোর লাইফ হেল করে দিচ্ছে, তোর ভেতরের শিল্পী মনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে ..., একটিবার ভেবে দ্যাখ্‌ তো, বাড়িওয়ালার দাঁত-খিচুনি খেয়ে কতদিন তোর মানসিক শান্তি নষ্ট হয়েছে, লেখালিখি মাথায় উঠেছে। লিখে দিচ্ছি তোকে, ঐ বাড়িতে থাকলে লেখালেখি ডকে উঠবে তোর।

—নিজের বাড়িতে থাকলেই কি শান্তিতে থাকা যায় রে?

—বাহ্‌! নিজের বাড়িতে আর কেই-বা অশান্তি করবে তোর সঙ্গে?

অতীন চোখেমুখে এক দুর্লভ জাতের হাসি ফোটায়। বলে, কপালে থাকিলে বিষ্ঠা, কাগে এনে দেয়, বুঝলি। আসলে, বাড়িওয়ালা নেহাতই উপলক্ষ্য, শান্তিতে থাকা, সেও এক মানসিক ট্রেনিংয়ের ব্যাপার, বাকিটা কপাল। আর, লেখালেখি হবে কি হবে না, সেটা কি বাড়িঘরের ওপর নির্ভর করে রে! ভালো লেখালেখির জন্যও কপাল চাই। নিজের বাড়িতে থাকলেই যদি বেশি লেখা যেত, ভালো লেখা যেত, তাহলে তো মানিক বাঁড়ুজ্যে কিছুই লিখতে পারতেন না। কেন কি তিনিও তো ছিলেন ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা। আর, তাঁর নাকি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কখনো ঝগড়াই হয় নি।

—তবে?

—শুনেছি, তাঁর নাকি যত ঝগড়া, সবই হতো গৃহিনীর সঙ্গে। অত কেন? শিবরাম চক্রবর্তীর কথাই ধর্‌ না। তিনিও তো থাকতেন মেসবাড়িতে। তাঁর আবার গৃহিনীও ছিল না।

—ওসব বাতেলা ছাড়ো। হৈ-হৈ করে উঠি আমরা। ...ওসব শাক দিয়ে মাছ ঢাকা অনেক দেখেছি।

ধীরে ধীরে আমরা ওকে দিয়ে জমিটা কেনালাম। মিউটেশন, কনভারশন করিয়ে প্ল্যান তৈরি করালাম। প্ল্যান পাশও হলো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাড়ির কাজে আর কিছুতেই হাত দেয় না অতীন। খালি একের পর এক গল্প লিখে আমাদের শোনাতে থাকে। আমরা আবার কোমর বেঁধে নামি আসরে। দিনরাত একই কথা তুলে ওর কান ঝালাপালা করে দিই। আমাদের সবাইয়ের পীড়পীড়িতে অবশেষে একদিন ভিতপুজো সেরে বাড়ির কাজটা শুরু করে সে। আমরা সবাই মিলে বাড়ির প্ল্যানটা এমনভাবে বানিয়ে দিই, যাতে করে ঐ বাড়িতে আমাদের জন্য একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আড্ডাঘর থাকে। বলি, বয়েস হচ্ছে তো, না কী? আর কতদিন রকে কিংবা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারবো, বল্!

—হ্যাঁ, ছেলেপুলেরা বড় হচ্ছে, তাদের তো ছেড়ে দিতে হবে জায়গাগুলো। নইলে তারা যে একেবারে রিফ্যুজি হয়ে বেপাড়ায় চলে যাবে।

২.

বাড়িতে হাত দেবার পর সেই যে গেল অতীন, পাক্কা তিনদিন ডুব মারলো, অথচ একবেলা আড্ডা না মারলে তার চলতো না কিছুতেই। একখানা গল্প লিখলেই কিংবা ছবি আঁকলেই তড়িঘড়ি তা নিয়ে আড্ডায় চলে আসতো। সেই অতীন কিনা তিন-তিনটে দিন না বলে কয়ে হাওযা হযে গেল! আমরা সবাই মিলে মহা ভাবনায় পড়ে যাই, অতীনের হলোটা কী? আবার মনেমনে খুশিও হই। কিনা, অ্যাদ্দিন বাদে মাছির পা চিটে-গুড়ে আটকালো তবে! আমরা তো এটাই চাইছিলুম।

চতুর্থ দিনে আচমকা হাজির সে। গলদঘর্ম শরীর। পুরোপুরি বিধবস্ত। সাইকেল থেকে ঝুপ করে নেমে পড়ে বলে, ওহ্, কী ক্যাঁচাকলে ফেললি বল্ দেখি?

—কেন, কী হলো? আমরা মিটিমিটি হাসতে থাকি।

—এ যে প্রাণান্তকর অবস্থা! অতীন পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মোছে, —উহ্, ইট-সিমেন্ট-বালি-চিপস্, মিস্ত্রীদের হাজারো জুলুম..., তার ওপর মোড়ের মস্তান হরিশ দাসের স্বরচিত ক্লাব 'হ্যারিশ-কর্ণার' ...। আর যে পারি নে।

—কেন, হরিশটা আবার করলো কি? একজনকে শীতের সন্ধেয় ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিয়ে মজা দেখবার দুষ্টু হাসি ছলকে উঠতে চায় আমাদের চোখেমুখে।

অতীন বলে, হ্যারিসের মাত্র দুটো ছোট্ট দাবি। একটি ব্যক্তিগত, অন্যটি সমষ্টিগত।

—মানে?

—সে আমার থেকে, কৈকেয়ীর মতো, দুটি বর চায়। এক, তার নিজস্ব গোলা থেকেই ইট-বালি-চিপস-সিমেন্ট ইত্যাদি কিনতে হবে। দুই, তার স্বরচিত ক্লাব হ্যারিশ-কর্ণারকে দশ হাজার টাকা দান করতে হবে। বলতে বলতে প্রবল ঝড়ের মুখে লিকলিকে ডালের মতো দ্রুতগতিতে নড়তে থাকে অতীনের ডানহাত, আমার দ্বারা এ বাড়ি শেষ করা সম্ভব হবে না রে। এ আমার কম্মো নয়। এর মধ্যেই রাতের ঘুম চলে গিয়েছে আমার। হ্যাঁ রে, সাবেক ভিতের বদলে কলাম দিয়ে বাড়ি করলে খরচা কত

বেশি পড়ে বলতে পারিস? রঘুনাথ মিস্ত্রি বলছে ...। হ্যাঁ, আর একটা কথা, দুটো পয়সা বেশি পড়লেও গঙ্গার ধারের ইটই নাকি কেনা উচিত? অন্য ইটে নাকি খুব জলদি নোনা ধরে যায়? সত্যি? বলতে বলতে একসময় আচমকা উঠে দাঁড়ায় অতীন, সাইকেলে লাফ মেরে চড়ে বসে ঘোড়ায় চড়বার ভঙ্গিতে। ইস্, একটা জরুরি কথা মনে পড়ে গেল...। বলতে বলতে পাঁইপাঁই প্যাডেল মেরে হাওয়া হয়ে যায় অতীন। ওর চলে যাবার ধরন দেখে আমরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করি। এ কোনও বাস্তব দৃশ্য কিনা, সংশয় জাগে মনে।

দিন-পনেরো বাদে অতীন আবার আচমকা উদয় হয় আড্ডায়, কিন্তু আমাদের হাজার পীড়াপীড়িতেও বেশিক্ষণ বসে না। ওর সারা মুখের রেখায় অসম্ভব ব্যস্ততা, চোখের দৃষ্টিতে এক ধরনের আচ্ছন্নতা। যেন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে। এক কাপ চা ধরিয়ে দেওয়ায় কাপটা হাতে নিয়ে বসেই থাকে। আমরা যখন বললুম, খা, অমনি অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিতে গিয়ে ছ্যাঁকা খায়। একসময় খুব অস্থির গলায় শুধোয়, ...হ্যাঁ রে, বালি বইবার মুটেদের আড্ডাটা ঠিক কোথায় বল্ দেখি? এই এলাকারই কোথায় যেন থাকে ওরা। উহ্,কী হ্যাপা বল্ দিকি!

—বালি বইবার মুটে কোন্ কাজে লাগবে তোর? আমরা ওর সঙ্গে রগড় শুরু করি।

—বা-রে, জমি অবধি লরি ঢুকবে নাকি? বড় রাস্তা থেকে বয়ে আনতে হবে না? শুধু বালি নয়, সবকিছুই আমাকে বয়ে আনতে হবে বড় রাস্তা থেকে। এতেই তো টোয়েন্টি পারসেন্ট খরচা বেড়ে যাবে আমার। বউকে বলছি, একটা বেডরুম কমিয়ে দিই, নিদেন গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা বাথরুম। একতলায় আমাদের তিনটে বাথরুম কী হবে বল্ দেখি? বাইরের লোকের জন্য আর চাকর-বাকরের জন্য একটা বাথরুমে চলে না? কিন্তু শুনেই তোদের সীতাদেবীর মুখ কালো। যেন তাকে দ্বিতীয়বারের জন্য বনবাসে যেতে বলা হয়েছে। বলতে বলতে অতীন এমন করে হাসে, যেন প্রাণের আশ মিটিয়ে প্রিয় নেশাটি করেছে সে, সেই কারণেই, তৃপ্তি বুঝি চুইয়ে পড়ছে নেশায় চুর মানুষটির মুখমণ্ডল থেকে।

আমরা সবাই মিলে একচোট হেসে নিই ওকে নিয়ে। বলি, তাহলে যে? কিছুতেই নামতে চাইছিলি না। বেশ তো মজে গিয়েছিস দেখছি।

সেকথা গায়ে মাখে না অতীন। বলে, নিজেদের জন্য যদি দুটো বাথরুম করতেই হয়, তো একটাতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কমোড বসানোই তো ভালো, না কী বলিস তোরা? কিন্তু বউ বলছে, দরকার নেই, দুটোই ইউরোপিয়ান করে দাও। আচ্ছা, কী বুদ্ধি বল্ দেখি, বাইরের থেকে আত্মীয়-স্বজন কেউ হয়তো এল, যার কমোডে ইয়ে হয় না। তখন?

সেদিন আর বেশিক্ষণ বসে না অতীন। আচমকা কী একটা মনে পড়ে যাওয়ায় উশখুশ জুড়ে দেয়। আমরা আরো একটুখানি বসে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় কাঁদোকাঁদো মুখে বলে, না ভাই, যাই। কাল সকালের মধ্যে বালি না পড়লে মিস্ত্রী বসে থাকবে।

—আই বা...প ! আমরা সবাই মিলে জোর প্যাঁক দিই ওকে, — কী গেরস্ত-গেরস্ত কথা ! আবে, তুই যে আড্ডার এঁটুলি ছিলি ! আড্ডা থেকে তোকে যে তোলা যেত না ! আর, গল্পের প্লট ছাড়া যে তোর মাথায় আর দুনিয়ার কিছুই খেলতো না।

শুনে একটুখানি বুঝি লজ্জা পায় অতীন। বলে, গেরস্ত-গেরস্ত নয় ব্যাপারটা, মিস্ত্রী বসে থাকলে তো লোকসান না ...।

—অবাক কাণ্ড ! মিস্ত্রী বসে থাকলে তোর কী লোকসান ? তোর কাজ তো ফুরনে।

—তা ঠিক, কিন্তু আমি কাজটা যত জলদি সম্ভব শেষ করতে চাই। যত জলদি সম্ভব এই ক্যাঁচাকল থেকে বেবোতে চাই ভাই। বলতে বলতে গলাটাকে অস্বাভাবিক খাটো করে ফেলে অতীন, ... আসলে, আমি যত জলদি সম্ভব স্বধর্মে ফিরতে চাই রে। এই বনবাস, নির্বাসন আর ভালো লাগছে না। একটিবার ভাব্ দেখি, লেখালেখি, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, আড্ডা, ...সবকিছুই একেবারে মাথায় উঠেছে ! এভাবে বাঁচা যায় ? বাঁচা উচিত ? হ্যাঁ রে, মেঝেতে মাটি নাকি রোঁয়া-বালি, নাকি পাওয়ার হাউসের ছাই, কোনটা ফেলে দুরমুশ করলে বেশি মজবুত হবে, বল্ দেখি ? ঐ এলাকায় যা মেঝে ফাটছে বাড়িগুলোর !

৩.

তারপর ....হপ্তা দু-তিন দেখাই নেই অতীনের। ফোন করলে পাওয়া যায় না। জানকী বৌঠানও ঠিকঠাক ঠাহর দিতে পারে না। বলে, কোথায় যেন গেল ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও গ্যাছে চিপ্সের অর্ডার দিতে ....না, না, চিপসের অর্ডার তো ও ফোনেই দিল, ...তাহলে বোধ হয়, টিউবওয়েল-মিস্ত্রীর কাছে, ...নাকি কাঠের গুদোমে গেল ? দূর ছাই, দিনভর চরকির মতো ঘুরছে, কখন কোথায় যায়, তাল রাখতে পারি নে আমি।

আমরা হাসতে হাসতে বলি, এটাই তো চাইছিলেন বৌঠান, পারছিলেন না, আমরা পেরেছি।

—হ্যাঁ ...। অতীনের বউয়ের গলার স্বরে কৌতুক, ... খুব ফাঁসান ফেঁসেছে। আপনারা না থাকলে ...।

—ওসব শুকনো কথায় ভুলছি নে, বৌঠান। আমরা হৈ-হৈ করে উঠি, ...একদিন কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াতে হবে কিন্তু। বাড়িটা শেষ হোক আগে।

—ঠিকই বলেছেন। অতীনের বউয়ের গলায় কৌতুকটা গাঢ় হয়। ...বাড়িটা শেষ হোক আগে। কেন কি, ওকে তো বিশ্বাস নেই। কবে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার গল্প আর ছবি আঁকায় ডুবে গেল !

কদাচিৎ ফোনে পেয়ে যাই ওকে। কিন্তু আমাদের কথাবার্তার পুরোটা ওর কানে ঢোকে কিনা, ঢুকলেও তা মগজ অবধি পৌঁছয় কিনা ঘোর সংশয় জাগে আমাদের মনে। যদিও বা ঢোকে, আমাদের কথার জবাবে এমন ঘোর মাখানো ঘুমঘুম গলায় কথা বলে,

শুনতে শুনতে একেবারে নিঃসংশয় হতে হয়, অতীন ঐ মুহূর্তে অন্য দুনিয়ার বাসিন্দা। যেন সেইমাত্র ঘুম থেকে উঠলো। কোন-কোনওদিন পাশ দিয়ে পাঁইপাঁই সাইকেল চালিয়ে এমনভাবে চলে যায়, যেন আগুন লেগেছে ওদের পাড়ায়, দমকলে খবর দিতে চলেছে। আর, ঐ অবস্থায় আমাদের চোখে চোখ আটকে গেলে এমনভাবে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নেয়, যেন আমাদের সে কস্মিনকালেও চেনে না।

অবশেষে একদিন মোড়ের মাথায় দেখা। দেখা মানে, পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে পালাচ্ছিল, আমরাই হৈ-হৈ করে নামালুম। ক্ষেপে উঠে বলি,

...সেদিন পাশ দিয়ে অমন পাঁইপাঁই সাইকেল চালিয়ে চলে গেলি যে বড়? আমাদের চিনতেই পারলি নে!

এমন কথার জবার দেবে কি, দেখি, খুবই অন্যমনস্ক মুখখানি। যেন কী এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। চেখেমুখে সেই দুঃখী-দুঃখী ভাবখানা তো নেইই, বরং ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারি, একটা যেন ভারী মিষ্টি জলের কুয়োর সন্ধান পেয়েছে অতীন, যেন একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে তার মধ্যে, যেন ভারী এক সুখকর দম-আটকানো অনুভূতি তার প্রতিটি রোমকূপের তলায় বাসা বেঁধেছে। বলি, কীরে, একটা বাড়ি করতে গিয়ে রাতারাতি বদলে গেলি যে! এক্কেবারে ডুমুরের ফুল! গল্প লেখা, ছবি আঁকা, আড্ডা মারা, সব যে বন্ধ করে দিলি একেবারেই! একলপতে শিল্প-সংস্কৃতির এতখানি লোকসান যে সহ্য করা যাচ্ছে না।

সে কথায় অতীন মুচকি হাসে। তারপর কম্বুকন্ঠে আওড়াতে থাকে,

...একটু দাঁড়াও কার্ল মার্কস,
কয়েক শতাব্দী আরও কেটে নিই ঘাস।

—কার রে?

—কবির নাম মনে নেই, লাইনদুটো মনে আছে।

—বড়ই রি-অ্যাকশনারি লাইন।

—ঠিক, বড়ই একপেশে।

—এবং ফ্যালাসির চূড়ান্ত।

—সে যাই হোক। .... গলাটা খাদে নামিয়ে অতীন বলে, ...বলতে চাইছি, বাড়িটা আগে নামিয়ে নিই বাপ, ...সাহিত্য, শিল্পকলা, আড্ডা, ...এসবের জন্য অনেক সময় মিলবে, কিন্তু বাড়িটাতে বেশি দেরি করলে সিমেন্টের দাম বেড়ে যাবে।

আমরা শুনে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকি অতীনের দিকে। শুনেছি কাউকে ভূতে ধরলে, আসল মানুষটির গলায় ঢুকে প্রেতাত্মাটি কথা বলে। তখন, গলাটা ওর, কথাগুলো অন্যের। অতীনের ঘাড়ে তেমনই কেউ ভর করলো নাকি! ভাবছিলুম বটে এসব, কিন্তু তাই বলে অতীনের এই ধরনের আচরণ কিংবা মন্তব্যের জন্য আমাদের মনে তিলমাত্রও ক্ষোভ ছিল না। বরং আমরা চাইছিলুম, অতীন মন দিয়েই করুক বাড়িটা। অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে ওর মধ্যেকার উড়নচণ্ডী মানুষটা যেন জিততে না পারে। একটা বাড়ি বিহনে আমাদেব জানকী-বৌঠানের শুকনো মুখখানি আর চোখে

দেখা যাচ্ছিল না। কাজেই আমরা মনেপ্রাণে চাইছিলুম, বাড়িটা গুছিয়ে শেষ করুক অতীন। তার জন্য, যতদিন খুশি ডুমুরের ফুল হয়ে থাকুক। আমরা সব রকমের কৃচ্ছ্রসাধনে প্রস্তুত।

কিন্তু তখনো বুঝি নি, বাড়ি তৈরির নামে দিনের পর দিন আমাদের কতখানি ধাপ্পা দিয়ে চলেছে সে।

মাসখানেক বাদে যখন আবার একদিন আচমকা দেখা হয়ে গেল অতীনের সঙ্গে, তখনই কথার পিঠে কথা চড়াতে গিয়ে এক সময় ধরা পড়ে গেল ধাপ্পাটা। আর তখনই আমরা বুঝতে পারি, ভেতরে ভেতবে আমাদের সবাইকে কতখানি বোকা বানিয়েছে সে।

৪.

যেদিন ওর ধাপ্পাটা প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম আমরা, সেদিন বুঝি হাতে একটুখানি সময় ছিল অতীনের। সবাই গিয়ে চায়ের দোকানে বসেছিলুম। ডুমুরের ফুল হয়ে যাওয়া নিয়ে আমাদের সমবেত কপট অনুযোগে বুঝি অতীনের মনে অপরাধবোধ চাগিয়ে উঠেছিল। লজ্জা পেয়ে সামান্য হেসেছিল সে। কথাটা চেপে যেতেই চাইছিল বলে মনে হয়। কারণ, অন্যদিনের মতো দেখা হওয়া মাত্রই বাড়ি-বাড়ি, মিস্ত্রি-মিস্ত্রি করে হেদিয়ে পড়ে নি ও। কিন্তু আমরাই ক্রমাগত উসকাতে লাগলুম ওকে।

—তারপর? বাড়ি নিয়ে যে স্পিকটি নট! কেমন এগোচ্ছে তোর বাড়ি?

—বাড়ি ...! সহসা কেমন উদাস হয়ে যায় অতীন। পরমুহূর্তে ফিক করে হেসে ফেলে। বিড়বিড় করে বলে, বাড়ি বাড়ির মতোই এগোচ্ছে, তার মর্জিমতো, নিজগুণে উঠছে সে।

—নিজগুণে মানে? আমরা খেঁকিয়ে উঠি, ...নিজগুণে মানেটা কি?

—বলি ক'বছর লাগাবি?

—নিজগুণেই যদি এগোবে, তবে আড্ডার থেকে ছেঁটে ফেলে তোকে আমরা ঐ কাজে পাঠালাম কী জন্যে?

—তোকে ঐকাজে লাগাবার দরুণ আমাদের কতখানি স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে জানিস?

—রাইট। রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠিয়ে দশরথের বুকে যেমন শেলটি বেজেছিল, তোকেও আড্ডার থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ...।

—আমি...আসলে...। বলতে বলতে একটুখানি ঘনিষ্ট হয়ে আসে অতীন, এবং দড়ি বাঁধা পোষা ছাগলটি মালিকের পাশাপাশে পথ হাঁটতে গিয়ে, নাগালের মধ্যে সবজি-গাছের সবুজ পাতা দেখলে মুখ বাড়িয়ে টেনে নিতে পারে এমন আশঙ্কায়, যেমন ওর মালিক সবজি-গাছের ঝোপটির কাছে আসা মাত্তর দক্ষ হাতে খাটো করে নেয় দড়ি, ঠিক তেমনই কৌশলে গলাটাকে আচমকা খাটো করে নিয়ে অতীন বলে,

আসলে, আমি একটা অন্য কাজ করছি, বুঝলি ...., একটা অন্য ধরনের কাজ ..., মানে...।

—মানে ? আমরা সবাই একযোগে চমক খাই, ... বাড়ি বানানোর বাহানায় আমাদের থেকে আর্নড-লিভ নিয়ে কোথায় কী করছিস তুই ? অ্যাই, ঝেড়ে কাস্। আর সাসপেন্স দিস নে।

দু'হাত কচলাতে কচলাতে খুব অপরাধীর ভাব করে অতীন বলে, আসলে, আমি না...আমি না...একটা উপন্যাসে হাত দিয়ে ফেলেছি।

আমরা ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। মুখ দিয়ে কথা সরে না কারোরই। কথা বলবো কি, ওর কথার মাথামুন্ডুও বোধগম্য হয় না আমাদের। তাও কোনও গতিকে সামলে নিয়ে শুধোই, উপান্যাসে হাত দিয়েছিস মানে ? তোর হাত কেটে নেবো, শালা। বৌঠানকে আমরা কথা দিয়েছি। কব্জি ডুবিয়ে খাওয়ানোর অফার পেয়েছি। শালা, তোর লজ্জা করে না ? পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটিমাত্র বউ তোর ...।

—রাগছিস কেন, শোন্ না। আমাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা চালায় অতীন, ... তোরা তো জানিস নে, ...এই যে বাড়ি তৈরির ব্যাপারটা... এ এক আজব দুনিয়া মাইরি... তোরা কল্পনাও করতে পারবি নে ...। অতীন খুব ঘোর মাখানো হাসে।

বটে তো ! আমরা, যদিও ততদিনে বাড়ি করে ফেলেছি সবাই, মনে মনে এবং প্রকাশ্যে অতীনের শেষ বাক্যটির শেষ অংশের সঙ্গে ষোলআনা একমত হই। সত্যিই তো, আমরা কী করেই বা কল্পনা করতে পারবো ? আমাদের সেই কল্পনাশক্তি কোথায় ? থাকলে তো আমরাও অতীনের মতো গল্প-উপন্যাস লিখতুম, ছবি আঁকতুম। আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি অতীনের দিকে, সত্যি সত্যি ঐ নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছিস তুই ?

—সত্যি, তিনসত্যি। অতীন উজ্জ্বল হাসে। ...এমন ভেতর থেকে জার্ক মারতে লাগলো ...। এমন পুরোনো আমাশার মতো নাভিমূলে কামড়াতে লাগলো ঘন ঘন ...।

আমরা কিন্তু তিলমাত্র যোগ দিতে পারি নে ঐ হাসিতে। তেতো গলায় বলি, ...শালা, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভাঙবে ! তা, বাড়িটার কী অবস্থা ?

—বললাম তো ...। অতীন নির্বিকার, ...বাড়ি নিজগুণে নিজ মহিমায় নিজের নিয়মে উঠছে, আমিও আমার মতো, ঐ যা বললি, ধান ভানছি। উপন্যাসটা বেশ জমে উঠেছে, মাইরি। যতই লিখছি, ততই মজা পাচ্ছি। আর লিখতে গিয়ে ঐ জগৎটাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। বলতে বলতে অতীনের চোখদুটো আকাশে উঠে যায়, ...জানিস, একখানা বাড়ি করতে গেলে কম করেও পঞ্চান্ন রকমের সামগ্রী আর আঠারো রকমের মিস্ত্রী লাগে ! আর, মিস্ত্রী তো নয়, প্রত্যেকেই এক-একটি চিজ। একেবারে বাঁধিয়ে রাখবার মতো।

—মানে ?

—মানে, একেবারে জিনিয়াস এক-একটি। গবেষণাযোগ্য প্রাণী। আচ্ছা, পীযূষ,

প্যারিস করবার আগে তুই কি এক মরসুম প্রাইমার করে রেখে দিয়েছিলি? আচ্ছা, রনেন ....।

—রাখ্ তোর প্যারিস। আমরা কড়া ধমক লাগাই অতীনকে, ...এত বলে কয়ে বাড়িটার কাজে নামালুম তোকে, আর তুই শালা কিনা চান্সটি পেয়েই আবার ধান ভানতে লেগেছিস! হ্যাঁ রে, তোর বউ কিছু বলছে না?

সে কথায় অতীন মুচকি হাসে। বলে, বউকে বলেছি, উপন্যাসটা ছেপে বই হয়ে বেরোলে কপিরাইট ওর। শুনে অবধি ঐ আনন্দেই রয়েছে সে।

এরপর আর ওকে খুঁজে পাই নে আমরা। একটু একটু করে হারিয়েই ফেলতে থাকি। ফোন করলে শুনি, অমুকের কাছে তমুকের জন্য গ্যাছে। কিংবা, ফিরেছিল, আবার রঙের মিস্ত্রীর খোঁজে বেরিয়ে গেল। ফোনে কদাচিং ধরা পড়লেও খুব গা-ছাড়া গলায় কথা বলে অতীন, আড্ডায় আসবো-আসবো করেও কিছুতেই আসে না। কালেভদ্রে এলেও বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। যতটুকু সময় থাকে, সরাক্ষণ ওর ঐ উপন্যাসের কথাই শোনাতে থাকে সাতকাহন করে। বলে, জানিস, ভারী মিস্টিরিয়াস এই বাড়ি তৈরির দুনিয়াটা! যতই ঢুকছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আর এই মিস্ত্রিগুলো, কী ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার এক-একটি, দেখতে দেখতে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। ভাবি, এদের নিয়ে কেন লেখা হয় না? অথচ, বিশ্বাস কর্, একেবারে ক্ল্যাসিক গল্প-উপন্যাসের চরিত্র হওয়ার জন্যই জন্মেছে এরা।

—কী রকম? আমরা সামান্য কৌতূহলী হয়ে উঠি।

—প্রথম কথা, সারা দুনিয়া ঢুঁড়েও এমন একটা মিস্ত্রিও পাবি নে তুই, যে কিনা ডাকামাত্তর চলে আসবে। যদি আসে তো বুঝে নিতে হবে, সে জাত-মিস্ত্রিই নয়। সে মিস্ত্রি-কুলের কুলাঙ্গার। আসলে, ওদের যারা গুরু, তারা নাকি কাজ শেখানোর আগে ভালো করে শিখিয়ে দেয়, কী করে, কতভাবে গেরস্তের সঙ্গে কথার খেলাপ করা যায়, কত উপায়ে তাদের ভোগাতে হয়, পদেপদে হয়রানি করতে হয়। দু'চোখ বড়বড় করে আবিষ্কারের গল্প শোনানোর ভঙ্গিতে অতীন বলে, গুরুর কাছে ওদের প্রথম পাঠটা কী জানিস? গেরস্ত ডাকতে এলে সঙ্গে সঙ্গে যেতে তো নেইই, এমন কি, হপ্তাটাক বাদে যে-তারিখটা দিল, ঐ তারিখেও কিছুতেই যাবে না। অর্থাৎ যাওয়া চলবে না। পরের তারিখেও না। বার-তিনেক ডেট ফেল করে, তারপর একদিন অড-টাইমে যাবে। কেন কি, ডাকামাত্তর চলে গেলে নাকি গেরস্ত ভাববে, ডাকামাত্তর চলে এলো, তার মানে ওর হাতে কোনও কাজকর্মই নেই, একেবারেই বেকার লোকটা, আর, কাজ জোটে না মানেই তো মিস্ত্রী হিসেবে অঘা। গুরু নাকি তাই পয়লা চটকায় বলে দেয়, কাজটা তোর ভালো করে না শিখলেও চলবে, কিন্তু গেরস্তকে ঘোরানো, ভোগানো, এটা না শিখতে পারলে তোর ফুটুর ডুম। সারা জীবন আর কাজ জুটবে না কিছুতেই। আর, গুরুর ঐ বচনটি মানতে গিয়ে, হয়তো বা বাড়িতে সেদিন হাঁড়ি চড়বার চালই বাড়ন্ত, কিন্তু গেরস্ত ডাকামাত্তর সেইদিনই যাবে না কিছুতেই। সারাদিন না খেয়ে থাকবে, তবু যাবে না, কেন কি, তাহলে গেরস্ত যে এটাই ধরে নেবে, লোকটা বসেই ছিল, ডাকামাত্তরই

দৌড়ে এল, অতএব লোকটা নির্ঘাৎ মিস্ত্রী হিসেবে থার্ড-ক্লাস। আরও কত-কত যে পিক্যুলিয়র ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে ওদের মধ্যে, জগৎটাতে না ঢুকলে, মাইরি, জানতেই পারতুম না।

শুনতে শুনতে মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল একজাতের কৌতূহল। বাস্তবিক, এই জগৎটা নিয়ে তো বড় মাপের লেখালিখি তেমন একটা হয় নি। ভালো বিষয়ই ধরেছে অতীন। জমাতে পারলে পাঠক খাবে। অ্যাওয়ার্ড-ট্যাওয়ার্ডও পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু অতীনের সামনে মনের ভাবটা গোপন রাখি। লাই পেয়ে গিয়ে বাড়িটার দিকে তাহলে আর ফিরেও তাকাবে না। গম্ভীর মুখে শুধোই, ...তা, লেখাটা কদ্দুর এগোলো?

—প্রায় মাঝামাঝি। আর, গোটাকয় চ্যাপ্টার বাকি। তারপর সামান্য ঘসামাজা আর গয়নাগাঁটি পরালেই, ব্যস। খুব তৃপ্তির হাসি হাসে অতীন, ...শেষ হোক, যথাসময়ে শোনাবো তোদের।

—এক খণ্ডেই শেষ নাকি? আমরা মনের মধ্যেকার যাবতীয় উচ্ছ্বাস চেপে রেখে শুধোই।

অতীন ম্লান হাসে, আগে তো একটা খণ্ডই শেষ হোক। পরের কথা পরে।

মনের খুশিটা আর শেষ অবধি চেপে রাখতে পারি নে আমরা। চোখে মুখে খুব তারিফ ফুটিয়ে বলি, চালিয়ে যা।

এরপর আড্ডায় আসা প্রায় পুরোপুরিই ছেড়ে দেয় অতীন। মাঝেমাঝে রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ-হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। সামান্যক্ষণ গল্পগুজব করে, কিন্তু সারাক্ষণ অস্থির ভাব, ইতিউতি চাউনি। একসময় বলে, ... এই, চলি রে, লেখাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করবো আজ।

—অ্যাদ্দিন বাদে দেখা, একটু বসে যা, চা-ফা খাওয়া যাক।

—না....রে, এখন আমি যাবো সেই কুঁদঘাট। শুনেছি কোন্ এক পুরানো দিনের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, একেবারে সরেস বার্মা-টিক জলের দামে ছেড়ে দিচ্ছে। ভাবতে পারিস, কতকালের প্রাচীন একটা প্রাসাদ .... তার খাঁজেভাঁজে পুরোনো দিনের ইতিহাসের গন্ধ...সেই বাড়ির বার্মা টিক ....। কার বাড়ি, কবে বানিয়েছিল, তারা এখন কেমন আছে, বাড়িটা কে ভাঙছে, কেন ভাঙছে, কী দামে বেচছে মাল ..., সবকিছু দেখে আসি স্বচক্ষে। তাছাড়া, কলাবাগানে একটা রঙের মিস্ত্রীর খোঁজ পেয়েছি, ব্যাটার হাতে নাকি যাদু আছে। যখন দেয়ালে রঙ মাখায়, তাবড় আর্টিস্টের অয়েল-পেন্টিংয়ের পোচকেও নাকি হার মানায়। বাড়ির সামনের দেয়ালে মন থেকে ভেবে ভেবে এমন কারুকার্য আঁকবে, দেখে নাকি চোখ ফেরানো দায়। এমনই এক শিল্পীমনের মানুষ সে, কিন্তু বাড়ি ফেরার সময়, গেরস্তের ঘরে, হাতের সামনে যা-কিছু পড়বে, নিঃশব্দে হাতিয়ে নেবে, নেবেই, কেন কি, ঐ শিল্পীটির ভেতরে একটা চোরেরও বসবাস। যাই, একটিবার কথা বলে আসি লোকটার সঙ্গে।

—ঠিক আছে, তাহলে কাল একটিবার আয়, কাল তো আমাদের সবাইয়ের ছুটি।

—কাল? অতীনের বুঝি সহসা খেয়াল হয়, বলে, কাল তো হবে না রে। আমার

শালীর এক বান্ধবী নাকি তাদের নতুন বাড়িতে গ্রীলের এমনই এক ডিজাইন দিয়েছে, চোখ ফেরানো দায়। কাল একটিবার গিয়ে দেখে আসবো ডিজাইনটা। উপন্যাসের জানলাগুলোতে গ্রিলের ডিজাইনের ডিটেল আঁকা যাবে জুত করে। আচ্ছা স্বপন, বল্ দেখি, বাইরের দেয়ালটা সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টার আর রঙ করিয়ে নেওয়া উচিত, নাকি, একবছর পরে করলে ভালো? কেউ বলছে সঙ্গোসঙ্গো, নইলে ইটে নোনা ধরে যায়, কেউ বলছে, এক-বছর ইটগুলোকে জল খাইয়ে নিয়ে তারপর করা উচিত। আর, সবাই বলছে, মুরারকা প্রাইমার নাকি আর আগের মতো নেই? বার্জার পেইন্টই ভালো, নাকি আই-সি-আই?

মুচকি হেসে বলি, এসবও ঢুকবে নাকি তোর উপন্যাসে?

—ঢুকবেই তো। বাড়ি বানাবার পুরো দুনিয়াটাই ঢুকবে। ফণী ছুতোর ঢুকবে, রঘুনাথ মুন্সী ঢুকবে ....।

—এরা কারা?

—এরাই তো আমার উপন্যাসের চরিত্র রে। এদের যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। ধর্ ফণী ছুতোর, ক্লাস থ্রি অবধি বিদ্যে তার, আফগানিস্তানটা ভারতের মধ্যে, নাকি বাইরে, জানে না। জ্যোতিবাবু গিয়ে যে বুদ্ধবাবু এসেছেন, সে খোঁজটা অবধি রাখে না, কিন্তু যত জটিল কাঠের হিসেবই হোক না কেন, চোখদুটি আধো মুদে বিড়বিড় করতে করতে যে হিসেবটি কষে দেবে, ক্যালকুলেটারও লজ্জা পাবে। আর, কাঠের গায়ে র‍্যাঁদা চালাতে চালাতে আচমকা এমন এক-একটা প্রশ্ন শুধিয়ে বসবে, সারা জীবন ধরেই বুঝি তার জবাব খুঁজতে হয়।

—বটে! খুব ইনটারেস্টিং তো! কী শুধোয়?

—কী শুধোয়? ধর্ .... একদিন ....বেশ চালাচ্ছিল র‍্যাঁদা ....আচমকা আমার দিকে তাকিয়ে শুধিয়ে বসলো, 'হ্যাঁ বাবু, আপনি নাকি গপ্পোগাথা লেখেন? তা, লিখে কী হয়?' শুনে তো আমি থ'। সত্যিই তো, লিখে কী এমন পাহাড় ওলটানো হয়! বাস্তবিক, কেন লিখি আমরা? কোন্ কম্মে লাগে তা! ভেবে দ্যাখ তবে, সামান্য একটা ছুতোর মিস্ত্রী ....। একদিন ফণীকে নিয়ে আসবো, দাঁড়া। কিংবা ধর, অতুল মিস্ত্রী, ... বাড়ির দেয়াল কেটে জলের পাইপ লাগায়, কানে একেবারেই কালা সে, একটিবার পিছু ফিরলে তাকে আর চেঁচিয়ে ফাটিয়েও ফেরানো যায় না, একেবারে সামনে গিয়ে পথ আটকাতে হয়, অথচ এমন বুদ্ধি খাটিয়ে লাইনগুলো বানায়, টালি, মার্বেল লাগানো দেয়ালের গায়ে এমন পরিপাটি হাতে নিটোল ফুটো বানিয়ে ফেলে ....। আর, রঘুনাথ মুন্সী, তার কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। ইট গেঁথে গেঁথে এখন থুত্থুড়ে বুড়ো সে। ক' অক্ষর গোমাংস। স্বাধীনতার পরপর ওদের মুলুকে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছিল বিধান রায়ের সরকার। ঐখানে নাম সইটা কোনও গতিকে শিখেছিল। তাও শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয় নি। কেন কি, আজও অবধি মজুরির টাকা নেবার কালে ভাউচারের ওপর তার সই দিতে গিয়ে, যেদিন ঘ-এর তলায় উ-কার দেয়, সেদিন আর মুন্সীর ম-এর তলায় উ-কার দেয় না। যেদিন ম-এর তলায় দেয়, সেদিন ঘ-এর তলাটা ফাঁকা থাকে।

ভাইব্রেটরকে বলে, ভায়ামিটার। অফসেটকে বলে, অফসাইড। লিনটেলকে বলে, লিন্টন। ড্যাডোকে বলে, ডিটো....। কিন্তু একদিন আমার পাশেপাশে পথ হাঁটতে হাঁটতে একটা চারতলা বাড়ির সামনে গিয়ে আচমকা থমকে দাঁড়ায় রঘুনাথ। ভুরু কুঁচকে কয়েক পলক আগাপাস্তলা দেখে নেয় বাড়িটাকে। তারপর বিধাতার গলায় রায় দেয়, বাড়িটা বাঁকা আছে। আমি মজা পেয়ে বলি, বাড়িটা কার জানো? তমালদের। তমালের বাবা মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। রঘুনাথ মুন্সী তার জবাবে আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো, এমন সীমাহীন তাচ্ছিল্য ছিল সেই দৃষ্টিতে, খুবই অস্বস্তি লাগছিল আমার। কিন্তু তমালকে দিনকয় বাদে বলায় সেও স্বীকার করলো কথাটা। বাড়িটা নাকি সত্যিসত্যিই একটুখানি বাঁকা! ভাবতে পারিস!

—বলিস কি! আমরা বাস্তবিকই তাজ্জব বোধ করি, ...কেবল চোখে দেখেই ....!

—কেবল চোখে দেখেই। তারপর শোন্ না, ...একবার নাকি এক বড় ঠিকেদারের আন্ডারে কাজ করতো রঘুনাথ। তো, ধরবি তো ধর্, খোদ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যানে মারাত্মক ভুল ধরে বসলো। ঠিকেদার তো তাকে এই মারে তো সেই মারে। ছাড়িয়ে দিতে চায় তৎক্ষণাৎ। কেন কি, খোদ বড় সাহেব চটলে ওর কপালে অশেষ দুঃখু রয়েছে। বিল-পেমেন্টের সময় কেঁদে কূল পাবে না। কিন্তু পরের দিনই বড়সাহেব নিজেই ডেকে পাঠালেন রঘুনাথকে। অকপটে স্বীকার করলেন, প্ল্যানে বাস্তবিকই ঐ মারাত্মক ভুলটা ছিল। ভাগ্যে রঘুনাথ ঠিক সময়ে ডিটেক্ট করেছিল! নইলে বিল্ডিংটা সারাজীবনের মতো উইক হয়ে যেত। বড়সাহেব নাকি সেই কাণ্ডের পর রঘুনাথকে পাঁচশো টাকা কখশিস দিয়েছিল। ভাবতে পারিস, ঘ-এর তলায় উ-কার দিলে যে মানুষ কিনা ম-এর তলায় উ-কার দিতে ভুলে যায় ....।

—সত্যি! ভারী অবাক মানুষ তো রে এরা!

—অবাকই তো। বড়ই রহস্যময়। অথচ, ঐ রঘুনাথই আবার বাড়ি তৈরির মালমশলার পরিমান এবং সেই বাবদ খরচ-খরচার এস্টিমেট হিসেব করবার বেলায় একেবারেই কানা।

—মানে?

—মানে, বাড়িটাতে হাত দেবার আগে গেরস্থ যদি কোন্ মাল-মশলা কত লাগবে, সব মিলিয়ে কত খরচ হবে, তার একটা আন্দাজ পেতে চায়, তো রঘুনাথ এমন আন্দাজ দেবে, যা কিনা হাফেরও কম। তুমি ওর কথায় বিশ্বাস করে কাজে নেমেছ কি মরেছ।

—সে কি! এত বড় মিস্ত্রি, হিসেবটা শিখে নেয় নেয় না কেন?

—শিখে নেবে কি, হিসেবটা ও বিলক্ষণ জানে। কিন্তু অর্ধেক কমিয়ে বলবে। বলবেই।

—সে কি!' কেন?

—কেন কি, এটাই হলো গুরুর শেখানো দ্বিতীয় পাঠ, কিনা, প্রথম কাজে নামছে, এমন গেরস্তকে এস্টিমেটটা বলতে হবে অনেক কমিয়ে। হাফেরও কম হয় যেন।

নইলে ঘাবড়ে গিয়ে নামবেই না কাজে। আর, একটিবার ভুজুং-ভাজুং দিয়ে যদি নামিয়ে দিতে পারো কোনগতিকে, যদি গাড়ির জোয়ালটা একটিবার সাকসেসফুলি চাপিয়ে দিতে পার ওর ঘাড়ে, তখন আর দেখতে হবে না। যত কষ্টই হোক, এমন কি ধার-ধোব করেও গাড়িটাকে তখন টেনে নিয়ে যাবেই। বলতে বলতে অতীনের সারা মুখে ফুটে ওঠে এমন এক জাতের মিহি রহস্যময় হাসি, যেন এক রূপকথার রাজ্যি থেকে ফিরে এসে ঐ গল্প শোনাতে বসেছে আমাদের।

বুঝতে পারি, বাড়ি তৈরির জগৎটা নিয়ে একেবারে মজে গিয়েছে অতীন। একেবারে বুঁদ হয়ে রয়েছে।

অতীন শুনে হাসে। বলে, উপন্যাসটা নামাই, দেখবি কী একখানা মাল নামালাম।

৫.

একদিন ওর অর্ধসমাপ্ত বাড়িটার সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়াই।

রঙের মিস্ত্রি নিজের মতো কাজ করছিল, অতীনকে পাওয়া গেল না। ওর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলুম, কোথায় নাকি এক মার্বেলওয়ালার কাছে ফুল-ফুল ছাপ মার্বেল রয়েছে, সে নাকি কাকভোরে বেরিয়ে গিয়েছে তারই সন্ধানে।

ওর বউকে শুধোই, বৌঠান, মেঝেতে মার্বেল লাগাবেন নাকি?

—কে জানে! লাগাবে কি লাগাবে না, তা সে ওই জানে। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে নাকি? সারাক্ষণ কী এক ঘোরের মাথায় থাকে। আর, বাড়িটা শুরু করবার পর থেকেই একটা লাল রঙের মোটা খাতা বানিয়েছে, সময় পেলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে কীসব লেখে ঐ খাতাতে।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে মুচকি হাসতে থাকি। ঘরের দরজা বন্ধ করে অতীন যে কী লেখে, তা তো জানতে বাকি নেই আমাদের। অতীনের বউকে লোভ দেখানোর ভঙ্গীতে বলি, ঐ ঘোরটা খবরদার ভাঙাবেন না ওর। বাড়ি তৈরিও একটা ঘোরের ব্যাপার, জানেন তো। ভালোভাবে ইনভলভড্ না হলে মানুষ পরিস্কার করে বাহ্যিও সারতে পারে না।

অতীনের বউয়ের থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ডেরার দিকে পা বাড়াই। পথেই পড়ে ওদের নতুন বাড়িটা। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম বাড়িটাকে। কিন্তু অল্প কাছে যেতেই অতীনকে এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যাই। সামনের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে নিজের আধা-তৈরি বাড়িটার দিকে। নিমগ্ন দুটি চোখ একেবারে বুঁদ হয়ে গিয়েছে। আমরা ওর একেবারে পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াই।

রজত ওকে ঠেলা মারতেই আমাদের দিকে চমকে তাকায় অতীন। কিন্তু বিন্দুমাত্র লজ্জা পায় না সে। আমাদের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয় বাড়িটার দিকে।

বলি, কোথায় ছিলি তুই? আমরা তোকে একটু আগেই তো অ্যাবসেন্ট করে গেলুম। বৌঠানও বলতে পারলো না তোর খবর। তা, এখানে দাঁড়িয়ে করছিসটা কী?

নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে অতীন বলে, চুপ কর্। একটা ছবি আঁকা চলছে। গোল করিস নে। বলেই পুনরায় সামনের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অতীন। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখি, রঙের মিস্ত্রী রঙ লাগাচ্ছে বাড়ির সামনের দেয়ালে। সিমেন্ট দিয়ে যে রিলিফ-ডিজাইনটা বানিয়েছিল, রঙ লাগাচ্ছে ওগুলোরই গায়ে। আমাদের দিকে পিছু ফিরে বসে একমনে কাজ করছে লোকটা। তুলির টানে একটু একটু করে রূপ নিচ্ছে সামনের দেয়ালের কারুকার্যগুলি।

একটু বাদে আবার আমাদের দিকে এক ঝলক তাকায় অতীন। খুব তৃপ্ত চোখে হাসে। চাপা গলায় বলে, লোকটাকে পেছন থেকে ঠিক দা-ভিঞ্চি লাগছে, বল ? অন্তত মগ্নতায় কোনও তফাত নেই। অথচ লোকটার নাম কি জানিস ? ল্যাংটেশ্বর দাস। সাগরেদরা ওকে ন্যাংটোদা বলে ডাকে। আর ওর বউটার নাম কী হতে পারে, বলতে পারিস ? উলঙ্গিনী। উলঙ্গিনী দাসী। বলতে বলতে অতীনের দুচোখে উপচে পড়ে কৌতুক। আচ্ছা, দেওয়ালের রঙটা যদি পিঙ্ক হয়, দোতলার ব্যালকনির গ্রীলের রঙটা কী দেওয়া যায় বল্ দেখি ?

বলি, সে না হয় একটা রঙ বেছে দেওয়া যাবে, কিন্তু এই সাত-সকালে গিয়েছিলি কোথায় ?

—একটা মার্বেলের আড়তে। বলতে বলতে অতীনের চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। বলে, মার্বেলের দুনিয়াটাও কি আজব রে ! দুনিয়ায় যে এত রকমের মার্বেল রয়েছে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না। আর, ওদের শরীর জুড়ে কী সব আঁকিবুকি, কারুকার্যের কী বাহার ! মনে হয় স্বয়ং বিধাতা বুঝি নিজেই রঙ-তুলি নিয়ে অনেক বছর ধরে বসে বসে এঁকেছেন পাথরের বুকে ঐসব দারুন চোখজুড়োনো ডিজাইন ! বাস্তবিক, রঙ নিয়ে একেবারে বাদশাহী হোলিখেলা খেলেছেন বিধাতা পাথরগুলোর গায়ে। আর, কী সব বাহারি নাম ওদের ! জানিস, এক কিসিমের মার্বেলের নাম 'কুমারী'। ঐসব নিয়ে জমিয়ে একটা চ্যাপ্টার লেখার ইচ্ছা আছে। দেখা যাক।

অস্থির গলায় বলি, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু লেখাটা শেষ হতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? প্রায় বছর পেরিয়ে গেল যে।

—বা-রে, এলেবেলে লেখা নাকি ? দেখা হলো, আড়াই কলি কথা হলো, অমনি দুটিতে চললো বিছানার দিকে। খেটে-খুটে লিখছি ব্রাদার, দেরি তো হবেই।

৬.

একদিন আমাদের সবাইকে চমৎকৃত করে অতীন ঘোষণা করলো, উপন্যাসটা শেষ হয়েছে, তোদের হাতে সময় থাকলে যেকোনও দিন পড়ে শোনানো যেতে পারে।

আমরা হৈহৈ করে সময় ঠিক করে ফেলি।

নির্দিষ্ট দিনে ওর নতুন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছই আমরা। তখনো অবধি গৃহপ্রবেশ হয় নি, তবে কাজকর্ম সব শেষ। যে-কোনও দিন ঢুকে পড়লেই হয়। বাড়িটাকে দেখতে দেখতে আমরা বিস্ময়ে থ হয়ে যাই। মাত্র বছরটাক আগে জমিটা একেবারে

ফাঁকা ছিল। এমন কি তার মালিকও ছিল অন্য লোক আমরাই জোরাজুরি করে অতীনকে দিয়ে কিনিয়েছিলাম ওটা। সেই জমির ওপর একটা ছিমছাম বাড়ি এমনই ঝলমল করছে, দেখামাত্র অতীনের দিকে তাকিয়ে, এসিয়ান পেইন্টের বিজ্ঞাপনের ঢংয়ে বলতে ইচ্ছে করে, এই যে—অতীনবা...বু..., নতুন বা...ড়ি, নতুন...। তাও যদি বাড়িটার পেছনে একটুও সময় দিত অতীন! সে তো বাড়িটা শুরু করে দিয়েই বসে গেল উপন্যাস লিখতে। তাও বাড়িটা যে শেষ হলো, এতেই আমরা চমৎকৃত, এর সঙ্গো জড়িত সব কিসিমের মিস্ত্রীর প্রতি আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

বলি, চল্ .... দেখি, ...উপন্যাসটা কেমন দাঁড়ালো। কত বড় হয়েছে রে? কত পৃষ্ঠা?

বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। অতীন তার চোখজোড়াকে ক্রেনের মতো বারদুই ওঠায় .... নামায় ....। ঠোঁটের কোণে খুব রহস্যময় হাসে। এক সময় বাড়িটার দিকে তর্জনী তাক করে বলে, ঐ তো, তোদের সামনেই তো .... প্রথম খণ্ড এটা।

আমরা একটুখানি মজা পাই অতীনের কথায়। বলি, হ্যাঁ, বাড়িটাকে উপন্যাস ভাবলে অবশ্য একতলাটাকে প্রথম খণ্ড ভাবা যায় বটে, কিন্তু আর দেরি নয়, চটপট বসে পড়ি চল্। শুনতে সময় লাগবে।

অতীন এক পাও নড়ে না। বলে, সত্যি বলছি রে, ঠাট্টা নয়, এই উপন্যাসটাই গেল এক বছর ধরে লিখলুম। প্রচ্ছদটা কেমন খোলতাই হয়েছে, বল্! গনেশ পাইন, প্রকাশ কর্মকার, বিকাশ ভটচাজ, চারু খানেদের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ কি? উপন্যাসটা পড়ে দ্যাখ, ওর পাতায় পাতায় কী সব কারুকার্য, কত-কত ডিটেলের কাজ। প্রত্যেকটা মিস্ত্রী-কারিগরের ক্যারেক্টার কীভাবে ফুটে রয়েছে এব দেয়ালে দেয়ালে, মেঝেতে, সিলিংয়ে, গ্রীলে, জানালায়, সিঁড়িতে, ব্যালকনিতে ....। চল্ এবার উপন্যাসটার ভেতরে ঢুকি। দেখতে পাবি, মোজাইকের রঙিন পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে কেমন বাহারি ফুল লতাপাতা এঁকেছে শুকদেব নামের এক কুচকুচে কালো রঙের মোজেক-মিস্ত্রী, যার বউ কিনা ওরই হেলপারের সঙ্গো বিনা নোটিশে ভেগেছে।

—বুঝেছি, আর ঢপ দিতে হবে না। বৌঠান আমাদের সবই বলেছে। ঐ লাল রঙের ঢাউস খাতাটা বের কর দেখি মাণিক।

—ধুশ। অতীন ফিক করে হেসে ফেলে, ...ওটা তো হিসেবের খাতা। মাল-মসলার দাম, মিস্ত্রিদের মজুরি, কত মাল পেলুম, কত খরচ হলো, মিস্ত্রিদের কত মজুরি দিলুম, কত বাকি রইল, সবকিছু লিখে রাখছি যে। এক্কেবারে পাকা কাজ।

আমরা পলকহীন তাকিয়ে থাকি অতীনের মুখের দিকে, —তাহলে সত্যি সত্যিই কোনও উপন্যাস লিখিস নি তুই! এই এক বছর ধরে স্রেফ গুল মেরেছিস আমাদের কাছে!

—কে বললে লিখি নি? এবার অতীনই বুঝি ঈষৎ বিরক্ত। সামনের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে, এটা তবে কী? কাগজে কলমে লেখাটাই কি সব নাকি? নিজের মনেই

বিড়বিড় করতে থাকে অতীন, ...কতকগুলো শুকনো খসখসে কাগজের ওপর কালির আঁচড় দিয়ে লেখা .... অতি ব্যবহারে জীর্ণ কিছু শব্দ .... কিছু বোকা-বোকা নিরেট বাক্য .... দাঁড়ি, কমা ...., তাই দিয়ে এইসব আধা-বিধাতার মতো বিচিত্র চরিত্রগুলোকে তিলমাত্র ফোটানো সম্ভব ? শোন্, এদের যে-কারুর মাত্র একচিলতে হাসিকে ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তোলার মতো শব্দগুচ্ছও এখনো অবধি বাংলা শব্দভাণ্ডারে নেই।

এইসব প্রলাপবৎ কথাবার্তার কী যে জবাব দেবো, ভেবে পাই নে আমরা। চোখেমুখে সীমাহীন ক্ষোভ, রোষ, বিরক্তি ফুটিয়ে নির্বাক তাকিয়ে থাকি অতীনের দিকে।

অতীন বুঝি দেখেও দেখে না তা। দেখলেও পাত্তা দেয় না। তিলমাত্র অপরাধবোধ ফোটে না ওর চোখেমুখে। বরং এমন একটা জম্পেশ উপন্যাস দেখেও আমরা তিলমাত্র অভিভূত নই বলে বাহ্যত খুব আহত দেখায় ওকে। বলে, আচ্ছা তোরাই বল্ না, নিরস কাগজের বুকে, কালো কালো হরফে, ফনী ছুতোর, কালা -অতুল, রঘুনাথ মুন্সী, শুকদেব, ল্যাংটেশ্বরদের মতো অপার রহস্যময় মানুষগুলোকে কি এমন করে ফুটিয়ে তোলা যেতো ? ভেবে দ্যাখ্, ক্লাস থ্রি অবধি বিদ্যে, অথচ কাঠের যেকোনও দুরূহ হিসেব মুখেমুখে নির্ভুল বলে দেয় ! মার্বেল পাথরের ওপর স্রেফ ছেনি-বাটালি দিয়ে যখন বানিয়ে ফেলে গোলাকার ছিদ্র, কাঁটা-কম্পাস দিয়ে যে-কেউ মিলিয়ে দেখে নিতে পারে, সেই ছিদ্রের কেন্দ্র থেকে পরিধির যে-কোনও অংশের দূরত্ব একেবারে সমান ! কেবল চোখের আন্দাজে বলে দিতে পারে, খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ারের বানানো প্ল্যানে ভুল রয়েছে ! কিংবা তমালদের চারতলা বাড়িটি একটুখানি বাঁকা ! অথচ ওরাই আবার এমন ভুলভাল এস্টিমেট দেয় গেরস্তকে ....., এমন অকারণে ঘোরায়, কথায় কথায় এমন মুড়ি-মুড়কির মতো মিছে কথা বলে, মেহগিনি কাঠের টুকরোটিকে গেরস্তের চোখ এড়িয়ে এমন সুদক্ষ হাতে ভরে নেয় যন্ত্রপাতির ব্যাগে .... আটআনা এক টাকার জন্য এমন ভিখিরির মতো হ্যাংলামো করে ...., একটু বেশি পে-মেন্ট করে ফেলেছ কি , ডুব মেরে দেবেই পরের দিন .....।

ভেবে দ্যাখ্, দেয়ালের গায়ে কিংবা মার্বেলের মেঝেতে যখন দা-ভিঞ্চির মতো নিখুঁত কারুকার্য আঁকে, সারাক্ষণ এমন বুঁদ হয়ে থাকে ঐ নিয়ে ...., তখন একেবারেই বিধাতার মতো লাগে ওদের, আবার দিনান্তে, কাজ শেষ করে, সামান্য ক'টি টাকা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে কুঁজোপানা শরীরটাকে টানতে টানতে, এমন দুঃখী দুঃখী মুখে চলে যায় !.... হতো না, বুঝলি, ঝুলিতে ক'টি মাত্র জীর্ণ শব্দকে পুঁজি করে এদের কানাকড়িও ফোটানো যেতো না খসখসে কাগজের বুকে। তাই জন্যই তো আমি তেমন ছেলেমানুষি চেষ্টা করিই নি।

আমরা অতীনের সদ্যসমাপ্ত বাড়িটার সামনে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। অতীনকে আপাদমস্তক দেখতে থাকি অপার বিস্ময়ে। খুব ক্লান্ত লাগছিল ওকে। এই এক বছরে ওর শরীরের যাবতীয় মেদ ঝরে গিয়েছে নিঃশেষে। খুব হাড় জিরজিরে রোগা হয়ে গিয়েছে অতীন। কেবল ওর চোখদুটির দিকে তাকিয়েই আমরা

বুঝতে পারি, চোখের তারায় যেন প্রসবশেষেব অবসাদ মাখানো তৃপ্তি। ওর ক্লান্ত মুখের খাঁজেভাঁজে খেলা করছিল এক বিরল জাতের অচেনা রোদ্দুর। বলি, যাগগে, ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে উপন্যাস তো লিখলি। এবার শেষ কর এই খেলা। ফিরে আয় আসল খেলায়।

আমাদের কথা শুনে অতীন খুব বিপন্ন চোখে তাকায়। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, এখনই কেমন করে ফিরি বল্ দেখি .... এখন আমার বলে কত কাজ! প্রথম খণ্ডটাই পুরোপুরি শেষ হয় নি। .... লক্ষ করে দ্যাখ্, অনেককিছুতেই ফিনিশিং-টাচ দিতে বাকি.... সেসব শেষ হলে পর তখন দ্বিতীয় খণ্ডটা ধরতে হবে যে ....।

—আবার দ্বিতীয় খণ্ড! আমরা বিষন্ন চোখে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে।

—এমন আজব এক দুনিয়া ...., এত এত বিচিত্র মানুষ, সবাই বলছে, আমাকে দ্যাখ্ ...., মাত্র এক খণ্ডে হয় নাকি? দ্বিতীয় খণ্ডটা তো লিখতেই হবে, ...তারপর , সম্ভব হলে তৃতীয় খণ্ডটাও ....। শোন্, এখন আমার মরবারও সময় নেই রে ....। আচ্ছা রজত, ক্যান্টিলিভার দিয়ে দোতলার ব্যালকনিটা ফুট-দুয়েক বাড়িয়ে নিলে কেমন হয? ....আচ্ছা রণেন, অনেকে বলছে বটে, কিন্তু দোতলার জানলাগুলোতে লোহার ফ্রেম দেওয়া কি ঠিক হবে? দু'দিন বাদেই মরচে-টরচে ধরে ...। ....আচ্ছা স্বপন, বউবাজার এলাকার কোথায় নাকি চিলেকোঠার জন্য কাস্ট-আয়রনের ঘোরানো সিঁড়ি বানিয়ে দেয়? ঠিকানটা জানা আছে তোর? ....আচ্ছা পীযূষ ....।

কবিগুরুর স্বদেশ

১.

তোরা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছিস তো?

এমন প্রশ্নে লোকগুলো আলগোছে তাকায়। কথাটা তাদের একটা ইন্দ্রিয়ও ছোঁয় না। বলে, কে জানে বাবু, আমরা উয়াকে নাই চিনি গ'। উ আমাদ্যার পাড়ায় নাই থাকে।

কে যেন বলেছেন, যখন মনে ভীষণ অহংকার জমবে, তখন উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাও। দেখবে, লজ্জায় তোমার সারা শরীর কুঁকড়ে যাবে নিমেষে। বসন্ত পালেরও এখন সেই অবস্থা।

সেই কোন্ সকালে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। কোচ-বিড়াইকে বাঁয়ে রেখে ওঝা-পুল পেরিয়ে হেঁটেছিলেন বিড়াইয়ের পাড় বরাবর। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। পায়ের তলায় গেরুয়া রঙের কাঁকর বিছানো সড়ক। রাস্তার দু'ধারে মরা মরা খেত। ছককাটা ধুসর রুমাল ....। মাঝেমধ্যে পলাশের ঝোড় ....। গাছগাছালি ....। গাঁ....।

একটু আগেই পাশ দিয়ে সাঁইসাঁই সাইকেল চালিয়ে বিষ্টুপুরের দিকে চলে গেল এক ছোকরা। বছর পনেরো-ষোল বয়েস। বসন্তর দিকে আড়নয়নে তাকায়। চিনতে পারার কথা নয়, তবে ইস্কুলে-টিস্কুলে পড়ে নিশ্চয়ই, খোঁজখবর কি রাখে না একেবারেই? জানে না কি, তাঁর বিখ্যাত হয়ে যাবার কথাটা? যদি সাইকেল থামিয়ে শুধোতেন বসন্ত, আমাকে চেনো না, ভাই? আমি বসন্ত পাল। ঐ যে, বিষ্ণুপুর স্টেডিয়ামে বিশাল স্টেজ বেঁধে উৎসব হলো গোটা দিন ধরে, আমাকে নিয়েই তো ঐ উৎসব। ছেলেটা শহরে-টহরে যায়, বাসে-টাসে চড়ে, ঐদিন স্টেডিয়ামের সামনে বিশাল গেট, ভেতরে জমকালো মঞ্চ, ঝলমলে আলো, দেখে নি কি? ভাবতে ভাবতে সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ে যায়। ওরা সম্বর্ধনা-সভায় বসন্তর সম্বন্ধে কিছুটা বাড়িয়েই বলেছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, গ্রাম তাঁর রক্তের মধ্যে নৃত্য করে। গ্রামের প্রতিটি ধুলিকণার সঙ্গে তাঁর আজীবন নিবিড় পরিচয়। জীবনে, তাই গ্রাম সম্পর্কে একটা অক্ষরও বানিয়ে লেখেন নি বলেই তাঁর বিশ্বাস। বানিয়ে লেখার দরকারই পড়ে না। যা লেখেন, সবই দেখা, চেনা, ... হাতের তালুর মতো, ... গ্রামের ছবিগুলোকে মনের খোপ থেকে তুলে তুলে আনেন অনায়াসে।

গ্রাম তাঁর নিজস্ব আয়না। তাঁর একান্ত সংসার। একমাত্র স্বদেশ।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওরা সেদিন বললো, বসন্ত পাল মশাই যখন গাঁয়ের বর্ণনা দেন, তখন মনে হয়, চোখের সামনে নিটোল গ্রামটি তাব যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে একেবারে সপ্রাণ উপস্থিত।

তা তো হবেই। ক্যালেন্ডারে গাঁয়ের ছবি দেখে তো গাঁযের বর্ণনা লেখেন না বসন্ত। গাঁয়ের গল্প-কবিতা লিখতে গিয়ে যাঁরা দু'লাইন অন্তর 'ফিঙে দোল খাচ্ছে' 'কাক ঢুলছে' 'গরু চরছে' গোছের মোটা দাগের আঁচড় কেটেই নিজের প্রতি গদগদ হয, তিনি তো তাদের দলে নন। এক বিখ্যাত শহুরে গল্পকারের বর্ণনায় বসন্ত পড়েছিলেন, 'শেষ রাতে চাঁদ উঠলো ....রুপোর টাকার মতো গোল চাঁদ ....।' 'গাঁড়োল! গাঁযে একটা রাতও কাটায় নি। কাটালেও শেষ রাত অবধি জাগে নি। নিচু ক্লাসের ভূ-গোলটাও মন দিয়ে পড়ে নি। শেষ রাতে কখনো গোল চাঁদ ওঠে? আসলে, আপাত-সরল মনে হলেও গ্রামকে ঠিকঠিক চিনে ওঠা অত সোজা নয। তবে, বসন্ত তা পারেন। শহরে জন্মালেও, বেড়ে উঠলেও, তিনি তো বিগত বিশ বছর শুধু গাঁয়ের রাস্তাঘাট, গাছগাছাল, আর মানুষকেই দেখেন নি, দেখেছেন গাঁযের আত্মাকে। তিনি জানেন, কোন্ ঋতুতে বনে বনে কোন্ ফুল ফোটে। কোন্ গাছে কখন পাতা ঝরে, নতুন পাতা গজায়। পাখি-পাখাল কখন বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। কোন্ ঝোপে ভাম থাকে, কোন্ ঝোপে ডাহুক। তিনি জানেন, লটাহীড়ের রূপা বাউরি কেন গভীর রাতে পথ হাতড়ে হাঁটে।

এইসব জানা নিযেই তাঁর গর্ব। এই সবকিছু দিযেই তিনি তাঁর কবিতার শরীর ভরিয়ে দিয়েছেন নিঃশেষে।

২.

বেসাম বেলায় বসন্তকে দেখে কালাচাঁদ বাউরি কোঁচকানো চোখে হাসে, বাবু যে বহুৎদিন বাদে গো? সুয্যিদেব কুন্ গগনে উইঠেছ্যান আইজ?

পাড়ার মধ্যিখানে ঝাঁকড়া কুসুম গাছ। তামাটে লাল পাতায় ভরে যাবার কথা এখন। কিন্তু বসন্ত নজর করে দেখলেন, পাতার রঙটা বড্ড ফ্যাসফ্যাসে। ওরা তার তলায় বসে শালপাতা সেলাই করছিল। সুখীবুড়ি, রঙী, পদম বাউরি, ওর বউ ...। গোল হয়ে বসেছে সবাই। পাশে ডাঁই করা সবুজ শালপাতার বাণ্ডিল। নিপুণ হাতগুলো চলছে যন্ত্রের মতো। নিমের কাঠি দিয়ে সেলাই করে করে শালপাতার থালা বানাচ্ছে ওরা। কালাচাঁদ বাউরি অল্প তফাতে চিকুম গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একমনে ডাং-জাল বুনছে। ওর পাশটিতে বসে রতন বাউরি কী বিষয়ে যেন শলা নিচ্ছে। কিন্তু বসন্ত জানেন, কোনও ব্যাপারেই শলা নিচ্ছে না সে। আসলে, রঙী রয়েছে বলে সেও ঐ এক অছিলায় ঘুরঘুর করছে আশেপাশে, কেন কি, রঙীর সঙ্গো ছোকরার যে ভেতরে ভেতরে ঘোরতর আসনাই।

এখন ঘোর চৈত্রমাস। বনেবনে কচি পাতার প্লাবন। এ সময়টা ওদের দিনরাত শুধু পাতা সেলাই।

...তোরা কেমন ছিলি রে? স্মিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে শুধোন বসন্ত।

এমন প্রশ্নে সহসা পরিবেশটা কেমন জানি ভারী হয়ে আসে। এখন চারপাশে কেবল পাতা সেলাইয়ের শব্দ ....।

এক সময় কালাচাঁদ বাউরি লম্বা হাই তোলে। সরুপানা হাতদুটিকে পাখির ডানার মতো দুদিকে টানটান ছড়িয়ে দিয়ে আড় ভাঙে। বলে, আমাদ্যার ফের থাকাথাকি! দিনটা কাইট্‌লে মনে হয়, একটা দিন গেল। জন্তু-জানোয়ারের তুল্য বাঁইচে আছি মশয়।

কথাটা ভারী বিঁধে যায় বুকের মধ্যে। বসন্ত জানেন, নিজেদের যখন অবলীলাক্রমে জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে এরা, তখন শহুরে ভদ্রলোকদের প্রতি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন অভিমান আর বিতৃষ্ণা কাজ করে এদের মনে। একটা বোকা গোছের হাসি দিয়ে কালাচাঁদের কথাটা হজম করেন বসন্ত।

মহুল, নিম আর চাকোলতা গাছের ঘোরাটোপের মধ্যে খান-দশবারো ঝুপড়ি। ময়লা কাপড়-চোপড়। অপরিচ্ছন্ন উঠোন। দু'চারটে কৃশকায় শুয়োর। হাড়-জিরজিরে কুকুর। গাছের তলায় দু'চারটে উদোম, কংকালসার বাচ্চা। বসন্তকে জুলজুলে চোখে দেখছিল ওরা। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, অনাহার আর অপুষ্টি তিলতিল গ্রাস করেছে নিষ্পাপ শরীরগুলোকে। একে তো মানুষের মতো বাঁচা বলে না। এত রুক্ষতা আর কৃপণতার মধ্যে স্বাভাবিক বাড় হতে পারে না কারোর।

এই বিষয়টা নিয়ে কথা উঠলেই কালাচাঁদ বাউরির দু'চোখের ঘোলাটে মণি জুড়ে নেমে আসে অন্যতর ছবি। অন্যতর ছায়া ...। অন্যদিনের স্মৃতি ...। বলে, কলিযুগ ভোর হইয়েঁ আইছে আইজ্ঞা। আর বেশি দেরি নাই। ধ্বংস হইয়েঁ যাব্যেক সব। ইসব হইল্যাক মহাপাপের ফল।

কার মহাপাপের ফল সে ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই কালাচাঁদের। কিন্তু সে এমনই বিশ্বাসে অটল যে, অজস্র মহাপাপের ফলে এ সংসারের সবকিছু ক্ষয় হচ্ছে দিনদিন। তিলতিল অধঃপতনের দিকে চলেছে সবকিছু। এই যে দেশ জুড়ে খরা, দুর্ভিক্ষ, নিরন্তর হানাহানি, মানুষের মধ্যে সীমাহীন লালসা, ... এসব তারই ফল। পেছনের দিনগুলোকে নিয়ে কালাচাঁদ বাউরির গর্বের শেষ নেই। সে ছিল আইজ্ঞা সইত্যো-যুগ। উয়ার সবকিছো ছিল সাচ্চা। মাঝেমাঝে সেই সত্যযুগের সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার দিনগুলোকে একাকার করে ফেলে কালাচাঁদ। তখন নাকি টাকায় ষোল সের চাল মিলতো। এক পয়সায় আটটা ডবকা সাইজের সুপারি। টাকায় এক সের গাওয়া ঘি। দু'আনায় একখানা নৈতা। তখন দুনিয়ার সব মানুষ সত্যি কথা বলতো। জোচ্চুরি, লাব্বাকির ধার ধারত না কেউ। সে ছিল এক যুগ বটে! তখন আকাশ জল ঢালতো নিয়মমাফিক। পশুপ্রাণী, কীটপতঙ্গ, গাছপালার ঠিক-ঠিক অনুপাতে জন্ম-মৃত্যু হতো। ষড়ঋতুর বিবর্তন হতো সঠিকভাবে। সেই সত্যযুগের সূর্যটার তেজও ছিল অন্য ধরনের। সে যুগের স্বর্গটাও ছিল মানুষের খুবই কাছাকাছি। ঠাকুরদ্যাবতারাও কথায় কথায় দেখা দিতেন মানুষকে। কথা বলতেন, রাগ-রোষ ফলাতেন, বর দিতেন, শাপ দিতেন ...। বর্তমান যুগটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না কালাচাঁদ বাউরি। এই যুগটাই

হলো দো-আঁশলা। এ-যুগের কোনও কিছুই আগেকার মতো সাচ্চা নয়। সবকিছুই দু'নম্বরি। বলে, উই যে মধ্য-গগনে সুয্যুটা ভাইল্‌ছেন আইজ্ঞা, উটাও দু'লম্বরি। আসল সুয্যুদেব বহুৎদিন আগেই অস্ত গেছেন, আর উদিৎ হন নাই।

—কী করে বুঝলে, এটা আসল সূর্য নয়? বসন্ত দু'চোখ কপালে তুলো শুধোন।

পরম তাচ্ছিল্যে মধ্যগগনের জ্বলন্ত সূর্যের ওপর চোখ ফেলে কালাচাঁদ বাউরি। বলে, ইট্যা হীনমানিয়াটা! এক্কেবারে দো-আঁশলা! দেখলেই মালুম হয সেটা। সে সুয্যুর কত তেজ ছিল আইজ্ঞা!

—বল কি! বসন্ত অপার বিস্ময়ে শুধোন, এর কোনও তেজ নেই? এই তেজেই তো জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জ্বলছে হে।

—এ তেজের কুনো দাম নাই আইজ্ঞা। কালাচাঁদ বাউরি পরম অবজ্ঞায় ঠোঁট ওলটায়, এ হইল্যাক মারণ-তেজ। সে সুয্যুর ছিল অন্য তেজ। সেই তেজে আকাশে মেঘ জইম্‌তো, বরষা ঝইর্‌তো, গাছ-গাছাল সবুজ হইযেঁ রইতো বারোমাস। ক্ষেতে-খামারে ফসল ফইল্‌তো ধানের শীষে ক্ষীর, মাছের পেটে ডিম, গাইয়ের বাঁটে দুধ, মেয়া-মাইন্‌ষের গভ্‌ভে সুসন্তান হইতো আইজ্ঞা। আর, এ শালার মুরাদ নাই একতিল। খালি অষ্টপ্রহর আগুন ঝরাঁই ঝরাঁই খাক কইরে দিল্যাক ভূ-ভারত।

৩.

লটাহীড় গাঁ থেকে জঙ্গলটা দূরেই শাল, পিয়াশাল, ছাতিম, চিকুম, কেঁদ আর মহুলের নিবিড় সমাবেশ। গাঁযের নামেই জঙ্গালের নাম। লটাহীড়ের জঙ্গাল। এককালে জঙ্গালটা গাঁয়ের একেবারে লাগোয়া ছিল। এখন খানিকটা দূরে সরে গিয়েছে।

রূপক সেন একটু দরকচা ইনটেলেকচুয়াল। বসন্তর সঙ্গে লটাহীড় গাঁয়ে সখের সফরে এসে গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করে, আসলে মানুষের জীবন থেকে অরণ্য সরে যাচ্ছে। চোখ মটকে বলে, দ্যাট মিনস্‌ সিভিলাইজেশন।

—এই জন্যেই তোকে সবাই দরকচা বলে।

—দরকচা? দরকচা মানে?

—দরকচা মানে ....। বসন্ত মিটিমিটি হাসতে থাকেন, ...কী হে কালাচাঁদ, বাবুকে দরকচা মানেটা বুঝিয়ে দাও।

বসন্তর কথায় আতাবীজের মতো কালো কুচকুচে দাঁত বের করে হাসে কালাচাঁদ বাবু মোদ্যার সব কথা শিখে ফেলাইছ্যান গ'!

তারপর সে রূপক সেনকে 'দরকচা'র মানে বোঝাতে থাকে বিতাং করে। বলে বাবুমশয়, বেগুন খেয়েঁছেন? এক-একটা টুকরা কেমন হাতে টিপলে তলতল করে, দাঁত কাটলে কচকচ করে, দরকচা বলে উই চিজকে।

বাকিটা বসন্তই প্রাঞ্জল করেন, টগবগে জলে অনেকক্ষণ ডোবাডুবি করে তার রঙ হলো সেদ্ধ বেগুনের মতো। সে নিজেও ভাবে, সুসিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যে খায়, সে মুহূর্তে বোঝে, আদৌ সেদ্ধ হয় নি।

—মানে, আধাসেদ্ধ। তাই তো?

বসন্ত বলেন, না। আধাসেদ্ধর সঙ্গে দরকচার তফাৎ হলো, আধাসেদ্ধকে ফের কড়াইতে চাপালে সে পুরো সেদ্ধ হতেও পারে, কিন্তু দরকচা মেরে গেলে সে আর কোনদিনও সেদ্ধ হবে না।

আসলে, রূপক সেন এদের জীবনের কিছুই জানে না। সে কেবল মহুয়া আর তাড়ির লোভে বসন্তর সঙ্গে এসব পাড়ায় আসে। তার যা-কিছু গরজ ঐখানেই। কাজেই, দরকচা নিয়ে কূটকচাল করে সময় বরবাদ করতে চায় না সে।

এই মরসুমে সকাল থেকেই বাতাসে আগুন লাগে। গভীর রাত অবধি সে বাতাস ঠান্ডা হয় না। এই রোদ্দুর-গেলা শরীরে আজ একটুখানি তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে বসন্তরও। কিন্তু ওঁকে তাড়ি দিতে এদের রাজ্যের সঙ্কোচ। বলে, তাড়ি কি বাবু ভদ্দরনোকে খায়? এসব ছোটলোকদের খাইদ্যো।

ওদের অজ্ঞতায় বসন্ত মনেমনে হাসেন। নিজেদের সবকিছুকে এইভাবেই হীন ভেবে আসছে ওরা কতদিন ধরে! বলেন, তাড়ি কত উপকারী, তা জানো? ঐ বিষয়ে নিজের যাবতীয় পান্ডিত্য উগরে দেন বসন্ত। বলেন, তাড়িতে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ঠাসা রয়েছে, জানো না?

তাড়ি হেন সামান্য চিজকে এমন কঠিন ইংরেজি বিশেষণে ভূষিত করায় কালাচাঁদরা ঘাবড়ে যায়। এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সম্ভ্রম জাগে দু'চোখে। বসন্তর প্রতি নয়, তাড়ির প্রতি।

৪.

—তো, সে যাক সে-কথা। কালাচাঁদ বাউরি সূর্যের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বলে, অ্যাদ্দিন কুথা ছিলেন আইজ্ঞা?

বসন্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অনেকক্ষণ বাদে প্রিয় প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার জো পান তিনি। মৃদু হেসে বলেন, আমি এখানে ছিলুম না হে। কোলকাতা গেছলুম।

বসন্ত এবার আসল কথাটা পাড়বার জন্য প্রস্তুত হন।

—কোইলকাতা! সে তো বহুৎ দূর আইজ্ঞা!

সে কথার জবাব না দেন না বসন্ত। গলাটা বার-দুই ঝেড়ে নিয়ে বলেন, আমি একটা পুরস্কার পেলুম তো ....।

কথাটায় তেমন করে গা করলো না কেউই। সুখী-বুড়ি পাতা ফুঁড়তে ফুঁড়তে বলে, উখ্যেনে হাবড়ার পোল আছে, লয় গো?

কী কথার পিঠে কী প্রশ্ন! বসন্ত মনেমনে ঈষৎ বিরক্ত। বলেন, আছে। আরও অনেক কিছু আছে কোলকাতায়।

—একবার কোইল্‌কাতায় যাবার খোব ইর্চা ছিল ....। কালাচাঁদ বাউরি জালে ফাতি চালাতে চালাতে বলে, সেই সাধটুকু আর মিটল্যাক নাই।

শালপাতার গায়ে চোখ বিঁধিয়ে সুখী-বুড়ি বলে, মাইন্‌সের ক'টা সাধ আর মিটে!

মনেমনে খুবই বিরক্ত হচ্ছিলেন বসন্ত। হাওড়ার পুলের উচ্ছ্বাসটা কাটতেই

ঝোলা থেকে সুদৃশ্য কৌটোটা বের করেন। ডালা খোলেন সাবধানে। ভেতরে নীল মোড়কের মধ্যে সোনালি চাকতিটা। আচমকা সূর্যের আলো পেয়ে খুশিতে ঝিকমিকিয়ে ওঠে তার বুক।

রঙীই সর্বপ্রথম তার ভাসাভাসা চোখ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলো বস্তুটি। ওর বিস্ময় ভরা চোখদুটো অকস্মাৎ এক আশ্চর্য ভাষা পেয়ে যায়।

—এইটে পেলুম। বসন্ত লাজুক চোখে হাসেন।

এতক্ষণে বুঝি সবার নজর পড়ে বস্তুটির ওপর। কালাচাঁদ বাউরি দূর থেকে চোখ কুঁচকে দেখতে থাকে সোনালি চাকতিটাকে। বলে, ইট্যা তো বোধ লেয় ম্যাডেল গোছের কিছো?

মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে সায় দেন বসন্ত। বলেন, আমি এ'বছরের সেরা কবির সম্মান পেয়েছি। মেডেলটা সে কারণেই।

কালাচাঁদ বাউরি জালের ফাতিতে চোখ বিঁধিয়ে রেখে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। বলে, আমিও যে কত্তো ম্যাডেল পেইয়েঁছিলম ছা' বেলায!

—তুমি! মেডেল!

—কিষ্টোযাত্রায় রাধা সাজতম্ যে। কালাচাঁদ বাউরি মিটিমিটি হাসতে থাকে, ...আসরে নামলেই ম্যাডেল।

সে-কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে রঙী। সাদা দাঁত ঝিকমিকিয়ে ওঠে। কালাচাঁদের দিকে অপাঙ্গো তাকিয়ে বলে, রাধা সাইজ্‌তে তুমি, বুঢ়াদাদা? মেইয়া সাইজ্‌তে?

—থাম্ ছুঁড়ি। নাতনিকে ধমক দেয় কালাচাঁদ। তাতে করে রঙীর হাসি আরও বেড়ে যায়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সর্বাঙ্গা কাঁপিয়ে হাসতে থাকে সে।

বসন্তকে দেখলে এমনিতে খুব লজ্জা পায় রঙী। আবার কেন জানি চোরা চোখে বারবার তাকায় ওঁর দিকে। ওকে মাঝে-মাঝেই ক্ষেপান বসন্ত। ভীষণ লজ্জা পেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। নানান ছলে বাইরে আসে বারবার।

আজ একটা চেক-চেক সবুজ শাড়ি পরেছে রঙী। কালো একঢাল চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। দেখতে দেখতে রতন ছোকরা বুঝি এক্কেবারে দিওয়ানা। কুসুম গাছের আশপাশ ছেড়ে নড়ছেই না।

রঙী হাসছিল। মাঝেমাঝে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল বসন্তকে। মিষ্টি হেসে বসন্ত বলেন, আসলে, গ্রাম এবং গ্রামের মানুষকে নিয়ে কবিতা লেখার জন্যই ওরা মেডেলটা দিয়েছে আমাকে।

শুনে উপস্থিত সবাই ঠোঁট খুলে হাসে। সরলপানা হাসি।

সুখী-বুড়ি বলে, আমাদ্যার লিয়ে ফের কী লিখ্‌লি গো? আমরা ফের মানুষ নাকি?

এসব কথা শুনলে চিরকালই বুকে ব্যথা পান বসন্ত। কেন যে এত অভিমানী এরা! বলেন, শুনবি, কী লিখেছি? তবে শোন্।

ঝোলার ভেতর থেকে কবিতার খাতা'টি বের করেন বসন্ত। গলা চড়িয়ে পড়তে শুরু করেন।

শরীর জুড়ে সবুজ চেক-চেক শাড়ি ....,
মাথায় কালো চুলের ঢেউ-খেলানো মেঘ ....,
মেঘের আড়ালে বিজলি খেলে চোখের তারায়,
সরু কোমর জুড়ে চকচকে রুপোলি বিছে ....
বেড়-খাওয়া বিড়াইয়ের জল ....,
মনে হয়, শুধু মনে হয়,
লক্ষ চুমো এঁকে দিই ....
সে মেয়ের কপোলে চিবুকে ....।

বসন্তর মনে পড়ে, গাঁয়ের রূপ নিয়ে লেখা এই কবিতাটির প্রশংসা করতে করতে মঞ্চে ওরা সেদিন ফেনা বের করে ফেলেছিল কষে। কিনা, বসন্ত পাল মশাই যখন গাঁয়ের বর্ণনা দেন......।

কালাচাঁদের দল কান খাড়া করে শুনছিল কবিতাটি। উৎসাহ পেয়ে পুরো কবিতাটাই পড়ে ফেলেন বসন্ত। শুনতে শুনতে সুখী-বুড়ির চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে ক্রমশ। রতন নামের ছোকরাটির মুখমন্ডলের রেখাগুলিতে ঘনঘন ভাঙচুর ঘটে। চোখের মণি স্থির হয়ে আটকে থাকে বসন্তর মুখের ওপর।

একসময় টানটান উঠে দাঁড়ায় সুখী-বুড়ি। সারা মুখের অজস্র ভাঁজের কারুকার্যের মধ্যে চোখদুটি আশ্চর্য রকমের জটিল হয়ে ওঠে। সেই চোখদুটি আকাশে তুলে সে নিরীখ করতে থাকে বেলা। তারপর বসন্তর থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, ব্যালা গড়াই আসছে। তু এবার ঘরকে যা বাবু। আমাদের ইখন ঢের কাজকাম রয়্যেছে। ইখনতক্ক একদানা পেটে পড়ে নি কারো। তুয়ার ইসব ঢং-এর কথা শুইন্‌বার সময় নাই আমাদ্যার।

সুখী-বুড়ির কথাগুলো চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে বসন্তর পিঠে। আচমকা অমন খেপে গেল কেন বুড়ি! বলে, মাসি কি রেগে গেলে নাকি আমার ওপর?

সুখী-বুড়ি এবার বসন্তর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ওঁর চোখে সরাসরি চোখ বিঁধিয়ে বলে, আসছু, বসছু, কথাবার্তা বলছু, কিছো বলছি নাই মোরা, কিন্তু রঙীর পিছে লাগাটা তুই ছাড় বাবু।

—রঙীর পেছনে! বসন্ত নিদারুণ চমকে ওঠেন।

—হঁ বাপ। বেশ চোখাচোখা গলায় সুখী-বুড়ি বলতে থাকে, ...উ মা-মরা মেয়া। উয়ার বিয়ার কথাবার্তা চলছে। উয়ার সাথ তুয়ার পীরিত কি মানায়? তুয়ারা ভদ্দরলোক, আমরা হইলম নীচ জাত।

—এসব তুমি কী বলছো মাসি! প্রবল যন্ত্রনায় কাতরে ওঠেন বসন্ত, ...এসব কথা আমি স্বপ্নেও....।

—এ আমার মেয়া-মাইন্‌সের চোখ বাবু। সুখী-বুড়ি তীক্ষ্ণ গলায় বলে চলে, ...তুয়ার উই সবুজ চেকের শাড়ি, আর মেঘের পারা চুলের বাখান আমরা বুঝি না বটে, তেবে শুইনতে শুইনতে রঙী ক্যানে উঠে পালাল্যাক, সেটা বুঝেছি সাথেসাথ।

আর, ঘাড় ঘুরিয়ে বসন্ত দেখেন, সত্যিসত্যি রঙী কখন জানি চলে গিয়েছে ঘরের

ভেতরে। এবং দেখতে পান, সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রতন বাউরির মুখটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে।

গলায় তীব্র বিস্ময় ফুটিয়ে বসন্ত বলেন, দ্যাখো দিকি, কী কথার কী অর্থ! এটা হলো কবিতা। গাঁ'কে নিয়ে কবিতা। বুঝিস নে কেন!

—কপিতা তো বুঝলম্। সুখী-বুড়ি আরও তেতে ওঠে, ...ত' উয়াতে রঙীর শাড়ির কথা ক্যানে আইজ্ঞা?

—ওটা রঙীর শাড়ি নয় রে। পাগলের মতো অস্থির মাথা নাড়াতে থাকেন বসন্ত, ...বর্ষাকালে চারপাশে আল দেওয়া ছক-বন্দী খেতগুলোতে যখন সবুজ ধানের চারা ....।

কে শোনে কার কথা! সুখী-বুড়ি ঝনঝনিয়ে বাজতে থাকে। সমানে গজগজ করতে থাকে সে। বলে, তুয়ারা শহরের লোক, ঘরে অভাব নাই তুয়াদ্যার, মহুয়া, তাড়ির টানে মাঝেমাঝে আইসু, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়াকে লিয়ে উসব উল্টাপাল্টা কথা লেখা কী শোভা দেয় তোকে?

ওর চিৎকারে পাড়ার মানুষ জমায়েত হতে থাকে। পথ-চলতি বেপাড়ার মানুষজনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুখী-বুড়ির কথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরে ওরাও একটু একটু করে তেতে ওঠে। সুখী বুড়িকে ষোলআনা সমর্থন করে ওরা। বটে তো। শহরের লোকগুলা বড়ই ঢ্যামনা হয়।

—অতই যদি টান তো বিয়া কইরে লে রঙীকে। চুইক্যে যাক ল্যাঠা।

—তাই ফের করে! শহরে বিয়া-থা কইরে ঘর সংসার করবেক, আর, গাঁয়ে ঢুইকে আমাদ্যার মেয়াদের সাথ ঢ্যামনামি করবেক।

—ঠিক। গরিবের ঘরের মেয়াদের তো কুনো ইজ্জত নাই উয়াদের পাশ। উয়াদের শাড়ি লিয়ে, মাথার চুল লিয়ে, চোখ, নাক, কোমর লিয়ে যা খুশি লিখে ফেলা যায়।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছিল। উঠতি ছোকরাদের চোখমুখের ভাষা বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। বিশেষ করে রতনের চোখদুটো যেন সাপের মতো জ্বলছিল। তাই দেখে মনেমনে শঙ্কিত বোধ করেন বসন্ত। আর, বিপদে পড়ে মানুষ যেমন ইষ্টনাম মুখে নেয়, বসন্তও তেমনি একেবারে শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন। বলেন, আমার কথা ছাড়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তো রূপসী গ্রামকে নিয়ে এমনিতরো অজস্র কবিতা লিখেছেন।

—তাইলে উটাও এক ঢ্যামনা। নিঃসঙ্কোচে বলে বসে সুখী-বুড়ি।

ছোকরাদের মুখগুলো হিংস্র হয়ে উঠছিল ক্রমশ। এতদিনের চেনা গ্রামটি, পরিচিত মানুষগুলি যেন একটু একটু করে অচেনা হয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে। মনের ভেতর থেকে বারবার চেতাবনি আসছিল, ছোকরাগুলো যেকোনও মুহূর্তে কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে। বিশেষ করে রতন বাউরি যেকোনও মুহূর্তে ঘটিয়ে ফেলতে পারে যে-কোনও অঘটন।

আর ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকটা সমীচীন মনে করেন না বসন্ত। একসময় পিছু হটতে থাকেন। কৌটোবন্দী মেডেলটিকে মুঠোয় ভরে নিয়ে হাঁটতে থাকেন বিষ্ণুপুরের উদ্দেশে।

পেছন থেকে ছোকরাদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে, পালাচ্ছ ক্যানে? দাঁড়া। রঙীকে লিয়ে কেন লিখলি উসব, জবাবটা দিয়ে যা।

এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি রতন বাউরি। আচমকা সে চেঁচিয়ে ওঠে, অ্যাই, ধর্ তো শালাকে।

বেগতিক বুঝে হাঁটার গতিটা বাড়িয়ে দেন বসন্ত। একসময় প্রায় ছুটতে থাকেন। পেছন থেকে হাফ-ডজন উত্তেজিত পায়ের শব্দ ভেসে আসে তাঁর কানে।

সূর্যটা মধ্য গগন থেকে হেলে পড়েছে। এক অদৃশ্য চাবুকের ঘায়ে বসন্তর পিঠটা নিঃশব্দে জ্বলছে। বিড়াইয়ের পাড় ধরে ছুটছেন তিনি। নদীর জলে তাঁর বিপন্ন ছায়াটাও ভাঙচুর হতে হতে ছুটছে...।

ছুটন্ত অবস্থায় বসন্ত দেখতে পান, তাঁর আগে আগে আরও বহু মানুষ ছুটছেন। বরেণ্য মানুষ তাঁরা, দাড়ি, টিকি, কোছা, আলখাল্লা সামলে, খানাখন্দ-ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে, অনভ্যস্ত পায়ে ছুটছেন দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। কোমল উন্মুক্ত পিঠ ফেটে রক্ত ঝরছে তাঁদেরও। মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে বুঁদ হয়ে যেতে থাকেন বসন্ত।

মনে অহংকার জমলে নাকি আকাশের দিকে তাকাতে হয়। আকাশ মানুষের চোখের সামনে এক নীলাভ আস্তরণ। নীল নাকি শূন্যতারই এক বর্ণ। এই জন্যেই বুঝি সোনার মেডেলও সোনার হয় না আজকাল, অরণ্য সরে গেলেই সভ্যতা আসে না। সেই জন্যেই বুঝি কালাচাঁদ বাউরিদের চোখে মধ্য-আকাশের সূর্যটাও দু'নম্বরী... দো-আঁশলা।

আচমকা পেছনে পায়ের শব্দগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও জীবন্ত। এক ঝলক পিছু ফিরে বসন্ত দেখতে পান, তাঁর সামান্য সময়ের অন্যমনস্কতার সুযোগে ছোকরাগুলো কখন জানি দৌড়ের গতি বাড়িয়ে নিয়েছে। প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। যে-কোনও মুহূর্তে ধরে ফেলতে পারে বসন্তকে।

আচমকা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকেন বসন্ত। কাঁকর বিছানো এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় এভাবে ছোটার অভ্যেস নেই কোনকালেই। ঘনঘন হোঁচট খাচ্ছিলেন। সারা শরীর ভিজে গিয়েছে ঘামে। কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। দেখতে পাচ্ছিলেন, ওঁর ডানদিকে উল্টোপানে ছুটে চলেছে বিড়াই...।

অকস্মাৎ টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খেলেন রাস্তার ওপর। আর, তার ফলেই, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখা মেডেলের কৌটোটা আচমকা হাত ফস্কে ছিটকে পড়লো বিড়াই নদীর জলে।

বসন্তর চোখের সামনেই টুপ করে তলিয়ে গেল তা।

বসন্ত হাহাকার করতেও ভুলে গেলেন।

খেলাঘর

রথীনদার কথাটা তুলতেই সহকর্মী বন্ধুরা মুচকি হাসলো।

'শ্রীরথীন্দ্রনাথ ব্যস্তবাগীশের সঙ্গে তোর আলাপ হলো কোথায়?'

'অমন করে বলছিস কেন?'

সে কথায় চাপা হাসি ফুটে উঠলো বন্ধুদের ঠোঁটের ডগায়। বললো, 'এমনিতে, মানুষটা ভালো। যা না, ঐ ওদিকে সার্টিফিকেট সেকশন্।'

'রথীনদা সার্টিফিকেট সেকশন দেখেছেন এখানে? আর কিছু নয়?'

বন্ধুরা আর হাসি চাপতে পারে না। বলে, 'ওতেই সবকিছু একেবারে তোলপাড় করে ফেলছেন তিনি। বিশ্বেস না হয়, নিজের চোখে দেখে আয়।'

রথীনদাকে দেখেছিলুম প্রায় বছর পনেরো আগে কোচবিহারে। একজন দক্ষ, পরিশ্রমী এবং তেজী মানুষ তিনি তখন। সমস্ত কাজেই ডাক পড়তো তাঁর। তিনি ছিলেন যথার্থই একাই একশো। আর, শরীরে তাঁর শ্রান্তি-ক্লান্তি বলে কিছুই ছিলো না। এমন কাজপাগল মানুষটি আবার পাশাপাশি ছিলেন সমান বন্ধুবৎসল, পরোপকারী ও ভীষণ সামাজিক। তাঁর কাছ থেকে উপকার পায়নি এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের ফাঁদে পড়েনি, এমন লোক কমই ছিল কোচবিহারের অফিসে। তখনই আমার মনে হয়েছিল, রথীনদা চাকরি-জীবনে অনেক উঁচুতে উঠবেন। সম্ভাব্য সমস্ত গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবেন তিনি।

মেদিনীপুরে বদলী-অর্ডার পাওয়ার আগেই আমি শুনেছিলুম, রথীনদা মেদিনীপুরে রয়েছেন। সেই থেকে মনের মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব। কারণ রথীনদা মানেই একরাশ সুখস্মৃতি। রথীনদা মানেই একটি একাই-একশো মানুষ। জয়েন করবার পরই তাই যত শিগ্‌গির সম্ভব রথীনদার সঙ্গলাভটা ছিল ভীষণ জরুরী।

প্রথম দিনকয়েক যাবো-যাবো করেও সময় পেলুম না। একটা জায়গায় নতুন যাওয়ার ঝক্কি অনেক, রথীনদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো একটা ভরভরন্ত মিটিং-এ।

মিটিং বসেছিল সার্কিট হাউসের হলঘরে। জেলার সব অফিসারকে নিয়ে ডি-এম-এর মিটিং-হল থইথই করছিল। আমি বসেছিলুম একেবারে পেছনের দিকে।

প্রায় আধ ঘন্টাটাক বাদে, মিটিং যখন জমে উঠেছে, হন্তদন্ত হয়ে হলে ঢুকলেন রথীনদা। হাতে এবং বগলে একগাদা নানান রঙের ফাইল। আমার ঠিক সামনের

চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন। ওঁর সারা শরীর ভিজে গিয়েছে ঘামে। জোরে জোরে হাঁফাচ্ছেন। বুঝলুম, রথীনদা এতোগুলো ফাইল নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছেন অনেকটা পথ।

পাশের ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন রথীনদা। নীচু গলায় বললেন, 'এ্যায়সা বিশাল রিপোর্ট। পরশু থেকে শুরু করে আজ দশটা অবধি শেষ করতে পারিনে। এই বয়েসে আর পোষায় না ভাই।'

দু'মিনিট না যেতেই উঠে দাঁড়ালেন রথীনদা। 'আমার কতকগুলো গুরুতর সমস্যা ছিল, স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে ডি-এম হাত নেড়ে বসিয়ে দিলেন তাঁকে। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে বসে পড়লেন রথীনদা। বিড়বিড় করে বললেন, যত সব ফালতু কথা নিয়ে সময় কাটাবে এরা।'

এইভাবে, মিটিং চলাকালীন, প্রায় চার-পাঁচবার উঠে দাঁড়ালেন রথীনদা। প্রতিবারই ডি-এম-এর ইঙ্গিতে বসে পড়তে হোল তাঁকে। একসময় মিটিং ভেঙে গেল। পেছন থেকে রথীনদার মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলুম না। অত্যন্ত শিথিল ভঙ্গিতে ফাইলের বোঝাখানি বগলে এবং দু'হাতে ভাগাভাগি করে নিলেন তিনি। তারপর ধীরপায়ে বেরিয়ে এলেন হল ছেড়ে।

আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। মায়া হচ্ছিল। একটু একটু রাগও হচ্ছিল রথীনদার ওপর। কি দরকার ছিল বারবার উঠে দাঁড়াবার! আগ বাড়িয়ে অতো সমস্যা বলতে চাওয়ার দরকার কি?

হল থেকে বেরিয়েই পায়ের গতিটা বাড়াতে যাচ্ছিলেন রথীনদা। আমি পেছন থেকে ডাকলুম, "রথীনদা"।

রথীনদা পিছু ফিরলেন। চোখেমুখে ব্যস্ততা এবং অস্বস্তিতার ছাপ। পনেরো বছর বাদে হলেও আমাকে ঠিক চিনতে পারলেন। কিন্তু দু'একটা মামুলি কুশল বিনিময়ের পর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'আজ আর কথা বলতে পারছি নে ভাইটি। ফিরে গিয়ে এক বিশাল রিপোর্ট বানাতে হবে। কালকের মধ্যে মিনিস্টারের কাছে পৌঁছুতে হবে সে রিপোর্ট। তাছাড়া, এই এ্যাত্তো ডি-ডবু পড়ে রয়েছে সইয়ের জন্য। ডি এম-এর সঙ্গে বসতে হবে ঠিক পাঁচটায়। একদণ্ড দম ফেলবার জো নেই। একদিন সময় করে আসিস আমার ঘরে। গল্প করবো। কে কেমন আছে শুনবো। আসিস কিন্তু।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয় যাবো।'

ততক্ষণে রথীনদা লম্বা লম্বা পা ফেলে রওনা দিয়েছেন তাঁর অফিসঘরের দিকে। একসময় মৃদু মৃদু ছুটতে লাগলেন তিনি। আমি দূর থেকে দেখলাম।

২.

রথীনদার ঘরটা কালেক্টরেটের একেবারে শেষপ্রান্তে। একটা করোগেটেড শীটের ছাদওয়ালা বাড়ি। তারই একেবারে দক্ষিণের একখানা বড় ঘর। ঘরখানার একটা অংশ

প্লাইউডের দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা। সামনে ময়লা পর্দা ঝুলছে। তার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম রথীনদাকে।

পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম রথীনদার ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে নজর ছুটে গেল ওঁর পেছনের দেওয়ালে। সেখানে বলিষ্ঠ হরফে লেখা ঃ 'সিন্‌সিয়ারিটি কস্টস্‌ আ লিট্‌ল, বাট পেইজ আ মোর।' অন্য কেউ হলে মনে মনে হাসতাম। কিন্তু রথীনদার মতো মানুষের এমন উপদেশ দেবার অধিকার রয়েছে ষোলআনা। দেওয়াল থেকে চোখ সরিযে নিয়ে এলাম রথীনদার মুখের ওপর। মুখটিতে সেই প্রশান্তির অনেকখানি অবশিষ্ট রয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু পাকা চুল, কিঞ্চিৎ ব্যস্ততা ও অস্থিরতা।

তিনদিক থেকে স্তূপাকার ফাইলে বেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন রথীনদা। একখানা রেজিস্টারের সঙ্গে একগোছা কাগজ নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কি যেন মেলাচ্ছিলেন। এবং তার ফলাফল পাশের আর একখানা কাগজে সযত্নে টুকে রাখছিলেন। আমাকে দেখে প্রথমে একচিলতে চাপা বিরক্তি, তারপর বিস্ময়, অবশেষে সারা মুখে খুশির ঝলক। মুখে বিড়বিড় করে কি যেন বকছিলেন রথীনদা। সেই অবস্থায় ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলাম। বসেই রইলাম। রথীনদা লিখতে লাগলেন। গুণতে লাগলেন। মেলাতে লাগলেন। এই একটা জায়গায় রথীনদার স্পষ্টতই খানিক পরিবর্তন হয়েছে। কেউ সামনে বসে বিরক্ত হতে থাকবে, আর রথীনদা নিজের খেয়ালে কাজ করে যাবেন, এ যেন ভাবাই যায় না। মনে পড়ে যায় রথীনদার পনেরো বছর আগের বচন ঃ 'আরে কাজ তো হবেই ভাইটি। দু'ঘন্টা পরে হবে। দু'ঘন্টা বেশি হবে। তুমি তো আমার বস্‌ নও বাপু, যে তোমাকে সামনে বসিয়ে বসিয়ে কাজ দেখাবো।' সেই রথীনদা অন্তত ঘন্টাখানেক আমার দিকে তাকানোরই ফুরসৎ পেলেন না। চুপচাপ বসে থাকবার পক্ষে এক ঘন্টা দীর্ঘ সময়। আমি উসখুস করতে থাকি। বিরক্ত হই। আহত বোধ করি। মাঝে মাঝে উঠে পড়বার ইচ্ছে প্রকাশ করি। কিন্তু রথীনদা ইঙ্গিতে আমাকে নিরস্ত করেন। আমি বাধ্য হয়ে বসে থাকি স্থবিরের মতো। দৃষ্টিটাকে প্লাইউডের দেওয়াল টপকে পাঠিয়ে দিই বাইরে।

ঘন্টাখানেক বাদে মুখ তুললেন রথীনদা। তারপর সেই ভুবনভোলানো হাসিটি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম তোকে। কিছু মনে করিসনি তো?

আমি নীরবে মাথা নাড়ি। 'কেমন আছেন?'

'আর, কেমন আছি! এক্কেবারে মরে গেলুম। এরা যে সব কী ভেবেছে আমায়! সারাটা জীবন শুধু খাটিয়েই মারলো।'

'সে তো টেবিলে ফাইলের স্তূপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

'স্তূপ! এ কি স্তূপ দেখছিস? বড়বাবুকে বলেছিলুম, আজ ভায়রা আসবে। একটু জলদি বাড়ি ফিরবো। খুব জরুরী না হলে ফাইল দেবেন না আমার টেবিলে। এই হলো সেই 'খুব জরুরী' ফাইল। তাহলেই বোঝ্‌।'

শুনতে শুনতে খুব বিস্মিত হচ্ছিলুম আমি। সার্টিফিকেট সেকশনের কাজকর্মের পরিমাণ সম্পর্কে আমার কিছুই অজানা নেই। এককালে, চাকরির প্রথমদিকে, আমিও

কিছুদিন ঐ সেকশনটা দেখতাম কোচবিহারে। মূলত সরকারি প্রাপ্য পাবলিকের কাছ থেকে আদায় করাই এই সেকশনের কাজ। কালেক্টরেটের 'দপ্তর-সমাজে' আমরা এই দপ্তরটিকে কস্মিনকালেও কৌলীন্য দান করিনি। সাধারণতঃ শুধু এই দপ্তরটুকু দিয়েই কোনও অফিসারকে বসিয়ে রাখা হয় না। কুলীন দপ্তরগুলোর সঙ্গে সঙ্গে থাকে এ'টি বাঘের সঙ্গে ফেউয়ের মতো। আসলে, এককালে হয়তো গুরুত্ব ছিল, কিন্তু এখন আর ঐ দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে কেউই তেমন মাথা ঘামায় না। আমি তো কোনদিন সার্টিফিকেট দপ্তরের জন্য দিনে এক ঘন্টার বেশি ব্যয় করিনি।

রথীনদা বুঝি আমার মনের কথাটি আন্দাজ করেছিলেন। বললেন, 'অনেকে ভাবে, সার্টিফিকেট সেকশনে আবার কি অতো কাজ? আসলে, কাজ করতে চাইলে সব দপ্তরেই কাজ আছে। নইলে কোনো দপ্তরেই নেই। ব্রিটিশরা এমনি এমনি সেকশনটা চালু করেনি। তারা বুঝেছিল, কিছু করতে হলেই টাকা চাই। টাকাটা মানুষের কাছ থেকে আদায় করতে না পারলে সব কিছুই আটকে যাবে। আর এখন কেমন যেন ঢিলেঢালা ভাব। আরে বাবা, পুকুরে জল ঢোকাবার ইনলেটটা না রেখে যদি শুধু আউটলেট আর ফিল্ড চ্যানেল বাড়িয়ে যাও, জল পাবে? অবশ্য আজকাল, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হয়েছে। ওপরওলাদের কাছে সিক্রেট চিঠি আসছে। তোমরা পাবলিক মানি রিয়েলাইজ কর। সার্টিফিকেট সেকশনকে চাঙা কর। ডায়েনামিক লোকদের বসাও ওখানে। মাসে মাসে রিপোর্ট পাঠাও। বড়কর্তা বললেন, মিঃ দাস, আপনি একটু দেখুন। যাতে রিয়েলাইজেশনে আমরা ফার্স্ট হতে পারি।

আমি বলি, 'কি করে দেখবো স্যার? ঢাল নেই, তলোয়ার নেই।'

বড়কর্ত বললেন, 'আপনাকে যখন বসিয়েছি ওখানে, তখন ঢাল-তলোয়ার আপনি ঠিক যোগাড় করে নেবেন। আমি বললুম, দেখি। তারপর ভাই, আজ ছ'মাস ধরে, সমস্ত পুরোনো ফাইল ঘেঁটে, নতুন রেজিস্টার বানিয়ে, কেসরেকর্ড আপ-টু-ডোর করে, প্রত্যেকটাতে লেবেলিং করে, ইনডেক্স-নাম্বার লাগিয়ে, ইনডেক্স-রেজিস্টার বানিয়ে সবকিছু কেমন ছবির মতো করে দিয়েছি দ্যাখ্। ঐ দ্যাখ্, সব র‍্যাকে র‍্যাকে নতুন ফাইল, নতুন রেজিস্টার। ঐদিকে সব কেসরেকর্ড ছবির মতো সাজানো রয়েছে। সব ফাইলে ইনডেক্স নাম্বার দেওয়া আছে। একেবারে পাক্কা ব্যবস্থা।

আটফুট উঁচু প্লাইউডের দেওয়াল। তার ওপর দিয়ে দেখলাম, সারা ঘর জুড়ে ছাদ অবধি শুধু র‍্যাকের পর র‍্যাক। দু'তিন সারি। মধ্যে সরু করিডোর। র‍্যাকের খোপে খোপে থরে থরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য নতুন ফাইল, রেজিস্টার। প্রতিটি র‍্যাকে নানান রঙের কালিতে হরেক রকমের নম্বর এবং একাধিক সূত্র-নির্দেশ লেখা রয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালেও উপদেশ নির্দেশের ছড়াছড়ি। র‍্যাকের গায়ে এখানে ওখানে বহুবিধ তীরচিহ্ন আঁকা।

'বা-ব্বা! এ যে বিশাল ব্যাপার করেছেন!'

'তাওতো লোকজন কিছু দিলে না। একটি বড়বাবু, একটি এল ডি, একটি পিয়ন। ওরা কি আর আজকাল কাজকর্ম করতে চায়? সবকিছু নিজের হাতে করতে হয়েছে, বুঝলি।'

শুনতে শুনতে আমার দু'চোখ কপালে উঠে যায়। রথীনদার চোখে মুখে বিরক্তির লেশ নেই। তার বদলে এক ধরনের তৃপ্তির গাঢ় প্রলেপ। মনে হলো, ঠিক সরকারি কাজের তাগিদে নয়, এই ভাঙাচোরা সরকারি ঘরে রথীনদা বহু মেহনতে বানিয়েছেন তাঁর স্বপ্নের বর্ণাঢ্য খেলাঘর। ঐ ঘরেই যেন নিরন্তর খেলায় মেতে রয়েছেন তিনি।

বললুম, 'তৈরি তো করেছেন একেবারে ছবির মতো। কিন্তু থাকলে তো। সরকারি কাজ হোল কুকুরের ল্যাজের মতো। যতক্ষণ টেনে রেখেছেন সোজা আছে। ছেড়ে দিলেই ফের বেঁকে গিয়ে পূর্বাবস্থায়।'

'সেই টেনে রাখাটাই তো আমাদের কাজ। ছেড়ে যারা দেয়, তারা—' বলতে বলতে রথীনদার মনে হোল তাঁর খেলাঘরের এক আধটা খেলা আমাকে দেখানো দরকার। বললেন, 'দাঁড়া, তোকে একটুখানি দেখাই।' বলেই বেল বাজালেন তিনি। একবার নয়, তিনবার।

'আমার এই পিয়নটা হয়েছে এক ফাঁকিবাজ। বড়বাবু—'

'বড়বাবু একটুখানি বাইরে গেছেন, সার।'

'কে? নরেশবাবু? একটুখানি আসবেন?'

খানিকবাদে একজন মাঝবয়েসী সিড়িঙ্গে মতো লোক পর্দা সরিয়ে ঢুকলেন।

'নরেশবাবু, একটা ফাইল বলছি আনুন তো। দেখি কতো জলদি আনতে পারেন?' বাচ্চা ছেলেকে লোভ দেখাবার ভঙ্গিতে বললেন রথীনদা।

'আমার স্যর, বাঁ পায়ে খুব ব্যথা।' নরেশবাবু যেন ঈষৎ বিরক্ত, 'আজকে আর ওটা—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ব্যথা পায়ে ওঠানামা ঠিক নয়। সিঁড়িখানা আছে তো?'

'আছে, স্যার।' বলেই নরেশবাবু চলে গেলেন নিজের টেবিলে।

রথীনদা একখানা ঢাউস খাতা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। বললেন, 'এর থেকে যে কোনও একখানা ফাইলের নম্বর বল্ তো।'

আমি একখানা নম্বর বলামাত্র রথীনদা তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তরতরিয়ে কাঠের সিঁড়ে বেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফাইলটি নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, 'দেখলি, এই অসংখ্য ফাইল-রেজিস্টারের ভেতর থেকে কতো জলদি খুঁজে আনলাম! এইভাবে সেকশনের যেকোনও ফাইল আমি ঠিক দু'মিনিটের মধ্যে বের করে দিতে পারি। সরকারি অফিসে এমনিতে তো ঠিক কাগজটি খুঁজে বের করতেই উম্বর কেটে যায়।'

ছ'টা বেজে গিয়েছে কখন। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। আমি বললাম, 'রথীনদা, বাড়ি যাবেন না?'

'বাড়ি? এক্ষুনি কি রে? আমার এখন কতো কাজ।' হাসলেন রথীনদা, 'তুই এবার একখানা রেজিস্টারের নম্বর বল্ দেখি।'

নম্বর বলতেই রেজিস্টারখানা খুঁজে নিয়ে এলেন রথীনদা। বললেন, 'আর একটা নম্বর বল্।' রথীনদার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'ঠিক আছে। বুঝেছি।'

'আরে বলই না।' রথীনদা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ।

'কি দরকার রথীনদা? রাত হয়েছে। বাড়ি চলুন এবার।'

'না। বাড়ি যাবার উপায় নেই আমার। তুই বলতে হলে বল্, নইলে চলে যা এখান থেকে। আমাকে কাজ করতে দে। ফাঁকিবাজ কোথাকার।' রথীনদা রাগে উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন।

আমি অসহায় চোখে দেখতে থাকি রথীনদাকে। বাধ্য হয়ে বলতে থাকি নম্বর।

এর পরই সেই ঘটনাটা ঘটলো।

রথীনদার পীড়াপীড়িতে আমি একটার পর একটা নম্বর বলতে থাকি, রথীনদা সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে সেটা বের করে আনেন। তিন-চার-পাঁচ-ছয়-বাইশ-পঁচিশ—একটা ভয়ঙ্কর পাগলামিতে পেয়েছে যেন রথীনদাকে। আমি ক্রমাগত নম্বর বলছি, রথীনদা সিঁড়ি নিয়ে সারা ঘরময় ছুটছেন। তরতরিয়ে উঠছেন, নামছেন। গাদা গাদা ফাইল-রেজিস্টার আর কেসরেকর্ডে ভরে যাচ্ছে সামনের টেবিল। রথীনদা গলগলিয়ে ঘামছেন। তাঁর কপালের শিরা চাগিয়ে উঠেছে। চক্ষু, রক্তবর্ণ। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। চোখে-মুখে-ললাটে-চিবুকে-মুখের তাবৎ রেখায় অপ্রকৃতিস্থতার ছাপ। সব মিলিয়ে এই রথীনদা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগলো, রথীনদার কথা ভেবে।

সিঁড়িখানা দু'হাতে বাগিয়ে কোণের দিকে ছুটছিলেন রথীনদা। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে পেছন থেকে জাপটে ধরলুম, 'রথীনদা থামুন, থামুন, দোহাই আপনার, আর নয়। বলতে বলতে সামনে গিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ফাঁপা সিঁড়িখানা কেড়ে নিলুম ওঁর হাত থেকে।

রথীনদা দাঁড়িয়ে রইলেন নিষ্পলক। কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। মনে হচ্ছিল, একটা বিশাল মহীরুহ যেন নিজেকে খাড়া রাখবার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে প্রাণপণ পাখা ঝাপটাচ্ছে লড়াকু এক পাখি। রথীনদার সারা শরীর ভিজে গিয়েছে ঘামে। কপাল বেয়ে ঘামের স্রোত কুলকুল কবে নামছে নিচের দিকে।

এবং সেইসঙ্গে লক্ষ করলুম, চোখদুটিও ভরে গিয়েছে জলে।

আমি সমীরকে খুঁজছি

আবছা কুয়াশায় দূরের অতি পরিচিত দৃশ্যপটও যেমন অস্পষ্ট লাগে, এমন কি কাছের বস্তুও, গাছগাছাল, ঘরবাড়ি, মানুষ ...., একটুখানি চেনা এবং অনেকখানি অচেনা, ঠিক তেমনই সমীবের মুখটা, পুরো অবয়ব, বর্তমানে একেবাবেই ঝাপসা আমার স্মৃতিতে, একটা স্কেচ-ছবিব মতো ভাসাভাসা, অর্থাৎ ছবিটা দেখে যতটুকু বোঝা যায়, কল্পনা করে নিতে হয তার চেয়ে ঢের বেশী। স্মৃতিতে এমনই অসম্পূর্ণ সেই স্কেচ, সন্দেহ জাগে, ওর নামটা কি সমীরই ছিল, নাকি সমর? নাকি সমীরণ কিংবা সমরেশ? পদবিটা যে বসু ছিল, এটা স্পষ্ট মনে আছে। ডাকনামটা যদ্দুর মনে আছে, রানা। রনিও হতে পাবে। কিন্তু না, আমাদের ছেলেবেলায়, ঐ অদ্দিন আগে, অত আধুনিক ডাকনাম রাখতো না, অন্তত ঐরকম একটা মফস্বল শহরের বাপ-মায়েরা। রানাই ছিল ওর ডাকনাম। কিন্তু পোশাকি নামটা? আমি সবগুলো সম্ভাব্য নামকেই পাশাপাশি রেখে যুগপৎ আওড়াতে থাকি মনেমনে, স্মৃতির ভাঁড়ারে সবগুলি নামকেই যুগপৎ হাতড়াতে থাকি। সমীর...সমর...সমীরণ...সমরেশ....। অবশেষে একসময় সমীর নামটাকেই আঁকড়ে ধরি।

এই শহরে আমার পুরো ছেলেবেলাটাই কেটেছে। ক্লাস ওয়ান থেকে এইট অবধি পড়েছি এখানকার স্কুলে। এককালে এই শহরটাকে হাতের তালুর মতো চিনতুম। যেখানে খুশি চলে যেতে পারতুম অবলীলায়। চোখ বেঁধে দিলেও পৌঁছে যেতে পারতুম যে-কোনও বন্ধুর, বিশেষ করে সমীরের বাড়িতে। কৈশোর নাকি এক সোনার পাতে মোড়া সিন্দুক, ঐ সিন্দুকে যা কিছু জমা পড়ে তাব কিছুই নাকি হারায় না, ফুরোয় না, অথচ আমি অবাক হয়ে দেখলুম, কবে কবে যেন আমার সযত্নে রাখা সিন্দুকটা থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছে আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধুর স্মৃতি, এতটাই হারিয়ে গিয়েছে যে, আজ ওর নামটাই ঠিকঠিক মনে করতে পারছি নে আমি। সমীর, নাকি সমীরণ? কিংবা সমর, নাকি সমরেশ? অথচ সে ছিল আমার এমনই প্রাণের বন্ধু যে, একবেলা ওকে দেখতে না পেলে আমার চারপাশের বিশ্বভুবন অন্ধকার হয়ে যেত। একপাতে খেতুম, এক বিছানায় শুতুম, এক কোচিংয়ে পড়তুম, একসাথে ঘুরে বেড়াতুম, বাইরে থেকে দেখে যেকোনও লোক ভাবতো, আমরা একই বাড়ির ছেলে বুঝি। অথচ আজ ...। আশ্চর্য! স্মৃতি কখনো এত বড় প্রতাবক হয়!

বহুদিন বাদে এসেছি আমার সেই যষ্টিমধু শহরে। আফিসের কাজের তাড়ায়

আসা। নইলে ইদানিং এমনই হাজারো ঝামেলায় থাকি, বাড়ি থেকে বেরোনো, সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাজটা অন্য কোনও শহরে পড়লে হয়তো বা এড়িয়ে যেতুম। অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতুম। কিন্তু আমার সমগ্র কৈশোরের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, এমন শহরে যাওয়ার টানই আলাদা। বাড়ি থেকে রওনা দেবার মুহূর্ত থেকেই এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করছিল মনের মধ্যে, কিনা, এমন এক শহরে যাচ্ছি আমি, যার ধূলিকণায় মিশে রয়েছে আমার শৈশব, কৈশোর...., রয়েছে সমীর নামে এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু, যার সঙ্গো দেখা হয় নি অন্তত চার দশক।

সারাদিন ধরে কাজকর্মের ফাঁকেফাঁকে সমীর (আপতত এই নামটাই সাব্যস্ত করেছি) এসে যাচ্ছিল আমার স্মৃতিতে, কিস্তিতে কিস্তিতে। সমীরকে নিয়ে অনেক স্মৃতি ঘাই মারছিল মনে, বুকের অচেনা খোপগুলো থেকে উঠে আসছিল দুধের ফেনার মতো আবেগ, তাও ছেলেটার মুখ ও শরীরের পুরো ছবিটা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। সব মিলিয়ে একটা ভাঙাচোরা প্রতিমা। তবুও যে তাকে এখনো অবধি পুরোপুরি ভুলতে পারিনি, তার কারণগুলো লুকিয়ে নেই তার শরীরে, ওগুলো ছিল তার চরিত্রে। প্রথমত, ওই বয়েসে এতখানি আত্মমর্যাদাবোধ আমি আর কারোর মধ্যে দেখিনি। তার ঐ শিরদাঁড়া সোজা করে চলবার ব্যাপারটা আমাকে খুব অবাক করে দিতো ঐ বয়েসে। শুধু গাঢ় বন্ধুত্বই নয়, সমীর সম্পর্কে এক ধরনের সম্ভ্রামবোধও তৈরি হয়েছিল আমার মনে। ওর মুখটা পুরোপুরি মনে করতে পারছি নে বটে, কিন্তু সম্মানের প্রশ্নে তার অনমনীয় জেদ এবং আপোসহীনতার ঘটনাগুলো এখনো অবধি কাচা রুমালে থেকে যাওয়া সুগন্ধির রেশের মতো রয়ে গিযেছে। আমাদের ক্লাসে একজন খুব বড়লোকের ছেলে পড়তো, তার নামটা আজ আর মনে নেই, কিন্তু তার আকাশচুম্বী দেমাকের কথাটা ভুলিনি। মনে পড়ে, একবার, আমরা তখন বোধ করি সেভেন কিংবা এইটে পড়ি, ওর জন্মদিনের আগের দিন ছেলেটা টিফিন পিরিয়ডে চিৎকার করে বললো, অ্যাই, শোন্ সবাই, কাল আমার জন্মদিন, সন্ধেবেলায় ভোজ দিচ্ছে বাবা। তোরা সবাই যাস। তোদের সবাইয়ের নেমন্তন্ন।' যদ্দুর মনে পড়ে, আমাদের ক্লাসের সব্বাই গিয়েছিল ভোজ খেতে, এমন কি আমিও, কিন্তু সমীর যায় নি। পরের দিন ওকে একান্তে চেপে ধরতে ও খুব গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছিল, ওভাবে নেমন্তন্ন করলে আমি যাইনে। ওভাবে মানুষ কুকুরকে খেতে ডাকে। এমন গম্ভীর গলায়, সারামুখে প্রাজ্ঞদের মতো অভিব্যক্তি ফুটিয়ে কথাগুলো বলেছিল সমীর, আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। ওই মুহূর্তে সমীরকে একেবারে বড় মানুষের মতো লাগছিল। আর, ঐরকম দুর-ছি করে নেমন্তন্ন করা সত্বেও ভোজ খেতে গেছি বলে নিজের প্রতি ঘেন্না লাগছিল। আজও চারপাশের কাউকে খুব উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলে, কোনকিছুর জন্য আত্মবিশ্বাস খোয়াতে দেখলে, সমীরের কথা মনে পড়ে। সম্ভবত ঐ একটা কারণে সমীরের একটা ভাঙাচোরা স্মৃতি আমি এখনো অবধি বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছি মনে।

আজ সারাদিন কাজেকর্মে ডুবে থাকতে হয়েছে। বিকেল নাগাদ যেই না কাজকর্মের পাট চুকলো, অমনি বেরিয়ে পড়লুম শহরের রাস্তায়। আমার প্রথম এবং

একমাত্র কাজ হলো, সমীরকে খুঁজে বের করা। গত চার দশকে শহরটা সবদিক থেকে আমূল বদলে গিয়েছে। বাড়িঘর বেড়ে গিয়েছে দশ-বিশগুণ। একতলা বাড়ি তিনতলা হয়েছে, রাস্তাঘাট চওড়া হয়েছে, স্টেড়িয়াম, পার্ক, ঝকঝকে সাজানো-গোছানো, দোকানপাট, শো-রুম, ঘিঞ্জি বাসস্ট্যান্ড অনেক প্রশস্ত হয়েছে, ...সব মিলিয়ে শহরটাকে প্রথম দর্শনে সনাক্ত করা মুশকিল। দেখতে দেখতে শুধু যে অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম তাই নয়, সবকিছু কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছিল মনের মধ্যে। যে পাড়াটাতে আমরা থাকতুম, সেটাকেই তো সনাক্ত করতে পারছিলুম না। যে গলি দিয়ে আমরা পাড়ায় ঢুকতুম, ওই মুখটাকেই তো কিছুতেই চিনে উঠতে পারছিলুম না। গলির মুখটাতে ছিল একটা খুব কাঁচা হাতের তৈরি গান্ধীমূর্তি, একটা পুরোনো ধাঁচের মিঠাইয়ের দোকান, একজন খুব বুড়ো কারিগর ফাটাফাটি খাস্তাগজা বানাতো, স্টেশন থেকে ডাকবাংলো যাওয়ার পথেই পড়তো গলিটা, কিন্তু আজ স্টেশন থেকে ডাকবাংলো অবধি সারাটা পথ, পথের বাঁ দিকে সারাক্ষণ চোখ বিঁধিয়ে রেখেও কোনও গলিব মুখেই দেখতে পাই নি সেই মূর্তি অথবা মিঠাইয়ের দোকান। কেমন জানি মনে হচ্ছিল, আমার সেই ছেলেবেলার শহরটাকে শেকড়সহ উপড়ে ফেলে দিয়ে কেউ সেখানে বসিয়ে দিয়েছে অন্য একটি শহরকে। তবে কি সমীরও নেই এই নতুন শহরে! পুরোনো শহরটার সঙ্গো সেও কি উৎখাত হয়ে গিয়েছে!

অফিস থেকে বেরিয়েই স্থির করলুম, গাড়িতে নয়, হেঁটেই ঘুরবো। পায়ে হেঁটেই খুঁজতে থাকবো আমার ছেলেবেলার শহরটাকে। সমীরকেও। যেভাবেই হোক, এই শহরে সমীরকে খুঁজে বের করতেই হবে। এত বছর বাদে মূলত ঐ চোরাটানেই এসেছি আমি। স্থির করলুম, কাউকে জিজ্ঞেস না করে প্রথমে নিজে-নিজেই খুঁজি খানিকক্ষণ, স্মৃতি থেকেই কৈশোরের রঙ-তুলি বের করে আঁকতে থাকি শহরটাকে। আঁকতে আঁকতে এগোই। কেন কি, যতই না কেন বদলাক শহরটা, পুরোনো দিনের সব দিকচিহ্নই মুছে যাবে নিঃশেষে? তাই আবার হয়?

কিন্তু ঘন্টাটাক ঘুরে ঘুরে একেবারে বেদম হয়ে যাই আমি। সমীরের পাড়াটাকে খুঁজে পাই নে। সমীরের পাড়াটার কী যেন নাম ছিল, অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারি নে কিছুতেই। যদ্দুর মনে পড়ে, সমীরের বাবার একটা সাইকেলের দোকান ছিল। সমীরের সঙ্গো প্রায়ই যেতুম ঐ দোকানে। ক্লাস এইটে উঠতেই আমার টিউশনির মাস্টার বেড়ে গেল। বাবা একটা সাইকেল কিনে দিলেন আমায়। মনে পড়ে, সমীরের বাবার দোকান থেকেই কিনেছিলুম সাইকেলটা। পড়াশোনায় বড় একটা ভালো ছিল না সমীর। ওর বাবার ধান্ধা ছিল, স্কুল-ফাইন্যালটা পাশ করলেই ওকে ঢুকিয়ে দেবেন দোকানের কাজে। ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, পড়াশোনা শিখে চাকরিবাকরি করবার স্বপ্ন দেখতো না সমীরও। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলুম, বাপের সাইকেল দোকানে ঢুকে পারিবারিক ব্যবসাই সামলাচ্ছে ও। সত্যিমিথ্যা যাচাই করা সম্ভব হয় নি। সমীরদের সাইকেলের দোকানটা যেন কোথায় ছিল? এলাকাটা আর পুরোপুরি স্মরণে নেই, তবে যদ্দুর মনে পড়ে , চকবাজার এলাকাতেই ছিল দোকানটা। চকবাজারকেই তো বর্তমানে চিনে ওঠা দায়। কত বড় বড় বাড়িঘর উঠেছে পুরো এলাকা জুড়ে, কত

চোখধাঁধানো শোরুম, তার মধ্যে ঐ ছোট্ট সাইকেলের দোকানটাকে কিছুতেই খুঁজে পাই নে। হতে পারে, যে একতলা বাড়িটার একটি ছোট্ট কুঠুরিতে দোকানটা ছিল, ঐ বাড়িটাই ভেঙে ফেলে বিশাল অট্টালিকা মাথা তুলেছে সেখানে। একতলায় সারবন্দী দোকান, দোতলা-তিনতলায় বসবাসের ফ্ল্যাট, এরকমটা তো আকছার হচ্ছে এই ধরনের বদলে যাওয়া শহরগুলোতে। আমি চকবাজার এলাকায়, অন্তত যে এলাকাটাকে চকবাজার বলে সনাক্ত করেছি মনেমনে, চক্কর মারি বারকয়। একটা বড় তিনতলা বাড়ি দেখে কেন জানি মনে হয়, ঐখানটাতেই ছিল সেই বাড়িটা, যার একখানা কুঠুরিতে ছিল সমীরদের সাইকেলের দোকান। পায়েপায়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি দোকানগুলোকে, কিন্তু না, টিভি-ফ্রীজ, গারমেন্টস, বাটার শো-রুম, হাল-ফ্যাশনের টেলারিং-শপ, সবকিছুই রয়েছে, কিন্তু ওগুলোর মধ্যে কোনও সাইকেলের দোকান নেই। ভাবলুম, এমন তো হতে পারে, সাইকেলের ব্যবসাটা তুলেই দিয়েছে সমীররা। তার বদলে এতদিনে গড়ে তুলেছে অন্য কোনও ব্যবসা। আমি দোকানগুলোর ভেতরে চোখ চারিয়ে দেখতে থাকি, দোকানদারের আসনে কোনও চেনামুখ নজরে পড়ে কিনা দেখতে চাই। আমার ঘোরাঘুরি এবং চোখ চারানোর মধ্যে নির্ঘাৎ অস্বাভাবিক কিছু ছিল, দোকানদারদের একজন আড়চোখে অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল আমাকে, একসময় সরাসরি শুধিয়ে বসে, কী ব্যাপার দাদা, কাউকে খুঁজছেন?

খুব কুন্ঠিত গলায় বলি, ঠিকই ধরেছেন। আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর বাবার একটা সাইকেলের দোকান ছিল এখানে ....।

—কী নাম?

—বন্ধুর নাম, যদ্দুর মনে পড়ে, সমীর, সমীর বসু। সমীরণও হতে পারে। তবে দোকানটা ছিল ওর বাবার। সমীর তো ছোট ছিল তখন, আমার সঙ্গে পড়তো।

—কী নাম ছিল বাবার?

খুব লজ্জিত গলায় বলি, নামটা এখন আর মনে নেই।

একটুখানি অবাক চোখে আমার দিকে তাকায় লোকটি। সামান্য রহস্যেরও গন্ধ পায় বুঝি। বলে, এই রো' তে তো কোনও সাইকেলের দোকান নেই। সামান্য এগিয়ে গিয়ে ঐ যে নীল রঙের বাড়িটা দেখছেন, ওর তলায় পরপর দুটো সাইকেলের দোকান রয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

পাশাপাশি দুটো সাইকেলের দোকান! ভেতরে ভেতরে খুশিতে নেচে ওঠে মন। আমার খুব নিশ্চিতভাবে মনে হয়, ঐ দুটোর মধ্যে একটা সমীরদের না হয়ে যায় না। চাই কি দুটোই ওদের হতে পারে। সফল ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তেমনটাই হয়। একটা লরী থেকে দুটো লরী, একটা দোকান থেকে দুটো দোকান। সত্যিই তো, একটা দোকানে বাপ-বেটা দুজনে বসে কেনই বা খামোকা ম্যান-পাওয়ার নষ্ট করবে! দুটো দোকানই তো খোলা উচিৎ।

—ধন্যবাদ, দাদা। বলেই পা চালিয়ে হাঁটা দিই নীল বাড়িটার দিকে।

পাশাপাশি দুটো জমকালো দোকান। ঢাউস সাইনবোর্ডে। একটার নাম, সাইকেল মার্ট, অন্যটার নাম, রিলায়েন্স সাইকেল স্টোর। কিন্তু সাইনবোর্ডর তলার দিকে নজর

করতেই দমে যাই আমি। দুটোরই মালিক অবাঙালি। একটার পদবি জৈন, অন্যটার আগরওয়াল। ততক্ষণে আমার মনে তিলমাত্র সংশয় নেই, এ-দুটোর মধ্যে একটাই ছিল সমীরদের দোকান। কারণ, একে তো বাঙালি ব্যবসার দুনিয়া থেকে হটতে হটতে গত তিন-চার দশকের মধ্যে একেবারেই কোনঠাসা, স্বাধীনতার পরেও যেসব ব্যবসাতে বাঙলির ছিল একচেটিয়া আধিপত্য, গত চার-পাঁচ দশকে তার বারোআনাই চলে গিয়েছে অবাঙালিদের হাতে। একটা থেকে দুটো করা তো দূরের কথা, সবেধন একটাই খুইয়ে বসে আছে বাঙালি। কাজেই, সমীরদের পক্ষে একটা দোকান থেকে দুটো দোকান করা সম্ভব তো নয়ই, বরং এমনটাই স্বাভাবিক যে, সমীররা দোকানটা জৈন কিংবা আগরওয়ালদের কাছে বেচে দিয়ে নিজেরা সরে গিয়েছে অন্য কোনও এলাকায়, ছোটখাটো কোনও দোকান খুলে বসেছে শহরের কোনও গলিঘুঁজিতে। কিন্তু আমার তো অত গবেষণায় কাজ নেই, আপাতত এদের থেকে সমীরের ঠিকানাটা পেলেই চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে আমি ঢুকে পড়ি জৈনদের দোকানে।

দোকানের মালিক ভদ্রলোক বয়েসে তরুণ। ব্যবহারে অমায়িক। বললেন, এটা ঠিক, দোকানটা এক বাঙালি বাবুর কাছ থেকেই কিনেছিলেন আমার বাবা, কিন্তু তার নাম-ধাম এখন আর মনে নেই। হয়তো বা বাবা জানতেন, কিন্তু তিনিও তো গত হয়েছেন না-হোক বছর দশেক আগে। ততক্ষণে দোকানের কর্মচারিদের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা। একজন বললেন, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, বোসই ছিল ওরা। কেমন দেখতে বলুন তো ? আমি স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়াতে থাকি। বাস্তবিক, কেমন দেখতে ছিলেন সমীরের বাবা, মনে করবার চেষ্টা করি। কিন্তু বড়ই ঝাপসা সে স্মৃতি। মুখের আদলটা অবধি স্পষ্ট নয়।

কর্মচারি ভদ্রলোক বলেন, মাথায় টাক ছিল ?

বোধ হয় ছিল, নাকি ছিল না ? মনে পড়ে না একেবারেই। সে কথা বলতেই গুম মেরে যান ভদ্রলোক। বলেন, আপনি এক কাজ করুন, সোজা এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে বাঁকলেই একটা ছোট্ট সাইকেলের দোকান পাবেন। মালিক বাঙালি, নাম রবি রায়। অনেক দিনের দোকান ওটা। তিনি হয়তো জানতে পারেন। হাজার হোক, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে এই শহরে সাইকেলের দোকান ক'টাই বা ছিল ! সবাই সবাইয়ের খোঁজ রাখতো।

২.

রবি বাবু বললেন, চল্লিশ বছর আগে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল বটে। কিন্তু সে তো এখানে নয়, বড়বাজারের দিকে ছিল দোকানটা। হ্যাঁ, বোসই ছিল ওরা। নগেন নাকি গগন কী যেন নাম ছিল ভদ্রলোকের। একটা ছেলে ছিল বটে ওর। শেষের দিকে দোকানেও বসতো বটে কিছুদিন। সমীর কিনা ঠিক মনে নেই, ডাকনামটা যেন কী ছিল ...., কিন্তু সে দোকানটাও তো নেই এখন। একটা লন্ড্রী হয়েছে ওখানে। দেখুন গিয়ে লন্ড্রীর মালিক যদি কিছু বলতে পারে।

খুবই টায়ার্ড লাগছিল। মনে মনে হতাশও হয়ে উঠছিলুম ক্রমশ। একবার মনে হলো, ডাকবাংলোয় ফিরে যাই। কিন্তু মনের মধ্যে থেকে কেউ যেন বলছিল, লন্ড্রীতে গেলেই পেয়ে যাব সমীরের খোঁজ।

লন্ড্রীর মালিক বললেন, সমীর কিনা জা নে, আমরা ওকে রানা বলেই ডাকতাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রানাই ওর ডাক নাম। আমি প্রায় হামলে পড়ি।

লন্ড্রীর মালিকের চোখেমুখে ততক্ষণে আত্মপ্রসাদের সর জমেছে পুরু করে। বললেন, অনেক দিন আগের কথা তো, শুনেছি, চালপট্টির কাছাকাছি একটা মনিহারি দোকান করেছে। ওখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। চারপাশের দোকানপাট খোলা ছিল তখনো। কিন্তু মণিহারি দোকানটির ঝাঁপ বন্ধ। দোকানের সামনে একটা ছোটখাটো জটলা। জনকয় মাঝবয়েসি লোক আড্ডা মারছিলেন। বললেন, খোলা তো ছিল, সাড়ে-সাতটা নাগাদ বন্ধ করে চলে গিয়েছে। হ্যাঁ, রানাই নাম ওর। পোশাকি নাম সম্ভবত সমীরই। বাড়িতে গেলে পেতে পারেন হয়তো বা। আরে, বাড়িটাই তো খুঁজে পাচ্ছি নে। নইলে কি আর সারা সন্ধে ধরে...। শুনে ওরা নিজেদের মধ্যে পুনরায় আলোচনা শুরু করলেন। রানার বাড়িটা ঠিক কোন এলাকায় তাই নিয়ে শুরু হলো গবেষণা। একসময় সবাই একমত হয়ে রায় দিলেন, রানার বাড়িটা চণ্ডী-মন্দিরের আশেপাশে। পথের হদিশও দিলেন আমাকে। একটা রিক্সো ডেকে বুঝিয়ে দিলেন ওকেও।

চণ্ডী-মন্দির থেকে সামান্য এগোলেই একটা সরু গলি। টিমটিমিয়ে আলো জ্বলছিল। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে বাড়িটার হদিশ পেলুম।

দরজায় কড়া নাড়তেই যে লোকটি বেরিয়ে এল, তাকে দেখা মাত্র অকস্মাৎ কেন জানি মনে হলো, এ সমীর না হয়ে যায় না। কেন এমনটা মনে হলো জানি নে। কারণ, আমার স্মৃতিতে সমীরের মুখের যে ছবিখানা আটকানো রয়েছে, সেটা নিতান্তই ওর কিশোর বয়েসের ছবি। তখন আমাদের বয়েস বড় জোর চোদ্দ-পনেরো। ঐ বয়েসের মুখাবয়বের সূত্র ধরে একজন চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছরের মানুষকে সনাক্ত করা সম্ভব? তবুও আমার তেমনটা যে মনে হলো, এতে করে আমি নিজেই খুব বিস্মিত বোধ করলুম।

দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল সমীর। বেশি ভনিতা না করে বলি, কী রে, চিনতে পারিস?

দু'চোখে অনেকখানি অনিশ্চয়তা নিয়ে তাকিয়ে থাকে সমীর। বুঝতে পারি, চিনতে পারে নি আমাকে। নিজের সম্পর্কে বিতাং করে বলতে থাকি। দুজনের ছেলেবেলার জীবনটা নিয়ে একটা তাৎক্ষণিক ছবি এঁকে ফেলি দ্রুত। ভুরু কুঁচকে আমার কথাগুলো শুনছিল সমীর। মুখমন্ডলে রোদছায়া খেলছিল অবিরাম। বলি, কী রে, চোর-ডাকাত ভাবছিস নাকি? বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবি?

আমার কথায় সমীর কি একটুখানি লজ্জা পেলো? দরজার পাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার পথ করে দেয়।

ছোট্ট একটা বাইরের ঘর, যৎসামান্য বসবার ব্যবস্থা। আমাকে বসতে দিয়ে সমীর দাঁড়িয়ে থাকে পাশটিতে। বলে, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি?

—দাঁড়িয়ে কেন, বোস্ না। আমি বলি।

সমীর বসে না। দাঁড়িয়েই থাকে সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে আমার কথা, এবং আমি লক্ষ করি, সমীরের সারা মুখ জুড়ে মেঘ জমেছে গাঢ় করে। উদ্বেগে, আশঙ্কায় থমথম করছে মুখ। আমার কথাগুলো শুনছে বটে, কিন্তু মগজ অবধি পৌঁছচ্ছে কিনা সন্দেহ। বলি, কী রে, খুব ভাবনায় পড়ে গেছিস মনে হচ্ছে! চোর-ডাকাত ভাবছিস নাকি আমাকে?

সে কথায় খুব লজ্জা পেয়ে যায় সমীর। বলে, না না, ছি-ছি, চোর-ডাকাত ভাবতে যাবো কেন? বলল বটে, কিন্তু আমি খুঁটিয়ে লক্ষ করতে থাকি ওকে, এবং নিঃসন্দেহ হই, যতই না কেন মুখে অন্য কথা বলুক সমীর, কোনও কারণে খুব ভাবনায় পড়ে গ্যাছে ও। এক ধরনের আশঙ্কা ওকে নিঃশব্দে কুরছে। আচ্ছা, ও কি এমনটা ভেবে ভাবনায় পড়ে গিয়েছে যে আমি ওর বাড়িতে রাত্রিবাস করতে চাইছি? সেই কারণেই কি ভয়ে অমন সিঁটিয়ে রয়েছে ও? আজকের দিনে এটা একটা ভাবনায় পড়ে যাওয়ার মতোই ব্যাপার বটে। এমনভাবে টানটান বাঁধা থাকে আজকের দিনের সংসারগুলো, সামান্যতম ব্যত্যয় সহ্য হয় না। দু'তিনজনের সংসার, সকালেই দু'বেলার রান্নাবান্না সেরে রাখে মেয়েরা, রাতে কেবল গুটিকয় রুটি ভেজে নেওয়া, বাকি সময়টা টিভির সিরিয়ালের জন্য বরাদ্দ। এই অবস্থায় রাত ন'টায় যদি একজন উটকো মানুষের আমদানি হয়, শুনেই হয়ত বা বাড়ির গৃহিনীর মাথা গরম হয়ে গিয়েছে।

খুব কাঁচুমাচু গলায় সমীর পুনরায় বলে, একটু চা বলি?

ওর গলার আওয়াজে বুঝতে পারি, মার্বেলের গুলির মতো কোনও কঠিন বস্তু আটকে রয়েছে ওর গলায়। মনে পড়ে, সেই ছেলেবেলায়, তখন সমীর ফোর কিংবা ফাইভের ছাত্র, একদিন একটা মার্বেলের গুলি কেমন করে যেন আটকে গেল ওর গলায়। গিলতেও পারে না ওগরাতেও পারে না। সে এক সসেমিরা অবস্থা ওর। শেষ অবধি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ....। ওর আজকের অবস্থা দেখে মনে হলো, মার্বেলের গুলিটা আবার আটকেছে ওর গলায়। এবং আমিই সেই গুলি। সমীর আমাকে না পারছে গিলতে, না পারছে ওগরাতে। বলি, ইস,বড্ড ফরম্যালিটি করছিস! রাত ন'টা বাজে। চা খাওয়ার সময় এটা? একটুখানি বোস্ দেখি, অল্পক্ষণ গল্প করেই চলে যাবো। বেশি রাত করলে ডাক-বাংলোর খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে। তোরা সব আছিস কেমন? মেশোমশাই কই? আরে, তোর সঙ্গে দেখা হবে ঐ টানেই তো কাজ নিয়ে আসা। বলতে বলতে আমি লক্ষ করি, দুশ্চিন্তাটা কিছুতেই যেন ছাড়ছে না সমীরকে। বড়ই ম্রিয়মান লাগছে ওকে। এই মুহূর্তে ওকে দেখে ছেলেবেলার সেই মজাদার মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া দায়। মেশোমশাইয়ের প্রসঙ্গেই কি মনে ব্যথা পেলো সমীর? মনে হয় বেঁচে নেই ওর বাবা। বেঁচে থাকবার কথাও নয়। আমরা যখন স্কুলে পড়ি, তখনই তাঁর বয়েস পঞ্চাশের ওপর। আমি বিতাং করে বলতে শুরু করি, কেমন করে সারা সন্ধে জুড়ে লেগে থেকে ওর বাড়ির হদিশ পেয়েছি শেষ অবধি। বলি, ওটাই কি তোদের সেই আগের বাড়িটাই? এই বাড়িতেই থাকতিস তোরা? যদি এই বাড়িটাই হয়, তবে খুবই রদবদল হয়েছে, একেবারে খোলনলচে বদলে গিয়েছে।

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় সমীর। বলতে বলতে বাবার প্রসঙ্গো চলে যায়। বলে, বাবা তো কবেই দেহ রেখেছেন। সেই বিরাশিতে।

—তা...ই? কী করে জানবো বল্? কতকাল দেখা নেই। খোঁজখবরও তো নিস নে। আমি খুঁজে পেতে না এলে দেখাই হতো না। বিয়ে-থা করেছিস নিশ্চয়? খবরও দিস নি। অথচ আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছিলুম, তোর বউ আমি বেছে দেবো, আমার বউ তুই।

ভেবেছিলুম, সমীর এবার পাল্টা খোঁচা দেবে। কারণ, আমিও তো আমার বিয়ের খবর জানাই নি ওকে। কিন্তু না, তেমন কিছু বললো না সমীর। বরং চোখেমুখে একরাশ অস্বস্তি ফুটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বলি, তোর মনে আছে, আমাদের বাসার উল্টোদিকের বাড়িতে একটা মেয়ে থাকতো, আমাদের চেয়ে এক ক্লাস নিচে পড়তো, দেখতে সুন্দরী ছিল, আর খুব সেজেগুজে থাকতো সারাক্ষণ? মনে আছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম, আমাদের মধ্যে যে-কোনও একজন বউ করে ঘরে তুলবো ওকে? কার বউ হবে ও, তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে লটারি করেছিলুম মনে আছে?

এতক্ষণে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সমীর। চোখেমুখে দুনিয়ার অস্বস্তি জড়ো করে বলে, দেখুন, কোথাও একটা বড়সড় ভুল হচ্ছে।

—মানে? আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি সমীরের দিকে।

—মানে, ইয়ে .... আপনি যাকে খুঁজছেন, আমি সে নই।

—যাহ্! আমি কলকল করে উঠি, ...রগড় করবার অভ্যেসটা তোর এখনো অবধি যায় নি দেখছি! বেণীমাধব হাইস্কুলে আমার পাশটিতে বসে কে তবে আমার ট্রানস্লেশনের খাতা থেকে ....।

—বেণীমাধব হাইস্কুলে আমি কস্মিনকালেও পড়িই নি। আমি তো নগেন্দ্র-স্মৃতির ছাত্র। তাও ক্লাস সেভেন অবধি।

আমার দু'চোখে বুঝি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্ময় ও অবিশ্বাস ছিল, তাই দেখে সমীর বলে, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমি আপনার সেই বন্ধু নই। আমার ডাকনাম রানা বটে, কিন্তু ভালো নাম সমীর নয়, সমর। আমাদের একটা সাইকেলের দোকান ছিল বটে, কিন্তু অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে ওটা।

ওর চোখের ভাষা পড়তে পড়তে বুকের মধ্যেকার সেই গাঢ় বিশ্বাসটা একটু একটু করে ফিকে হচ্ছিল। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল এটাই ভেবে যে, ছেলেবেলার প্রাণের বন্ধু ভেবে সাতকাহন কথা বললুম, অথচ এই লোকটা প্রথম থেকেই বুঝে ফেলেছে, আমি আমার সেই তথাকথিত প্রাণের বন্ধুটিকে আদপে চিনিই না। ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই তো মানুষ অন্যকে চালবাজ, বজ্জাত ইত্যাদি ভাবে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ লজ্জায় ততক্ষণে নিঃশব্দে পুড়ছি আমি। কোনওগতিতে বিড়বিড় করে বলতে থাকি, ইস, দেখুন দেখি, আপনাকে ভুল করে ছেলেবেলার বন্ধু ভেবে ....।

—হ্যাঁ, ভুল তো বটেই। বলতে বলতে সহসা বুঝি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর চোখমুখ। বলে, দাঁড়ান-দাঁড়ান, আচ্ছা আপনি ওর কথা বলছেন না তো, ঐ যে গান্ধী-গলিতে বাড়ি ছিল, ওদেরও তো একটা সাইকেলের দোকান ছিল।

গান্ধী গলি! আমি যেন লাফ দিয়ে উঠেছি ততক্ষণে। টানটান হয়ে বসি। বলে উঠি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ সমীরের কথাই বলছি আমি। আপনি চেনেন ওকে?

—চিনি মানে...., আলাপ নেই কোনওকালেই, তবে ঐ গলির একজনের একটা সাইকেলের দোকান ছিল জানতাম। লোকটার মাথায় টাক ছিল কি?

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা, খুব স্পষ্ট করে কিছুই মনে নেই। তাছাড়া, ততক্ষণে আত্মবিশ্বাসটা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছি। খুব ভরসা ছিল মনে, ছেলেবেলার প্রাণের বন্ধুটিকে যতদিন পরেই হোক না কেন, ঠিক চিনে ফেলবো। সেই বিশ্বাসটাও তো ইতিমধ্যেই ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছে। রানা নামের এই মানুষটি যে আমার বন্ধু নয়, এতক্ষণের আলাপচারিতেও তা বুঝতে পারলুম কই? কাজেই, একটা অস্পষ্ট, ঝাপসা ছবিকে পুঁজি করে খুব বুক ঠুকে কিছু বলা মুশকিল। তবে, গান্ধী-গলি, সাইকেলের দোকান, রানা, সবই মিলে যাচ্ছে দেখে আমার মনে হলো, সমীরের বাবার মাথায় অবশ্যই টাক ছিল। টাক না থেকে পারে না। স্মৃতিতে সমীরের বাবার যে ছবিটা ঝাপসা হলেও ছিল, ওটাকে একটুখানি ঝেড়েমুছে নিতেই দেখতে পেলুম, প্রায় সারা মাথা জুড়ে পাকা চালকুমড়োর মতো মসৃণ টাক। বলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল বটে।

—ওঁর ছেলে, কী যেন নাম বলছেন, খুব ভালো ফুটবল খেলতো কি?

আবার একটা গোলকধাঁধাঁর সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। এমনিতে পড়াশোনায় ভালো ছিল না সমীর। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলোর দিকেই টান ছিল বেশি। নিজের পাড়ায়, স্কুলে, সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়তো টিমে। মাত্র ক্লাস এইট অবধি তো পড়েছিলুম ওর সঙ্গে, তারপরে তো দীর্ঘ চল্লিশ বছর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সমীর কি পরবর্তীকালে ফুটবল খেলে খুব নাম করেছিল? কে জানে! তবে বেশ মনে আছে, অভিনয়টা খুব ভালো করতো। তখন নাটক করায় খুব নাম ছিল আমাদের স্কুলের। আর, মনে আছে, পরপর দু'বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিল সমীরই। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা মনে আছে। তৃতীয় বছরে নাটকের দায়িত্বে থাকা স্বদেশবাবু ওকে আচমকা বাদই দিয়ে দিলেন নাটক থেকে। শুনে তো আমরা সবাই তাজ্জব! সমীরকে বাদ দিয়ে নাটক! সে যে ভাবাই যায় না! সমীরকে জিজ্ঞেস করায় সে মুখে কুলুপ এঁটে রইলো। অনেক পীড়াপীড়ির পর বললো, আমি নিশ্চয় ভালো অভিনয় করি নে, তাই। দিন-দুই বাদে আমরা সবাই ঘিরে ধরলুম আমাদের ক্লাস-টিচার গিরীনবাবুকে। সমীরকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, স্যার। আপনি একটা কিছু করুন, স্যার। সব শুনেটুনে গিরীনবাবু কথা দিলেন, সমীরের জন্য স্বদেশবাবুকে অনুরোধ করবেন তিনি। তাঁর অনুরোধে অবশেষে বরফ গল্‌লো। একদিন ক্লাসে এসে গিরীনবাবু সমীরকে বললেন, স্বদেশবাবু তোকে রোল দিতে রাজি হয়েছেন। আজ টিফিন-পিরিয়ডে দেখা করিস ওঁর সঙ্গে। কিন্তু টিফিন-পিরিয়ডে সমীর গেল না স্বদেশবাবুর কাছে। আমরা ওকে কতই না পীড়াপীড়ি করলুম। কিন্তু সমীরকে তিলমাত্র টলানো গেল না। একসময় ও খুব গম্ভীর গলায় বললো, কারো দয়া কিংবা সুপারিশে আমি রোল পেতে চাই নে। সমীরের মধ্যেকার সেই আত্মমর্যাদাবোধটিকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি তখন থেকে। সেসব প্রসঙ্গ তাই এখনো অবধি স্পষ্ট মনে আছে আমার।

কিন্তু সমীর খুব ভালো খেলোয়াড় ছিল কিনা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। তবুও আমতা আমতা করে বললুম, হ্যাঁ, খেলাধুলোর প্রতি বেশ ন্যাক ছিল ওর।

—.তাহলে ওই হবে। ওর বাড়িটা তো চেনেন?

আমতা আমতা করে বলি, চিনি মানে, ...এককালে তো চিনতুম, কিন্তু এত বছর বাদে, ...এতকিছু বদলে গিয়েছে এই শহরের....।

—এক কাজ করুন, মহামায়াতলাটা চেনেন তো?

—মহামায়াতলা বলতে .... ঐ যেখানে ফি-বছর গাজনের মেলা বসতো?

—এখন আর মেলা-টেলা হয় না। প্রায় পুরো মাঠটাই তো প্লটেপ্লটে বিক্রি হয়ে গেছে। তিন-চারতলা বাড়িঘর উঠেছে ওখানে।

—দেখুন, অ্যাদ্দিন বাদে এসে শহরটার মাথামুণ্ডু কিছুই ঠাহর পাচ্ছি নে। মহামায়াতলাটা ঠিক ...।

—এক কাজ করুন, রিক্সো রয়েছে তো সঙ্গে? চলুন, আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে।

৩.

খুঁজে খুঁজে সমীরের বাড়ির দরজায় যখন পা রাখলুম, রাত তখন দশটা ছুঁইছুঁই। দরজা খুলে যে মধ্যবয়স্ক মানুষটি বেরিয়ে এলো, তাকে দেখামাত্র ভেতর থেকে কেউ ক্রমাগত বলতে লাগলো, এ-ই সমীর। খুব কুতকুতে চোখে আমাকে দেখছিল সমীর। বলি, এক স্ট্রোকে চিনতে হবে কিন্তু। নইলে একশো টাকা ফাইন। শালা, সারা সন্ধে বহুৎ ভুগিয়েছ।

আমার কথায় আরও ছোট হয়ে আসে সমীরের চোখ। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, চেনা-চেনা লাগছে বটে ....।

—শালা, বটে-কি-বাচ্চে, জলদি আমার নামটা বল্, জলদি। কী আশ্চর্য, বলতে পারলি নে? আরে, আমি অশোক, অশোক রায়। গুলি মার্ অশোকে, আমি হীরু, ওরে তোদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলুম ফাইভ থেকে এইট অবধি। মনে পড়ছে, নাকি এক পয়সার গাট্টা মারতে হবে মাথায়? মনে পড়ছে তো, গিরীনবাবুর হাতের গাট্টা খেতেখেতে আমরা ছড়া বানিয়েছিলুম, গিরীনবাবুর গাট্টা, পয়সায় আটটা, ভুলে গেছিস?

সমীরে ম্লান চোখদুটি একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খুব গদগদ গলায় বলে ওঠে, অ...শোক ....!

—যাক, চিনতে অন্তত পেরেছিস!

আমার গলায় বুঝি প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল, তার জবাবে সমীর বিড়বিড় করতে থাকে, কতদিন আগের কথা! এক যু...গ! আজই এসেছিস?

—হ্যাঁ রে। এ জেলার ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে একটা মিটিং ছিল। কোনও জুনিয়র অফিসারকে পাঠিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু, বললে বিশ্বাস করবি নে, কেবল তোর সঙ্গে দেখা হবে এই আশাতেই এলুম।

একচিলতে ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ে সমীরের সারা মুখে। বলে, তুই ব্যাঙ্কে কাজ করিস?

মাথা দুলিয়ে সায় দিই, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার জোনাল ম্যানেজার।

আমার কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সমীরের মুখ। গদগদ গলায় বলে, চিরকাল ফার্স্ট-বয় ছিলি তুই। আমরা সবাই জানতাম, বড় হয়ে একজন তালেবর হবি। বলতে বলতে কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে যায় সমীর। বলে, তাহলে, এই শহরে তোদের ব্যাঙ্কের যে শাখাটি রয়েছে, তার ম্যানজারের ওপরওয়ালা তুই ?

—ওপরওয়ালা ? আমি মৃদু হাসি, তা বলতে পারিস। ওকথা ছাড়। কেমন আছিস বল্ ?

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতর থেকে বসবার ঘরে ঢোকেন এক মহিলা। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস, ফরসা, মুখখানিতে বয়েসের চেয়েও কচিকচি ভাব। এত রাতে এক জন আগন্তুক এসেছে, বাড়ির কর্তাটি তাকে পত্রপাঠ বিদেয় না করে খোসগল্প জুড়েছে তার সঙ্গে, সম্ভবত সেই কারণেই সারা মুখে কৌতূহল জমিয়ে সমীরের পাশটিতে এসে দাঁড়ান ভদ্রমহিলা।

ওঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে সমীর, চিনতে পার ?

ভদ্রমহিলা লাজুক হেসে মাথা নাড়েন।

—তোমাকে আমার এক বন্ধুর কথা বলতাম প্রায়ই। অশোক। মনে পড়ছে ? এখন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বিরাট অফিসার।

—ও....মা, ইনিই তোমার সেই বন্ধু ? বলতে বলতে আমার দিকে খুব সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় সমীরের বউ, ...আপনার কথা ওর মুখে যে কত শুনেছি !

আমি আলতো হাসি, কী নাম তোর বউয়ের ?

—আশা। বলেই কোনকিছুর আশায় বউয়ের দিকে তাকায় সমীর।

আশা বুঝে মুহূর্তে বুঝে ফেলে তা। বলে, তোমরা গল্প কর, আমি আসছি।

আশা ঘরের ভেতর চলে যাওয়া মাত্র আমি কটমট করে তাকাই সমীরের দিকে। বলি, যদিও তোর বউ খুবই ভালো হয়েছে, কিন্তু তুই চুক্তি ভঙ্গ করেছিস।

—চুক্তি ভঙ্গ ? সমীর কিছুই না বুঝে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

—আলবৎ। আমাদের চুক্তির হয়েছিল, তোর বউ আমি বেছে দোব।

—তাই ? সমীরও চোখ পাকায়, ...কেবল এই চুক্তিটাই হয়েছিল ? তোর বউ আমি বেছে দেবো, এমন চুক্তি হয় নি বুঝি ?

আমি হেসে ফেলি। বলি, আমাদের মধ্যে কিন্তু আরও একটা চুক্তি হয়েছিল।

—কী ?

—ঐ মেয়েটাকে মনে আছে তোর ? ঐ যে, আমাদের পাশের গলিতে থাকতো। জলি না কী যেন নাম ....।

—জলি নয়, মলি। জলি ওর দিদির নাম।

—তা হবে। কিন্তু আমরা কি এমন চুক্তি করিনি যে আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন মলিকে বিয়ে করবো ?

—করেছিলাম তো। এমন কি, কে ওকে বিয়ে করবে, তাও আমরা লটারি করে স্থির করেছিলাম।

—রাইট। এবং লটারিতে তোর নামই উঠেছিল।

—আমার নয়, তোর নামই উঠেছিল।

—ফ্যাট্। কখ্খনো নয়। তোর নাম।

সমীর আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বলে, তুই দেখছি আগের মতো কথা বানাতে পারিস বেশ। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তোর নামই উঠেছিল ।

—কখ্খনো না। তোর নাম।

—আমি বলছি, তোর নাম।

—তোর নাম

—তোর নাম

এমনি সময়ে সমীরের বউ জলখাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢোকে। দু-বন্ধুতে সমানে চেঁচিয়ে যেতে দেখে হকচকিয়ে যায়। বলে, ব্যাপার কি? আমরা তৎক্ষণাৎ সামলে নিই নিজেদের। বলি, ও কিছু নয়। আপনার কর্তার দেখছি ইদানিং কিছুই মনে থাকে না। রোজ ব্রাহ্মীশাক খাওয়াবেন ওকে।

—ঐ একই কথা তোর বউয়ের সঙ্গে দেখা হলে আমিও বলবো।

—ব্রাহ্মীশাক খেতে খুব ভালোবাসো বুঝি তোমরা? সমীরের বউ মুখ টিপে হাসতে থাকে।

—আমি নয়, ও ভালোবাসে। আমি সমীরের দিকে আঙুল দেখাই, ...ওর খাওয়া দরকারও।

চা খেতে খেতে আমরা পুরোনো দিনের গল্পে মেতে উঠি। একটুক্ষণ উসখুশ করে সমীরের বউ একসময় পায়েপায়ে চলে যায় ভেতরে। বলি, তোর ছেলেমেয়ে ক'জন?

—এক ছেলে, তিন মেয়ে।

—কোথায় ওরা?

—ওদের ছোট মামার বিয়ে, পরশু। সবাই আগেভাগে চলে গিয়েছে, কেবল আমরা বুড়ো-বুড়ি কাল যাবো।

—কী করছিস আজকাল? আমি শুধোই।

সে কথায় সমীরের চোখে আকস্মাৎ সব আলো নিভে আসে। বলে, তেমন কিছু করছি নে রে। আসলে, বাবা সাইকেলের দোকানটা তো বেচে দিল ...., বুড়ো বয়েসে রোগ-ব্যাধিতে ধরলো ...., চিকিৎসা করাতে গিয়ে দোকান বিক্রির প্রায় সব টাকাই শেষ হয়ে গেল ...., সেই থেকে ...., বলতে বলতে আমার দিকে যখন পুরোপুরি তাকায় সমীর, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই। কী ক্লান্ত, অবসন্ন চোখদুটি!

খুব ব্যাকুল হয়ে বলি, বন্ধু হিসেবে জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করিস নে, এখন ঠিক কী করিস তুই?

—তেমন কিছু পাকাপাকিভাবে করি না। আজ এটা তো কাল সেটা। তবে একটা দোকান করবার খুব চেষ্টা করছি। দেখি, কী হয়।

—কিসের দোকান?

—করলে সাইকেলের দোকানই করবো। ওটাই আমি বুঝি।

—তো, অসুবিধেটা হচ্ছে কোথায়?

সমীর আমার দিকে তাকায়। ম্লান হেসে বলে, আজকাল পুঁজি ছাড়া দোকান হয়? ব্যাঙ্ক থেকে কিছু লোন পাওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু হলে তো। যাগগে্ তুই কেমন আছিস্ বল্? মেশোমশাই, মাসিমা, আর তোর ছোট বোন মাধুরী? কেমন আছে সব? মাধুরীর ডাকনামটা যদ্দুর মনে আছে, পুচকন, তাই না?

—মা..বাবা দুজনেই মারা গ্যাছেন। পুচকনের বিয়ে হয়ে গ্যাছে। ভালোই আছে ও।

—ছেলেবেলায় কতই না ক্ষ্যপাতাম ওকে! পুচকন বললেই রেগে কাঁই। বড্ড ছেলেমানুষ ছিল।

আমি হাসি, এখন সে ছেলেপুলের মা। গিন্নিবান্নি হয়ে সংসার সামলাচ্ছে। আর আমি তো, ঐ যে বললুম, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জোনাল ম্যানেজার। বউও চাকরি করে কানাড়া ব্যাঙ্কে। একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেটার ডাক্তারির ফাইন্যাল ইয়ার, মেয়েটা লোরেটোতে ইক্‌নোমিক্স নিয়ে সেকেন্ড ইয়ার। ব্যস, এইসব নিয়ে আছি ....।

খুব মন দিয়ে শুনছিল সমীর। ধীরেধীরে গদগদ হয়ে আসছিল ওর চোখমুখ। বলে, তুই তো একেবারে যাকে বলে প্রতিষ্ঠিত। তবুও যে আমাদের কথা এখনো মনে আছে, এটাই ভেবে খুব ভালো লাগছে।

আমি মৃদু হেসে বলি, মনে আছে কেন জানিস? তোকে মনে আছে তোর একটা গুণের জন্য। তোর স্পষ্টবাদিতা আর শিরদাঁড়া সোজা করে বাঁচবার ধরনটিকে, সত্যি বলছি, ঐ বয়েসেই খুব সম্মান করতুম আমি। নিজেকে হেয় করে, হীন করে কখনোই বাঁচতে চাস নি তুই। একই একটা ব্যাপারে আমি সবদিনই তোর চেয়ে পিছিয়ে থাকতুম। বিড়বিড় করে বলি, সম্ভবত এখনো।

কথাগুলো শুনতে নিশ্চয় খুব ভালো লাগছিল সমীরের। খুব মিষ্টি করে হাসতে থাকে সে।

বলি, তোর মনে আছে? একবার, আমরা তখন বোধ করি সেভেন কিংবা এইটে পড়ি, আমাদের ক্লাসে একজন খুব বড়লোকের ছেলে পড়তো ....।

—হ্যাঁ, মোটকা জগদীশ। জন্মদিনের নেমতন্ন করেছিল, আমি যাই নি।

—আজও ঘটনাটা মনে পড়ে আমার।

সে কথায় বুঝি সামান্যক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায় সমীর। দু'চোখের কোণায় চিকচিক করে বিষাদ।

একসময় সমীর কয়েক মিনিটের জন্য ঘুরে এল ঘরের ভেতর থেকে। তখন থেকেই একটা ব্যাপার সন্দেহ করছিলুম, একটু বাদেই ফলে গেল আমার আশঙ্কা। সমীরের বউ এসে দাঁড়ালো স্বামীর পাশটিতে। মিষ্টি হেসে বললো, আপনি কিন্তু খেয়ে যাচ্ছেন এখানে।

সমীরের বউয়ের এমন আতিথেয়তার বহর দেখে মনে মনে মজা পাই আমি। আমার মনে হলো, সমীরই তখন ভেতর-ঘরে গিয়ে বুদ্ধিটা জুগিয়ে এসেছে বউকে। তবুও যেন কিছুই বুঝতে পারছি নে এমন ভাব করে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে।

সমীরের বউ ঘাবড়ে গিয়ে বলে, কী হলো?

বলি, খেয়ে যাচ্ছি মানে? কোথায় যাব, অত রাতে, ঐ ভরপেটে? রান্না চড়াবার ফাঁকে বিছানাটাও পেতে রাখুন। আমি আঁচিয়েই বিছানায় ঢুকবো।

এতক্ষণে বুঝি সমীরের বউ বুঝতে পারে, আমি নিছক ঠাট্টা করছি ওর সঙ্গে। বলে, ঠাট্টা নয়, আমি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি কিন্তু।

—প্লি-জ...। আমি এবার সত্যিসত্যি বাধা দিই ওকে, ...ডাকবাংলোয় খাবার বলে এসেছি, ঠান্ডা হয়ে যাবে। পরের বার এলে একেবারে কব্জি ডুবিয়ে খাবো।

—আর এসেছেন! কত বছর ধরে শুনতে শুনতে অ্যাদ্দিন বাদে এলেন। সমীরের বউয়ের গলায় বুঝি সামান্য অভিমান।

মুচকি হেসে বলি, এবার তো ঘনঘন আসবো।

—কেন? সমীরের বউ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আপনার হাতের রান্না খেতে। ফিক করে হেসে ফেলি আমি।

—খালি ঠাট্টা! সমীরের বউ ভ্রূকুটি করে, ...সত্যি করে বলুন কবে আসবেন?

—মাস-দুয়েকের মধ্যে একবার আসবো হয়তো।

—তখন কিন্তু খেতেই হবে। সমীরের বউয়ের গলায় আবদার।

আবদারটা ভালো লাগলো। বলি, অবশ্যই খাবো।

একটু বাদেই সমীর আসল কথাটা পাড়ে। সত্যি বলতে কি, আমি একেবারেই আশা করি নি তেমনটা। অল্পক্ষণ উশখুশ করে এক সময় সমীর খুব কাঁচুমাচু গলায় বলে, তোকে একটা অনুরোধ করবো?

—কী?

—তোদের ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে একটুখানি বলে দিবি, যাতে আমার লোনটা স্যাংশন করে দেয়? বড্ড ল্যাজে খেলাচ্ছে। বলতে বলতে খুব করুণ হয়ে ওঠে সমীরের মুখ। বলে, দে না ভাই আমার এই উপকারটা করে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া হয় আমার। বলি, আসলে, ব্যাপারটা কি জানিস, লোন নিয়ে এতএত লোক শোধ দেয় নি, ব্যাঙ্কগুলো খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বিপদে পড়ে গেছে ম্যানেজারগুলো। ব্যাঙ্কগুলো ওদের ওপর রেসপসিবিলিটি ফিক্স-আপ করছে। ভয় পেয়ে গ্যাছে বেচারারা।

আমার কথাতে মন ছিল না সমীরের। সে ক্রমশ অবুঝ হয়ে উঠছিল। খুব ব্যাকুল গলায় বলে ওঠে, তবুও তুই একটু বলে দিলে, না করতে পারবে না। হাজার হোক, তুই ওর বস্।

বলি, ঠিক আছে, আমি কথা বলবো ওর সঙ্গে। আমি অন্যদিকে কথা ঘোরাই, তোর মনে আছে, একবার একটা মার্বলের গুলি আটকে গিয়েছিল তোর গলায়? আমি না থাকলে তো মরেই যেতিস ঐদিন।

গল্পগুজবে মন ছিল না সমীরের। তাও আমার কথায় আলগোছে হাসে। বলে, সব মনে আছে। কিছুই ভুলি নি। তুই কি কালই চলে যাবি?

—হ্যাঁ, সকালের ট্রেনে।

—কাল দিনটা থেকে গেলে হয় না?

—কেন বল্ তো?

—কাল দিনটা থেকে গেলে তোকে নিয়ে একবার চলে যেতাম ব্যাঙ্কে। তোর সামনেই কথাবার্তা পাকা হয়ে যেত।

—না রে। আমি মাথা নাড়ি, কাল আমাকে ফিরে যেতেই হবে। ভাবিস নে, আমি ফিরে গিয়েই ফোনে বলে দেব।

—মনে থাকবে তো? যা ব্যস্ত মানুষ তুই!

—মনে থাকে কিনা দ্যাখ্। আমি ওকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করি। অন্যদিকে কথা ঘোরাই, হ্যাঁ রে, তোর সেই মলির খবর কি? কোথায় আছে সে? কেমন আছে?

—মলি আমার কেন হতে যাবে? ও তো তোরই ছিল। লটারিতে তোর নামই তো উঠেছিল। একটু থামে সমীর, শুনেছি কোলকাতায় কোন্ প্রাইভেট ফার্মে নাকি চাকরি করে। ভালো কথা, হ্যাঁ-রে, ব্যাঙ্কের এত বড় অফিসার হওয়ার সুবাদে তো অনেক শাঁসালো পার্টির সঙ্গে তোর দহরম মহরম, দে' না আমার বড় মেয়েটাকে কোনও একটা ফার্মে ঢুকিয়ে। তুই একটু বলে দিলেই হয়ে যায়, ভাই।

বুঝতে পারি, অগাধ জলে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থা সমীরের। কোনও গতিকে একটা খড়কুটো ধরবার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলুম। আজকের দিনে চাকরি পাওয়া অত সোজা নয়। কিন্তু সেটা কী করে বোঝাই সমীরকে! বলি, দেখবো। আজ আমি উঠি। রাত অনেক হলো।

আমি উঠে দাঁড়াতেই সমীরও বশংবদের মতো উঠে দাঁড়ায়। বলে, আবার কবে আসবি তুই? এই যে ...., কোথা গেলে? অশোক চলে যাচ্ছে।

সমীরের বউ দ্রুতপায়ে চলে আসে ভেতর-ঘর থেকে। তার চোখেমুখেও গাঢ় আকুতি দেখলাম বলে মনে হলো আমার। হতে পারে, বাইরের থেকে আমাদের দুজনের সব কথাবার্তাই মনোযোগ দিয়ে শুনেছে সে। খুব গদগদ গলায় বলে, গরিব বন্ধুর বাড়িতে আবার কবে আসবেন?

আমি নিঃশব্দে হাসি। বলি, আসবো।

ঘড়ির ডায়ালে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে আমি দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকি রাস্তার দিকে। পাশে পাশে হাঁটতে থাকে সমীরও। আমি লক্ষ করি, বেশ কুঁজো হয়ে গিয়েছে ওর লম্বাটে শরীর। আমাকে সদর রাস্তা অবধি এগিয়ে দেয় সে। আমি রিক্সোয় চড়ে বসতেই কাছটিতে এসে, কুঁজো শরীরটাকে আরও ঝুঁকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলে, পরশুই ফোনটা করিস তাহলে। ভুলে যাস নে যেন।

আমি মৃদু গলায় জবাব দিই, করবো, অবশ্যই করবো।

—আর, ঐ বড় মেয়েটার জন্য একটা কিছু ....।

রিক্সো এগিয়ে যায়। আধো অন্ধকারে রাস্তায় ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সমীর ....। রাস্তার টিমটিমে আলোতে তার শরীরের কুঁজোপানা রোগাটে ছায়াটি তিরতিরিয়ে নাচতে থাকে।

আর, তখনই আমার অকস্মাৎ মনে হয়, এ লোকটিও আমার ছেলেবেলার সেই বন্ধুটি নয়। এতক্ষণ কথার পিঠে কথা চাপিয়ে আমার সঙ্গে তাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু নিশ্চয় করে বলতে পারি, এ অন্য লোক। এ লোকটা সমীর হতেই পারে না। না, কিছুতেই না।

হাহাকারে ভরে যাচ্ছিল মন, প্রাণের বন্ধু ভেবে একটা অচেনা, ভুল লোকের সঙ্গে এতটা সময় বাজে খরচ করলুম আমি!

পোকা-মাকড়

কাঁচের পাল্লা দেওয়া ঘরটাতে ঢুকেই ধূর্জটির দুটো অনুভূতি।

ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা, এক ধরনের অস্বস্তিকর শীতলতা এ ঘরের বাতাসে।

একটা অচেনা গন্ধ, সেন্ট, সিগারেট, অডোনীল, নতুন পর্দ্দা, গ্যামাক্সিন, চপ-কাটলেট, সব কিছুর গন্ধ একসংগে মিশে গেলে যেমন একটা সম্পূর্ণ অচেনা গন্ধ তৈরী হয়।

একটা অস্বস্তিকর শীতল বাতাসে, একটা বারো-মেশালী অচেনা গন্ধ। ধূর্জটির প্রথম অনুভূতি বলতে এই।

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা সুদর্শন মানুষটি ধূর্জটির পায়ের শব্দে মুখ তুলতেই, ওর দ্বিতীয় অনুভূতি। সে এক হাড়-পাঁজর কাঁপানো প্রলয়ংকর শব্দের অনুভূতি। শব্দ নয়, কেবল শব্দেব অনুভূতি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে ধূর্জটির মধ্যে সেই অনুভূতিটা তার সারা মস্তিষ্ককে অসাড় করে তুলছিল ধীরে ধীরে। একটা অসাড় মস্তিষ্কের মধ্যে কতোকিছু ছবি, টুকরো টুকরো, কতো মধুক্ষরা বক্তৃতা, অকপট হাসি, আন্তরিক চাউনি, কতো, কতো স্মৃতি ! প্রকাশ-স্যার !

—সারা ভারতবর্ষ তখন গভীর শোকে মুহ্যমান। বিস্ময়ে, ঘৃণায়, দুঃখে, ক্রোধে একেবারে বোবা হয়ে গেছে সবাই। কোনও সভ্য জাতি যে তিনদিক থেকে এমন বর্বর আক্রমণ চালাতে পারে নিরস্ত্র শিশু-মহিলা-বৃদ্ধদের ওপর, সেটা সবাইয়ের ধারণার অতীত ছিল। সেদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কতো নিরস্ত্র, নির্দোষ মানুষ যে ইংরাজের উদ্ধত কামানের সামনে পোকা-মাকড়ের মতো মরেছিল !

'পোকা মাকড়ে মতো' কথাটা ভীষণ গভীরে গিয়ে আঘাত করেছিল ধূর্জটির। পোকা-মাকড়কে সে মরতে দেখেছে বহুবার। মানুষকে অমনভাবে মরতে দেখলে বুকে ভীষণ কষ্ট হয় তার। মরার সময় পোকা-মাকড়গুলো যে কতো অসহায় আর করুণার পাত্র হয়ে যায় !

—সারা ভারত, আসমুদ্র হিমাচল তখন ধিক্কারে সোচ্চার। মহাত্মাগান্ধীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত চরম ঘৃণা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। সাত সমুদ্দুরের ওপার থেকে সুভাষ বোস তার ঘৃণা ছড়িয়ে দিলেন সারা বিশ্বে। তখনই শোনা গেল মাইকেল ওডায়ারের সদর্প ঘোষণা, ভারী দুঃখিত, অনেকেই বেঁচে ফিরে গেল। আর গুলি ছিল না কাছে।

প্রকাশস্যার যে কেবল ছাত্রদের পড়ানোব জন্যই এত গুছিয়ে বলতেন তা নয়। ধূর্জটির যেন মনে হোত, হিস্ট্রির ক্লাসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ানোর সময় প্রকাশস্যার আর শিক্ষক থাকতেন না। পড়াতে পড়াতে ইংরেজের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা, বিপ্লবীদের প্রতি অসীম মমতা, বিশ্বাসঘাতকের প্রতি চরম আক্রোশ, ভন্ডদের প্রতি সুস্পষ্ট বিদ্রূপ—সবকিছু নিয়ে তিনি যেন তখন এক সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। মনে হোত, জালিআনওয়ালাবাগের অপমান, ক্ষত, দহন—সবকিছু নিয়ে তিনি যেন সর্বক্ষণ জ্বলছেন। দেখতে দেখতে ধূর্জটির সারা মনে একটা চৈতন্যের প্লাবন বয়ে যেতো। অত্যাচারের একটা চিত্রায়িত রূপ সে আজো স্পষ্ট দেখতে পায়, কেবল প্রকাশস্যারের জন্যই।

—তবে যে বলে স্যার, ওরা সভ্য জাতি ছিল? কোন সভ্য মানুষ কি এমন রাক্ষসের মতো মানুষ মারতে পারে বিনা বিচারে?

প্রকাশস্যার হাসলেন, এমন পবিত্র হাসি ধূর্জটি বেশী দেখেনি। হাসতে হাসতে তাঁর ফর্সা মুখ, নাক, কপাল লাল টক্‌টকে হয়ে উঠলো। প্রকাশস্যারের সেই তাৎক্ষণিক পাল্‌টে যাওয়াটা ধূর্জটির আজো মনে আছে। এক অচেনা গলায় প্রকাশ স্যার বলেছিলেন, 'সভ্যই তো, তা নইলে ফাঁসিতে চড়াবার আগে সূর্য্য সেনের সবকটি দাঁত ভেঙে দেয় বুটের ঘাযে? আশি বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনীর বুক ঝাঁঝরা করে দেয়?'

প্রকাশস্যারের চোখ দিয়ে ধূর্জটি সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল, সভ্য দুনিয়ার অত্যাচারের একটা জীবন্ত ছবি। ঐ ছবিটা বুকে বাঁধিয়ে নিয়েই সে চলেছে আজও।

হেড স্যার বলেন, ওরা নাকি ভুল করছে? দু'একটা পিস্তল সম্বল করে ইংরাজকে তাড়ানো যাবে না নাকি?

প্রকাশস্যারের চোখমুখ সহসা জ্বলে ওঠে। বলেন, 'কয়েকটা পিস্তলই তো ওদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এখন যদি সমস্ত দেশ ওদের পেছনে গিযে দাঁড়ায়? ওদের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক অন্য জায়গায়। কত সহজে মরতে পারে এই ছেলেগুলো! কত নিঃশব্দে! পিস্তলের সংখ্যাটা কিছু নয়। একটা জাতের মরতে পারার ক্ষমতাটাই আসল।'

ধূর্জটি সেই বয়সেই টের পেতো, প্রকাশস্যার নিঃশব্দে পুড়ছেন। শুধোতো, 'আপনি ঐ সময় থাকলে কি করতেন স্যার? কিভাবে প্রতিবাদ জানাতেন ঐ গণহত্যার?'

একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন প্রকাশ স্যার। তারপর বললেন, 'আমি হলে দেশের আদালতগুলোকে ভেঙেচুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম।'

'কেন? আদালতের দোষ কি?'

'দোষের কথা হচ্ছে না, পথেঘাটে, ফাটকের মধ্যেই যখন বিচার হয়ে যাচ্ছে মানুষের, তখন আর আদালতের প্রয়োজন কি?' প্রকাশস্যারের গলা ক্রমশঃ খাদে নামতে লাগলো, 'একটা বুলেটেই যদি একটা মানুষের বিচার ও সাজা একসাথে হয়ে যায়, তাহলে এতবড় ঘর, এজলাস, লোকজন, পেয়াদা-চাপরাশী-পেশকার, কাগজপত্র অত হাঙ্গামা করে লাভ কি? বলো?'

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রকাশ স্যারের ডাক পড়েছিল হেডস্যারের ঘরে। এবং বিকেলের মধ্যে সারা স্কুল জেনে গিয়েছিল, প্রকাশস্যার সিলেক্‌টেড হয়েছেন।

উল্লাস, আকাশ কাঁপানো উল্লাস! বেদনা, বিচ্ছেদের সুগভীর বেদনা। সব ধূর্জটির ছোট্টো বুকে উথলে ওঠা দুধের মতো ফুলে উঠতে না উঠতেই প্রকাশস্যার হারিয়ে গেলেন।

প্রকাশস্যার চলে গেলেন। কিন্তু ধূর্জটির বুকে একটা জ্বলন্ত ছবি হযে বেঁচে রইলেন তিনি। বড় হয়ে আরও অনেক কিছু জেনেছে ধূর্জটি। তার নিজের পথ সে বেছে নিয়েছে নিজের মতো করে। এখন প্রকাশস্যারেব মূল ভাবনার সঙ্গে ওর ভাবনার অনেক ফারাক। প্রকাশস্যার রাজনীতিতে থাকলে হযতো ধূর্জটির শত্রু পক্ষই হতেন আজ, তবুও প্রকাশস্যারের সেদিনের ছবিখানা এখনও টেঁসে বসে রযেছে ওর বুকের গভীরে। ওঁর অনেক কথা এখনও ওকে চালায়, দোলায়, নাড়ায়।

আসলে, একধরনের উথলে ওটা আবেগের দ্বাবা তাড়িত হয়েই তো মানুষ এমন অনির্দিষ্টের পেছনে এমন বল্গাহীন হয়ে ছুটে যায়। ঐ আবেগই তাকে ধাক্কা মারে পেছন থেকে। মানুষ আবেগ নিয়ে যা আঁকড়ে ধরে, তাকে ছাড়া কঠিন হয়। আর ভালো লাগাটা দুধের চাঁছির মতো। চেটেপুটে নিলেও কড়াইযের গায়ে লেগে থাকে খানিক। নিদেন আঘ্রানটা থেকে যায়! সেই আবেগের বশেই ধূর্জটি আজ ঘর ছেড়েছে। প্রকাশস্যারকে ভালোবেসে চলেছে সেই কারণেই।

ধূর্জটি একনজরে দেখে নিল প্রকাশস্যারের মুখখানা। সারা শরীরে যে অল্প মেদ জমেছে সেটা ও আগেই লক্ষ করেছে। এবার দেখলো ওর মুখখানা। ফর্সা ধারালো মুখখানা আরও উজ্জ্বল, আরও তীক্ষ্ম, আরও বয়স্ক। তবে এই মুখের খাঁজে খাঁজে যে অকপট কোমলতা ছিল, তা মুছে গেছে অনেক খানি। ধূর্জটি বোঝে, ওটা হবেই। সময়ের চেয়ে বড় ডাকাত আর নেই।

প্রকাশস্যার এক পলক তাকিয়ে নিলেন ধূর্জটির দিকে। ওর নোংরা প্যান্ট-সার্ট, ময়লা শরীর, গর্তের গভীরে দুটো জীবন্ত চোখ, ওর ফোলাফোলা মুখ, কাটা-ছেঁড়া শরীর—সব কিছুর ওপর বার-দুই দৃষ্টির বুরুশ বুলোলেন। প্রকাশস্যারকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি বছরখানেক ছিলেন স্কুলে। ধূর্জটি তখন নিচু ক্লাসের ছাত্র। চারটে সেকসনের একটাতে একটা বেঞ্চির একটা সিট বরাদ্দ ছিল তার জন্য। প্রকাশস্যারের মনে পড়ার কথা নয়। মনে পড়তে পারে কেবল একটি কারণে, চার সেকসন মিলিয়ে ফি-বছর ফার্স্ট হতো ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহ। আর, ওর চোখদুটো প্রকাশস্যারকে মুগ্ধ করতো ভীষণ। ওর চোখ দেখে অনেক কথা নির্ভুল বলে দিতেন প্রকাশস্যার। প্রায়ই কোনও কথার পিঠে বলতেনই, 'সে আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি।'

ধূর্জটির সেই চোখদুটো তো এখনও আছে। যদিও সে চোখ অর্ধমৃত, অর্ধনিমজ্জিত।

চোখাচোখি হতেই এক টুকরো হাসি অতি সূক্ষ্মভাবে খেলে গেল ধূর্জটির দু'চোখে।

প্রকাশস্যার সংগে সংগে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখ নামিয়ে তিনি নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

আশ্চর্য্য! এই ছেলেগুলো এখনও কারণে-অকারণে এমন হাসে?

প্রকাশস্যারের মুখটা ঝুঁকে পড়েছিল টেবিলের উপর, সে মুখখানা দেখতে পাচ্ছিল না ধূর্জটি। সে শুধু শব্দটাই শুনলো, 'বসো'।

সামনের চেয়ারটাতে আলতো বসে ধূর্জটি বললো, 'আমাকে চিন্‌তে পারছেন স্যার?'

'নিশ্চয়, তোমাকে না চিনে উপায় আছে আমার?' ঝট্‌পট দু'খানা সই করে প্রকাশস্যার বললেন, 'তোমরা নিজেদের চেনাতে চাইলে, মানুষের সাধ্য কি, তোমাদের না চিনে এক দন্ড তিষ্ঠোয়?'

আবার একমনে সই করতে লাগলেন প্রকাশস্যার। খানিক বাদে মাথা নামিয়েই বললেন, 'এমন প্রলয় নাচ কেন জুড়েছো তোমরা? এই কচি বয়সে? তোমাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর—'

ম্লান হেসে ধূর্জটি বললো 'এটা তো আপনিই শিখিয়েছেন স্যার।'

ধাঁ করে মুখ তুললেন প্রকাশস্যার।

আর সেই মুহূর্তে ধূর্জটি বলে ফেললো, 'আপনি আমায় সত্যিই চিনতে পারছেন না স্যার? আমি ধূর্জটি। ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহ। মডার্ণ হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে—'

প্রকাশ স্যারের দুটো চোখ পেরেকের মতো ঢুকে যাচ্ছিল ধূর্জটির মুখে। বারবার। ঝাঁ করে পাশের ফাইলটা টেনে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ওল্টাতে লাগলেন কাগজ। তারপর একটা কাগজের উপর নিবদ্ধ হলো দু'চোখ। খানিকবাদে মুখ তুললেন প্রকাশস্যার। তাঁর সারামুখে অজস্র চেনা-অচেনা রেখা কিলবিল করছিল। তাঁর নাকের পাটা ফুলে উঠছিল বারবার। তাঁর নীচের ঠোঁট বারবার আটকা পড়ছিল দু'পাটি দাঁতের মাঝে। তুমি ধূর্জটি?

ধূর্জটির চোখমুখ সহসা উজ্জ্বল হতে চায়। স্থান কাল পাত্র ভুলতে চায় তার ইস্পাতের মত মন।

সহসা মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে টেবিলের কাছাকাছি নামিয়ে আনেন প্রকাশ বাগ্‌চী। স্বচ্ছ ঝিরঝির জলের তলায় রূপোলি মাছের মতো পিঠ ওল্টায় স্মৃতি। ধূর্জটিকে ভীষণ মনে পড়ে তাঁর।

বেল টিপতেই ঘরে ঢুকলো কড়া ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। খড়াক্ করে সেলাম ঠুকলো। মুখ তুলে তাকালেন বাগচী সাহেব। তারপর পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিলেন কনেষ্টেবলের দিকে। এক প্যাকেট দামী ব্রান্ডের চুরুট আনতে বললেন, জল্‌দি।

চুরুট খাওয়া একদম বারণ বাগ্‌চী সাহেবের। প্রেসারটা ইদানিং ভীষণ হাই। বুকে একটা ব্যথা বোধ করেন। পর্ণা প্রায় জোর করে বন্ধ করেছে চুরুট। কোনও হাল্কা গোছের সিগারেট খাওয়ার হুকুম মিলেছে পর্ণার কাছে। এখন চুরুট খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল বাগ্‌চী সাহেবের। একটা চুরুট খাওয়া ভীষণ দরকার। কিছু কড়া ধোঁয়া গলা দিয়ে মগজের কোষে চারিয়ে দিতে না পারলে কিছুতেই স্বস্তি হবে না তাঁর। ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বাজলো।

—হ্যালো, কে মুখার্জী? ডি সি বলছি। কি খবর? কেউ ধরা পড়েনি? একজন? মুচিপাড়া লকআপে রয়েছে? আচ্ছা আমি আধঘন্টার মধ্যে যাচ্ছি। আচ্ছা।

ফোনটা নামিয়ে রেখে একটা চুরুট ধরালেন বাগ্‌চী সাহেব। গোটা দুই টান মেরে তাকালেন ধূর্জটির দিকে।

ঠাণ্ডা গলায় শুধোলেন, 'তুমি এ লাইনে এলে কবে থেকে?'

ধূর্জটি ভারী সমস্যায় পড়ে গেল। কথাটা কে জিজ্ঞেস করছেন, প্রকাশস্যার, না ক্যালকাটা পুলিশের ডি সি প্রকাশ বাগ্চী, সেটাই বুঝতে পারছিল না সে।

—তুমি তো খুব ভালো ছাত্র ছিলে। তোমার ব্রাইট ফিউচার ছিল। হঠাৎ এ মতিচ্ছন্ন ঘটলো কেন?

ধূর্জটির প্রতিটি কোষে কোষে একটা সতর্কতার ঘন্টা বেজে গেল। কোটরের চোখ দুটো যতটা সম্ভব উজ্জ্বল রাখবার চেষ্টা করলো সে, তারপর যথাসম্ভব শান্ত গলায় বললো, 'আমার বিরুদ্ধে কোন স্পেসিফিক্ চার্জ নেই স্যার।'

বাগচী সাহেব নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন ধূর্জটির দিকে। তারপর বললেন, 'পুলিশ এমনি ধরেছে তোমায়?'

—আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন স্যার।

ধূর্জটির সারা শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। বাগ্চী সাহেব ওর ফুলে ওঠা জায়গাগুলো দেখছিলেন, সহসা ধূর্জটির ফাইলটা টেনে নিলেন তিনি।

—দশ-তিন-পঁচাত্তরে হাতিবাড়ির জংগলে কি করছিলে তুমি?

—আমি ওখানে যাইই নি।

—এজরা স্ট্রীটে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

—মিথ্যে কথা।

—গঙ্গাপ্রসাদ জুট মিলের মালিক শেঠ চুরণলালকে খুন করার সময় তুমিইতো প্রথম গুলিটা করেছিলে?

—আমার কোন বন্দুক নেই স্যার।

ফস্ করে চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন বাগ্চী সাহেব। কয়েকটা উত্তেজিত টান মারলেন পরপর। তারপর জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। সাব-ইনস্পেক্টর বোস কয়েকটা রেডিওগ্রাম এনে সামনে রাখলো।

অন্যমনস্কভাবে ওগুলোর ওপর দৃষ্টি বোলাতে বললেন, 'আমি একটু বেরোচ্ছি। মুচিপাড়া লকআপে সুহৃদ রায় রয়েছে। ওকে ইনটারোগেট করতে হবে।' বলেই আড়চোখে তাকালেন ধূর্জটির দিকে।

ধূর্জটির দু'চোখে আশঙ্কা চাপা ছিল না।

একটা সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল বাগ্চী সাহেবের ঠোঁটে।

'সুহৃদকে চেন তো?'

'কে সুহৃদ?'

বাগ্চী সাহেব কোন জবাব দিলেন না। রেডিওগ্রামগুলোতে খস্খস্ করে কিছু লিখে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি বেরুচ্ছি। ওকে লকআপে নিয়ে যান্। নো মোর ইনটারগেসন্।'

জলপাই-রংয়ের জীপখানা প্রচণ্ড বেগে ছুটছিল। বাগ্চী সাহেব নিজে ড্রাইভ করছিলেন। বাঁ পাশে বসে ছিল ধূর্জটি।

ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর দিয়ে ছুটছিল জীপ। শহর ছাড়িয়ে এসেছেন। কিছুক্ষণ আগে। এখন দু'ধারে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত ধূসর গ্রাম, কাঁচামাটির আঁকাবাঁকা রাস্তা। ধূর্জটি দেখছিল চারপাশের দৃশ্য।

বাগ্‌চী সাহেবের মুখে কথা ছিল না। ঠোঁটের কোণে ঝুলছিল ডানহিল সিগারেট। সারামুখে একটা থমথমে ভাব। স্পিডোমিটারের কাঁটা তির-তির করে কাঁপতে কাঁপতে ডানদিকে এগোচ্ছিল। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লেগে তাঁর চুলগুলো এলোমেলো উড়ছিল কপালের ওপর।

সহসা বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়লো জীপখানা এবং খানিক বাদে খ্যাঁচ্ করে থেমে গেলো এক গা'ছাড়া দীঘির পাড়ে।

এ রাস্তায় লোক চলাচল কম। এমন ঠা-ঠা দুপুরে এলাকাটা ভীষণ নির্জন লাগছিল। ধূর্জটি একবার বাগ্‌চী সাহেবের দিকে তাকিয়ে নেমে পড়ল।

বাগ্‌চী সাহেব এগিয়ে গেলেন দীঘির দিকে। পিছুপিছু ধূর্জটি।

'কি? খুব ঘেন্না হচ্ছে প্রকাশস্যারকে?'

ধূর্জটি চম্‌কে তাকালো। এ কার গলা!

ওরা বসেছে দীঘির পূবপাড়ে। চারপাশে অজস্র ঝোপঝাড়। লতা-বাকল। তার মধ্যে এক চিল্‌তে ঘাসজমি। কচুরীপানায় ভরে গিয়েছে দীঘির জল। মাঝেমাঝে টুকরো টুকরো ফাঁকা জায়গা। সেখানে কালো জল উঁকি মেরেছে আকাশের দিকে। গোটা কয়েক পানকৌড়ি ডুবছে আর উঠছে।

ধূর্জটি নরম গলায় বললো, 'আমি আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম স্যার।'

বাগ্‌চী সাহেব হাসলেন, 'আমি এই কিছুদিন হোল কলকাতায় এসেছি।'

আবার খানিক চুপচাপ। অস্বস্তি! বাগ্‌চী সাহেব একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, কতোদিন পরে দেখা হোল যেন তোমার সংগে?

অল্প ভেবে ধূর্জটি বললো, 'প্রায় এগারো বছর।'

'এগারো বছর।' বাগ্‌চী সাহেব চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর জড়ানো গলায় বললেন, 'জীবনটা নষ্ট করে ফেললে এইভাবে?'

ধূর্জটি কোন জবাব দিল না। এমন কথার কোনও সুস্পষ্ট জবাব হয় না।

'তোমার যন্ত্রণাটা আমি বুঝি।' রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন বাগ্‌চী সাহেব।

'এ যন্ত্রণা আমারও ছিল এককালে। ছিল বলছি কেন? এখনও—'

ধূর্জটি খুঁটিয়ে দেখছিল বাগচী সাহেবের মুখ। সেই আগের দিনের নরম ভাবটা যেন উঁকিঝুঁকি মেরেই মিলিয়ে যাচ্ছে ওঁর মুখে।

'তুমি কি বিশ্বাস করো, এভাবে কিছু হবে? তুমি কি বুকের মধ্যে বিশ্বাস করো?'

ধূর্জটি কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। সে সহসা অন্য একটি প্রশ্ন করে বসে।

'আপনি আমাদের জালিয়ানাওয়ালাবাগের গল্প শোনাতেন কেন স্যার?'

বাগচী সাহেবের চোখমুখ সহসা নিষ্প্রভ হয়ে এলো।

'তোমাকে ওরা কাল বিকেল থেকে মারধোর করেছে আর?'

'না'। ধূর্জটির চোখে একধরনের কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলো।

'তোমার বাবা কেমন আছেন?'

'ভালো নেই। প্যারালাইসিসে শয্যাশায়ী, আজ তিন বছর।'

'সংসার কি করে চলে?'

'চলে না। বাবার পেন্‌সনের টাকাটাই সম্বল।'

'চাকরির চেষ্টা করোনি?'

'করেছিলাম। পাইনি।'

ধূর্জটির মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে চোখদুটো ভারী হয়ে এলো বাগচী সাহেবের।

বললেন, 'তুমি কাল বলেছো, আমিই তোমাকে শিখিয়েছি এ লাইনে আসতে। তুমি কি আমাকে দাযী করো তোমার এই অবস্থার জন্য?'

'না, আমি কাউকেই দায়ী করি না।'

'তোমার কি এখন অনুতাপ হচ্ছে?'

'অনুতাপ করার মতো কিছুই আমি করিনি।'

বাগচী সাহেব ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন ধূর্জটির দিকে।

ভারি অস্বস্তি লাগছিল। ম্লান হেসে ধূর্জটি শুধোলো, 'কি দেখছেন স্যার?'

বাগচী সাহেব যেন হুঁশে এলেন। বললেন, 'কেমন শান্ত ছিলে তুমি! কত লাজুক আর নরম ছিলে!'

ধূর্জটি একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

'আমাকে তোমার শত্রু বলে মনে হচ্ছে না?'

ধূর্জটি ভারি সমস্যায় পড়ে গেল। পুলিশ যে ওদেব চরম শত্রু এটা তার অজানা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে ডি-সি সাহেবের আড়াল থেকে যিনি বেরিয়ে আসতে চাইছেন, তিনি প্রকাশস্যার।

ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে ধূর্জটি বললো, 'প্রকাশস্যার আমার শত্রু নয়।'

'তুমি কি মনে করো, তোমার প্রকাশস্যার এখনও বেঁচে আছে?'

এক ঝলক উজ্জ্বল আলোয় চোখদুটো ভরে গেল ধূর্জটির। বললো, 'এই মুহূর্তে যেন বিশ্বাস করছি।'

ফস্ করে নিঃশ্বাস ফেললেন বাগচী সাহেব। তারপর বললেন, 'সুহৃদ রায় ধরা পড়েছে। শুনেছো তো?'

'বলেছিলেন কাল'।

'ও কতো ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র ছিল, সে তো তুমি জানই। ফিজিক্সে থার্ড হয়েছিল এম-এস-সি তে।'

'থার্ড নয়, ফার্স্ট হয়েছিল। আর ফিজিক্সে নয়, কেমিষ্ট্রিতে।'

'দেশের এই ক্ষতি কী করে পূরণ হবে বলতো?'

'কিসের ক্ষতি স্যার?'

'এ্যাতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে পোকামাকড়ের মতো শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের কাজে লাগালে কতো উপকার হতো দেশের।'

বহুদিন পরে 'পোকামাকড়' শব্দটা আবার ধূর্জটির মগজে ঘা মারলো। প্রকাশ স্যার সেই কবে ওই শব্দটি ওর মাথায় চারিয়ে দিযে এসেছিলেন। সেই একযুগ আগে। শব্দটা তাকে একযুগ ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে। আজ সহসা ওটা জেগে উঠে মগজের মধ্যে বড় অস্থির হয়ে উঠলো।

ঠান্ডা গলায় ধূর্জটি বললো, ইয়ং জেনারেশনকে কাজে লাগালে, দেশব্যাপী এ্যাতো পোকামাকড় সৃষ্টি হতো না, স্যার।'

'আমি বুঝি ধূর্জটি। সব বুঝি। তোমাদের চেয়েও বেশী বুঝি। কিন্তু তোমরা কি শেষরক্ষা করতে পারবে?'

ধূর্জটি জবাব দিল না। সে স্থিরপলকে তাকিয়ে রইল একখন্ড সাদা মেঘের দিকে।

'সুহৃদ ধরা পড়েছে, সোনা হালদার ধরা পড়েছে। সুশান্ত মুখার্জী আর প্রণব বসু এখনও বাইরে, কিন্তু সে আর ক'দিন?'

চুরুটটা মাটিতে ঘস্‌তে ঘস্‌তে বাগ্‌চী সাহেব বললেন, 'তোমরা এত অল্পেই ধরা পড়ে যাও! আমার অবাক লাগে।'

সুশান্তদা আর প্রণবদার কথাটা বুকের মধ্যে তোলপাড় তুলছে এই মুহূর্তে।

পুলিশ ও'দের কতোটুকু খোঁজ পেয়েছে সেটা জানে না ধূর্জটি।

একটা অজানা আশঙ্কা তাকে ক্রমাগত অস্থির করে তোলে।

'সবাই জেলের মধ্যে থাকলে তোমাদের বিপ্লব চলবে কি করে?'

ধূর্জটি যেন নিজের মধ্যে ফিরে আসে ক্রমশঃ। বলে, 'আপানারাই তো ধরছেন।'

সে কথায় যেন কালো হয়ে গেল বাগ্‌চী সাহেবের মুখ। বললেন, 'তোমাদের ধরাটাইতো আমার চাকরী ধূর্জটি।'

'অথচ একদিন আমাদের এগিয়ে চলার মন্ত্র জোগানোই ছিল আপনার চাকরী।'

'আমি সেসব দিন স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছি, ধূর্জটি।' সহসা বাগচীসাহেব ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

ধূর্জটি ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠছিল মনে মনে। বললো, 'অন্যের কথা থাক্‌। আমি শুধু আপনার কথা জানতে চাই স্যার। আপনার কি মনে হয় না, এই সমাজটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলার দরকার আছে?'

বাগ্‌চী সাহেব মুহূর্তকাল চুপ করে থাকেন। তারপর ধরা গলায় বলেন, 'কিন্তু তোমরা যে কত মুষ্টিমেয়, কত নাবালক! আমাদের সংগে কিছুতেই পারবে না তোমরা।'

ধূর্জটির মুখে একটুকরো অদ্ভুত হাসি খেলে গেল। বললো, 'চিরদিন কেউ মুষ্টিমেয় থাকে না স্যার। চিরদিন নাবালক থাকে না কেউ।'

'দেখ।' ছোট্ট জবাব ভেসে এলো বাগচী সাহেবের মুখ থেকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। এক সময় বাগচী সাহেব বললেন, 'সুশান্ত মুখার্জী হয়তো কালই ধরা পড়বে, তাহলে আর উল্লেখ করবার মতো রইল প্রণব বোস।'

ধূর্জটির বুকের মধ্যে আলোড়ন চলছিল তখন। সুশান্তদা ধরা পড়ে গেলে এই এলাকার সমস্ত বেসটাই তছনছ হয়ে যাবে। ধূর্জটির কান্না পাচ্ছিল ভীষণ।

বিকেল গড়িয়ে এসেছে। মজা দীঘিব ওপারে লালচে সূর্য্যটা তেরচা হয়ে ঝুলছে। একটা ম্লান কমলা রং-এর রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে গাছ-পালায়। পড়ন্ত বিকেলে এমন পরিবেশে মনটা অকস্মাৎ বিষন্ন হয়ে ওঠে।

আরো একখানা চুরুট ধরালেন বাগ্‌চী সাহেব। একটা কড়া উৎকট গন্ধে ভরে গেল চারপাশের বাতাস।

'সুশান্তকে বাঁচাতে ইচ্ছে করছে না, তোমাব?'

ধূর্জটি ভীষণ চমকে তাকালো বাগ্‌চীসাহেবের দিকে। বাগ্‌চীসাহেব কি আজও ধূর্জটির চোখ দেখে বুঝতে পারেন সব?

'এমন ধরপাকড়ের সময় ও শহরে রয়েছে কেন, বুঝতে পারি না। তোমাদের তো কতো ঘাঁটি গাঁয়েগঞ্জে।'

ধূর্জটি তেতো হাসি হাসলো। বললো, 'সব জায়গার আপনারা ফাঁদ পেতে রেখেছেন।'

'ওকে এই মুহূর্তে পালিযে যেতে বলো বাইরে। আজই।'

ধূর্জটির সারা শরীরে কাঁপন শুরু হযেছে তখন। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে, রক্তে রক্তে পাগ্‌লা নদীর মতো উত্তাল তবঙ্গ ফুঁসে উঠতে চাইছে।

নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বললো, 'কি করে বলবো, আমি তো অ্যারেষ্টেড্‌।'

বাগচী সাহেব সে কথার জবাব দিলেন না। কেবল সামনের দিকে দু'চোখ স্থির করে চুরুট টানতে লাগলেন এক মনে।

'তোমাকে যদি একঘন্টার জন্যে ছেড়ে দি?' আচমকা শুধিয়ে বসলেন বাগ্‌চী সাহেব।

আবার কেঁপে কেঁপে উঠলো ধূর্জটির সারা শরীর। বাগচী সাহেবের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে সে খুঁজতে লাগলো, তার একযুগ আগের প্রকাশস্যারকে। এক ধরণের কৃতজ্ঞতায় সারা শরীর অজান্তে নুয়ে এলো।

জীপটা ছুটছিল বি, টি, রোড ধরে। এখন চারপাশে লোডশেডিং। দু'পাশে ঝুপড়ি, কারখানা, বাড়িঘর, সব ছুট্‌ছিল আঁধারে। ধূর্জটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে।

মুখের থেকে সিগারেটটা সরিয়ে বাগ্‌চী সাহেব বললেন, 'রাস্তা পাল্টাতে হলে বলে দিও।'

অন্ধকারে বাগ্‌চী সাহেবের মুখখানা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ধূর্জটি স্পষ্ট বুঝতে পারলো তাঁর মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ঝড় বইছে। একটা প্রচন্ড উত্তেজনায় স্টিয়ারিং বারবার কেঁপে যাচ্ছে।

ডানলপ পেরিয়ে খানিক এগুতেই, ডাইনে গাড়ী ঘোরাতে বললো ধূর্জটি। ডানপাশে

ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্টের গ্যারেজ। তার থেকে খানিক এগিয়েই বাঁয়ের সরু রাস্তাটায় ঢুকে পড়লো বাগ্চীসাহেবের জীপ।

'এটা তো তোমাদের তেরো নম্বর আড্ডা। তাই না?' বাগ্চী সাহেবের কথায় ধূর্জটি আবার চমক খেলো। ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল তার। কিছুই অজানা নেই এদের। কিছুই না।

সামনের দিকে চোখদুটো তাক করে বাগচী সাহেব বললেন, 'তোমাদের তেরো নম্বর আড্ডায় সুশান্ত মুখার্জী আছে জানলে, তোমাকে আর শুধু শুধু কষ্ট দিতাম না।'

সপ্তমীর চাঁদের আলো ক্ষীণ নয়। চারপাশে ধোঁয়া ধোঁয়া জ্যোৎস্না ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঝলকে ঝলকে ঠান্ডা হাওয়া ধাক্কা মারছে ধূর্জটির কাঁধে, মাথায়, শরীরের আধখানায়।

সুশান্তদা দিনতিনেক আগে এসেছে এই আড্ডায়। কাকচিলও জানে না সে কথা। ধূর্জটি শুধু ভাবছিল সুশান্তের কথা। ভাবছিল সুশান্তদা যদি শুধোয়, 'তুই এলি কেমন করে?' কি জবাব দেবে ধূর্জটি। প্রকাশস্যারের কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে।

গলিটা নিঃশব্দে পেরিয়ে এলেন বাগচী সাহেব। সামনেই ফিডার রোড। পাশেই একটা লম্বা গুদাম। তার ছায়াতে গাড়ীটা থামিয়ে বললেন, চটপট নেবে পড়। তাড়াতাড়ি চলে যাও ছুটে।'

ধূর্জটি নেবে দাঁড়ালো। তারপর যন্ত্রের মতো এগিয়ে চললো গোডাউনের উল্টো পাশ ধরে।

ঘসা ঘসা চাঁদের আলোয় একটা পুতুলের মতো লাগছিল ধূর্জটিকে। একটা কলের পুতুল যেন।

হাতকয়েক যাওয়ার পর হাঁটার গতিটা বাড়িয়ে দিল ধূর্জটি। একসময় ছুটতে লাগলো উর্দ্ধশ্বাসে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সীসের বুলেট পেছন থেকে ওর পিঠ, বুক ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে গেল।

মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল ধূর্জটি, গুদাম ঘরের গা ঘেঁসে। নর্দমার শানের ওপর। আবছা আঁধারে ওর দেহটা একটা পোকার মতো কিলবিল করেই একসময় স্থির হয়ে গেল।

এক টুকরো পাথরের মতো পড়ে রইলো সে।

রুমাল দিয়ে রিভলবারের নলটা বারকয়েক মুছে নিলেন বাগ্চী সাহেব। তারপর রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী এবং সাতসমুদ্রের ওপার থেকে সুভাষ বোসের গলা থেকে ধিক্কারধ্বনি বেরোনোর আগেই ওটা ভরে ফেললেন খাপে।

সপ্তমীর চাঁদের আলো কেটে কেটে জলপাই রং-এর জীপটা প্রচন্ড বেগে এগিয়ে গেল বেলঘরিয়া থানার দিকে। হাতে একদম সময় নেই।

বানের জল

১.

ঝাড়েশ্বরের ভারি ভক্তিছেদ্দা ছিল তেনাদের ওপর। কিনা, বাপ-ঠাকুদ্দার আমলে মহারাণীর পাগপেটি পরে এরা দেশ শাসন করেছে। সুজনকে পালন, দুর্জনকে দলন। ধীরে ধীরে যেন চোখদুটো খুলছে ঝাড়েশ্বরের। জ্ঞানগম্যি বাড়ছে। দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে ইদানীং লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। ঘেন্নায় থুৎকার দিতে সাধ যায়। অথচ এদের নিয়ে ভালো ভালো কত ভাবনাই না জমা ছিল এ্যাদ্দিন! এখন মনে হয়, কী বোকা সে। বোকা-চৈতন একটি!

'বোকা-চৈতন' ছাপটা অবশ্যি ওর পিঠের ওপর কয়েক বছর আগেই দেগে দিয়েছে রতিন্ সাউ। 'গিরস্থের গোলায় বাড়তি ধান রাখলে লুট হবে' বলে সে তখন বাজার গরম করে বেড়াচ্ছে। সেটা আশ্বিন মাস। টানের সময়। সম্পন্ন গিরস্থদের ঘরে চড়াও হয়ে অনেক ধান তুলেছিল সে। খোদ শংকর পার্টির সদরআপিসে অভিযোগ করেও থামাতে পারেনি রতিন্ সাউয়ের তাণ্ডব নাচ। ঝাড়েশ্বরকেও ঐসময় টানাহেঁচড়া করেছিল বারকয়েক। কিন্তু ঝাড়েশ্বর তিলমাত্র রাজি হয়নি। 'হুহ্!' তেতো গলায় হেসেছে ঝাড়েশ্বর, 'মায়ের মাই চুষে পেট ভরলো নি, বাপের উটা চুষলে পেট ভরবে! বেনাম জমিনের লড়াই কর, আছি। বাট-বেগারী মহাজনী বন্ধ কর, আছি। উই লুটপাটে ঝাড়েশ্বর দাস নাই।'

রতিন্ সাউ শুনে মন্তব্য করেছিল, 'শালা একটি বোকা-চৈতন। মওকা বুঝে না।'

পার্টির তরতাজা জোয়ান ছেলে শংকর। হেসেছিল। বলেছিল, 'রতিন্ সাউয়ের কাছে 'মওকা' শব্দটার মূল্য ঢের। এই কিছুদিন অবধি থানার একনম্বর কুরিয়ার ছিল সে। এ তল্লাটে পার্টির লোকেরা কোথায় যায়, কী বলে, কোন জঙ্গলে মিটিং করে, এসব খবর সে নির্ভুলভাবে দিয়ে এসেছে পুলিশকে। এখন জমানা বদলেছে। রতিন্ সাউ কোন গুহ্য ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়েছে দলে, সুড়ুং কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে জেলা সদর অবধি। শংকর ওর গতিবিধি লক্ষ করছে নীরবে। যতই দেখছে, ততই শিউরে উঠছে মনে মনে।

রতিন্ সাউ ঝাড়েশ্বরকে দু'একবার ধমকেছে। 'খোব শংকরের পিছু পিছু ঘুরছিস'। ঝাড়েশ্বরের বউটা জন্মখোঁড়া বলে জি-আর লিস্টে ওর নামটা ছিল। রতিন্ সাউ সম্প্রতি জি-আর লিস্ট করার ভার পেয়েই কেটে দিয়েছে নামটা।

শংকর বলে, 'সয়ে যা! এমন উড়াপাখি থাকবে নি শেষতক্।'

কিষ্টোকলির পাড়ে একতারা বাজিয়ে গান গাইছিল ঝাড়েশ্বর। কাজ-কাম না জুটলে গান-টান গেয়ে দু'দশ পয়সা রোজগার করে। জাতে বোষ্টম। গলাটাও খাসা। মানুষ খুশি হয়েই দেয়।

ঝাড়েশ্বরের চারপাশে লোক জমে গিয়েছিল। ঝাড়েশ্বর একতারা বাজিয়ে দুলে দুলে গাইছিল—

ভরা নদী ভয় করিনে,
ভয় করি সই বানের জল—।

'বাহা-বাহা' বলে চেঁচিয়ে উঠছিল জমায়েত। পাশ দিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল রতিন্ সাউ। জেলারো আপিসে মিটিং-এ যাচ্ছে। খাস-জমিনের মিটিং। আগে শংকরই যেত। এখন রতিন্ সাউ যায়। যাবার সময় রতিন্ সাউ ঝাড়েশ্বরের দিকে ফিরেও চাইল না।

এখন, এই ঘোর দুর্দিনে, অনেকেই ঝাড়েশ্বরকে উপদেশ দেয়। সোজা গিয়ে রতিন্ সাউয়ের পা' দু'খানা জড়িয়ে ধর্। উ একটিবার গলা খাঁকার দিলেই তোর সব বিপদ নিমিষে উড়ি যাবে শিমূল তুলার মতোন। ঝাড়েশ্বর যায়নি। কারণ, সে জানে, তার এই দুর্গতির মূলে ঐ রতিন্ সাউ। সেদিন যখন খাঁকিতে ভরে গিয়েছিল নৈতনপুকুরের পাড়, লোকজন জমেছিল বিস্তর, ঝাড়েশ্বরের বিস্মিত দুটি চোখের সুমুখে একে একে জল থেকে উঠল পিতলের হাঁড়ি, দু'তিনটে থালা, বালতি, গাগ্‌রা, গামলা, আরো অনেক কিছু। খাঁকির দল জাল ফেলে ফেলে তুলল সব। দেখতে দেখতে চোখের পাতা পড়ছিল না ঝাড়েশ্বরের। নৈতনপুকুরের যে ঘাটটা ওরা ব্যাভার করে, তার পাশাপাশি উঠল জিনিসগুলো। কাজেই মালগুলোর সঙ্গে ঝাড়েশ্বরকেও যেতে হল থানায়। ঐ সময় জমায়েতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল রতিন্ সাউ, হেসে কুটিকুটি হচ্ছিল। কেউ দেখেনি। কেবল ঝাড়েশ্বরই দেখেছিল, দু'চোখ ভরে সেই উছলে পড়া হাসি। তখন মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, এ ক'মাস থানার বারান্দায় দু'চোখ খুলে বসে থাকবার সুবাদে তা ঘুচে গেছে। কে মালগুলো ফেলেছিল ঝাড়েশ্বরদের ঘাটে, কে-ই বা অত জলদি খবর দিয়েছিল থানায়, সবই আজ তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

তবু তেনাদের বিচার আছে বলতে হবে। সাক্ষীসাবুদ না নিয়েই এক্কেবারে জেলে তো ভরে দেয়নি। মাত্তর দুটো দিন থানা-হাজতে থাকবার পর ঘন্টাখানেক মেদুনপুর কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। ব্যস্, জামিনে খালাস করে নিল শংকর। তবে বড়সড ডাকাতির কেস তো। ডাকাতির সঙ্গে একজন নাকি মারাও গেছে গেরস্থের ঘরের। তাই থানা-হাজিরা। হপ্তায় তিনদিন। পরের তারিখ তিরিশে শ্রাবণ।

সদর থেকে ফিরবার পথে শংকর বলল, 'পার্টি বোধ লেয় আমাকে তাড়াবে।'

'তুমাকে?' ঝাড়েশ্বর আকাশ থেকে গড়ে, 'তুমি তো এ তল্লাটে পার্টির আদি হে! তুমাকে খেদালে রাখবে কাকে?'

'কেন, রতিন্ সাউ। এখন সে-ই সদরের আস্থভাজন লোক।' একটু থেমে শংকর বলেছিল, 'তুমার জামিনের তরে যেন কেউ না আসে, এটাই ছিল রতিন্ সাউয়ের নির্দেশ। তোমাকে জামিনে ছাড়ালাম, এর ফল বিপরীত হবে।'

শংকরের কথাই সত্যি হয়েছে। রতিন্ সাউ থানা-কমিটিকে এবং জেলা-কমিটিকে

সাতকাহন করে লাগিয়েছে শংকরের নামে। শংকর যা কল্ল, এরপর এ পার্টিকে 'চোরের পার্টি' বলবে সব্বাই। দিন-দুফোরে শতচক্ষুর সুমুখে মাল পাওয়া গেল যার পুকোরঘাটে, তার জামিনের তরে যদি পার্টি-কর্মী লম্ফঝম্ফ জুড়ি দেয়, তেবে সাধারণ মানুষ ভাববে কী? শংকর যত বড় নেতাই হোক, পার্টির ক্ষতি করবার অধিকার কি তার আছে? এ পার্টিতে নেতা বড় লয়, নীতিই বড়। এটাই বুঝেছি সার কথা।

থানা-কমিটির ভূপালদা কিংবা জেলা-কমিটির অনিমেষদা শংকরকে বহুদিন ধরে চেনেন। ভালোও বাসেন। কিন্তু রতিন্ সাউয়ের একটা বিপজ্জনক গুণ আছে। সে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে একটা ঘটনাকে পরিবেশন করতে পারে যে, চরম অবিশ্বাসীও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় ওর কথা।

গ্রামে ঢুকতে গিয়ে মাটি থেকে মাথা তুলতে পারে না ঝাড়েশ্বর। বাচ্চা থেকে বুড়ো অবধি অপরিসীম বিস্ময়ে তাকায়। সৎ, সরল আর স্পষ্টবাদী বলে ভারি সুনাম ছিল ঝাড়েশ্বরের। এক রাতের খেলায় হায়, হায়, একেবারে চোরটি সেজে গাঁয়ে ঢুকতে হল তাকে। সে নাকি ডাকাতি করে মাল লুকিয়ে রেখেছিল। এর চেয়ে যে মৃত্যুও ভালো ছিল হে! বউ-ছেলার সামনে এ মুখ কী করে দেখাই, হায় ভগবান!

ইতিমধ্যে গাঁয়ে ঝাড়েশ্বরকে নিয়ে কতকিছুই রটনা। সে-ই নাকি স্বহস্তে কেটেছে গিরস্থের মাথা। লৈতনপুকুরেই নাকি পোঁতা আছে সে মুণ্ডু। সিনান করতে গিয়ে কার নাকি পায়ে ঠেকেছে কাল। কেউ বলে, গান গেয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াত ঝাড়েশ্বর, সেটা নেহাতই বাহানা। গান শোনানোর ছলে গেরস্থের সুড়ুকসন্ধান নিত সে। আসলে, সে ছিল ডাকাত দলের একের লম্বরের গুড়িয়াল। বউটা যতই শোনে, ততই কাঁদে। বাচ্চাগুলো পাতলা সন্দেহে দু'চোখ ভরে নিয়ে তাকায় বাপের দিকে। ঝাড়েশ্বরের দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে। হায় ভগবান!

২.

থানায় ঢুকতে গিয়ে একটুখানি থমকে দাঁড়াল ঝাড়েশ্বর। হাতে তার সাধের একতারাটি। সিপাইগুলো প্রথম দিন খিঁচিয়ে উঠেছিল। এখন কিছু বলে না। অবসর সময়ে বাবুদের গান শোনায় ঝাড়েশ্বর।

ডালেপালায় রোদ্দুর ছড়িয়েছে। বড়বাবুর কোয়ার্টারের সামনে বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছে দোল্‌না বাঁধা। হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। থানার সুমুখে ঝুরি নামা বিশাল বট। তার ডালপালা টপকে থানার টিনের চালের দিকে রোদ্দুর এগোচ্ছে গুটিগুটি। আর তো দেরি করা চলে না। ঝাড়েশ্বর পায়ে পায়ে চলল কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দুধারে গোটাকয় আকাশমণি গাছ। সারবন্দী গাছগুলো সরু হয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে। ঝাড়েশ্বর রোজ থানায় ঢুকবার সময় একটিবার মাথা তুলে গাছগুলোর চূড়ো দেখে। রাস্তাটা শেষ হলেই বারান্দা। ঘন্টা ঝুলছে। উঠবার মুখেই বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেপাই। নিজের কোমরে বন্দুকের ঠেক্‌না লাগিয়ে মৌজ করে খইনি ডলছে সে। গুটিসুটি মেরে ঝাড়েশ্বর উঠল বারান্দায়। পাহারাদার সিপাইকে দু'হাত জড়ো করে বন্দনা করল প্রথমে। তারপর এগিয়ে গেল মাঝের হলঘরখানার দিকে। একেবারে

কোণের চেয়ারটিতে বসেছিলেন জমাদারবাবু। বয়েস পঞ্চাশের ওপর। হাড্ডিসার চেহারা। কোটরসার চোখ। হাড়গিলা পাখির মতো গলা। কানের ডগায় লম্বা লম্বা চুল। চোখের শিরায় শিরায় জমাট রক্ত। সর্বদা বড় খ্যাঁকায় লোকটা। অকারণে প্রথমদিন 'পন্নাম জমাদারবাবু।' বলতেই খেঁকিয়ে উঠেছিল। 'জমাদার কি রে? আমি কি পায়খানা সাফ করি?' কুতকুতে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধমকে বলেছিলেন জমাদারবাবু, 'আমি হেড-কনিষ্টবল। আমাকে হাবিলদারসাহেব বলে ডাকবি।'

একতারাটিকে থানার চালের রোলায় গুঁজে দিল ঝাড়েশ্বর। উঁকি মারল ভেতরে। এত সকালে হলঘরের মধ্যে কেউ নেই। কেবল কোণে বসে হাবিলদার সাহেব রুলকাঠিখানা অকারণে আছড়াচ্ছেন টেবিলের ওপর। ঝাড়েশ্বর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল হাবিলদারসাহেবকে। তারপর বেরিয়ে এসে বসল বারান্দায়।

বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে ঝাড়েশ্বর। এরা যে কখন ছাড়বে তার ঠিক নেই। দুপুরের আগে ছাড়লে, ঘরে ফিরে অন্তত গা'টা ধুতে পারবে ঝাড়েশ্বর। তারপর ছাড়লে সেটাও হবে না। আজ আবার ছাড়া পেলেই ঘরে ফিরতে পারবে না। একটা পুরোনো ঘটি এনেছে সঙ্গে, রেখে এসেছে বাসস্ট্যাণ্ডে কেশব দাসের কাছে। ওটা বিশ্বনাথের কাঁসার দোকানে বিকোতে হবে। ঐ পয়সায় কিছু চাল-ডাল কিনে তবে ঘরে ফেরা। একটু তাড়াতাড়ি ছাড়া পেলে ভাল হত আজ। কেবল হাজিরাটুকু নিতে অত সময় কেন লাগে সেটা প্রথম প্রথম বোধগম্য হত না ঝাড়েশ্বরের। এখন বোঝে। হাজিরাটা কিচ্ছু নয়। আসলে, দুপুরতক্কো ওকে বেগার খাটতে হবে এখানে। থানা ঝাঁটপাট দেওয়া, বাগান সাফ করা, বড়বাবুর কোয়ার্টারের গাছে জল দেওয়া, কাপড়চোপড় কাচা, তার সঙ্গে থানার যাবতীয় ফাইফরমাস। খালি পেটে অত কাজ একসঙ্গে পারে না ঝাড়েশ্বর। হাঁপিয়ে পড়ে, চোখে অন্ধকার দেখে। কিছুদিন অবধি কুঁকুড়াখুপীর ধনু মাঝিও কাজ করত ওর সঙ্গে। দিন পনেরো হল কাজে ছুটি হয়েছে তার। এখন দুজনের কাজ একা ঝাড়েশ্বরের ঘাড়ে বর্তেছে। ধনু মাঝির কেসটা বড় মজার। প্রায় পাঁচ-ছ বছর সে থানা-হাজিরা দিয়ে আসছিল। বছরে বার-দুয়েক থানার বাবুরা ওকে জিপে তুলে মেদুনপুর নিয়ে যেত। সেখানে সরকারী উকিলের ঘরের বারান্দায় বসিয়ে রাখত ঘন্টা দুয়েক। তারপর ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দিত কেশিয়াড়ী বাজারে। সাধারণত থানার পুজো-আচ্চা-উৎসবের আগে তেমন দিনগুলো পড়ত। ফেরার পথে মেদুনপুর বাজার থেকে বস্তা বস্তা আলু, পিয়াঁজ, পটল ও অন্য সবজি কিনে আনত জিপে চড়িয়ে। ধনু মাঝিকেই বওয়া-বওয়ি, তোলা-নামানো করতে হত সেসব মাল। লোকটার ঘরসংসার পুরোপুরি তলিয়ে যাবার উপক্রম। মাথায়ও কেমন ছিট ছিট ভাব। দেখতে দেখতে শিউরে উঠত ঝাড়েশ্বর। পাঁচ-ছ' বছর ধরে থানা হাজিরা দিতে হয়? হায় বাপ! ঝাড়েশ্বরের তো ধারণা ছিল, দু'দশ মাসেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। মনে মনে প্রমাদ গোনে ঝাড়েশ্বর। এই দু'তিন মাসেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। হপ্তায় তিন দিন থানায় আটকে থাকতে থাকতে হয়। খাটা-খাটনি বন্ধ। ইতিমধ্যে ভিটেটা বন্ধক দিয়ে শ'দড়েক টাকা নিতে হয়েছে নিধু ভট্টর কাছ থেকে। ঘটি-বাটিতেও হাত পড়ে গেছে। দু'তিন মাসেই এই অবস্থা। এরপর আছে মাসে-দু'মাসে মেদুনপুর যাবার খরচ। উকিল-মোক্তারদের খাঁই। কোত্থেকে যে জুটোবে, এখনই ভেবে ভেবে কূল পায়

না ঝাড়েশ্বর। এইভাবে পাঁচ-ছ' বছর! ঝাড়েশ্বরের বংশটাই লোপ পেয়ে যাবে তদ্দিনে।

ধনু মাঝিকে দেখতে দেখতে শিউরে ওঠে ঝাড়েশ্বর। যেন নিজের অনাগত ভবিষ্যতটিকে চোখের সুমুখে দেখতে পায় সে। শংকরকে বলতেই সে ভুরু কুঁচকে শুনেছিল পুরো ব্যাপারটা। একদিন সোজা গিয়ে হাজির মেদুনপুর কোর্টে। খোঁজখবর নিয়ে সোজা কেশিয়াড়ী থানায়। হায় হরি! ধনু মাঝির কেস-এর কথাটা তুলতেই বাবুরা নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি করেন। ধনু মাঝির কেস নাকি প্রমাণাভাবে ডিসমিস হয়ে গেছে আজ চার বচ্ছর! বেচারাকে সেকথা ঘুণাক্ষরে ও জানায়নি থানার বাবুরা। ভাগ্যে শংকর নাড়াচাড়া করল। নইলে হয়ত সারা জীবনভর এমনিতরো হাজিরা দিয়ে যেতে হোত ধনু মাঝিকে।

থানার বাবুরা বলল, 'যাহ্, শালা। কাল থেকে আর আসবি নে থানায়। তুই খালাস হয়ে গেলি।'

ধনু মাঝির চোখেমুখে কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই। পুতুলের মতো হাত তুলে তুলে থানার সবাইকে পৃথক পৃথক পন্নাম জানিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে গেল থানা থেকে।

দেখেশুনে চোখের পাতা পড়ে না ঝাড়েশ্বরের। কী আজব থান্ রে বাপ্!

একেবারে কোণের ঘরটা বড়বাবুর ঘর। রঙ-চটা পর্দা ঝুলছে দরজায়। তারপরে বড়সড় হলঘর। অনেক চেয়ার-টেবিল পাতা। মেজোবাবু ছোটবাবুরা বসেন। হলঘরের মধ্যেই একদিকে মালখানা। অন্যদিকে লোহার রেলিং-এর দরজা দেওয়া হাজত। হলঘরের পরের ঘরটা 'রেডিও-ঘর'। সব সময় একটা যন্ত্রের সামনে চেঁচিয়ে চলে এক ছোকরা। কিংবা লিখতে থাকে তড়িঘড়ি। চা ঠান্ডা মেরে যায়। খাওয়ার সময় পায় না।

বেলা বাড়তেই লোকজনের আনাগোনা শুরু হল। হাঁক-ডাক। ধমক-ধামক। চুরির কেস নিয়ে এসেছে গগ্নেশ্বরের জনাকয়েক। ভয়ে ভয়ে বসে রয়েছে বারান্দার বেঞ্চিতে। একটু বাদেই ওদের ডাক পড়ল মাঝের ঘরে। আসামীর মতো মুখ করে ঢুকল ওরা।

মেজোবাবু পয়লা চটকায় দিল দাবড়ানি, 'কী করে চুরি হল? মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিলি রাতে? বেশ হয়েছে।'

চুরি যাওয়া মালপত্রের লিস্টি হল।

'কী বললি? সাইকেলও চুরি গেছে একটা? কোথায় পেলি সাইকেল? চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকেন মেজবাবু, 'তোদের নামেই তো একটা চুরির কেস দিতে হবে রে।'

ডাইরী লিখেটিকে মেজোবাবুর পরের প্রশ্ন, 'চিনেছিস কাউকে? চিনিস নি? তাহলেই চিত্তির। কাউকে সন্দেহ হয়? তাও হয় না?' খিঁচিয়ে ওঠেন মেজোবাবু, 'তাহলে কি খড়ি পেতে চোর ধরব আমরা? যত সব উটকো ঝামেলা! যা, ভাগ্। কেস লিখে নিলাম। চোর ধরা পড়লে খবর পাবি। হ্যাঁ, শোন্। তোদের গাঁয়ের বিজয় প্রধানকে একবার আসতে বলিস তো থানায়। বলিস, ও আসছে না বলে ওর বন্দুকের লাইসেন্সের কেসটা পাঠাতে পারছি নে সদরে।'

লোকগুলো পালিয়ে বাঁচে।

কুশগেড়িয়ার এক বিধবা বুড়ি বসে ছিল সেই সকাল থেকে। তার মেয়েকে পাওয়া

যাচ্ছে না কাল সন্ধে থেকে। শুনে মেজোবাবু রসিকের মতো হাসেন, 'চিন্তা কোরো না বুড়ি। ঘরে ফিরে যাও। বিয়ে দিতে তো পারবে না। তোমার এলেম বুঝে, মেয়ে তার পথ দেখে নিয়েছে। অষ্টমঙ্গলার দিন মিষ্টি-মাছের আয়োজন রেখ বরং। হঠাৎ হাজির হলে অপ্রস্তুতে পড়বে।

গরীব-গুরবোদের সঙ্গে এমন ব্যাভারটা করলেও ভদ্দরজনদের জন্য অন্য বেবস্থা। কুশগেড়িয়ার মধু সামন্ত মাঝেমাঝেই আসে থানায়। সোজা ঢুকে যায় বড়বাবুর ঘরে। হম্বিতম্বি করে। মন্ত্রীকে ফোন করার ভয় দেখায়। বড়বাবু হেন মনিষ্যিও কেমন বরষার খইয়ের মতোন মিইয়ে যান। মিনমিন করে বলেন, 'চেষ্টা তো করছি। কিন্তু ধরি কেমন করে বলুন তো? কোনো প্রমাণই যে পাচ্ছি না।'

'চেষ্টা করুন। প্রমাণ ঠিকই পাবেন। আপনারা ইচ্ছে করলে সবই পারেন।' যাবার সময় মধু সামন্ত আর একদফা শাসিয়ে যায়, 'মোট কথা এলাকার মানুষ চায়, এমন ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট যেন বাইরে না থাকে।'

আপন মনে গজগজ করতে থাকে বড়বাবু। 'জুলুমটা দ্যাখো দিকি। তোর সঙ্গে মতে মিলছে না বলে, ওদের ধরে ধরে হাজতে ভরতে হবে? এদিকে হাতিগেড়িয়ার বুধু দত্তকে হাতে নাতে ধরলাম বামালসমেত। তার বেলায় দলবল এনে হজ্জুতি করলি।'

'শালা ব্রিটিশ গবমেন্ট ভালো ছিল।' মেজবাবু মুখ তেতো করে বলেন।

'নাহ্। সত্যি, এ আর পারা যায় না!'

পাশে বসেছিল ছোটবাবু। বয়েস কম। সর্বদা হুল্লোড় করে বেড়ায় থানাময়। নিস্পৃহ গলায় বলল, 'বলছে যখন ঢুকিয়ে দিন না। আপনার কী?'

'আমার কি?' বড়বাবু ইষৎ বিরক্ত, 'দুদিন বাদে যখন পাশার দানটি উল্টোবে, হ্যাপা সামলাবে কে?'

'তখন আবার মধু সামন্তকে ধরে ঢুকিয়ে দেবেন। আপনি-আমি তো হুকুমের চাকর।'

'নাহ্। এই সাপের মুখে আর ব্যাঙের মুখে চুমু খেয়ে আর পারা যায় না!'

রেড়িও-ঘর থেকে একতাড়া কাগজ এল মেজোবাবুর টেবিলে। একরাশ বিরক্তি ফুটে উঠল মেজোবাবুর মুখে। চিঠিগুলোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে সারমর্মগুলো বলতে লাগলেন মুখে মুখে।

'বড়কর্তার চিঠি। চুরি-ডাকাতি কেন বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন? পুলিশ কোনো কিনারা করতে পারছে না কেন?'

ছোটবাবু পাশের চেয়ারে বসে সমানে টিপ্পনি কাটতে থাকে, 'লিখে দিন, কোনো দলেই নেই, এমন চোর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এস-ডি-ও লিখেছে, এ বছর ধান বোয়ার সময় যাতে কোনো গোলমাল না হয়, সেদিকে নজর রাখুন।'

'অর্থাৎ রুলিং পার্টি যাতে জমির দখলে গিয়ে বাধা না পায়, সেটা দেখুন।'

'একমুঠো ধান যাতে বিহারে না যায়, লক্ষ রাখুন।'

'মানে, নুটু সরকারের ট্রাকটি যেতে দেখলে, চোখ মুদুন।'

'আপনি তো বড় রসিক লোক মশাই।'

ছোটবাবু ভারি অদ্ভুত হাসি হাসলেন। তারপর লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'রসিক আমি নয় মশাই। রসিক ওঁরাই, যাঁরা জেনেশুনে এগুলো পাঠাচ্ছেন। আমি কেবল পাদপূরণ করছি।'

ঝাড়েশ্বর বসে বসে ওদের চাপানউতোর শুনতে থাকে। সবটুকুই যে বুঝতে পারে, তা নয়। তবে এটুকু এ্যাদ্দিনে সে বুঝেছে যে, এই দুনিয়ায় এদের চোখে ঠিক চোর বলে কেউ নেই। ঠিক সাধু বলেও কেউ নেই। এদের কাছে চোরধরা কিংবা ছাড়াটা ঠিক দোষের ওপর নির্ভর করে না। আড়াল থেকে অন্য কেউ বা অন্য কিছু সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যাপারটা। বাবু-ভায়ারা হরদম আসছে, যাচ্ছে। কেউ নরম, কেউ গরম। নানান জাতের তদ্‌বির-তদারকি। গুহ্যভাষায় কথা লেনদেন। আরো একটা ব্যাপার জেনেছে ঝাড়েশ্বর। এখানে থানার ব্যাপারে একটা 'কুমেটি' আছে। সেই 'কুমেটি'র মেম্বারেরা সারাদিন থানায় ঘুরে ঘুরে নানান্ কেসের তদ্‌বির করে। ঝাড়েশ্বর মাঝে মাঝেই ভাবে ঐ 'কুমেটি'র কাছে একদিন বলবে নাকি তার লতি-লাঞ্ছনার কথাটা? চা—ওয়ালা ধনঞ্জয়কে বলায় সে তো হেসেই খুন। কে বলল, এখানে কেস তদ্‌বির করার 'কুমেটি' আছে? এ হল থানা-কমিটি। থানার কাজকর্মে যাতে দুর্নীতি না হয়, সেটা দেখাই এদের কাজ। তাহলে তো ভালোই হল। ঝাড়েশ্বর যেন সুমুখে আলো দেখে।

ধনঞ্জয় বলে, 'উই মধু সামন্তই তো একজন ডাঁটো মেম্বার।'

তাহলে তো আরো ভালো হল। বড়বাবুর ঘরে মধু সামন্তকে [illegible] চা [illegible] খাইয়েছে সে। একদিন ধরবে মধু সামন্তকে। ওর ওপর শুধুমুদু যে জুলুমটা চলছে আজ ক'মাস, সেটা বিতাং করে বলবে ওঁকে। বলবেই।

৩.

রতিন্ সাউয়ের সঙ্গে শংকরের মতপার্থক্যটা দিন দিন বাড়ছিল। কয়েকদিন আগে জেলা থেকে অনিমেষদা এলেন। মৃদু ভর্ৎসনা করলেন শংকরকে। কেতাবী রাজনীতিটা বড্ড সহজে শিখে ফেলেছ তুমি। মনে রেখ, রাজনীতির তত্ত্বটা শিখতে হয় কেতাবে। রাজনীতি করতে হয় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

শংকর পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল অনিমেষদার দিকে। গোলমাল বেধেছিল বেনামী জমির ধান কাটা নিয়ে। পার্টির গোপন বৈঠকে একটা লিস্ট বানানো হয়েছিল। জমিচোরদের লিস্ট। অবাক হয়ে শংকর দেখল, ঐ লিস্টে সুনীল চাকীর নাম নেই। শংকর শুধোল, 'চাকীর জমি ধরা হবে নি?'

আচমকা এমন প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল রতিন্ সাউ। সামলে নিয়ে বলল, 'সব ধীরে ধীরে হবে। একে একে। এক সঙ্গে কি সবার গায়ে হাত দিতে আছে?'

রতিন্ সাউর পক্ষের লোকগুলো সায় দেয় সঙ্গে সঙ্গে। সব যুদ্ধের একটা কৌশল আছে। যাকে বলে রণনীতি।

শংকর জানে, রণনীতি-টিতি বাজে কথা। সুনীল চাকী হল মধু সামন্তের ভায়রা।

বাদ দেবার কারণটা ওখানেই। বলল, 'বেশ আগে সুনীল চাকীকেই ধরা হোক। অন্যেরা বাদ থাক এখন।'

রতিন্ সাউ বারুদ হচ্ছিল মনে মনে। তাও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'শংকর, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ। যাকে পাল্টে যাকেই রাখি, সবাই আমাদের সমান শত্রু।'

তেতো হাসি হেসে শংকর বলল, 'সে আমার বুঝতে বাকি নেই! কিন্তু জেলার নেতারা এসব জানেন তো? আমার বিশ্বাস তাঁরা এগুলো জানেন না। আমি সব খুলে বলল ওঁদের।'

অনিমেষদাকে হাতের কাছে পেয়ে সব খুলে বলল শংকর। বলল্ 'অন্য দলের লোক, এই অপরাধে গরীব ক্ষেতমজুরদের মাটি কাটার কাজ দিচ্ছে না রতিন্ সাউ। বলুন তো অনিমেষদা, তারা যে অন্যদলে আছে সেটা কি ওদের দোষ? আমরাই তো তাদের বোঝাতে পারিনি। এ-তো আমাদেরই অক্ষমতা'।

অনিমেষদা খুব চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বসে রইলেন। যাবার বেলায় বললেন, 'আমি এগুলো দেখছি। তুমি ভেঙে পড়ো না।'

অনিমেষদা যাই বলে যান, শংকর জানে, কিছুই হবে না। হয়ত বা অনিমেষদারও কিছুই করার নেই।

শংকর স্পষ্টতই টের পায়, কিছু লোভী মানুষ সর্বদাই তৎপর। তারা সবার অলক্ষ্যে ঘুণপোকার মতো অবিরাম কুরে চলেছে। নিঃশব্দে। বাইরে থেকে তাদের সর্বদা চেনার উপায় নেই। শংকর মাঝে মাঝে বসে থাকে একা একা। আকাশপাতাল ভাবে। ওর বাবা ছিল এক সরকারী অফিসের কেরানী। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোতো না। কতদিন শংকর শুকনো মুড়ি চিবিযে ইস্কুলে গিয়েছে। রাস্তায় যেতে যেতে দেখেছে, ফণী শা'র আড়তে হলুদ রঙের চাল ডাঁই করে রাখা। পাহাড় প্রমাণ। চালগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে হাতে ঘষে ঘষে পরীক্ষা করছে ব্যাপারীরা। ঐ বয়সে শংকর বুঝেছিল, ঐ চাল খানিকবাদেই ট্রাকে বোঝাই হয়ে উড়ে যাবে। এত এত চাল কোথায় চলে যায়, শংকরকে কেন শুকনো মুড়ি চিবিয়ে ইস্কুলে যেতে হয়, সেটা বুঝতে পেরেছে বয়েস বাড়ার সঙ্গো সঙ্গো। কিছু লোভী মানুষ সর্বক্ষণ ক্রিয়াশীল। সমাজের সব স্তরে। তারাই ইধার-কা-মাল উধার করে মানুষকে ভাসাচ্ছে ডোবাচ্ছে। লাখ লাখ টন চাল পাচার করে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ-মন্দির গড়ছে বুলাকিলাল। বেশি আয়ের জন্য নিজের বাড়ির বারান্দা ভরিয়ে ফেলেছেন শ্যামসুন্দরস্যার। তিন সিফ্‌ট বাড়িয়ে চার সিফ্‌টে ছেলে পড়াচ্ছেন এখন। ইদানীং নিজের ঘরেই বানিয়ে নিয়েছেন সায়েন্স স্টুডেন্টদের ল্যাবরেটরি। তার জন্য আলাদা চার্জ। কিষ্টো সিং যা ব্যাঙ ধরে, অর্ধেক বেচে কলেজে। অর্ধেক শ্যামসুন্দরস্যারকে।

ওপরতলার লোভ চুইয়ে চুইয়ে ক্রমশ নীচের তলায় নামছে। বিপিন রিক্সাওয়ালা উৎসব পার্বণের দিনে বিনা দ্বিধায় দ্বিগুণ ভাড়া চেয়ে বসে। বাজারে মাছের আমদানী কম দেখলে বাজারের তরলা মাছওয়ালীও তার পুঁটি মাছের দাম দ্বিগুণ হাঁকে।

শংকরের বাবা লড়াকু মানুষ। সারাজীবন কর্মচারী-সংগঠন করে মাঝবয়েসে টিবিতে ভুগে মরেছেন তিনি। বাবার কাছে মাঝে মাঝেই শুনত ভারি আজব আজব কথা। তাদের এই সীমাহীন দুর্দশার কারণ ভারি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করতেন বাবা।

এক বিশাল মহীরুহ। আমাদের মাথার ওপর তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখার বিস্তার। আর, তার লাখো লাখো দৃশ্য-অদৃশ্য শেকড় ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সর্বাঙ্গে, শেকলের মতো। অবিরাম আমাদের গা থেকে শুষে নিচ্ছে নির্যাস। শুনতে শুনতে, সারা শরীরময় জড়িয়ে থাকা শেকড়ের অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করত শংকর, রক্তে জ্বালা ধরে যেত। দুনিয়া থেকে এই লোভী মানুষগুলোকে নিকেশ করবার এক তীব্র বাসনা জোঁকের মতো চেপে বসত মগজে। এখন শংকর বোঝে। বাবার মধ্যেও কোথায় যেন ফাঁকি ছিল। তিনিও যেন পুরোপুরি লোভের উর্ধ্বে ছিলেন না। অন্যদের কঠোর পরিশ্রমের উপদেশ দিলেও বাবা কিন্তু নিজের অফিসে থাকতেন অল্পক্ষণ। তাঁকে কেউ কিছু বলতেই সাহস পেত না। সেবারে তপশীলী অফিসের টাইপিস্ট-এর চাকরিটা ফণি শা'র ছেলে পেয়েছিল, শংকর নিশ্চিত ছিল, তাতে বাবা কিঞ্চিত কৃপা বর্ষণ করেছিলেন। অথচ মদন দাস এসে পা পর্যন্ত ধরেছিল বাবার। এবং বাবা জানতেন, মদনের মা ঘুঁটে বেচে সংসার চালায়। এমন কি, শেষের দিকে শংকরকেও খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবার তাল করেছিলেন তিনি। শংকর নিজেই ভন্ডুল করে দেয় তা।

বাবা আজ বেঁচে নেই। তাঁকে অনেক কিছু শুধোবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কিন্তু অনিমেষদা তো আছেন। বাবার পরই শংকরের দ্বিতীয় গুরু। তাঁর কাছ থেকে কত প্রশ্নেরই না তাৎক্ষণিক জবাব পেয়েছে শংকর। কত জটিল প্রশ্নের কত সরল উত্তর। এখন অনিমেষদা সহসা কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। গুম মেরে বসে থাকেন। থেমে থেমে জবাব দেন। ভেবে ভেবে। এমনি অনেক সরল প্রশ্নের জবাবকে তিনি 'স্ট্র্যাটেজি' 'বাস্তব পরিস্থিতি' ইত্যাদিসহ পরিবেশন করতে করতে অকারণে জটিল এবং ধোঁয়া ধোঁয়া করে তোলেন।

এই যেমন সেদিন। যুব সংগঠনের একটা গোপন সভায় ভাষণ দিচ্ছিল শংকর। উপস্থিত ছিলেন অনিমেষদা এবং মধু সামন্ত। কথায় কথায় শংকর বলল, 'আমরা বেকার সমস্যাকে সম্পূর্ণভাব নির্মূল করে ফেলেছি। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।'

মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিয়ে অনিমেষদা বললেন, 'অতটা বোল না। একেবারে হটিয়ে দিয়েছি, এটা আত্মসন্তুষ্টিই শুধু নয়, নিতান্তই বাজে কথা।'

'আপনি বলছেন বাজে কথা? আমি কিন্তু বলছি এ অতি সত্য কথা। বিশ্বেস না হয় এই মধুদার ফ্যামিলিটার দিকে তাকান্ একটিবার। স্ত্রী, তিন ছেলে, একটি মেয়ে, বোন এবং এক অপগণ্ড ভাগ্‌না—সব্বাই এই ক'বছরে চাকরি পেয়ে গেছে।'

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সারা ঘর। মধু সামন্তের কপালের শিরা ফুলে উঠল। অনিমেষদার চোখেমুখে ফুটে উঠল চাপা যন্ত্রণা। সেদিন মিটিং-টা আর জমল না।

একা পেতেই শংকরকে মৃদু ধমক দিলেন অনিমেষদা।

কেঁদে ফেলল শংকর। 'তসরের সুতো বুনতে বুনতে যৌবন প্রায় চলে যায়, অনিমেষদা। লালা ঝরিয়ে ঝরিয়ে বুনেছি এক নিটোল গুটি। সেই গুটির মধ্যে নিজেই গুটিপোকা হয়ে গিয়েছি।'

সহসা কোনো জবাব দিয়ে উঠতে পারেন না অনিমেষদা। মৃদু গলায় বললেন, 'আমরা নজর রাখছি পুরো পরিস্থিতির ওপর। অত ভাবিস নে। সমুদ্র মন্থনের সময় কিছু গরলও ওঠে। শুধু মনে রাখিস, নিজেদের মধ্যে অত ঝগড়া করলে শত্রুর সুবিধে হয়ে যাবে।'

সে কথায় হাসে শংকর। বলে, 'সে ভয় নেই আপনার। শত্রু প্রায় নেই বললেই হয়। 'সোনালী' বাসের মালিক দেবেন কুণ্ডু, ধানের পাইকার গিরীশ মহাপাত্র, চালের আড়তদার ফনী শা, কনট্রাক্টর দেবু পাইন, জমিচোর মধু সামন্ত, রতিন্ সাউ/সবাই এসে গেছে দলে। বাইরে আর কেউ পড়ে নেই প্রায়। দু'একটি লোলচর্ম ব্যাঘ্র, নখদন্তহীন—!'

'বাজে বকিস নে।' ধমকে উঠলেন অনিমেষদা, 'সবাই চলে এসেছে তো গেল ভোটে অবনী ভট্টরা এ থানায় চল্লিশ ভাগ ভো'ট পেল কী করে?'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষদার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে প্রবল আবেগে ঝাঁকাতে লাগল শংকর, 'আমি তো সেটাই বলতে চাইছি, অনিমেষদা। তাহলেই বুঝুন, কত বর্ণচোরা ঢুকে পড়েছে আমাদের দলে।'

অনিমেষদা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। মৃদু গলায় বললেন, 'ওদের তাড়িয়ে দিলে ঘুরে দাঁড়াবে আমাদেরই দিকে। বরং এমনতরো মিত্র সেজে থাক্ না কিছুদিন। আরো বড় শত্রুর সঙ্গে লড়াইটা জেতো আগে।'

'কিন্তু এরা তো শুধু মিত্র সেজেই নেই অনিমেষদা। এরা অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে এগোচ্ছে নিঃশব্দে। অ্যাতো বিশাল জনসমুদ্রে কোন্ তিমি-হাঙরটি কোন্ পথে কতটা এগোলো তার হিসেব কি আছে আপনার কাছে?'

অনিমেষদা মিয়োনো হাসি হাসলেন। অত্যন্ত বিপন্ন লাগছিল ওঁকে। বললেন, 'হিসেব রাখবার চেষ্টা করছি ভাই।'

রতিন্ সাউ বলে, 'একটা সহজ কথা বোঝ না কেন শংকর? শত্রুকে কব্জা করবার উত্তম পদ্ধতি হল উকে লিজের গায়ের সঙ্গে লেপটে রাখা। যাতে আঘাত করবার জন্য দুজনের মধ্যে যে টুকচার জাগা দরকার, সিটা উ না পায়।'

শংকর কঠোর গলায় জবাব দেয়, 'এ তত্ত্ব আমার জানা ছিল নি। খুব সম্ভব ইটা মাক্সসাহেবও শুনেননি। এ তত্ত্ব রতিন্ সাউয়ের আবিষ্কার।'

৪.

হাজিরা দিয়ে বেরোবার পথে আচমকা মধু সামন্তকে পেয়ে গেল ঝাড়েশ্বর। একতারাটি বগলে চেপে দু'হাত জড়ো করল সে। মাথা নুইয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'বাবু মশায়—!'

ঘুরে তাকাল মধু সামন্ত। ভীষণ ব্যস্ত-সমস্ত মুখ। চোখজোড়া বনবন ঘুরছে চারপাশে। একতিল থামে না। ঝাড়েশ্বরকে দেখে হামলে পড়ল মধু সামন্ত, 'লছিপুর থেকে সতীশদা পাঠিয়েছে তোমায়, তাই না?'

'আইজ্ঞা না, বাবুমশায়। মুই পরশুরাম-গাঁয়ের ঝাড়েশ্বর দাস। একটা কথা লিবেদন করতে চাই আপনার ছি-চরণে।'

মধু সামন্তের চোখ ততক্ষণে ঘুরে গেছে অন্যদিকে। বিরক্তি মাখানো মুখে বিড়বিড়ানি, 'সতীশদা তো বলল দুপুরেই পাঠাবে। এ ভারি সমস্যা হল তো!'

'সে লোক হয়ত বা আসতিছে হজুর। পৌছে যাবে টুকচার বাদে—।' ঝাড়েশ্বর

ভক্তিভরে বলল, 'ততক্ষণ মোর কথাটা শুনুন বাবুমশায়। আকাট বিপদে পড়ি গেছি মুই।'

'আরে না, না। আরো আগে আসবার কথা ছিল ওর। বড়বাবু বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি।' চোখের মণি বন্‌বন্ ঘোরাতে ঘোরাতে মধু সামন্ত ফের হাঁটা দিল বড়বাবুর ঘরের দিকে।

দিন তিনেক বাদে আবার মধু সামন্তর দেখা পেল ঝাড়েশ্বর। এবারে সরাসরি পা'দুটো জড়িয়ে ধরল তার। 'মোকে বাঁচান হুজুর। মোর সংসারটা ভাসি যায়।'

ভাসাভাসা চোখে ঝাড়েশ্বরের বিপদের কথা শুনল মধু সামন্ত। বললো, 'এখন কিছু করা খুবই মুশকিল। চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেছে খুব। বদনাম হয়ে যাচ্ছে থানার।'

ঝাড়েশ্বর অবাক চোখে তাকিয়ে রইল মধু সামন্তর দিকে। 'চুরি-ডাকাতি বেড়ে গিয়ে থানার বদনাম হচ্ছে বলে নির্দোষ মানুষকে ধরে এনে হাজ্‌রা দেওয়ানো হবে?'

'তা, থানা কী করবে?' মধু সামন্ত রেগে ওঠে, 'হাকিমের হুকুমে ব্যবস্থা তোমার।'

তবু আশা ছাড়ে না ঝাড়েশ্বর। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

'এখন তো খুব কান্নাকাটি।' মধু সামন্তর গলায় তীক্ষ্ণ-বিদ্রূপ, 'যখন পার্টির নামে গান বেঁধে লোক জড়ো করে গাইছিলি?'

'পার্টির নামে গান?' ঝাড়েশ্বর আকাশ থেকে পড়ে, 'কী গান বাঁধলাম?'

'ঐ যে—কি সব বানের জল-টল বলে গান বেঁধেছিস। সব কিছুই কানে আসে রে!'

ঝাড়েশ্বরের বিস্ময়টা কিছুতেই কাটতে চায় না। বলে, 'এতো বাউল গান, হুজুর। কে কবে বেঁধেছে। উতে দলের বদনামটা কোথায়, হুজুর?'

'দলের বদনামটা কোথায়? ন্যাকা!' বলেই পাশ কাটাচ্ছিল মধু সামন্ত। ঝাড়েশ্বর ওর পা'দুটো ফের জড়িয়ে ধরল।

একটুক্ষণ কী যেন ভাবল মধু সামন্ত। তারপর বলল, 'রতিন্ সাউয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি আনতে পারিস? দেখা যেতে পারে তাহলে।' বলেই হনহনিয়ে চলে গেল সে।

ঝাড়েশ্বর রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে।

অনাগত দিনগুলোকে ভয়াল মনে হয় ঝাড়েশ্বরের। হপ্তায় তিনদিন হাজিরা মানে, মাসের প্রায় অর্ধেক দিন খাটা-খাটনি বন্ধ। এখনই উপোস শুরু হয়ে গেছে। ছোট মেয়েটার জ্বর আর ছাড়ছে না কিছুতেই। বউ এ্যাদ্দিন লতাপাতা বেটে খাওয়াচ্ছিল। কাল রাতে পাশে শুয়ে কেঁদে উঠল, মেয়াটা বাঁচবে নি। কাল টুকচার ওষোধ লিয়ে এস রামকিষ্টো সাউ'র দকান থিকে। শুনে পাঁজরের মধ্যে হৃদপিণ্ডখানা টুকরো টুকরো হতে থাকে ঝাড়েশ্বরের। কেজিটাক চাল আনবার কথা ভেবে রেখেছে কেশব দাসের কাছ থেকে। ধারেই আনবে। সেটা নিয়েই মন একবার সু গায় তো দু'বার কু গায়। একবার বলে, পাবিরে ঝাড়েশ্বর। কেশব দাসের দয়াধর্ম আছে। ফিরাবেনি শুধু হাতে। পর মুহূর্তে বলে, আরো তোকে দেয়? আগের তিন-তিনবার চাল এনেছু। তার টাকা দিয়েছু কেশবকে? সে কি কাশিয়াড়ী বাজারে দানছত্র খুলেছে নাকি? এর ওপর আবার

বউ ওষুধের কথা বলে! এ হল ঝাড়েশ্বরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে কাতুকুতু দেওয়া। আর কিছু নয়। এইভাবে কদ্দিন যে কাটবে! ভেবে কূল পায় না ঝাড়েশ্বর।

৫.

সকালবেলায় থানায় পা দিয়েই চমকে উঠল ঝাড়েশ্বর। থানার চেহারাটাই যেন পালটে গেছে বেমালুম। রোজ এমন সময় থানা শুনশান থাকে। বারান্দায় বন্দুকহাতে সেপাইটি মৌজ করে খইনি ডলে। আর, রেডিও-ঘরে ফর্সা ছোকরা চেঁচিয়ে চলে অনর্গল। আজ কিন্তু সারা থানা যেন জেগে উঠেছে এই সাতসকালে। সব্বাই পোশাক পরে দৌড়-ঝাঁপ জুড়েছে। মেজোবাবু, ছোটবাবু সবাইয়ের মধ্যে কেমন ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। এই মাত্তর দুজনেই হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে গেল বড়বাবুর ঘরে।

দেখেশুনে ভয় পেয়ে গেল ঝাড়েশ্বর। গেট খুলে ঢুকবে কি ঢুকবে না সেটাই বুঝতে পারছে না সে! না ঢুকে ফের কোন্ অপরাধ ঘটিয়ে বসে! সাত-পাঁচ ভেবে ঝাড়েশ্বর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। একতারাটিকে আর থানা অবধি নিয়ে যেতে সাহস হল না। কামিনী ঝোপের মধ্যে ওটা রেখে দিল।

বারান্দায় পা দিয়েই বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠল তার। চোখদুটো ঠিকরে আসার জোগাড়। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ। দেখতে দেখতে সারা গা ঘুলিয়ে উঠল ঝাড়েশ্বরের। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি। কোত্থেকে এরা মেরে আনল এতগুলান তাজা ছোকরাকে? ঝাড়েশ্বর দল্‌দল্ করে কাঁপতে লাগল ভয়ে।

লাশগুলো সারবন্দী শুয়ে ছিল বারান্দায়। আড়চোখে তাকাতে তাকাতে ঝাড়েশ্বর কোনরকমে পেরিয়ে গেল ওদের। রেডিও-ঘরের সামনে ধপ করে বসে পড়েই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ মুদল। গায়ের কাঁপুনিটা থামছে না কিছুতেই। ঝাড়েশ্বর পা-দুটোকে বুকের সামনে জড়ো করল। দু'হাত দিয়ে রশির মতো করে জড়িয়ে ধরল পা-দুটোকে বুকের সঙ্গে। চারপাশে একটা চাপা অস্থিরতা। মেজোবাবু আর ছোটবাবু খটাখট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এলেন বড়বাবুর ঘর থেকে। লাশগুলোকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে গেলেন অফিস ঘরের দিকে। একটুবাদে গুটিকয়েক খাতা-পত্তর নিয়ে ফের ঢুকলেন বড়বাবুর ঘরে। ঝাড়েশ্বর সব জুলজুল করে দেখছিল। পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান শরীর বারান্দায় গড়াচ্ছে চালকুমড়োর মতো। কোথাকার ছেলে, কী দোষ করেছিল, কে জানে?

খানিকবাদে বাবুদের হুকুমে চা আনতে চলে গেল ঝাড়েশ্বর। চা নিয়ে ফেরবার সময় দেখল, মধু সামন্ত ঢুকছে থানায়।

লাশগুলোর পাশ দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে গেল মধু সামন্ত। সোজা ঢুকে গেল বড়বাবুর ঘরে।

চা বিলোতে বিলোতে ওদের কথাবার্তা শুনে সারা গা হিম হয়ে এল ঝাড়েশ্বরের।

বড়বাবু বললেন, 'দেখবেন মশাই। শেষে কোনো ঝামেলায় না পড়ি। আমাদের তো সব দিকেই বিপদ।'

দু'হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মধু সামন্ত, 'কিচ্ছু ভয় নেই। কিন্তু শংকরটাকে তো আবার রেখে দিলেন আপনারা।'

'পেলাম না। সারারাত তক্কেতক্কে ছিলাম ওলদাচণ্ডীর জঙ্গলে। কিন্তু ও কাল মেদিনীপুর থেকে ফেরেই নি। ফিরলেও দুধেবুঁদেতে নামে নি।'

'ঠিক আছে। ফের পাত্তা লাগান।'

'আপনারা কি হরতাল ডাকবেন?'

'ডাকতেও পারি। সদরের সঙ্গে কথা বলি। তার আগে কেসটা বেশ শক্ত করে সাজান্। যেন কোনো ফাঁক-ফোকর না থাকে কোথাও।'

'সে আপনি ভাববেন না। রিপোর্ট প্রায় রেডি হয়ে এল।'

'কী দাঁড়াল ব্যাপারটা?'

'কেসটা খুবই সোজা। হাতিগেড়্যার রমনী ঘোষের মার্ডার কেস-এ এদের খোঁজা হচ্ছিল। হঠাৎ কাল খবর পেলাম, এরা লুকিয়ে রয়েছে ওলদাচণ্ডীর জঙ্গলে। শুধু তাই নয়, কালরাতে সাঁতরাপুরের পাঁচকড়ি দে-কে মার্ডার করবার প্ল্যানও ছকে ফেলেছে। শুনেই সন্ধের পর ছুটে গেলাম ওলদাচণ্ডীর জঙ্গলে। ওরা অ্যাটাক করল আমাদের। বাধ্য হয়ে গুলি চালালাম। পাঁচটা ছোকরা গুলি খেল। বাকিগুলো পালাল।'

মধু সামন্তর পাকামাথা। কেস সাজাতে ওস্তাদ। চোখ বুঁজে শুনছিল বড়বাবুর কথা। সহসা শুধোল, 'কে খবরটা দিল আপনাদের?'

কেমন যেন ধন্দে পড়ে গেলেন বড়বাবু। কে খবর দিল—? কে খবর দিল—? কে খবর—?

ঝাড়েশ্বর নীরবে চা বিলোচ্ছিল। অন্যমনস্ক চোখে তাকে দেখতে দেখতে বড়বাবু বলে উঠলেন, 'তুই খবরটা দিলি।'

'মুই—?' সারা শরীর কেঁপে উঠলো ঝাড়েশ্বরের। চায়ের গেলাসটা হাত থেকে খসে পড়ছিল বুঝি আর একটু হলে।

'হ্যাঁ। তুইই খবরটা দিলি।' বড়বাবু বিকারহীন গলায় বলে চলেন, 'আমরা তোকে বলে রেখেছিলাম, ঝাড়েশ্বর ভাই, তুমি তো প্রায়ই থানায় আনাগোনা করছ, বলতে গেলে থানারই একজন হয়ে গিয়েছ। কিন্তু ছোকরার উৎপাত বেড়েছে এ তল্লাটে। এলাকাটাকে জ্বালিয়ে দেবার ধান্দায় আছে ওরা। তেমন সন্ধান পেলে জানিও তো। সেই সুবাদে তুই কাল সন্ধেয় খবরটা দিলি।'

ঝাড়েশ্বর ততক্ষণে গলগলিয়ে ঘামতে লেগেছে। চোখদুটো তার উল্টে যায় বুঝি। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মুই তেনাদের খবর জানব কী করে, হজুর?'

'কেন?' যেন আকাশ থেকে পড়লেন বড়বাবু, 'তুই কাল থানা-হাজিরা দিয়ে ফিরছিলি বিকেলবেলায়। আচমকা ওলদাচণ্ডীর বটতলার আলোআঁধারিতে ওদের বসে থাকতে দেখলি। প্রত্যেকের হাতেই ছোরা এবং দেশী বন্দুক। পাঁচকড়ি দে-র নামটাও কানে এল তোর।'

'মোর ঘর তো পরশুরাম-এ, হজুর। মোর তো বেলমা'র ভিতর দিয়ে সোজা রাস্তা। মুই ক্যানে ওলদাচণ্ডী দিয়ে অতটা ঘুরতে যাব?'

'বাজে বকিস না।' ক্ষেপে উঠলেন বড়বাবু, 'বেলমা'য় তোর বড় মেয়েকে বিয়ে

দিয়েছিস না? চুরির আসামী হয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে ঢুকতে তোর লজ্জায় মাথা কাটা যায়। সেদিন তো ঘটা করে বলছিলি রে শালা!'

কথাটা মিছে নয়। বেলমায় ঢোকে না ঝাড়েশ্বর। লজ্জায়। যদি কুটুমদের কারো সঙ্গে অকস্মাৎ ভেট হয়ে যায় গাঁয়ের মধ্যে। অনেকটা পথ ঘুরে ওলদাচণ্ডীর জঙ্গল দিয়েই যাতায়াত করে ঝাড়েশ্বর।

বড়বাবু মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, 'কেস থেকে ছাড়া পাওয়ার একটা মওকা পেয়েছিস শালা। ভেবে দ্যাখ, ডুববি না ভাসবি।'

ঝাড়েশ্বরের মুখে কথা জোগায় না।

বড়বাবু বলেন, 'আজ কিংবা কাল কড়কর্তা আসতে পারেন সরেজমিনে। কড়া ধাতের মানুষ তিনি। তাঁর সামনে বেফাঁস কিছু বললেই গেছি আমি। আর, আমি গেলে, তুইও আর বাঁচবি নে।'

৬.

সারা সকাল ঝাড়েশ্বরের গায়ের কাঁপুনিটা থামল না কিছুতেই। ঘটি ঘটি করে খেয়েও তালু শুকিয়ে কাঠ। সারা সকাল প্রহরটা পাখি পড়ানোর মতো করে পড়িয়েছে বড়বাবু, ছোটবাবু, সবাই। কেসটা উতরে গেলে নাকি এলাকার ভারি উপকার হবে। মধু সামন্তও বারাবর বলেছে কথাটা। সরকার থেকে বকশিস্ও পেয়ে যেতে পারে ঝাড়েশ্বর। নিদেন, নিজের কেসটা থেকে নির্ঘাৎ রেহাই দেওয়া হবে তাকে। এসব ছুঁচোমারা কেস নাকি করতেও যতক্ষণ, ক্যাঁচাতেও ততক্ষণ। ঝাড়েশ্বর বুঝতে পারে না, অত সহজেই যদি রেহাই দেওয়া যায়, তবে কেন এরা আজ ক'মাস ধরে এমন লতি-লাঞ্ছনা করছে ওকে? বড় বড় মনিষ্যিদের খেয়াল কি অমনতরোই হয়?

ঠায় দুপুরে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিল ঝাড়েশ্বর। চলে এসেছে ওলদাচণ্ডীর কাছাকাছি। ডানদিকে বিশাল বট। অসংখ্য ঝুরির থাম নাবিয়ে ঘিরে রেখেছে অনেকখানি জায়গা। গাছের তলাতেই মা-চণ্ডীর থান। সামনে অজস্র মাটির হাতি-ঘোড়ার পাহাড়। হ্যাঁরে ঝাড়েশ্বর, এইখানেই তুই দেখলি ছেকরাগুলাকে? সাথে সাথে ছুটলি থানায় খবর দিতে? ভাবতে গিয়ে ঝাড়েশ্বরের সারা অঙ্গে বাঁশপাতার কাঁপুনি। এখন ঠাঠা দুপুর। বনের পথটা একেবারেই ফাঁকা। শাল গাছের পাতাগুলোও স্থির। এ ডালে, ও ডালে এক-আধটা হরিয়াল কিংবা ঘুঘু। একটা মোটাসোটা নেউল মুখটি দেখিয়ে পলকের মধ্যে গা লুকোল হাতী-ঘোড়ার আড়ালে। এসময়ে হঠাৎই যদি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে ছোকরাদের সঙ্গীরা? ঝাড়েশ্বরকে যদি ঘিরে ফেলে চারপাশ থেকে? তারা কি আর খোঁজ-খবর রাখছে না কিছুই? ছোকরাদের সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানে না ঝাড়েশ্বর। তবে এটুকু বুঝেছে, পুলিশ আর মধু সামন্ত যাদের নিয়ে ভাবনায় পড়ে যায়, তারা সাধারণ মনিষ্যি নয়। ভয় পাইয়ে দেবার মতো বিদ্যে তাদের দখলে আছে। ঝাড়েশ্বরের বুকের ভেতরটা গুরগুর করতে থাকে।

জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা মচর-মচর আওয়াজ আসছে অস্পষ্ট। শুকনো পাতা মাড়ানোর আওয়াজ। হাঁটাটা সহসা বাড়িয়ে দিল ঝাড়েশ্বর। দৌড়তে লাগল ঘরের

দিকে। ঠিক সেই সময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল শংকর। পেছন থেকে ডাক দিল, 'ঝাড়েশ্বরদা।'

পা-দুটো আচমকা মাটির সঙ্গে আটকে গেল ঝাড়েশ্বরের। শত চেষ্টাতেও সে সামনের দিকে এগোতে পারল না এক পা।

পায়ে পায়ে পাশটিতে এসে দাঁড়াল শংকর। স্থির পলকে দেখল ঝাড়েশ্বরকে। ম্লান হাসল। বলল, 'হাজরা দিয়ে ফিরলে?'

'মধু সামন্ত পিছু নেগেছে তুমার। তুমাকে মারি ফেলাবে। তুমি পাইল্যে যাও।' সহসা তোতাপাখির মতো গড়গড় করে আউড়ে গেল ঝাড়েশ্বর।

শংকর মৃদু হেসে ঝাড়েশ্বরের পিঠে হাত রাখল। বলল, 'আমাকে নিয়ে ভেবো নি। তুমার নিজের কথা ভাব।' একটুক্ষণ ঝাড়েশ্বরের মুখের ওপর জরিপ চালাল শংকর। তারপর বলল, 'পুলিশ যেমন সাক্ষী দিতে বলছে, দাও। না হলে পুরোপুরি তলিয়ে যাবে। তোমার তিন-তিনটা আবড়া মেয়ে।'

ধীরগলায় কথাগুলো বলে গেল শংকর। কোনো উত্তেজনা নেই ওর মধ্যে।

ঝাড়েশ্বর অবাক হয়ে শুনছিল। ভয়ে ভয়ে শুধোল, 'তুমি জানলে ক্যামন করে?'

ফের হাসল শংকর। 'আমাকে সব খবর রাখতে হয় যে।'

সহসা শংকরের হাতদুটো ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলল ঝাড়েশ্বর।

পরের দিন সকাল না হতেই বাড়ির দরজায় পুলিশ। ঝাড়েশ্বর, চলো হে। সদর থেকে সাহেবরা এসেছেন।

ঝাড়েশ্বর ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। প্যালা থেকে গামছাখানা এবং তাক থেকে একতারাটা নিয়ে গুটিগুটি পা-বাড়াল পুলিশের পিছুপিছু।

.থানার সামনে মাঝারি গোছের ভিড়। গোটা দু'তিন জীপগাড়ি খাড়া রয়েছে। থানার ভেতরে একটা দম আটকানো ভাব। ঝাড়েশ্বরকে দেখেই ছুটে এলেন ছোটবাবু। শালা এতো দেরি করে কেন রে? বড়সাহেব কতক্ষণ বসে রয়েছেন তোর জবানবন্দী শুনবার তরে।

ঝাড়েশ্বর বটগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সকালের নরম রোদ্দুর ঠিক সোনাবেনে পাখির মতো এডাল ওডাল নেচে বেড়াচ্ছে। ডালপালার ছাঁকনি গলে গুঁড়োগুড়োঁ রোদ্দুর ঝরে ঝরে পড়ছে ঝাড়েশ্বরের গায়ে।

একতারার তারটিকে ধীরেসুস্থে বাঁধল ঝাড়েশ্বর। জমায়েতের দিকে বোকা বোকা চোখে তাকালো কয়েক পলক। তারপর গলা ছেড়ে গান ধরল—

ভরা নদী ভয় করিনে, ভয় করি সই বানের জল,
ও জলের হরেক রীতি, হরেক নীতি, হাজার পেকার ছল—
(তাই) ভয় করি সই বানের জল...।

রাজা বদল

শ্রীমন্ত পাল বসে বসে পুতুল গড়ছিল। নরম মাটি দিয়ে বানাচ্ছিল হাত, পা, ধড়, মুন্ডু। ঘন ঘন হাত ভিজিয়ে পুতুলের গায়ে বুলোচ্ছিলো। কুমু পাশটিতে বসে সারাক্ষণ একপলকে দেখছিল শ্রীমন্তের পুতুল-গড়া।

শ্রীমন্তর বুকে কাঁচা-পাকা চুল। পেটের কাছে একটা ছোট্ট নেওয়াপাতি ভুঁড়ি। মাথায় পাতলা চুল। গোলগাল থ্যাবড়া মুখে বোকাসোকা সরল হাসি। দেখতে দেখতে কুমুর মাথায় হাজার প্রশ্ন ভীড় করে।

বিভিন্ন আকার এবং ঢং-এর অজস্র পুতুল শ্রীমন্ত পালের উঠোন জুড়ে। কোনওটা শুকোচ্ছে। কোনওটা রঙ লাগাবার অপেক্ষায়। শুকিয়ে আসা পুতুলগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কুমু শুধলো, এবার কি করবে?

শ্রীমন্ত পাল হাসে। বলে, এবার রঙ লাগাবো দিদিমণি। তারপর চোখমুখ আঁকবো। তারপর ...।

—তারপর? কুমু ডাগর চোখে তাকায়।

—তারপর জামাকাপড় পরিয়ে দোব।

—কোন্ জামাকাপড় পরাবে?

হাতের পুতুলের নাকটা টিকলো করতে করতে শ্রীমন্ত বলে, যার যা পোশাক। রাজার গায়ে চড়বে ঝলমলে পোশাক। বাউলটাকে পরাবো গেরুয়া আলখাল্লা।

—আর চাষাটাকে?

—ও ব্যাটা নেংটি পরবে। আড়চোখে চাষা-পুতুলটাকে দেখে নিয়ে শ্রীমন্ত পাল ঠোঁটের কোণে হাসে।

—চাষাকে নেংটি পরাবে কেন? কুমু বিষন্ন চোখে তাকায়। —তোমার আর রাজার পোষাক নেই?

—থাকবে না কেন? শ্রীমন্ত পুরু ঠোঁটে হাসে। —কিন্তু থাকলেই তো আর পরানো যায় না। ও যে চাষা! চাষার গায়ে কি ঝলমলে পোশাক মানায়?

বলতে বলতে শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে ডুবে যায় নিজের কাজে।

কুমু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। শ্রীমন্তদার যুক্তিটা মাথায় ঢোকে না তার। পোশাক মজুত রয়েছে, তবু চাষা বলে পরতে পাবে না? এ কেমন কথা!

কুমু বায়না ধরে, ওকেও একটা ঝলমলে পোশাক পরাও না শ্রীমন্তদা।

শ্রীমন্ত কুমুকে ভালোই চেনে। মাঝেমাঝেই এমনিতরো অবুঝ হয়ে ওঠে মেয়েটা। ভীষণ জেদি হয়ে ওঠে তখন। শ্রীমন্ত স্নেহের হাসি হাসে। বোকা মেয়ে! দুনিয়ার আদব বোঝে না।

মাটিমাখা আঙুলটা কুমুর নরম গালে আলতো ছুঁইয়ে শ্রীমন্ত বলে, দিদিমণি, বোঝ না কেন, ও ঝলমলে পোশাক পরে মাঠে লাঙ্গল চালাবে কি করে? পাথর ভেঙে রাস্তা বানাবে কি করে? পোশাক নোংরা হয়ে যাবে না?

কুমু ভুরু কুঁচকে তাকায় শ্রীমন্তের দিকে। বিরক্ত হয়। বলে, আহা, ও কি সত্যি সত্যিই ক্ষেতে নাবছে নাকি? ও তো আলমারিতে সাজানো থাকবে। নোংরা হবে কী করে?

বাপের আদরে মেয়েটি গোল্লায় গেছে। মনের ভাব চেপে রেখে শ্রীমন্ত ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে, আলমারিতে থাকলেও চাষা চাষাই। ওকে নেংটি পরানোই দস্তুর।

কুমুর ভীষণ রাগ হচ্ছিল শ্রীমন্ত পালের ওপর। বড়ই নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছিলো ওকে। পুরো ব্যাপারটাই যেন ওর এক কিসিমের খামখেয়ালীপনা।

মাটিতে চাপড় মেরে কুমু বললো, তুমি পরাও না, কি হয় দেখি।

কুমুর ভাবভঙ্গি দেখে ভীষণ হাসি পাচ্ছিল শ্রীমন্তর। বলে, উল্টোপাল্টা বানালে আমার পুতুল যে কেউ কিনবে না দিদিমণি। আমি খাবো কি?

—কেউ না কিনলে আমি কিনবো। কুমু জেদী গলায় বলে, তুমি ঐ চাষাটাকে ঝলমলে পোশাকই পরিয়ে দাও। আমি কিনবো, তোমার কি? শ্রীমন্তর সঙ্গে সারা সকাল এই নিয়ে রগড় চলে কুমুর। অবশেষে চাষাকে ঝলমলে পোশাক পরিয়ে নিয়ে কুমু ফিরে আসে বাড়িতে।

কুমুর মা গীতালি ছিলেন রান্নাঘরে। কুমু পুতুলটাকে সাবধানে রেখে দেয় আলমারিতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে চারপাশ থেকে। পাশে আরেকটা পুতুল ছিলো। রাজার মূর্তি। ঝলমলে পোষাক পরে সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসেছেন রাজামশাই। তার পাশে চাষীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রসন্ন মুখে।

কুমুর চোখে একচিলতে মিষ্টি হাসি খেলে যায়।

একটুবাদে ঘরে ঢুকে চাষা-পুতুলটাকে দেখে হেসে বাঁচেন না গীতালি। বলেন, ও মা, এ কী কান্ড! এ কেমন চাষী বানিয়েছে শ্রীমন্ত! এমন পোশাক কেন চড়িয়েছে ওর গায়ে?

মায়ের পেছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল কুমু। অভিমানে তার গলা ধরে আসে। দু'চোখ ভারী হয়ে ওঠে। নরম গালদুটো ফুলিয়ে কুমু বলে, অত হাসির কি হয়েছে? শ্রীমন্তদার কাছে অনেক পোশাক রয়েছে তো। ও বেচারা একখানা পরলে ক্ষতি কি?

কুমুর নরম গাল আলতো টিপে দিয়ে গীতালি হাসেন। বলেন, পোশাক পেয়ে এখন যদি ও বাহারি সিংহাসন চায়?

—চাইলে কিনে দোব একটা। কতো আর দাম?

কুমুর অবুঝ গোঁ দেখে গীতালি হেসে গড়িয়ে পড়েন। বলেন, সে এক দৃশ্য হবে! চাষা বসবে কিনা সিংহাসনে! এসব তোর বাবার আস্কারা।

কুমুর দু'চোখ ফেটে জল এসে যায়। অভিমানে ভারি হয়ে আসে বুক। মা যে কেন চাষীটিকে পছন্দ করছে না! অথচ, চাষীর সরল প্রসন্ন মুখখানার দিকে তাকিয়ে ওর কোনও দোষই খুঁজে পায় না কুমু।

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল কুমু। সহসা উঠে বসে এক ধরনের চিৎকারে। চোখ রগড়ে দেখে, আলমারির মধ্যে রাজামশাই ধমকে চলেছেন চাষীকে।

—ব্যাটা চাষা, তোর সাহস তো কম নয়! তুই রাজার সুমুখে এমন পোশাক পরে দাঁড়িয়েছিস! তোকে শূলে চড়ালেও আমার রাগ যাবে না।

চাষীটা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আমার কোনও দোষ নেই হুজুর। কুমু দিদিমণি শ্রীমন্ত পালের সাথে ঝগড়া করে এমন পোশাক পরিয়েছেন আমার গায়ে।

—দুর হ' ব্যাটা, আমার পাশ থেকে। তোর গায়ের গন্ধে বমি আসছে আমার। রাজামশাইয়ের নাক ঘেন্নায় প্রায় কপালে উঠে গেল, ...যা বলছি।

চাষীটা এবার কেঁদে ফেলে আর কি! বললো, কী করে যাবো? আলমারির পাল্লায় বাইরের থেকে তালা আটকানো যে। কুমু দিদিমণির কাছে চাবি।

—তবে আমিই চললাম এখান থেকে। রাজামশাই সিংহাসণ থেকে উঠবার উপক্রম করলেন। নাক কুঁচকে বললেন, তোর সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে নির্ঘাৎ বমি করে ফেলবো আমি।

—কী করে যাবেন? চাষী রাজামশাইকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, —বললাম না, তালা বন্ধ?

চমকে উঠলেন রাজামশাই। ...তা হলে আমি বন্দী?

চাষী যেন আশ্বস্ত করতে চাইলো রাজাকে। বললো, শুধু আপনি একাই নন, আমিও বন্দী। আমরা দুজনেই এক কামরায় বন্দী, আউর চাবি খোয়া যায়ে ...।

রাজামশাইকে পলকের জন্য বিষন্ন মনে হোল। পরক্ষণেই তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, তোর সঙ্গে বন্দী থাকবো আমি? তুই চাষা, আর আমি কিনা রাজা! বলতে বলতে প্রবল বিরক্তিতে ঝুলে পড়লো রাজামশাইয়ের ঠোঁট, কুমুটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

এমনি সময়ে কুমু ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা থামিয়ে রাজামশাই গম্ভীর মুখে বসে রইলেন সিংহাসনে ঠেস দিয়ে। রাজাটার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল কুমুর। ভারি হিংসুটে তো!

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়র সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছিল কুমু। এক সময় বাপীর কাছে প্রসঙ্গটা তোলে। বলে, রাজাটা কী হিংসুটে বোঝ বাপী, আলমারির মধ্যে কত্তো জায়গা, তবুও সে চাষীটাকে কিছুতেই থাকতে দেবে না।

আদুরে মেয়েটির এমনিতরো ছেলেমানুষী কথাবার্তা প্রায়ই শুনতে হয় বিষ্ণুপ্রিয়কে। জুতসই জবাবও দিতে হয়। কুমুর কথার জবাবে বিষ্ণুপ্রিয় মৃদু হেসে বলেন, রাজারা একটুখানি হিংসুটে হবেই মা। নইলে যে ওদের রাজ্যি রাখা দায়। তাছাড়া, সবাইয়ের

সঙ্গে গা ঘসাঘসি করে থাকলে যে রাজামশাইয়ের মান থাকে না। রাজা-রাজড়াদের সবার থেকে দূরে একা একাই থাকতে হয় মা।

সন্ধেবেলায় পায়েপায়ে আলমারির সামনে এসে দাঁড়ায় কুমু। ওকে দেখামাত্র রাজামশাই বলে ওঠেন, এই মুখ্যু চাষাটাকে আমার পাশ থেকে সরাও কুমু। আমার ভালো লাগছে না।

কুমু রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে শুধোয়, ওকেও যদি রাজা বানিয়ে দি?

রাজামশাই খানিকক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন। তারপর অবাক হয়ে শুধোন, ইস, বানিয়ে দিয়েই হলো? ও রাজা হবে কী করে? ওর মুকুট কই?

—কিনে এনে পরিয়ে দিলেই হবে।

—ওর সিংহাসন কই? রাজা মুচকি হাসেন।

—বাজার থেকে কিনে আনবো কালই।

রাজামশায়ের চোখেমুখে চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে। চাষার দিকে কটমট করে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যান তিনি। সহসা চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর। চিৎকার করে বলে ওঠেন, সিংহাসন না হয় কিনে আনলে, কিন্তু ও সিংহাসনে বসবে কী করে?

কুমুর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে রাজামশাইয়ের উল্লাস আর বাধা মানে না। হাসতে হাসতে বলেন, কী? কেমন জব্দ এবার?

গনগনে চোখে রাজাটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে কুমু ছুট মারে শ্রীমন্ত পালের ডেরার দিকে।

—শ্রীমন্তদা, ও শ্রীমন্তদা! তুমি চাষীকে ওর'ম দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? ও বসবে কি করে? কুমুর কেঁদে ফেলবার জোগাড়।

শ্রীমন্ত পাল নরম গলায় বলে, চাষাদের তো বসবার জো নেই দিদিমণি। ওরা তো সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাজ করে যায়।

—ওর বসতে ইচ্ছা করে না? তুমি নিজে বস না? কুমুর ঠোঁটদুটো রাগে তিরতির করে কাঁপতে থাকে।

শ্রীমন্ত ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ইচ্ছে থাকলেও তো উপায় নেই, দিদিমণি। বসলে ওদের চলে না যে। ওদের যে দিনরাত, চব্বিশ ঘন্টা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়।

—না, না, আমি কোনও কথা শুনতে চাইনে। কুমু অবুঝের মতো গোঁ ধরে, তুমি একটা বসে থাকা চাষী গড়ে দাও আমার জন্য। আমি ওর জন্য সিংহাসন কিনবো। রাজার পাশে বসবে ও।

শ্রীমন্ত পাল মনে মনে বিরক্ত হয়। ছেলেমানুষী আর কাকে বলে! কিন্তু কথা বাড়ায় না সে। কুমুর সঙ্গে বকবক করার সময় নেই তার। অনেক বায়না নেওয়া কাজ পড়ে রয়েছে। তুলে দিতে হবে ঠিক সময়ে। কাজের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে শ্রীমন্ত বলে, দেখি , বসে থাকা চাষা যদি বানাই তো খবর দেবো তোমায়।

দিন দুয়েক বাদে শ্রীমন্তর কাছ থেকে বসে-থাকা চাষীকে পেয়ে কুমুর আনন্দ আর ধরে না! সিংহাসনও কেনা সারা। ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে আলমারীর পাল্লা খুলে ফেলে কুমু। তারপর রাজার পাশেই খালি সিংহাসনটায় বসিয়ে দেয় চাষীটাকে। মনটা এতক্ষণে খুশীতে ভরে ওঠে তার। পরক্ষণেরই পাশের থেকে খিলখিল হাসির শব্দ শুনে চমকে ওঠে কুমু। দেখতে পায়, আলমারীর তাকে বসে রাজামশাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছেন।

—অ্যাতো হাসির কি হলো? কুমু আলতো ধমক লাগায় রাজাকে।

বহুকষ্টে হাসি থামিয়ে রাজামশাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন চাষীকে। ঠাট্টা মেশানো গলায় বলেন, এই না হলে সিংহাসনে বসা! এক ঠ্যাং সিংহাসনের ওপরে তুলে দিয়ে, যেন আলের ওপর বসেছেন। একটা হুঁকো ধরিয়ে দাও ওর হাতে।

রাজার চোখদুটো থেকে হাসি উপচে পড়ছিল যেন। কুমু এতক্ষণ ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি। হাঁটুমোড়া পুতুলটা দেখেই সে ভেবেছিল সিংহাসনে বসালেই ও বসে থাকবে রাজার মতো। কিন্তু ওর বসবার ধরণটা যে সত্যিসত্যিই অন্য রকম। চাষীরা যেমন করে বসে তামাক খায়, সেই ঢং-এ বানিয়েছে শ্রীমন্ত পাল।

শ্রীমন্তর ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিলো কুমুর। চাষীর ওপর লোকটার এই ঘেন্না কেন, কিছুতেই সেটা বুঝে উঠতে পারে না সে। কিছুতেই কুমুর মনের মতন করে বানিয়ে দিচ্ছে না পুতুলটা। কুমু ঠিক করলো, শ্রীমন্তকে আর খোশামোদি করবে না। ইস্কুলে দীপা দিদিমণিকে ধরবে একটা পুতুল গড়ে দেবার জন্য। দীপা দিদিমণি সুন্দর খেলনা গড়েন। উঁচু ক্লাসে ওয়ার্কএডুকেশন শেখান তিনি। কুমুকে ভীষণ ভালোবাসেন।

পরের দিনই ইস্কুলে দীপা দিদিমণিকে ধরে কুমু, আমায় একটা সিংহাসনে বসা চাষী বানিয়ে দাও না দীপাদি।

চোখ বড় বড় করে দীপাদি তাকিয়ে থাকেন কুমুর দিকে। শুধোন, সিংহাসন বসা চাষীর মুর্তি? তারপর চোখ শক্ত করে বলেন, আজকাল মায়ের সঙ্গে খুব সিনেমা-টিনেমা দেখা হচ্ছে বুঝি? ছবিগুলো যা হচ্ছে আজকাল! গুল-তাপ্পিতে ভর্তি।

দীপাদি ক্লাসের অন্য মেয়েদের দিকে তাকান। চোখের কোণে চাপা হাসি। শুধোন, চাষী সিংহাসনে বসলে কি হবে? বলতে পারো তোমরা?

বিজয়া বলে ওঠে, রাজার মান যাবে দিদিমণি।

সুলতা বলে, চাষবাস কে করবে দিদিমণি? আমরা কি খাবো?

শিবাণী বলে, সিংহাসন নোংরা হবে দিদিমণি। ওদের গায়ে বেজায় ধুলো-কাদা লেগে থাকে সারাক্ষণ।

দীপাদি সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে, ও রাজামশায়কে সিংহাসন থেকে ঠেলে ফেলে দেবে এক ধাক্কায়। ওদের গায়ে অসুরের বল, জানো তো? রাজামশাইয়ের তো থলথলে নধর শরীর।

—বেশ হবে। আর চুপ থাকতে না পেরে বলে ওঠে কুমু, রাজাটা ভারি হিংসুটে। চাষীটাকে একতিল দেখতে পারে না। সারাক্ষণ ধমকায়।

—ধমকায় কি সাধে? বিরক্ত মুখে দীপাদি বলেন, ধমক বন্ধ করলে ওরা ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে যাবে? না ধমকালে তুমি পড়াশোনা করো?

কুমুকে ধমক খেতে দেখে অন্য মেয়েদের চোখ চক্‌চক্ করছিলো খুশীতে। দীপাদি কুমুকে ভালোবাসেন বলে ভারি হিংসে হোত ওদের। হৈ-হৈ করে বলে ওঠে ওরা, চাষী সিংহাসনে বসলে ভীষণ ক্ষতি হবে দিদিমণি।

কুমুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। চোখে জল এসে যাচ্ছিলো তার।

রাতের বেলায় ব্যালকনিতে বিষ্ণুপ্রিয়কে একলাটি পেয়ে কুমু দাঁড়ায় পাশটিতে। বাবার মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে শুধোয়, বাপী, চাষী-পুতুল সিংহাসনে বসতে পারে না?

বিষ্ণুপ্রিয় আবছা অন্ধকারে কুমুর দিকে তাকান। দুচোখ দিয়ে আদর ঝরে পড়ছিলো তাঁব। আহ্লাদী মেয়ের অমন অনেক ছেলেমানুষী প্রশ্নের জবাব তাঁকে প্রায়ই দিতে হয়। এড়িয়ে গেলে মেয়ের কালো চোখের কোণে অভিমান জমে। বিষ্ণুপ্রিয় কুমুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, না, না। তাহলে তারাও যে রাজা হয়ে যাবে। একে-ওকে ধমকাবে।

—তা কেন? কুমু মুখ গোঁজ করে বলে, তারা তো আর রাজার মতো হিংসুটে নয়।

মৃদু হেসে বিষ্ণুপ্রিয় বললেন, সিংহাসনে বসলেই তারাও হিংসুটে হয়ে উঠবে, মা। তোমাকে সেদিন চাষীর ছেলে গোপালের রাজা হওয়ার গল্প বলিনি? বড় হলে আরও অনেকের কথা পড়বে, যাঁরা চাষীর ছেলে ছিলেন, রাজা হয়েই হিংসুটে হয়ে গিয়েছেন।

কুমু বুঝতে পারে না, কেন এমনটা হয়? বাপীর কথা পুরোপুরি বিশ্বেস হয় না যেন তার। একসময় শুধোয়, ওরা কেন এমন হয় বাবা?

বিষ্ণুপ্রিয় কুমুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, সিংহাসনের তলায় একটা ডাইনী বসে থাকে, মা। সেই রাজামশাইকে সর্বদা চিমটি কেটে রাগিয়ে দেয়।

—কোথায় ডাইনী? কুমু বাবার চোখে চোখ রাখে, —আমি তো দেখতে পাইনে।

—তুমি কি সবকিছুই দেখতে পাও, মামণি? বিষ্ণুপ্রিয় কুমুর চুলে হাত বুলিয়ে দেন, তুমিও মাঝে মাঝে কেমন রেগে যাও। কে তোমার ঐ ছোট্ট শরীরে রাগ ঢেলে দেয়, তুমি কি তাকে দেখতে পাও?

কুমু আগের কথায় ফিরে আসে। বলে, চাষীটা তাহলে কোথায় বসবে বাপী?

কুমুর ছোট্ট শরীরটা দোলাতে দোলাতে বিষ্ণুপ্রিয় বলেন, এক কাজ কর। ওকে মাটিতে বসিয়ে দাও।

অভিমানে ঠোঁটদুটো ফুলিয়ে রাখে কুমু। বলে, রাজা সিংহাসনে বসে হাসবে যে।

বিষ্ণুপ্রিয়ই হেসে ফেললেন এবার। কুমুর কানের কাছটিতে মুখ এনে বুদ্ধি বাতলালেন তিনি, রাজাকেও বসিয়ে দাও ওর পাশটিতে।

—ও বসবে কেন মাটিতে? ওর সিংহাসন ও ছাড়বে কেন?

বিষ্ণুপ্রিয় কয়েক মুহূর্ত ভাবেন। তারপর চোখমুখ উজ্জ্বল করে বলেন, কোনরকমে একটিবার ওকে নামিয়ে দিয়ে সিংহাসনটা লুকিয়ে ফেল কোথাও।

কুমু যেন মজা পায় বাবার কথায়! সোজা ছুটে যায় আলমারির পাশটিতে। বিষ্ণুপ্রিয় বসে থাকেন চুপটি করে। ব্যালকনিতে রাত বাড়তে থাকে...।

খানিক বাদে ফিরে আসে কুমু। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, ও বাপী, ও নাবছে না। অতো করে বললাম, খোসামুদি করলাম কতো। কথা কানেই তোলে না।

মেয়ের গালে আলতো টোকা মেরে বিষ্ণুপ্রিয় বলেন, অমন করে বললে কি নামে কেউ? একটু ধমক-টমক দাও, ভয়টয় দেখাও।

কুমু আবার ছুটে যায় ঘরে। আবছা আঁধারে একা একা বসে থাকেন বিষ্ণুপ্রিয়। রাত বাড়তে থাকে...।

খানিক বাদে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে কুমু। চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিলো তার। বিষ্ণুপ্রিয় ব্যস্ত হয়ে কুমুকে কোলে টেনে নেন। চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে শুধোন, কি হোল মা? কাঁদিস কেন? বল্।

বহুকষ্টে কান্না থামিয়ে কুমু বলে, আমি রাজাকে একটু ধমকাচ্ছিলাম হাত নেড়ে। বিষ-আঙুলটা ওর গায়ে লাগাতেই ও মাটিতে পড়ে গেল, বাপী। দু'টো পা'ই ভেঙ্গে গিয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়র মুখে এক টুকরো ভারি অদ্ভুত হাসি খেলে যায়। কুমুর মাথাটা দু'হাতে তুলে ধরে বলেন, তবে আর কি! এই বেলা ছুটে যা' মা। রাজা সেরে ওঠার আগেই সিংহাসনটা সরিয়ে ফ্যাল।

কান্না জড়ানো গলায় কুমু বলে, ও আর উঠে বসতে পারবে না বাবা। ওর দুটো পা'ই ভেঙ্গে গিয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয় যেন অসহায় বোধ করেন। কেমন করে কুমুকে প্রবোধ দেবেন ভেবে পান না। নিজের মনে বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকেন, রাজাকে যদি এতোই ভালোবাসিস, তবে তাকে সিংহাসন থেকে নামাতে গেলি কেন মা?

কুমু সে কথার জবাব দেয় না। সে কেবল বাবার বুকে মুখ লুকোয়। কুমুর অবস্থা দেখে বিষ্ণুপ্রিয়র মুখে চিন্তার মেঘ জমে। ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেন, সিংহাসন খালি রাখতে নেই, মা। সুযোগ পেলেই সরিয়ে ফেলতে হয়, লুকিয়ে ফেলতে হয়। নয়তো অন্য কেউ এসে বসে পড়বেই। দ্যাখ্ গিয়ে, হয়তো বা কেউ বসে পড়লো এতক্ষণে। হয়তো বা ঐ চাবীটাই...।

কুমু সে কথার জবাব দেয় না। কোন গরজ দেখায় না সে। কেবল বাবার বুকে মুখ চেপে নিঃসাড়ে বসে থাকে।

ব্যালকনিতে রাত বাড়ে...।

কুমুর বিচার

—দ্যাখো। তোমার হাকিম মেয়ের কাণ্ডটা দ্যাখো একবার। নরম গলায় অনুযোগ করতে করতে ঘরে ঢোকেন গীতালী। বিষ্ণুপ্রিয় হেডলী চেজের মধ্যে ডুবে যাবার তাল করছিলেন। মুখ তুলে তাকান।

—কুমু? কোথায় সে?

—ঐ তো, বাগানের মধ্যে এজলাস বসিয়েছে।

জানলা দিয়ে বাগানটা দেখা যায়। চারপাশের কেয়ারীতে মরসুমী ফুল। কিছু গোলাপ, রঙ্গনের ঝোপ। মাঝখানে শানবাঁধানো বকুল গাছ। তার তলায় গ্যাঁট হয়ে বসেছে কুমু। বিষ্ণুপ্রিয় দেখতে পান।

—সামনে ওরা কারা?

—কারা আবার? আসামী আর বাদী। মুচকি হেসে গীতালী বলেন, জমাদারের ছেলেটা আসামী আর রেবার ছেলেটা বাদী।

—কিন্তু বিচারটা কী নিয়ে?

—সেকি আমি জানি ছাই? গীতালী চুলের ঢল সামলাতে সামলাতে জবাব দেন।

বিষ্ণুপ্রিয় হেডলী চেজ বন্ধ রেখে জানলার পাশে এসে দাঁড়ান। ভরাট গলায় ডাক দেন মেয়েকে, কুমু চলে এসো। চান করবার সময় হোল তোমার।

—দাড়াও বাপী। এখন যে বিচার চলছে। কুমুর কচি গলা ভেসে আসে বাগান থেকে, এখন কোর্ট বন্ধ করে যাই কি করে?

—রোববার কোর্ট তো বন্ধ। আজ কি বিচার করতে আছে? চলে এসো।

—কিন্তু অন্যদিন তো আমার স্কুল। ব্যাজার মুখে জবাব দেয় কুমু।

—তা হোক। চলে এসো।

বিষ্ণুপ্রিয়র গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, কুমুকে উঠতে হলো অবশেষে। বকুলতলার এজলাস ভেঙ্গে গেল তৎক্ষণাৎ।

কুমুর বয়েস বড় জোর সাত। বাবা-মায়ের একটি মাত্র মেয়ে বলে আদরটা আঠারো আনা। এইটুকু বয়েসে আর কিছু না হোক, এইটুকু সে জেনেছে যে, তার 'বাপী' বিচার করেন। কোথায় তাঁর কোর্ট, কি বৃত্তান্ত, অতশত জানা নেই তার। সে শুধু

জানে, তার বাপী হাকিম। তিনি রোজ বিচার করে দোষীদের সাজা দেন। ফুরসৎ পেলেই সে বাবার কাছে বসে তাঁর হাকিমগিরির গপ্পো শোনে। বিষ্ণুপ্রিয়ও বেশ রসিয়ে রসিয়ে গপ্পো করতে পারেন মেয়ের সঙ্গো।

গীতালী বাপ-মায়ের কথাবার্তা শুনে হেসে লুটিয়ে পড়েন।

বলেন, মেয়ে তোমার প্রায়-হাকিম হয়ে এসেছে গপ্পো শুনেই।

সেটা অবশ্যি বিষ্ণুপ্রিয়ও লক্ষ করছেন। ইদানীং সুযোগ পেলেই কুমু যেখানে সেখানে এজলাস বসিয়ে দেয়। শুরু হয়ে যায় বিচার। আসামীর কোনও ঠিক নেই। মানুষজন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছ-গাছাল, ...সবাইয়ের মধ্যেই সে অপরাধী খুঁজে পায়। দিনকয়েক আগে বেলিফুলের ঝোপ বনাম জমাদারের কালো ছাগলটার বিচার করেছে সে। ছাগলটা ছিল আসামী। সে বাগানের বেলি ফুলের ঝোপ মুড়িয়ে খেয়েছিল। বিচারে সাতদিন জেল হয়েছে তার। রামু জমাদার কুমুর রায় শোনার পর একদণ্ডও ছাড়ছে না ছাগলটাকে।

একোয়ারিয়ামে অজস্র মাছ। ব্ল্যাক মলি, টাইগার, ফাইটার, কসবি, এঞ্জেল, গরামী...। বিচিত্র বর্ণের সব। হাল্কা সবুজ জলের মধ্যে সুন্দর মন্দির। সবুজ ঝোপঝাড়। রুপোলী বুদ্বুদ। তার মধ্যে মাছগুলো দিনরাত খেলে বেড়ায়। কুমু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে ওদের ভাবগতিক। একদিন একোয়ারিয়ামের সুমুখেই এজলাস বসিয়ে দিল সে। সারাক্ষণ পাশে ঘাড় গুঁজে বসে রইলো কুমুদের পোষা কুকুর জিমি। একসময় বিচার শেষ হোল। এবার রায় দেবার পালা। কুমু মায়ের উদ্দেশ্যে হাঁকডাক জুড়ে দেয়। মেয়ের চেঁচামেচিতে গীতালি হন্তদন্ত হ'য়ে ঘরে ঢোকেন। মায়ের শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে কুমু বায়না জোড়ে, মা, ঐ ফাইটারটাকে বের করে দাও। জলদি।

—কেন? ও আবার কি করলো?

—ও দোষ করেছে। বিচারে ওর পনের দিনের জেল হয়েছে। ও এখন জেলে যাবে।

মুখের হাসি বহুকষ্টে চেপে রেখে গীতালি শুধোন, কিন্তু কি দোষ করলো ও?

—ও সারাক্ষণ একে ওকে তাড়া করে। গরামীগুলোর সুন্দর পাখনা ধরে টান মারে। ওকে আর সাজা না দিলেই চলে না।

মেয়ের হাত থেকে শাড়ির আঁচলটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে গীতালি শুধোন, কিন্তু কী করে সাজা দিবি ওকে? জল থেকে বের করলেই সাথে সাথে মরে যাবে ও।

সঙ্গো সঙ্গো আবদার জুড়ে দেয় কুমু, ...তুমি একটা হরলিকসের বোতল ধুয়ে জল ভরে দাও। ওর মধ্যেই থাকবে ও পনের দিন। ওটাই ওর জেল।

জিমি বসে বসে লেজ নাড়াচ্ছিল অকারণে। মনে হোল, কুমুর রায়ে ও বেজায় খুশী।

সেদিন মেয়ের আবদার রাখতে গীতালিকে একটা জলভরা বোতল দিতেই হোল। সারা বিকেল একা একা বোতলের জলে ভেসে বেড়ালো মাছটা নিতান্তই মনমরা হয়ে। জিমি সারাক্ষণ বোতলের পাশে শুয়ে রইলো পাহারা দেবার ভঙ্গিতে।

—বাপী, সাজা দিলে দোষীরা শোধরায়?

মেয়ের প্রশ্নে বড় অস্বস্তি বোধ করেন বিষ্ণুপ্রিয়। এতোটুকুন বাচ্চাকে হতাশ করতে সাধ যায় না তাঁর। বলেন, শোধরায় বৈকি মা। জেলে বসে ওদের অনুতাপ হয় যে।

—তাহলে আমাদের ফাইটারটা শোধরালো না কেন? বিরস বদনে শুধোয় কুমু, —ও তো খালাস পাবার পর আবার একে-ওকে ঢুঁ মারছে।

কি জবাব দেবেন ভেবে পান না বিষ্ণুপ্রিয়। মৃদু হেসে কুমুকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, বেয়াড়া আসামী তো সর্বত্রই আছে মা। সবাই কি পয়লা চটকায় ভালো হয়?

কুমু এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, বাপী, বিচার করবার সময় তোমরা আসামীকে মারো?

—না তো। যার বিচার চলছে তাকে কি মারা চলে মা?

—তবে কেন পল্টুদারা গতকাল চোরটাকে ধরে অমন করে মারলো সবাই মিলে?

গতকাল এপাড়ায় একটা চোর ধরা পড়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়র মনে পড়লো। ক্লাবের ছেলেরা বেধড়ক পিটিয়ে ওকে থানায় দিয়ে এসেছে। কুমুর নজর এড়ায়নি সেটা।

বিষ্ণুপ্রিয় আমতা আমতা করে বলেন, ওরা তো বিচার করছিল না। শুধুই মারছিল।

—মারতে মারতে যদি লোকটা মরেই যেতো? কুমু ডাগর চোখে শুধোয়, তাহলে তুমি কার বিচার করতে?

বিষ্ণুপ্রিয় মনে মনে হাসেন। মেয়ের ধারণা, দুনিয়ার তাবৎ দোষীর বিচার করেন কেবল ওর বাবাই। বলেন, তাহলে যারা চোরটাকে মেরেছে, তাদেরও বিচার করতাম। বিচার করে সাজা দিতাম ওদেরও।

—কেন? তারা তো চোর নয়।

—চোর নয় বটে, কিন্তু তারা যে খুনী। তাদের দোষ আরও বেশি।

বাপ-মেয়ের কথাবার্তার মধ্যিখানে এসে দাঁড়ান গীতালী। ওর ফর্সা মুখ টকটকে হয়ে উঠেছে। সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়েন, উহ্, রান্নাঘরে ইঁদুরের জ্বালায় তো আর পারিনে। একটা কিছু করো।

কুমুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয় এবার গীতালির পাল্লায় পড়লেন।

—কেন? ওষুধ মেখে খাবারদাবার দিলে যে? মরলো যেন ক'টা?

—ঐ ক'টাই। ঠোঁট উলটে বলেন গীতালি, তারপর সব চালাক হয়ে গিয়েছে। ওষুধ পড়ে থাকে ওষুধের মতো, ওরা মুখও দেয় না।

বিষ্ণুপ্রিয় গুম মেরে থাকেন। ছুটির দিনের প্রশান্তিটা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাবার মুখে। গীতালিকে তিনি চেনেন। ইঁদুর মারার কোনও সুব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সে কাউকেই তিষ্ঠোতে দেবে না।

গীতালি থমথমে মুখে বসে রয়েছেন সোফায়। কুমু বাবার কোলটি ঘেঁসে বসে থাকে পুতুলটির মতো। আর কালো কুচকুচে জিমি মেঝের উপর বসে বসে পিটপিট করে দেখতে থাকে সবাইয়ের মতিগতি।

গীতালি নিজের মতো গজগজ করছিলেন, ভাঁড়ার ঘরের চাল-গম খেয়ে খেয়ে ইয়া-ইয়া সব হয়েছে এক-একটা। দিন নেই, রাত নেই, সারা ঘর ছোটাছুটি লাগিয়েছে। একটা জিনিস বাইরে রাখবার জো' নেই। কাপড়-চোপড়, লেপ-বালিশ কেটেকুটে শেষ করে ফেললো।

শুনতে শুনতে কুমুর মনে হলো, ইঁদুরগুলো ভারি বজ্জাত। অন্যের শান্তির সংসারে অযথা অশান্তি সৃষ্টি করছে দিন দিন। ওদের সাজা দেওয়া উচিত।

পরের দিন কোর্ট-ফেরতা বিষ্ণুপ্রিয় একখানা ইঁদুর-ধরা ফাঁদ কিনে নিয়ে এলেন। ভাঁড়ার ঘরের এককোণে বসিয়ে দেওয়া হলো ফাঁদ। দেখেশুনে জিমির উৎসাহ আর ধরে না। জোরে জোরে লেজ নাড়াতে থাকে সে। ঘোরাঘোরি করতে থাকে ভাঁড়ার ঘরের সামনে।

কুমুর রাতটা ভারি উৎকণ্ঠায় পার হোল।

সকালবেলায় সাততাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেই বড়সড় চমক খায় কুমু। একটা ধাড়ি ইঁদুর গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে ফাঁদের মধ্যে। বাইরে থেকে তার সুচোলো মুখ আর কুতকুতে চোখদুটো দেখতে পায় কুমু। ইঁদুরটা ফাঁদের মধ্যে ছোটাছুটি করে বেরোবার চেষ্টা করছিল। তার লম্বা সরু লেজ ফাঁদ গলে বাইরে আছড়ে পড়ছিল বার বার। পলকের মধ্যে ঐ লেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল জিমি।

খবর পেয়েই রামু জমাদার একটা খেঁটে নিয়ে হাজির হোল।

—ছোড়িয়ে দ্যাও খুকুমনি। উ শালার জান নিকলাই।

জিমি ততক্ষণে খাঁচার সুমুখে উবু হয়ে বসেছে। স্থির পলকে তাকিয়ে রয়েছে ইঁদুরটার দিকে।

গীতালির চোখেমুখে ভোরের স্নিগ্ধ প্রশান্তি। এক রাতেই হাতেনাতে ফল পেয়ে মনে মনে বেজায় খুশি তিনি।

কেবল বিষ্ণুপ্রিয় কেমন উদাসীন চোখে দেখছিলেন পুরো দৃশ্যটা। ব্যাপারটা নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাস ছিল না তাঁর।

রামু জমাদার ফাঁদটাতে হাত ছোঁয়াতেই হৈ হৈ করে ওঠে কুমু, একি ফাঁদে হাত দিচ্ছো যে?

—উকে মারবো খুকুমনি।

—মারবে? কেন?

রামু জমাদার দাঁত বের করে হাসে। বলে, ইঁদুর ধরে মারবে না তো কি করবে খুকুমনি? পুষবে?

—আগে তো ওর বিচার হোক। কুমু গম্ভীর গলার রায় দেয়, বিচারের রায় বেরুলে তবে তো সাজা।

গীতালির সংগে বিষ্ণুপ্রিয়র নিরব চোখচোখি হয়। সাত সকালে মেয়ের মাথায় আবার পোকা নেচেছে। অথচ ফাঁদটা খালি করে আবার বসিয়ে দিলে আরও এক-আধটা আটকে যেতে পারে। কিন্তু সেকথা এখন মেয়েকে বোঝায় কে?

জিমির বুঝি আর তর সইছিল না। সে কালো কুচকুচে লেজখানা মেঝেতে আছড়াতে থাকে সমানে। গলায় বিচিত্র আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়াতে থাকে ফাঁদটার চারপাশে। ও মনে মনে চাইছে, ফাঁদ থেকে ইঁদুরটাকে বের করে দেওয়া হোক। ও ক্যাঁক করে কামড়ে ধরুক ওটার টুঁটি।

দেখে ভীষণ রাগ হয়ে গেল কুমুর। জিমির পিঠে সপাটে একটা থাবড়া মেরে বললো, ওকে মেরে ফেলবার মতলব তোর? ভাগ্। বিচার না করে মেরে ফেলতে চাস একটা প্রণীকে? একি মগের মুলুক নাকি?

না। মেয়েটা ভীষণ বাড়াবাড়ি করছে। গীতালি খুব অপ্রসন্ন গলায় বলে ওঠেন, এই কুমু, ফাঁদটা রামুকে দিয়ে দাও মা?

গীতালির গলার মৃদু ঝাঁঝটা বুঝি টের পায় কুমু। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, বা-রে, কোনও বিচার না করে ওকে মেরে ফেলা হবে? তুমিও একথা বলছো মা?

গীতালি অস্বস্তি বোধ করেন।

শেষমেশ মেয়ের জেদের কাছে মাথা নোওয়াতে হয় সবাইকে। ইঁদুরটাকে সন্তর্পণে বের করে একটা ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে রাখে রামু জমাদার। এখন ও বেচারার চব্বিশ ঘন্টা হাজত বাস। কাল সকালে ওর বিচার হবে। কারণ, আগামী কাল কুমু দিদিমনির স্কুলের ছুটি।

সেদিন রাতেই একটা মজার স্বপ্ন দেখলো কুমু।

ইঁদুরটা কখন যেন ঝুড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওর খাটের পাশটিতে এসে দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—একটা কথা বলতে এলাম হুজরাইন।

ওকে দেখে চমকে ওঠে কুমু, তুই এলি কী কেমন করে? জিমি নেই আশে পাশে?

—ওর এখন মধ্য রাত। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গোর হাসি খেলে গেল ওর।

—বল। কী বলছিলি? নড়ে চড়ে বসে কুমু।

—শুনছি কাল নাকি আমার বিচার হবে? আমার দোষটা কি, দয়া করে বলবেন?

—তোর আবার দোষের অভাব? তোর বিরুদ্ধে এক নম্বর অভিযোগ, অন্যের ভাঁড়ার থেকে চুরি করে খাওয়া।

ইঁদুরটা বিহ্বল চোখে তাকায় কুমুর দিকে। থমথমে গলায় বলে, চুরি না করেও খেয়েপরে বাঁচার কোনও উপায় হুজরাইন রেখেছেন কি? উপায়টা বাতলে দিন। কোন্ শালা আর চুরি করে কাল থেকে।

—অন্য উপায় না পেলে চুরিং করবি তুই?

—নইলে বাঁচবো কি করে হুজরাইন?

—সেটা কোর্টের দেখবার বিষয় নয়। চুরির বিচার করতে গিয়ে কারুর বাঁচার পথ বাতলানোটা কোর্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে না। বুঝলি?

ইঁদুরটার সারা মুখে এক ধরনের অসহায় ভঙ্গি ফুটে ওঠে। ছলোছলো চোখে সে চেয়ে থাকে কুমুর দিকে। কুমু বড় বড় চোখে শুধোয়, আর কিছু বলার আছে তোর?

ইঁদুরটা বিষণ্ন চোখে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। খানিকবাদে বলে, মৃত্যুদণ্ডটা দেওয়া যায় না?

—মৃত্যুদণ্ড? কুমু চমকে তাকায়, —চুরিতে?

ইঁদুরটা বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে কুমুর দিকে। তারপর গলায় উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে শুধোয়, বিচারে আমার কী সাজা হতে পারে?

—সেটা কি আগে থেকে বলা যায়? কুমু ইষৎ বিরক্ত হয়। —চুরি প্রমাণ হয়ে গেলে তোর জেল হয়ে যেতে পারে।

ইঁদুরটা বিষণ্ন চোখে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। খানিকবাদে বলে, মৃত্যুদণ্ডটা দেওয়া যায় না?

—মৃত্যুদণ্ড? কুমু চমকে তাকায়, —চুরিতে?

ইঁদুরটা বুঝতে পারে, সে একটা ভীষণ অন্যায় আবদার করে ফেলেছে। কাঁচুমাচু মুখে বলে, তাহলে অন্ততঃ যাবজ্জীবন জেল। গলায় চরম মিনতি ফুটিয়ে বলে, এটুকু তোমাকে করে দিতেই হবে।

কুমুর কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। শুধোয়, সাজা বাড়াতে চাইছিস্ কেন?

খানিকক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে ইঁদুরটা। তারপার অভ্যস্ত গলায় বলে, দ্যাখো, মৃত্যুদণ্ড হলে কথা ছিল না। তা না হলে অন্ততঃ যাবজ্জীবন জেলটা হলে দুবেলা দু'মুঠোর চিন্তাটা ঘোচে।

দোষী ইঁদুরের চালাকিটা সহজেই বুঝে ফেলে কুমু। চোখ নাচিয়ে বলে, খুব মজা, তাই না? জেলে বসে বসে বিনে পয়সায় খাওয়ার ধান্ধা? ভারিক্কি গলায় বলে ওঠে, রায় অবশ্য ভালো করে দেখেশুনে, বিচার করেই দেওয়া হবে, তবে চুরিতে তোর দু'হপ্তার বেশি জেল কিছুতেই হবে না।

ইঁদুরটা নাছোড়বান্দা। দু'পা এগিয়ে এসে হাত জোড় করে বলে, জেলের মেয়াদটা আর একটুখানি বাড়িয়ে দেওয়া যায় না? আর এ...কটুখানি?

—কি আশ্চর্য! কুমু এবার রেগে যায়, আইনে আমার হাত-পা বাঁধা, বুঝিসনে কেন?

কুমুর কথা শুনে ইঁদুরটার দুচোখ করুণ হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে পিছু ফেরে সে। দরজার দিকে পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে আত্মস্থ গলায় বলে, দু'হপ্তা জেল খাটিয়েই তো ছেড়ে দেবে আমাকে। তারপর দিনগুলো যে কী করে কাটবে আমার! এক পেট ক্ষিদে নিয়ে কতো দিন যে ভালো থাকতে পারবো! ক্লান্তপায়ে হেঁটে গিয়ে ইঁদুরটা আবার ঢুকে পড়ে ঝুড়ির মধ্যে।

আচমকা কুমুর ঘুমটা ভেঙে যায়।

শেষ রাতে ইঁদুরটার জন্য একটা সহানুভূতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল কুমু। আচমকা ঘুম ভাঙতেই দেখতে পায়, বিছানার ওপর নরম রোদ্দুর। চটপট বিছানা থেকে নেমে আসে সে। মুখহাত ধুয়ে সোজা চলে যায় আসামী ইঁদুরটার কাছে।

বারান্দার কোণের দিকটাতে ঝুড়িঢাকা ছিল ইঁদুরটা। কাছাকাছি পৌঁছে ঝুড়ির দিকে নজর পড়তেই সহসা আর্তনাদ করে ওঠে কুমু।

—বাপী, ও বাপী ...। বলেই অতর্কিতে ডুকুরে কেঁদে ওঠে। মেয়ের কান্নাকাটিতে বিষ্ণুপ্রিয়-গীতালি তড়িঘড়ি ছুটে আসেন।

কুমু দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। বিষ্ণুপ্রিয়কে সামনে পেয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে।

বিষ্ণুপ্রিয় দেখলেন পুরো দৃশ্যটা।

বারান্দার কোণে ঝুড়িটা ওলটানো। মেঝের ওপর ছোপছোপ রক্তের দাগ। এবং অল্প দূরে জিমির সামনে দু' থাবার মধ্যিখানে ইঁদুরের রক্তাক্ত শরীরটা কাঠ হয়ে গিয়েছে।

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা বোধগম্য হয় বিষ্ণুপ্রিয়র। ওঁরা ভাবছিলেন না জানি কী ঘটলো এই সাত সকালে।

মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে চুমু খান বিষ্ণুপ্রিয়। বলেন, ভালোই তো হয়েছে মা। ওরা মাকে বড্ড জ্বালায়। মায়ের ভাঁড়ারে ঢুকে ...।

—কিন্তু বিচার করার আগেই মেরে ফেললো যে? বাবার কথার মাঝখানে বলে ওঠে কুমু।

—ইঁদুরের আবার বিচার কি মা? বিষ্ণুপ্রিয় ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, ইঁদুর কি আর মানুষ? আদালতে কেবল মানুষেরই বিচার হয় মা। ছিঃ, শুধু শুধু কাঁদে না।

সে কথায় কুমুর কান্নাটা সহসা বেড়ে যায়। বলে, কিন্তু আমি যে ওকে কথা দিয়েছিলাম, ভালো করে বিচার না করে কোনও সাজা দোব না। বলতে বলতে কুমুর চোখে মুখে রাজ্যের আক্ষেপ জমে ওঠে।

বিষ্ণুপ্রিয় স্নেহের হাসি হাসেন। বলেন, ইঁদুর যখন ধরা পড়েছে, ওকে তো মারতেই হতো মা। তুমি তো সেই হুকুমই দিতে শেষ অবধি। একটু আগেই না হয় ...।

বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে কুমু। চোখের কোণে বিস্ময় বেড়ে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয় স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করেন। কুমুর কচি মুখখানার দিকে বুঝি তাকিয়ে থাকতে পারেন না। মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন পলকহীন।

ওদিকে মেঝের ওপর রক্তের ফোঁটাগুলো জমে গিয়ে কালচে পাথর হতে থাকে।

কুমুর বাগান

১.

—'কুমু, এই কুমু। উহ্। মাঝে মাঝে কোথায় যে যায় মেয়েটা! এই, কুমুকে দেখেছো?'

—'নাহ্। তোমার কুমুকে চব্বিশ ঘন্টা চোখে চোখে রাখবার সময় নেই আমার। আমার ঘর-সংসার আছে।'

—'উহ্। গতকালের 'শব্দজব্দ'টা এই মাত্তর মিললো। ঠিক এই সময়ে কোথায় যে গেল মেয়েটা?'

—'দ্যাখো গে, বাগানে গিয়ে বসে রয়েছে কি না।'

শুনেই বিষ্ণুপ্রিয় হন্তদন্ত হয়ে বাগানের দিকে পা বাড়ালেন।

কুমু বাগানেই ছিল। বাবার গলা শুনে মুখ বাড়িয়ে হাসলো।

—'এই দ্যাখ্। কেমন মিলে গেছে 'শব্দজব্দটা।' বলতে বলতে বাবা ঢুকলেন বাগানে।

—'তার আগে দ্যাখো, কেমন খুলে গেছে সোনালী জিনিয়ার কুঁড়িটা।'

বিষ্ণুপ্রিয় বাগান করতে চিরদিনই ভালোবাসেন। ইদানিং কুমুর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে সেটা। আর, বাচ্চাদের মাথায় কোনও জিনিস ঢুকলে ওরা পাগলামীতে চিরকালই বড়দের হার মানায়। কারণ ওরা তো হিসেব কষে পাগলামী করতে জানে না।

হাকিমের চাকরিটা বড় নিরস। সারাদিন আইনের কচকচি। কোর্ট থেকে ফিরেই তাই বিষ্ণুপ্রিয় তিলমাত্র দেরী করেন না। সাততাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েন তাঁর স্বরচিত বাঁচন-ঘরে। সঙ্গো সারাক্ষণ থাকে কুমু।

বাগানে হরেক জাতের গাছ। গোলাপ, বেলি, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গন্ধরাজ, রঙ্গন। কতো বিচিত্র জাতের ক্যাকটাস্। দেখতে দেখতে কুমুর আর আনন্দ ধরে না। বাবা বলেন, 'সারা জীবনে একটা বাগানে যা শিখবার রয়েছে, দুনিয়ার কোনও ইস্কুল-কলেজে তা নেই। বাগান হলো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটা পাসপোর্ট-সাইজ ফটোগ্রাফ। আর জানো তো—?' বিষ্ণুপ্রিয় গলায় জোর এনে বলেন, 'নিয়মিত নিজের হাতে বাগান করলে দুরারোগ্য ব্যাধিও ভালো হয়ে যায়।'

বাগানের এক কোণে একখানা ছোট্ট ঘর। তার মধ্যে বাগান করবার তাবৎ সামগ্রী

মজুত রয়েছে। টব, মাটি, গোবর সার, খইল, পচাপাতার সার, ফ্লোরাভিটা এবং আরো হরেক জাতের গাছের খাবার। বিষ্ণুপ্রিয় কতো যে দামী দামী খাবারের প্যাকেট কিনে আনেন বাজার থেকে! গাছকে খাওয়াতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই বিষ্ণুপ্রিয়র।

বাগানে ফুলের বন্যা বয়ে যায় শীতকালেই। গোলাপ, ডালিয়া এবং চন্দ্রমল্লিকার ত্রিবেণীসংগম ঘটে তখন। শীত ফুরোলেই বাগান মোটামুটি ফাঁকা। আবার বর্ষাকালে জিনিয়া গোছের কিছু ফুল। সব মিলিয়ে চার কি পাঁচ মাস ভরভরন্ত ফোটে বাগানে। কিন্তু তাতে কি হয়? বিষ্ণুপ্রিয়র সারাবছরই বাগানে কাজ। বলেন, 'ফুল ফোটাতে হয় মরসুমে। বাগান করতে হয় সারাবছর। আর, জানো তো?' বলতে বলতে মমতায় ভিজে আসে বিষ্ণুপ্রিয়র মুখ। 'ওরা ভীষণ অভিমানী। যত্ন-আত্তিতে একটু অবজ্ঞা দেখলে এমন মুখখানি হাঁড়ি করে বসবে যে হাজার সাধ্যি-সাধনাযও আর হাসিটি ফুটবে না মুখে কিছুতেই।' কুমুর নরম গালটা টিপে দিয়েই বিষ্ণুপ্রিয় বলেন, 'ঠিক তোমার মতো।'

সারাবছর অতো বড় বাগান কি একা সামলানো যায়? বিষ্ণুপ্রিয় হাঁসফাঁস করেন। কুমু অবশ্যি ওঁকে যথাসম্ভব সাহয্য করে। কিন্তু কুমু তো ছোট। ও আর কতোখানিই বা সাহায্য করতে পারবে বাবাকে? বাবাকে মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে উঠতে দেখে মনে মনে কষ্ট পায় কুমু।

বলে, 'একটা লোক রাখো না বাপী। তুমি দেখিয়ে দেবে, ও করবে।'

গোলাপের গোড়াটা উস্‌কে দিতে দিতে বিষ্ণুপ্রিয় হাসেন। বলেন, 'বললাম যে, ওরা দারুণ অভিমানী। অন্যের হাতে ওরা খাবেই না। ঠিক তোমার মতো। ফুলের কমন্ শ্লোগান কি জানো তো মা? 'য়্যু হ্যাভ্ টাচড্ মি, আই হ্যাভ্ গ্রোন্। তুমি আমাকে ছুঁয়েছো বলেই আমি ফুটেছি।'

বাগান করবার ফাঁকে কুমুকে গাছেদের হরেক বাতিক নিয়ে গল্প শোনান বিষ্ণুপ্রিয়। বাগান করবার খুঁটিনাটি এইভাবেই বাবার কাছে শিখছে কুমু।

২.

ফুলের পাশাপাশি যেমন কাঁটা থাকে, তেমনি সমস্ত সুখের পাশাপাশি এক অচেনা অসুখও বাস করে।

কুমুরও হযেছে তাই।

বাবাকে সে এ্যাতো ভালোবাসে। বাবা কত্তো ভালো! কি সুন্দর সুন্দর অভ্যেস তাঁর। কতো ভালো ভালো কথা বলেন। কুমুকে আদর করবার ভঙ্গিটাও কত গাঢ়। কিন্তু তাও বাবার প্রতি একটা চাপা অভিমান মাঝে মাঝেই জমে ওঠে ওর ছোট্ট বুপেক। দেবতুল্য মানুষটির বুকের মধ্যে কোথায় যেন বাস করে এক চিলতে নির্মমতা। কাঠিন্য। পেশায় হাকিম হলেও তাঁর ব্যবহারে সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়ে পক্ষপাতিত্ব। অবিচারের প্রবণতা। সংসারের সমস্ত ক্ষেত্রে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে কুমুর তাই মনে হয়।

এই যেমন বাগান করবাব বেলায়।

কতো সুন্দর সুন্দর টব এনে জড়ো করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়। কতো দামী দামী খাবার।

রঙ-বেরঙের লেবেল আঁটা সারের প্যাকেটে বাগানের কুঠরি বোঝাই। কিন্তু ঐ টব আর সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর 'কোলে-পিঠে'র ব্যাপার আছে। কোনও কোনও গাছ তাঁর কাছ থেকে পায় ষোল আনার জায়গায় বত্রিশ আনা আদর। কারুর কপালে জোটে শুধুই তাচ্ছিল্য আর অপমান।

এই যেমন চন্দ্রমল্লিকার বেলায়। আগষ্ট থেকে শুরু হোল এদের খিদ্‌মদ্‌গারি। সকাল সন্ধ্যে ওদের নিয়েই থাকেন বিষ্ণুপ্রিয়। দামী দামী খাবার দেন কিস্তিতে কিস্তিতে। ওদের কথা বলতে গেলেই মমতায় গলে যেতে থাকেন বিষ্ণুপ্রিয়। বলেন, 'একা এই চন্দ্রমল্লিকাই মানুষকে পাগল বানিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ওরা বেজায় পেটুক হয়। আর পেটুক লোকেরা একটু বোকাও হয় জানিস তো মা? ওরা নিজেদের পেটের মাপ বোঝে না। একসাথে অনেক খাবার দিলে ওরা গোগ্রাসে গিলে ফেলে। আর এটা তো মানিস, খাবারের চিন্তা না থাকলে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকে। মাথা খাটায় না মোটেই। জেনে রাখিস, দুনিয়ার সব 'ভোরাসিয়াস ইটার'রা হয় অকর্মন্যের ঢেঁকি এবং মাথামোটা। চন্দ্রমল্লিকারাও গাদা গাদা খেলেই মাথা মোটা হয়ে যায়। ঐ মাথায় তখন কুঁড়িও আসে না ফুলও ফোটে না।'

সেই কাবণেই, কুমু দেখে, চন্দ্রমল্লিকার জন্য সারাবছর ধরে দু'তিন ধরনের খাবার বানান বিষ্ণুপ্রিয়। কেনেন আরো দু'তিন রকমের। ছোট্ট খুরি থেকে বড় খুরি! তার থেকে ছোট টব। এইভাবে প্রায় তিন-চারবার চন্দ্রমল্লিকার টব পালটান তিনি। প্রতিটি টবে পরম যত্নে ভরে দেন সব দুর্লভ খাবার। এইভাবে, একবারে নয়, বারে বারে অল্প অল্প খাবার দিয়ে পুষ্ট করে তোলেন চন্দ্রমল্লিকার শরীর।

শুধু চন্দ্রমল্লিকাই নয়। গোলাপ-ডালিয়া-জিনিয়া, কিংবা প্যান্‌জী-এষ্টারের জন্যও তাঁর যত্নের সীমা-পরিসীমা নেই। সবার জন্য অঢেল খাদ্যেব বরাদ্দ। সবার জন্য পৃথক ধরনের যত্ন।

আবার ঐ বাগানেই কিছু কিছু গাছ আছে, যারা যত্ন তো দূরের কথা, এক চিলতে দামী খাবারের মুখই দেখতে পায় না।

এই যেমন, গাঁদা ফুলটা কুমুর কতো ভালো লাগে! কেমন চাপচাপ ফুলে হলুদ করে রাখে বাগান। কিন্তু ওগুলোর দিকে ফিরেও তাকান্ না বিষ্ণুপ্রিয়। কেবল শেষ বর্ষায় কিছু চারা এনে ফেলে দেন বাগানে। দু'একদিন ঐভাবে পড়েই থাকে। শেষে একদিন জমাদার রামু ওগুলোকে বাগানের পাঁচিল ঘেঁসে পুতে দেয়। ব্যস, পুঁতে দেবার পরই ওদের দিকে আর ফিরে তাকায় না কেউ। ওরা নিজেদের মতো করে বেড়ে ওঠে। কেবল বর্ষা শেষ হলে, ওদের জন্য এক মগ করে জল বরাদ্দ করেন বাবা। সেটাও দিনান্তে একবার ওপর থেকে ঢেলে দেয় রামুদা।

বাবার কাছে এ নিয়ে মৃদু অনুযোগ করেছে কুমু। বিষ্ণুপ্রিয় চুপটি করে শোনেন। মুচকি হাসেন।

বলেন, 'সব গাছকে যত্ন করবার সময় কই মা? তাছাড়া ওদের অতো যত্ন লাগে না। ওরা এমনিতেই ফুল ফোটায়।'

এটা কোনও কথা হলো? কুমুর গলা অভিমানে ধরে আসে। যে মানুষটা অফিসে হাজার জনের বিচার করে, দোষীদের সাজা দেয়, সে কি করে অমন অবিবেচকের মতো কথা বলে সেটা কুমুর মগজে ঢোকে না কিছুতেই। বিষ্ণুপ্রিয় স্নেহের হাসি হাসেন। বলেন, 'এ দুনিয়ায় কি সবাই সমান আদর পায় মা? ঐ দ্যাখো, কেউ ঐ অত্তো বড় বাড়িটায় থাকে। আবার দ্যাখো ঝুমকিরা ঐ বস্তির কুঁড়ে ঘরে থাকে। তুমি কেমন সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরে সেজেগুজে থাকো। রামুর মেয়ে টিক্‌লি কি ওরকম জামাকাপড় পায়? অমন সুন্দর সুন্দর খাবার খেতে পায়?'

বাগানের ছোট্ট চোহদ্দি থেকে ব্যাপারটাকে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিলে তার সাথে তাল রাখতে পারে না কুমু।

সে শুধু জেদী গলায় বলে, 'আমি ওসব কথা তেমন বুঝে উঠতে পারিনে। কিন্তু যে খাবার তোমার গোলাপা-ডালিয়া পাবে, একই বাগানে থেকে সেগুলো কেন পাবে না গাঁদা-দোপাটি-বেলিরা? তুমি সারাক্ষণ গোলাপ-ডালিয়াদের নিয়ে থাকবে। গাঁদা-বেলিদের দিকে কেন একটিবারও ফিরে তাকাবে না? বলো?

কুমুর মধ্যে দিন দিন অভিমান জমতে থাকে। বাবার প্রতি দ্বেষ। সে অনুভূতি ক্রমশঃ গাঢ় হতে থাকে।

৩.

'শব্দ জব্দ' মেলাবার আনন্দেই মশগুল ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়। কুমুর কথায় ফিরে তাকালেন জিনিয়াটার দিকে। উজ্জ্বল সোনালী রঙের বিশাল ফুল। বহু মেহনত করে চারাটা বাঁচিয়েছিলেন। ফলটা ফলেছে হাতেনাতে। এই নিয়ে চারটা ফুল ফোটালো গাছটা। ফুল তো নয়, এক একটি রাজপুত্তুর! থাকেও একনাগাড়ে প্রায় দু'হপ্তা!

ফুলটা দেখে নিয়ে ফের শব্দজব্দ'তে ফিরে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়। বললেন, 'এই ১৫-র 'পাশাপাশিটা 'সোনার' না করে 'সোনালী করলেই মিলে যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। 'লী' দিয়ে ওপাশে 'লীলা' হচ্ছে। এদিকে 'সো' দিয়ে 'সোমবার'। কিন্তু একি!' বলতে বলতে পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি! কুমুর ছোট্ট মুখখানা ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে লাগলো।

দিনকয়েক আগে বাগানে বসে চন্দ্রমল্লিকার কাটিং করছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়। আচমকা কুমু এসে টানতে লাগলো ওকে।

'বাপী, চলো। একটা দারুণ জিনিস দেখাবো তোমায়।'

বিষ্ণুপ্রিয় কুমুর পিছু পিছু এসে দেখলেন, পাঁচিলের ধারে ধারে গাঁদা গাছ উঠেছে অজস্র। গেল-বছর ঐ জায়গাগুলোয় গাঁদার গাছ ছিল। ফুলগুলো শুকিয়ে ঝরে পড়েছিল মাটিতে। সারা গ্রীষ্মকাল বোঝা যায় নি। বর্ষাটি পড়তেই অজস্র চারায় ভরে গিয়েছে পাঁচিলের ধারগুলো। বর্ষার সাথে দোল খেতে খেতে তারা লকলকিয়ে বেড়েছে।

দেখতে দেখেতে কুমুর উচ্ছ্বাস আর বাগ মানে না।

বলে, 'দ্যাখো বাবা, কেমন সুন্দর হয়েছে এগুলো!'

বিষ্ণুপ্রিয় মৃদু মৃদু হাসেন। কুমুর কচি হাতের বাঁধন থেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নেন হাত। কুমু ততই জড়িয়ে ধরে থাকে বাবার হাত।

বিষ্ণুপ্রিয় বলেন, 'ছাড়ো। চন্দ্রমল্লিকার কাটিংগুলো বালিতে পুঁতি দিই। শুকিয়ে যাবে।'

'না—।' বাবার হাতখানা আরো চেপে রাখে কুমু। আদুরে গলায় বলে, 'তুমি দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে এদের। অনেকক্ষণ।' শুনে বিষ্ণুপ্রিয় অনেকক্ষণ হেসেছিলেন সেদিন।

আজ পাঁচিলের ধারে গাঁদা গাছগুলোর পাশাপাশি গিয়ে সহসা গম্ভীর হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়র সদাপ্রসন্ন মুখ। পিছু ফিরে কুমুকে একপ্রস্থ দেখলেন তিনি।

কুমু চোরের মতো লক্ষ করছিল বাবাকে।

বিষ্ণুপ্রিয় থমথমে গলায় বললেন, 'সমস্ত প্যাকেটের সার এনে গাঁদা গাছের তলায় ঢেলেছো? ভোর থেকে বাগানে এসে এইসব করা হয়েছে তবে?'

কুমুর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। বাবার এমন গম্ভীর মুখ সে আগে দেখেনি কখনো। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয় মেয়ের মাথার হাত রাখেন সস্নেহে। 'পাগলী মেয়ে!'

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কুমুর মুখ। বললো, তুমি দেখে নিয়ো বাপী, এবারে দারুণ ফুল ফোটাবে এরা।'

বিষ্ণুপ্রিয় হাসেন। বলেন, 'তাই বুঝি? কিন্তু এযে রাশি রাশি চারা বেরিয়েছে! এগুলো বেড়ে তো জংগল হয়ে যাবে দু'দিনে। সাপের বাসা হবে। কিছু গাছ তুলে ফেলে দেওয়া দরকার।'

বাবার কথায় চমকে ওঠে কুমু। 'তুলে দেবে? এমন লকলকে গাছগুলোকে?' বাপী মাঝে মাঝে এমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলে! কই, অনেক চারা হয়ে গিয়েছে বলে তো কিছু চন্দ্রমল্লিকা আর ডালিয়ার চারা তুলে ফেলে দেয় না বাবা! শুধু গাঁদার বেলায় তাঁর দুয়োরানীভাব! গাঁদাগুলো যেন বাপীর দু'চক্ষের বিষ!

বিষ্ণুপ্রিয় হাঁক পাড়লেন রামুকে।

বললেন, 'কুমুর বাগানটা একটু সাফ করে দিও তো। গাঁদা গাছগুলোর মধ্যে বড় বড়গুলো রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলে দিও।'

বাপী গম্ভীর হয়ে কিছু বললে কুমুর ভারি ভয় করে। তখন আর বেয়াড়াপনা করতে সাহস হয় না। বহু কষ্টে চোখের জল চেপে বাগান থেকে বেরিয়ে আসে কুমু।

৪.

'মামার বাড়ি থেকে ফিরে তোমার মেয়ের মুখ যে গোমড়া হয়ে রয়েছে।' রাতে বিছানায় শুয়ে গীতালী বলেন!

'কেন?' বইয়ের পাতা থেকে মুখ তোলেন বিষ্ণুপ্রিয়।

'গেল শুক্কুরবার রামু ওর গাঁদাগাছ উপড়ে ফেলে দিয়েছিল। তুমিই নাকি বলেছিলে? তাই শুনে মেয়ে চোখ মুছতে মুছতে গেল মামার সাথে। রাস্তায় যেতে যেতে নাকি বলেছে, বাপী ভীষণ খারাপ। মায়া-দয়া নেই ওর বুকে। আরো কত কি।

আজ ফিরে এসেই বাগানে যাবার জন্য বায়না ধরছিল। আমি বারণ করেছি। বলেছি, অত রাতে বাগানে যেতে হয় না। কাল সকালে যেও। শুনে গোমড়া মুখে বিছানা নিয়েছে মেয়ে।'

শুনতে শুনতে বিষ্ণুপ্রিয়র মনটা ভিজে আসে।

বলেন, 'বড় নরম মনের মেয়ে! কারুর দুঃখ সইতে পারে না। তা সে মানুষই হোক আর গাছ-পাথরই হোক।'

নিজের ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে চুপটি করে শুয়েছিল কুমু। মন পড়েছিল বাগানে। ভাবছিল ওর প্রিয় গাঁদাগাছগুলোর কথা। বাপীর হুকুমে রামুদা কত্তো যে গাঁদাগাছ উপড়ে দিয়েছে, তার হয়তো ইয়ত্তা নেই। ইস্ গাছগুলোর কি কষ্ট! এতোদিনে নিশ্চয়ই পাঁচিলের ওপারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওরা। মরবার সময় হয়তো কুমুকে মনে মনে কতো খুঁজেছে। কুমুর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। নিদারুণ আফশোষে বুকটা ভরে যায়। নিজেকে দোষী দোষী লাগে। বেশ ছিল ওরা। সবার অনাদরে শুধু মাটি থেকে রস টেনে নিজের মতো করে বাড়ছিল। কুমুই বেশি সোহাগ দেখাতে গিয়ে বাবার দামী সারগুলো ছড়ালো ওদের গোড়ায়। বাবার বুঝি সেই কারণেই ভীষণ রাগ হোল কুমুর এবং গাছগুলোর ওপর! একটা অজুহাত তুলে বারোআনা গাছকে মৃত্যুদন্ড দিলেন তিনি। গাছগুলোর মৃত্যুর ব্যাপারে কুমু বারবার নিজেকে দোষ দেয়। বারবার তাই গলা থেকে কান্না উথলে ওঠে ওর।

নিহত গাছগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো কুমু।

খুব ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই কুমু ছুটে গেল বাইরে, দেখলো সামনের লনে পায়চারী করছেন বাপী। কুমুকে দেখে হাসলেন। কুমুর ঠোঁটদুটো অভিমানে কেঁপে কেঁপে ওঠে। পায়ে পায়ে বাগানের দিকে চলে যায় সে। বিষ্ণুপ্রিয় পেছন থেকে বলেন, 'কুমু, ভেজামাটিতে খালি পায়ে হেঁটো না। জুতো পরে যাও।'

কুমু বাবার কথায় ভ্রূক্ষেপও করে না। অভিমানটা সহসা গাঢ় হয়ে ওঠে।

পাঁচিলের ধার ঘেঁসে গাঁদাগাছেদের পাড়াটা বড় বেশি রকমের ফাঁকা লাগছে। প্রায় বারোআনা গাছই তুলে ফেলেছে রামুদা। কেবল মাঝে মাঝে বেড়ে ওঠা বড় হৃষ্টপুষ্ট গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাটিতে বসে পড়ে কুমু। ফাঁকা জায়গাগুলোতে আলতো হাত বুলোতে থাকে।

কিন্তু গাছগুলো তুলে কোথায় ফেললো রামুদা? নিশ্চয় ডোবাটার পাড়ে। ওখানেই যত নোংরা-আবর্জনা, ঘাসপাতা, ছাঁটা ডালপালা ইত্যাদি ফেলা হয়। বাগানের বাইরে বেরিয়ে এলো কুমু। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগলো ডোবাটার দিকে।

ডোবাটার পাড়ে গিয়ে অবাক হয়ে গেল কুমু। দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো নিমেষে! পিছু ফিরে চেঁচাতে লাগলো সমানে, 'বাপী, ও বাপী, এসো একটিবার দেখে যাও।'

কুমুর ডাকাডাকিতে বিষ্ণুপ্রিয় পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন কুমুর পাশটিতে।

কুমু আনন্দে নাচতে নাচতে জড়িয়ে ধরলো বিষ্ণুপ্রিয়কে। আঙুল তুলে গাঁদা গাছগুলোকে দেখালো।

বিষ্ণুপ্রিয় দেখলেন।

ভিজে মাটিতে তিন-চারদিন পড়ে থাকবার দরুণ, ঐ মাটিতেই শেকড় চারিয়ে দিয়েছে গাঁদার চারাগুলো। সর্বাঙ্গে লালসার মতো শেকড় বেরিয়েছে অজস্র পোস্তদানার মতো। পাতাগুলো আর ঝিমিয়ে নেই। বর্ষার জল আর ভিজে মাটি পেয়ে বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। এবং শরীরের অর্ধেকখানা মাটিতে শুইয়ে, বাকি অর্ধেকখানা দিয়ে উঠে বসেছে গাছগুলো।

বিষ্ণুপ্রিয় নির্নিমেষ দেখলেন গাছগুলোকে।

কুমু বললো, 'দেখেছো বাবা, ওদের বাঁচবার কি প্রচন্ড ইচ্ছে। ওরা আমাদের ছেড়ে যেতে চায় না কোথাও। ওরা আমাদের ভালোবাসে বাবা। আমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। অথচ—। বলতে বলতে বিষ্ণুপ্রিয়র দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকায় কুমু, 'অথচ তুমি ওদের একটুও যত্ন কর না। ওদের এক চিলতে সার দিতে তোমার যেন বুকে বাজে।'

মেয়ের অভিমান দেখে ম্লান হাসেন বিষ্ণুপ্রিয়।

মৃদু গলায় বলেন, 'এইজন্যই তো এরা আদরযত্ন পায় না মা। ভালো খাবার দাবারও পায় না। তুই তো নিজের চোখেই দেখলি সব।'

'কোন্‌টা বাপী?'

'ঐ যে—।' ভারী চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বিষ্ণুপ্রিয় বলেন, 'মাথা উঁচু করে বাঁচতে হলে মরতে জানাও চাই যে। ওরা যে কিছুতেই মরতে জানে না, মা।'

সুখপাখি

১.

এতক্ষণ কারেন্ট ছিল না। এইমাত্র এল। পাখাটা ফুল স্পিডে ঘুরতেই বুকের ওপর ঝমঝমিয়ে হাওয়া বর্ষণ। অর্পিতা চিৎ হয়ে শুয়েছিল, খাটের ওপর। দেওয়াল ঘড়িতে ছ-টা বাজল। একটু আগেই গা ধুয়েছে। পাটভাঙা শাড়ি পরেছে। সুদীপের ফেরার সময় হল। এমনিতেই সাতটা নাগাদ ফেরে। আজ জলদি ফিরতে বলেছে অর্পিতা। যদি সওয়া ছ-টা নাগাদও ফেরে, চান করে পোশাক পরে, জল খাবার খেতে বড়জোর আধ ঘন্টা। তার মধ্যেই অর্পিতা হালকা প্রসাধানটুকু সেরে নেবে, পরে নেবে বাইরে বেরোবার শাড়ি। বের করেই রেখেছে। সাজগোজ করতে দু-জনের কেউই বেশি সময় নেয় না, এটাই বাঁচোয়া। কাজেই আরও একটুক্ষণ আয়েস করে শুয়ে থাকা যায় বর্ষণমুখর হাওয়ার তলায় শরীরখানা পেতে দিয়ে।

ঠিক এমনি মুহূর্তে মনে পড়ে একখানা বাগানের কথা।

অর্পিতার মনের গূঢ়তম ইচ্ছে, একখানা অভিনব বাগান করে। যদি কোনদিন নিজেদের একখানা বাড়ি হয়, বাড়ির চারপাশে রাখবে খানিকটা খালি জায়গা। তাতে থাকবে অনেক অনেক গাছ, কোনও পরিচিত বংশমর্যাদাসম্পন্ন নয়, থাকবে কেবলমাত্র বুনো, নাম-না-জানা ফুল ও লতার গাছ। থাকবে কুরচি, শ্যামা, আটাঙ্গীলতা, বনশিউলি, কাঠ-মল্লিকা, আরও অনেক গাছ, যাদের দেখা মেলে কেবল বনে, জঙ্গলে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির বুকে। তাদের নাম-ধাম জানে না কেউ সঠিক, তাদের খোঁজ মিলবে না কোনও নার্শারিতে কিংবা ফুলচাষের কোনও রঙ-চঙে বইতে। সামাজিক মানুষ কিংবা নাগরিক বাগানবিদরা যাদের কোনও খোঁজই রাখে না। একটা কুসুম গাছ লাগাবে সামনের উঠোনে। কুসুম গাছের কচি পাতায় সারা গাছখানা কেমন আগুনের মতো জ্বলতে থাকে! এসব ইচ্ছের কথা সে শুধু একান্তে বলতে পারে সুদীপকে। সুদীপ ছাড়া কে-ই বা কদর করবে তার ওই বুনো ইচ্ছেগুলোর! আজীবন শান্তিনিকেতনে লালিতা অর্পিতা, বিয়ের সময় ভয় ছিল, স্বামী যদি নেহাতই কাঠ-কাঠ বেরসিক হয়; যে গাছ বোঝে না, ফুল বোঝে না, ছবি, গান, কবিতা কিংবা ফুল সাজানো, কিছুই বোঝে না। মেঘ-বৃষ্টি-চাঁদ বোঝে না, রামধনুর সাতটা রঙ আলাদা করে চেনে না, সে শুধু বোঝে আহার, নিদ্রা, মৈথুন, চাকরি-বাকরি, প্রমোশন, শিং নাড়ানো গুঁতোগুঁতি; সে যদি হয় শুধুই পেটুক, তাসুড়ে আর পরচর্চায় ওস্তাদ ব্যক্তি; তার পৌরুষ বলতে যদি

বোঝায় কেবল ঘরনীর ওপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপন ; সে যদি কেবল ওপরওয়ালার কাছে কথা-পাচার করাটাকেই বুদ্ধিমত্তা বলে ভাবে, আর মক্কেলের ঘাড়ে চেপে অন্যের পুকুরে ছিপ ফেলেই সুখ পায়! এসব ভয়ের জন্ম হয়েছিল সুনেত্রাদি-কে দেখে।

সুনেত্রাদি, কী সুন্দর সেতার বাজাতো এককালে, বিয়ে হল ফুড কর্পোরেশনের এক ইন্সপেক্টরের সঙ্গে, যে নাকি দিনরাত কেবল রাইসমিলে ধান আর চালের গুণাগুণ পরীক্ষা করে বেড়ায়, আর হাজার হাজার চটের বস্তার হিসেব রাখে। শুনলেই গা গুলোতো অর্পিতার। সুনেত্রাদিকে দু-দিনেই সেতার ছাড়িয়েছিল ভদ্রলোক। সুনেত্রাদি নাকি বিকেলে রেওয়াজের সময়টা খরচ করত খাটাল থেকে খাঁটি দুধ নিয়ে আসার কাজে। ভয়টা পাকা রঙ ধরছিল এই কারণে যে সুদীপ নামক তার হবু বরটি ছিল একটা সরকারি কনস্ট্রাকশন দপ্তরের অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং সে বিয়েতে যৌতুকজাতীয় কিছুই নেবে না জানিয়েছিল, কারণ, তার নাকি শ্বশুরের কাছ থেকে হাত পেতে নেবার মতো অভাব হয়নি এখনও। এটা আত্মমর্যাদা হতে পারে, দেমাকও হতে পারে, টাকার দেমাক। কনস্ট্রাকশন দপ্তরের অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর পদটি তো এমনিতেই রুপোর রঙে উজ্জ্বল এবং দুর্নামের কালিতে মলিন। পিসেমশাই, এককালের ঝানু কন্ট্রাক্টর, বলেছিলেন, ও দপ্তরে, বুঝলি অপু, টাকা ওড়ে। ইঞ্জিনিয়ার থেকে পিয়ন অবধি সারাক্ষণ কুড়োচ্ছে। টাকার ওপর শুয়ে থাকবি তুই। অর্পিতা যত শোনে, ততই শুকিয়ে আধখানা হয়ে যায়। তবে কি ওরও সুনেত্রাদির দশা হবে! সরকারি কনস্ট্রাকশন দপ্তরের এক হিসাবপটু কেরানির পাল্লায় পড়ে তবে কি শান্তিনিকেতনকে এ জন্মের মতো বিদায় জানাতে হবে! পিসেমশাইকেও তো সে দেখছে আজীবনকাল। টাকার কুমীর হলেও লোকটা ইট-কাঠ-পাথর ছাড়া কিছুই বোঝে না। বিয়ের পর, এসব ভয় যখন কেটে গেল, এবং অর্পিতা যখন নিশ্চিত হল, সুদীপ এক সম্পূর্ণ অন্য জাতের মানুষ, তার জীবন ও জীবিকা একাকার নয়, তখন অর্পিতার যেন আনন্দ আর ধরে না। শিল্প-সংস্কৃতির কোনও বিশেষ শাখায় যে সুদীপ খুব পারদর্শী, তা নয়। কিন্তু অর্পিতা নিরন্তর টের পায়, মানুষটার বুকের মধ্যে একটি ঝোর আছে। কবিতা পড়ে, আবৃত্তি করে অনভ্যস্ত গলায়, গান শোনে, নাটক দেখে, যা কিছু সুবিন্যস্ত, শৈল্পিক, চোখ খুলে দেখতে জানে, হাসতে পারে প্রাণখোলা, আর বনে-জঙ্গালে, আদাড়ে-বাদাড়ে অর্পিতাকে নিয়ে টো-টো করে বেড়াতে ভালবাসে। একটি শিক্ষিত, সৎ, রুচিবান মানুষ বাস করে ওর মধ্যে যে কিনা গতানুগতিক সময়গুলোকে জারিয়ে রাখতে জানে বিচিত্র রসে, আর সর্বদাই কামনা করে অর্পিতার অকুন্ঠ সান্নিধ্য। দীপিকা, মল্লিকা, সুদীপের শালীরা, ওই নিয়ে কতই না খোঁটা দেয় সুদীপকে, 'দিদির আঁচলে বাঁধা মানিক' বলে ক্ষেপায়, সুদীপ গা করে না, বদলায় না। অর্পিতা বাগান করলে, সে সবকিছু জোগাড় করে এনে দেয়, পাশ থেকে সাহায্য করে যথাসাধ্য, আর অর্পিতার হাতের ছোঁয়ায় গাছগুলি কচি পাতা ছাড়লে, কুঁড়িগুলো মুখ দেখালে অবাক চোখে ওদের দেখতে থাকে। জঙ্গালের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে অর্পিতা যেদিন একখানা শুকনো ডালের মধ্যে আবিষ্কার করে বসল এক ছুটন্ত সৈনিককে, সেদিন সুদীপের সারা মুখে খুশির অন্ত ছিল না।

সামান্য সময় পেলেই ওরা দুটিতে খোলা ছাদে বসিয়ে দিত গান-বাজনা, আবৃত্তির আসর। কত নতুন নতুন গান যে ফরমায়েশ করে বসত মানুষটা, অর্পিতা লজ্জায় লাল! আর, গলা ফাটিয়ে আবৃত্তি করত দেবতার গ্রাস, কিংবা আঠারো বছর বয়স যে দুঃসহ ... ...। বাসে চড়ে, পাশাপাশি সিটে বসে, চলে যেত কলকাতায়, ফ্লাওয়ার-শো দেখতে, বইমেলায় 'ইকেবানা'র বই খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত, বসে পড়ত সবুজ ঘাসে পাশাপাশি। আর, সেই দিনগুলোতে বারবার মনে হত, সুনেত্রাদির সঙ্গে একবারটি দেখা হয়ে যাক, অনেকদিন দেখা নেই ওর। ছুটির দিনে যখন সকাল সকাল চান সেরে নিয়ে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ত ওরা, তখন অধিকাংশ দিনই চুল আঁচড়াতে ভুলে যেত সুদীপ। অর্পিতাই শেষ মুহূর্তে লক্ষ করত তা। ওদের ব্যাগে থাকত শুকনো খাবার, জল, ক্যামেরা এবং ছুরি-কাঁচি জাতীয় সরঞ্জাম এবং একখানা ঢাউস ব্যাগ, তাতে ফিরতি পথে ভরে আনত শুকনো ফুল, ডালপালা, সুদৃশ্য পাথর, ঘাসের শীষ, এক কথায় ঘর সাজাবার তাবত কাঁচামাল, যা জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে, মনে হত, কাজে লাগবে অর্পিতার। জঙ্গলটা ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। দ্বারকেশ্বর নদীর পাড় বরাবর অনেকখানি হেঁটে গেলে, একেবারে সেই বাঁকুড়া-খাতড়া বাসরাস্তার কাছাকাছি।

যাবার সময় যা হোক, ফেরার বেলায় খুবই কষ্ট হত, বিশেষ করে অর্পিতার। পা টনটন করত, মাথা ঝিমঝিম, তখন খিদে পেত, তেষ্টা পেত, এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে দাপাদাপির সুবাদে শরীর জুড়ে অবসাদ নামত, আর যতই কম বোঝা থাক, কাঁচামালের ঢাউস ব্যাগখানা সুদীপ নিলে, অর্পিতাকে ক্যামেরা, টিফিন ক্যারিয়ার, ওয়ারটার-বটল ইত্যাদি নিতেই হত। এমনিতে হয়তো বা তেমন কিছু ভারী নয় বস্তুগুলো, কিন্তু ওই মুহূর্তে, ওই অতখানি বেলায়, ওই অবসন্ন শরীরে, ঐগুলোকেই মনে হত বিশমণ ভারী। তখন তো নিজের পা'দুটোকেই দু'মণ ভারী লাগত। তেমনি এক মুহূর্তে, একদিন কথাটা তুলেছিল অর্পিতা। আর তাতেই একদিন দরজার সামনে এক লাল ঘোড়া এসে হাজির। সত্যি কথা বলতে কী, অর্পিতা একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিল, যাকে বলে বোবা। এমন করেও মানুষের কথাকে গুরুত্ব দেয় মানুষ! লাল ঘোড়ার জন্য যত নয়, এটার জন্যই আরও বেশি করে আনন্দের বান ডেকেছিল বুকের মধ্যে। আর তখনই মনে পড়েছিল সুনেত্রাদিকে। অনেকদিন দেখা হয়নি। মুখে অবশ্যি ঈষৎ রোষ ফুটিয়ে বলেছিল, আমি বললাম, আর তুমি কিনে আনলে? কী মানুষ রে বাবা! আক্কেলটা হবে কবে। এমন বাউণ্ডুলে মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

সেই থেকে খুব ঘুরে বেড়াত ওরা, আরও অনেক অনেক ঘুরে বেড়াত ওদের লাল ঘোড়ায় চড়ে। আজও একটু বাদে 'শাপমোচন' দেখতে যাবে ওতেই চড়ে। মিনিট দশেক লাগবে। ভাবতে ভাবতে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়েই আঁতকে ওঠে অর্পিতা, মাই গড্! সওয়া ছ-টা। এখনও আসছে না কেন? ও তো এমন দেরি করে না। এখনও না এলে আমাদের পৌঁছতে যে দেরি হয়ে যাবে! আর, 'শাপমোচন'—এর মতো নৃত্যনাট্য একেবারে প্রথম থেকে না দেখতে পেলে, দেখবেই না অর্পিতা। ভাবতে ভাবতে অর্পিতা ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে।

২.

ইদানীং ফিরতি পথে হাঁফাতে হাঁফতে প্রায়ই কথাটা বলত অপির্তা, শহর থেকে জঙ্গালটা বেশ দূরে।

—হ্যাঁ। জঙ্গাল ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। খুব আন্তরিক গলায় নিজের প্রতিক্রিয়া জানাত সুদীপ, একদিন আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

—আসলে যেতে আসতে এতখানি সময় চলে যায়।

—তা ঠিক। যাতায়াতে ঘন্টাখানেক তো লাগেই।

—ইদানিং এই হাঁটাহাঁটির কথা ভাবলেই আমাব জঙ্গালে বেড়াবার আনন্দটাই উবে যায়।

সুদীপ আর কী জবাব দেবে এ কথার! কষ্ট তো ওরও হয়।

আর ঠিক সেই রকমের এক পরিস্থিতিতে অর্পিতা একদিন হঠাৎই পেড়েছিল কথাটা, একখানা মোটর বাইক কিনলে বেশ হত। অনেক দূরের জঙ্গালেও অনেক কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যেত। আরও অনেক বেশি বেশি ডাল-পালা-ফুল বয়ে আনা যেত। অর্পিতার কথায় যুক্তি আছে অবশ্যই, কিন্তু সঙ্গাতির প্রশ্নে সুদীপকে চুপ করে যেতে হয়। শুধু মিনমিনে গলায় বলে, হবে একদিন, হয়ে যাবে, সুযোগ মতো, কিছু জমাই-টমাই, এই তো চাকরি... ...।

এক মাসের মধ্যে কথাটা বার তিনেক বলে অর্পিতা। তারপর, একদিন দীপ্তেশ আর ওর বউ বেড়াতে আসে, লাল টুকটুকে বুলেটে চড়ে। গল্পগুজব করে হুশ করে ধুঁযো উড়িয়ে চলে যায় ওরা। অর্পিতা ওদের চলে যাওয়াটা দেখে। বলে, আর নয়, এবার একখানা মোটর-বাইক কেনো। কেমন পিছলে বেরিয়ে গেল দুটিতে!

একদিন কন্ট্রক্টর নীলু ঘোষের একখানা বিল চেক করতে করতে সুদীপ অতিশয় নিরাসক্ত গলায় শুধোয়, আপনার মোটরবাইকখানার দাম কত?

—কেন? কিনবেন নাকি?

—নাহ্। এমনি শুধোলাম।

—বুলেট তো এখন আঠারো-উনিশের কমে পাবেন না। আমি কিনেছিলাম চোদ্দোয়। অবশ্য সেকেন্ড হ্যান্ড হলে অন্য কথা।

সেকেন্ড হ্যান্ডের দাম কত? বিল থেকে চোখ না সরিয়ে শুধোয় সুদীপ।

—কন্ডিশনের ওপর নির্ভর করে। বলতে বলতে স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়াতে থাকে নীলু ঘোষ, ভাল কন্ডিশনে একখানা সেকেন্ড-হ্যান্ড বিক্রি আছে। হাজার ন-এ হয়ে যাবে। বলেন তো খোঁজখবর নিই।

কিন্তু সেকেন্ড-হ্যান্ডের প্রশ্নে নাক সিঁটকায় অর্পিতা। গাল ফুলিয়ে বলে, কিনলে নতুনই কিনব।

সুদীপ দত্তর বুলেট কেনার ইচ্ছের কথাটা কন্ট্রাক্টরমহলে চাউর হয়ে যায় অচিরেই। অনেকেই খোঁজ-খবর আনে। প্রয়োজনে টাকা ধার দিতে চায়। সুদীপ এড়িয়ে

যায়। অথচ অর্পিতার ইচ্ছেটা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় তোলে। ওর তো কোনও দোষ নেই। পথ হাঁটতে কষ্ট তো হযই—বেচারির, বেড়ানোর আনন্দটা মাটি হওয়াটা স্বাভাবিক। তার ওপর দীপ্তেশজাতীয় সমশ্রেণীর লোকজনকে বউকে পেছনে বসিয়ে হুশ করে বেরিয়ে যেতে দেখলে বেচারির দীর্ঘশ্বাস তো পড়বেই। —সবাই কেমন পারে, আমরা পারি না কেন, হ্যাঁ গো?

এর জবাবে একদিন একটা নতুন বুলেট নিযেই ঘরে ফেরে সুদীপ। টকটকে লাল রঙ। পি-এফ থেকে হাজার চারেক লোন, বাকিটা ইনস্টলমেন্টে। নীলু ঘোষই জামিন থাকে। অর্পিতা ওটাকে অপত্যস্নেহে আদর করতে করতে খুশিতে ভেঙে পড়ে বারবার, আর তাই দেখে সুদীপের রোমশ বুকে চিরুনি চালানোর সুখকর অনুভূতি। ওরা ঘুরে বেড়ায়, ... আরও দূর দূর জঙ্গালে, কখনও বা দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরীর পাড় ধরে, শুশুনিয়া পাহাড়ে ... ...। আর, ঘর ভরে যায় লতা-পাতা, কাঠ-কুটো, শুকনো ফুল আর ঘাসের শীষে। শুধু মাঝে মাঝে সুদীপ বলে, এ তো এক সাদা হাতি ঢোকালাম ঘরে।

—কেন?

—পেট্রোল-মবিলের দাম জানো? একবার বেরোলেই পনেরো-বিশ টাকার ধাক্কা।

অর্পিতা মিষ্টি হাসে, নতুন নতুন অমন মনে হয়। ধীরে ধীরে ওটা গা-সওয়া হযে যাবে।

প্রথম মাসেই ধারশোধ বাবদ বেরিয়ে যায় শ-চারেক টাকা। সুদীপ বলে, এ মাসে সংসার চললে হয়।

অর্পিতা শুনেও শোনে না। বরং নতুন বাহন পেয়ে তার ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছেখানা দ্বিগুণ চাগিয়ে ওঠে। রোজই সন্ধেয বেরোতে চায় সে। তাতে খরচ আরও বেড়ে যায়। সুদীপ বিপন্ন বোধ করে। সেটা প্রকাশও করে ফেলে মাঝে মাঝে। অর্পিতা প্রথমটা গা করে না, হাসে, তারপর ক্ষুন্ন হয়, তারপর বিরক্ত, ক্রুদ্ধ, একদিন ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, তোমাদের চাকরি করা না করা সমান। একটা সামান্য বাড়তি খরচও সামলে উঠতে পারো না! চারপাশে তো সবাইকে দেখছি। কারও তো কিছুতেই কিছু আটকায় না। টিভি, ফ্রিজ, গ্যাস—সবই তো করছে মানুষে। তারাও তো তোমার মতোই চাকরি -বাকরি করে।

সুদীপ জবাব দেয় না, শুধু বিষন্ন মুখে শুনে যায় অর্পিতার অনুযোগ।

ইদানীং সুদীপের বাড়িতে নীলু ঘোষের আগমন ঘটছে ঘন ঘন। তারই সৌজন্যে ওদের বুলেট হয়েছে এটা জানার পর থেকেই অর্পিতা মানুষটার প্রতি মনে মনে প্রসন্ন। আপ্যায়ন করে বসায়। মিষ্টি হেসে কফির কাপ ধরে দেয়।

—বৌদির সময় কাটে কী করে? কফির কাপে চুমুক দিয়ে নীলু ঘোষ বলে, একটা টিভি কেনেন না কেন? কত সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম! হপ্তায়, দুপুর-সন্ধে মিলিয়ে, তিনটে সিনেমা।

—আপনার দাদাকে বলুন।

—দাদাকে বলে কী হবে? হুকুম করুন শুধু। বাড়িতে পৌঁছে যাবে। টাকা সুবিধে মতো দেবেন।

সুদীপ রাতের বেলায় একান্তে বলে, তুমি কি পাগল হলে! এক মোটর বাইকের টাকাই শোধ হল না এখনও!

অর্পিতার সারা মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমে।

৩.

মাত্র হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে যেদিন ঘরে আনা হল টিভিখানা, তার পরের দিনই নীলু ঘোষের একখানা বিল চেক করতে গিয়ে হিসেবে মারাত্মক ভুল দেখতে পায় সুদীপ। ভুলটা ধরলেই নীলু ঘোষের হাজার সাতেক টাকা কমে যায় এক ঝাঁকুনিতে।

সুদীপের কলম একটুক্ষণ থেমে থাকে। বিলটা দিন-দুয়েক ফেলে রাখে সে। তৃতীয় দিনে বিলটা কাটতে গিয়েই তার মনে হয়, মেজারমেন্ট বুক লিখেছেন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গগন বোস। তিনি টেকনিক্যাল ম্যান। তিনি যা লিখেছেন তার পুরোপুরি দায় তাঁরই। সুদীপ কেন খামোখা অনধিকার চর্চা করে ওতে কলম চালায়! সে তো নেহাতই কেরানি, মাছিমারা কেরানি। বিলের যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগটুকু ঠিকঠাক দেখে নিলেই তার পক্ষে যথেষ্ট: ক্রমশ যুক্তিটাকে তার অকাট্য মনে হতে থাকে এবং বিলটা সে ছেড়ে দেয়। পরের দিন নীলু ঘোষকে একান্তে পেয়ে মেজারমেন্ট বুক-এর ভুলখানা দেখায়। সুদীপ মুচকি হেসে বলে, ছেড়ে দিলাম।

আপনাদের জন্যই তো বেঁচে আছি দাদা। নীলু ঘোষ ক্লাসিক সিগারেটের প্যাকেট খুলে এগিয়ে দেয় সুদীপের দিকে, হ্যাঁ, আপনার টিভি কেমন সার্ভিস দিচ্ছে?

--ভালই তো।

—একখানা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগিয়ে নিন, টিভি ভাল থাকবে।

—দাম কত?

—খালি দাম-দাম করবেন না তো। নীলু ঘোষ আহত হয় খুবই,—চার-পাঁচশো নেবে, তার বেশি কি!

সন্ধেয় কোনও কোনও দিন আড্ডা বসে, ব্যাচেলার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পীযূষ বাগচীর কোয়ার্টারে। কন্ট্রাক্টররা কেউ কেউ আসে, গগন বোস, তাদের বটব্যালরাও ... ..., একটুখানি পানটান হয়... ..., ইদানীং কচিৎ-কদাচিৎ সুদীপও যায় ওখানে। এমন করে টানাহেঁচড়া করে ওরা, না করতে পারে না।

গেলাসে বার-দুই চুমুক মেরে নীলু ঘোষ আবার প্রসঙ্গটা তোলে, চার-পাঁচশো টাকার জন্য অত ভয় পাচ্ছেন কেন দাদা?

—কী যে বল, বড্ড টানাটানি চলছে এখন। বুলেট, টিভি... ..., এখন আর কিছুই কেনা সম্ভব নয়।

—কিনতে না চান, উপহার নিন। নীলু ঘোষ অবলীলাক্রমে ... ল ফেলে।

সুদীপের চোখমুখ সহসা কঠিন হয়ে ওঠে। দু-পাত্র পান করে নীলু ঘোষ আজ বেজায় মুডে রয়েছে। লালচে ঠোঁটে হাসে সে। বেশ আদুরে গলায় বলে, দুনিয়ার সব

কিছুই আপনি দাম দিয়ে কিনতে চান? চাল-ডাল-আটা-আনাজ থেকে ফ্রিজ, টিভি, বাপের স্নেহ, স্ত্রীর প্রেম, বন্ধুর ভালোবাসা, সব কিছুই? দুনিয়ার ক-টি মাত্তর বস্তু শুধু দাম দিয়ে কেনা যায়। তার বাইরে বিশাল এক বাজার রয়েছে স্যার, যার কোনও বস্তুই মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য নয়।

নীলু ঘোষের মুখে এমন দার্শনিক কথা শুনে মুখ তুলে তাকায় সুদীপ। মাঝেমধ্যে এমন আধা-রোমান্টিক, আধা-দার্শনিক কথাগুলি সাবলীলভাবে বলে ফেলে সে।

—আপনি কি বাংলার ছাত্র? একদিন শুধিয়েছিল অর্পিতা, না কি দর্শনের?

—আমার কথা ছাড়ুন বৌদি। ব্রিজ-কালভার্টের ঠিকাদার ছাড়া আমার আর বর্তমানে কোনও পরিচয়ই নেই।

ও চলে যাওয়ার পর অর্পিতা খুব সম্ভ্রম মেশানো গলায় বলেছিল, যাই বল, লোকটাকে আমার খুবই কালচার্‌ড মনে হয়।

ইদানীং বেড়াতে বেরিয়ে অর্পিতা বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। গাছ-গাছালিতে মন ছিল না, পাখি-পাখালে নজর ছিল না, কেমন যেন অস্থিরতা ওর চোখে-মুখে। বারবার তাড়া লাগাচ্ছিল সুদীপকে, এই, এবার চল, ফিরি।

কারণটা বোধগম্য হল দিনকয়েক বাদে। অর্পিতাই খোলসা করে বলে। আসলে মন পড়ে থাকে রান্নাঘরে। গিয়ে তো রান্না চড়াতে হবে। কুটনো কোটো, মশলা পেষো...হাজার ঝক্কি। যতই ফিরতে দেরি হবে, ততই ভোগান্তি। বলে, নুপুরদিদের কী মজা। দু-বেলার রান্না সেরে ভরে রেখে দেয় ফ্রিজে। কোনও ভাবনাই নেই ওদের। যতক্ষণ খুশি বেড়াও, যখন খুশি ফেরো। খাওয়ার আগে গরম করে নিলেই হল।

সুদীপ আড়চোখে তাকায় অর্পিতার দিকে। আশঙ্কায় দুরুদুরু বুক। বলে, আমাদেরও হয়ে যাবে, ভাবনা কোরো না। সুদীপের চোখে মুখে কোনও দুর্ভাবনা দেখেনি অর্পিতা। আসলে, এই ক-বছরে খুবই ম্যাচিওরড্ হয়েছে লোকটা। খুবই সাহসী। ঝক্কি নেবার ক্ষমতাও বেড়েছে। অনেক পরিণত হয়েছে চিবুকের ভাঁজ। দু-চার হাজার টাকার জন্য একেবারে হেদিয়ে পড়ে না ইদানীং। খুব একটা বন্ধু-পালন করতো না আগে, বড় একটা সামাজিক ছিল না সেঅর্থে। কেবল অর্পিতাকে নিয়ে অষ্টপ্রহর মশগুল ছিল। ইদানীং নিজেকে অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছু বন্ধুও হয়েছে ওর। মাঝে মাঝে আড্ডা মারে ওদের সঙ্গো, একটু আধটু পান-টান করে। তবে সীমা ছাড়ায় না কোনদিনও। অর্পিতা ওসব নিয়ে ভাবিত নয়, বরং মনে মনে খুশিই হয়। মানুষ-জনের সঙ্গো মেশা ভাল। তাতে মনের উদারতা বাড়ে। চোখের সামনে অনেক বন্ধ দৃষ্টি খুলে যায়। আপদে-বিপদে পাঁচজনের সাহায্য সহানুভূতিও সুলভ হয়। এমন মুখচোরা ভাবটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয় এ-যুগে, এমন ঘরকুনো স্বভাবটা। অর্পিতা তো নিজের চোখেই দেখছে, আগে সামান্য সমস্যায় কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ত মানুষটা, বিছানায় এপাশ ওপাশ করতো সারা রাত, এক ধরনের নাবালক অসহায়তা জড়িয়ে থাকত সারা মুখে। অথচ মেয়েরা তো একজন সাবালক পুরুষ খোঁজে সর্বার্থে। একটা শক্ত বাকলওয়ালা মহীরুহ বৃক্ষ। সেই সাবালক, আত্মবিশ্বাসী পুরুষটিকে আজকাল অর্পিতা লক্ষ করে সুদীপের মধ্যে, স্বস্তি জমে বুকে, নিরাপত্তাবোধও।

৪.

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে ছ-টা বাজল, আর সুদীপের বুলেটের গর্জন এসে থামল বাড়ির গেটে। মনে মনে একটুখানি অস্থির হয়ে উঠেছিল অর্পিতা, সুদীপকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। চটজলদি রান্নাঘরে ঢুকে জলখাবার সাজিয়ে ফেলে সে। সুদীপ ঝটপট চানের ঘরে ঢুকে যায়। জলখাবারের প্লেটখানা টেবিলে রেখে অর্পিতা খুব দ্রুতলয়ে বেরোবার পোশাক পরে নেয়, মুখে হাল্কা প্রাসাধন করে। কানের দুলজোড়া বদলে নেয়। শাড়ির সঙ্গে মানানসই টিপ পরে নেয় কপালে। ফাংশনের টিকিট দুখানা ড্রয়ার থেকে বের করে ভ্যানিটি ব্যাগে রাখে। তারপর খাটের ওপর গিয়ে বসে।

তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে সুদীপ। একটা অচেনা গানের সুর ভাঁজছিল বাথরুমে। বাইরে থেকে তার রেশ পাচ্ছিল অর্পিতা। সুরের শেষাংশ গলায় নিয়ে শোবার ঘরের দিকে হেঁটে যায় সুদীপ। ভেজা চুল থেকে গড়িয়ে পড়ে দু-চার ফোঁটা জল। অর্পিতা ধোয়া পাজামা-পাঞ্জাবি এগিয়ে দেয়। বলে, একটু জলদি কর গো। আর মিনিট পনেরো বাকি।

—কিসের বলো তো?

—সে-কি! অর্পিতা আহত গলায় বলে, তোমায় তখন বললাম না, শাপমোচন দেখতে যাব সন্ধেয় ... ...!

—ওহ্ হো! তাই তো! এক্কেবারেই মনে ছিল না।

অর্পিতার দৃষ্টিতে ক্ষোভ এবং অস্থিরতা জমছিল। সুদীপ আড়চোখে দেখে নেয় ওকে। পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বলে, ক-টায়, শো?

—সাতটায়। ওরা ঠিক সময়েই শুরু করে।

পাঞ্জাবিটা শরীরে গলিয়ে নিয়ে সুদীপ পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ড্রেসিং টেবিলের দিকে। মানুষপ্রমাণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব দ্রুতলয়ে চিরুনি চালাতে থাকে চুলে। পেছনে, পরিপাটি বিছানায় বসে অর্পিতা আয়নার মধ্যে সুদীপের প্রতিবিম্বটিকে দেখতে থাকে অপলক। বেশ গম্ভীর লাগছে সুদীপকে। কঠিন চোয়ালের চুড়োয় আলো পড়েছে। নাকের পাটা ঈষৎ স্ফীত। সব মিলিয়ে আরও অনেক পুরুষালী লাগছে ওর মুখখানি। বেশ পরিণত, আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন।

পাউডারের পাফটা বুকে, পিঠে, ঘাড়ে গলায় বুলিয়ে নেয় সুদীপ। ওর শরীর থেকে সুগন্ধি সাবানের সৌরভ ভেসে আসে।

অর্পিতা সৌরভটুকু গ্রহণ করতে করতে নিচু টেবিল থেকে খাবারের প্লেটখানা এনে ধরে দেয় ওর সুমুখে।

সুদীপ সামান্য অন্যমনস্ক ছিল বুঝি। অল্প চমকে হুঁশে ফেরে।

বলে, আমি কিছু খাব না, বুঝলে। আর শোনো, আজ আমাকে একটু ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তুমি একাই দেখে এসো আজ।

—কেন? অর্পিতা যেন আকাশ থেকে পড়ে, তুমি এখন কী করবে?

আমি—মানে আমার আজ—। সুদীপ সামান্য দ্বিধাগ্রস্থ হয়েও সামলে নেয়, আমাকে আজ একটু বেরোতে হচ্ছে। ফিরতে রাত হবে। তুমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো।

—কোথায় যাচ্ছ?

নীলু একটা পার্টি দিচ্ছে আজ। পাঞ্জাবির বোতামগুলো ঠিকঠাক লাগাতে থাকে সুদীপ, বড্ড ধরেছে ওরা। কিছুতেই না করা গেল না। তা ছাড়া—।

অর্পিতার মুখে কথা ছিল না। সে কেবল নিষ্পলক দেখছিল সুদীপকে।

—তাছাড়া—, একটা বড় কাজের টেন্ডার রয়েছে কাল। আজ সন্ধেয় তার ডিলটা ফাইনাল হবে। গগনদা, তারকদা সবাই থাকবে। না গেলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।

বলতে বলতে অর্পিতার দিকে পায়েপায়ে এগিয়ে যায় সুদীপ। একেবারে সামনেটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রাখে নির্ভুল নিশানায়। ওর শরীরের পুরুষালি গন্ধ আরও তীব্র হয়ে ঢোকে অর্পিতার নাকে। আড়চোখে অর্পিতাকে এক ঝলক দেখে নেয় সুদীপ।

খুব গাঢ় স্বরে বলে, আমি তো অনেকদিন ধরেই বুঝতে পারছি, একখানা ফ্রিজ না হলে বড্ড অসুবিধে হচ্ছে তোমার। কোথাও থেকে ফিরে এসে রান্না চড়ানো, কুটনো কোটা, মসলা পেষা—সত্যি, বড্ড ডিসগাস্টিং!

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সুদীপ। ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়াল ঘড়িটা শব্দ করে বেজে ওঠে। গুনে গুনে সাতবার। সাতখানি আওযাজ যেন হাতুড়ির সাতটি ঘা, অর্পিতার পাঁজরের মধ্যেখানে নির্ভুল আঘাত করে।

বহুদিন পরে আবার সুনেত্রাদিকে মনে পড়ে অর্পিতার।

নেশা

১.

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই স্মৃতির মধ্যে সুবর্ণরেখা।

গতকাল, উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায়, কালো ঘোমটায় ঢাকা সুবর্ণরেখা ছিল রহস্যময়ী। নদীর পাড় ধরে লাল ধুলো উড়িয়ে জীপটা ছুটছিল। হেড-লাইটের আলোয় রাস্তাটুকুই দৃশ্যমান ছিল। নদীটা শুয়েছিল অন্ধকারে। তখনো চাঁদ ওঠেনি। দোতালার একটা ঘরে তিমিববরণ শুয়েছিলেন রাতে। সকালে উঠে জান্‌লার ধারে দাঁড়াতেই নদীটাকে দেখা গেল। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গল। সামান্য ঢেউ-খেলানো সারবন্দী টিলা।

এখন শীতকাল। নদীর দু'ধারে অনেকখানি বালির চরা। মধ্যিখানে জলের ধারা। সূর্য উঠেছে খানিক আগে। নদীর চর রোদ্দুর মাখছে গায়ে। চিক্‌চিক করছে বালি। বালি, না কি সোনা? কতদূরে সোনা-ধোওয়া ঘাট!

ঘুম ভেঙেছে কনকনে শীতে আর রিনিঝিনি মলের আওয়াজে। এমন স্নিগ্ধ সুরভিত সকালে, শুধু নাম না জানা ফুলের গন্ধ আর পাখির মিষ্টি ডাক। রিনিঝিনি মলের আওয়াজটিকে প্রথমে কোনো এক অচেনা জাতের পাখির ডাক বলেই মনে হয়েছিল। ভুল ভাঙল জান্‌লায় এসে দাঁড়াতেই। উঠোন জুড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে এক কিশোরী। পরনে ডুরে শাড়ি। এলোমেলো বিনুনি। নুয়ে নুয়ে ঝাঁটপাট দিচ্ছে উঠোনে। মাঝে মাঝে বারান্দার দিকে তাকিয়ে ভেঙচাচ্ছে, কিল দেখাচ্ছে, আর কীসব কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ছে। বারান্দায় বসে বসে রঙ্গ করছে, অদৃশ্যচারীটি কে, এই সাতসকালে! কাল রাতে মেয়েটিকে দেখেননি তিমিরবরণ। ঠিকে-ঝি হতে পারে। সকাল-বিকেল আসে। ঠিকে-ঝি হলেও মেয়েটি বেশ। সারা শরীর জুড়ে একটা নিবিড় ছন্দ আছে! হীরে যেমনি নাড়াচাড়া করলেই ঝিলিক মারে, মেয়েটিরও হাঁটা চলায়, ঘাড় বাঁকানোয়, হেসে ওঠায়, প্রকাশ পাচ্ছে ঐ ছন্দ। গাঁয়ের পটভূমিতে কোনো ফিল্ম হলে, ভোলেভালা কিশোরী নায়িকার রোলে যা মানাবে না! এমন কাচভাঙা হাসি যদি একখানা দিতে পারে সেট-এ, কিংবা ঐ ভ্রূ-ভঙ্গি, গ্রীবাভঙ্গি, কিল দেখানো, এমন কি ঝাঁট দেবার ভঙ্গিটিও কি দারুণ! ফিরে গিয়েই সোমেশ্বরকে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ওর বাপটাকে শতখানেক টাকা আগাম দিয়ে, নিয়ে যাবে মেয়েটিকে। দু'দিনেই টালিগঞ্জ মাতিয়ে দেবে এই বুনো ফুল!

এটাই বেরিয়ে পড়বার সময়। এই কনকনে শীতের সকালে সারা গায়ে মিঠে

রোদ্দুর মাখতে মাখতে সুবর্ণরেখার ভিজে বালির ওপর হেঁটে বেড়ানো! তুষের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিমিরবরন। পরিচিত আশঙ্কাটা পলকের তরে ফণা তুলল। বেরোনো ঠিক হবে তো? যদি কেউ চিনে ফেলে? সর্বনাশ হয়ে যাবে তবে। সোমেশ্বর মাহাতো অবশ্যি সারাটা পথ আশ্বাস দিয়ে এসেছে, 'এ এমনই এক পাণ্ডব-বর্জিত জায়গা, আপনাকে কেউই চিনবে না স্যার।' তবুও ঝুঁকি নেননি তিমিরবরণ। বলেছিলেন, 'তুমি সন্ধে পেরিয়ে গাঁয়ে ঢোকো বলা যায় না...।' গতকাল সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ সোমেশ্বরের জিপ তিমিরবণকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে। এ বাড়ির পুরনো কেয়ার-টেকার কান্‌চারাম, বুড়োথুড়ো, চোখে দেখে কম। ডিমের ঝোল-ভাত খাসা খাইয়েছে রাতে। নদীর হিমেল বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে শরীর। কম্বলের তলায় আকণ্ঠ ডুবে নির্জন রাত্রির স্বাদ নিয়েছেন তিমিরবরণ। দূরবর্তী কোনো গ্রাম থেকে দ্রিমিদ্রিমি মাদলের আওয়াজ ভেসে আসছিল হাওয়ায়। শুনতে শুনতে তলিয়ে গেছেন ঘুমের অতলে। মদ লাগেনি, ক্যাম্পোজ লাগেনি। কেবল, যতক্ষণ ঘুম আসেনি, একটা ভাবনাই চরে বেড়াচ্ছিল মগজে। সকালবেলায় প্রথম নজরেই কেউ চিনে ফেলে যদি!

কাল রাতেরবেলায় ভাত খাচ্ছিলেন। হ্যারিকেনের নরম আলো যদ্দুর যায়, তার বাইরে নিকষ আঁধারের গাঢ় প্রলেপ।

—'তোমরা সিনেমা-টিনেমা দ্যাখ, কান্‌চারাম?'

কান্‌চারাম ক্ষয়া দাঁতে হাসে। বড় আদিম হাসি। নেশায় মজা চোখ।

বলে, 'কুঠিঘাটের ডাঙায় টকি বুসলো। প্রায় বিশ-বচ্ছর আগের কথা। কাপড়ের তাঁবু। চঙায় গান। রাজা হরিচ্চন্দ্র পালা। চ্যানাচুর ...র...র গ্রম্‌। উই একবার। ব্যস।

'সিনেমাহল নেই ধারেকাছে?'

'ধারেপাশে কুথা পাবেন উসব? সি-ই ঝাড়েকগ্রাম।'

'তোমাদের গাঁয়ের ছেলেরা যায়-টায় না?'

'কে যাবে বাবু, অদ্‌ধুরে টকি দেখতে? বলে খাটতে খাটতে কোমরের বাঁধন টুইট্যে যায়! সারা গাঁ-টাই মজুর খাইট্যে খায়।'

শুনতে শুনতে মুক্তির স্বাদ! বুক ভরে দম নেওয়া টাটকা বাতাস। সোমেশ্বর বোধ করি মিছে বলেনি। প্রকাশ পোদ্দার বলেছিলেন, 'সোমেশ্বরকে বিশ্বাস করা যায়। আমারই কর্মচারি তো। মিছে বলে পার পাবে না। যান, দেখে আসুন সোমেশ্বরের আদিম গ্রাম।'

'কিন্তু বিশ্বাস করা ভারি শক্ত যে। আমি দশ বছর আগে বর্ধমানের গাঁয়ে গেছি। চারপাশের গাঁ ঝেঁটিয়ে এসেছিল খবর পাওয়া মাত্র।'

পাশে দাঁড়িয়ে সোমেশ্বর মাহাতো হাসছিল। এঁরা দেখেননি তেমন গেরাম। যেখানে মানুষ পাহাড়ের কোলে আর জঙ্গালের ধারে প্রায় আদিম জীবন যাপন করে। যেখানে সূর্য ডুবলেই সাপের মতো রাত নামে। ভাত নয়, ওরা সেঁ-উ ঘাসের বীজ আর মহুয়া মিশিয়ে খায় বছরের ছ'মাস। নদী কিংবা ঝরণার জলে তেষ্টা মেটায়। জীবনে কাউকে কোনোদিনও চিঠি লেখেনি। চিঠি পায়নিও কারো।

'কিন্তু আপনি ফিরবেন কবে, প্রকাশ পোদ্দার শুধোন।

'পাক্কা পনের দিন বাদে।'

'বাপরে! একেবারে মরে যাব যে। আমার তিনখানা ছবির শুটিং বন্ধ থাকবে! সাতদিন করুন।'

তিমিরবরণ ক্লান্ত চোখে তাকিয়েছিলেন। ছবির প্রযোজক হিসেবে প্রকাশ পোদ্দার আদর্শ ব্যক্তি। তিমিরবরণের মতো শিল্পীর জন্য কোনো কিছুরই অভাব রাখেন না। কিন্তু খাটিয়ে নেন জানোয়ারের মতো। ইদানীং বড় ক্লান্ত বোধ করছিলেন তিমিরবরণ। মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েও জুত পাচ্ছিলেন না শরীরে। ঘুমের বড়ি খেয়েও ঘুম হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে ব্যথা করে বুকের কাছাকাছি এলাকায়। শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ বিষপোকা। মগজের মধ্যে কুরে-কুরে নিরাপদ বাসা বানায়। খিদে চুষে খায়, ঘুম চুষে খায়, ফূর্তি-আনন্দ, তৃপ্তি-অভাববোধ, সব—। আসলে মানুষের জীবনে যতি চাই, অবসর চাই, বিনোদন চাই। চাই টাটকা বাতাস। মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি। চাই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখবার সুযোগ। বহুদিন ধরে এগুলোই পাচ্ছিলেন না তিমিরবরণ। দেখেশুনে প্রকাশ পোদ্দারই বলেছিলেন, 'যান, ঘুরে আসুন ক'দিন। শীতে তো আর পাহাড় চলবে না। সমুদ্রেই যান। পুরী, গোয়া কিংবা গোপালপুর-অন সী। শরীরটা খেলিয়ে আসুন। যে তিনটে ছবির শুটিং চলছে, বন্ধ থাকবে না হয় ক'দিন। হিরোর মেজাজ শরিফ না থাকলে ছবিটাই মাটি। ফিরলে কিন্তু ঐ সাথে 'নাগচম্পা'রও মহরত হবে।'

প্রকাশ পোদ্দারের কথায় তিলমাত্র উৎসাহ পাননি তিমিরবরণ। 'পুরী, গোয়া, গোপালপুর যাব বেড়াতে? না কি অটোগ্রাফ বিলোতে? কিংবা বেঘোরে প্রাণটা দিতে! সেবার কী হয়েছিল মনে নেই, চাঁদিপুরে?'

প্রকাশ পোদ্দার সোনা-বাঁধানো দাঁতে হাসেন, 'ও ফেমাস লোকদের অমন একটু-আধটু হবেই। ও নিয়ে ভাবলে আপনার আর ঘরের বাইরের বেরোনোই চলবে না।'

প্রকাশ পোদ্দারের কথাগুলো মিথ্যা নয়। নামী জায়গাগুলোতে তো কথাই নেই, অখ্যাত আধাগঞ্জ এলাকায় গিয়েও দুর্ভোগের অন্ত থাকে না তিমিরবরণের। চারদিক থেকে পিলপিল করে ধেয়ে আসে মানুষ। শুধু গন্ধটি পেলেই হয়। গ্রু ...গ্রু বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় চারদিক থেকে। একটুখানি দেখতে চায়, ছুঁতে চায়। বেড়াবেন কী, বিশ্রামই বা নেবেন কী! ওদের কবল থেকে নিস্তার পেতে প্রাণটি নিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পান না। আর কলকাতা তো তাঁর কাছে শত্রুপুরীর সামিল। রাস্তায়-ঘাটে, মার্কেটে-রেস্তোঁরায় একা একা বেরোলে, ভক্তদের আদরের ঠেলায় সত্যিসত্যিই প্রাণটাই চলে যাবে। কাজেই, বাড়ি থেকে কালো কাচে ঢাকা গাড়িতে স্টুডিও, এয়ারপোর্ট, ব্যস! বছর পাঁচেক আগে অবধি নিউ-মার্কেটে যাওয়ার অভ্যেসটা ছিল। মাসে-দু'মাসে একবার। বার-দুতিন নাকানিচোবানি খেয়ে সেটাও এখন বন্ধ। শেষবারে জনস্রোতের মাঝখান থেকে পুলিস গিয়ে কোনোও গতিকে উদ্ধার করে। ঐ শেষ। আগে বাছাবাছা কিছু ফাংশনে যেতেনটেতেন। এখন তাও যান না। ল-এণ্ড-অর্ডার প্রব্লেম হয়ে যাচ্ছিল। পুলিসের বিশাল বাহিনী লাঠিচার্জ করেও সামাল দিতে পারছিল না। অবশেষে

পুলিস কমিশনারই কেঁদে পড়লেন। ফাংশন-জলসায় আপনি গেলে আমার প্রেসার বেড়ে যায় মশাই। আমাদের দিকটাও একটু ভাবুন। কাজেই, এখন বোম্বে-কলকাতায় স্টুডিও আর বাড়ি করেই তিমিরবরণের দিন মাস বছর কেটে যায়। রিক্রিয়েশন বলতে মাসে এক-আধবার দু'একটি নির্বাচিত হোটেলে গভীর রাতে টুক করে ঢুকে পড়া। কিঞ্চিৎ খানাপিনা করে চোরের মতো ফিরে আসা। হোটেলের মালিক নিরাপত্তার খাতিরে এমনই গোপন রাখেন ব্যাপারটা যে, কাক-পক্ষীতেও জানতে পারে না। কিন্তু এভাবে মানুষ বাঁচে? ফলে তিমিরবরণের মধ্যে ক্লান্তিজনিত ক্ষয় চলছে দীর্ঘদিন। ইদানীং তিনি কাজে তেমন মন দিতে পারেন না। খিটখিটে হয়ে ওঠেন অল্পেতেই। কিছু উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা সর্বদাই খেলে বেড়ায় মগজে। আসলে, খ্যাতির বিষপোকাটি সাতরঙা তন্তু বুনছিল তিমিরবরণের শরীরে, মনে। বাধা দেননি। প্রশ্রয় দিয়েছেন। একদিন ঐ তন্তু তাঁর সারা শরীরে জড়িয়ে গিয়েছে। দমবন্ধ অবস্থায় বেরিয়ে আসতে চাইছেন তিমিরবরণ। কিন্তু ঐ স্বর্ণতন্তুর বাইরে নিরেট দেওয়াল। বেরিয়ে আসার সবগুলো দরজাই নির্মমভাবে বন্ধ।

প্রকাশ পোদ্দার দেখে তৃপ্তিভরে হাসেন। 'এটাই তো স্বাভাবিক। বাংলা এবং হিন্দি ফিল্মের সুপারস্টার মশাই, আপনি। তরুণদের আইডল, রূপসীদের হার্ট-থ্রব, বিগত যৌবনাদের টনিক ...। মানুষ আপনাকে দেখে তো উন্মাদ হয়ে উঠবেই। ক'জন এমন কপাল নিয়ে আসে!'

মরিয়া হয়ে প্রকাশ পোদ্দারকেই ধরে বসেন তিমিবরণ। 'আমাকে হপ্তা-দুয়েক লুকিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন মিঃ পোদ্দার। একেবারে নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বেগ জীবন। কেউ জানবে না, চিনবে না। আমি একটু খোলা আকাশের তলায় হাঁটতে চাই। আমি আর পারছি নে, মিঃ পোদ্দার।'

'পাগল! প্রকাশ পোদ্দার হাসেন, 'কোথায় লুকিয়ে রাখব? বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? সিনেমা আর ভিডিও'র দৌলতে এখন গাঁ-গঞ্জের পানের দোকানেও মহানায়ক তিমিরবরণের ছবি। কিশোরীদের বইয়ের মলাট। কিশোরদের টি-সার্টের ব্যাজ। যেখানেই যান, যতদূরেই, আপনার আগেআগে আপনার সৌরভ ছুটবে দিকেদিকে। তবুও দেখি, কী করা যায়।

দিন-তিনেক বাদে স্টুডিয়োতেই এল সোমেশ্বর মাহাতো। প্রকাশ পোদ্দার বললেন, 'আমার প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির জুনিয়র সুপারভাইজর। আপনার অজ্ঞাতবাসের সারথি।'

সোমেশ্বর মাহাতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল তিমিরবরণের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই কথাবার্তা শুরু হল।

সুবর্ণরেখার তীরে সোনা-ধোওয়া ঘাট। ওপারে গভীর শাল-মহুয়ার জঙ্গল। উঁচু ঢেউ-খেলানো জমি। সারবন্দী টিলা। টিলার ওপারে পেঁচাবিধা গাঁ। জনা-পঞ্চাশেক ঘর মাহাতোর বাস। পাশে অবশ্যি সাঁওতালদের পল্লীও আছে। ঐ গাঁয়ের যারা জমিদার ছিল, তারা এখন সবাই ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। ওদের বিশাল বাড়িখানা ফাঁকা পড়ে থাকে সারা বছর। বুড়ো কান্‌চারাম মাহাতো, ঐ বাড়ির কেয়ার-টেকার, সোমেশ্বরের

মামা। ওখানে তিমিরবরণ নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন। সোমেশ্বর গ্যারান্টি দিয়েছে, ঐ জঙ্গলের দেশে কেউ ওঁকে চিনবেই না।

২.

কান্‌চারামের বয়েস সত্তরের কম নয়। কিন্তু এখনো বেশ শক্তপোক্ত। লম্বা খাঁচা-খাঁচা চেহারা। গালদুটো ভাঙা। ঠেলে উঠেছে হনু। ঘোলাটে চোখ। অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটে। মানুষটি মন্দ নয়। তবে নেশাখোর! বোঝা যায়। সোমেশ্বর আগেই বলে রেখেছিল, সে কথা। সন্ধে হলেই নেশায় বুঁদ হয়ে যায় কান্‌চারাম। দুনিয়া থেকে যেন লাইন অফ্ করে দেয়। কাজকর্ম যা করে, অভ্যেসবশে। সত্যিই তাই। কাল রাতে তিমিরবরণকে খেতে দিল, বিছানা পেতে দিল, জল ঢেকে দিল, কিন্তু সারাক্ষণ ডুবে ছিল আকণ্ঠ নেশায়। মদ-গাঁজা নয়। তাহলে গন্ধ ওগরাতো প্রতিটি বাক্যে। নেশাটা তবে কী? টলোমলো করে না পা। বাজে বকে না জিহ্বা। গন্ধ ছোটে না বাতাসে। অথচ একেবারে মজিয়ে রেখেছে বুড়োকে। জিজ্ঞাসা করতে হবে। একটুখানি ভাবসাব হোক। তিমিরবরণ নিজে নেশাখোর মানুষ। নেশার মর্ম তিনি বোঝেন। আউট হয়ে যাওয়া কোনো নেশা নয়। আউট হলে, নেশার জগৎ থেকেও আউট। ইদানীং ঘনঘন আউট হয়ে যাচ্ছিলেন তিমিরবরণ। কান্‌চারামকে দেখে হিংসে হচ্ছে। আকণ্ঠ চড়িয়েও ওর পা টলে না, হাত কাঁপে না, কথা জড়ায় না, চোখ ওলটায় না, পীরিতখানা তবে কত গাঢ়, কত প্রাচীন!

দোতলা থেকে সন্তর্পণে নামলেন তিমিরবরণ। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে চাদরটা দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন মাথা।

কিশোরী মেয়েটি উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছে তখনো। বারান্দায় বসে চুটায় টান মারছে কান্‌চারাম। মস্করা জুড়েছে মেয়েটির সাথে। তাতেই হাসির বান ডেকেছে।

পায়েপায়ে উঠোনে নামলেন তিমিরবরণ, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কিশোরী। দু'চোখে সীমাহীন বিস্ময়! এই শান্ত সকালে মেয়েটিকে এক ঝলক দেখলেন তিমিরবরণ। ছিপছিপে কিশোরী। শ্যামলা গড়ন। চোখদুটি হীরের কুচির মতো ঝকঝকে। দোয়েল পাখির মতো যেন নেচে বেড়াচ্ছে উঠোনময়। আড়ষ্টতার লেশমাত্র নেই। শহরের 'শো-কেস গার্লদের দেখে দেখে ইদানীং তিমিরবরণের এক ধরনের বিতৃষ্ণা, বিবমিষা। হাসেন, কথা বলেন, ছোঁন, জড়ান, ইচ্ছে হলে আদর-টাদরও করেন একটু-আধটু। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বুক অবধি পৌঁছোয় না ওসব। ঠোঁটের বস্তু ঠোঁটেই থাকে। কানের বস্তু কানে। ত্বকের বস্তু ত্বকে। মেয়েটিকে দেখতে দেখতে মন জুড়ে অচেনা শিস্। বড়ই কি রূপসী মেয়েটি? কোথায় লুকিয়ে আছে ওর রূপ? দেহে নেই, মুখে নেই, কেশে নেই, নাকে-চিবুকে-ঠোঁটে নেই। কোথায় তবে লুকিয়ে রয়েছে তা, এই পবিত্র সকালে মন ভরিয়ে দেবার মতো?

উঠোন ঝাঁট দেওয়া শেষ করে মেয়েটি এগোলো বারান্দার দিকে। ভোমরার মতো গুনগুন করছিল কান্‌চারাম। কথাবার্তায় যা বোঝা গেল, কান্‌চারাম পটাচ্ছে মেয়েটিকে, লোভ দেখাচ্ছে এটা-ওটার। রাজি হইয়ে যা টিয়া। না করিস নি। মাথায় টিকলি দুবো। নাকে লোলক। পায়ে খাড়ু। আমার মতন মরদ তুই পাবি নি।

শুনতে শুনতে উঠোনটুকু নিঃশব্দে পার হয়ে গেলেন তিমিরবরণ। পেছন থেকে ঐ কাচভাঙা হাসি। হোলির দিনের পিচকিরি যেন। বেশ খানিকটা রঙ ছিটিয়ে দিল তিমিরবরণের পিঠে। মেয়েটির নাম তবে টিয়া!

দু'পাশের বালির চরে ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল রোদ্দুর। ঘাসের ওপর জমে থাকা শিশিরে রোদ্দুর পড়ে জ্বলছে। সরু একখানি পথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে নদীর ঘাট অবধি। দু'ধারে সবজির খেত।

একটা মহুল গাছের তলায় জনা-চার ছোকরা গুটিসুটি রোদ্দুর পোহাচ্ছে। পিটপিট করে তাকাল। হাই দ্যাখ্! ধ্বক করে ছলকে ওঠে তিমিরবরণের বুক। গাঢ় আশঙ্কায় আড়চোখে তাকান। ছোকরাগুলো তাকিয়ে রয়েছে নিষ্পলক।

দু'চোখ দিয়ে যেন গিলছে। মনে মনে প্রমাদ গোনেন তিমিরবরণ। ধীরপায়ে হেঁটে যান পাশ দিয়ে। ছোকরাগুলো পেছন থেকে দৃষ্টি বিঁধিয়ে দেখতে থাকে।

নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে হাঁফ ছাড়েন তিমিরবরণ। উহু, ছোকরাগুলো যেভাবে চমকে উঠল! অবশ্য এমন আকাট জঙ্গলে যেকোনো শহুরে ধোপদুরস্ত মানুষ দেখলেই, ওদের পক্ষে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। তবুও তিমিরবরণের মনটা কেন জানি, অবিরাম 'কু' গায়। সোমেশ্বর যতই আশ্বাস দিক, নিশ্চিন্ত হতে পারেন না পুরোপুরি। কোনো গতিকে চিনে ফেলে যদি! ভিড় করে আসে যদি চারপাশ থেকে! পালাতেও পারবেন না তিমিরবরণ। অতখানি রাস্তা। তাছাড়া, রাস্তাই বা চিনবেন কী করে? গতকাল কুঠীঘাট নামক এক বাজার মতো জায়গা থেকে কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েছিল জিপ। চলেছিল ঘন্টাটাক। একঘন্টায় কত কিলোমিটার চলে জিপ? চল্লিশ-পঞ্চাশ...। কতদূরে এসে পড়েছেন তিনি? পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত সীমায়? তেমন বিপদে পড়লে, কোন্‌দিকে কত যোজন পথ পেরোলে সভ্য জগতে পৌঁছুবেন তিমিরবরণ! ভাবতে ভাবতে বালুচর পেরিয়ে একেবারে জলের পাশটিতে চলে এসেছেন উত্তেজনার বশে। পিছু ফিরে দেখলেন, ছোকরাগুলো গাছের তলায় নেই। দুশ্চিন্তাটা নতুন রূপ নেয়। তড়িঘড়ি গ্রামেই ঢুকল নাকি? শুভ সংবাদটা চাউর করে দিল নাকি এতক্ষণে? মনে মনে বেশ দমে গেলেন তিমিরবরণ। আর তখনি দেখলেন, বালির চর ভেদ করে বহুদূরে হেঁটে চলেছে ওরা। সম্ভবত গন্তব্যস্থল ঐ জঙ্গলটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিমিরবরণ। প্রথম ফাঁড়াটি কাটল তবে! মনটা ঝরঝরে হয়ে উঠল। তিমিরবরণ পায়ে পায়ে দাঁড়ালেন, একেবারে জলের কিনারে। কাচের মতো স্বচ্ছ জল। নিজের ছায়াখানি পড়েছে জলে। তিমিরবরণ পরম প্রশ্রয়ে জলের মধ্যে নিজের মুখখানি দেখতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে।

নদীর জলে ছাঁকনি দিয়ে চুনোমাছ ধরছে গুটিকয় বাচ্চা। পায়েপায়ে ওদের পাশটিতে দাঁড়ালেন তিমিরবরণ। চুনো, পুঁটি, চ্যালামাছগুলো কোঁচড়ের মধ্যে রাখছে ওরা। নিজেদের আনন্দে মশগুল। শীতে অনেক পাখি এসেছে সুবর্ণরেখায়। মাঝনদীতে বসেছে ওরা। কালো কালো বিন্দু। গ্রাম থেকে গরুর পাল বেরিয়ে আসছে। বালুচর ধরে এগিয়ে চলছে জঙ্গলের দিকে। পা থেকে সৌখিন কোলাপুরী চটি খুলে হাতে নিলেন তিমিরবরণ। ভিজে বালির ওপর হাঁটতে লাগলেন খালি পায়ে। বহুদিন বাদে একচিলতে

মুক্তির স্বাদ! কেমন করে তাকে উপভোগ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না যেন। হাঁটতে হাঁটতে নদীর জলে পা ডোবালেন বারকয়েক। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। ঝিন্‌ঝিন করে ওঠে সারা শরীর। তবুও ভালো লাগে। অনেকদূরে আখের খেত। আখ কাটতে নেমেছে জনাকয়। চিবিয়ে আখ খাওয়ার স্মৃতি প্রায় ধূসর হয়ে এসেছে। তবুও মুখ জুড়ে যেন মিঠে স্বাদ। তিমিরবরণকে কে যেন টানতে লাগল আখখেতের দিকে।

ন'টা নাগাদ ফিরলেন তিমিরবরণ। শহুরে ভদ্র-সজ্জন বিবেচনায় কয়েক পাব্ আখ উপহার দিয়েছে ওরা। ফিরতি পথে তাই চিবিয়েছেন পরম তৃপ্তিতে। না, কেউই চিনতে পারেনি তাঁকে। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে স্বস্তি জমে বুকে। আহ্, এখানে কেউই চেনে না মহানায়ক তিমিরবরণকে! আহ্!

ঘরে ফিরেই দেখেন, কান্‌চারাম জলখাবার বানিয়ে তৈরি। লুচি-হালুয়া। কেটলিতে চায়ের জল চড়িয়েছে।

'টিয়া রে—' হাঁক পাড়ে কান্‌চারাম, 'কাপ-পিলেটগুলা লিয়ে আয়।'

উঠোনের পাতকুয়োর পাড়ে বসে চীনেমাটির কাপ-প্লেটগুলো ধুচ্ছিল ঐ কিশোরী। সম্ভবত তিমিরবণের আগমন উপলক্ষ্যে বহুদিন বাদে পৃথিবীর আলো দেখছে ওগুলো।

'মেয়েটি কে গো, কান্‌চারাম?' নিচু গলায় শুধোন তিমিরবরণ।

'এটা? এটা মোর তৃতীয় পক্ষ।' ভাবলেশহীন গলায় জবাব দেয় কান্‌চারাম! মিটি মিটি হাসে, 'পর্‌থমটি মর্য়েছে। দ্বিতীয়টি লয়াগ্রামে থাকে উর ব্যাটার পাশ। ইটি তৃতীয় পক্ষ। শালী বড্ড ঢ্যামনা। ঘর কত্তে চায় না কিচ্ছোতেই।'

নিঃশব্দে ধোওয়া-ধোওয়ি করছিল টিয়া। এক ঝলক তাকাল। দু'চোখে কপট রোষ।

'কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিল নাকি, আমার ব্যাপারে?' খেতে খেতে শুধোন তিমিরবরণ।

'তেমন কিছো লয়।' কান্‌চারাম শরীর বেঁকিয়ে আড় ভাঙে, 'বলছিল, তোদের ঘরে লোকটা কে বটে? ত' আমি কই, মোর ভাইগ্‌নার স্যাঙাত। গাঁ দেখতে আইছে।'

স্যাঙাৎ! তিমিরবরণ হলেন সোমেশ্বর মাহাতোর স্যাঙাৎ! মনে মনে হেসে কুটিকুটি হন তিমিরবরণ।

বলেন, 'বেশ বলেছ। কী কাজ করে, শুধোলে বলো, বেলেঘাটায় গেঞ্জির কারখানার ম্যানেজার।'

'গেঞ্জির কারখানায় মেনেজার বট-অ তুমি!' কান্‌চারাম লুব্ধ চোখে তাকায়। প্রবল শীতে তার গায়ে একটি খাঁকি হাফ-সার্ট আর ময়লা চাদর।

'তুমি তাইলে কত গেঞ্জিই না পর সম্বচ্ছর! তুমার কারখেনায় পুরাহাতা মোটা গেঞ্জি হয়? ললিতবাবু শীতকালে যা পরেন। এক্কেরে গলাতক্ক ঢাকা।'

ঠাট্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়েন তিমিরবরণ। কথা ঢাকতে হয়। বলেন, 'তোমাকে একখানা গলাঢাকা গেঞ্জি পাঠিয়ে দেব সোমেশ্বরের হাতে।'

'সোমেশ্বর? উ'সালাকে দিলে আর পেইছি মুই! তুমি বরং কালাচাঁদকে দিয়ে পাঠাই দিবে। কালাচাঁদ কলকাতায় থাকে। পুলুসে চাকরি করে। মাসে মাসে ঘর আসে। উটা সোমেশ্বরিয়ার মতন অত লাব্বাক লয়।'

তিমিরবরণের ভুরু কুঁচকে উঠেছে ততক্ষণে। কালাচাঁদ বলে একজন আছে নাকি এ গাঁয়ে? যে কিনা পুলিসে চাকরি করে। এবং কলকাতায় থাকে! হায় ঈশ্বর!

'কালাচাঁদ কবে আসবে ঘরে?'

'এই তো গেল, দিনা-দুই আগে। ফের আসবে মাঘে। ওর মারফত দিও।'

তিমিরবরণ মিষ্টি হেসে মাথা নাড়েন, 'পাঠাব। একজোড়া।'

'একজোড়া!' চক্‌চক্‌ করে ওঠে কান্‌চারামের চোখ, 'তাইলে একটা মোর বিয়াইকে দুবো। উ শালা মোর চেইয়েও বুড়া। এই শীতেই বোধ করি টসকাবে।'

'কোথায় থাকে তোমার বেয়াই?'

'অই তো, তামাজোড় গাঁয়। লদীর ওপারে। মোর বড় ঝি'র শ্বশুর।'

কথায় কথায় খোলসা হয়। টিয়া কান্‌চারামের বড় মেয়ের মেয়ে। দু'বেলা আসে দাদুর কাছে। দুধ নিয়ে আসে। ফাই-ফরমাস খেটে দিয়ে যায়।

খুব মৃদু গলায় কথা বলছিল কান্‌চারাম। চোখদুটি যেন সর্বদাই ঢুলু ঢুলু। যেন মাঝেমাঝেই যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছে চলতি দুনিয়ার সাথে।

একসময় ওর নেশার ব্যাপারে শুধোলেন তিমিরবরণ। 'বড় জব্বর নেশা তো হে তোমার! কাল থেকে দেখছি। পা টলে না, গন্ধ ছোটে না, বাজে বকো না, অথচ...'

কান্‌চারাম হাসে। শিশুর মতো নিষ্পাপ হাসি। অনেক সাধ্যসাধনার পর মুখ খোলে।

'এ আইজ্ঞা, মোদের গরিবের লিশা। পোস্ত খোলার জল। পোস্তদানা যে ফলের মধ্যে থাকে, উই ফলের খোলা। জলে দু'চার ঘড়ি ভিজাই রাইখ্যে জলটুকু খাইত্যে হয়।'

নেশাটার মাহাত্ম্য সাতমুখে বলতে থাকে কান্‌চারাম। বড় জব্বর নেশা। শয়তানটা ঘুমিয়ে পড়ে। শরীরের মধ্যে পাখি-পাখালগুলো জেগে ওঠে। কলরব জোড়ে। মনটা পলকা হয়ে শিমুল তুলোর মতো উড়তে থাকে। বেজায় ভালো লাগে তখন। তবে, বিপদও আছে। একবার ধরলে ছাড়া কঠিন। আর, একটা দিনও বাদ দেবার জো নেই।

বস্তুটি একবার চেখে দেখবার সাধ জাগল তিমিরবরণের মনে। দু'একদিন যাক। কথাটা পাড়বেন কান্‌চারামের কাছে।

৩.

দুটো দিন প্রায় শুয়ে বসেই কাটালেন তিমিরবরণ। সকালে লুচি-হালুয়া, দুপুরে মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত। রাতে রুটি। মাঝেমধ্যে নদীর ধারে একটুখানি বেড়িয়ে আসা। মোটা চালের ভাত, মুর্গির ঝোল দিয়ে মেখে ভরপেট খাচ্ছেন। অমন ভুরিভোজ, অমন তৃপ্তি সহকারে, বহুদিন ঘটেনি। অথচ হজম হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

দুপুরটা একটুখানি গড়িয়ে নিয়ে, বেরিয়ে পড়লেন। গাঁ-খানা চক্কর মারলেন। ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝি'রা জুলজুল চোখে দেখে। কিন্তু সে জন্যে আর দুশ্চিন্তা নেই মনে। এ দৃষ্টি, সে দৃষ্টি নয়! ভারতের মহানায়ককে এরা চেনে না। এরা দেখছে স্রেফ একটি শহুরে মানুষকে।

গাঁয়ের কয়েকটি ছেলের সঙ্গো আলাপ হয়েছে ইতিমধ্যে। খাঁদা, শুকরা আর একটি বিদ্ঘুটে নামের ছেলে। ওদের সঙ্গো গতকাল গিয়েছিলেন জঙ্গালটার দিকে। অনেক গাছ-গাছড়ার নাম চেনাল। জঙ্গালের রহস্য আর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করল শতমুখে। শুকরা নামের ছেলেটি আবার ক্লাস এইট অবধি পড়েছে গোপীবল্লভপুর স্কুলে। বাকি দুটি পাশের গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে ফোর অবধি। ষোল-সতের বছর বয়স ওদের । ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতি বসুর নাম জানে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গো লড়াইয়ের ভাসাভাসা খবর রাখে শুকরা। অথচ তিমিরবরণের নাম শোনেনি জীবনে। মনে মনে খুব হেসেছেন তিমিরবরণ। বেজায় মজা পেয়েছেন। ছেলেগুলো বুঝতেই পারছে না, কার সঙ্গো বেড়াচ্ছে সারা বিকেল। তিমিরবরণ স্থির করলেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে একখানা পত্রযোগে নিজের পরিচয় ফাঁস করবেন ওদের কাছে। গোটা কতক সই করা ফটোগ্রাফও পাঠাবেন। তখন তো সবাই হাত কামড়াবে নিষ্ফল আক্ষেপে। হায় গো, হেন মানুষটি এলেন, রইলেন, চিনতেই পারলাম নি! এমন কপাল কি এ জন্মে আর হবে?

পাড়ার মধ্যে ঢুকে অবলীলায় ঘুরে বেড়ান তিমিরবরণ। কুয়োতলা, পুকুরপাড় ধরে হাঁটেন। একটি বাড়ির সাবেকি দাওয়ায় বসে তাস পিটছে চারজন। পাশে বসে সঙ্গাত দিচ্ছে আরো চার-পাঁচজন। পাশে একখানি ট্রানষ্টির বাজছে। এমন পরিবেশে যেন নিতান্তই বেমানান।

তিমিরবরণ গিয়ে দাঁড়ান পাশটিতে। ভুলে গেছেন এসব তাসের খেলা। পিয়ার..., বিন্তি...। জানতেন এককালে। তুখোড় খেলুড়ে ছিলেন। স্মৃতিতে হাতড়ান। ছোকরাগুলো পিটপিট করে তাকায়। শহুরে বাবুকে দেখে অস্বস্তি। তিমিরবরণই যেচে আলাপ করেন। ভাব জমান। কালাচাঁদ মাহাতোরই বাড়ি এটা। এই গাঁয়েরই ছোকরা সবাই। খেতে-মাঠে খাটে-বাটে। হতদরিদ্র অবস্থা সকলের। রেডিওটি কালাচাঁদ মাহাতোর। ওর অবর্তমানে, এখন ছোট ভাই রাইচাঁদের দখলে। কালাচাঁদের রেডিও এখন সারা পেঁচাবিধা গাঁয়ের গর্বের বস্তু।

বাড়ি ফেরার পথে নিমগাছের তলা থেকে জাল বুনতে বুনতে হাঁক পাড়ে এক থুখুড়ে বুড়ো। কে? যোগেন নাকি? থমকে দাঁড়ান তিমিরবরণ। আজ্ঞে না। ঘোলাটে চোখদুটো তিমিরবরণের গায়ে ঘসতে থাকে বুড়ো। জালে ফাঁস পড়ে যান্ত্রিক হাতে।

'আমি সোমেশ্বর মাহাতোর বন্ধু। বেড়াতে এইচি।'

'সোমেশ্বর? অই কান্চারামের ভাইগ্না? কোলকেতায় কুন সিনিমার মালিকের দোরে চাকরি করে? শালা, হাজারবার কইল, কোলকেতা লিয়ে গিয়ে সিনিমা দেখাবে। ধড়িবাজ!'

ফিরতি পথে বহেড়া গাছের তলায় টিয়ার সঙ্গো মুখোমুখি।

তিমিরবরণের মন জুড়ে অকস্মাৎ সেই সোহাগী পাখির শিস্। কাছাকাছি হতেই অস্বস্তি, সঙ্কোচ। আশ্চর্য! সারাজীবন, দৈনিক বারো-চোদ্দ ঘন্টা শুধুই নায়িকা নামক নারীশরীরগুলির আকন্ঠ সংস্পর্শ, শরীরে শরীরে শুধু আদিম ঘসাঘসি...। শুটিংয়ের

বাইরেও নারীদেহগুলি ফেনায়িত হয়ে ঢেউ ভেঙে আছড়ে পড়তে চায় মহানায়কের শরীরে, অবিরাম...। অথচ গাঁয়ের এক পুঁচকে কিশোরীকে দেখে তাঁর দু'চোখে মুগ্ধতা, মনে সঙ্কোচ, কপালে স্বেদ!

'ঘরে ফিরছ বুঝি?' শেষ মুহূর্তে ঠোঁট ফসকে বেরিয়ে আসে কথাগুলো।

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় টিয়া। 'ঘরকে যাও জলদি। বুড়া ভাবছে।'

বলেই স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে টিয়া। পায়ের মল বাজতে থাকে ঝুমুর-ঝুমুর...।

তিমিরবরণের পা'দুটো আটকে যায় ওখানেই। টিয়া চলেছে নদীর দিকে। সোনালি বালিতে তার ছোট্ট দুটি পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে যাচ্ছে পলকে। কেমন অলৌকিক মনে হয় তিমিরবরণের। স্বপ্নের মতো লাগে।

একসময় পা'দুটো সচল হল। পায়ে পায়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকেন তিমিরবরণ। নিজের অজান্তে। কী এক ঘোরের মাথায়।

বালি ছেড়ে জলে নেমেছে টিয়া। ডুরে শাড়িখানা তুলে ধরেছে হাঁটু অবধি। কোমল-মসৃণ পা। পায়ের গোছ পুষ্ট হচ্ছে। কাচের মতো জলে উঠছে-নামছে পা। এইভাবে একসময় নদী পেরিয়ে টিয়া চলে যাবে ওপারে।

তিমিরবরণের পায়ের আওয়াজে ফিরে তাকাল টিয়া। হাঁটু জলে থমকে গেল পা। দু'চোখে তীব্র বিস্ময় ও সামান্য কৌতুক।

'ঘরে গেলি না, বাবু?'

তিমিরবরণ অপ্রস্তুত বোধ করেন।

বলেন, 'এই, যাব।'

নদীর ওপারে, টিলার আড়ালে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য ডুবছে। লালচে বালির বুক থেকে উধাও হয়ে গেছে রোদ্দুর। চারপাশ কেমন নিঝঝুম হয়ে আসছে। ছায়া ছায়া। বালির বুকে কিছু শালিখ তখনো কিছু খুঁটে খেতে মশগুল। আকাশপথে উড়ে চলেছে মরালের দল। মালা গড়ছে, ভাঙছে। নদীটা শুয়ে রয়েছে ক্লান্ত বিবশ ভঙ্গিতে।

'সোনা-ধোওয়া ঘাটটি কদ্দুরে, টিয়া?'

টিয়ার চোখদুটি কৌতুকে ঘন হয়ে ওঠে। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক।

'সে ইখ্‌নে কুথা গো— ? আরো অনেক নামোতে। একবেলার হাঁটা।'

হাঁটতে শুরু করে টিয়া। জলের মধ্যে অলৌকিক শব্দ তুলে সে একসময় ওপারে গিয়ে ওঠে।

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন তিমিরবরণ। পায়ে পায়ে হাঁটা দেন বাসার দিকে। সূর্য তখন ডুব মেরেছে টিলার আড়ালে।

৪.

পেঁচাবিঁধার পরের গাঁ ভালুকমুড়া। সেখানে হপ্তায় একদিন হাট বসে। আজ হাটবার।

কানচারাম মাহাতো হাটে যাবে। টিয়াও যাবে সাথে। সারা হপ্তার কেনাকাটা। তিমিরবরণের জন্য এ হপ্তায় বাজারহাটের বহর বেশি। সোমেশ্বর বার বার বলে গেছে, বাবুর খাওয়া-দাওয়ার যেন ত্রুটি না হয়। কান্চারামকে মোটা টাকা দিয়ে গেছে সে বাবদ।

'যাবেন নাকি হাটে?' কান্চারাম শুধোয়, 'না। থাক। গাঁ'র হাটে লোক যত, ধূলা তত।'

ইচ্ছে করছিল। তবুও মনে দ্বিধা। হাট মানে, রাজ্যের মানুষের জমায়েত। যদি এক-আধজন আচমকা চিনে-টিনে ফেলে! দু'হপ্তা থাকতে এসেছেন, তিন দিনের মাথায় সুখ-স্বর্গখানি ভেঙে যাবে তবে। আবার, মনের মধ্যে চোরা লোভ। দেখলে হয়, কেমন হাট বসে গাঁয়ে! বলেন, 'যাব গো, খুড়ো।'

সারা পথ এক অদ্ভুত ঘোর তিমিরবরণের। সবার আগে টিয়া। লাফিয়ে চলেছে ফিঙের মতো। তার পিছে কান্চারাম। সবার পেছনে তিমিরবরণ।

গেরিমাটি রঙের পথ। দু'পাশে অচেনা গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড়। খাল-বিল, খেত-গাঁ, গাছ-গাছাল চেনাতে চেনাতে চলেছে কান্চারাম।

কী সুন্দর সব ল্যান্ডস্কেপ! কি সুন্দর সব নাম! সোনা-ধোওয়া ঘাট, লক্ষ্মীকাজল ধান, মৌডাল ছাতু! খেতের নাম মানিকভাসা। গাঁয়ের নাম চোরচিতা। পাখির নাম কোয়ের। আর, কী সব সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করে এরা! 'বিহনে' শব্দটা ভারি মনে ধরেছে তিমিরবরণের। কেমন যেন বিচ্ছেদ আর বিরহের সৌরভ রয়েছে। উ বিহনে মোর তি-ভবন আঁধার। বলেছিল কান্চারাম! টিয়ার প্রতি কপট অনুরাগে। কথাটা তিমিরবরণের মনে গেঁথে গেছে।

'ও, দাদু—।' নাচের ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে তাড়া লাগাচ্ছিল টিয়া, 'জলদি আইস। বেলা যায়।'

'হাঁ-রে মাগী—। ত'র বরের হাট ফুরাই গেল!' হাঁফাতে হাঁফাতে নাতনিকে গাল পাড়ে কান্চারাম, 'তুই বরং আগে যা। ভালো বর সব বিক্রি হইয়ে গেলে, ত'র ভাগ্যে জুটবে কানা, লুলা...।'

টিয়া বেজায় ক্ষেপে যায়। মুখ ভেংচে, চোখ পাকিয়ে, ডান হাতে মুঠো বানিয়ে তুলে দেয় আকাশে।

কান্চারাম হাসে। হাঁটতে হাঁটতে গুনগুনায়। খুব ছোটবেলায় হাটে গেছে টিয়া। কান্চারাম ওকে সারাপথ লোভ দেখিয়েছে, হাটে ওকে সুন্দর দেখে একটা 'বর' কিনে দেবে। হাটে পৌঁছেই বায়না ধরল টিয়া, এবার দাও কিনে বর। বর না নিয়ে ফিরবেই না সে। সেদিন সারাপথ মায়ের কোলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরেছিল। বর না কিনে দেবার অপরাধে কান্চারামের সঙ্গে কথা বলেনি হপ্তাটাক।

কান্চারাম হাসে।

টিয়া চেঁচিয়ে বলে, 'বর লয়। তুমার তরে একটা সোন্দর দেইখ্যে বউ কিন্যে দুব আইজ।'

'তুই থাইক্‌তে, বউ কিনতে যাব ক্যানে?' চেরা গলায় গান ধরে কান্চারাম, 'বলি, কাজ কি আমার অন্য ধনে—?'

'আ—হা! তুমার ঘর কত্তে বয়্যে গেছে মোর!' দু'হাতের বুড়ো আঙুল একত্রে নাচাতে থাকে টিয়া।

সহসা কপট রাগে ফেটে পড়ে কান্‌চারাম, 'না কল্লি তো মোর বইয়ে গেল! তা বলে এই গাঁইয়া-হাট থিক্যে ক্যানে কিনতে যাব বউ! বাবুর সাথে চইলে যাব কোলকেতায়। সোন্দরী বউ কিন্যে লিয়ে আইস্‌বো বউবাজার থিক্যে!'

কথার রসটুকু চাখতে চাখতেও তিমিরবরণের ভুরু কুঁচকে ওঠে অজান্তে। বউবাজারের নাম জানল কী করে বুড়ো?

'কালাচাঁদ তো অখানেই থাকে!' কান্‌চারাম চোখ বড় করে তাকায়, 'আমরা বলি, সে কি রে কালা? জায়গার নাম বউবাজার! সিখেনে কি তেবে বউয়ের বাজার বসে?'

নিজের রসিকতায় নিজেই মজে যায় কান্‌চারাম।

সুবর্ণরেখার পাড় ধরে মাইল-দুই হাঁটলে, চার পাঁচখানা মহুল গাছের তলায় ছোট্ট হাট। আলু-পেঁয়াজ, আদা-রসুন, শাক-সবজী। দু'তিনটো ফিতে-কাঁটার মনোহারী দোকান। গামছা-কাপড়ের দোকানও একটা। দু'তিনজন বসেছে জিয়োল মাছ আর কুচো মাছ নিয়ে। আর, শুঁটকি মাছের ডাঁই। হাটের একেবারে শেষপ্রান্তে শুয়োরের মাংস ঝুড়িতে নিয়ে বসেছে আদিবাসীরা। লাল চাকা-চাকা মাংস। খানিক তফাতে কুসুম গাছের তলায় মোরগ-লড়াই চলছে। চারপাশে বৃত্তাকারে মানুষের জমায়েত। আকাশ ফাটানো উল্লাস।

বিপুল বিস্ময়ে সবকিছু দেখছিলেন তিমিরবরণ। স্টুডিও'র মধ্যে বানানো 'গাঁয়ের হাট'-এ কতবার সওদা করেছেন তিনি।

আজ সশরীরে একেবারে আসল হাটের খদ্দের!

হাটভর্তি গেঁয়ো মানুষ। খাটো ধুতি কিংবা গামছা পরনে। সরলপানা মুখ। বোকা বোকা হাসি। নেশা জড়ানো চোখ। তিমিরবরণকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে তাকায়। বড্ড বেমানান তিনি এমন পরিবেশে।

রাইচাঁদ মাহাতো হাটে এসেছে। কাঁধে ঝুলছে ট্রানজিস্টার। চড়া ফিল্মি গান বাজছে ওতে। চমক খেয়ে শুনতে থাকেন তিমিরবরণ। বেশ কয়েকটি গান তাঁরই অভিনীত ছবির। তিনিই লিপ দিয়েছেন। গানগুলোকে নতুন করে শুনতে থাকেন এমন পরিবেশে।

গতকাল সন্ধেবেলায়ও হয়েছিল অনুরূপ অভিজ্ঞতা। কালাচাঁদ মাহাতোর ঘরে বাজছিল ট্রানজিস্টার রেডিও। ছায়াছবির গান চলছিল উচ্চগ্রামে। দাওয়ায় বসে তাসুড়ের দল শুনছিল কি শুনছিল না। একটুখানি মজা করবার লোভ সামলাতে পারলেন না তিমিরবরণ।

বললেন, 'কোন্‌ ছবির গান, জানো?'

মাথা নাড়ে ছোকরার দল।

'প্রেমযমুনা। যমুনার রোল করেছিল স্বপ্নাকুমারী। আর প্রেমের রোল কে করেছিল, জানো নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ে ওরা । জানে না।

'সে কি! তিমিরবরণ। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?'

ছোকরার দল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। একজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে। দু'একজন 'না'-সূচক। দু'একজন 'না', 'হ্যাঁ'-র মাঝামাঝি। তিমিরবরণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করেন। না হয় জঙ্গলের মধ্যে অজ গাঁ। না হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। না হয়, পনেরো আনা মানুষই অজ্ঞ, দরিদ্র। তা বলে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে পশ্চিমবাংলায় (নাকি বিহারে? নাকি উড়িষ্যায়?) এমন অঞ্চলও আছে, যেখানে কেউই তিমিরবরণের নাম শোনেনি! আশ্চর্য! এরা যে সত্যিই সেই আদিম যুগেই বাস করছে! বলেন, তোমরা কি কেউই জীবনে একটাও সিনেমা দ্যাখোনি?'

বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে হাসে ওরা।

দু'একজন বলে, দেখেছি আইজ্ঞা। ঝাড়গ্রামে একবার একটা সিনিমা দেখল্যাম, কী যেন নাম, খোব মারপিট আর ঘোড়-দৌড়। একটা সোন্দরী মতন মেয়া-ছেইলা খোব চাং চাবড়াল্যাক আর ল্যাচল্যাক।

'কী নাম বলতো ছবিটার? আঁধারমানিক? বিবর্ণ প্রেম? প্যার কা কসম? হাত-সাফাই?'

'অ'গুলারই একটা হব্যেক বোধ লেয়। আপনি বোধ লেয় খোব সিনিমা দ্যাখেন?

তিমিরবরণ দমে যান। সামলে নেন নিজেকে। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে না কিছুতেই। এ এক আজব রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন তিনি! স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

হাঁটের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মানুষজনের সঙ্গে গল্প জুড়লেন তিমিরবরণ। এ অঞ্চলের লোকভাষা তিনি জানেন না। তবে এ ক'দিন পেঁচাবিধার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, কথার আদলটা কিঞ্চিৎ রপ্ত হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম শুধোন। গাঁ-ঘরের খবরাখবর নেন। নাম শুধোন, ধাম শুধোন, এবং এক সময়ে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে সিনেমার প্রসঙ্গ। আসলে, সিনেমার জগতটা সম্পর্কে মানুষজনের এমন সীমাহীন অজ্ঞতা তাঁকে বিস্মিত করেছে। তিনি এই অজ্ঞতার শেষ দেখতে বদ্ধপরিকর। জনা দশ-বারো জোয়ান ছোকরার সঙ্গে কথা বলে তিমিরবরণের মনে হল, তাদের প্রত্যেকেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এক-আধটা ছবি দেখেছে। কেউ পৌষমেলায় ঝাড়গ্রামে গিয়ে, কেউ বা পুবে খেটে ফিরবার কালে বেলদা-বাজারে। কিন্তু সবাইয়ের ছবি দেখা হল, ঐ ঘন্টা তিনেকের হুড়ুম-দুড়ুম ব্যাপার-স্যাপার। সাঁই-সাঁই গাড়ি ছুটছে। ঝলাক-ঝলাক বাজ পড়ছে। ঢিসুম-ঢিসুম মার পিট চলছে। কোমর-দুলিয়ে নাচ চলছে। তারপর একসময় খেল খতম, পয়সা হজম। চরম হতাশায় ঘন ঘন মাথা নাড়েন তিমিরবরণ। নিজের ছবির ডজনখানেক নাম বলে যান এক নিঃশ্বাসে। মানুষগুলোর মধ্যে কোনো বোধোদয় ঘটে না। এক চিলতে লজ্জাসরমের ছায়াও পড়ে না মুখে।

বলে, 'কে জানে, হবেও বা। দেখেছি হয়তো বা। মনে নাই।'

তিমিরবরণের ভীষণ রাগ হচ্ছিল মনে মনে। পরতে পরতে ক্ষোভ জমছিল বুকে।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও বর্হিজগতের এক চিলতে আলোও ঢোকেনি এদের জীবনে! আশ্চর্য! প্রায় আদিম যুগে পড়ে রয়েছে মানুষগুলো। সরকার তবে এতগুলো দিন গদিতে বসে করলটা কী? ফিরে গিয়েই সুনন্দকে ফোনে বলতে হবে কথাগুলো। সুনন্দ হল তিমিরবণের স্কুল-জীবনের বন্ধু। এখন মন্ত্রী হয়েছে। তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর দ্যাখে। খিস্তি মারতে হবে ওকেই। তোমরা করেছ কী? তোমাদের তথ্যদপ্তর তো দেখছি ঠুঁটো জগন্নাথ। খোলা আকাশের তলায় পর্দা খাটিয়ে, তিমিরবরণের ছবি না হোক, 'পথের পাঁচালী'টাও একটিবারের তরে পেঁচাবিধা গাঁয়ে দেখাবার সময় হয়নি তোমাদের! এ অঞ্চলের তথ্যসংস্কৃতি অফিসারকে এক্ষুনি বদলি করা দরকার। নর্থ বেঙ্গালে। ভাবতে ভাবতে ঝাঁ-করে এসে গেল আইডিয়াটা। পেঁচাবিধা গাঁয়ে, খোলা আকাশের তলায় পর্দা খাটিয়ে একটা ওপেন-এয়ার ফিল্ম শো করে দিলে কেমন হয়? তিমিরবরণের খানদশেক বাছা-বাছা ছবি। ডিস্ট্রিবিউটরদের বলে দিলেই তারা তিমিরবরণের অনারে ফ্রি-তে ফিল্ম দেবে। বিনি পয়সায় তিমিরবরণের ছবি পেলে যাযাবর ফিল্ম-কোম্পানিগুলো তাঁবু পুঁতে বসে যেতে পারে পেঁচাবিধার ডাঙায়। ডিস্ট্রিবিউটরদের জানাশোনা রয়েছে ওদের অনেকের সঙ্গে। যদি ওরা জানতে পারে যে তিমিরবরণ চান এটা, বর্তে যাবে। নেহাৎ ওরা রাজি না হলে সুনন্দ আছে। প্রস্তাবটা দিলেই, একটা দু'লাইনের অর্ডার ইস্যু করে দেবে। ওরা ফেল করলে তিমিরবরণই পর্দা, জেনারেটর, প্রজেক্টর ভাড়া করে অপারেটরসহ পাঠাবেন পেঁচাবিধা গাঁয়ে, নিজের খরচে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এত অজ্ঞতা সহ্য করা যায় না! স্রেফ সহ্য করা যায় না।

সকালে জলখাবার পরিবেশন করতে করতে কান্‌চারাম শুধোল, 'বাবু কি সিনিমার লোক?'

খাবার মুখে তুলতে গিয়েও থেমে যান তিমিরবরণ। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ে অকস্মাৎ। সারা শরীর জুড়ে সতর্কতার ঘন্টা বাজতে থাকে।

মুখ কালো করে শুধোন, 'কী করে জানলে কথাটা?'

নিরাসক্ত গলায় কান্‌চারাম বলে, 'গাঁয়ের ছেইলাগুলাই বলাবলি কচ্ছে। কাল হাটে নাকি তুমি বলেছ, পেঁচাবিধায় একটা সিনিমা কুম্পানি খুলবে? মুই বলল্যাম, সিট্যা হইত্যে পারে। সোমেশ্বরিয়া সিনিমা-মালিকের থানে চাকরি করে। সেই এনেছে বাবুকে। সিনিমা-কুম্পানির লোক হইত্যেও পারে উ' লোক।'

ভয়ে ভাবনায় যে বেলুনটা ফুলছিল, আস্তে আস্তে চুপসে যায়। খাবারদাবারগুলো কেমন বিস্বাদ ঠেকে। হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তিমিরবরণ।

এক সময় বলেন, 'আমি কে জানো কান্‌চারাম?'

'জানব কী ক্যানে?' কান্‌চারাম চায়ে দুধ ঢালে, 'তুমি হইলে সোমেশ্বরিয়ার স্যাঙাৎ।'

'আরে না, না।' সর্বাঙ্গ দুলিয়ে বলে ওঠেন তিমিরবরণ, 'আমি কে, সেটা জানলে তোমার পিলে চমকে যাবে।'

ঘোলাটে চোখদুটো তিমিরবরণের গায়ে বোলাতে থাকে কান্‌চারাম।

মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস করবার ভঙ্গিতে তিমিরবরণ বলেন, 'আমি তিমিরবরণ।'

'অ—।' চায়ের গেলাস এগিয়ে দেয় কান্‌চারাম, 'আজ দুপুরে কী খাবে? ডিম না কুঁক্‌ড়া?'

চরম বিরক্তিতে উঠে দাঁড়ান তিমিরবরণ। হনহনিয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে।

গাঁয়ের মধ্যে প্রাচীন তেঁতুল গাছ। তার তলায় বসে বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছে এক মধ্যবয়েসী লোক। তিমিরবরণ পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ান। কি গো খুড়ো, চিনতে পার আমাকে? নামটি বললেই চিনতে পারবে। বাচ্চা শিশুকে নাড়ুর লোভ দেখাচ্ছেন তিমিরবরণ! কাল বলছিলে না, সিনেমা দেখেছ দু'চারটে? তো বলি, আমি তিমিরবরণ। সেই বিখ্যাত তিমিরবরণ!

'অ আচ্ছা, আচ্ছা।' লোকটি দড়ির পাকের ওপর নজর রেখে চকিতে তাকায়, 'তুমি সিনিমায় পার্ট কচ্ছ নাকি?'

গুম মেরে যান তিমিরবরণ। তাকিয়ে থাকেন ক্ষণকাল। ধুশ শালা! পা' চালিয়ে হাঁটা দেন শীতলা-মাড়োর দিকে।

এখন শীতলাতলা খাঁ-খাঁ। সবাই গিয়েছে সব্জিখেতে। তিমিরবরণ সব্জিখেতে পৌঁছে দেখেন, সব্জিখেতে নিড়ানি দিচ্ছে গণেশ, সুবল, মংলা, বুধুর দল। ওঁকে দেখে সরলপানা হাসে।

'আর তোমাদের আঁধারে রাখা ঠিক হবে না। নিজের আসল পরিচয়টা দিই। কে বলতো আমি? কে? আমি হলাম তিমিরবরণ। সেই বিখ্যাত সিনেমায় নায়ক তিমিরবরণ।' মিটিমিটি হাসতে থাকেন তিমিরবরণ। সাফল্যের সঙ্গে ম্যাজিকটি দেখিয়ে ম্যাজিসিয়ান যেমন হাসেন বিনীত-অহঙ্কারী হাসিটি।

'সতীমা'র ঘাট, বিবর্ণ প্রেম, কালপুরুষ, আঁধারমানিক, হাত সাফাই, বুঝতে পারছ এবার?' সগর্বে মাথা দোলাতে থাকেন তিমিরবরণ।

গণেশদের মুখে বোকা বোকা হাসি।

বটে, বটে! ওরা সব্জির গোড়ায় হাত চালায়। নিজেদের মধ্যে গুনগুনিয়ে-বাতচিৎ চালায়। তিমিরবরণ দাঁড়িয়ে থাকেন ঠায়। অভিমানে ফুলে ওঠে বুক। অপমানে তেতো হয়ে ওঠে মন। এই তো বেশিদিন নয়, বছরদশেক আগে, ঝাড়গ্রাম শহরে এসেছিলাম জলসায়। মন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে এক-লাখ-একে রাজি হতে হল। ছিলাম রাজবাড়িতে। পঁচিশ হাজার লোকের বিশাল প্যাণ্ডেল। মঞ্চের সামনে তিন সারি ব্যারিকেড। পেছনে তিন সারি। গ্রীনরুমের দোর অবধি গাড়ি আনবার ব্যবস্থা, সামনে এস-পি'র জিপ। পেছনে সশস্ত্র-বাহিনী। মধ্যিখানে আমাদের গাড়ি। থামল গিয়ে একেবারে গ্রীনরুমের গোড়াটিতে। ততক্ষণে গ্রীনরুমসহ সারা মঞ্চ ঘিরে রেখেছে পুলিস। প্যাণ্ডেলের তাবৎ পুলিস ফোর্সকে এলার্ট করে দেওয়া হয়েছে। তিমিরবরণ এপিয়ারস্‌। সাবধান! আমি গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে গেলাম মঞ্চে। জনতাকে নমস্কার করলাম। একটু হাসলাম। একটা হিট ছবির গান গাইলাম, দু'চার কলি ডায়লগ ঝাড়লাম। তারপর গট্‌গট্‌ করে নেমে সোজা গাড়ির ভেতরে। স্টার্ট দেওয়াই ছিল। নিবিড় পুলিশ-বেষ্টনীর মধ্যে হুশ করে বেরিয়ে গেল আমার গাড়ি। সোজা রাজবাড়ি। পেছনে হাজার হাজার জনতা তখন হল্লা তুলেছে। আমরা আমাদের স্বপ্নের হিরোকে

আর একটুক্ষণ দেখতে চাই...। মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি...। লাঠি, কাঁদানে-গ্যাস...। সদর থেকে আরো ফোর্স এল। আমার রাতটা রাজবাড়িতে কাটাবার কথা ছিল। কিন্তু ভরসা পেল না অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। স্পেশাল সিকিউরিটিসহ আমাকে সেই রাতেই ঝাড়গ্রাম ছাড়তে হল। নইলে রায়ট বেধে যেত।

বেগুনগাছের গোড়াগুলো একমনে নিড়োচ্ছিল গণেশরা। যা বেগুন ফলেছে গাছগুলোতে, জবাব নেই। টাইম মতো সেচ পেলে চৈত্র অবধি পয়সা আনবে ঘরে। কাজ করতে করতে সহসা বলে ওঠে সুবল, 'আপনি তেবে আকাশে পাখির মতন উড়তে পারেন লির্ঘাৎ?'

—মানে?

'মানে, একটা সিনিমায় দেখেছি, রাজকুমারীকে বাঁ-হাতের মুঠায় ধইরে আকাশ পথে পালাচ্ছে দৈত্য। রাজকুমারও আকাশপথে পথ আগ্‌লিল। দু'জনের বেদম লড়াই। মরার আগে বাঁ-হাত থিক্যে রাজকুমারীকে টুপ কইরে ফেল্যে দিল দৈত্য। পাহাড়ের চূড়ায় আছাড় খাবার আগে তাকে চিলের মতন ছোঁমাইরে ধরল্য রাজকুমার। তারপর দু'জনে উড়্যে-উড়্যে দেশের পানে।'

চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন তিমিরবরণ। পাথরের মতো স্থির। চোখের পাতাও পড়ছিল না। সহসা পিছু ফিরলেন তিনি। সোজা এসে হাজির হলেন ডেরায়।

'কান্‌চারাম, একটা গরুর গাড়ি হবে, কুঠিঘাট পর্যন্ত? যত টাকা চায় দেব। আমাকে আজকেই ফিরতে হবে কলকাতায়।'

'সে কি! মুরগী ছাড়াতে ছাড়াতে হাত থেমে যায় কান্‌চারামের, 'পন্‌দরো দিনের তরে আইলে। আজ ত' মাত্তর চার দিন!'

'আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কান্‌চারাম। প্লীজ, একটা গরুর গাড়ি জোগাড় করে দাও। এক্ষুনি। পঞ্চাশ টাকা বখশিশ পাবে তুমি। এখানে আর থাকতে পারছি নে এক মুহূর্ত। এখানে নিঃশ্বাস নেবার বাতাস নেই। বোঝ না কেন?'

কান্‌চারাম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ক্ষণকাল।

'কিন্তু যাবে কুথা, সিট্যা বল, শুনি?'

'কলকাতায়। নইলে খড়্গপুর, কিংবা ঝাড়গ্রামে। নিদেন কুঠিঘাট, ফেকোঘাট, কোলাঘাট...' হাঁফাচ্ছিলেন তিমিরবরণ, 'যে কোনো ঘাটে, যেখানে পাতলা কাগজে সবুজ কালিতে "সগৌরবে চলিতেছে, মহানায়ক তিমিরবরণের অসামান্য দুর্দান্ত ছবি—" গোছের পোস্টার সাঁটা আছে। সমস্ত পান-সিগারেটের দোকানে। ঘরবাড়ির দেওয়াল-দেওয়ালে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গাছ আর ল্যাম্পপোস্ট-এর গায়ে। পায়খানা-প্রস্রাবখানায়। উঠতি এবং বিগতযৌবনাদের বুকে। এমনি কোনো এক জায়গায়, যে কোনো উপায়ে, যে কোনো মূল্যে, আজ সন্ধের মধ্যেই...।

ভারি অবাক মানে কান্‌চারাম মাহাতো। কারণটা বলবে তো! এমন আচমকা পলায়নের হেতুটি কী!

কী করে বোঝান তিমিরবরণ! কোন বাক্যবন্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন মনের বিবশ হয়ে ওঠার কারণটা। বলেন, 'আমার নেশার জিনিসটা ফেলে এসেছি হে...। তুমি তো নেশাড়ী মানুষ, বুঝতেই পার, বিশ বছরের পুরনো নেশা, চার-চারটা দিন সেই নেশা বিহনে কী অবস্থা হয় মানুষের!'

গিরগিটি

রাসবিহারী কেমন পালটে যাচ্ছিল দিন দিন।

তার সেই বেড়ালের মতো সুযোগসন্ধানী চোখদুটো আর নেই এখন। তার বদলে কেমন মরা কাতলের মতো ফ্যাকাসে চোখ। গাঁজাখোরদের মতো ঝিম মেরে থাকে সারাক্ষণ। বাতে ভোগা রুগীর মতো সর্বদাই ঘাড়খানা ঝুলে থাকে সামনে। হাঁটে যখন, মনে হয় যেন কানা হাঁটছে পথ হাতড়ে। অথচ রাসবিহারীকে যারা চেনে, তারা শুনলে বিশ্বেস করবে না কথাটা। এরা সব বলে কি? তার অমন রমরমা ধান-চাউলের বেব্‌সা, বৈতোলের মোড়ে আনাজের আড়ত, মাহাজনী তেজারতি—। কতো করিতকর্মা লোক সে! কত ঝানু ব্যক্তি। ব্যবসা চালাতে দশদিকে তার নজর। দিনভর চোখ ঘোরে শিকর‍্যা পাখির মতো। পাঁদুটো চষে বেড়ায় বিশ্বসংসার। একে খেলায়। ওকে ভোলায়। ডোবায়। ভাসায়। সবদিক সামলাতে গিয়ে রাসবিহারীর হাত ঘোরে, পা ঘোরে, চোখ ঘোরে, মুখ ঘোরে, কিন্তু মাথাটি ঘোরে না কখনও। সেই রাসবিহারী দিন দিন কেমন ঘুমিয়ে পড়ছে যেন। সাত চড়ে রা মেলে না। ঘুমঘুম চোখে তাকায় সবাইয়ের দিকে।

অবাক চোখে ওকে দেখে পাইকার-মহাজন, খদ্দের-গেরস্তের দল। রাসবিহারীর হলো কি?

অ' রাসবিহারী, ডাক্তার-টাক্তার দেখাও হে। বাহ্যি-পেচ্ছাব পরীক্ষা করাও। পেসার-টেসার মাপাও। এ'তো ভালা নক্কন লয়।

রাসবিহারী চোখ নাবিয়ে নেয় মাটিতে। লাজুক চোখে হাসে। ঘুমভাঙা মানুষের অপ্রস্তুতের হাসি।

হুতোম শিকারী রসিক মানুষে। চোখ নাচিয়ে বলে, শরীলে উয়ার কুনো রোগ ব্যাধি নাই হে। রোগ যদি কিছো থাকে, সে আইঞ্জা মনে।

সবাই চোখ কপালে তুলে শোনে।

নব্বুই বছরের বুড়ো হারু গোপেরই বিস্ময়টা বেশি।

কোঁচকানো চোখের পাতা টানটান করে বলে, 'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছি, ইমন কথা শুনি নাই মোর বাপের জন্মে।'

গদাধর মান্না ঠাণ্ডা ধাতের মানুষ। ভেবেচিন্তে, রয়েসয়ে বাক্যি কাড়ে। মাথা নেড়ে নেড়ে বললো, 'হইত্যেও পারে। বউ মইরেছে তো সিই কবে। ব্যাটাটা তো এক আকাল কুস্যাণ্ড। ইদানিং ঘর ফিরে না রাতে। উয়ার আর লিজের বইল্‌তে কে রইলো বল

তুমরা? দেইখ্‌বার, শুইন্‌বার, লোভ-লালসা দেখাবার?' দু'হাত নেড়ে গদাধর বুঝিয়ে দিলো, 'কো-উ নাই।' তারপর প্রাজ্ঞ পুরুষের মতো ভঙ্গি করে বলতে লাগলো, 'একলার সন্‌সারে অমন ভূতের বেগার কে-ই বা খাইট্‌ত্যে চায় দিন দিন? কও তুমরা? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কী কামে তেবে লাইগ্‌বেক মাইন্‌সের?

তা অবশ্যি ঠিক। সংসারের সামনে রাঙা-মূলো গোছের কেউ বা কিছু না থাকলে কিসের তাগিদে মানুষ গাধার খাটনি খাটবে নিত্যিদিন? না খেয়ে, না পরে?

মাথা দুলিয়ে সায় দিতেই হয় কথাটায়। গদাধরের উৎসাহটা বেড়ে যায় তাতে। চোখদুটোকে ছোট করে গলায় রসের ভিয়েন দিয়ে বলে, টেইন্যে রাইখবার রশিটাই যে ছিঁড়ে গেঁইছে হে। উ তো আইজ্ঞা অমন ব্যাভার কইরবেক্‌ই।'

বুড়ো হারু গোপ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'না, না, সব কিছোর একটা টাইম-বেটাইম আছে ত'? বটে কিনা?

গিরিজা নাগ উরুতে চাপড় মেরে বলে, 'আমারো তো আইজ্ঞা উটাই কথা। কথায় আছে, অসময়ে ফলে না বিক্ষো, সময়েতে ফলে। এ কি উয়ার ই কাম কইর্‌বার বইস?'

হারু গোপ রাসবিহারীকে ডেকে বলে, 'অ' রাসু, ই তুয়ার কি ভীমরতি র‍্যা? বেশ তো ছিলি ব্যবসাপাতি লিয়ে। দু'দশ পইসা দাব্‌ড়ে দুবড়ে লিচ্ছিলি। হঠাৎ ইমনতরো রোগে ধইর্‌লেক ক্যানে তুয়াকে?'

রাসবিহারী মিষ্টি মিষ্টি তাকায়। নিঃশব্দে হাসে। জবাব দেয় না।

লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে হারু গোপ। কে যে অমন কইর‍্যে মাথাটা চিবাই খেঁইল্যো? কি মাইন্‌সের কি দশা আইজ!

'কতো দিগেই ত' আনাগুনা ছিল'। কুঞ্জ কামার রায় দেয়, 'কোউ ঘাড়ে চেইপ্যে বইসেছে কুনো দিন। আজকাল বাটে-ঘাটে পা' বাড়ালেই বেপদ। মাইন্‌সের অলিষ্ট কইর্‌বার লেইগ্যে—।'

রাসবিহারী শোনে আর হাসে। বলে, 'সবই উই রসিক লাগরের কাম। মোকে দোষ দিয়ে লাভটা কি?'

'ঝ্যাঁটা মারি উই লাগরের মুয়ে'। ঝামটে উঠলো হারু গোপ, 'কি লোকের কি দশা!'

শেষ পর্যন্ত আর অবিশ্বাস করতে পারলো না কেউ। কাজে-কর্মে নেমে পড়তে লাগলো রাসবিহারী।

বাড়ির সুমুখের উঠোনটা সুন্দর করে নিকিয়ে নিয়েছে। মাঝখানে বেদী বানিয়ে তুলসীর চারা বসিয়েছে। একদিকে বানিয়েছে খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট মণ্ডপ। ছিমছাম। মণ্ডপের মাঝখানে ফ্রেমে বাঁধানো রাধাকৃষ্ণের ছবি বসিয়েছে। তার পাশে রাধাকৃষ্ণের মাটির যুগল মূর্তি। রঙ্গিন কাগজ আর রাংতা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে মূর্তির সারা গা।

সামনে কম্বলের আসন পেতে রাসবিহারী বসে থাকে। ঝুলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে নাম জপ করে সকাল-বিকেল।

রাসবিহারীর বদন দেখে প্রথম দর্শনেই চমকে উঠলো কুসুবনির ভোলা শা। রাসবিহারীর নাকের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বললো, লাকের উপর কাগে হেইগ্যেছে যে হে স্যাঙ্গাৎ। ই ঘোড়া রোগ ধরলো কবে থিক্যে?

রাসবিহারী লাজুক চোখে হাসলো।

'এ ঘড়ারোগ কাকে যে কখোন দ্যান্ তিনি!'

একটু থেমে বললো, 'তুম্মো পেইয্যেঁ যেত্যে পার ই রোগ। পভুর যেদি কির্পা হয়।'

চোখের মণিজোড়াকে কপালের কাছাকাছি এনে ওপরের দিকে ইঙ্গিত করলো রাসবিহারী।

দেখে শুনে ভোলা শা হেসেই খুন।

'ভালা এ্যাক ভেক ধইর্য়েছো হে স্যাঙ্গাৎ। গাঁ'ঘরের বক্কা-সক্কা গিরস্থগুলানকে গেঁড়ায়ে দু'পইসা কমেই—।

সংগে সংগে কানে আঙ্গুল দিল রাসবিহারী। 'যা কর্যেছি, তা কর্যেছি। ইখন আর উ সকল পাপ কথা শুনায়ো না গো ভলানাথ। বড্ড দেরিতেই আমাক্যে কিরপা কইর্যেছেন নন্দদুলাল। জন্মের আধ্যেক তো গেল পাপে-তাপ্যে! দেখি বাকি জেবনটা—'

রাসবিহারী কেমন উদাস হয়ে বাড়ির পথ ধরলো।

গণেশ দত্ত সদর থেকে ফিরে সন্ধ্যেবেলায় গেল বাগদী পাড়ায়। সারা পাড়া খাঁ খাঁ।

ফাঁকা ঘরগুলো অন্ধকারে ভুতের মতো দাঁড়িয়ে পাড়া জাগছিল যেন।

বার-দুই একে-ওকে ডেকে মনে মনে তেতে উঠলো গণেশ। অন্যদিন এ সময়টা সারা পাড়া গমগম করে। গণেশ দত্তকে ঘিরে বাগদী পাড়ার জনা-বিশ-পঁচিশ যোয়ান-আধড়া গোল হয়ে বসে। দেশ-কালের হাল অবস্থা নিয়ে আলোচনা চলে।

'গেরিব-বল্লোকের ফারাকটা কম্যে আসত্যেছে হে, কেরমশ। এ যুগটা হলো, গেরিবের একতার যুগ। কোমরে গামছা কষ্যে বেঁইধ্যে, দাঁড়াও দেখি এ্যাক্টিন্মর স'জ্যাটি হইয়্যেঁ। দ্যাখবে ক্যামন নাই পাও হক্কের ধান। দেখি, ক্যাম্‌নে জমিন্ থেক্যে উচ্ছেদ করে জুদ্দার।'

গণেশের বক্তৃতা আগুন ছড়াতো চারপাশের মানুষগুলোর ওপর। মরা মরা ফ্যাকাসে চোখগুলো কোটর থেকে টেনে এনে তারা গোগ্রাসে গিলতো গণেশের কথাগুলো। মনের মধ্যে শুকিয়ে আসা নদীটাতে আশার বান ডাকতো। বুকের হাঁপরটা তেজী হয়ে দম চালাচালি করতো। আগামী দিনের পরিকল্পনাগুলোর কথা শুনতে শুনতে নিটোল হয়ে আসতো ভাঙাচোরা মুখগুলো।

ঐ মুখগুলোকে নিয়ে গাঁয়ের মধ্যে কতোবার মিছিল করে হেঁটেছে গণেশ দত্ত। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চেঁচিয়ে উঠছে, 'কমরেড জোরসে—!'

সেই লোকগুলো কোথায় গেল আজ?

দিনকতক গাঁয়ে ছিল না গণেশ দত্ত। পার্টির কাজে সদরে যেতে হয়েছিল তাকে।

অনেক নতুন বার্তা বয়ে এনেছে সদর থেকে। সেসব কথা গোগ্রাসে গিলবার লোকগুলো কোথায় গেল?

খানিক ঘোরাঘুরি হাঁকডাকের পর সিদ্ধেশ্বর বুড়ার কাছ থেকে যে হাল-হদিশ পাওয়া গেল, তাতে করে মনে মনে একেবারে হেঁদিয়ে পড়লো গণেশ দত্ত। পাড়ার বেবাক লোক গিয়েছে রাসবিহারীর বাড়িতে। 'অষ্ট প্রহর' হচ্ছে সেখানে। মচ্ছব চলছে দিনভর। সেখানে গিয়েই জুটেছে সবাই। হাঁড়ি চড়েনি কারো ঘরে।

'লিকুঞ্জ, সে কুথা?'

'সে তো আইজ্ঞা কাল থিক্যেই রইয়েঁছে সিখ্যেনে। কীত্তন-দল লিয়ে গিয়েঁছে সে। পভুর লামগান কত্তিছে দিনভর।'

গণেশের মাথা থেকে পা' অবধি রাগে জ্বলে উঠলো। ঘাম ঝরতে লাগল দরদরিয়ে। চোখদুটো অক্ষম আক্রোশে জ্বলতে লাগলো। দিনের পর দিন, তিলতিল গড়ে তোলা মানুষগুলোর একি অধঃপতন! ওরাই না গেল-সনে লুট করেছিল রাসবিহারীর ধানের আড়ৎ! লগ্‌নাকে জমিন্ থেকে উচ্ছেদ করার অপরাধে ওরাই না মিটিং করে রাসবিহারীর মুনিশ খাটা বন্ধ করেছিল পাক্কা একচল্লিশ দিন!

আঁধারে পথ হাঁটতে হাঁটতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিল গণেশ দত্ত। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ছিল কমল মাষ্টারের কথাগুলো। 'যুদ্ধ তো পরে। আগে হোল শত্তুর চেনা। কে তুমার বাটি থিক্যে মাখনটি তুইল্যে খেঁইয়্যে, জলটি ঢেইল্যে রাখতেছে তুমার লেইগ্যে, সিট্যা জানত্যে লাইগ্‌বেক পয়লা। কার লেইগ্যে চাষী হইয়েও মরসুমে তুমার ঘরে দু'মুঠা ধান উঠে না, উয়াকে চিনত্যে হব্যেক। সক্কলকে শত্তুর চিনাও হে পয়লা। তার পরে লয় লড়াই।'

গণেশ দত্তের ইদানিং বিশ্বাস হচ্ছিল, সে লোকগুলোকে শত্রু চেনাতে পেরেছে। শাঁসে-জলে যারা বেঁচেবর্তে রয়েছে, তাদের প্রতি একটা আক্রোশ জাগছিল এই দুব্‌লা মানুষগুলোর মনে। তেলে-জলে ফারাকটা বাড়ছিল। অকস্মাৎ এ কি বিপত্তি! তরী যে তীরে এসে ডোবে!

রাসবিহারীর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই খোলকরতালের শব্দগুলো যেন একযোগে ছেঁকে ধরল গণেশকে। যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো চারপাশ থেকে। গণেশের দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। রাস্তার উল্টোদিকে একটা আস্তাকুঁড়ে রাশি রাশি শাল-পাতা দুমড়ে মুচড়ে ফেলা হয়েছে। ডজনখানেক কুকুর কিলবিলিয়ে ঘুরছে আর কামড়া-কামড়ি করছে। হ্যাজাকের তেরচা আলোয় গণেশ দেখলো। পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো রাসবিহারীর চৌহদ্দির বাইরে। বেড়ার গা ঘেঁসে। আবছা আঁধারে চোখ-দুটো শানিয়ে দেখতে লাগলো ভেতরের কাণ্ডকারখানা।

সারা উঠোন জুড়ে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার তলায় কীর্ত্তনের দল। চারপাশে গিজগিজ করছে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ। কীর্ত্তনের দল লক্কা পায়রার মতো গলা ফুলিয়ে গান করছে। প্রভুর নামগান। উঠোনের উল্টোদিকের জায়গাটা চেঁছেছুলে নিকিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে মচ্ছবের পংক্তিভোজন চলছে। পাঁচ-সাতটা উনুন

গনগনিয়ে জ্বলছে। বিশাল বিশাল লোহার কড়াইতে ভাত, ডাল, ঘন্ট ফুটছে। একধারে গরম ভাতের বিশাল ডাঁই। মানুষ প্রমাণ উঁচু।

হুতহুতিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে। ঝুড়িতে ভরে সেই ভাত পরিবেশন করছে দশ-বারোটা লোক। গলগলিয়ে ঘামছে তারা। গণেশ দত্তের ডানহাত নিকুঞ্জ বাগদী ব্যস্তসমস্ত হয়ে হ্যাজাকে পাম্প দিচ্ছে ঘন ঘন।

বাগদীপাড়ার প্রায় সবাই জুটেছে এখানে। গণেশ দত্ত দেখলো। সারবন্দী বসে গোগ্রাসে ডাল-ভাত গিলছে ওরা। গরম ভাতগুলোকে ডাল দিযে মেখে মুঠো মুঠো ঢুকিয়ে দিচ্ছে মুখে। চিবোবার আগেই তা পৌঁছে যাচ্ছে পেটে। খোলা আকাশের তলায় ডাল-ভাতের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ঘন্টের ফোড়নের সুবাস নাকের মধ্যে ঢুকছে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে গণেশ দত্তর মাথার মধ্যে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন। কেমন যেন অসহায় লাগে নিজেকে। বাগদীপাড়ার লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'শালারা কাগের জাত। চাট্টি ভাত ছড়াঁই দিলেই ছুইট্যে আসে চারপাশ থিক্যে! ল্যালা'র দল সব!

একসময য বেড়ার ধার থেকে নিঃশব্দে সরে এলো গণেশ দত্ত। ফস্ করে নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর হাঁটতে লাগলো বাড়ির দিকে। বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। গলায় যেন আটকে ছিল কিছু। গরীব মানুষগুলোর থেকে রাগটা সহসা লাফ মেরে পড়লো রাসবিহারীর ওপর। আঁচড়ে-কামড়ে নাজেহাল করতে লাগলো ওকে।

'শালা, চাঁদির জুতা মেইরে বশ কইর্‌তে চাস্ গেরিব মাইন্‌সের কইল্‌জাটা? সে দিন চইল্যে গেঁইছে হে! মানুষ জাইগেছে। উসব ধাপ্পা আর চালবাজীতে কিছো হবেক নাই'।

গনগনে হয়ে জ্বলে উঠতে গিয়েও যেন পারছে না গণেশ দত্ত! ঠিক জুত পাচ্ছে না। মনের মধ্যে অসহায় ভাবটা বাড়ছে ক্রমশ। লোকগুলোর বিশাল 'হাঁ'-র মধ্যে ভাত ভর্তি মুঠো ঢুকিয়ে দেবার দৃশ্যটা চোখের ওপর অনবরত ভাসছে।

নিদারুণ ক্ষোভে গণেশ দত্ত বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে, 'চাট্টি ভাত ছড়াই দিয়ে আর কদ্দিন যে ইয়ারা কিন্যে রাইখ্‌ব্যেক মানুষগুলাকে?'

শুধু কি চাট্টি ভাতের লোভেই জমেছে এরা? পুণ্য! সেটাও কি কিছু কম? একে তো মহাপাপের ফল ভোগ চলছে এ জীবনে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। জন্তুর জীবন! ফের এ জীবনে টুকচেক পুণ্যি না করে গেলে কী হবে পরের জন্মে? পুণ্যির লিশা বড় জব্বর লিশা। মনে বড় ভাঁপ আসে গ।

পরের দিন সকালে একটা সমবেত চিৎকারে ঘুমটা ভেঙ্গো গেল গণেশ দত্তর। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এলো সে। সামনের দৃশ্যখানা দেখে চোখ কপালে উঠে গেল। সামনের রাস্তা দিয়ে বাগদীপাড়ার বহুলোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে ফুলবনীর দিকে। জোয়ান মদ্দ, বুড়া-হাবড়া, কানা-খোঁড়া সব চলেছে আগলবাগল হয়ে। গণেশ

দত্তর সন্দেহ হলো, আগুন লেগেছে নাকি কোথাও। দু'এক জনকে থামাবার চেষ্টা করলো সে। জানতে চাইলো আসল ঘটনাটা। বিড়বিড় করে দু'চার জনা কি যেন বললো। বোঝা গেল না। দাঁড়িয়ে খোলসা করে বলার সময় নেই ওদের। কি এক ঘোরের মাথায় মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটছে গোটা পাড়াটাই। চোখে-মুখে, কপালে-চিবুকে প্রচণ্ড উত্তেজনা ফেটে বেরোচ্ছে। গণেশ দত্ত ভারি চিন্তায় পড়ে গেল।

বাধ্য হয়ে কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে তাকেও নেমে পড়তে হোল রাস্তায়। যতই হোক, তেমন কোনও ঘটনা ঘটলে তারও তো একটা দায়িত্ব রয়েছে। ছুটন্ত মানুষগুলোর পায়ের আওয়াজ এবং উত্তেজিত সোরগোল অনুসরণ করে গণেশ দত্ত যে জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো সেখান থেকে সে কাল রাতে নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল ঘরে।

রাসবিহারীর বেড়ার ধার থেকে সে দেখতে লাগলো ভেতরের কাণ্ডকারখানা। লোহার সিন্দুকখানা টেনে আনা হয়েছে একেবারে মাঝউঠোনে। রাসবিহারী একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে মেলে ধরেছে একটা খেরো বাঁধানো খাতা। খাতা ধরে আউড়ে যাচ্ছে নাম। সিন্দুকের ডালা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকুঞ্জ। নাম শুনে শুনে ভীড়ের ভেতর থেকে একজন করে এগিয়ে আসছে। হাতে তুলে নিচ্ছে বাসন-কোসন সোনাদানা, কাগজপত্র। রাসবিহারী হাতজোড় করে অপরাধীর মতো মুখ করে বলছে, 'কি ? ঠিক ঠিক ফিরে পেলে তো বাবা ? আর কুনো খেদ রইলো নি তো ?'

জমায়েত উত্তাল! এমন দৃশ্য তারা জীবনে দেখেনি। না, এসব রাসবিহারীর নিজের জিনিস নয়। এসব ঋণের খাতে বহুদিন ধরে তিলতিল জমা পড়েছে রাসবিহারীর সিন্দুকে। আজ মচ্ছবের শেষদিনে যার জিনিস তাকে ফেরৎ দিয়ে পাপমুক্ত হতে চাইছে রাসবিহারী। সেটাও কম আচানক কথা নয়। এলাকার মানুষ-জন সেটাও কে কবে দেখেছে ?

বিস্ময়ের ধাক্কায় বোবা হয়ে গেছে সবাই। ফ্যালফ্যাল করে দেখছে দৃশ্যটা। যারা ফেরৎ পাচ্ছে তারা তো বটেই, যারা ফেরৎ পাচ্ছে না তারাও কেবল দৃশ্যখানা পুরোপুরি দেখবার লোভেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায়।

পয়লা চট্‌কার আচানক ভাবটা ক্রমশ ভক্তির রূপ নিচ্ছিল। বুড়ো-হাবড়া বিধবাদের চোখের কোণা চিক্‌চিকিয়ে উঠছিল। 'আহা! তেনার কির্‌পা লাইগ্‌ল্যে কি মানুষ, কি হয়! বড় ভাগ্যবান গ' লোকটা!'

গেরুয়া রঙের এক টুকরো কাপড় পরেছে রাসবিহারী। দাড়িগোঁফ, মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছে। চোখেমুখে একটা দিব্য প্রশান্তি। টলটলে দীঘির মতো স্থির একজোড়া চোখের মণি। নির্মল আকাশের পানে উদাস উদাস দৃষ্টি।

একসময় পিছু ফিরলো গণেশ দত্ত। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগলো ঘরের দিকে।

পুরো সাতটা দিন তল্লাটের তাবৎ মানুষ রাসবিহারী ছাড়া আর কিছুই বলে না। উঠতে-বসতে, শয়নে-স্বপনে রাসবিহারী। একটা মানুষ ভালো হয়ে গেল! পাপের পথ ছেড়ে সে ভগবানে প্রাণ সঁপেছে। তাকে আর ঠেকায় কে? পুরো ব্যাপারটা যেন একটা নেশার মতো জুড়ে বসেছে সবাইয়ের মনে। একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটা-চলা করছে সবাই।

একটা মানুষের ভালো হয়ে যাবার আনন্দে হাজার মানুষ উত্তাল!

সন্ধ্যে নাগাদ পায়ে পায়ে বাগদীপাড়ার দিকে গেল গণেশ দত্ত। অনেক কথা জমা রয়েছে মনে। অনেক উপদেশ, মন্ত্রণা। ভাবী দিনের অনেক পরিকল্পনা।

পাড়ায় ঢোকার মুখেই নিকুঞ্জের বাড়ি। দূর থেকে খোল-করতালের শব্দ ভেসে আসছিল। সংগে প্রভুর নামগান। গণেশ দেখলো নিকুঞ্জর উঠোনেই বসেছে কীর্তনের আসর।

গণেশ দত্তকে দেখে মৃদু হাসলো নিকুঞ্জ, বন্ধ হোলনা কীর্তন। গণেশ একপাশে দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো সবাইকে।

নিকুঞ্জর মুখখানা কেমন যেন গাঁজা খাওয়া মানুষের মতো লাগছে। চোখদুটো আধবোঁজা। মাথাটা অল্প দুলছিল খোল-কবতালের বাজনার তালে তালে।

ডান হাত আকাশের দিকে তুলে গান ধরলো নিকুঞ্জ :

'না পোড়ায়ো রা—ধার অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে—।

মরিলে তুলিয়া রেইখ্যো তমালের ডা লে—।

আমি তমাল বড়ো ভালাবাসি--'

সংগে সংগে ধুয়ো ধরলো সবাই, 'আমি তমাল বড়ো ভালাবাসি—।'

গণেশ দত্ত দেখলো, মানুষগুলোর চোখ-মুখ অনেক উজ্জ্বল, স্বচ্ছ আর সুখী সুখী।

খানিকবাদে কীর্তন থামলো।

নিকুঞ্জ মৃদু হেসে বললো, 'বইসো কম্‌রেড। খাড়া ক্যানে?'

বসবে কি বসবে না ভাবতে ভাবতে অবশেষে বসেই পড়লো গণেশ। চোখ দিয়ে জরিপ করতে লাগলো সবাইয়ের মুখ। গলায় ক্ষোভ ফুটিয়ে বললো, 'এসব কী কম্‌রেড? কি লিয়ে মেইত্যে যাচ্ছ, খিয়াল আসে সিট্যা?'

একটু যেন লজ্জা পেল নিকুঞ্জের দল।

নিকুঞ্জ হাত কচলাতে কচলাতে বললো, 'উই, সক্কলে বইল্‌লো, টুকচান্‌ কীত্তন-টিত্তন হউক আইজ। বহুৎ দিন তো ইসব ছাইড়্যে ছুইড়্যে দিবা হইয়েঁছে। খোলগুলানে ফেপুন্দ্যা পইড়েছে দিন দিন। তাই তরে আইজ টুকচান,—...।'

একথা সেকথার পর আবার উঠলো রাসবিহারীর মানুষ হয়ে যাওয়ার গপ্পো। সাতসতের করে বাখান চললো তার। পার্টির কথাবার্তাও হোল। তবে সবই বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো, মিনমিনে। শুনলো সবাই। সায়ও দিল। কিন্তু গণেশ দত্ত বুঝতে পারছিল, একটা নেশায় পেয়েছে ওদের। বড় কড়া নেশা। প্রাণের আশা ছেড়ে ঢকঢকিয়ে গিলতে চাইছে ঐ নেশার বস্তুটিকে।

বিধ্বস্ত মনটাকে টেনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল গণেশ দত্ত। অন্ধকারের মধ্যে সে কেবলই দেখতে পাচ্ছিল, একদল নেশাগ্রস্থ মানুষ যেন চিৎকার করে এগিয়ে চলেছে তার সামনে, পেছনে, ডাইনে, বামে। তাদের হাঁটাচলার ছিরি-ছাঁদ নেই। নেই কোনও নির্দ্দিষ্ট নিশানা।

রাসবিহারীর বেড়ার কাছটিতে এসে থমকে দাঁড়ালো গণেশ দত্ত। মৃদু হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে মণ্ডপে। তার পাশে বসে রাসবিহারী একমনে মালা জপ করছে।

হ্যারিকেনের আলোয় তার মুখখানা দেখা যাচ্ছে না পুরোপুরি। মুখের একটা পাশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। শরীরের আনাচেকানাচে আলো পড়েছে লালচে রোদ্দুরের মতো। একটা শরীরে এতো রকমের আলোআঁধারীর খেলা! বড় বিকট লাগে রাতের আঁধারে।

গণেশ দত্ত দেখলো, রাসবিহারীর ছায়াটা বিশাল হয়ে ঢেকে ফেলেছে পেছনের মূর্তিগুলোকে। তার বদলে রাসবিহারীকেই বেশী উজ্জ্বল লাগছে হ্যারিকেনের আলোয়।

রাসবিহারীর আগের মুখখানা ভাববার চেষ্টা করলো গণেশ দত্ত। ধূর্ত দৃষ্টি নিয়ে, বাজপাখির মতো ছোঁ মারার ভঙ্গিতে সর্বদাই এদিক-ওদিক তাকাতো সে মুখ। রাসবিহারীর আজকের মুখের সংগে সে মুখের অনেক ফারাক।

রাসবিহারীর এ মুখ অনেক শান্ত, গম্ভীর, উজ্জ্বল।

অনেক বেশি কঠিন আর শীতল।

আগের মুখখানা দিয়ে এতোদিন সে একটা একটা মানুষকে ধরে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। আজ এ মুখ দিয়ে সে হাজার লোককে চোখের পলকে অনায়াসে গিলে ফেলবার ক্ষমতা রাখে।

ভাবতে ভাবতে এক অচেনা ভয়ে নীল হয়ে এলো গণেশ দত্তের পোড় খাওয়া মুখখানা।

হুলমারার ভমরা মাঝি

কুঠরিটা আকারে আন্দাজ আট ফুট বাই আট ফুট। একটাও জান্‌লা নেই। ফুট ছয়েক ওপরে ছোট্ট ঘুলঘুলি। সামনের দিকে একটি মাত্র দরজা। মোটা লোহার রড দিয়ে বানানো রেলিংয়ের কপাট। বাইরে থেকে তালাবন্দ।

ভেতরে ভমরা মাঝি। কপাটের দু'খান্ রডকে দু'হাতে আলগোছে ধরে পাথরের মত নিস্পন্দ।

রেলিংয়ের বাইরে বড়সড় হলঘর। অনেক চেয়ার, টেবিল, কাগজপত্তর। বাবু-ভায়াদের ছোটাছুটি। ব্যস্ততা। উদ্বেগ। চোখে মুখে রক্তবর্ণ ক্রোধ।

একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে আজ। ঘটিয়েছে হুলমারার ভমরা মাঝি।

রেলিংয়ের ভেতর থেকে বাইরের দুনিয়াটা দেখা যায় না। তবে ভমরা মাঝি কল্পনা করতে পারে, এখন আঙ্‌নার বাইরে নিকষ অন্ধকার। ঝাঁকড়া ছাতিম গাছটার তলায় হয়তো বা মালতী ভয়ে ভাবনায় কাঠ। হয়তো বা খাঁকি পোষাক দেখলেই আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে জাপটে ধরছে পা'। মরদটাকে মোর ছেড়্যে দ্যান্ হুজুর। উয়ার কুনো কসুর নাই।

বাপ বলতো ঃ জ্যালের ঘানি, কালা পানি, উয়ার চে' ভালা পরানহানি।

বলতো ঃ এ্যাকবার জ্যালের ভাত যেজন খেঁইয়েছে বাপ, চুদ্দ পুরুষ জলঃগহন কইর‍্যেক নাই উয়ার হাতে। সিখ্যেনে মাইন্‌ষের জাত-ধরম লষ্টো হয় গ'।

জ্যালের ঘানি অবশ্যি এখনও টানতে হয়নি ভোমরাকে। এখন রাতটা হাজত বাস। রাত পুইলে নাকি বাবুরা চালান করবেন কুর্টে। সিখ্যেনে ভমরা মাঝির বিচার হব্যেক। বিচার অন্তে সাজা। ঠিক কী ধরণের সাজা হতে পারে সেটা আগাম আন্দাজ করা মুস্কিল। তবে এই কিছুক্ষণ আগে খাঁকিবাবুরা সব জনায় জনায় রেলিংয়ের পাশটিতে এসে শাসিয়ে গেছেন, অন্ততঃ দশটি বছর লপ্‌সি না খাইয়ে ছাড়বেন না ওঁরা। বুকটা হিম হয়ে আসে!

পুলিশ যখন ভমরাকে জিপগাড়িতে তুলে নিয়ে আসছিল থানায়, তখন দু'ধারে লোক জমেছিল অনেক। অনেক ভীতসন্ত্রস্থ কৌতূহলী মুখ। ভীড় কেটে কেটে জিপ গাড়িটা চলছিল ধীরলয়ে। পাশ থেকে দু'একজনের চাপা গলার স্বর ভমরা মাঝির কানে এসেছে। লোকটা লকশাল হে। ভাবতে গিয়ে ভমরার পা'দুটো পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। ছাতির মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে, ঢুঁকুর দুম, ঢুঁকুর দুম।

রেলিংয়ে দু'হাত চেপে ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ভমরা মাঝি। বাইরের হলঘরে হুলুস্থুল কাণ্ড। কথা বলবার যন্ত্রে মুখ ঠেকিয়ে অনর্গল কথা। অকারণে হুংকার, গর্জ্জন, টেবিল চাপড়ানি। মালঘর থেকে খানকয়েক বন্দুক নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল জনাকয়েক। ভমরা মাঝি বাবুদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখতে থাকে ভুলভুল করে।

এখন রাত গভীর। শহরে অবশ্যি রাত খুব একটা গভীর হয় না কোন দিনও। আলো-বাতি জ্বলে। বাস-টেরাক হুঁকুরে ছুটে যায়। রিক্সা ছোটে পুঁকপুকিঁয়ে। মিটিমিটি বাতি জ্বলে জুনিপোকার পারা। রাতভর রেলের আবাজ, হুইশিল। শহরের রাতকে সর্বদা সইন্‌ঝা পহর লাগে। কিন্তু ভমরা মাঝির হুলমারা গাঁয়ে এখন ঘোর নিশুত রাত। সেখানে সইন্‌ঝা পহরেই ঝুপ করে মরে যায় গাঁ-গঞ্জ, মাঠ-ঘাট-জঙ্গাল। তখন নিঝ্‌ঝুম অন্ধকারে অসংখ্য নিশাচর প্রাণীর সতর্ক পায়ের খস্‌খস্‌, সর...সর আওয়াজ। বিলের পগারে গাঁ বাঁচিয়ে ছুটে যায় সাট্‌না। গাছের ডালে ডালে ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে নিদালু গুঁড়চ্যারা। সোঁদাল ঝোপের মধ্যে ঠরকা ব্যাঙ নিঃশব্দে পোকা ধরে গিলে ফেলে।

হুলমারা গাঁয়ের এই অশরীরী পরিবেশে কোলের বাচ্চাটা হয়তো এতোক্ষণে কুন্দপিসির পাশটিতে নিদাচ্ছে। মা বিহনে নিদাবে কি? মাকে ছাড়া একটি রাতও তো থাকে নি জীবনে। সেই ছেলেকে সামাল দিতে গিয়ে কুন্দপিসির হয়তো এতোক্ষণে আগলবাগল অবস্থা। পেটের ছেলের কথা ভেবে ভেবে এতোক্ষণে মালতীর মনও নিশ্চয় উচাটন। ডুকুরে কেঁদে ভাসাচ্ছে নিশ্চয় ছাতিম তলার রুখা পাথরের বুক। লম্লাট্‌।

মোচের বাহার আর বসবার কায়দা দেখে মালুম হয় কোণের ঐ মোটা কুঁদলা লোকটিই বড়বাবু। কাজকাম, কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে খটাসের মতো কনকনে ঠাণ্ডা চোখে তাকাচ্ছিলেন ভমরার দিকে।

একসময় কাঁদো-কাঁদো গলায় কথাটা নিবেদন করলো ভমরা মাঝি ঃ আমাকে ছেড়ে দ্যান্‌ হুজুর। আমার বউ একলাটি রইয়েঁছে আইজ্ঞা বাইরে। উ ভারি ডরছুটকা হুজুর।

উপস্থিত সবাই ওর দিকে তাকায়। একসময় হ্যা-হ্যা করে হেসে ওঠে। ভমরা মাঝি তখন মরিয়া। দু'হাত বুকের কাছটিকে জড়ো করে সে উগরে দিতে থাকে তার যাবতীয় দিগ্‌দারির কথা।

ঃ ঘরে মোর তিন বছরের ছাঁ হুজুর। থাণ্ডা-কাশ-জ্বর। উয়াকে ভাইল্‌বার লেগ্যে কোউ নাই আইজ্ঞা।

ভমরার চোখের পাত্‌নি ক্রমশঃ ভিজে আসে। থোত্‌না কাঁপতে থাকে। সর্বাঙ্গে প্রবল আক্ষেপ শুরু হয়।

বড়বাবুর চোখে-মুখে সুক্ষ্ম হাসির তরঙ্গ খেলে যায়। বলেন ঃ ছাড়বো? তুমি যে মানিক এই খানিক আগে একটা মার্ডার করে এলে? এখন কিছুদিন মামাবাড়ির ভাত খাও।

ভমরা মাঝির মুখে কথা সরে না। বোবার মতো তাকিয়ে থাকে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে। 'মার্ডার' শব্দটা সর্বাঙ্গের কোষে কোষে অর্থময় হয়ে চারিয়ে যেতে থাকে। যাকে মার্ডার করার কথাটা উঠলো, তার চোখ, মুখ, সারা অবয়ব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভমরা মাঝি স্পষ্ট দেখতে পায়, লোকটি সারা মুখে দুনিয়ার তাচ্ছিল্য জড়ো করে মিটিমিটি হাসছে ঃ ছ্যা ছ্যা, শেষকালে লোকের আঁইঠা বুটি কুড়িয়ে খেলি রে ভমরা? ছ্যা ছ্যা। তুই মানুষ, না কুকোর রে? ইলচি করে আরও অনেক কথাই বলেছিল লোকটা। সব এখন মনে নেই। সব কথা তখন মন দিয়ে শোনার মতো অবস্থায় ছিল না ভমরা। তখন কেবল চোখ এবং গলা জুড়ে কান্না জমছে কুয়াশার মতো। আর মগজ জুড়ে চণ্ডাল রাগ। ঐ রাগটাই জয়ী হোল।

ভাবতে ভাবতে শরীরের প্রতিটি রোমকূপে অগ্নিসঞ্চার হয ভমরার। চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। চোয়াল কষকষ করে ওঠে।

ঃ বেশ করেছি। শালাকে ঠিক ওযোধটি দিবা হয়্যেছে। যমন ঠাগরের তমন পূজা। বরঞ্চ টুকচান্ কম্ হয়্যেঁ গেল লাথান্টা। ভমরা মাঝি মনে মনে উচ্চারণ করে ঃ কি আর করা যাব্যেক। তলপ্যাটে খান-দুই লাথ খেঁইয়্যেঁ বাছাধন কাটা কলাগাছটির মতোন আছড়াঁই পড়লো ভুঁইয়ে। রাগখান তুঙ্গো ছিলো। উই আবেস্তায় শালার মুয়ে দমাদ্দম আরও দু'লাথ।

ভাবতে ভাবতে দাঁতের পাটি কিড়মিড়িয়ে ওঠে ভমরা মাঝির।

ততক্ষণে খাঁকি বাবুরা ওদিকে বসে দেশ-গাঁয়ের মানুষজনের অধঃপতনের কথায় মেতে উঠেছেন। গাঁয়ের ছোটলোকগুলোর কি আকাশপ্রমাণ সাহস বাড়ছে দিনকে দিন, সেই রোষেই জ্বলতে থাকেন ওঁরা।

ঃ আমি আপনাকে সেদিন বললাম না? ঐ হুলমারা-বগ্‌ডহরার দিকটাতেই শালারা মৌচাক বেঁধেছে। গভীর রাতে মিটিং করছে খড়কাটার জংগলে।

ঃ কিন্তু আমি অতোটা ভাবি নি। ওরা যে মিনিস্টারের প্রোগ্রামেও অপারেশন চালাতে পারে, এটা আমার চিন্তার বাইরে ছিল।

ঃ তবে কিনা শালারা পালাবে কোথায়? একদিন খড়কাটার জংগল ঘিরে...।

ভমরা মাঝির ওসব কথায় পুরোপুরি কান নেই। সে ভাবছিল আজকের পুরো ঘটনাটা। কেন যে ঘটনাটা ঘটে গেল আজ! কেন যে মাথার মধ্যে চণ্ডাল রাগটা চাগাড় দিয়ে উঠলো! আসলে পেট থেকেই যতো রোগের উৎপত্তি। যত রিপুর তাড়না ঐ পেট থেকেই। পেট খালি থাকলে কোনও কোনও রিপু হিংস্র বেসামাল হয়ে ওঠে।

আজ যে পার্টির বাবুদের সাথে মিছিলে আসা, সেও ঐ পেটের টানে। দেশ গাঁর আগাশ জুড়ে শাগ্‌না উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। বচ্ছরটাই খাটারশাল্ অজন্মা। নুয়ান আর কেলাশ ধান হয়নি। আমনও নামমাত্র। এখন, এই ফাগুনের পয়লা হপ্তায় বাঁধে-জোড়ে জল নেই। রুখা ধরিত্রীর বুক খাঁ খাঁ। তপ্ত নীল আকাশ জুড়ে ডোমচিলেরা চক্কর মারে। ঢেপুয়া খালের তলায় থিকথিকে বত্ জমেছে।

এলাকায় কাজ-কামের দাবী নিয়ে মাঝে মাঝে বিষ্টুপুরে মিছিল নিয়ে যান বাবুরা। ভমরা মাঝি সব মিছিলেই থাকে। কারণ একটাই। মিছিলের শেষে যৎকিঞ্চিৎ দানাপানি

মেলে। শোনা গেল, আজকের মিছিলে প্রত্যেককে দু'কেজি গম দেওয়া হবে। আশায় আশায় বুক বেঁধে সকাল সকাল হাঁটা দিয়েছিল ভমরা। বউকেও নিয়েছিল সাথে। কোলের বাচ্চাকে রেখে এসেছিল কুন্দ পিসির কাছে।

মিছিল টিছিল হোল। বাবুরা মাইক হাঁকড়ে বক্তিতা করলেন। কাকে যেন বাখান টাখান দিলেন জোর গলায়। কিন্তু কাজের কাজ হোল না কিছু। লৈতন বিডোসাহেবটি য্যান পাঁকাল মাছ। গলায় মধু ঢেলে বললেন, গম-চাল, দানাপাণি বলতে কিছোটি নাই ইষ্টকে। মিঠা কথায় কাম সারলেন তিনি। মিছিল গেল ভেঙে। চিকনবাবুরা সব চলে গেলেন যে-যার ধান্দায়। শালা ভমরা মাঝি সারাদিনের ভুখা পেটটি লিয়ে বুড়া আঙুল চুষে চুষে ঘরে যা!

তখন বেলা লি-লি। চাকি ডুবু ডবু। ভমরা মাঝি বউকে নিয়ে হাঁটতে লাগলো এলোমেলো। একখানে দাঁড়িয়ে রাস্তার কলে মুখ ঠেকিয়ে জল খেল : ইখন কি করবি রে? ঘর চ'।

বউ শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বাস্তবিক, এখন ঘর যাবার কথায় ছাতি থরে। সারাদিনের উপোসী শরীর নিয়ে আবার ঐ মৃত্যুগুহায় ঢোকা! পথও তো কম নয়। কাটান্ধার দিয়ে সট্কনে মট্ কনে চলে গেলেও ঘরে পৌঁছুতে দুটি পহর রাত। এখন অন্ধকার পক্ষ। পিছলি জোছ্না। দাগাশোলের জংগলে সইন্ঝা হলেই পথ আটক করে বসে থাকে হুঁড়ারের দল।

আসলে হুঁড়ারের ভয়টাও ঠিক নয়। ভমরামাঝির ঘরে ফেরার পথ আগলে বসে আছে আরও এক মস্ত কেঁদুয়া বাঘ। প্রবল আক্রোশে ধারালো নখ নিয়ে হাঁচড়াতে লেগেছে পেটের নরম ভুঁই। ঐ বাঘটার ভযেই গাঁয়ের পথে পা' বাড়াতে সাহস হয না ভমরাদের। বিশেষ করে উপোসী বাচ্চাটির মুখখানা মনে পড়লেই কান্না আসে বুক জুড়ে।

বউ মিনমিনে গলায় বললো : অতো বল্লোক রইয়েঁছে শহরে, মাগা-যাচা করে এক ঠুঙা মুড়ি কিনা যাব্যেক নাই মোর খ্যাঁদাটার তরে, হাঁ গ'?

ভমরা মাঝি এদিক ওদিক তাকায়। অনেক শহুরে বাবু-বিবির দল সেজেগুজে চলেছেন রসিকগঞ্জের দিকে। ভমরা চলমান মুখগুলোর ওপর চোখ ফেলে। খোসমেজাজে চলেছেন সব। নিশ্চিন্ত, নিরাসক্ত মুখ। সুখী সুখী শরীর। দেখেশুনে ভরসা পায় না ভমরা মাঝি। তবুও ওদের পিছু পিছু অনাবশ্যক হাঁটতে থাকে।

রসিকগঞ্জে বাবুদের বল খেলবার মাঠ। পাঁচিল দেওয়া মাঠে থাকে থাকে পাকার সিঁড়ি। সেই ম্যাঠে অজস্র আলো-বাতির বাহার। বাদ্যি-বাজনা। মাইকে চড়া গান। অগুনতি লোক গিস্গিস্ করছে। সামনে বিশাল গেট। তাতে উজ্জ্বল আলোর হরেক আল্পনা।

সামনে এসে গাঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো ভমরা মাঝি। বউটাও বড় আদেখ্লা। ভুলভুল করে তাকায়। অলবলে দৃষ্টি চারায় দশদিকে। খালি উস্খুস করে। খালি ঢুকে পড়তে চায়। ভমরা মাঝি বিরক্ত হয়। দাঁড়ারে বাপ্। অত আঁটুপাঁটু ক্যানে? কিসের মজলিশ, কি বিত্তান্ত, সব সুড়ুকসন্ধান লিতে দে। হুট কর্য়ে কুথাকে সেঁধ্যাবি তুই। শেষ মেষ ভালামন্দ কিছো একটা হয়ে গেলে?

ভীড়ভীড় করে ঢুকছে মানুষজন। কাতারে কাতারে। ভমরা একে ওকে শুধোয় : ইখ্যেনে অত ভ্যাজাল (ভীড়) কিসের গ' বাবু? অত মেইযামদ্দ হুড়হুড়চ্ছে ক্যানে? বিজলীবাতির আলো য্যান্ দিনের পারা ফিটফিটাচ্ছে। চঙায় গান, দকান-পসার—ইখ্যেনে কি হচ্ছে আইজ্ঞা?

: মেলা বসেছে এখানে।

: মেলা? ত কিসের ম্যালা আইজ্ঞা? কুনো পরব-টরব তো লয ইখন। টুসু পরব তো চুক্যেবুক্যে গেঁইছে সিই পৌষে। তেবে?

: সে মেলা নয় হে। এ হোল কৃষিমেলা।

ভমরা মাঝি অবাক মানে। কিষিম্যালা আবের কি'বে বাপ? কুন পরবে হয় সিট্যা? গাঁয-ঘরে তো টুশুপরব, পৌষমেলা, এখ্যান্ পরব, গাজন লাচ। কিষি ম্যালাটা আবের কি চিজ?

দেখতে দেখতে ভমরা মাঝি নিজেকে একটু চান্‌কে নিল। তারপর এক পা দু'পা করে একসময ঢুকে পড়লো ভেতরে।

বাপরে বাপ! ভমরা মাঝির মুখে কথা জোগায় না। একি আজব ম্যালা' বসিয়েছেন বাবুরা! ঝকঝকে মাঠের চারপাশ ঘিরে খোপ খোপ দোকান। সাফ-সুতরা। সাজানো-গোছান। আলোয় আলোময়। মাঠের মধ্যিখানে ঢাউস মঞ্চ। তাতে বিচিত্রবর্ণের ঝালর। সারা চৌহদ্দি জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝলমলে পোষাক পরা, গয়ানা-গাঁটিতে অঙ্গা মোড়া বড়সড় ঘরের বউ-ঝির দল। শাঁকালুর মতো নিটোল অঙ্গা সব। ঘুরছে, ফিরছে, কেনাকাটা করছে। আমোদ-আহ্লাদে গলেগলে পড়ছে সবাই।

দেখতে দেখতে ভমরা মাঝি মনে মনে কুঁকড়ে যায়। এমন থানে নিজেদের নিতান্তই বেমানান ঠেকে। মনের মধ্যে কুতকুত করে ভয়। কখন উঁয়াদ্যার স্বর্ণ অঙ্গো গা' ঠ্যাকে যায় এই আশঙ্কায় স্বস্তি পায় না একতিল।

গাঁ-ঘরের মেলা পরবে অতো বাধো বাধো নেই। সেখানে লাল কাঁকুরে ডাঙ্গায় মহুল-পিপুলের তলায় জমে ওঠে ওদের পরবের মেলা। খোলা আকাশের তলায় ফুলুরী-বেগুনীর ডাঁই। চানাচুর, বত্রিশভাজার স্তূপ। ফুরিয়ে গেল দাদা! টলোমলো কাঠের টেবিলে রঙ্গীন সরবতের গেলাস। সন্ন্যাসী লায়েকের সারা অঙ্গো সেফটিপিন; মাথায় ফিতে, ক্লিপ, কানের দুল, হার, ঘুনসী, মালা, বুকের প্রজাপতি, মাথার সিঁথি, হরেক চীজ নিয়ে মেলাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। যা-রে কিলিপ উড়ে যা, আমার বুক থিক্যে দিদির চুলে যা। গোলাপী রঙের আইসক্রিম মুখে পুরে ছুটে বেড়ায় কালো কালো বাচ্চারা। হাজার পায়ের চাপে লাল ধুলোয় ধুলাকার হয়ে থাকে বাতাস। নেশায় চুর হয়ে ঐ মেলায় ঘুরতে বড় সুখ! অতো চাকচিক্য নাই বটে, কিন্তু জীবন সেখানে পুরোপুরি নির্ভয়। উলঙ্গা শিশুর মতো খোলামেলা। সেখানে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে সারাক্ষণ অমন কুঁকড়ে থাকতে হয় না ভমরাদের।

: উরে ব্যাস! সুমুখের মূত্‌তিগুলানের পানে ভাল্ (দ্যাখ্) বউ।

মালতিও অবাক বিস্ময়ে দেখছিল। বললো : ইগুলান্ কি ঠাকুর?

ঠাকুর লয় বোধ লেয়। এর কেমন মালকোছা মারা গাঁট্টাগোট্টা শরীর। ইয়া বড় ছাতির পাটা। মাথায় পাগড়ি। ঝাঁকড়া মোচ। তার তলায় চিকন হাসির রেশ। ঠাকুর লয়। মানুষ লিঘ্যাৎ। তেবে খাবাদাবা করয়েছে গ্যাদাড়ে। হাড়-পাঁজরায় মাষ লেগ্যেছে দম্মে। ভমরা মাঝির ভুরুজোড়া কুঁচকে ওঠে, বাস্তবিক, এ শালা কে বটে? পাশের শালিটাকেও চিনত্যে লারল্যম। গায়গত্তে য্যান চৈতালী ডিংলাটি। শাড়ি-বেলাউজ টেঁসে পরেছে। কপালে টিপ। পায়ে মোটা মোটা খাড়ু। হাতে দশ-বিশ গাছা চুড়ি-কাঁকন। ভমরার দিকে চেয়ে মিচিক মিচিক হাসছে।

তুরকীর মেলাতেও অনেক মূর্তি গড়া হয়। ঠাকুর-দ্যাবতার মূর্তি। পুরাণের গল্প-গাথা। বকরাক্ষস বধ, ভীষ্মের শরশয্যা, কল্কি অবতার, এইসব। সেসব মূর্তির সাথে এদের কোনও মিল নাই।

একে ওকে শুধিয়ে অবশেষে মূর্তির হালহদিস মেলে। শুনেটুনে ভমরা মাঝির দু'চোখ কপালে উঠে যায়। ইট্যা চাষার মুর্তি? আর উট্যা চাষার বউ? এ কুন দ্যাশের চাষা আইজ্ঞা? কি খেঁইয়্যেঁ অমন পাকা-কাঁঠালের পারা গতরটি বানিয়েছে? সে দ্যাশে কি বুনা ওল আর বাওড় আলুর জোর বেশি আইজ্ঞা?

বাস্তবিক, অমন সুপুরুষ চাষা ভমরা তার বাপের জন্মেও দেখেনি। চাষা হবে ঠিক চামচিকাটির মতো। তার পেটের চাম পিঠের সাথে মিশে যাবে। সে কাঠির মতো পা' দু'খান্ টেনে টেনে হেঁটে চলে বেড়াবে। আর চাষীর বউ? ষোল বচ্ছর থেকে এক নাগাড়ে বিয়োতে বিয়োতে আর কাঁচা গতরে ভোখ খিঁচে খিঁচে খাটতে খাটতে, বিশ-বাইশ না পেরোতে তাকে দেখতে লাগবে ঠিক যেন চৈত্রের বগা লাউটি। ছেঁড়াফাড়া এক টুকরো ন্যাকড়ার আড়ালে তার রুখা-শুখা শরীরটা যখন-তখন বেলায় অবেলায় কেঁপে কেঁপে উঠবে। সে নুয়ে পড়লে দুলতে থাকবে পোড়া বেগুনের মতো বুক।

আর এ শালির ঠমক্খানা দ্যাখোনা! কি অঙ্গের বাঁধুনি! কি সাজ পোষাকের বাহার! পাছাজোড়া য্যান্ সাত-শিয়ালে খেইয়্যেঁ শেষ করত্যে লারব্যেক!

দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তে পেটে মোচড় মারে ক্ষিদে। শরীরটা বড় দুর্বল লাগে।

মূর্তির কারিগরটি দাঁড়িয়ে ছিল পাশেই। ভমরাদের গদ্গদ ভাব দেখে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। ভমরা মাঝি কারিগর মশাইয়ের পরিচয় পেয়ে একেবারে ধন্য হয়ে যায়। বলে, বড় জব্বর হাত বটে আপনার। বাহাদুরি আছে বলত্যে হব্যেক। ত' আইজ্ঞা—' ভমরা মাঝির চোখদুটি মিটিমিটি জ্বলছিল। বললো, 'দ্যান্ না আইজ্ঞা, মোর আর মোর মালোতীর হাড় পাঁজরায় টুকচান কাদো-মাটি লেপ্যে। বেশ কুঁদ্দলাটি হয়্যে মোরা বি খাড়া থাকি বাবু-বিবিদ্যার সাইক্ষ্যাতে।

কারিগর হাসে। কাদামাটি গায়ে লেপে মোটা হতে চাস?

: উপায় কি আইজ্ঞা? মাটির ফসল খেইয়্যেঁ তো মোট্টা হলাম নাই এ জন্মে। গায়-গতরে মাটি লেপ্যে মোট্টা হই। টাউনের বাবু-বিবিরা দেখে বড় আমুদ পাবেন গো। গাঁ-ঘরের চাষার মূর্ত্তি দেইখবার লেগ্যে কত্তো সেজ্যে-গুজ্যে, শাড়ি-গহনার বাহার তুলে আইছেন উয়ারা গাড়ি-জুড়ি-চেপ্যে। আ-হা!

অল্প দূরে কারা যেন নাচছে। ভমরা মাঝি পা' বাড়ালো সেদিকে।

পিছু পিছু হাঁটা দিল মালতী। সারাদিনের উপোসী মেয়েটা এসব ব্যাপারস্যাপার দেখে যেন বাক্যিহারা! পেটের খিদেটাও ভুলে গেলো বোধ করি কিছুক্ষণের জন্য।

একদল মোটা-সোটা ফর্সা মেয়ে আঁটো-সাঁটো শাড়ি পরে তালে তালে নাচছে। সেখানে শহরের কাঁচা ছোকরাদেরই ভীড় বেশি। ভমরারা গিয়ে অল্প তফাতে দাঁড়ালো। হাই বাপ! ইয়ারা অমন লাচুনি ধর্‌য়্যেছে ক্যানে গ' ? মালতীর চোখেও বিস্ময় ধরে না। শীর্ণ ঠোঁটে উঁকিঝুঁকি মারে ম্লান হাসি। ইট্যা কি লাচ আইজ্ঞা? টুসু-ভাদু-কাঠিলাচ ত' লয়। তেবে? বিটি-ছেইল্যাদ্যার কোউ কোউ আবার পাগড়ী এঁট্যে মদ্দ সেজ্যেছে!

ঃ এ হোল চাষের নৃত্য।

ঃ বটে বটে! তাইতো! কেমন বার বার নুয়ে পড়ে ধান রুইছ্যে। বাঁ-হাত থিক্যে লিচ্ছে বিচন চারা। আগাশের দিকে বাঁহাত আড়াল কর্‌য়্যে নিরিখ করছে ব্যালা। রাঙা ঠোঁট নাইড়্যে গানও গাচ্ছে সাঙে সাঙ।

ঃ ইয়ারা কুন দ্যাশের মুনিশ-কামিন আইজ্ঞা? বড় আমুদ কইর‍্যে ধান রুইছে গ'। লাচত্যে লাচত্যে এক্কেরে দলকাঁই দিচ্ছে ভুঁই। মেইয়া মদ্দ মিল্যে চোখে চোখ ঠারছে কেমন!

মোদের চাষের টাইমে, হায় বাবু গ', ত্যাখন গা' টলমলায়, মাথা ঘুরঘুরায়, প্যাটের চামে ছুঁচ ফুটায়। ত্যাখন ক্যাবল একটা ভাবনাই জোঁকের পারা কামড়ে থাকে মগজে। কখন এক পাই মুড়ি-ভুজা মিলব্যেক, ছ' ঘড়িটাক ব্যালা হলে। ত্যাখন মনে মনে একখান্ গানই গাই মোরা ঃ হেই বাবা সূয্যিদেব! জলদি জলদি ছুটো হে আগাশে। ছ'ঘড়িটা বাজাই দাও বাপ জলদি।

ভাবতে ভাবতে পেটের চামে আবার ছুঁচ ফোটায়। সারাদিনের উপোসী শরীর তিরতির করে কাঁপে। বাচ্চার শীর্ণ মুখ মনে পড়ে। সাত জন্মের বিয়ে করা বউ ঢ্যাঙা কাঠির মতো মিশে থাকে নিজের ছায়ার সাথে।

ফাগুন মাসে কিষ্টোচূড়ো গাছে দেদার ফুল। বাবুরা সেইসব গাছের সারা অঙ্গে অজস্র লাল-নীল-সবুজ বাতি টাঙ্গিয়েছেন। হরেক রঙের জুনিপোকা যেন হাজারে হাজারে জ্বলছে। গাছে গাছে বেলুন ঝুলছে শয়ে শয়ে।

বড়সড় ঘরের চাকমাদুল্যা (অস্বাভাবিক মোটা) বাচ্চাগুলান বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরে ছুটে বেড়াচ্ছে মাঠময়। সুন্দরী মেয়েমানুষের দল এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে আহ্লাদে। মাইকে ঘন ঘন 'বন্ধুগণ' বলে চেঁচাচ্ছে কে যেন। নৈঋত কোণের তে-কোণা জায়গাটাতে মাংস-পরোটার দোকান। সেখানে ভীড় ভাঙা দায়। কষা মাংসের সৌরভটা হাওয়ায় ভাসতে থাকে। ক্ষিদেটা প্রকট হয়। টাক্‌রা অজান্তে ভিজে আসে। হাতে পায়ের কাঁপুনিটা বেড়ে যায়। বমি বমি ভাবটা প্রকট হয়।

এবং এই ঐশ্বর্যময় স্বর্গোদ্যানকে একটা নির্বান্ধব ভয়ংকর শ্মশানভূমি বলে মনে হয় ভমরা মাঝির।

গারদের মধ্যে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সময় ভাঙছে ভমরা মাঝি। এই মধ্য

রাতেও থানার সবাই ভীষণ ব্যস্ত। সব চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। ঘন ঘন কথা বলার মেসিন বেজে উঠছে। বড়বাবু বার বার বাখান দিচ্ছেন আজকের ঘটনার। ভমরা মাঝির নামটাও সেই সুবাদে বার বার উচ্চারণ করছেন তিনি। যন্ত্র নামিয়ে কথাবার্তার সারাংশ ব্যাখ্যা করছেন অন্যদের কাছে। মন্ত্রী নাকি বেজায় খেপেছেন। সারা দেশে তাঁর নাকি মাথা কাটা গেছে। বিরোধীরা হি হি করে হাসছে। মেলা উদ্বোধনের আগেই এমন একটা সর্বনাশা কাণ্ড কী করে ঘটলো, তার কৈফিয়ত তলব করেছেন তিনি। অবস্থা সামাল দিতে পুলিশের কারো কারো চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।

জেলা-শহর থেকে পঞ্চাশ জন রাইফেলধারী পুলিশ চলে এসেছে ঝটিতি। ঘিরে রেখেছে সারা মেলা। ভেতরে টহল দিচ্ছে জনাকয়। সারা শহরেও আজ সারারাত পাহারার কড়াকড়ি চলবে। এইসব ব্যবস্থা করতে করতে আর ফাগুনের মাঝরাতে ঘেমে নেয়ে উঠতে উঠতে বড়বাবু বার বার ক্ষিপ্ত বাঘের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন ভমরার দিকে। সবকিছুর মূলে এই কালো কুচ্ছিৎ লোকটা! দাঁড়া, এদিকের ঝামেলাগুলো একটু সামলেসুমলে নিই, তারপর আমছ্যাঁচা করবো তোকে। বড়বাবুর চোখদুটো টিকিয়ার মতো জ্বলতে থাকে।

আমছ্যাঁচা আর করতে হোল না। তার আগেই দু'জন বাবুলোক এলেন থানায়। বড়বাবু একটু নড়েচড়ে বসলেন। খাতির করে বসালেন ও'দের।

ওঁরা ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন ভমরা মাঝির দিকে। বিস্ময়ে কৌতূহলে ভরভরাট চোখ।

ঃ লোকটার সাথে একটু কথা বলতে পারি?

ঃ ওর সাথে? বড়বাবু চমকে ওঠেন। ডেঞ্জারাস লোক মশাই।

ঃ জানি। এই লোকটা বিষ্টুপরে হিরো বনে গেছে। বলবো, একটুখানি কথা?

ঃ বলুন। তবে লাভ হবে না। ও অন্য ডালের পাখি।

বাবুরা পায়ে পায়ে এসে গারদের সামনে দাঁড়ালেন। মিটিমিটি চোখে দেখলেন ভমরাকে। ভমরা মাঝি আশায় আশায় বুক বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। এক সময় ডুকুরে কেঁদে ওঠে, মোকে বাঁচান বাবু।

ঃ কি নাম?

ঃ ভমরা মাঝি আইজ্ঞা।

ঃ বাড়ি কোথা?

ঃ হুলমারা হুজুর।

খানিক চুপচাপ। ভমরাকে আবার জরিপ করতে থাকেন ওঁরা।

ঃ হুলমারার বঙ্কুবিহারী আইচকে চিনিস?

ঃ বঙ্কাদাকে? চিনি আইজ্ঞা। ভমরা অকুলপাথারে খড়কুটো পেয়ে আঁকড়ে ধরে। উয়ার পন্‌দরো কাঠা শোলজমিন ভাগে করথ্যাম মুই। ত' গেল সনে বঙ্কাদা সিট্যা কেড়েকুড়্যে লিল্যাক। বঙ্কাদা বইল্‌ল্যেক, অরে ভমরা, জমিনটা দে। উয়াতে মুইবোরোচাষ করি। মুই বললাম, উ তো বত্‌জমিন দাদা। উয়াতে তো বোরোধান হব্যেক নাই—।

ঃ থাক থাক। লোকটি কেমন?

এবার ভারি দোটানায় পড়ে যায় ভমরা মাঝি। আজকাল মানুষ সম্পর্কে চটজলদি বলা যায় কিছু? মানুষ বড় ঘনঘন রঙ বদলাচ্ছে। আজ যে তুলসী কাঠের মালাটি পরে, সারা অঙ্গে রসকলি এঁকে নামগান করলো 'অষ্ট পহরের' থানে, কাল শুনি কোনও বেধবার পেটটি করে দিয়েছে অক্লেশে। আজ যে ল্যাতাটি বড় বড় বাখান দিলেন সরকারী আপিসে চুরি-চামারির কথা তুলে, তাকেই দেখি সইন্‌ঝা পহরে মাথায় জিয়ারের গম চাপিয়ে অন্ধকারে বনবাদাড়ে ভাঙছেন অবলীলায়। ভালো-খ্যারাব এসব বলা ভারি শক্ত এযুগে।

চিকনবাবুরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছেন ভমরা মাঝির জবাবের জন্য।

ভমরা খানিক ইতস্ততঃ করে। বলে, লোক আবের ক্যামন? উই জুদ্দার লোক যমনটা হয়।

পেছন থেকে ঘর ফাটানো হাসি হাসলেন বড়বাবু।

ঃ বলেছিলাম না? এ অন্য ডালের পাখি।

বাবুরা পিছু ফিরলেন। মাপা পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন বড়বাবুর সামনে।

ঃ আমরা আবার কাল সকালে আসবো। দেখবেন মশাই, মন্ত্রীমশায়ের মান ভাঙাতে লোকটার কলিজা থেকে জানটা বের করে নেবেন না যেন। তাহলে কিন্তু পরশুই বিষ্টুপুর বন্দ্।

বাবুরা চলে গেলেন। বড়বাবু রাগে জ্বলছিলেন। শালাদের কিছু বলাও যায় না। দুদিন বাদে হয়তো এরাই আবার গদিতে আসবে। ভমরার দিকে কটমটিয়ে তাকালেন বড়বাবু। গলায় নিদারুণ শ্লেষ মিশিয়ে বললেন, তুই শালা যে ভি.আই.পি হয়ে যাচ্ছিস রে ক্রমশ। একটুবাদে হয়তো স্বয়ং মন্ত্রী আসবেন তোকে দলে টানতে।

কিন্তু মন্ত্রীমশাই এলেন না। তার বদলে যিনি এলেন, তাঁকে দেখে থানার সবাই চমক খেল। শহরের খুব গণ্যমান্য লোক তিনি। টাকা-পয়সার মালিক। অনেক কমিটি-সমিতির সঙ্গে যুক্ত। ইদানিং পুলিশ এক গোপন খবরে জেনেছে, ওঁর সাথে উগ্রপন্থীদের নাকি খুব সূক্ষ্ম অথচ গভীর যোগাযোগ আছে। পুলিশ আরও সুলুকসন্ধান করছে।

ওঁকে দেখে বড়বাবু কাষ্ঠহাসি হাসলেন। বড়বাবুর সাথে একটুক্ষণ কথা বলেই উনি এগোলেন ভমরা মাঝির দিকে। চোখে মুখে আশ্চর্য বিস্ময়!

ঃ তুই পারলি! তোর যে চামচিকার মতো শরীর রে!

ঃ হঁবাবু। খাদ্য বিহনে—।

ঃ থাক থাক। বুঝেছি। কার কথায় এমন কাজটা করলি বল তো?

ঃ কারো কথায় লয় হুজুর। আচমকা বড্ড রাগ হয়ে গেল। শালা, অমন চোখে চাইলো আমার দিকে। অমন ইলচি কয়্যে কতা-বাত্তা বইল্‌লো—

ঃ ঠিক আছে। ঘাবড়াস নি। আমরা তোর ব্যাপারটা দেখছি। তুই কাল সকাল থেকে কেবল 'ইনকিলাব জ্বিন্দাবাদ' বলে চেঁচাতে থাক। আর কারুর কথার কোনও জবাব দিবি নে।

ফিসফিসিয়ে কথাগুলো বলে পিছু ফিরলেন তিনি। ভমরা মাঝি হাজতের ভেতর থেকে গরুর মতো চোখে তাকিয়ে রইলো।

ঘর ফাঁকা হলে বড়বাবু পায়ে পায়ে এলেন ভমরা মাঝির পাশটিতে। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। মৃদু গলায় বললেন, 'তোমার ঘরানা তো, মাণিক, ঘনঘন পাল্টাচ্ছে। আর তো তোমায় বাঁচিয়ে রাখা গেল না।'

'মোকে বাঁচান হুজুর।' ঝপ্ করে পায়ের তলায় বসে পড়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বড়বাবুর পা'দুটো জাপটে ধরলো ভমরা মাঝি। বললো, 'মুই বড় গেরিব আইজ্ঞা। হীনমান।'

'তুই তবে বল, কে তোকে দিয়ে এমন মারাত্মক কাজটা করালো?'

'ই বাবা!' ভমরা মাঝি আকাশ থেকে পড়ে, 'কেউ বলে নাই আইজ্ঞা। বাবা ষাঁড়েশ্বরের কিরা।'

বড়বাবুর দু'চোখ গাঢ় সন্দেহে দুলতে থাকে। বলেন, 'তাহলে অমন এলোপাতাড়ি লাথি মারলি কেন ওর মুখে, তলপেটে?'

ভমরা মাঝি চুপটি করে ভাবে। লাথি মেরে মেরে একজনকে মাটিতে ফেলে দেবার সংগত কারণগুলো বুঝি একত্র করতে থাকে মনের মধ্যে।

ধুমসী মেয়েগুলোর চাষীলাচ দেখতে দেখতে মেজাজটা একদম খিঁচড়ে গেছলো ওর। সেই অবস্থায় মেলাটা এক চক্কর ঘুরেছিল ওরা। কিন্তু সঙ্গোর গ্রহটি কি একতিল স্বস্তি দেয়? পেটের মধ্যে খালি ধাড়ি মুষার মতোন হাঁচোড়-পাঁচোড় করে। ধারালো নখ দিয়ে ফালাফালা করতে থাকে নাড়ি-ভুঁড়ি। তারই ঠেলায় ভমরারা এসে দাঁড়িয়েছিল পরোটা-মাংসের দোকানের সামনে। অনেকক্ষণ ধরে ভাজা পরোটা আর কষা মাংসের ঘ্রাণ নিয়েছিল নাক ভরে। বউটা ভুলভুল করে দেখতে থাকে মানুষজনের খাওয়াদাওয়া। মাংসের হাড় চোষার আওয়াজটা বুকের মধ্যে ঢুকে বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ শিস্ দিতে থাকে অবিরাম।

বউটা অল্পস্বল্প টলছিল। সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল খাদ্যবস্তুর দিকে। ভমরা মাঝি ওর শীর্ণ হাতখানা ধরে। দুজনে চোরের মতো চলে আসে সেখান থেকে। অমন শত্রুপুরীতে আর একদণ্ড দাঁড়াতে সাধ হয় না তার। একদণ্ড না।

ওদের সামনে হাঁটছিল এক বড়ঘরের বউ। সারা অঙ্গ জুড়ে অগাধ গয়না। চাটিম কলার মতো গায়ের রঙ। জরিপাড় শাড়ী। সংগে ছিল নাদুসনুদুস এক বাচ্চা। তার হাতে ছিল কেকজাতীয় একটা খাবার। আয়েস করে খাচ্ছিল ও। ফুরফুরিয়ে হাঁটছিল। একসময় আধখাওয়া খাবারটা মাটিতে ছুঁড়ে দিল বাচ্চাটা। ভমরা মাঝি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বউয়ের সাথে চোখাচোখি হোল পলকের তরে। মনে পড়লো, ঘরে ফেলে আসা উপোসী বাচ্চাটার মুখ।

পায়ের তলায় পড়ে থাকা খাদ্যবস্তুটি মহার্ঘ হয়ে তাকিয়েছিল ভমরা মাঝির দিকে। ভমরা এদিক ওদিক তাকায়। তারপর একসময় নুয়ে পড়ে টুপ করে কুড়িয়ে নেয় ওটা। হাত দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে এগিয়ে দেয় বউয়ের দিকে।

ঠিক সেই সময়েই ওর চোখাচোখি হয় লোকটার সাথে। চোখে মুখে সীমাহীন ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য।

ঃ ছ্যা ছ্যা। শেষকালে কুকোরের মতো লোকের এঁটো কুড়িয়ে খাচ্ছিস রে? ছ্যা ছ্যা!

সারা শরীর এমনিতে জ্বলছিল ভমরার। লোকটার কথা শুনে তা শতগুণ তীব্র হোল। চোখের কোণা দিয়ে বিষাক্ত গরল ঢেলে ভমরা শুধোলো, 'কে হে তুমি? কাঁচা কার্ত্তিকটি সেজ্যে খাড়া রইয়েছো ইখ্যেনে?'

'হুঁ হুঁ, লোকটি পরিপাটি হাসে, 'শুধুমুধু খাড়া নাই হে। বাবুরা এনেছেন। টুকচান্ বাদে মন্ত্রী-মশাই এসে একটা রূপার দা দিবেন মোকে।'

'ক্যানে?'

'বা' রে! মুই যে ই তল্লাটের সেরিয়া—চাষী।'

ভমরার সারা শরীর রাগে রি রি করে ওঠে। বমি আসে। দাঁতে দাঁত চেপে শুধোয়, 'বটে! তা, কুন দ্যাশের চাষা হে তুমি? বড় লধরপানা অঙ্গা যে তুমার! কি লাম বটে?'

'মুই হুলমারার ভমরা মাঝি হে।'

যেই না বলা, আচমকা শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে গেল। চোখের সুমুখে আবিশ্ব টলোমলো। বুক জুড়ে আবহমানকাল সঞ্চিত রাশি রাশি ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, আক্রোশ তরল ধাতুর মতো গলে গিয়ে প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে নিঃসারিত হ'তে লাগল তীব্র গতিতে।

এবং চাষীটা আরও কিছু বলার আগেই ভমরা মাঝি শরীরের সমস্ত শক্তি ডান পায়ে জড়ো করে ওর তলপেটে নিশানা করে মারলো এক মোক্ষম লাথি। প্রতিপক্ষ সংগে সংগে আছড়ে পড়লো মাটিতে।

বলতে বলতে ভয়ে আশঙ্কায় ভিজে আসে ভমরা মাঝির গলা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'মুই কি কর‍্যে জানবো হুজুর? ই শালা রঙচঙা পিটাই শরীরখান্ অতো পলকা? খালি ক'টা খড়ের আঁটি। হাজার টাকার চিজ, অথচ একটা খুঁটাও পুঁতা নাই মাটির গহীরে, মুই মুরুখ্যু-সুরুখ্যু লোক, কি কর‍্যে সিটা জানবো আইজ্ঞা? কি কর‍্যে সিট্যা জানবো?

বাঘের ডাক

বিন্দো ভক্তার কিছুতেই আর গা গরম হয় না। খড়কুটোয় জ্বলে ওঠা আগুনের সামনে বসে, হাতের তালুদুটো সামনে মেলে ধরে সে। তালু দিয়ে উত্তাপ পাচার করে সারা শরীরে। মাঝে মাঝে তালুতে তালুতে ঘসাঘসি করে দু'হাত চেপে ধরে দু'কানের ওপর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

উদোম পিঠখানা পড়ে থাকে আড়ালে। পৌষের উত্তুরে হাওয়া ছুরির মতো ফালা-ফালা করে কাটে। রোমগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুঁয়োপোকার গায়ের মতো।

গেল শীতের শেষাশেষি বলকের বাবুরা একখানা সস্তাদরের চাদর দিয়েছিল। পঞ্চায়েতের অফিসে তিনদিন ধর্ণা দিয়ে বহু কষ্টে মিলেছিলো ওটা, টিপছাপ দিয়ে। পুরো বছরটা ঐ চাদর সম্বল করেই কেটেছে। গায়ে দেওয়া, বিছিয়ে শোওয়া, মাঝে মাঝে ওটাই পরে লাজ ঢেঁকানো। ফালাফালা হয়ে ঝুলে পড়েছে ওটা, তিন দিকে। সেটাই গায়ে জড়িয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা। গেঞ্জি অবশ্যি একটা ছিল। বেশ জব্বর গেঞ্জি। মোটা সুতোয় বোনা, ঘন নীল রং, টানলে সরে। সবাই বলে 'অন্ততঃ পঁদ্‌রো ট্যাকা দাম!' কি করে পেল এমন বাহারি চিজ? ভগমান। তিনি জোটালেই জোটে।

মহাপাত্রদের খোকাবাবুটা—কোলকাতায় কি যেন পড়ে—দিন দিন মুটোচ্ছিল বাল্‌কা মাটির লাল মুলোর মতো। শরীরের মাঝখানটাই শনৈ শনৈ বাড়ছে। হাতদুটো য্যান ঢেঁকির মুষল, পা দু'টো য্যান কলাগাছের গুঁড়ি। সেই গুঁড়ির একটা টিপতে টিপতে ক'লাম—"ও দা'বাবু, রগাসগা মাইন্‌ষি, শীতে বড্ডে ভুগতিছি। দ্যাও কেনে একটা পিরান-টিরান। ও দা'বাবু!"

"পিরান-টিরান!" কেমন আদুরে আদুরে গলায়, চোখ বুজে বললো ম'দের ছোটবাবু। তেমন গা করলো লাকো কতাটায়। টিপলাম। অনেকক্ষণ। টিপতেই থাকলাম। চোখ বুঁজেই থাইক্‌লেন তিনি। শেষমেষ বাবুর কাপড় কাচার টাইমে এক্কেরে হেদায়ে পইড়লাম। নীল মোটা গেঞ্জিটা লিয়ে বইল্‌লাম "ও দা'বাবু ইটা মু' লিলাম। তুমরা লা দিলে দিবে কে, কও? গেরিবের মা-বাপ আর কে রইয়েছে এ বেশ্ব-সম্‌সারে?"

ছোটবাবুর গায়ে গেঞ্জিটা ঢুকতো লাকো ইদানিং। যা গতর একখান বানায়ছ্যান বাবু ম'দের। ব্যস্ত হয়ে এক্কেরে হামলায়ে পড়লো লাকো, কেবল তেরচা চোখে এক পলক তাকায়ে থাণ্ডা গলায় বললো "রেকে দে, যিখানকার চিজ সিখানে!" পাশে দাঁইড়ো কাপড় গুছাচ্ছিলেন বাবুর পরিবারটি। বেশ বড় ঘরের মেয়া। গায়ের রংখ্যান্‌

ফাট্যে বারাতে চায়। ভুরুকুঁচকে তিনিও চাইলেন এক ঝলক। বললো ল্যাকো কিছুটি।

কিন্তু মু'তো জানি মুই ঘর থিকে বারায়ে গেলেই এক্কেরে বোমা ফাটবে। 'কুকোরকে মাটিতে খাতে দিতে লাগে। খোলায় দিলে, সে পাতে খাবার চায়।'

অর্থাৎ কিনা কুকোরটি হলাম গে মুই। বিন্দো ভক্তা। বাবুদ্যার তিন পুরুষের মাহিন্দারের শেষ পুরুষ।

তা, দা'বাবু মোদের দয়ার অপ্‌তার। মাসখানেক বাদেই মোর পানে ছুঁড়ে মাইর্‌লেন নীল গেঞ্জিখান্ "লে, ভাগ্।" পাছে ফের ফিরায়ে লিতে মন চায় ছোটবাবুর, তাই ভাগলাম মুই সাথে সাথে। ভাগ্যিস বাবুর পরিবারটি লেইকো ঘরে। বিয়োবার লেগে চলে গেছেন বাপের ঘর। বড়ঘরের একটি মাত্তর মেয়া তো। তিনমাস না পুরতেই বাপের ঘর। সিখ্‌নে যতন-আত্তি, সেবাপূজা, সেঁক-পুট। কত আরাম!

বাবুর গায়ে ঢুকতে চায় লাকো যে গেঞ্জি, ম'র গায়ে ঢিলা হোল খোব। য্যান পিরান এ্যাকটো। তাই সই। ভিখের চাল, তার আবের কাঁড়া-আঁকাড়া! শীতটা কুন ক্যার্‌মে কাটে গ্যালেই বাঁচি।

কিন্তুন কাটলো লাকো। গেরিবের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাকি চড়চড় করে। মোরও হোল সিটাই। বাবুর গায়ের গেঞ্জি দু'মাস না যাতেই ফাটতে লাগলো ইখ্‌নে সিখ্‌নে। ঘামে এক্কেরে পচে গিছলো তো ভিত্‌রে ভিত্‌রে। যা ঘামেন ম'দের ছোটবাবুটা। মোটা নোকের ঘাম হয় খোব। বসে থাইক্‌লেও ঘাম।

এখ্‌নে ফুটা, সিখ্‌নে ফোকর। যে দেখে সে হাসে। আম্মো হাসতে হাসতে জবাব করি, 'হাবাখানা বান্নিছি হে। বড় বড় জান্‌লা সব। মনে মনে ভাবি, শীতটা যে ক্যাম্‌নে কাটে?

সোঁ সোঁ বইছে ...উত্তুরের কনকনে হাওয়া। ঝাঁ ঝাঁ ... করছে নিশুত রাত। বিশাল মাঠের এখানে ওখানে ... ছড়ানো ছেটানো ...দু' চারটে করে ধান জাগুয়াদের পালা। টিমটিম করে লন্ঠন জ্বলছে পালার বাইরে। অন্ধকারে মনে হয়, যেন থই থই জলের মাঝে মাঝে দু' একটি বসতি।

আগুনটা নিভে এসেছিল। বিন্দো উঠে গিয়ে একবোঝা ন্যাড়া খড় ছিঁড়ে নিয়ে এলো। এই অল্পটুকুর মধ্যেই তার হাড়ের ভেতর একেবারে কাঁপিয়ে দিলে। দল্‌দল্ থরতে লাগলো বিন্দো। দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি হয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুললো নিঝুম রাতের জনহীন মাঠের মধ্যে।

আগুন ফের জ্বালিয়ে নিয়ে হাতদুটো মেলে ধরলো সে। মুখের মধ্যে একটা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ তুললো, শীত কমাবার জন্যে। মুখের গরম হাওয়া ধোঁওয়া ধোঁওয়া হয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিন্দো আন্দাজ করতে লাগলো রাত। সাতভায়া তারা মাথার ওপর। তার মানে রাত দুপুর ...। এখনও আরো আধখানা রাত তাকে কাটাতে হবে ঐ হাড়-জমানো শীতের মধ্যে! ভাবতে গিয়ে কান্না পেল তার। অসহায় চোখে সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, ঘুমে জড়িয়ে আসা চোখ নিয়ে।

অন্য পালাগুলোতে সবাই বোধ করি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বিন্দোও এতক্ষণে ঘুমোত, কিন্তু পালার মধ্যে শুলেই খানিক বাদে ঐ শব্দটা। সরসর ... সরসর ... কিছু যেন হেঁটে চলে বেড়ায় খড়ের মধ্যে। সাপ সাপ লাগে! গা শিউরে ওঠে ভয়ে। মনে পড়ে যায় যুগীদেউলীর মেলায় জ্যোতিষ ঠাক্‌রের বচন "সপ্পাঘাতে মিত্যু। খণ্ডাবার উপায় লাইকো।" বিন্দো জানে, সকালেবেলায় সাপের গপ্পোটা ছাড়লে সবাই হেসে কুটি কুটি হবে। শালা গুলিখোর, শীতকালে কিনা সাপ। ক'ভরি গ্যাঁজা টানিস রে বিন্দো? কিন্তু জ্যোতিষের বচন? সেটা কেউ মাথায় রাখে না। কপালে লেখা থাকলে শীত তো শীত, বরফের চাঙ্গ্‌ থেকেও সাপের উদয় হবে। সেই যে জন্মেঞ্জয় রাজার সপ্পো দন্‌শনের বেত্তান্ত।

কাজেই, সারাটা রাত ন্যাড়া খড়ের আগুনে হাত সেঁকে কাটিয়ে দিতে হবে যে কোনও গতিকে। গেরিবের কপালের যা নেকন। খণ্ডাবে কে?

ইস্‌রে! বাবুরা কেমন কাঁঠাল কাঠের খাট-পালঙ্কে বালাপোসের ওপর শোয়ে লাক ডাকাতিছান ইখন! ক্যামন পুরু ন্যাপে অঙ্গাখান ঢেকে নিদাল্‌ছেন! রাত আল্যে কি আমোদ উনাদ্যার! বিন্দো অন্ধকারের মধ্যে চোখ ঠাউরে তাকালো দূরের গাঁ'গুলোর দিকে।

নিটোল অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো কালো নিটোল গাঁ ...। ঐ গাঁ'য় সবাই ঘুমোচ্ছে। যাদের ধান মাঠে রয়েছে তারা সবাই ঘুমোচ্ছে পুরু লেপের ভিতরে—আরামে! মাঠে ধান নেই যাদের—বিন্দোর মতো যারা—তারা খাঁ-খাঁ মাঠের মধ্যে ছুরিবেঁধা পৌষের হিম শীতে উদোম গায়ে উজাগর করছে রাত। পাহারা দিচ্ছে বাবুদের ধান।

কনকনে শীতের রাতে লেপের মধ্যে শোবার আরামটা জানে বিন্দো। সোয়াদটা পেয়েছিল একটি রাতের তরে। মহাপাত্রদের বাড়ীর বুড়াবাবু গিন্নিমাকে নিয়ে হরিদ্বার গেলেন এক মাসের তরে। বিন্দো তখন ওদের এষ্টেটের বিশ্বেসী মাহিন্দর! খোকাবাবুর বয়েস তখন বারো কি তেরো। ইস্কুলে পড়ে। খামারে ধান ঝাড়তে ঝাড়তে খোকাবাবুর সাথে অনেক গপ্পো-সপ্পো হলো একদিন। গেরিব-গুরবোদের লতিলাঞ্ছনার কাঁদন গাওয়াটাওয়া হোল। খোকাবাবুর মনটা একটু নরম ছিল তখন। "শীতের রাতে বিন্দো'দার কতই লা কষ্টো হয়" বলে সেই সন্ধেতেই দান করে বসলো একটি নরম তুলতুলে লেপ।

"সেই ন্যাপ গায় দে' ম'র সারা অঙ্গে সে কি পুলক! ঘুম কি আর আসবার চায়? ইপাশ ফিরি উপাশ ফিরি। কিছুতেই আশ মিটে লাকো। ন্যাপের মধ্যে ভাঁপগরমে শুয়ে কত পেরকারে যে আরামটা লিতে লাগলাম, তার ইয়াত্তা লাইকো।

লেপের মধ্যে শুয়ে, শেষরাতে ঘুমের মধ্যে এক জব্বর স্বপ্ন দেখেছিলো বিন্দো। পরের দিন বিতাং করে বলে বেড়িয়েছিল সব্বাইকে। একটা বিরাট ঘর, বড়বাবুর ঘরটার মতোনই। তার মধ্যে ধোতি, চাদোর, পিরান, কোট, সাজায়ে রাখেছে শয়ে শয়ে। ঝলমলে সব। সোনার মতোন রং। সারবন্দী ঝুলতিছে। যাত্রার দলের সাজঘরের পারা। খালি গা'য় কপ্‌নি পরে শীতে থরতিছিলাম মুই। কে য্যান বললো ...ইঁসব

তুমার গ' বেনন্দ বাবু। শুনেই তো মুই ছোট্টে গিয়ে পরতে লাগলাম সব। ধোতির উপর পিরান, তার উপর কোট, তার ওপর পশমের চাদর, তার ওপর বিলাতি র‍্যাপার, তার উপর—

সকালবেলায় খোকাবাবু ঘটালেন বেপরীত কাণ্ড। লেপটা নিয়ে যেতে বললেন যশোদা ঝিকে। বললেন "না গো বিন্দোদা। ন্যাপ তুমারে দিলে মা আসে বেজায় বকবেন।" আচ্ছা এ কথাটা এক রাতের মধ্যে ঐটুকুনি বাচ্চার মাথায় কে ঢোকালো? আমি পাগলের পারা ভাবলাম অনেকক্ষণ। বুঝলাম যশোদা ঝি'রই কম্মো উটা। ওই মাগীই উসকাচ্ছে দুধের ছা'টারে। বিন্দো ভক্‌তার উপর জম্মের রাগ অর। ধম্মো লষ্ট করে, সধবা মেয়ামানুষটা যে বুড়াবাবুর কাছে থাইক্‌লো সারাটা জেবন, আমারো লাকি হাত আছে তায়। আরে! মুই কে? মুই তো হুকুমের চাকোর। বাবু হাঁকলেন "বিন্দো ইদিক আয়।" আলাম। বললেন "যশোদা বামনীকে লে আয়।" আইন্‌লাম। তারপর বাবু জানে। মু'তো পাঁঠার কপালে সিঁদুরটি লেপে দিয়েই খালাস। তারপরের ক্যাদ্দানি তো ঘাতকের। কে মুন্ডু পালো, কে পালো ধড়, তার মু' কি জানি? তব্বো বেটি রাগখান পুষে রাখিছে ম'র পরে, জেবন ভর ...।

সে যাক্ গে। একটি রেতের তরে তো ন্যাপের মধ্যে ঘুমায়েছেলাম। সে সোয়াদটি সারা অঙ্গো যে নেগে রয়েচে গো! ন্যাপের কথাখান ভাবলেই শীতখান বেশী বোধ হয়।

বিন্দো ভক্‌তা কাঁপছিল, ঠকঠক করে। দাঁতে দাঁতে সর্বদাই মরা পাতা মাড়িয়ে চলার শব্দ। রোমের গোড়া ফুলে উঠেছে ঘামাচির মতো। খাঁ-খাঁ মাঠের মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডায় বরফের চাঙ্গাটি হয়ে সে একমনে ভাবতে লাগলো সেই এক রাতের লেপমুড়ি দেবার কথাটা।

মহাপাত্তরদের বড়বাবু বলে ভালা। "তু তো ম'র জমির ধান জাগতিছিস্ না, ত'র নিজের জমিন তো উটা। ত'র জমিন্ তু' ছাড়া কে জাগবে র‍্যা?"

কও দিকি তুমরা ভদ্দর পঞ্চজনা। এমন মস্করা কেউ করে মাইন্‌সের সাথে? আরে, জমিনটা বটে ম'র। কিন্তুন ধানটা? কাল সক্কালে অবশ্যি সে ধান মু' কাটবো, ম'র বউ কাটবে, ম'র ব্যাটা কাটবে। সব ধান কাট্যে, বিড়া বাঁধে, মাতায় চাপায়ে পৌঁছে দিতে লাগবে বাবুদের খ্যামারে। সিখনে ধান পিটা হবে, ওজন হবে। তারপর বুড়াবাবু একখান বাঁধান খাতা লিয়ে বসবেন চিয়ারের উপর। আমি আর খ্যামারে তখন থাকি কুন্ আশায়? বাপের বইস্ থিকে যে ধার ইতোদিন শোধ হোল নি কো, সে ধার কি আজ ফুসমন্তরে শোধ হয়ে যাবে বাবুর খাতায়? শুধু শুধু পুরান্ কতা লতুন করে শোনা।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে আর বাবুদের আরামের কথাটা ভাবতে ভাবতে গত কাল একটু দুষ্টুবুদ্ধি জাগলো বিন্দোর মাথায়। দা'এর আগা দিয়ে বানিয়েছিল এক গর্ত। চুলার মতন গইর। তার পাশ দিয়ে ছোট্টপানা একটি গর্ত বানিয়ে মিশিয়ে দিয়েছিল বড় গর্তের সাথে। ছোট গর্তে মুখ লাগিয়ে, দিয়েছিল কষে ফু...। আরে বাপ! এক্কেরে বাঘের ডাক ডাকে যে বড় গর্তটা! ঠিক যেন কেঁদ বাঘের ডাক!

"নিশুত রেতে মাঠের মাঝে বাঘের ডাক শুনে গাঁয়ঘরে বাবুদের পেরানে কাঁপনখান্ যা উঠতিছে, সে আর কহতব্য লয়কো।" অন্ধকারে প্রেতের মতো জ্বলজ্বলে চোখে হাসে বিন্দো। "ন্যাপের মধ্যে ভয়ে ডরে পেরানটি একেরে আধমরা। বাঘ বলে কতা! ঘুমের বারোটা তো বাজলো একটি রেতের তরে। বাবুদের উপর আচ্ছা শোধখান্ তুল্লি রে বিন্দো।"

সেই আমুদে সারা রাত গর্তে মারলাম ফুঁ, কইল্জা ফাটায়ে। এক মুহূর্তও থামলাম লাকো। সকালে গাঁয় ফিরে যা শুনলাম, ত্যাখন আঁধার পালেই য্যান কাঁদি।

গাঁ' ঘরের কেউ শুনতেই পায়নি সে আওয়াজ। উতরা হাওয়ায় ভাসিয়ে লিয়ে গেছে সব আওয়াজ খালের দিকে। ওদিকে, সারা রাত ঠকঠক কেঁপে মরেছে মাঠের মধ্যের জাগুয়ারা বাঘের ভয়ে। একতিল ঘুম হয়নি তাদের সারারাত। গাঁঘরের বাবুদের ঘুম কিন্তু লষ্ট হয়নি একতিল।

আপশোষ হলো ভীষণ। হায়রে, যারা লিদাবার, লিদালো জুতসে। গেরিব চাষাগুলান্ সারাদিনের খাট্নি লিয়ে জাগে থাইক্লো রাতভর বাঘের ভয়ে?" ভাবতে ভাবতে রাগ হোল হাওয়ার উপর। যার ধন আছে, মান আছে সম্পদ আছে হাওয়া-জলও কি তারি দলে? বাবুদের নিদাবার ব্যাঘাত যাতে না হয়, সেই কারণে হাওয়াও বইলো উলটো দিকে!

"হাঁবা, জলও কি বাবুদ্যার চাকর-বাকর হয়ে গেল ইদানি।"

হবেই তো। এ যে শাস্ত্রের বচন। কাঁটাপুকুরের অপেরা দল কি গাওন্খান গায়ে গেল তেবে, গেল বচ্ছর? রাবণ রাজার সব ছিল। তাই বম্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেঁ—দেব্তা, পবন, বরুণ, সব্বাই চাকোর হয়ে থাকতো তার ঘরে। সে ছেল তেতা যুগ। আর এতো ঘোর কলি!

ভাবতে ভাবতে কান্না পেয়ে গেল বিন্দো'র। প্রচণ্ড শীতে কলাপাতার মত কাঁপতে কাঁপতে সে অভিসম্পাত দিতে লাগলো তেত্রিশ কোটি দেঁদেবতাকে। কপালটা অকারণে চাপড়াতে লাগলো বার বার।

রাত পোহাতেই খবরখানা নিয়ে এলো কালাচাঁদ। একেবারে জব্বর খবর! গাঁময় হুলস্থূল কাণ্ড! মাহাপাত্রদের বেনাম জমিনের খোঁজ মিলছে। মোট সাঁইত্রিশ বিঘে জমিন। তার মধ্যে বিন্দোর নামেই রাখা আছে সতের বিঘার মতো।

"হাই বিন্দো, তু তো একদিনেই দুনিয়াদার বে। তোর জমিনের ধান ইখন খায় কে! পাঁচমারির চাক্, আস্তমনির পঁচিশ কাঠা, মানিকভাসার দু'বিঘা, পাথরঘাটার তিন বিঘা—সক্কল, সক্কল তোর। তু' শালা তো ইখন জোদ্দার বে।"

বিন্দোর সারা অঙ্গ কাঁপতে থাকে। পাড়াপড়শীর কথাগুলো কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় তীরের মতো। কোন কথাই ঠিক ঠিক ঢোকে না মাথায়। কি কাণ্ডখান করি রাখেছেন বাবুরা! ইস্ কি কাণ্ড! সত্রো বিঘা জমিন কিনা কেবল বিন্দো'র নামে! গেলরাতে যে জমিনে উদোম গায়ে জেগেছে সে, সেটাও তো তবে তারই। গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে নাকি? কালাচাঁদকে বুকে চেপে কাঁদবে নাকি? কি করবে সে এখন? কি করা ওচিৎ?

বাড়ীর দিকে ছুট মারতে গিয়েই বাধা পেল বিন্দো। বড়বাবু এত্তেলা পাঠিয়েছেন। জরুরী তলব। বিন্দো ভয় পেলো মনে মনে। তিন পুরুষের মাহিন্দর কিনা বাবুদের সিকি সম্পত্তির মালিক! এ পোড়ামুখ সে এখন দেখায় ক্যাম্‌নে 'বাবুদ্যার'? বাবুদের এতবড় সর্বনাশটা করে এখন কী বলে দাঁড়ায় তাদের সুমুখে, লজ্জাছাড়া বেহায়ার মতো। তাছাড়া অন্য ভয়ও আছে, বোকাসোকা মানুষটাকে একলাটি পেয়ে কি প্যাঁচ কষবেন তেনারা কে জানে? বাবুদ্যার বুদ্ধির সাথে পারে কে? শেষমেষ কি—না—কি বুঝিয়ে, গরম জলটিকে ঠাণ্ডা মেরে দেবে, পাখি-পাখালও জানতে পারবে না, টিপছাপ কত মন্তরই না জানা আছে বাবুদ্যার!

শেষ অবধি যেতেই হোল। এমন স্নেহের ডাক শেষমেষ অবজ্ঞা করা গেল না। মানে, সাহস হোল না ফেরাতে।

মহাপাত্তরদের বড়বাবু চান সেরে ফিরছিলেন ঘাট থেকে। মোটা পৈতে দিয়ে টপ-টপিয়ে জল ঝরছিল। মাথার কাঁচাপাকা চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিন্দো আর সামলাতে পারলো না নিজেকে। দূর থেকে সটান ভূমিষ্ট হয়ে গড় সারলো ভক্তিভরে। বিড়বিড়িয়ে মন্তর আউড়াচ্ছিলেন বড়বাবু। ইঙ্গিতে বসতে বলে ঢুকে গেলেন ভেতরে। বিন্দো ঠায় বসে রইলো দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে।

দাদন নিতে এলে যে রকম গো-বেচারাটি হয়ে বসে থাকে, সেইরকম।

বিন্দোর মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল! বড়বাবুর দপ্‌দপে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল তার। মাঝে মাঝে নিজের ওপরও হচ্ছিল রাগ। এতো কুঁকড়ে যাবার যে কি আছে! সরকারী নিয়মে জমিন এসেছে তার কপালে। বিন্দোর দোষটা কোথায়? আইন-কানুন তো সবার তরেই। সেখানে গরিব বড়লোক নেই। তেমনি কিছু বললে বড়বাবুকে মুখের ওপর বলে দেবে সে এসব। অত ধুক-পুকানি কিসের লেগে? বিন্দো কেবল কথা ঘসে ঘসে গা'টা গরম করতে চাইলো।

ধোওয়া কাপড় পরে, কোঁচা মোচড়াতে মোচড়াতে বড়বাবু বাইরে এলেন খানিক বাদে। "এই য্যা, বেনন্দ বাবু। মোরা তো ইখন তুমার জমিনের বর্গাদার গ'। শুন্যেচো তো সব।"

বিন্দো শুনেছে। তবুও সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো বড়বাবুর দিকে।

"বিশাস্ করে, লিজেরটি ভেবে, তুর নামে কিছুটাক জমিন রাখেছেলাম। এখন নাকি সেসব দখল লিবার ফিকির খুঁজতিছিস তু?"

বিন্দো এর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। আমতা আমতা করে বললো, "আজ্ঞা, মানে, গরমেন্টের আইনে—"

"শালা, পাখি ছা'টার মতোন কোড়ে-পিঠে মানুষটি কইর্‌লাম, সিই বাচ্চা বইস থিকে। তোর বংশোটাকে পালতিছি, পুষতিছি আজ তিন পুরুষ। ইখন কিনা পাখনাটি গজাছে তুর। পাখ্‌না ঝট্‌কে উড়তে চাতিছিস রে"!

বিন্দো বাস্তবিকই এসব কথা বুঝতে পারে না একতিল। কবে যে তিন পুরুষকে পাললো-পুষলো মহাপাত্তরবাবুরা সেটার মাথায় ঢুকছিল না কিছুতেই।

বারো মাস পাট খেটে খেটে মহাপাত্তরদের এক্টেটে বাঁধা রয়েছে বংশ-পরম্পরায়। পেটভাতায় সম্বচ্ছরের মাহিন্দর। বউ সম্বচ্ছরের বিনে মাইনের ঝি। ছেলেগুলো রাতদিনের বেগার। টুকচার জমিন ছিলো, তাও বাপের আমল থেকে টিপছাপ করা রয়েছে বাবুদের সিন্দুকে। এত খেটেও শোধ হোল না আসলটাই। কেমন করে বাড়ীর ছেলের মতো পুষলেন বাবুরা, জিগাতে বড় সাধ হচ্ছিল তার।

তার আগেই বড়বাবু বললেন "বাপরে মোর, সাপে কামড়ালে বিষ নামে, মাইন্‌সে কামড়ালে নামে লাকো। মাইন্‌সে কামড়াতেছে তোকে। বুঝতিছি সিটা। না'লে এমন নিমোখারামি করতে সাধ জাগে তোর?" আঙ্গুলে পৈতে জড়াতে জড়াতে বড়বাবু বললেন, "ওপরে ভগ্‌মান্ আছেন, খিয়াল রাখিস রে বিন্দো। তার কোপ্ থিকে পাঁচজনে তোকে বাঁচাবে নাই।"

একি বেপদে পড়লি রে বেন্দো? গরমেন্টের ঘরে আইন পাশ হোল। তা বিন্দো ভক্তার কোন্ কসুর? বড়বাবু পৈতে ধরে ভগমান্ দেখায় কিসের লেগে?

"শোন, শুনে লে কাজের কথাটি।" বড়বাবু ভারি অথচ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "তোর নামে জমিন বটে। কিন্তু শ্রীমান লবকুমার মহাপাত্রর নামে ভাগ-রের্কড। কাগজ চাইলে দেখাতে পারি। লতুন লিয়মে বর্গাদারের খ্যামারে ধান উঠবে, তারপর ভাগাভাগি হবে,—হিসেবপত্তর হবে পাওনাগাণ্ডায়।"

ব্যাস, সার কথাটি বলে ফেলেছেন বড়বাবু। 'হিসেবপত্তর হবে।' তার মানে ঐ সিন্দুকের টিপছাপ বেরুবে। কত যে ধার ছেল বাপের, কত যে তার সুদ, কত যে শোধ হোল এ্যাদ্দিনে, বিন্দো তার মাথামুণ্ডু জানবে কি করে? বছরে একটিবার ঐ মোটা খাতাটি বেরোয়। তাই দেখে সঙ্গো সঙ্গো বিন্দো পুকুরঘাটে চলে যায় চোরের মতো। ধানের ভাগবাঁটোযারা নিয়ে রা'টি কাড়ে না, এও সেই একোই বিত্তান্ত। ঘরে ডেকে শুনায়ে দিলেন বড়বাবু। গরমেন্টের আইনে কি মহা লাভটাই তোর হলো রে বিন্দো! আমড়া চোষ্ শালা ইবার দু'হাতে।

কালাচাঁদরা খুব তাতালো বিন্দোকে সারা বিকেল। পতিতের বাড়িতে মিটিন বস্‌লো। গলা চড়িয়ে সবাই চিল্লালো খানিক। বিন্দোকে সদরে হাকিমের কাছে লিয়ে যাবার পিলান আঁটিলো। বিন্দোর খুব ফুর্তি লাগছিল মনে মনে। তাকে নিয়ে কিনা এত কাণ্ড চলছে! আবার ভয়ও করছিল। বাবুদের কতই না বুদ্ধি! কি করতে কি হয়!

পতিতের বাড়িতে বসেই সারধার হোল! প্রথম বছর ধান কেটে জমির দখল নেওয়া হবে, কালাচাঁদরাই মাদল বাজিয়ে দখল দিয়ে দেবে বিন্দোকে। ফসল ভাগ হবে আধআধি। বিন্দো সব তাতেই একপায়ে খাড়া। মোট কথা কিছু একটা হলেই হোল! বাবুদের যে জমিন গেল-রাতেও সে কনকনে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে পাহারা দিয়েছে, সে জমিনের ধান সে কাটতে যাবে বুক ফুলিয়ে, এই চিন্তাটাই তাকে মাতিয়ে রাখলো সারা বিকেল।

সন্ধ্যে নাগাদ পুলিশের বাবুরা এলেন। সবার সুমুখে বিন্দোকে জানিয়ে গেলেন সার কথাটি। সরকারী আইন মোতাবেক কাজ হবে। বর্গাদার ধান কাটবে। তারই খামারে উঠবে ধান। বিন্দো ভক্তা নামক জোদ্দার কেবল ফসলের আইন মোতাবেক

ভাগ পারে। জোদ্দার যেন বর্গা জমির ওপর কাস্তে নিয়ে চড়াও না হয়। খবরদার! বর্গাদার শ্রীমান লবকুমার মহাপাত্রই কাটবে ধান।

নিশুত রাতে বাবুদের পালার সামনে আগুন জ্বালিয়ে সেই কথাগুলোই ভাবতে থাকে বিন্দো। সাপের নিঃশ্বাসের মতো ঠাণ্ডা বাতাস দু'কান ছুঁয়ে যাচ্ছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবশ হয়ে আসছিল ঠাণ্ডায়। চারপাশের রাশি রাশি সোনার ধানের মধ্যে যখের মতো একাকী নিঃসঙ্গ বিন্দো কেবল দু'হাত দিয়ে উত্তাপ নিচ্ছিল। আর ভাবছিল, তুলতুলে নরম ন্যাপের উত্তপ্ত আরামের কথা।

ন্যাড়া খড়ের আগুন ঝিমিয়ে পড়তে থাকে থেকে থেকে। চারপাশের অনেক ইন্ধন দিয়েও তাকে জ্বালিয়ে রাখতে পারে না বিন্দো। ধিকধিকে মরা আগুনের সামনে বসে আপ্রাণ চেষ্টা করে তখন। কিন্তু কিছুতেই আর গা গরম হয় না।

তালুদুটো ঘসতে ঘসতে এক সময় উঠে দাঁড়ালো বিন্দো। ন্যাড়া খড়ের ক্ষেত দু'পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চললো 'পালা'র কাছে। আগুনের তাত পাওয়া চোখদুটো অন্ধকারের মধ্যে যেন জ্বলছিল। মুহূর্তের জন্য গায়ের কাঁপুনির কথা ভুলে গেল সে। পালার ভেতর থেকে কাস্তেখান্ টেনে এনে গর্ত খুঁড়তে বসলো মাঠের মধ্যে...।

হাঁটু গেড়ে বসে, মাথাটা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ছোট গর্তটায় ফুঁ দিতেই বাঘের ডাক ডেকে উঠলো গড় গর্ত্তটা। ঠিক য্যান কেঁদ বাঘের ডাক! তেমনি ভরাট, তেমনি গম্ভীর। বিন্দোর বুকটা নেচে উঠলো আনন্দে। গলার শিরা ফুলিয়ে এক নাগাড়ে ফুঁ দিতে লাগলো সে। একবার—দু'বার—তিনবার, ...বার বার..., একটা নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। একটা বড় জেদ। গাঁয়ের 'ন্যাপের' মধ্যেকার লোকগুলোর প্রতি একটা আক্রোশ। সেই আক্রোশ ক্রমশ তীব্র হতে লাগলো। ফুসফুসের মধ্যে জমে থাকা সবটুকু নিঃশ্বাস বাইরে পাঠিয়ে বিন্দো সৃষ্টি করতে লাগলো একটির পর একটি ভরাট বাঘের ডাক।

বড় গর্ত্তের বাঘের ডাকগুলো ক্রমশ তীব্র হচ্ছিলো। বিন্দো'র বুকের খাঁচাটা হাঁপরের মতো বাড়ছিলো কমছিলো! ফুসফুসটা আকুলি-বিকুলি করছিলো। পাকা লাঠির মতো শক্ত হচ্ছিল গলার শিরা। কপালের মসৃণ চাতাল রুক্ষ বন্ধুর হয়ে উঠেছিলো। কড়া করে পোড়ানো খোলামকুচির মতো খটখটে চোয়াল! বিন্দো ভক্‌তার চোখমুখের ভাষা পালটে যাচ্ছিলো দ্রুত। দেখতে দেখতে চারপাশের পালাগুলো থেকে বেরিয়ে এলো ঘুমভাঙা পালাজাগুয়ার দল!

অন্ধকারের বুক চিরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো তারা ছায়ার মতো। নিঃশব্দে দাঁড়ালো বিন্দোর পেছনে। তাদের বুকের থেকে বেরিয়ে আসা গরম নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়লো বিন্দোর চারপাশে। চারপাশ থেকে একটা কম্বলের মতো জড়িয়ে ধরলো তাকে। বিন্দোর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জীর্ণ ফুসফুসটাকে হাপরের মতো বাগিয়ে ধরে সে পাগলের মতো একনাগাড়ে ডেকে যেতে লাগলো অসংখ্য বাঘের ডাক।

কারণ সে জানে, আজ আর উত্তুরে বাতাস বইছে না।

পাখি-ধরা খেলা

১.

হুজুর, আমার জমি আমি কবে ফেরৎ পাবো? মথুর দাস হাকিমের দিকে দু'হাত কাটারি মারবার ভঙ্গিতে তুলে ধরে।

স্পেশাল অফিসার একটু বিষম খেলেন। আদালতে এসে, কবে বিচার পাবো, এমন প্রশ্ন কেউ করে না। ব্যাপারটা রীতি-বিরুদ্ধ, আদালত অবমাননার তুল্য।

আজকে খুব গরম পড়েছে। অসম্ভব গুমোট। তার ওপর লোড-সেডিং।

'চার বছরে তো হইল্যাক হুজুর—। মথুর দাস করুণ গলায় কঁকিয়ে ওঠে।

'কবেকার কেস?' স্পেশাল অফিসার নিরুত্তাপ গলায় কেরানীকে শুধোন।

'তিন-চার বছর হবে স্যার।' চাপা গলায় জবাব দেয় কেরাণী।

ভ্রূ-কুঁচকে মথুর দাসকে দেখতে থাকেন স্পেশাল অফিসার। দেখতে দেখতে দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হয়ে আসে।

'ও-সেই তিনশো-বারো দাগের কেস?'

'হ্যাঁ, স্যর।' আশায় আশায় তাকিয়ে থাকে মথুর।

'আরে, দাঁড়াও এখন। ও-পি'কেই হাজির করানো যাচ্ছে না।'

ও-পি'টি কী বস্তু, সেটা ঠাহর করতে পারে না মথুর দাস। সে ফ্যাল-ফ্যাল করে কেরানীবাবুর দিকে তাকায়।

'আপনার জমি যিনি কিনেছিলেন, মানে, যার বিরুদ্ধে আপনার মামলা, তাকেই হাজির করা যাচ্ছে না।'

'উ' তো আগের তারিখে আইছিল, হুজুর।'

স্পেশাল অফিসার কেস-রেকর্ডটা পড়ে নিয়েছেন ততক্ষণে। পরপর তিনবার সমন পাওয়ার পর ও-পি উপেন ধর হাজির হয়েছিল আগের তারিখে।

স্পেশাল অফিসার বললেন, 'হাজির তো হয়েছিল, জবানবন্দীও দিয়ে গেছে। কিন্তু জমি তো এখন আর তার কাছে নেই। সে ওটা বেচে দিয়েছে। কার কাছে যেন...?'

কেরাণীবাবু কাগজ উল্টেপাল্টে বললেন, 'বাঘশুলির হারান কুচলানকে।'

'ঠিক।' চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেন স্পেশাল অফিসার।

'হারান কুচলানের নামে সমন পাঠান।'

কোর্ট সেদিনের মত বন্ধ হল।

উকিলবাবুর বাসায় রাত হল খানিক।

মথুর দাস বাইরে বসেছিল। ভেতরে সারাক্ষণ গগন সরকারই কথা বলল উকিলের সঙ্গে!

বাইরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল মথুর। বাপকেলে এক চিলতে জমিন, হাজার অনটনেও হাতছাড়া করেনি বাপ। মথুরও বহু বছর আগলে রেখেছিল। কিন্তু কি আচানক কথা, জমিটা তিলেক মনের বিভ্রমে হাতছাড়া করতেই নিমেষের মধ্যে কোথায় চলে গেল! বেচেছিল উপেন ধরকে। সে বেচে দিল হারান কুচলানকে। হারান কুচলান ছেড়ে দিল ভেস্টে। ইদানিং হাঁদা মুর্মু হাঁটাহাঁটি জুড়েছে ঐ জমির পাট্টার জন্য। হারান কুচলানের হাত থেকে যদি হাকিমের রায়ে ফিরিয়ে আনাও যায় সে জমিন, তো তৃতীয় মালিক হিসেবে হাত ধুয়ে বসে রয়েছে গগন সরকার। মথুর দাস তার কাছ থেকে ঐ জমির বাবদ আগাম তিনশ টাকা নিয়ে বসে আছে। আজকের কেসের যাবতীয় খরচ গগন সরকারই জুগিয়েছে। মায় মথুরের খাওয়া-খচ্চাও। তার পক্ষে অবশ্যি খরচ-খরচা নিরর্থক নয়। নিজের ভিটের লাগাও আটষট্টি শতক জমি। মাত্র বারোশ টাকায়, ভাবা যায়? এসব করতে দু'পাঁচ-শ যদি যায়ও, ক্ষতি নেই। আধো অন্ধকার বারান্দায় একলাটি বসে আছে মথুর। গগন সরকার রয়েছে ভেতর-বাগে। উকিলের সঙ্গে তার কথা আর ফুরোয় না। একটা পাখি কিনেছে আজ গগন সরকার। চন্দনা। একটা পাখি ছিল ওদের, খাঁচা খুলে উড়ে গেছে দিনকতক। ছেলেমেয়েগুলো খুব কান্নাকাটি করছিল। আজ ব্লক অফিসের সামনে একরাশ চন্দনা দেখে খাঁচাশুদ্ধ একটা কিনে ফেলেছে গগন সরকার। খাঁচার মধ্যে পাখিটা ঝিমুচ্ছে। মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠে চারপাশটা দেখে নিচ্ছে; ঠিক যেন ট্রেন-বাসের ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার। মাঝে মাঝেই চমকে জেগে ওঠে, এসে গেল নাকি! পাখিটা কোথাও চলেছে নাকি! মানসিক ভ্রমণে, কোনও দূর প্রবাসে! বসে বসে এইসব ভাবে আর মশা চাপড়াতে থাকে মথুর দাস।

খানিক বাদে উকিলের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে গগন সরকার। মুখে একরাশ কালি-ঝুলি। মথুরকে দেখামাত্রই সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল তার!

—কি এক সর্বনাশা জমিনের খাতে আগাম নিলি রে মথ্‌রা—। এ যে দেখি এক চিড়ার বাইশ ফের!

গগন সরকারকে কিছু শুধোবার সাহস হয় না মথুর দাসের।

গগন সরকার তেতো গলায় বলে, 'হারান কুচলান তো তিনশো-বার দাগ ছেড়্যে দিয়েছে সাত নম্বর ফরমে। সরকারে ভেস্ট হইয়ে গেছে উটা। ইস্, কি বিপদে ফেললি বল্ দেখি! কাজ নাইকো আমার জমিতে। তুই আমার টাকা ফেরৎ দে।'

টাকা! টাকা এখন কোথায় পাবে মথুর? সংসারের গভ্‌ভরে ঢুকে সে টাকা গুঁ হয়ে গেছে কবে।

ফেরৎ জমির মামলায় মথুর দাস জিতবেই, উকিল তেমন ভরসা দিয়েছিল বলেই না গগন সরকার তিনশোটি টাকা আগাম দিয়ে ফেলেছে মথুরকে। নিজের জমির লাগোয়া শোল জমিটা বলেই না অত গরজ ছিল গগন সরকারের। এখন সেই জমি বিশ-বাঁও জলের তলায়!

বিশ নয়, শ' বাঁও, মনে মনে ভাবতে থাকে মথুর দাস। কোথাকার জমিন' এই অল্প সময়ে কত দূরে চলে গেছে, পড়ে গেছে কতখানি জটিল আবর্তে! জমিনও কি পাখির তুল্য! শেকলটা অল্প ঢিলে হলেই মুহূর্তে উড়ে যায় এক আকাশ থেকে অন্য আকাশে!

২.

হাঁদা মুর্মু—তিনশো-বার দাগ—আটষট্টি শতক—। খগেন হাঁসদা—তিনশো পঁচিশের বাটা পাঁচশো পাঁচ—সাঁইত্রিশ শতক—। জমি বন্টনের লিষ্টটা গড়গড় করে পড়ে যাচ্ছিল ভবেন মাষ্টার। হাঁদা মুর্মুর বুকের মধ্যে পুলক উথলে উঠছিল ফুটন্ত দুধের মত। আটষট্টি শতক শোল জমিন পেলে নিজের কপালটাকে ঘুরিয়ে ফেলা সম্ভব। কতদিন ধরে ভবেন মাষ্টারের পিছু পিছু ঘুরছে সে। কত খিদ্‌মদ্‌গারি করেছে হরেক বাবুর। এ্যাদ্দিনে মুখ তুলে চাইলেন বাবুরা।

বিকেলের মিষ্টি আলো। পাখি-পাখাল ঘরে ফেরে। চরেবুলে গাইটার ফেরার সময় হল। ঝুপড়ি ঘরের লাগোয়া কয়েকটা বেগুন-লঙ্কার গাছ। ফুল এসেছে, জালি ধরছে। এসময়ে কষে জল দেওয়া দরকার। ঠেক্‌না লাঠিটা ধরে উঠে দাঁড়াল হাঁদা মুর্মু।

'উঠছিস যে!' খেঁকিয়ে উঠল ভবেন মাষ্টার, 'জমিনটি পেয়েই অমনি পাখ্‌নাজোড়া ফট্‌ফটালেক? এরপর মিটিং আছে না?'

হাঁদা মুর্মু বোকার মত হেসে বসে পড়ল। এই মানুষগুলোর অকৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। ভবেন মাষ্টার রোষকষায়িত চোখে তাকায়। লুটের আগে, দাঙ্গার পিছে। মানুষের জন্য কাজকর্ম করা এক ঝকমারি ব্যাপার। পাখি-পাখাল পোষ মানে, মানুষ জাত সে পোষ মানবে না কিছুতেই। কোনগতিকে শেকলটি একটুখানি ঢিলে হলেই ফুরুৎ ...।

'জমিন-দিলাম, সব দিলাম, এখন প্রতিটি মিটিং-এ মিছিলে যেন দেখতে পাই।' ভবেন মাষ্টার গোলাকার চোখে ধমক দেয়,' নচেৎ জমিটি কেড়ে নিয়ে, দিয়ে দুবো অন্যকে।'

হাঁদা মুমু আবারও বোকার মত হাসে। পদমদীঘির পশ্চিম পাড়ে ঝুপ করে সূর্যটা ডুবে যায়।

৩.

মথুর দাসের উকিলের সামনের দুটো দাঁত নেই। অর্ধেক কথা হাওয়ায় ভেসে যায়। কেসটা শেষ অবধি পাকবে কিনা সন্দেহ ছিল গগন সরকারের। সেই কারণেই ওর চেয়ে বড় উকিল লাগিয়ে আর পয়সা খসাতে মন চায়নি। মুখোমুখি হতেই উকিলকে চুপিচুপি শুধোলো গগন সরকার, 'কেমন বুঝছেন, উকিলবাবু? শেষমেষ তরীটি তীরে ভিড়বেক তো?'

জবাবে মুচকি হাসেন উকিলবাবু, যার মানে, আমি থাকতে চিন্তা কি?

আজ হারান কুচলান হাজিরা দিয়েছে। স্পেশাল অফিসার বললেন, তিনশো-বারো দাগের জমি যদি মথুর দাসকে ফিরিয়ে দিতে হয়, তবে আপনাকে সাত-নম্বর ফর্মে অন্য জমি ছাড়তে হবে হারানবাবু।'

'কেন, স্যার? আমি তো আমার রায়তি সম্পতিই ছেড়েছি।'

স্পেশাল অফিসার হাসলেন, 'রায় মথুর দাসের পক্ষে গেলে তো ঐ জমি আর আপনার রায়তি থাকবে না। ওটা তখন মথুর দাসের জমি হয়ে যাবে।'

হারান কুচলানের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা গাঢ় হয়। তাই দেখে স্পেশাল অফিসার নরম গলায় বলেন, 'অবশ্য, যদি রায় সে রকম হয়, তবেই।'

এমন কথায় হারান কুচলানের দুশ্চিন্তা কিছুমাত্র কমে না। মহা ফাঁপরে পড়ে যায় সে। এবং আপিশ-কাচারিতে সব সমস্যারই একটা সমাধান থাকে, এই বিশ্বাসে শুধোয়, 'তাহলে আমাকে কি করতে হব্যেক্ স্যার?'

'কিছুই করতে হবে না এখন। আগে শুনানী তো হোক। অভাবের জ্বালায় বেচলে তবেই তো জমি ফেরৎ পাবে মথুর দাস।'

হারান কুচলান এসব কথার মাথা-মুণ্ডু বোঝে না। বলে, 'অভাবের জ্বালায় তো মথুর দাস আমাকে জমি বেচেনি স্যার। আমি তো কিনেছি উপেন ধরের কাছ থেকে। সে তো বড়লোক। খাঁড়ার ঘা'টা তবে আমার উপর আসছে কেন?'

স্পেশাল অফিসার এমন বোকা বোকা কথায় মজা পান।

বলেন, এটাই যে আইন, হারানবাবু। সোনার গয়নাটি ঠোঁটে নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে কাক। কাক চলেছে আকাশ পথে। আমরা ওকে ফলো করে চলেছি নীচে। উড়তে উড়তে কাক যে গাছেই বসবে, আমরা সেই গাছের তলায় গিয়ে উৎপাত করবো।'

হারান কুচলানের মাথায় কিছু ঢুকছিল না। কেবল তার ভুরু-জোড়া কুঁচকে যাচ্ছিল ভাবনায়। মক্কেলকে খুব বেশি ভাবতে দিতে চান না উকিলবাবু। তাতে নাকি আখেরে তাঁরই ক্ষতি। ভোকালতনামায় সই করবার পর, পুরো ভাবনাটা উকিলের, মক্কেলের নয়। হারান কুচলানের উকিল হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন ওকে।

'হুজুরের সঙ্গে তর্ক করবেন না। এসব-হল আইনের সূক্ষ্ম প্যাঁচ। বুঝবেন না। কথায় বলে, আইনস্য কুটিলা গতি—।

৪.

শুনানী শুরু হল আরো মাস-দুই বাদে।

হারান কুচলানের উকিল বেশ জব্বর। তাঁর পাটিতে সব দাঁতই মজুত। কষে কষে পান চিবোতে চিবোতে তিনি মথুর দাসকে জেরা করেন, 'জমি বেচেছিলেন কেন?'

মথুর দাস নিজের উকিলের দিকে তাকায়। উকিল বিড়বিড় করে কি যেন বলতেই, তার অর্ধেক হাওয়ায় উড়ে যায়। মথুর এক বর্ণও বুঝে উঠতে পারে না। অগত্যা বলে বসে, 'চাষবাসের জন্য, হুজুর।'

হা-হা করে হেসে ওঠেন হারানের উকিল, 'ওর তো ঐটুকু জমিনই ছিল, স্যার। ল্যান্ড-সিডিউলে তো তাই দেখছি। কি হে, ঠিক কিনা?'

মথুর দাস আস্তে আস্তে মাথা দোলায়, 'ঠিক।'

'তবে, আর কোন্ জমি চাষ করবে বলে তিনশো-বার দাগ বেচেছিলে তুমি?'

মথুরের উকিল উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমার ক্লায়েন্ট চাষবাস করতে পারছিল না, স্যার। বাড়িতে অভাব-অনটন চলছিল। তাই ভরণ-পোষণের জন্য—। কি, তাই কিনা?'

মথুর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে দেয়।

হারানের উকিল কটমট করে তাকান মথুরের দিকে। শুধোন, 'অভাবটা কি রকম?'

'অভাব আবার কি রকম হয়?' অভাব মানে, অভাব, পভার্টি।' মথুরের উকিল বলে।

'পভার্টির ডেফিনিশন কি?'

'আপনি এইভাবে কোর্টকে পভার্টির ডেফিনিশন চাইতে পারেন না।'

'কোর্টকে নয়, আপনাকে চাইছি।'

'আমি আপনাকে পভার্টির মানে বোঝাতে যাব কেন? আমি কি আপনার মানে-বই?' বলতে বলতে মথুরের উকিল বেজায় ক্ষেপে গেলেন। তাঁর হাত-পা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। উত্তেজনার চোটে অনেক কিছু বলতে লাগলেন তিনি। কিন্তু ফোকলা পাটি দিয়ে প্রায় সব কথাই ভেসে গেল হাওয়ায়।

মাঝপথে মোচ্ছব কেঁচে যায় দেখে, উঠে দাঁড়ায় গগন সরকার।

বলে, 'হুজুর, এরকম ঝগড়া চলল্যে তো—।'

'কে আপনি?'

গগন সরকার থতমত খায়।

'আপনি কে?'

'আজ্ঞে, আমি মথুর দাসের গাঁয়ের লোক।'

'এই কেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'

'আজ্ঞে, সম্পর্ক বলতে—, গগন সরকার ঘন ঘন ঢোঁক গিলতে থাকে, 'এই পড়শী তো। তাই বিপদে-আপদে।'

'কোর্টের মধ্যে কি বিপদ-আপদ দেখলেন ওর?'

উকিল-হাকিমের সম্মিলিত জেরার মুখে পড়ে হাঁকু-পাঁকু করতে থাকে গগন সরকার। শেষমেষ মথুরের উকিলই ওকে বাঁচায়।

'ও স্যার, এই কেসের একজন সাক্ষী।'

'ও—সাক্ষী? তাই বলুন?' স্পেশাল অফিসার শান্ত হন, 'তাহলে, আপনিই বলুন তো, কোন্ অভাবে পড়ে মথুর দাস তিনশো-বার দাগের জমি বেচেছিল?'

'মথুর দাসকে জেরা করা এখনো শেষ হয় নি, স্যার।'

'ও, ঠিক আছে, ঠিক আছে, প্রসীড—।'

'তাহলে, মথুরবাবু, আপনি অভাবের জ্বালায় জমিটা বেচেছিলেন?'

মথুরদাস মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'বেশ, মোট কত টাকা পেয়েছিলেন?'

'আড়াই-শ, হুজুর।'

'সে-কি! দলিলে রয়েছে এগার-শ। যাগ গে, আড়াই-শ টাকা কিভাবে খরচ করলেন?'

'আইজ্ঞা খাবার-দাবার কিনল্যাম্। দশ-শুলিটাক ধান, সের-দশেক গম...।'

'এসব যে কিনেছিলেন, তার প্রমাণ আছে কিছু?'

'আছে, স্যর।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠেন মথুর দাসের উকিল, 'একটাই প্রমাণ, মথুর দাস এখনো বেঁচে আছে।' একটা জুত সই জবাব দিতে পেরে মথুরের উকিল আড়চোখে তাকান গগন সরকারের দিকে। তারপর স্পেশাল অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ঐ খাবার-দাবার না কিনলে, ঐ সনেই মথুর দাস ঝাড়ে-বংশে মরে ভূত হয়ে যেত, স্যার।'

'আন্‌পার্লিয়ামেন্টারী কথা বলবেন না।' বিপক্ষের উকিল ক্ষেপে ওঠেন, 'মরলেই সবাই ভূত হয় না। কেবল পাপীরাই ভূত হয়। আপনার মক্কেল কি পাপী?'

নিজের মক্কেল কখনই পাপী হয় না। মথুর দাসের উকিল ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'ইর্‌রেলিভেন্ট কথা বলবেন না। আমার ক্লায়েন্ট পাপী কিনা সেটা আজকের বিচার্য বিষয় নয়।'

এরপর খানিকক্ষণ মথুর দাসকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলে। এবং স্পেশাল অফিসার, অন্যত্র মিটিং থাকায়, সেদিনের মত শুনানী মুলতুবী করে দেন।

৫.

তিনশো-বার দাগের পাট্টাখানি মাস দুয়েক ধরে তহশীলদারের পকেটে ঘুরছিল আর দাম বাড়ছিল। কামেদ মাহাতো কিছুতেই ছুঁতে পারছিল না ওটা। দিনের পর দিন তহশীলদারের পিছু পিছু ন্যাওটা কুকুরের মত ঘুরতে থাকে সে। পাট্টাটার দাম বেড়ে হয়েছে পনের টাকা। ঐ টাকাটাই কিছুতেই জোটাতে পারছে না কামেদ।

কামেদ মাহাতোকে পাট্টা দেওয়ার বিরুদ্ধে স্থায়ী সমিতিতে ভবেন মাষ্টার অনেক বাগ-বিতন্ডা করেছে! হাঁদা মুর্মুর জন্য অনেক ওকালতি করেছে। কিন্তু শেষ অবধি পাট্টা হয়েছে কামেদের নামে।

খবরটা কানে যেতেই হেদিয়ে পড়ে হাঁদা মর্মু। দিন দুয়েকের মধ্যেই দেখা পায় ভবেন মাষ্টারের। 'কি ভবেনদা, আর মিটিন্ হবেক নাই? সব থাভা মেরো্য গেল যে!'

ভবেন মাষ্টার এখন ভীষণ ব্যস্ত। এক হপ্তা বাদেই পঞ্চায়েতের একটা সীটের বাই-ইলেকশন।

বলল, 'হব্যেক, হব্যেক। খবর পাবি। অন্যের কথা শুনে লাচিস নাই যেন।'

'কিন্তু আমার উই তিনশো-বার দাগের জমিনটা— ?'

'শুনেছিস তো সবই। কিছুতেই দিল না তুয়াকে। কামেদ মাহাতো ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বারাল্যাক।'

'তেবে? এখন উপায়? তুমার কথায় দখলে গেছি আমি। সার-খত্ ঢেলেছি ধার-উধার কর‍্যো— ।'

'কোনও চিন্তা নাই। মাটি কামড়ে পড়ে থাক্। আর, ডাকলে, মিটিং-এ আসিস। বুঝলি ?'

হাঁদা মুর্মু ইদানিং সব কিছুই একটু আগে ভাগে বোঝে। বলে, 'শালা, কামেদ ঘুষ দিয়েছে নির্ঘাৎ।'

'আর তুই ত পার্টির চাঁদাটাও দিস নাই।'

'দুবো গ' দুবো' হাঁদা মুর্মু হলুদ দাঁতে হাসে, 'ধানটা কাটি উই জমিনের, তখন চাঁদার উপর টুকচান্ বেশিই দুবো।'

অবশেষে পাট্টা হাতে পেল কামেদ মাহাতো। মাদি ছাগলটার পেটে বাচ্চা এসেছিল। মাস-দুয়েক বাদেই বিয়োত। সেটাই বেচে দিতে হল ছাঁদাপাথরের হাটে।

পাট্টাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে কামেদ মাহাত। হাল্কা নীল রঙের মোটা কাগজের গায়ে কতকিছু লেখা, ছাপার অক্ষরে। হরেক সই-সাবুদ, টিপ-ছাপ, গোল শীল। দেখেশুনে কামেদের বুকখানা জুড়োলো। জমি মানে চাষবাস। চাষবাস মানেই ধান-চাল। ধান-চাল মানেই ভাত-তরকারি...। কামেদ যেন সিঁড়ি ভেঙে নামছে। এক সিঁড়ি শেষ হলে তখন অন্য সিঁড়ি। চাষবাস মানেই হাল-বলদ, সার-বীজ ...। জমিন তো দিলেন আইজ্ঞা, এখন চাষবাস করি কি প্রকারে! হাল-বলদই যে নাই।

'আরে, থাম্ ব্যাটা।' মেম্বরবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন, 'আগে জমিটার দখল নে। পরে চাষবাস। ওদিকে হাঁদা মুর্মু যে আজ বৎসারাধিক কাল এঁটুলির পারা লেপটে রয়েছে জমিতে। ওকে সমানে উসকাচ্ছে ভবেন মাষ্টার।'

কামেদ মাহাতো হাসবার চেষ্টা করে, 'উয়ার ভবেন মাষ্টার আছে, আমার তুমরা আছেন।'

'আরে, আছি তো বটে। তোদের জন্যই তো আছি। কিন্তু শেষরক্ষা হইল্যে তবেই না!'

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত মেম্বরবাবু নিছক 'গরীবকে বাঁচানোর' জন্যই কামেদ মাহাতোকে নিজের হাল-বলদ দিতে রাজি হন। কিছু সার-বীজও দেন। দখল রাখবার জন্যই তো, প্রথম বছরটা নমো-নমো করে সারলেই হবে। দখল পেয়ে যদি চাষবাস করতে পারিস, তখন দেখা যাবেক।

৬.

আজকের উকিলটি বেশ ফিটফাট, গৌরবর্ণ। বেশ নধরকান্তি আর চকচকে। সঙ্গে মোটা মোটা খান চার-পাঁচ আইনের বই।

স্পেশাল অফিসার শুধোন, 'আপনি কার কেস লড়বেন ?'

'মথুর দাস, স্যার। কেস নম্বর পনেরশো-বাইশ।'

'সে কি!' স্পেশাল অফিসার ভুলভুল চোখে তাকান, 'ও কেসের তো শুনানী হয়ে গেছে। জাজ্‌মেন্ট লেখাও শেষ। আজ রায় দেবার দিন।'

'জানি, স্যার। তবুও আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে কোর্টের সামনে আমার কিছু সাবমিশন আছে।'

'আপনার আগের উকিল তো মথুর দাসের পক্ষে সব পয়েন্টই ইলাবোরেট করেছেন।'

উকিলবাবুটি মিষ্টি হাসেন, তাহলে আর আমার ক্লায়েন্ট উকিল পাল্টাবে কেন?

গগন সরকার বাইরে থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। ভেতরের কথাগুলো শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। সব দেখেশুনে শেষ অবধি ফোকলা-উকিলের ওপর আর ভরসা রাখতে পারে নি। এই উকিলটি বেশ চটপটে। কথাবার্তায় বেশ ঝানু। এর দক্ষিণাও বেশি। তা হোক। বাস্তুর লাগোয়া জমি। প্রায় সোনার তুল্য!

নতুন উকিলের কথায় স্পেশাল অফিসার স্পষ্টতই বিপন্ন বোধ করেন।

'আবার আপনি এই স্টেজে কি সাবমিট করবেন বলুন তো? রায় লেখা, মায় সই-সাবুদও শেষ। কোর্টের তো একটা নিয়ম আছে।'

নতুন উকিল আবারো হাসেন, এটা তো, স্যার, ফুল-ফ্লেজেড কোর্ট নয়। মানে, আমি প্রাক্‌টিক্যাল লেন্সে বলছি।'

স্পেশাল অফিসারের বুকের পাশটিতে বড় বাজে। ইনসাল্ট!

বলেন, 'হোয়াট ডু য়্যুউ মিন বাই ফুল-ফ্লেজেড কোর্ট?'

স্পেশাল অফিসারের চোখ-মুখ দেখে প্রমাদ গোনেন নতুন উকিল। ফাঁদে পড়া শেয়ালের মত এধারে ওধারে ঢিলে দিয়ে ফাঁস খুলতে চান।

'এক্সকিউজ মি, স্যার। আমি সে অর্থে বলিনি। আমি বলছি, এখনও তো আপনি কোর্ট শুরু করেন নি। এখন তো অফিসের অন্য ফাইল করছেন।'

ইনসাল্ট নয় তাহলে! যাক! স্পেশাল অফিসারের বুক থেকে খানিকটা গরম বাতাস বেরিয়ে যায়।

খানিক প্রসন্ন হয়ে বলেন, 'আর সওয়াল করে লাভ নেই। কেস আপনার মক্কেলের পক্ষেই গেছে। মথুর দাস জমি ফেরৎ পেয়েছে।'

শুনে অল্পক্ষণের জন্য বুঝি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন নতুন উকিল।

পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলেন, 'স্টিল, আমাকে কিছু বলতে দিন, স্যর। আই হ্যাভ সাম্‌থিং টু অ্যাড—। প্লীজ, ফর দ্য সেক অব্ জাস্টিস ... স্যর...। আমাকে আমার পয়েন্টগুলো বলতে না দিলে, মাই ক্লায়েন্ট উইল সাফার ইর্‌রিপেয়ারেব্‌ল্ লস্ এ্যান্ড ইন্‌জুরী, স্যর...।'

স্পেশাল অফিসার কাঁধ ঝাঁকান, ঠোঁট ওল্টান, নাচার হবার হরেক ভঙ্গি করে বলেন, 'বলুন তবে, যা বলবার। আমি কিন্তু ফাইল সই করতে থাকবো।'

নতুন উকিল হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মোটা মোটা বইগুলোর পাতা উল্টে গড়গড় করে পড়ে যান কতকিছু। মাঝে মাঝে ইংরাজী-বাংলা মিশিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন হাত-পা নেড়ে।

বিকেলের দিকে রায় পড়লেন স্পেশাল অফিসার। হার্ড দ্য পিটিশনার ...হার্ড দ্য ও পি ...এক্‌জামিন্‌ড্ উইট্‌নেসেস ...ভেরিফাইড ডকুমেন্ট্‌স্ ...। মথুর দাস জমি ফেরৎ পেল। যত টাকা সে উপেন ধরের কাছ থেকে নিয়েছিল, তা সুদ-সমেত কিস্তিতে

কিস্তিতে শোধ দেবে হারান কুচলানকে। সেই কিস্তি আগামী ছ' বছরের মধ্যে শুরু হবে না। জমির দখলটা মথুর পেয়ে যাবে আগামী বৈশাখের আগেই।

ঘন্টাখানেক বাদে নতুন উকিল ঢোকেন স্পেশাল অফিসারের চেম্বারে। বেশ খুশি খুশি তেলতেলে মুখ। বলেন, 'রায়ের কপিটা আজই পেলে ভাল হত, স্যর। হায়ার কোর্টে আপিল করবো কিনা।'

স্পেশাল অফিসার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন উকিলবাবুর দিকে। একটু বুঝি ভয়ও পান। 'সকাল থেকে কিসব মিস্ট্রি করছেন বলুন তো? রায় গেছে মক্কেলের পক্ষে, তাও খানিকটা বকবক করলেন। রায় শুনে আবার অ্যাপিল করতে চাইছেন। নিজের পক্ষে রায় গেলে কেউ এ্যাপিল করে?'

লাজুক লাজুক হাসছিলেন উকিলবাবু। বললেন, 'আমি, স্যর, এখন হারান কুচলানের পক্ষে কথা বলছি। আপিল করবার জন্য আমাকে উকিল নিয়েছেন হারানবাবু।

৭.

সেদিন খুব হাওয়া বইছিল।

কোর্টের অর্ডার নিয়ে তিনশো-বার দাগের দিকে রওনা দিল মথুর দাস। পেছন পেছন গগন সরকার। জমির পাশাপাশি এসে থমকে যেতে হল ওদের। তিনশো-বার দাগের দু' আলে সারবন্দী শ'খানেক লোক। এক আলে হাঁদা মুর্মু, অন্য আলে কামেদ মাহাতো মুখোমুখি।

দেখতে দেখতে সহসা আনমনা হয়ে গেল মথুর দাস। ট্যাকবন্দী কাগজখানা বার কয়েক খসখস আওয়াজ তুলে থেমে গেল।

কাগজখানা ট্যাক থেকে বের করে বার-দুই নিরীখ করল মথুর দাস। কোর্টের হুকুমনামা বলে কথা। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। হাওয়া বইছে খুব। মথুর দাসের দু'হাতের মধ্যে কাগজখানা পাখির মত ডানা ঝাপটাচ্ছে সামনে। একটি অস্থির পাখি। হাল্কা নীলাভ রঙের ওপর কালো কালো ছিটে। মথুরের মনে হল, সামান্য ঢিলে পেলে, যা হাওয়া, কাগজখানা এক্ষুনি উড়ে য.ব দূরে কোথাও, অন্য আকাশে, মথুর দাস আর এ জন্মেও নাগাল পাবে না তার।

একদিনের বিকিকিনি

১.

সূর্যটা পশ্চিম আকাশের দিকে তেরচা হতেই কালা-কার্তিকের কপালে যে ভাঁজটা পড়তে শুরু করেছিল, সেটা দুশ্চিন্তার ভাঁজ। আর, তাই দেখে এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে গুমরোতে থাকা কুন্দর শুধু মুখ নয়, সারা শরীর জুড়ে শুরু হয়েছিল তড়পানি ... আস্ফালন, কিনা, স্রেফ পুরুষালি গোঁয়ারতুমি দিয়ে এতক্ষণ যে তাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে, তার সুযুক্তি যে কানে অবধি তোলা হয়নি, নিকৃষ্টজ্ঞানে তার তাবৎ মতামতকেই যে এতক্ষণ ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পরিণতিতেই না এই শেষবেলায় কালা-কার্তিকের কপাল জুড়ে এমন ভাঁজ, নইলে এতক্ষণে তো মুরগির ঝোল দিয়ে ভরপেট ভাত খেয়ে তাদের একটা জবরদস্ত ভাতঘুম মেরে নেবার কথা। সেইসব কথা মনে পড়তে থাকায় তড়পানিটা বেড়ে যাচ্ছিল কুন্দর। বলে, এখন কেন? আরও গোঁ ধরিয়া থাকো। ডাঁট লিয়া বুসিয়া রও। সেই বলে না, গরিবের কথা পচলে মিঠা লাগে! যত বলি, আর নিজের দর বাড়ায়োনি, সীমা রেখে চলো, তখন তো মুখে বড় বড় কথা! এখন চোখের বাতি যে নিভিয়া যাচ্ছে। বলে কিনা, চারশো ট্যাকার এক ছ্যাদামও কম হবেনি! কী চিজের দাম তুমি চারশো ট্যাকা চাচ্ছ, খিয়াল আছে সিটা! ট্যাকা কি খুলামকুচি নাকি, যে, তুমি যা চাইবে, তাই দিয়ে দিবে মাইন্‌ষে! ট্যাকার তরে (বলে) ভাই ভাইয়ের কলিজায় চাকু চালায়। আর তুমি ভাবছ, সক্কলে বোধ লেয় এক-একটা ট্যাকার গাছ, তুমি গাছটি ধরিয়া ঝাঁকানোমাত্তর ঝরিয়া পড়বে ট্যাকা।

কুন্দর তড়পানির জবাবে সহসা কথা জোগায় না কালা-কার্তিকের মুখে। মেনিমুখার মতো বসে বসে হজম করে কথাগুলো। একসময় মিনমিনে গলায় বলে, তিনশোয় তো রাজি হইছ্‌লাম। দিলনি ত।

...আহা, দিলনি ত। কুন্দ কালা-কার্তিকের গলা নকল করে ভেংচি কাটে, ...সারা সকাল লেজে খেলালে, আর দুপুরবেলায় বলছ কিনা, তিনশো টাকা। ততক্ষণে হয়তো বা খাঁই মিটিয়া গেছে অদের। বাপু বলত, বাজারে গিয়া মাল কখ্‌খনো ফেলিয়া রাখতে নাই। রোদ্দুরে শুকিয়াবে, টসকিয়াবে, পচিয়াবে, ধুলাবালি লাগিয়া মলিন হবে চিজ। তাবাদে, পরখ কত্তে থাকা দশ হাতের টিপাটিপিতে আরও হতশ্রী চেহারা হবে তার। এ হইল, গরম গরম খাওয়ার চিজ, ঠান্ডা মারতে দিলেই দাম কমিয়াবে।

কুন্দর বাপের ছিল চা-তেলেভাজার দোকান। চলত না। প্রায়ই ঠান্ডা মেরে থাকত ফুলুরি, বেগুনি। মাছি ভনভনাত সারাক্ষণ। সেই বাপের সুপুত্রী কিনা আজ কালা-কার্তিককে জ্ঞান বিতরণ করতে গিয়ে ওই হেন বাপের বচন আওড়াচ্ছে!

কুন্দ বলে, (বলি) যেটাতে তুমি দুপুরব্যালায় রাজি হবে, সেটা সকালব্যালায়, একেবারে পয়লা চটকায় রাজি হইতে কী হচ্ছিল তুমার? গুলিয়া জল খাইয়া কী লাভটা হইল? বাপু ঠিকই কইত, গুলিয়া জল খায় গাধারা।

ততক্ষণে শাড়িটা বদলে তৈরি হয়ে নিয়েছে কুন্দ। বলে, লাও বারাবে তো বারাও। পাকা গুঁটিটি কাঁচিয়া দিয়া ফের পাকাতে ভালো লাগে তুমাদের! সক্কালব্যলায় খগেন বাগের কথায় রাজি হয্যালে এতক্ষণে মাংসের ঝোল দিয়া ভাত খাইয়া ঘুম হয্যাতো। তা নয় ...। কুন্দই আগে উঠোনে পা নামায়।

কুন্দর গা-জ্বালানো কথাগুলোকে শুনে যতই খারাপ লাগুক, যতই মুখে, 'শালী, তুই যা বুঝুনি, তাই লিয়া কথা কইতে আসিস কেন?' বলে পালটা ধমক দেবার চেষ্টা করুক না কেন, এতক্ষণে কালা-কার্তিক বউয়ের তাবৎ মুখঝামটা এই কারণেই হজম করছে যে, কথাগুলো তো মনে মনে অস্বীকার করতে পারছে না সেও। তড়পানির ছলে কুন্দ যা বোঝাতে চাইছে, উপস্থিত এটা তো তারও মনের কথা। সকালবেলায়, পয়লা চটকাতে রাজি হয়ে গেলেই তো ভালো হত।

আসলে, কালা-কার্তিক সেই সকাল থেকে মালটি সাজিয়ে বসে ছিল একটা শাঁসালো খদ্দেরের আশায়। নিজের ঘরের দাওয়াতেই বসে বসে একটা স্বপ্ন দেখছিল সে। দু'দুটো নিটোল ভাঁজ ছিল সেই স্বপ্নে। প্রথম ভাঁজে ছিল, মালটা ঠিকঠাক বেচতে পারলে আজ আর খাটালিতে বেরোবে না। এবং দ্বিতীয় ভাঁজে ছিল, শম্ভু গুচ্ছাতের থেকে লগদা দামে একটা মুরগি কিনে এনে, মাংসের ঝোল-ভাত খেয়ে সারা দুপুর দম্মে ঘুম লাগাবে, ভোট দিতে যাবে বিকেল গড়িয়ে। কেন কী, সে তো এমন বিশ্বাসেই বুক বেঁধে বসে ছিল যে, এ এমনই এক চিজ, আজকের দিনে নিজের ঘর থেকেই বিক্রি হয়ে যাবে অক্লেশে। দুয়োর বয়ে এসে কিনে নিয়ে যাবে খইদ্দার। কেন কী, আজকের দিনে তো সামগ্রীটির আকাশছোঁয়া কদর। বিক্রি না হয়ে যা...য়! বছরের বিশেষ মরসুমে, বিশেষ-বিশেষ দিনে নির্দিষ্ট কিছু সামগ্রীর কদর বেড়ে যায়। যেমন, মকর-পরব কিংবা সরস্বতী পুজোর আগে-আগে বাজারে ফল-ফুলারি, বিশেষ করে নারকোলি কুল, আখ, শশা, শাঁকালুজাতীয় ফলমূলের দাম বেড়ে যাবেই। জামাই-ষষ্ঠীর আগের দিন পাঁঠার মাংস, ইলিশ-মাছ, মিষ্টির দোকানে মিষ্টি দই, ...চড়া দামেও পড়ে থাকবে না এসব চিজ। তেমনি, আজকের দিনটিতে কালা-কার্তিক যে তার মালটিকে চড়া দামে বেচবেই, তাতে তার মনে কোনোরূপ সন্দেহই ছিল না। আর, মাল তো মাত্তর দুটো। যত চড়া দামই হাঁকুক না কেন, কালা-কার্তিকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সন্ধে প্রহরেই ফুইরে যাবে!

তার পিতৃদত্ত নাম কার্তিক হলেও লোকে যে তাকে কালা-কার্তিক বলে ডাকে, তার কারণ হলো, সে কানে কালা। তবে গাঁয়েঘরে সমস্ত কানেখাটো লোককেই কি কালা বলে ডাকে মানুষ, নাকি, সমস্ত খোঁড়ার নামের বামপাশে খোঁড়া কথাটা জুড়ে

দেওয়া হয়! কিন্তু এক্ষেত্রে কার্তিকের নামের বাঁয়ে কালা কথাটা যে পাকাপাকি ঠাঁই নিয়েছে, তার কারণ হলো, এই গাঁয়ে আরও দু'-জন কার্তিক দাস রয়েছে। তো, একটা গাঁয়ে যদি সাকুল্যে তিন-তিনটে কার্তিক থাকে এবং সবাইয়ের পদবি যদি একই হয়, তবে তো গাঁয়ের মানুষের খুবই মুশকিল। কাকে ডাকলে কে সাড়া দেবে! কে দোষ করলে কে সাজা পাবে! কাকে নেমন্তন্ন করলে কে খেতে যাবে! তো, গাঁয়েঘরে এমন সমস্যার সমাধান কবেই আবিষ্কার করে ফেলেছে মানুষ। তারা দেহের গঠন পেশা, কিংবা শরীরের কোনও খুঁত ইত্যাদি দেখে তিনটি মানুষের নামের পেছনে তিনটি পৃথক পৃথক বিশেষণ বসিয়ে দিয়েই শনাক্তকরণের কাজটি চালিয়ে নেয়। তো এক্ষেত্রে কানেখাটো কার্তিকের নাম কালা-কার্তিক, আর একজন হল দাউদা কার্তিক, কেন কী, তার সারা গায়ে দাদ। তৃতীয় জন শুধুই কার্তিক। কেন কী, যদিও সে অন্য কার্তিকদের চেয়ে খুবই বেঁটে, অতএব তাকে সহজেই বেঁটে-কার্তিক বলা যেত, কিন্তু যেহেতু দুজন কার্তিক সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল তৃতীয়জনটির নামের বাঁয়ে আর বিশেষণ যোগ করবার দরকারই হয় না। এবং যেহেতু তৃতীয় কার্তিকের আর্থিক অবস্থা অন্য দুই কার্তিকের চেয়ে ঢের ভালো, সেই কারণেই গাঁয়ের মানুষ তার নামের পাশে বেঁটে জাতীয় হীন বিশেষণটি যোগ করেনি। তো, কালা-কার্তিক যে আজীবন কানে কালা এমন একটি রটনা রয়েছে বটে, কিন্তু তার শোনা-না-শোনা ব্যাপারটি খুব রহস্যময়। সে যে কখন শুনতে পাবে, আর কখন পাবে না, তা অন্যের পক্ষে বোঝা রীতিমতো মুশকিল। এমনকী গাঁয়ের অনেকেই মনে মনে বিশ্বাস করে, কার্তিক আদপেই কালা নয়। সে সুবিধে মতো কালা সাজে। যেমন কিনা এই মুহূর্তে কালা-কার্তিক কুন্দর মুখঝামটাগুলো কেন জানি শুনতেই পাচ্ছে না। সে কুন্দর পিছু পিছু মুখে কুলুপ এঁটে উঠোনে নামে। আর, সারাটা সময় কেবল এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটে যে, আজ কিনা পঞ্চায়েত ভোট, অথচ এমন দিনেই এহেন দামি চিজটার কদর এতখানি নেমে গেল!

সন্ধিপুর গাঁয়ের তেত্রিশ নম্বর বুথে গেল দু'-ভোটে গ্রাম-পঞ্চায়েতের আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। দু'-পাঁচ ভোটেই হারাজেতা ঠিক হয়েছে। যে জিতেছে তার তো পাথরে পাঁচ কিল, যে হেরেছে, সে সারাক্ষণ হায় হায় করেছে, কিনা, ইস, মাত্র পাঁচটি ভোটের তরে হারিয়া গেলাম হে! সেই থেকে বাড়তি ক'টি ভোটের জন্য পৃথক উদ্যোগ শুরু হয়েছে খগেন বাগ আর সুরেন সাউয়ের মধ্যে। এই পথটি গেল-নির্বাচনে প্রথম দেখিয়েছিল সুরেন সাউ। গেল-ভোটের আগের ভোটে খগেন জিতেছিল মাত্র তিন ভোটে। গেল-ভোটে সুরেন জিতল চার ভোটে। রহস্যটা ফাঁস হল দিনকয় বাদে। উড়ু উড়ু ভোটারদের থেকে বেছে বেছে পাঁচটি ভোট কিনেছিল সে। কিন্তু জিতেছিল চার ভোটের ব্যবধানে। এবারেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সেই কারণে ভোট কেনার লড়াইতে এবার খগেনও পিছিয়ে থাকতে চায়না। এতকাল ভোট হওয়ার সুবাদে কে-কার ভোটার, এখন চোদ্দোআনা ক্ষেত্রে তা ঠিক হয়ে থাকেই। উড়ু উড়ু ভোট মাত্র দু'-আনা। ওরাই জেতা-হারা ঠিক করে। ওদের নিয়েই যা-কিছু উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। সেই দুর্ভাবনাটার হাত থেকেই গেল ভোটে রেহাই পেতে চেয়েছিল সুরেন সাউ। পাঁচটি

অনিশ্চিত ভোটার, তারা তো আগে থেকেই প্রায় চিহ্নিত হয়ে রয়েছেই, সুরেন সাউ তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল করকরে নোট। কিনা, অত ঢাকঢাক গুড়গুড় করবার কিছু নেই, পরিষ্কার কথা, তুমার ভোটটা আমি কিনতে চাই। এমনি করে, গেল-ভোটে সুরেন কিনেছিল পাঁচটি ভোট, কিন্তু জিতেছিল মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে। হতে পারে, একজন নগদ পয়সায় ভোট বেচেও বাক্সে ফেলবার বেলায় বেইমানি করেছে। আজকাল মানুষ ঘনঘন রং বদলাচ্ছে। সকালে এক, বিকেলে অন্য। সুরেনের মতে, লোভ-লালসা একেবারে গিলিয়া খাচ্ছে মানুষকে।

কালা-কার্তিক প্রথম থেকেই বুঝেছিল, এবারের ভোটে দু'পক্ষই কিছু বাড়তি ভোট কিনবেই। সেই কারণেই, সবাই যখন সাতসকালে পড়ি কি-মরি করে ভোটের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিনা, ভোটটি দিয়েই চলে যাবে কাজকামের তল্লাসে, কালা-কার্তিক গ্যাঁট মেরে বসে ছিল দাওয়ায়। আজ সকাল থেকেই কেন জানি খাটাবাটা করতে যেতে মনটা চাইছিল না একেবারেই। আজ একটুখানি আরাম চাইছিল শরীর। সেই কারণেই সকালটি হতে একটা ফাঁদ পেতে বসে ছিল দাওয়ায়। আগের দিন বিকেলে নটবর দাসের চা-তেলেভাজার দোকানে সে এমন কথাটাও হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিল যে, কাকে ভোট দেবে, সেটা ঠিকই করেনি। বলেছিল, দু'জনার মধ্যে একজনাকেই দিব। কাকে দিব, সেটা রাতের ব্যালায় ভাবিয়া ঠিক করব। শেষ মুহূর্তে যাকে ভালো মনে হবে, তাকেই দিয়া দিব ভোটটা। আর, আমার বউটিকে তো তুমরা চিনো। কুনো বেপারেই তার কুনো নিজস্ব মতামত নাই। আমার মতেই মত। সামান্য একটা কালবউস মাছ, ক'চাকা করিয়া কাটবে আমাকেই বলিয়া দিতে হয়। বলি, অরে শালী, পেত্যেক মাইন্‌সের মাথায় একটা করিয়া পিথক মগজ দিয়েছে ভগ্‌মান। তোর মাথায় কি সেটা দেননি তিনি ? কাজেই, কালকেও আমি যাকে ভোট দিব, বউও তাকে দিবে। দোকানে বসে চা-ফুলুরি খাচ্ছিল খগেন-সুরেনের দু'চারজন চেলা। কালা-কার্তিকের কোনও সন্দেহই ছিল না, ওরা যত জলদি সম্ভব যে-যার নেতার কানে তুলে দেবে কথাটা। এই উপায়েই ভোটের আগের দিন বিকেলে সে তার পরিবারের দুটি ভোটকে বিক্রয়যোগ্য করে তুলেছিল। অথচ ভেতরের কথাটা এই যে, বউ আবার খগেন বাগের পাকা ভোটার, কেন কী, খগেন তার দূর সম্পর্কের মামা। কিন্তু কথাটা বুঝতে পেরেই কালা-কার্তিক তার ওপর নেয় বাঘের ঝাপট। শালী, ভোটে অত মামা-কাকা কী র‍্যা ? সে দাঁড়াচ্ছে নিজের আখের গোছাতে। তুই কেন নিজের আখেরটা গুছাবিনি ? যাকে বলব, তাকেই ভোট দিবি। মনে হচ্ছে সোয়ামির কথাটা মানবে। আর না মানলেও ক্ষতি কী ! ভোট বাকসে শালী কাকে ভোটটা দিল, সেটা তো আর বুঝবার উপায় নাই। ওই আনন্দে রাতের বেলায় গোটাকয় শুকনো রুটি চিবিয়ে শুতে গিয়েছিল কালা-কার্তিক, পরের দিনটাকে নিয়ে একটা সুখকর স্বপ্ন দেখতে দেখতে তলিয়ে গিয়েছিল গাঢ় ঘুমে।

২.

তখন সবে সুয্যিদেব মুখটি দেখিয়েছেন, সামনের বড় রাস্তা দিয়ে গরিবগুরবোরা আধানেতা, সিকিনেতাদের তাড়া খেয়ে সারবন্দি হাঁটা দিয়েছে বুথের দিকে, আগড় ঠেলে উঠোনে পা রেখেছিল খগেন বাগ। খুবই ব্যস্ত-সমস্ত মুখ। এসেই কাজের কথা

পাড়ে, কি না, কার্তিকদের ভোটদুটো তার চাইই চাই। এগিয়ে দিয়েছিল পঞ্চাশ টাকার নোট। বলে, এই লে, মিঠাই খাস।

নোটটার দিকে খুব অলস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কালা-কার্তিক। হাত পেতে টাকাটা নেবার গরজ দেখায়নি তিলমাত্র।

খগেন বাগ অস্থির গলায় বলে, নে, নে, জলদি ধর। আমার এখন অনেক কাজ। আরও কমপক্ষে পাঁচটা ভোট আমাকে জোগাড় করতেই হবে।

কালা-কার্তিক তাও ম্যাদা মেরে বসে থাকে। এক সময় খুব শীতল গলায় বলে, পঞ্চাশ টাকা কি কেবল আমার ভোটটার জন্য? নাকি, আমার আর কুন্দর দু'জনার?

—অত আমার-তার ভাবিস কেন? এ-তো আর দাম দিয়ে মাল কেনা লয়। নিজের মানুষ, মিঠাই খাইতে দিচ্ছি। কোনওকিছু হিসাব করিয়া তো আর দিচ্ছিনি।

—তা বটে। যদি মালই কিনছই না, তবে মিঠাই খেতেই বা দেওয়া কেন? ভোটটা যদি দিই তো, এমনিই দুব। মিঠাই খাবাতে লাগবেনি দাদা।

দু'চোখ কপালে তুলে খগেন বাগ ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে কালা-কার্তিকের দিকে। ভেতরের সেয়ানা মানুষটাকে দেখতে পায় বুঝি। বলে, বেশি ঠ্যাটামো করিসনি। আর কত দিতে হবে, বল। কিন্তু তোদের ভোটদুটো আমার চাইই।

খগেন বাগের কথা শুনে এতক্ষণে হাসি ফোটে কালা-কার্তিকের ঠোঁটের ডগায়। বলে, দু'-দুটা সিয়োর ভোট, একটা বেবেচনা করিয়া দাও। মাল কিনতে বারিয়েছ, মালের ন্যায্য বাজারদর লিশ্চয়ই জানা আছে তুমার।

—আহ্, আবার ঠ্যাটামো করে! কত হইলে দিবি বল? আমার হাতে টেইম কম। আরো পাঁচটা ভোটারের দুয়োরে ঘুরতে হবে।

—দ্যাখ দাদা, পস্টাপস্টি কথা কওয়াই ভালো, দুটা ভোট চারশো-র কমে হবে নি।

—চা-র—শো! খগেন বাগ বুঝি এবার সত্যি সত্যিই আকাশ থেকে পড়ে ... স্বপন দেখতিছু নাকি র‍্যা? কাগজের উপর একটা মাত্তর ছাপ মারবি, আর তরে দুশো টাকা চাস তুই!

—হ্যাঁ ... বটে তো, একটামাত্তর ছাপ বই তো লয়। কালা-কার্তিক খুব উদাস নয়নে আকাশের দিকে তাকায়, রোদ্দুরের রং পরখ করে। বলে, মনে করো, গেল ভোটে ওইর'ম চারটা ভোটের তরেই হারিয়া গেছলে তুমি। পাঁচ-পাঁচটা বচ্ছর হা-হুতাশ করিয়া ঘুরিয়া বুলছ। মাঝের থিক্যা সুরেন সাউ লুটিয়া লিল।

খগেন বাগের বড় দুঃখের জায়গাটাকে চট করে ছুঁয়ে ফেললো কালা-কার্তিক। খগেনের চোখমুখ কয়েক লহমার জন্য মেঘে ঢেকে গেল বটে, পরমুহূর্তেই সেই আগের অস্থিরতা। বলে, দ্যাখ, আমিও পস্টাপস্টি বলতিছি তোকে, দুটা ভোটের তরে বড় জোর আশি টাকা দিতে পারি। তার চাইতে একটি ছ্যাদামও বেশি লয়। রাজি কিনা বল? বলতে বলতে হাফশার্টের পকেট থেকে গোটা দু'তিন দশ টাকার নোট বের করে খগেন।

কালা-কার্তিক আড়চোখে দেখে নেয় নোটগুলোকে। লম্বা করে হাই তোলে। খুবই অলস গলায় বলে, এবারে আর ভোট দিতে যাবনি দাদা। কী হবে, বচ্ছর বচ্ছর ভোট দিয়া? কুন্ শালা আমাদিগের ভালোটা করবে? সেই বলে না, যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।

কালা-কার্তিকের কথাগুলো শেল হয়ে বাজে খগেন বাগের বুকে। একে তো কৌশলে 'শালা' বলল খগেনকে, তার ওপর এমন ইঙ্গিতও করলো যে খগেন বাগও জিতলে সুরেন সাউয়ের মতোই লুটবে। তাও ঝানু খদ্দেরের মতো পিছু ফিরে হাঁটতে গিয়েই ঝাঁকুনি মেরে ঘুরে দাঁড়ায়, শুন্, পুরাপুরি একশো দিচ্ছি। শেষ কথা। রাজি থাকলে বল্।

খগেন বাগ পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে চোখ রাখে কালা-কার্তিকের চোখে। কার্তিকের চোখে মিচিক-মিচিক হাসি দেখে মাঝপথে থমকে যায় হাত। একবার ভাবে আরও পঞ্চাশটা টাকা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে হয়, কালাকে আর বেশি তেল মারাটা সঙ্গত হবে না। লেজটা আরও মোটা হয়ে যাবে তাহলে। তাবাদে, এই তো সবে সকাল। সারা দিনটাই তো পড়ে আছে। করকরে নগদ টাকার টোপ খেয়েছে শালা। না দিয়ে যাবে কোথায়! ভানুকে বরং একটুখানি বেলা বাড়লে পাঠিয়ে দিলেই হবে। দরাদরি করে কেস পাকাতে সে শালা ওস্তাদ। খগেন বলে, ঠিক আছে, যা ভালো বুঝিস। আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নাই। রাজি থাকলে সোজা বুথে চলিয়া যাবি আমাদের ক্যাম্পে। সাথেসাথ সিলিপ পায়াবি। ভানুকে বলিয়া রাখব। আড়ালে গিয়া একশো টাকা লগদা পে-মেট করিয়া দিবে তোকে।

কালা তো, তাই খগেনের শেষের দিকের কথাগুলো বুঝি শুনতেই পেল না কার্তিক। সে ততক্ষণে গুণগুনিয়ে গান ধরেছে, আমি সুখেরো লাগ্গিয়া এ ঘরো বাঁধ্‌ধিনু—অনলে পুড়িয়া গ্যালো....।

খগেন বাগ যাওয়ার পর পনেরো মিনিটও কাটেনি, সুরেন সাউকে দেখা গেল আগড়ের বাইরে।

অজান্তে হাসি ছলকে উঠতে চায় কালা-কার্তিকের ঠোঁটের ডগায়।

সুরেন সাউ উঠোন থেকে ধুলোপায়ে দাওয়ায় উঠে আসে সটান। বলে কার্তিক রে, তোকে তো বলতে আসা না আসা সমান। কেন কী, তুই তো চিরকালই ভোটটা আমাকেই দিস।

সুরেনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসে কালা-কার্তিক। জবাব দেয় না।

—তবুও ভাবলাম, যাই, একটিবার নিজে গিয়া বলিয়া আসি। কেন্ডিডেট হিসাবে সেটা তো আমার কত্তব্যো।

কালা-কার্তিক আবারো হাসে। জবাব দেয় না এবারও। সুরেনের চোখেমুখে নিদারুণ অস্থিরতা লক্ষ করে সে। মনে তার পুলক যেন ধরে না আর। বঁড়শিতে আটকে থাকা মাছটাকে খেলতে দেয় ইচ্ছেমতো।

এক সময় সুরেনও পকেটে হাত ঢোকায়।

—এই নে কার্তিক, বউমাকে মিঠাই কিনে দিস। নোটটার দিকে না তাকিয়েই কালা-কার্তিক আলগোছে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, কত?

কালা-কার্তিকের এহেন নির্লিপ্ত আচরণে থতমত খায় সুরেন সাউ। বলে, লে, লে, ধর। পুরা আশি টাকা আছে। দু'জনে একসঙ্গেই যাস কিন্তু।

—আশি! শিশুর মতো সরল হাসি কালা-কার্তিকের ঠোঁটে, —খগেন বাগ তাইলে আর দোষটা কী কল্ল?

—খগেন বাগ? সে শালা তোর দুয়ারে কেন? তুই তো তার ভোটার লয়।

—না, না, আমি তো সবদিনই তুমার ভোটার। কিন্তু একটু আগে আইসিয়া সেও তো একশো টাকা হাতে গুঁজিয়া দিছলো বার-বার তিনবার। আমি বললাম, না দাদা, ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ করবোনি। এদেশের মানুষ হিসাবে ভোট দিয়াটা আমার কত্তব্যের মধ্যে পড়ে। যেদেশে ভোট নাই, রাজা বাছবার কুনো বেবস্তাই নাই, তাদের কত দুঃখ! শুনছি, কাবলিদের দেশে নাকি ভোট নাই। ত,' আমরা সেই ভোটের ক্ষমতা পায়াও যদি ঠিকঠাক ভোটটি না দিই ....। না দাদা, টাকা লিয়া ভোট দিব, তেমন বান্দা আমি লই।

—লে, লে, বড্ড ঠ্যাটা হয়েছু আজকাল। একশো টাকাই ধর্। কিন্তু দুটি ভোট যেন ঠিক ঠিক পাই। বেইমানি করিসনি শালা।

—অ্যাই দ্যাখো, কথা বুঝলেনি তুমি। অ্যাতোক্ষণ তেবে বললাম কী? তুমার থিক্যা একশো টাকাই যদি লিব, তবে খগেন বাগ কুন্ আপরাধটি কল্ল?

—শালা, তবে কত চাউ তুই। দুটামাত্তর ভোটের তরে কি ইন্দ্রের ঐরাবত দিতে হবে তোকে! লিহাত ...।

—ওই লিহাতটাই আসল কথা। চোখ নাচায় কালা-কার্তিক, —আচ্ছা ভাবো তো একটিবার। পাঁচটি বচ্ছর পঞ্চাতের মেম্বার রইলে সাকুল্যে আয়-উপায় কত হবে তুমার! তার উপর কানা-ঘুষায় শুনতে পাচ্ছি, এবার জিতলে নাকি পড্ধান হইতে পার তুমি।

কথাটা শোনামাত্তর নিমেষের মধ্যে চোখমুখের অভিব্যক্তি দ্রুত বদলে যেতে থাকে সুরেনের। চকচক করে ওঠে চোখের মণি। এ শালা বলে কী! তেমন সম্ভাবনা সত্যি সত্যি রয়েছে নাকি? তাহলে তো আর দেখতে হয় না। একেবারে পাথরে পাঁচ কিল। আটাত্তর সালে যখন প্রথম পঞ্চায়েত ভোট হল, কেউই গ্রাম পঞ্চায়েতে দাঁড়াতে চায়নি। সবাইয়ের লক্ষ ছিল জেলা পরিষদ, নিদেন পঞ্চায়েত সমিতির দিকে। বাস্তবিক উঁচু তলা থেকে নিচু তলার বাসিন্দা হতে কে-ই বা চায়! জেলা পরিষদের মেম্বর মানে কতখানি এলাকার দায়দায়িত্ব! জেলার সবচেয়ে উঁচু সংস্থাটির সদস্য হওয়া। ব্লক অফিস পিছু দু'-তিনজন। সারা জেলা মিলে জনা-চল্লিশ ভাগ্যবান। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বর মানে মাত্র একটি বুথের নিধিরাম সর্দার তুমি। সারা জেলার কয়েক হাজার মেম্বার একজন। প্রথম ভোটে তাই জেলা পরিষদ, নিদেন পঞ্চায়েত সমিতির টিকিট পাওয়ার জন্য লড়াই চালিয়েছিল প্রায় সবাই। যারা সে লড়াইতে হেরে গিয়ে গ্রামে পঞ্চায়েতে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল, তারা সারাক্ষণ বিষন্নবদনে ঘুরে বেড়িয়েছিল, বউয়ের মুখঝামটা খেয়েছিল, শালা-শালীদের সামনে মুখ দেখাতে পারেনি লজ্জায়। কিন্তু কয়েক বছরেই সবাই বুঝে গিয়েছিল সার কথাটা। বুঝে গিয়েছিল যে, চাকভরতি মধু কোথাও থাকলে তা গ্রাম পঞ্চায়েতেই রয়েছে। টাকা-পয়সা, ইস্কিম, চোদ্দোআনাই তো গ্রাম পঞ্চায়েতে। তাবাদে পারমিট, লাইসেন্স, শালিশী, মাতব্বরি ... সাধে কি লোকে বলে, উপরে ভগবান, নীচে পড্ধান, এর মধ্যিখানে আর কেউ নাই। কাজেই পরের ভোট থেকে সবার নজর গ্রাম পঞ্চয়েতের দিকে। আর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হওয়া, সে তো একটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। রাতারাতি অনেক সোনার কাঠি রুপোর কাঠি এসে যায় হাতে। কাজেই, কালা-কার্তিকের মুখে কথাটা শোনামাত্তর পিটপিট

করে তাকায় সুরেন সাউ। কালা-কার্তিকের চোখে চোখ রেখে কথাটার সত্যমিথ্যে পরখ করবার চেষ্টা করে সে। একসময় খাটো গলায় শুধোয়, কে বললো তোকে?

কালা-কার্তিক ফের হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয় চোখ। আকাশের পানে তাকিয়ে রোদ্দুরের রং পরখ করতে থাকে। একসময় খুব নিরাসক্ত গলায় বলে, এই কানাঘুষায় শুনতে পাচ্ছি। যা রটে, তার কিছোটা তো সত্যি বটে। তাই, বলতেছিলাম, কটা মাত্র টাকার তরে ...।

প্রধান হওয়ার স্বপ্ন থেকে অতি দ্রুত মনটাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনে সুরেন সাউ। বলে, করকরিয়া একশো টাকা, ক'টা মাত্তর টাকা হইল তোর পাশ? তাবাদে, তোরা দুটিমাত্তর নাকি? আমার এ বচ্ছর ক'টা সিয়োর ভোট চাই, জানিস?

—তা, খুড়া, ভাজা খাইতে হইলে টুকচার তেলের ব্যয় তো হবেই।

ততক্ষণে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে সুরেন সাউ। সহসা খেঁকিয়ে ওঠে সে,—ত' ভাজা খাইতে হইলে কতটা তেলের ব্যয় কত্তে হবে, সেটা পস্টাপস্টি খুলিয়া বল না রে শালা। আমার যে মাথার উপর গন্ধমাদন, তোর সাথ রগড় করবার টেইম নাই।

—পস্টাপস্টি? কালা-কার্তিক সরাসরি চোখ রাখে সুরেন সাউয়ের চোখে,—পস্টাপস্টিই বলি তবে। খগেনদাকে যা বইল্‌ছি তুমার ক্ষেত্রেও তার লড়চড় হবেনি। দুটা ভোটের তরে থোক চারশো লিব আমি, যাও ভোট তুমার বাস্কে পড়িয়া গেছে ধরিয়া লও।

—শালা, তুই কি পাগল হয়্যালু নাকি রে? প্রবল রোষে ফেটে পড়ে সুরেন সাউ,...কত ট্যাকায় চারশো ট্যাকা হয়, কুনো ধারনা আছে তোর? যা মনে আসে, বলিয়া দিলেই হয়্যাল? শুন্ দুটি শো ট্যাকা দিব আমি, রাজি থাকলে সোজা বুথে চলিয়া আইস্‌বি। আমি রইবো বুথে। পে-মেট সেখানে পাবিনি। সন্ধ্যায় পায়াবি লটবরিয়ার চায়ের দোকানে, এক বাত।

হনহনিয়ে চলে যায় সুরেন সাউ। পেছন থেকে ওকে দেখতে দেখতে ঠোঁটের কোণে হাসি চুঁইয়ে পড়ে কালা-কার্তিকের। শালা ঘুঘুর-পো আজ ফাঁদে পড়েছে। চারশো টাকা না দিয়া যাবে কুথা! জিতা হারার প্রশ্ন এটা, ছেলেখেলা লয়। পাঁচ বছর পঞ্চায়েতে থাকবার মধুটা তো একবার পেয়ে গিয়েছে। বাঘ পেয়েছে রক্তের স্বাদ। এ-ভোটে জেতাটা, বাস্তবিক, তার কাছে মরণবাঁচনের প্রশ্ন। কাজেই, দেমাক্ দেখিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু ঘুরে এল বলে। ভাবতে ভাবতে মনের পুলকে গানটার পরের কলিতে চরে বেড়ায় মন,....অমিয়-সাগ্‌রে সিনানো করিতে সক্‌কলি গরলো ভেল ....।

৩.

খগেন বাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভানু বাগ যখন এল, রোদের তাত বেশ বেড়েছে। এসেই সটান দাওয়ায় উঠে পড়ে ভানু।

ভানুকে দেখে একেবারে পাদ্যঅর্ঘ দেবার ভঙ্গিমায় হাসে কালা-কার্তিক। চোখ নাচিয়ে বলে, কী... ? লেতা তো এবার পড়্‌ধান হচ্ছে।

আচমকা যেন বিষম খায় ভানু বাগ, পড়্‌ধান! পড়্‌ধান মানে? স্বপন দেখতিছ নাকি?

—হা—। আকাশের দিকে মুখ করে হাই তোলে কালা-কার্তিক, পড়্ধান হবে খগেন বাগ, আমার স্বপন দেখিয়া লাভ কী ভাইপো? আমাদের হইল 'বেল পাইক্‌লে কাগের কী'!

কালা-কার্তিক চোখ নাচায়, ...খগেন বাগ পড়্ধান হইলে তো তুমারই পুয়াবারো!

ভানু বাগ কান এঁটো করে হাসতে গিয়েও সামলে নেয় শেষ মুহূর্তে। বলে, কিন্তু কথাটা তুমাকে বলল কে?

—আমি তো আর অত কপাল করিয়া আসিনি যে, কেউ ঘর বইয়া এমন কথা কইয়া যাবে আমাকে। হাওয়ায় ভাসতিছে কথা, কান পাতিয়া শুনি আর কী।

এমন দুর্জ্ঞেয় কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না ভানু বাগ। সে আর ওই নিয়ে কথা বাড়ায় না। পকেট থেকে একগাছা নোট বের করে এগিয়ে দেয় কার্তিকের দিকে। বলে, অ্যাই লাও, পুরো দেড়শোই পাঠিয়া দিছে জেঠা। একখানা একশো এবং একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট ভাঁজ খুলে একেবারে দাতাকর্ণের স্টাইলে কালা-কার্তিকের দিকে এগিয়ে দেয় ভানু।

কালা-কার্তিক চোখে খুব কৌতুক ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকে অবোধ নোটদুটোর দিকে। পরমুহূর্তে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় ভানু বাগের দিকে, এটা কী র‍্যা?

—এই, ন্যাকামি করোনা দেখি। ন্যাকামি শুনবার সময় নাই আমার। মাথার উপর গন্ধমাদন। লাও, টাকাটা ধরো। আর দুপুর দুপুর চলিয়া যেয়ো। বিকালব্যালায় আবার রাশ বাড়বে।

—ন্যাকামি আমি কচ্ছি? নাকি তুই কচ্ছু? কেবল এইটা দিয়াই তোকে পাঠিয়েছে? ওই লোটটা বার কর দেখি জলদি।

ভানু বাগ বাধ্য হয়ে পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ভাঁজ খুলতে থাকে। কালা-কার্তিক নোটটাকে এক ঝলক দেখে নিয়েই ফিরিয়ে নেয় মুখ।

—কী হইল? টাকাটা ধর। খুব অস্থির গলা ভানু বাগের।

—ধরব। কালা কার্তিক খুব দার্শনিক গলায় বলে, বাকি টাকাটা বার কর।

—ইস, দু'শো টাকায়ও মন উঠছেনি! কত টাকা চাও তুমি?

—সেটা তোর মালিককে পয়লা চটকায় বলিয়া দিছি।

ভানু একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কার্তিকের দিকে। বলে, নোলা তো বড্ড বাড়িয়া গেছে হে তুমার! দুটামাত্তর ভোটের তরে লগদা দুশোটি টাকা দিবা হচ্ছে, তাতেও মন উঠতিছে নি? খগেন জেঠা পড়ধান হইলে তার থিকে কুনো উপকার লিতে যাবেনি তুমি?

—কী যে কউ ভাইপো! পড়্ধানের পাশ সক্কলের কাজ। কিন্তু পড়্ধান হইতে হইলে তো ভোটে জিততে হবে পয়লা। বলতে বলতে পুনরায় চোখ নাচায় কালা-কার্তিক, —ধরো, যেদি মাত্তর দুটা ভোটের তরেই হারিয়া গেল খগেনদা, তখন?

—শুন, বাজে কথা শুনবার সময় নাই আমার। আড়াই-শো টাকায় হবে? লচেৎ তুমার পথ তুমি দেখো, আমার পথ আমি দেখি।

*শেষ অবধি গজগজ করতে করতে ফিরে যায় ভানু বাগ। দাওয়ায় বসে কালা-*কার্তিক চেঁচিয়ে বলে, চারশোয় রাজি থাকলে দুফোরের আগে আইসো কিন্তু। সুরেন

সাউ যদি টাকাটা কুনো গতিকে হাতে গুঁজিয়া দেয়, আমার কিছো করবার থাকবেনি। টাকা লিয়া কথার খেলাপ করবার লোক লই আমি।

বেলা বারোটা নাগাদ তিনশো টাকা দিয়ে কেদার দাসকে পাঠায় সুরেন সাউ। কালা-কার্তিক তাকেও ফেরত পাঠায়। তখন সামনের শুঁড়িপথ ধরে মানুষজন চলেছে বুথের দিকে। এক-একটি দলে সাত-আটটা করে মানুষ। মেয়ে-মদ্দ, বুড়ো-বুড়ি...। পিছু পিছু লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে খগেন-সুরেনের চেলারা। হাঁটার গতি শ্লথ হওয়া মাত্র তাড়া লাগাচ্ছে, জোরে হাঁটো হে ...। তুমাদিগকে পৌঁছিয়া দিয়া ফের মাঝের পাড়ায় ছুটতে হবে। গুচ্ছাত আর প্রধান বাড়ির লোকজনকে বার করতে হবে। তাড়া খেয়ে মানুষগুলো হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। চেলাদের কেউ কেউ রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, কী হে, কাত্তিকদা, গ্যাঁট মারিয়া বুসিয়া আছ যে বড়? বারাও, বারাও, আমরা আসতেছি। পরের লটে লিয়া যাবো তুমাদের। বউদির রাঁধাবাড়া কদ্দুর? কালা-কার্তিক দাওয়ায় বসে মিটমিটি হাসতে থাকে। জবাব দেয় না।

আকাট বৈশাখ মাসে ভোট। বেলা বাড়ছে হুহু করে। রোদের তেজ বাড়ছে। হাওয়া গরম হচ্ছে দ্রুত। ঝলা বাতাস বইতে শুরু করেছে। বুথের দিক থেকে কলবর ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। দূরের বড় রাস্তা দিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি ঝাঁ ঝাঁ শব্দে বেরিয়ে গেল। গুমোট গরমে কালা-কার্তিকের গায়ের ঘামাচিতে চিড়বিড়ানি শুরু হয়েছে। ইস্, এই ঘোর গরমে ভোট ডাকে কেউ! বাবুদের যে কী বুদ্ধি! এখন বলে দু'ঘড়ি বেলাতেই হাঁসফাঁস করতে থাকে মানুষ। এর মধ্যে ভোট! বুথ অবধি যেতে গিয়ে বেম্মতালু ফেটে যাবার জোগাড়। আর, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা, সেও তো এক নরকযন্ত্রণার সামিল। শুধু কি ভোটারদের কষ্ট, ভোটবাবু, পার্টির লোকজন, পুলিশ, সবাই তো হাঁসফাঁস করতে থাকে সারাক্ষণ। শীতে ভোটটা করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? শুনে বাম পার্টির নেতা খগেন বাগ মিটিমিটি হাসতে থাকে। বলে, বড় মাথা খাটিয়া এই মরসুমে ভোটটা ডাকা হয় রে কার্তিক, তুই তার বুঝবি কি! এমন ঠা-ঠা গরমে বাবুভায়াদের ঘরের লোকজনের বড়ই কষ্ট। বুথ অবধি আসতে কষ্ট, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট, ঠেলাঠেলি ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আরও কষ্ট। অনেকেই তাই এত কষ্ট সয়ে ভোট দিতে আসেই না। যারা আসে, তারাও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অধিকক্ষণ। আর, বাবুভায়ারা না আইলে, সেটা কাদের লাভ, অ্যাঁ? আমাদের বাপ গরিবের পার্টি। রোদ-বরষা-ঝড়, কিছুই আমাদের ভোটারদের রুখতে পারবেনি। কী রে, বুদ্ধিটা কেমন?

দুপুর গড়ানির মুখে, তাও খগেন-সুরেনের থেকে এল না কেউ। রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল মরে আসে। অপেক্ষা করতে করতে ঘুম পেয়ে যায়। গজগজ করতে করতে একসময় উনুনে আগুন দেয় কুন্দ। যে ক'টি চাল ছিল, হাঁড়িতে চড়িয়ে দেয়। খিড়কির ডোবার পাড় থেকে শাকপাতা তুলে এনে কুটতে থাকে। হাত চলে, মুখও চলে। কালা-কার্তিকের উদ্দেশে সমানে গঞ্জনা দিতে থাকে কুন্দ। সেই কথায় বলে না, যাচা অন্ন ছাড়তে নাই। লগদা তিনশোটি টাকা ঘর বইয়া লিয়া আইস্‌ল, বাবু দেমাক মারিয়া বুসিয়া রইলেন। এবে বুঝ-অ। বাপু ঠিকেই বলত, অতি লোভে তাঁতি লষ্ট। সেই বলে না, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্তের বচন/অতএব কর সবে লোভ সম্বরণ...।

কার্তিকের চোখের সামনে সময় নিঃশব্দে বয়ে যায় ....রোদ্দুরের রঙে, হাওয়ার সঙ্গো মিশে থাকা গুমোটে ....। স্কুলের দিক থেকে মুহুর্মুহু ভেসে আসে কলরব ...কখনো বা পেটোর আওয়াজ। সামনের রাস্তায় ভোটারদের আনাগোনায় খানিক ছেদ পড়েছে এতক্ষণে। কার্তিক জানে, এই পরিস্থিতি ঘন্টাটাক থাকবে। তারপর, রোদ্দুরের চোখরাঙানি চড়াভাবটা একটুখানি টসকালে পর, সামনের বড় রাস্তায়, ভোটারের স্রোতটি আবার বইতে শুরু করবে। ওই স্রোতটি অবশ্য অপেক্ষাকৃত মৃদু। এবং স্রোতের মধ্যে সম্পন্ন ঘরের মহিলাই বেশি। এবা সারা সকাল ঘর-গেরোস্থালির কাজকাম সামলেছে, রান্না করেছে বাহান্ন পদ, রাবণের গুষ্টিকে খাইয়েছে, তারপর ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে সম্বৎসর তুলে রাখা শাড়ি-সায়া বের করে পরিপাটি করে পরেছে। যাদের রয়েছে, তারা গায়ে বাড়তি দু'খান চড়িযেও নিয়েছে। তারপর মুখে মিঠে পানটি পুরে দল বেঁধে রওনা দিয়েছে ভোটবুথের দিকে। রাস্তায় যেতে যেতেই ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে গিয়েছে প্রস্তাবটা যে, যদি তেমন ভিড়ভাট্টা, *ঠেলাঠেলি*, ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখে, যদি ওই অবস্থায় অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বলে মনে হয়, তো পত্রপাট বিদায়। সো....জা নিজের ঘরে ফিরে আসা। কেন কী, সাধ করে লোধা-সাঁতাল-বাগদি-বাউরিদের ঘেমো, শরীরের সঙ্গো গা ঘষাঘষি করবার তিলমাত্র রুচি নেই একজনারও। ভোটের পায়ে গড়। মন চল নিজ নিকেতনে। কার্তিক জানে, যেমনটা আশঙ্কা করতে করতে চলেছে মেয়াগুলো, লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে যদি অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে সুরেন সাউয়ের বাপেরও সাধ্যি নেই এদের অধিকক্ষণ লাইনে আটকে রাখে। কাজেই, সুযোগটা ষোলআনার জায়গায় আঠারো আনা নেয় খগেন বাগ। সকাল-সকাল আদিবাসীপাড়াগুলোর থেকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে এলেও, ফি-পাড়ায় কট্টর সমর্থক এবং মারকুটে দজ্জাল গোছের কিছু মেয়েকে রেখে দেয়। বলে, রাধি, বুধি, একাদশী....তোরা দুফোরের পর যাইস। এতদিনে রাধি-বুধিরাও এমন কথার পিঠের মধ্যেকার পুরটির সন্ধান জেনে গিয়েছে। খিলখিলিয়ে হেসে *ওঠে* ওরা, তাই যাব গ' খগেনদা। একটা মাছিকে অবদি গলতে দিবনি।

পেটের ভেতর খিদেটা ক্রমশ প্রকট হয় ...। মাংস-ভাতের স্বপ্নটা ততক্ষণে খানখান। উপস্থিত এক সানকি ফেনাভাত পেলেই যে পেটের জ্বালা নিস্তেজ হয়। আরে শালী তুই করছিসটা কী! পুলাউ নাকি বিরানি রাঁধছিস তখন থিকে! একটুখানি ফেনাভাত রাধতে তো দেখি পুরা দিনটাই কাবার তোর! শালী কি রাতের খাবার একসঙ্গো খাবাবি নাকি রে? খিড়কির দিকে দ্রুতহাতে কাঁটাখোঁচা ভাঙছিল কুন্দ, কার্তিকের *চেঁচামেচি* কানে যায় তার। বোঝে। এ হল কার্তিকের চরম হতাশার বহিঃপ্রকাশ। পেটের জ্বালা আর মনের জ্বালা মিলে বুকের মধ্যে একসঙ্গো বাধাতে চাইছে হুলস্থূল। এই সময়টা বড়ই ভয়ানক। যে-কোনও মুহূর্তে খুলে যেতে পারে ভিসুভিয়াসের মুখ। শুরু হয়ে যেতে পারে চড়-চাপড় লাভাবৃষ্টি। এসময়টা কথার পিঠে কথা গুঁজতে গেলেই বিভ্রাট শুরু হবে। চ্যালাকাঠে পিঠখানা ভাঙবে কুন্দর। এখন মুখে কুলুপ মেরে আড়ালে আড়ালে সরে থাকাটাই দস্তুর। তারপর রান্না হলে পর, একেবারে

ফেনাভাতের থালাটি নিয়ে হাজির হওয়া কার্তিকের সামনে। কুন্দ শরীরের তাবৎ শক্তি একত্র করে মোটামোটা বাঁশকঞ্চিগুলোকে ভাঙতে থাকে।

ততক্ষণে কালা-কার্তিকের মনেও বাস্তবিক অল্পস্বল্প হা-হুতাশ শুরু হয়েছে। সত্যিই তো, তিনশো টাকা নিয়ে সুরেনের চেলা কেদার দাস তো ঘর বয়ে এসেছিল। টাকাটা নিয়ে নিলেই তো পারত কার্তিক। কী যে দুর্বুদ্ধি হল, তিন-তিনশো টাকা ... একেবারে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেবার মতো ব্যাপার। সেটাই বুঝি তার কাল হল। কারণ, সেই যে দু'পক্ষ গেল, আর ফিরল না কেউই। দাওয়ায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল মরে গেল কার্তিকের। দুই নেতারই চেলারা কতবার সামনের রাস্তা দিয়ে যে-যার ভোটারদের ছাগল-তাড়ানো তাড়িয়ে নিয়ে গেল, কেউ কেউ আনাগোনার ফাঁকে আড়চোখে তাকালও, কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাধ্য হয়ে একবার খগেন বাগের এবং একবার সুরেন সাউয়ের ভলেন্টিয়ারগুলোর উদ্দেশে দাওয়ায় বসেই কথা ছুঁড়ে দিয়েছিল কার্তিক, বলিস, আমি ঘরেই আছি। কথাবার্তা কইতে হইলে য্যান্ জলদি লোক পাঠায়। কিন্তু সেকথা তারা মন দিয়ে শুনল বলেও মনে হয়নি কার্তিকের। খগেন কিংবা সুরেনের দূত আসেনি। সময় গড়িয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে।

বাস্তবিক, খগেন বাগ আর সুরেন সাউ যে দুম করে সাধাসাধিটা বন্ধ করে দেবে, সেটা বুঝি আগাম আন্দাজ করে উঠতে পারেনি কালা-কার্তিক। সাতসকালে আগলবাগল হয়ে নিজেরা এল, পরমুহূর্তে চেলাদের পাঠাল, কার্তিক ভেবে নিয়েছিল এবারের ভোটে নির্ঘাত জব্বর ঠেকায় পড়েছে দু'জনেই। কিন্তু আচমকা যে দু'জনেই এমন চুপ মেরে যাবে সেটা আগাম আন্দাজ করতে পারেনি কার্তিক। তারপর...নিজের বাড়ির রোয়াকে বসে বসে দুপুর অবধি ক্ষণ গুনেছে কালা, মনে মনে একটু একটু করে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। ততক্ষণে বুঝি বুঝতে পেরেছে, খাঁইটা একটুখানি বেশিই দেখিয়ে ফেলেছে সে। একেবারে চারশো টাকার গায়ে লেপটে থাকাটা উচিত হয়নি। কোনও বাজারেরই দস্তুর নয় এটা। দোকানদার একটা দর বলবে বটে, কিন্তু দরাদরির মাধ্যমে সেই দর কিছুটা হলেও কমিয়ে-টমিয়ে একটা রফায় সে অবশ্যই আসতে পারত। আসলে, তখনও অবধি তার মনে এমনই পাকাপোক্ত বিশ্বাস ছিল যে, আজকের দিনে দু'দুটি মূল্যবান ভোট, যে-কোনও দামেই কিনবে ভোটের কাঙালরা। ওদেরও তো জীয়োন-মরণ সমস্যা।

৪.

বউয়ের পিছু পিছু উঠোনের আগড় ঠেলে রাস্তায় নামে কালা-কার্তিক। আধ-মাইলটাক দূরে বুথ। হাঁটতে হাঁটতে কালা-কার্তিক বলে, দেখিস, বুথে পৌঁছোনো মাত্তর টানা-হেঁচড়া জুড়িয়া দিবে খগেন বাগ আর সুরেন সাউয়ের লোকজন। পাশে পাশে রইবি। বাড়তি কিছো সিয়োর ভোট আজ বড়ই দরকার উদের। কাজেই, সহজে গা-ছাড়া দিবা যাবেনি। অন্তত তিনশোটি টাকা না পাইলে ডাহা লোকসান।

বুথের সামনে তখন শেষ বিকেলের ভিড়। লম্বা লাইন পড়েছে বুথঘরের সামনে। ঠেলাঠেলি জুড়েছে মানুষগুলো। বুথ থেকে সামান্য তফাতে প্রায় পাশাপাশি খগেন বাগ

আর সুরেন সাউয়ের ক্যাম্প। দুটো ক্যাম্পেই তখন টিফিন বিলি চলছে। পাঁউরুটি আর আলুর দম। ভলেন্টিয়াররা বুকে ব্যাচ এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালা-কার্তিক গিয়ে দাঁড়ায় খগেন বাগের ক্যাম্পের সামনে। এমন বারোয়ারি ভোজের আসরে একজোড়া উটকো লোকের আমদানি দেখে কেউ .কেউ খুব ভুরু কুঁচকে তাকায়। সম্ভবত কার্তিকের চোখেমুখে টিফিন প্রাপ্তির প্রত্যাশা ফুটে উঠেছিল, তাই দেখে ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কেউ কেউ। খগেন বাগ তার এক নম্বর চেলা ভানু বাগের সঙ্গে কী নিয়ে ফুসফুসানিতে মত্ত। তার মধ্যেও কালা-কার্তিকের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নেয়। চাউনিটা কেমন বেখাপ্পা ঠেকে কালার চোখে। বড্ড শীতল উদাসীন সে চাউনি। মনে মনে দমে যায় কার্তিক। মুখে একচিলতে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে। বলে, খগেনদা, এলাম। জবাবে খগেন বাগও একচিলতে শুকনো হাসি উপহার দেয় কার্তিককে। মনে মনে উসখুস করতে থাকে কার্তিক। কথাটা কী করে পাড়বে ভাবতে থাকে। একসময় বলে, তুমার সাথ একটা কথা ছিল যে।

—বল্ না।

—এইখানে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল্।

সবার সাক্ষাতে টাকাপয়সার কথাটা তোলা সমীচীন হবে না বলেই মনে হয় কার্তিকের। অথচ খগেন ওকে নিয়ে একান্তে কথা বলতেও যে বড় একটা উৎসাহী নয়, সেটা বুঝিয়ে দিগেছে। এই অবস্থায় খানিকটা হেঁয়ালির আশ্রয় নেয় কার্তিক। বলে, ওই ব্যাপারটা তাইলে কী দাঁড়াল ?

—কুন ব্যাপারটা, বল তো ?

—ওই যে, ওই ব্যাপারটা। সকালে যা লিয়া কথাবার্তা হইল।

গম্ভীর হয়ে আসে খগেন বাগের মুখখানি। বলে, ও—, ওই কথাটা! সে আর এই শেষব্যলায়—, তুই ভোটটা দে না। পরে না হয় কথা হবে। আমি তো আর পালিয়া যাচ্ছিনি, তুইও না।

বাহ্, এটা একটা কথা হল! ভোটটা আগে দিয়ে দেবে কার্তিক, পরে ওই নিয়ে কথা হবে! এসব ব্যাপার নিয়ে পরে আর কথা হব ? খাল পারিয়ালে কুমির হয়্যা যায় শালা।

কার্তিক বলে, কথাটা এক্ষুণি হয়্যালে ভালো হইতোনি ? তুমি সাত কাজের মানুষ, পরে আবার কখন সময় হবে—।

—হবে, হবে। যা দেখি ভোটটা দিয়া দে জলদি। আর টেইম নাই।

এ শালা বাগের পো পিছলি কাটছে! বুঝতে পারে কার্তিক। খাঁইটা বোধ লেয় মিটে গিয়েছে। একটা পয়সাও না ঠেকাবার ধান্দা! মনে মনে খুব আপশোস হচ্ছিল কার্তিকের। ইস্, তখন যদি রাজি হয়ে যেত! করকরে তিনশোটা টাকা! নিজের দোষে একেবারে মাঠে মারা গেল টাকাটা!

ততক্ষণে খগেন বাগ আবার ভানুর সঙ্গে গোপন মন্ত্রণায় ডুবে গিয়েছে। কার্তিক

খানিকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে। খগেন বাগ বুঝি খেয়ালও করে না ওই চলে যাওয়াটা। মনে মনে খুব ব্যথা পায় কার্তিক। সক্কাল বেলায় যে মানুষটি দোর বয়ে গিয়ে কতই না সাধ্যসাধনা করলো, চেলাকেও পাঠাল, কিস্তিতে কিস্তিতে কতই না তেল মারল, সেই মানুষটাই এখন এমন ভাব করছে , যেন চেনেই না।

ভোটের লাইনে না দাঁড়িয়ে কার্তিক পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় সুরেন সাউয়ের ক্যাম্পের সামনে। ক্যাম্পে সুরেন নেই। তার সাঙ্গোপাঙ্গারা বসে বসে গুলতানি মারছিল। ভলেন্টিয়ার ছোকরাগুলোর মধ্যে টিফিন নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছে। তার মধ্যে কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল কার্তিককে। সুরেনের ডান হাত মুরারি সাউ বলে উঠলো, কী রে, ভোট দিসনি এখনতক্ক? সিলিপ নিসনি? অ্যাই বঙ্কা, একে একটা সিলিপ দিয়া দে।

বঙ্কা ভোটার লিষ্ট থেকে কার্তিক আর তার বউয়ের নাম খুঁজে বের করে চটপট দু'খানা স্লিপ লিখে এগিয়ে দেয় কার্তিকের দিকে।

কার্তিক স্লিপগুলো নেয় না। শুধোয়, সুরেনদা নেই?

—সুরেনদা? বঙ্কা বিজোড় দাঁতে হাসে, —নাহ্, তাকে এখন পাবেনি। সে গেছে বিজয় উৎসবের বেবস্তা করতে। বিজয়-উৎসব! ভোটই শেষ হল না, তার আগেই বিজয়-উৎসব! একেবারেই ইলচি করে কথাটা বলেছে বঙ্কা, বুঝতে পারে কার্তিক। মুরারি সাউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কথা কিছো বলিয়া গেছে সুরেনদা?

—তোর কথা? মুরারি সাউ একটুক্ষণ কান চুলকে ভাবে, —কী কথা বল্ তো? ওর জবাব দেবার ভঙ্গিমাতেই কার্তিক বুঝে ফেলে, ওকে পাকাপাকিভাবে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছে সুরেন সাউ।

পায়ে পায়ে সরে আসে কার্তিক। বউয়ের সঙ্গে নিঃশব্দ চোখাচোখি হয়। বউয়ের চোখে চাপা রোষ। পারলে বুঝি দু'চোখ দিয়ে ভস্ম করে দেয় কার্তিককে। চাপা গলায় বলে, চলো, ফিরিয়া যাই। ভোট দিয়া আর লাভ নাই।

কার্তিকের মনটা বুঝি সায় দেয় না তাতে। বলে, একেবারে বুথে আইসিয়া ফিরিয়াব? চল, ভোটটা দিয়া আইসি।

শুনে কুন্দর চোখে দ্বিগুণ রোষ। বলে, আমার মত নাই। উই পাষণ্ডদুটার একটাকেও ভোট দিতে নারাজ আমি।

বউয়ের কথায় বুঝি সামান্য দমে যায় কার্তিক। একটুক্ষণ ভাবে। একসময় সোল্লাসে বলে ওঠে, অরে শালী, সেই তরেই তো ভোটটা দিতে চাচ্ছি। অদের কারুকেই দিবনি, ভোটটা দিব ব্যাঙা বোসকে। শালা এমনিতেই আট-দশটার বেশি পাবেনি। আমাদের দুটা ভোট দিয়ে উ' শালার ডজন পুরাব।

কার্তিকের প্রস্তাবটা কেমন জানি বেশ মনে ধরে যায় কুন্দর। তারও মনে হয়, এটাই হবে মুখের মতো জবাব। বলে, চলো।

ব্যাঙা বোসের থেকে স্লিপদুটো নিয়ে বুথের দিকে হাঁটা দেয় কার্তিকেরা। বুথের

দরজার মুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় দু'জনেই ঢুকে পড়ে ভেতরে।

বুথের ভেতরে এক ধরনের ঢিলেঢালা ভাব। ভোটের পাট ততক্ষণে চুকেবুকে যাওয়ার মুখে। বুথের মধ্যে দু'-একজনার বেশি ভোটার নেই। বাইরেও দু'দশজনার জটলা। ভোটবাবুরা কাগজপত্তর তৈরিতে হাত দিয়েছে। তেমনি সময়ে কার্তিক আর কুন্দ এগিয়ে গিয়ে ভোটবাবুদের হাতে ধরিয়ে দেয় স্লিপ।

কার্তিকের হাত থেকে স্লিপখানা নিতে নিতে একজন ভোটবাবু বলে ওঠেন, সারা দিন আর সময় পাওনি! এই শেষবেলায়...! বলতে বলতে দ্রুত হাতে ভোটার তালিকার পাতা ওলটাতে থাকেন তিনি। একসময় বুঝি খুঁজে পান কার্তিক দাসের নাম। বলেন, কার্তিক দাস?

কার্তিক মাথা দোলায়।

—পিতা ঈশ্বর গগন? সন্ধিপুর মাঝেরপাড়া?

নিজের নাম, ধাম একজন অপরিচিতর মুখে শুনতে-শুনতে, এতটাই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে সে এমনই বিবেচনায়, সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কার্তিকের।

—তোমার ভোট তো হয়ে গিয়েছে। আবার এসেছ কেন? দু'বার ভোট দেবে নাকি?

প্রায় আঁতকে ওঠে কার্তিক। বলে, আমি তো সদ্য সদ্য এলাম ছ্যার।

ভোটবাবু ততক্ষণে মুখ ফিরিয়েছেন কুন্দর দিকে। —কী নাম? কুন্দ দাস? স্বামী কার্তিক? হয়ে গেছে, হয়ে গেছে।

—হয়্যা গেছে মানে? ফোঁস করে ওঠে কুন্দ, ...আমাদের ভোট, আমরা দিলামনি হয়্যা যায় কী করিয়া?

—এ'তো আচ্ছা ঝামেলা পাকাল দেখছি! ভোটবাবু নাচার গলায় বলে ওঠেন, —যাও যাও, বাইরে যাও দেখি। কাজ করতে দাও।

—বা...রে! কার্তিক বোকার মতো বলে ওঠে, —আমাদের ভোটের কী হবে?

—পরের বারে দিয়ো। মুচকি হেসে বলে ওঠেন অন্য ভোটবাবু, —পরের ভোটে খুব সকাল সকাল চলে এসো। কেমন?

খগেন আর সুরেনের একজন করে পোলিং এজেন্ট বসে রয়েছে ভোটবাবুদের পেছনে। কার্তিক ওদের দিকে তাকায়। দু'জনেরই নিরাসক্ত মুখ। ততক্ষণে কার্তিক বুঝে ফেলেছে, খগেন-সুরেনের মধ্যে কোনও একজনের লোক নির্ঘাত দিয়ে দিয়েছে ওদের দুটি ভোট। কিন্তু ওদের চোখমুখ দেখে কার্তিক কিছুতেই আন্দাজ করতে পারে না, দুজনের মধ্যে কে ঠকিয়ে নিল ওদের ভোটদুটো।

পথে নেমে কুন্দ বাঘের ঝাপট নেয় কার্তিকের ওপর, হইল তো? শখ মিটল? বাপু ঠিকই বলত, বিকিকিনির মাল ফেলিয়া রাখতে নাই। গরম গরম বিকিয়া দিতে হয়। লচেত বাসি হইয়া পচিয়াবে ..., রোদ্দুরে শুকিয়াবে...., টসকিয়াবে..., মাছি বুসবে...., ধুলাবালি লাগিয়া মলিন হবে চিজ।

শেকল

১.

ছেলেবেলা থেকেই একটা স্বপ্ন আমি বহুবার দেখেছি।

শোবার ঘরের ভেন্টিলেটারে একটা শালিখ এসে বসেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। তার ঘন খয়েরী রঙের ডানা, হলুদ ঠোঁট, হলুদ চোখের কোল। সব ঝাপসা, মোহময়। বড় অলৌকিক দৃশ্যটা!

পাখিটার মুখে এক টুকরো শুকনো ঘাস। ঘাসের টুকরোখানা মুখে নিয়ে ও এলোমেলো তাকাচ্ছে চারপাশে। বুঝি বা আস্তানা গাড়বে কিনা ভাবছে।

আমি নিষ্পলক দেখছি পাখিটাকে। দম আটকে শুয়ে রয়েছি। কাউকে ডেকে দেখাতে সাহস পাচ্ছি না। যদি সামান্যতম আওয়াজে ও উড়ে যায়! যদি বাসা না বাঁধে! ডিম না পাড়ে!

প্রায়দিনই ঘুমের মধ্যে দেখতাম দৃশ্যটা।

অসিত ঘোর মাখানো চোখে তাকালো আমাদের দিকে। বললো, 'ইদানিং স্বপ্নটা আর ঘুমের মধ্যে আসে না। বড় কষ্ট হয়।'

ওর ঘোলাটে চোখের দিকে তাকালাম।

অসিতের কালসিটে রোগা শরীর, বুকের পাঁজর, চোখের গহ্বর, সব খুঁটিয়ে দেখলাম আমি। পরণে ঢোলা পায়জামা। হাল্কা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। দুটোই ছেঁড়া-ফাটা ময়লা। অবিন্যস্ত চুল, রুক্ষ্ম। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি আগাছার মতো বেড়েছে। বহুদিন বাদে ওকে দেখলাম।

বেশ খানিকক্ষণ আমরা পরস্পর নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলাম। এক সময় হো হো করে হেসে উঠলো অসিত। বললো, 'শালা, আবার দেখা হয়ে গেল। কি করবো বল্? পৃথিবীটা যে সবদিক থেকে এক্কেবারে গোল!'

রুমা অপাঙ্গে দেখছিল ওকে। ওর মসৃণ ভুরুতে কয়েকটি সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে।

রুমার দিকে এক পলক তাকিয়ে অসিত চোখ নাচিয়ে বললো 'বউ বুঝি?'

আমি রুমার সাথে অসিতের আলাপ করিয়ে দিলাম। 'এ হোল অসিত মজুমদার। আমরা দুজনে একসাথে এম-এ পড়েছি।'

অসিতকে খুব হাসিখুশী ঝরঝরে লাগছিল। চোখ পাকিয়ে বললো, 'শালা, দায়সারা আলাপ করালি? কেবল একসাথে পড়েছি কি রে? বল্, একরুমে ছিলাম হোস্টেলে। দু'বছরে অনেক মাল ছড়িয়েছি জয়েন্টলী। বল্।'

রুমার চোখের ভাষা পুরো পড়তে পারছি। সে বিশ্বাস করতে পারছে না, এই নোংরা পরিচ্ছদ পরা হাড়-হাভাতে লোকটা আমার এম.এ. ক্লাসের বন্ধু।

বললাম, 'অসিতটা চিরকালই এমনি ফাজিল। ওর মুখে কোনও ট্যাক্স নেই।'

'এ্যাডমিটেড।' 'অসিত আবার চোখ নাচালো, 'কিন্তু এই ফাজিল ছোকরাটি বহুবার তোমায় গুরুতর বিপদের থেকে সেভ করেছে বন্ধু। সেটি একটিবার শ্রীমতীকে বলো। সেই যে, হোস্টেলের মেস-ম্যানেজার থাকাকালীন পাঁচশো টাকা চুরির দায়ে ধরা পড়লি। সুপার শালা তোকে থানায় দিতে চায়। কেমন বুদ্ধি খাটিয়ে ফাঁড়াটা ওতরালাম? সেটা একবার বলো খুকুমণিকে!'

অসিতের দিকে জ্বলন্ত চোখে চাইতেই সে ঐ হাড়জ্বালানো হাসিখানা ফের হাসলো। 'হাটে হাঁড়িখানা ভেঙে দিলাম নাকি গুরু? ভেরি সরি।' পরক্ষণে রুমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এসব কথায় কিছু মাইণ্ড করবেন না ম্যাডাম। গ্রেট ম্যান্‌দের এসব একটু আধটু ইয়েটিয়ে থাকেই।'

আমার সর্বাঙ্গ তখন রাগে অপমানে জ্বলছে। অসিত সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। বললো, 'দে, আর একটা সিগারেট দে। এমন দামী সিগারেট সব সময় মেলে না।'

ট্রেনটা কোলাঘাট ষ্টেশন ছাড়লো। এবং খানিকবাদে রূপনারায়ণের ব্রীজের ওপর দিয়ে ঝমাঝম শব্দে ছুটে গেল। নদীর দু-ধারে এখন থিকথিকে কাদা: উঁচু পাড়ে কাশের ঝোপ সাদা হয়ে ফুটছে। দূর থেকে সমুদ্রের ঢেউ বলে মনে হয়।

ট্রেনের হাল্কা দুলুনিতে আমার এতোক্ষণে ঘুম আসা উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে রইলো। অসিতকে বড় ভয় করছে আমার।

অসিত চুপটি করে বসে রয়েছে। ক্লান্ত চোখ। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার মতো অস্পষ্ট অভিব্যক্তি। জনান্তিকে বললাম, 'কুমকুমের সাথে দেখা হয়?'

'আমার?' অসিত যেন আকাশ থেকে পড়লো।

'কুমকুম কে গো?' রুমা আর চেপে রাখতে পারলো না নিজেকে।

চোখমুখ যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলি, 'অসিতের প্রেমিকা।'

অসিত শূন্যদৃষ্টিতে তাকালো রুমার দিকে। ঠান্ডা কনকনে গলায় বললো, 'আমার কোনও প্রেমিকা নেই। ছিলও না কোনও দিন'। জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ও, 'শুধু একজনকে আমি চিরকালই ভালোবাসি। আজও।'

'কে?' রুমার চোখে মেয়েলী কৌতূহল খেলে বেড়ায়।

চোখের তারাদুটো শূন্যে ভাসিয়ে গাঢ় হিমায়িত কণ্ঠে অসিত বললে, 'ঐ স্বপ্নটা। স্বপ্নের মধ্যে ঐ পাখিটা। ওর চোখের তলায় ঐ হলুদ জমিন।' বলতে বলতে গলা ধরে এলো ওর। বললো, 'ভালোবাসি। কিন্তু সে আর আসে না।'

রুমা বিস্ফারিত চোখে শুনছিল কথাগুলো। অচেনা চোখে আমাকে দেখছিল বারবার। আমি যেন ক্রমশ মাটির সাথে মিশে যেতে লাগলাম লজ্জায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন নেতিয়ে পড়লো অসিত। দু'চোখে মৃদু আচ্ছন্নতা। ঘোর। বেশ খানিকক্ষণ রুমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিসফিসে গলায় বললে, 'বেশ, বেশ। সুন্দরী বউ পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

রূপের প্রশংসায় রুমার খুশী হবার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে ওর সারা মুখে গাঢ় অস্বস্তির মেঘ জমলো। অসিতের সম্পর্কে ধীরে ধীরে অনেক প্রশ্ন বুঝি দানা বাঁধছিল ওর মনে। আমার সম্পর্কেও।

অসিত আবার তুললো ঐ ঘুমের মধ্যে পাখি দেখবার প্রসঙ্গ। বেশ খানিকক্ষণ ধরে ইনিয়েবিনিয়ে বর্ণনা দিল পাখিটার। তার দু'চোখের মণির অনেক উজ্জ্বল উপমা দিল। ওর আশৈশব দেখা স্বপ্নটা আমাকে ছুঁলো না মোটেই। কারণ, এমন স্বপ্ন দেখবার অভ্যেস আমার নেই। আমি চিরদিন ঠিক এর উল্টো স্বপ্নটাই দেখেছি। পাখির সঙ্গে চিরকাল আমার মৃগয়ার সম্পর্ক।

দুপুরের দিকে লোক্যালগুলো প্রায় ফাঁকা যায়। এখন এই কামারায় সাকুল্যে জনা দশেক লোক। আমি আর অসিত বসেছি মুখোমুখি। রুমা আমার পাশটিতে জানালার ধার ঘেঁসে। ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে বাইরের ছবি দেখতে দেখতে যাওয়া রুমার অনেক দিনের প্রিয় অভ্যেস। এখন এই শরতের প্রকৃতি গর্ভবতী নারীর মত পূর্ণ। পরিপুষ্ট। নিটোল। সবুজ ধানের বুক ফুঁড়ে কচি কচি শিস্। কালচে সবুজ গাঁ। ফিঙে মাঝরাঙা ইতস্তত উড়ছে। নয়ানজুলিতে টলটলে জল। কচুরীপানা। শাপলার বন। পদ্মফুলও ফুটেছে অজস্র। পুজো আসছে।

অন্য দিন হলে রুমা নিবিষ্ট মনে দেখতো এসব ছবি। আজ বুঝি তার মনটা ঈষৎ বিক্ষিপ্ত। বারবার ধ্যান ভেঙে যাচ্ছে। চোখদুটো অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুরে যাচ্ছে অসিতের দিকে।

অসিত বললো, 'একটা সিগ্রেট থাকলে দে' না।'

'যদ্দুর মনে পড়ে, তুই সিগারেট খেতিস না?'

'আমি অনেককিছুই খেতাম না। এখন অনেককিছুই খাই।'

সিগারেটে লম্বা টান মেরে চোখ বুজলো অসিত। গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর চোখ খুলে জ্বলন্ত সিগারেটখানা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো। কিংসাইজ সিগারেট। নীলাভ ধোঁওয়া উড়িয়ে জ্বলছে। এইটুকুতেই অসিত বোধ করি আমার সুখের সন্ধান পেলো। বললো, 'বেশ সুখেই আছিস মনে হচ্ছে? শরীরের চেকনাই তো বেশ খুলেছে।'

২.

অসিতকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়েছি। বছর খানেক ও আমার রুমমেট ছিল। ও চিরকালই একটু অদ্ভুত ধরনের। রুমমেট থাকাকালীন ও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ওর এক দাদা মাষ্টারী করতো গাঁয়ের স্কুলে। মাসছয়েক টাকা পাঠানোর পর সে আচমকা টাকা বন্ধ করে দিল। তারপর থেকেই অসিত যেন আমাদের চোখের সুমুখে দ্রুত পালটে যেতে লাগলো। নানা রকমের জালিয়াতি অভ্যেস ধীরে ধীরে রপ্ত করে ফেলেছিল ও। কোথায় কোথায় যেন টিউশনিও জুটিয়েছিল। স্পষ্ট করে কোনও দিনও কিছু বলতো না। হোষ্টেলের প্রায় সব ছেলের কাছে টাকা ধার করতো ও। চেনা-অচেনা বহু লোকই মাঝে মাঝে

কোন অজ্ঞাত কারণে ওর খোঁজ করতো। মাঝে মাঝে এক দজ্জাল মেয়ে আসতো ওর ঘরে। কুমকুম ছিল তাদেরই একজন। এসব নিয়ে কিছু শুধোলেই ও চুপ করে যেতো। কিম্বা মিটিমিটি হাসতো।

দীর্ঘকাল অসিতের সংগে কোনও যোগাযোগই ছিল না আমার। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে ওর খবর পেতাম। বছর পাঁচেক আগে ছোট মাসিমা টাটা থেকে লিখেছিলেন অসিতের কথা। অসিত মজুমদার নামে তোর এক বন্ধু এসেছিল। দিন সাতেক ছিল। ভারি ভালো ছেলে। রৌরকেল্লা থেকে ফেরার পথে বেচারার সব টাকা পকেটমার হয়ে যায়। ওর ঘরে ফেরার ভাড়াটাও দিয়ে দিয়েছি। একই খবর পেয়েছিলাম ডিব্রুগড়ের সেজো কাকার কাছ থেকে। অসিত সেখানেও গিয়ে মাসখানেক ছিল। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে যা খবর পেয়েছি অসিত ওদের আত্মীয়দের বাড়ীতেও গেছেটেছে। ও বুঝি একটা আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেছিল। যেকোনও অচেনা মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে তাক লাগিয়ে দিতে পারতো। ঐ একই ক্ষমতায় ও সেজো কাকার মেয়ে অতসীর শ্বশুরবাড়ী কুচবিহারেও গিয়েছিল। পরের বছর কলকাতায় বড় কাকার বাড়ীতে দেখা হলে অতসী ঘটা করে অসিতের গল্প করেছিল আমার কাছে। ভারী অবাক লাগে, অসিত সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় গিয়ে থেকেছে। এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সাও আদায় করেছে, কিন্তু কেউ ওর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলে না। বড্ড ভাল রে তোর বন্ধুটি!

অসিত বললো, আমি নাকি খুব সুখেই আছি। অস্বীকার করিনে, বেশ সুখেই আছি। প্রচলিত অর্থে সুখ বলতে যা বোঝায়। ভালো উপার্জন করি। খরচও করি দু'হাতে। ছিমছাম বাড়ি করেছি উলুবেড়িয়াতে। সে বাড়ি মনের মতো সাজিয়েছে রুমা। সব মিলিয়ে আমি এখন প্রতিষ্ঠিত বলা চলে। নিশ্চিত জীবন পেয়ে আমি এখন আরো অনেক, অনেক মৃগয়ার স্বপ্ন দেখি।

একটা নিটোল হাসি হেসে এত কথা অসিতকে বুঝিয়ে দিলাম আমি।

মুখে বললাম, 'কদ্দুর চললি?'

অসিত মৃদু হাসলো। বললো, 'বন্ধুসংগমে।'

কথাটা হেঁয়ালীর মতো ঠেকলো।

একটু থেমে অসিত বললো, 'আর থাকছি নে এদেশে। শিগ্‌গির চলে যাবো দেশ ছেড়ে। তাই বন্ধুদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে বেরিয়েছি।'

আমি বিস্মিত হলাম। রুমাও কৌতূহলী চোখে তাকালো। বললাম, 'কোথায় যাবি? কোন দেশে?'

খানিক ইতস্তত করলো অসিত। বললো, 'সেটা এখনই বলতে চাইনে। তবে জেনে রাখ্ এদেশে আর নয়।'

আমি যেন কিছু একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। মনের ভাব চেপে রেখে শুধোলাম, 'কিসের তরে দেশত্যাগী হবি?'

'দুর দুর' অসিত একটা নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে বললো, 'এমন দেশে মানুষ থাকে? এখানে সব কবি-শিল্পীর হাতেপায়ে শেকল পরানো। সোনার ছুরি দিয়ে

জিভগুলো কাটা চলছে অবিরাম।'

অসিত অন্যমনস্ক হয়ে চোখ বুঁজলো। সেই ফাঁকে রুমার সাথে নির্বাক চোখাচোখি হলো আমার।

খানিকবাদে হুঁশে ফিরলো অসিত। বললো, 'তোর সাথেও দেখা করতাম। দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হোল। ভালো কথা, তোরা যাচ্ছিস কোথায়?'

'উলুবেড়িয়া।'

'ওখানে?'

'বাড়ি করেছি।'

অসিতের মরা মরা চোখে ক্ষণিকের তরে চকমকি পাথরটা জ্বলেই নিভে গেল। বললো, 'বেশ বেশ। তা, তোর কুমকুমের কি খবর?'

'কে কুমকুম?'

'সে কি রে!' একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো অসিতের গলা থেকে, 'কুমকুম বোসকে অতো জলদি ভুলে গেলি তুই? সে যে তোর স্বপ্নের রানী ছিল রে? সেই যে—।' অসিত যেন স্মৃতির খাঁচা খুলে ধরে, 'সেই যে গঙ্গার জেটিতে তোর পাশটিতে দাঁড়িয়ে বলেছিল, জানো সুধীরদা, আমার না, ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে।' অদ্ভুত মেয়েলী ভঙ্গীতে কথাগুলো উচ্চারণ করলো অসিত। নিঃশব্দে হাসতে লাগলো মিটিমিটি।

রুমা কান খাড়া করে শুনছে। আমি নিশ্চিত জানি, এই মুহূর্তে বাইরের ছবির দিকে চোখ থাকলেও দৃষ্টি নেই ওর। এমনিতে রুমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ভালোই। কিন্তু আমি জানি, ও কেন জানি মনে বিশ্বাস করে, আমার কেউ একজন ভীষণ ভালোবাসার জন ছিল। সব মেয়েই বুঝি এমনি একটা বিশ্বাসের কিংবা অবিশ্বাসের কাঁটা বুকে বিঁধিয়ে জীবন কাটায়। আমি এও জানি, এসব ব্যাপারে রুমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার চেষ্টা করাও বৃথা।

পুরোনো বন্ধুর সাথে এতদিন বাদে দেখা হওয়ায় আমার খুশী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে একটা দম আটকানো অস্বস্তি। একটা বায়ুহীন দিনের মতো গুমোট। একটা অজানা আশঙ্কা আমার চোখে মুখে লেগে ছিল বুঝি। সেটা লক্ষ্য করে রুমার মুখও থমথমে।

৩:

ট্রেনটা ধিকিধিকি চলছে। কোনও স্টেশন এলো বুঝি। শুকনো গলায় অসিতকে শুধোলাম, 'কোথায় নাববি?'

'কিচ্ছু ঠিক নেই। উলুবেড়িয়াতেও নাবতে পারি।' অসিত মিটিমিটি হাসতে থাকে, 'তোর বাড়ীতেই কাটাই রাতটা। দেখি তোর ঘর সংসার।'

আমি প্রমাদ গুনছিলাম মনে মনে। রুমার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ভাঙা গলায় বললাম, 'বেশ তো।'

অসিত আমার মুখের ওপর চোখ ফেললো। ছুরির ফলার মতো শানিত দৃষ্টি বিঁধিয়ে আমার বুকে মধ্যে যেন মুহূর্তে ঢুকে পড়লো ও। সেখানে খানিকক্ষণ কতো

কিছু খোঁজাখুঁজি করে ও মুখ ফেরালো রুমার দিকে।

'কি বৌদি, আপনি কিছু বললেন না যে?'

রুমা এক চিলতে হাসবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কথাগুলো গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে যাচ্ছিল ওর। কোনও রকমে বললো, 'বেশ তো। চলুন না। বেশ মজা হবে তাহলে।'

'তবে তো আর কথাই নেই।' অসিতের চোখদুটো মুহূর্তের তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, 'নিজের হাতে রাঁধবেন তো?'

কলের পুতুলের মতো নিঃশব্দে মাথা দুলিয়ে সায় দিল রুমা।

'বেশ বেশ। কি কি রাঁধবেন?'

রুমা আর এক প্রস্থ হাসবার চেষ্টা করলো। বললো, 'সে তো আগে চলুন। তারপর দেখা যাবে—।'

'নো নো। আগেই বলতে হবে। আচ্ছা আপনি ডিমের ডালনা রাঁধতে পারেন? পোস্তর চচ্চড়ি? উচ্ছে দিয়ে মুগের ডাল?' বলতে বলতে বাচ্চা ছেলের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো অসিত, 'আজ বেশ জমিয়ে খাওয়া যাবে।'

বলতে বলতে মুহূর্তে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও, 'আচ্ছা আপনাদের বাড়ীতে ভেন্টিলেটার রয়েছে?'

'থাকবে না কেন?'

'তা হলে নিশ্চয়ই পাখিরা এসে বাসা বাঁধতে চায়?' রুমা কি একটা বলতে যাচ্ছিল। ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অসিত বললো, 'তাড়াবেন না। একদম তাড়াবেন না।' বলতে বলতে ম্রীয়মান হয়ে এলো অসিতের মুখ। গলায় প্রগাঢ় বিষাদ জমিয়ে বললো, 'আমার অবস্থাটা দেখছেন তো? পাখিটা বাসা বাঁধলো না বলে কী দশা হয়েছে আমার!'

এসব ধোঁয়াটে কথা রুমা বুঝতে পারে না। তার সারা মুখ কেবল গাঢ় অস্বস্তিতে ভরে যেতে থাকে। কিন্তু অসিতের কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছিলাম না। সেই ছাত্রজীবন থেকে ওর কথা শুনে আসছি। দুনিয়ার যতো উদ্ভট কথাবার্ত্তা বলতে ও ওস্তাদ।

বাংলার ছাত্র হিসেবে অসিতের নাম ছিল তখন। কিছু কিছু ছোট পত্রিকায় তখনই ছাপা হয়েছিল ওর কিছু লেখা। সেসব লেখার মাথামুণ্ডু বুঝতাম না আমরা।

'কি করছিস?' আমরা মাঝে মাঝেই ক্ষ্যাপাতাম ওকে, 'জলদি লিখেটিখে নাম কর।'

ম্লান হাসতো অসিত। বলতো, 'কেন?'

'বারে! তুই কবিতা লিখে নামটাম করলে আমরা সমালোচনার বইটই লিখে দু'পয়সা ....। নিদেন, 'আমি অসিত মজুমদারকে যেমনটি দেখেছি' গোছের একখানা স্মৃতি রোমন্থনের বই।'

অসিত একটু গুম হয়ে থাকতো। তারপর বলতো, 'লিখেছি একখানা উপন্যাস। আরণ্যক।'

'সে কি। ওটাতো বিভূতিবাবুর লেখা।'

সে কথায় আচমকা ক্ষেপে যেতো অসিত। গলায় দারুণ উষ্মা ফুটিয়ে বলতো, 'কোনও লেখাই লেখকের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। তিনি লিখেছেন বলে আমি আর ওটা লিখতে পারবো না এমন কোনও কথা নেই।' আমরা ভীষণ মজা পেয়ে হেসে উঠতাম।

ঝিকিঝিকি ট্রেনের আওয়াজের সাথে সাথে শরীরে এক ধরণের মাদকতা আসে। তার মধ্যে অসিতের জীবনের পুরোনো ছবিগুলো ভেসে ভেসে বেড়ায়। ওকে নিয়ে ক্রমশ ভাবনার গভীরে ডুবে গেলাম আমি।

একসময় ও আমার গায়ে এক চিলতে কন্‌কনে ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দিল আচমকা।

বললো, 'কি রে ? বাড়ী যাবো শুনে ভড়কে গেলি নাকি ? অমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে রয়েছিস যে ?'

সে কথায় আমি সজাগ হয়ে উঠি। অনিশ্চিত চোখে তাকাই ওর দিকে। আমার দিকে তির্যক চোখে তাকালো অসিত। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়েই রইলো। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ টু-পাইস্‌ কামাচ্ছিস্‌। গায়ে গতরেও বেশ খোদার খাসিটি হয়েছিস। এক সন্ধ্যা প্রাণের বন্ধুকে খাইয়ে কিছু পাপ উসুল কর।'

বলতে বলতে রুমার দিকে চোখ ফেরালো অসিত। বললো, 'জানেন বৌদি, আজ আপনার মিষ্টারের এমন রমরমা, অথচ একদিন ঐ শালাকে শিবপুর হাইস্কুল থেকে পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়েছিল কমিটির লোক। শালা ভেজা কাকটি হয়ে রাত দশটায় আমার বাসায় গিয়ে হাজির। দু'চোখ জবাফুলের মতো লাল। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। প্রলাপ বকছে ও।'

রুমা বুঝি স্বামীর সম্পর্কে এসব কল্পনাও করতে পারেনা। সে দু'চোখে গভীর যন্ত্রণা ফুটিয়ে শুধোলো, 'এ সব কি গো ?'

স্মৃতিটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে ততক্ষণে। আমার মনে পড়লো, অসিতকে আমি তক্ষুনি জোর করে শুইয়ে দিয়েছিলাম বিছানায়। তারপর দরজায় শেকল তুলে সেই রাতেই ছুটেছিলাম ডঃ বর্ধনের বাড়িতে।

৪.

বাগনান স্টেশনে গাড়ি থামতেই আমি নেবে পড়লাম। এক প্যাকেট সিগারেট কেনা জরুরী। চোখেমুখেও একটুখানি জল দেওয়া প্রয়োজন।

ফিরে এসে দেখি, ও রুমার সাথে চুটিয়ে গল্প জুড়েছে। কুমকুমের সাথে আমার প্রণয়ের একটা ডগোমগো ছবি এঁকে ফেলেছে ততক্ষণে। রুমা নির্বাক বিস্ময়ে শুনছিল। ক্রমশ থমথমে হয়ে আসছিল ওর মুখ। আমি এসে পাশে বসতেই অসিত হলদে দাঁত বের করে হাসলো।

বললো, 'ছিঃ ছিঃ। ঘরের গৃহিনীর কাছে জীবনের কথা লুকিয়ে রাখে কেউ ? যার সঙ্গে তোর জীবনমরণের সম্পর্ক—।'

'থাম।' আমি চাপা গলায় ধমক দিলাম, 'যতো সব বাজে কথা। তোর স্বভাবখানা দেখছি একটুও পালটায় নি।'

অসিত সংগে সংগে থতমত খেয়ে গুটিয়ে নিল নিজেকে। মিনমিনে গলায় বললো, 'একটা সিগ্রেট দে।'

সিগারেট খেতে খেতে গুম মেরে রইলাম দু'জনে। রুমা অন্যমনস্কতার মাঝে মাঝে চোরাচোখে দেখতে লাগলো আমায়। পরিবেশটা ভারি হয়ে উঠলো ক্রমশ।

পরিবেশটা হাল্কা করার জন্যই এক সময় মৃদু গলায় শুধোলাম, 'তোর লেখালেখির খবর কি?'

অসিত ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো।

'লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'কি হবে লিখেটিখে? কে পড়বে? দেশের দশ ভাগ লোক বই পড়তে পারে। তার আটভাগই দিনগত পাপক্ষয় করছে। তা ছাড়া—' অসিতের দু'চোখ দারুণ হতাশায় নিভে আসে। বলে, 'কিছুদিন বাদে তো এই পৃথিবীটা জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। যা ষ্টক্ পাইলিং চলছে।'

'সে তো এখন অনেক দূরের কথা।'

'দূর কি বলছিস? বড় জোর হাজার বছর।'

'হাজার বছর কম হোল?' আমি বিস্ফারিত চোখে শুধোই। অসিত দু'চোখে গভীর বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে বললো, 'হাজার বছর বাঁচবে না যে লেখা, তা সৃষ্টি করে লাভ কি বল?'

আমি চুপ করে বসে থাকি। সিগারেটে টান মারি একের পর এক। এমন উদ্ভট কথার জবাব হয় না।

খানিকবাদে শুধোলাম, 'কি করিসটরিস তাহলে আজকাল?'

'কিচ্ছু না।' অসিত কাটাকাটা জবাব দিল, 'কিচ্ছুটি না।'

'চাকরি বাকরি কিছু?'

'করতাম। একটা ভালো চাকরিই করতাম। রিটায়ার করেছি।'

আমি অবাক বিস্ময়ে তাকালাম, 'এই বয়েসে রিটায়ার করেছিস?'

'হুঁ। ভলেন্টিয়ারী রিটায়ারমেন্ট।' চোখে মুখে চরম বিবমিষা ফুটিয়ে অসিত বললো, 'শালা বন্ডেজ, বন্ডেজ! চাকরী মানেই শ্লেভারী। হাতেপায়ে, সর্বাঙ্গে শেকল।'

একটু থেমে আমার দিকে তেরচা চোখে তাকালো ও। গলায় অপরিসীম শ্লেষ জড়ো করে বললো, 'তুই বোধ করি শেষ বয়েস অবধি লড়ে যাবি, বল্?'

'কি আর করা যাবে?' আমি আড়ষ্ট মুখে হাসি, 'চাকরি না করলে খাবো কি?'

বিকেলটা আজ বেশ হলুদ! দু'পাশে সবুজ ধানের ক্ষেতে সোনালী রোদ্দুর। টেলিগ্রাফের তারে একটা ফিঙে বসে ক্রমাগত দোল খাচ্ছে। দূরে একটা আকাশমণি গাছ গাঢ় হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে।

আমার বুকখানা আশংকায় দুলছিল। আমাদের দুজনের গোছানো ছিমছাম সংসার। সেখানে বড় নিটোল সুখের বসবাস। সেই ঘরে আজ যেতে চাইছে অসিত। আমি জানি ওর এক রাতের অবস্থিতি আমার ছোট সংসারটাতে দু'একটা সূক্ষ্ম চিড় ধরিয়ে দিতে

পারে। আমার মনে হোল, রুমাও এখন সেই ভাবনায় মশগুল। আমি দেখতে পাচ্ছি ওর দৃষ্টিতে আর সেই স্বাভাবিকতা নেই। ও আমার দিকে ঘনঘন তাকিয়ে গাঢ় সন্দেহের ছায়া বিস্তার করেই চলেছে। কুমকুমকে নিয়ে একটা অন্যতর ভাবনার খাত বুঝি ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছে রুমার বুকে। শিবপুর স্কুলে আমার লাথি খাওয়ার ঘটনাটাও বুঝি গভীরভাবে সংক্রামিত হয়েছে। অথচ—।

....অথচ এসব কিছুই আমার জীবনের নয়। এসব অসিতের জীবনের ক্লেদ—হতাশা। কি করে সেটা রুমাকে বোঝাই আমি? কোন্ মশলায় বুঁজিয়ে দিই সংসারের এই অবাঞ্ছিত চিড়!

অসিত মিটিমিটি হাসছিল। 'আজ সন্ধ্যায় চুটিয়ে গল্প করা যাবে।' চোখেমুখে আচার খাওয়ার তৃপ্তি ফুটিয়ে বললো অসিত, 'আপনার কর্ত্তার অনেক গল্প শোনাবো আজ। ওর হয়তো সেসব কথা আজ আর মনে নেই।'

শুনতে শুনতে ভারি অসহায় লাগছিলো। একটা অন্ধ আক্রোশ ফেনিয়ে উঠছিল বুকে। ইচ্ছে করছিল, সপাটে একটা চড় মারি ওর গালে।

তার আগেই রুমা আমাকে আলতো খোঁচা মারলো। ওর দিকে মুখ ফেরাতেই রুমা ইঙ্গিতে দেখালো অসিতের দু'পায়ের গোড়ালীর দিকে।

এবং আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম—।

অসিতের দু'পায়ে দুটো মোটা লোহার কড়া পরানো রয়েছে।

আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। রুমার চোখমুখও ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো নিমেষে।

অসিত বুঝি ব্যাপারটা আঁচ করেছে ততক্ষণে। চকিতে উঠে দাঁড়িয়েছে সিট থেকে। পা বাড়িয়েছে দরজার দিকে। ভাঙা ভাঙা গলায় শুধোলাম, 'তোর পায়ে কড়া পরানো কেন রে?'

নিজের পায়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখ তুললো অসিত। সারা মুখে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ খেলে গেল। ট্রেনটা ধিকিধিকি চলছিল। ঐ বিদ্রুপ মাখানো হাসিখানা আমার পায়ের দিকে ছুঁড়ে মারতে মারতে এক সময় লাফ মেরে ট্রেন থেকে নেবে গেল ও।

ওর নীরব দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমি নিজের পায়ের দিকে তাকালাম। ভীষণ চমকে উঠে হাত বোলাতে লাগলাম গোড়ালীতে।

কারণ, আমার তখন আর কোনও সন্দেহই ছিল না, আমার দু'পায়েও একজোড়া লোহার কড়া দেখতে পেয়েছে অসিত।

দুর্ভিক্ষ ও বেহালাবাদক

১.

একটা শান বাঁধানো ছোট্ট উঠোন, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঐ উঠোনের একপ্রান্তে হেমাঙ্গাবাবুর রান্নাঘর। মূল বাড়ির থেকে সামান্য বিচ্ছিন্ন। রোববার সকাল এগারোটা নাগাদ হেমাঙ্গাবাবু তাঁর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চাল ধুচ্ছিলেন।

এমনি সময় ছেলেটা এসে দাঁড়ালো সুমুখে।

ন্যাড়া কুলগাছটার গায়ে হেলান দিয়ে স্পষ্ট গলায় বললো, আমার জন্যও দু'মুঠো চাল নেবেন তো।

হেমাঙ্গাবাবু চাল ধুতে ধুতে মুখ তুললেন। অজান্তে থেমে গেল হাত।

ছেলেটার ভাঙ্গাচোরা লম্বাটে মুখ। খাড়াই নাক। ঠেলে ওঠা চোয়াল। সারা মুখে একটা ছন্নছাড়া ভাব, বিবর্ণ চাপদাড়ি। গালের রুক্ষ চোয়াড়ে চামড়ায় অসংখ্য খানাখন্দ। চোখের গর্ত্তদুটো বেখাপ্পা রকমের বড়। তার গভীরে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ। বড়ই অশালীন।

লম্বায় আন্দাজ পৌনে ছ'ফুট। হাড্ডিসার শরীর। কিন্তু দেখলে বোঝা যায় এককালে বেশ পেটানো শরীর আর চওড়া ছাতি ছিল। অতটা উচ্চতা বয়ে বেড়ানো বুঝি সম্ভব হচ্ছে না ইদানীং। তাই পিঠের পর থেকে ঘাড়সহ মুণ্ডুখানা সামনের দিকে বাঁক নিয়েছে আচমকা। প্রথম দর্শনে ছেলেটিকে কুঁজো মনে হতে পারে।

এ বছরটা মানুষের বয়েস আন্দাজ করতে যাওয়া বোকামি। তবুও মনে হল ছেলেটির বয়েস পঁচিশের বেশী হবে না।

হেমাঙ্গাবাবুর পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। বিয়ে থা করেন নি। একটা প্রাইভেট ফার্মে মাঝারি গোছের চাকরি করেন। এই ছোট্ট শহরের এক প্রান্তে একটা বাংলোগোছের বাড়িতে থাকেন।

সামনে এক চিলতে উঠোন। চারপাশে উঁচু সাবেক আমলের পাঁচিল। পাঁচিলের মধ্যে একটা মুমূর্ষু পেঁপেগাছ। একটা রোগা ঢ্যাঙ্গা পেয়ারাগাছ এবং রান্নাঘরের দাওয়া ঘেঁসে একটা ছন্নছাড়া কুলগাছ।

সকাল থেকে এই শহরে কান্নার রোল ওঠে। কাতারে কাতারে উপোসী কংকালসার মানুষ গেরস্তের দোরে দোরে ধর্ণা দেয় একটু ফ্যান কিংবা উচ্ছিষ্টের জন্য।

ফাল্গুন-চৈত্র থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ভীড় করছে এই ছোট্ট শহরে। তারা

রাস্তায়, গাছের তলায়, রোয়াকে, পুলের তলায়, হিউম পাইপের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিদিন তারা সংখ্যায় বাড়ছে। আর সর্বক্ষণ আকুল গলায় কাঁদছে।

মানুষের চোখেমুখে এক গভীর আতঙ্কের ছায়া স্থায়ী হচ্ছে দিন দিন। শকুনের মতো ডানা ঝাপটে এগিয়ে আসছে এক অনাগত শঙ্কা। দিনদুপুরেও গা ছম্‌ছম্‌ করে।

হেমাঙ্গবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ছেলেটিকে।

পুরোনো ছাতার মতো ফ্যাকাশে রঙের একটা ঢোলা প্যান্ট পরনে। গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন হাওয়াই সার্ট আলখাল্লার মতো ঝুলছে।

ছেলেটার কথা বলার ধরনটা বড় বেশি কানে বাজলো হেমাঙ্গবাবুর। সারা শরীরে তো বটেই, কন্ঠস্বরেও একটা অশালীন রুক্ষতা। অনেকটা ছিনতাইবাজের মতো জুলুমী কায়দা।

হেমাঙ্গবাবু ওর চোখের ওপর চোখ ফেললেন। এবং দেখলেন, তাতে একবিন্দু আর্দ্রতা নেই। মরুভূমির মতো শুকনো খটখটে সে চোখ। হিংস্র, বেপরোয়া।

'তোমাকে তো ঠিক'—খুব মোলায়েম গলায বললেন হেমাঙ্গবাবু।

দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো ওর চোখ। খুব কাটা কাটা গলায় সে আবার উচ্চারণ করলো, 'আমার জন্য দু'মুঠো চাল নেবেন।'

হেমাঙ্গবাবু স্মৃতির মধ্যে আঁতিপাতি খুঁজলেন। ছেলেটাকে কস্মিন্‌কালেও দেখেছেন বলে মনে হোল না তাঁর। এ ক'দিনে অবশ্যি অনেকের চেহারা আমূল পাল্টে গিয়েছে, কিন্তু কারুর মুখের সাথে ওর সামান্যতম মিল খুঁজে পেলেন না তিনি।

সদর দরজার দিকে তাকালেন। দরজায় ভেতর থেকে খিল এঁটে এসেছে ও।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। থলিতে অল্প চাল ছিল। একটা মানুষের এক বেলার খোরাক ঘর থেকে থলিটা এনে চালগুলোকে ঢেলে দিলেন ডেকচিতে।

ছেলেটা পলকহীন চোখে দেখছিল। কোটর থেকে বেরিয়ে এসে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি বারকয়েক নৃত্য করলো ডেকচির মধ্যে। তারপর ও আস্তে আস্তে বসে পড়লো কুল গাছের বিরল ছায়ার আশ্রয়ে।

হাঁড়িতে চাল ঢেলে দিয়ে বাইরে এলেন হেমাঙ্গবাবু। ছেলেটা কুলগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চোখ মুদে এলিয়ে রয়েছে। গা থেকে খুলে ফেলেছে ঢোলা হাওয়াই শার্ট। তার বুকের সারবন্দী পাঁজর হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। কঞ্চির বেড়ায় হাওয়ার দমকা লাগলে যেমন বেঁকে চুরে যায় বারবার।

হেমাঙ্গবাবু মৃদু চমক খেলেন। আজকাল গেরস্তের বারান্দায়, রোয়াকে বসে দু'চারজন লুটিয়ে পড়ছে নিঃশব্দে। আর উঠছে না।

ভয়ে ভয়ে ডাকলেন 'কি হোল?'

সে কথায় চমকে তাকালো ও। ধড়মড় করে উঠে বসলো। ব্যাকুল চোখে শুধালো, 'হয়ে গেছে?'

'কি?'

'ভাত?'

হেমাঙ্গবাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। উদ্গত নিঃশ্বাস সামলে নিয়ে বললেন, 'না, একটু দেরী আছে।'

ছেলেটি তেমনি বসে রইলো। চোখের মধ্যে গাঢ় ক্রোধ।

হেমাঙ্গাবাবু মোলায়েম গলায় বললেন, 'তুমি বরং চান করে নাও। চৌবাচ্চায় জল আছে।

'না—' ভীষণ আতঙ্ক মেশানো গলায় বলে উঠলো ও।

'কেন? চান করে নিলে তো ভালো লাগবে।'

'ম্যালা ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করবেন না তো। একদম রাগাবেন না আমাকে।'

হিংস্র চোখে শাসালো ও।

হেমাঙ্গাবাবু আর কথা না বাড়িয়ে কুয়োতলায় চলে গেলেন। চান করতে করতে ছেলেটার মুখ বার বার ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। বুক জুড়ে একটা গাঢ় অস্বস্তি। এমন সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিনে ঢুলতে থাকা মানুষগুলোকে দেখলে স্মৃতি থেকে সেই দৃশ্যটা উঠে আসে এখনও।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের একটা জলজ্যান্ত স্মৃতি। আকাশ থেকে আগুন বৃষ্টি হচ্ছিল সমানে। মাঠের ঘাসগুলো জ্বলে পুড়ে আংরা। গরু-বাছুর বুক ফেটে মরছিল উদোম মাঠের মধ্যিখানে। হেলে সাপগুলো আলের ধারে শুকনো কঞ্চির মতো মরে পড়ে থাকতো।

একদিন আকাট দুপুরে সাইকেলে চেপে ফিরছিলেন হেমাঙ্গাবাবু। মাথায় পুরু করে জড়িয়েছেন একটা ভিজে গামছা। একটা তে-কাঠী নিমের ডালে একটা কাক বসে ঢুলছিল। অল্প দূর থেকে কাকের ঢুলুনিটা দেখতে দেখতে এগুচ্ছিলেন। আচমকা ওঁর চোখের সুমুখে কাকটা টুপ করে খসে পড়লো মাটিতে। একটা কালো পুঁটুলির মতো পড়ে রইলো ঐ তপ্ত মাকড়া পাথরের বুকে।

একটা জীবন্ত প্রাণী যে চোখের পলকে এমনি মরে যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। অতো অতর্কিতে মৃত্যুর দৃশ্য জীবনে আর দেখেননি হেমাঙ্গাবাবু।

ছেলেটার কথা মনে হতেই স্মৃতি থেকে সড়সড় উঠে এলো দৃশ্যটা, আজ বহুদিন বাদে।

চান সেরে কুয়োতলা থেকে ফিরে এসে ছেলেটিকে দেখতে পেলেন না। বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠলো সহসা। দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

কেউ নেই ঘরে। পলকের মধ্যে আঁতিপাতি দৃষ্টি বোলালেন চারপাশে। কোনও কিছু খোওয়া যাওয়ার লক্ষণ বুঝতে পারলেন না। ড্রয়ার খুললেন চকিতে। খুচরো টাকা, রেজকি, চশমা, ঘড়ি সব ঠিক ঠিক আছে। আলনার জামা কাপড়ও নিখুঁত গোছানো। ভীষণ ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন তিনি। কোথায় গেল ছেলেটা?

রান্নাঘরে ঢুকে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন হেমাঙ্গাবাবু। ছেলেটা উনুনের কাছটিতে উবু হয়ে উপাসনার ভঙ্গিতে বসেছে। ডেকচিতে টগবগিয়ে ভাত ফুটছে, ডেকচির ওপর ঝুঁকে পড়ে পলকহীন চোখে দেখছে সেই দৃশ্য। হেমাঙ্গাবাবুর পায়ের শব্দেও হুঁশ হোল না ওর। ততক্ষণে ওর উদোম পিঠখানার ওপর নজর পড়েছে হেমাঙ্গাবাবুর। হাড় জিরজিরে পিঠে একাধিক কাটা দাগ। বেশ তাজা এবং গভীর। কেউ সজোরে বেত দিয়ে মারলে ওরকম দগ্‌দগে দাগ হতে পারে।

'সরে বসো। ভাত বোধ করি হয়ে গেছে।'

হেমাঙ্গবাবুর কথায় চমকে মুখ ফেরালো ও। সরে বসলো একটুখানি।

'এতক্ষণ আয়েস করে চান করা হচ্ছিল বুঝি?'

কোনও কথা না বলে ডেকচি মাটিতে নাবিয়ে হেমাঙ্গবাবু দুটো শান্‌কিতে ঢাললেন ফুটন্ত ফেনা ভাত। বড় শান্‌কিটা এগিয়ে দিলেন ছেলেটার দিকে। দুটো আলু দিয়েছিলেন ভাতে। ছুলতে বসলেন ওগুলো। দুটো চীনেমাটির প্লেট তৈরী রেখেছেন আলুসেদ্ধ রাখার জন্য। একটু তেল- নুন নিয়েছেন। একটা করে কাঁচালংকাও।

একসময় লড়াইটা শুরু হোল। লড়াই ছাড়া তাকে আর কিছুই বলা যায় না। ভাতের সংগে মানুষের সাপ-বেজির লড়াই।

সান্‌কির মধ্যে প্রথম আক্রমণটা চালিয়েই ও চকিতে সরিয়ে নিল হাত। যেন সান্‌কির মধ্যে শত্রুও সজাগ ছিল। সুযোগ পেয়েই মেরেছে এক মোক্ষম ছোবল। 'শালা হারামী।' কঁকিয়ে উঠলো ছেলেটা। আঙুলগুলো মুখে পুরে চুষতে লাগলো ত্বরিতে।

হেমাঙ্গবাবু আলু চটকাতে চটকাতে মৃদু গলায় বললেন, 'আস্তে খাও। ভীষণ গরম।'

একসময় অসাড় হয়ে এলো শত্রু। ছেলেটা কব্‌জায় পেয়ে ওকে গ্রাস করতে লাগলো উন্মত্ত আক্রোশে।

হেমাঙ্গবাবু মানুষের এমন খাওয়ার ধরন আগে কোনও দিন দেখেন নি। পুরো প্রক্রিয়াটা দেখতে দেখতে হেমাঙ্গবাবুর মনে হোল, মানুষ নয়, কোনও বিদ্‌ঘুটে প্রাণী বুঝি শিকার করা জন্তুর মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে। কিংবা এ কোনও প্রাণীর খাদ্য গ্রহণই নয়। বুঝি কোনও অসামাজিক প্রক্রিয়া।

দু'চোখে তীব্র রশ্মি জ্বেলে প্রথমে সান্‌কির খাদ্যগুলোকে অসাড় করে দেওয়া। তারপর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেগুলো ঝটিতি বয়ে নিয়ে যাওয়া। গোঁফ-দাড়িগুলো যেন এক বিবর্ণ জংগল। তার মধ্যে এক বিশাল গুহা। খাদ্যসহ যান্ত্রিক হাত ওখানে পৌঁছলেই গহ্বরের বিশাল মুখ আপসেই খুলে যায়। মুহূর্তে খাদ্যগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় গুহার মধ্যে।

এইভাবে দিনভর দুনিয়ার তাবৎ খাদ্যবস্তু যেন সঞ্চিত হচ্ছে ওর গহ্বরে।

গ্রাসকতক খেতে না খেতেই বাইরে কান্নার রোল উঠলো।

ছেলেটা খাওয়া থামিয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগলো সেই আওয়াজ। দু'চোখ তেরচা করে বিঁধিয়ে দিল সদর দরজার গায়ে। কোটরের মধ্যে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ অস্থির হয়ে উঠলো বারকয়েক। আচমকা খাওয়ার গতিটা দ্বিগুণ করে দিল সে। প্রাণপণে গিলতে লাগলো সান্‌কির ভাত।

খানিকবাদে ছেলেটি মুখ তুললো। বাইরে তখন অজস্র এলোমেলো পায়ের আওয়াজ। অনেক ক্ষীণ গলার আকুতি।

ছেলেটি ভয়ার্ত্ত চোখে শুধালো, দরজার খিলটা বেশ শক্ত, তাই না?

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হয়ে শুধালেন, কেন বলতো?

'বলছিলাম, যদি ভেঙ্গেটেঙ্গে ঢুকে পড়ে?'

সানকিতে কয়েক মুঠো ভাত নিয়ে সন্ত্রস্ত মুখে বার বার উঁকি মারছিল সে দরজার দিকে।

হেমাঙ্গবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ওরা ঢুকতে পারবে না। তুমি খাও।

সানকিটা চেটেপুটে খেলাও। আঙুলগুলো চুষে চুষে ফ্যানের শেষ স্বাদটুকু নিল। হেমাঙ্গবাবুর মনে হচ্ছিল, ফ্যান নয়, যেন রক্তের স্বাদ পাচ্ছে ও।

খাওয়ার পর হেমাঙ্গবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মাথার ওপর তামাটে রঙের আকাশ। ঝলা বাতাসে মাঠঘাট ঝলসে দেয়। দূরে দূরে মাকড়া পাথরের ডিহিগুলো পুড়ছে নিঃশব্দে। কেঁদগাছের পাতা বিবর্ণ। দিগন্তের গায়ে গায়ে সারবন্দী আগুন জ্বলছে যেন, তালে তালে নাচতে নাচতে সে আগুন কখনও এগোয় কখনও পেছোয়।

হেমাঙ্গবাবু নিজের ঘরে এসে বসলেন। ছেলেটা বসে রইলো দাওয়ায়। খাদ্যের সংগে দীর্ঘ সময় লড়াই চালিয়ে ও এখন বিধ্বস্ত, পরিশ্রান্ত। হেমাঙ্গবাবু আর ওকে ঘাঁটালেন না।

বিছানায় বসে বসে আজকের ঘটনাটাই ভাবছিলেন হেমাঙ্গবাবু। ছেলেটার খাওয়ার দৃশ্যটা নাচছিল চোখের সামনে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যাচ্ছিল মন।

বললেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

সরাসরি সে কথার জবাব দিল না ছেলেটা। বললো 'আমি এ শহরে থাকি না।

দিনভর আকাশ জুড়ে একটা পাটল বর্ণের মেঘ। কোঁ-কোঁ করে কাঁদতে থাকে ডোমচিল।

—ইঁদুরে নাকি গাছের ছাল খুবলে খাচ্ছে? বাঁশ ঝাড়ে নাকি ফুল ধরছে অগাধ?

—তাই নাকি? হেমাঙ্গবাবু এসবের খোঁজ রাখেন না মোটেই।

—হ্যাঁ। ঝুড়ি ভরে তাই নিয়ে যাচ্ছে মানুষ। ঢেঁকিতে কুটে খাচ্ছে।

—হবেও বা।

—সন্ধ্যের পরপরই পালে পালে শেয়াল এসে ঢুকে পড়ে এই শহরে।

এটাও জানা ছিল না হেমাঙ্গবাবুর। তিনি কোনও জবাব দেন না।

ছেলেটা বসে বসে আরও অনেক কথা বলে চলে। সব কথা কানে ঢোকে না। তিনি শুধু নিশ্চল বসে থাকেন।

ছেলেটা কথা বলতে বলতে এক সময় উদাস হয়ে যায়। আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ে দেওয়ালের গায়ে। ক্লান্তি কিংবা আয়েসে চোখদুটো নরম হয়ে আসে। পাঁচিলের ওপারে পড়তি বিকেলের ভাজা ভাজা আকাশ। দু'এক চিলতে হাল্কা মেঘ দিগন্তের গায়ে।

ছেলেটা একদৃষ্টিতে আকাশ দেখতে থাকে বুঁদ হয়ে।

ছুটির দিনে খাওয়ার পর হেমাঙ্গবাবু একবার বেহালা নিয়ে বসেন। আজ মনটা বড় অস্থির। তবুও কোণের তাক থেকে বেহালাটা টেনে নিলেন কোলের ওপর।

'বেহালা বাজাবেন?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়েন হেমাঙ্গবাবু।

'বাজান।'

হেমাঙ্গবাবু আস্তে আস্তে ছড় বুলোতে লাগলেন তারে। একটা বিলম্বিত করুণ সুর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে।

হেমাঙ্গবাবু ক্রমশ ডুবে যেতে লাগলেন সুরের গভীরে। তাঁর প্রশস্ত ললাটে একটা নিটোল প্রশান্তি ফুটে উঠলো ধীরে ধীরে।

ছেলেটি স্থির শান্ত চোখে দেখতে থাকলো ছড়ের অস্থির আনাগোনা।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুললেন হেমাঙ্গবাবু। ছেলেটা খাটের গায়ে হাত ঠেকিয়ে মাটিতে উবু হয়ে বসেছে। মাথাটা ঠেকিয়ে দিয়েছে খাটের বাজুতে।

হেমাঙ্গবাবুর চোখেমুখে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ছাপ। বেহালাটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি।

বেলা পড়ে গেছে। পশ্চিম আকাশের অস্তমিত সূর্যের ম্লান আলো জানালা টপ্‌কে সারা বিছানাকে গৈরিক করেছে। এতক্ষণে তাকালেন তিনি ছেলেটির দিকে।

'পূরবী!' গাঢ় কন্ঠে বললো ছেলেটি।

হেমাঙ্গবাবুর চোখে মুখে উচ্ছ্বাস।— তুমি রাগ বোঝ?

'বুঝি।' আত্মস্থ গলায় বললো ছেলেটি, 'আমি গানও গাই।'

'বলো কি!' হেমাঙ্গবাবু আর বিস্ময় চাপতে পারেন না। 'কই, গাও তো দেখি একখানা গান।'

এক মুহুর্ত্ত কি যেন ভাবলো ও। তারপর বললো, 'একখানা পূরবীই গাই।' হেমাঙ্গবাবু চোখের মণিজোড়া তাক করে বসে থাকেন। জবাব দেন না কথার। দু লাইন চিঁ চিঁ করে গাইলো ও। তাকে গান না বলে গোঙানিও বলা যায়।

তারপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'রান্না চাপাবেন না?'

'কেন?' চমকে ওঠেন হেমাঙ্গবাবু।

'আমার ভীষণ ক্ষিদে পাচ্ছে যে।'

'এক্ষুনি?'

'চান করলে আর গান করলে আমার ভীষণ ক্ষিদে পায়।'

হেমাঙ্গবাবুর সর্বাঙ্গ সহসা কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর কথায়।

নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে বললেন, 'তুমি তো দেখলেই, শেষ চালটুকুও তখন ঢেলে দিলাম তোমার জন্যে।'

'আর নেই?'

নিরুপায় মাথা নাড়েন হেমাঙ্গবাবু।

ছেলেটা বেশ কিছুক্ষণ থম্ মেরে বসে রইলো। তারপর নীচু গলায় শুধোলো, 'কি হবে বলুন তো?'

'কিসের?'

'এই আমাদের? সবাইয়ের?'

হাত তুলে বিশ্ব চরাচর দেখালো ছেলেটি, 'আমরা যে পাকা ফলটি হয়ে গেলাম। কখন যে টুপ করে ঝরে যাবো!'

হেমাঙ্গবাবুর স্মৃতির মধ্যে চকিতে সেই কৈশোরের চিত্রটা হাঁকুপাঁকু করে।

একসময় ধপ্ করে বসে পড়লো ছেলেটা। চাপা গলায় বললো, 'শুনুন, আপনার সঙ্গে কিছু জরুরী আলোচনা আছে আমার।'

হেমাঙ্গবাবু পরিপূর্ণ চোখে ওর দিকে তাকালেন।

'দেখুন, আমি আর বাঁচবো না। বড় জোর আর দু'দিন। কিন্তু মরার আগে আমি একটা কাজ করে যেতে চাই।'

'বলো।'

'আমি একজনকে মেরে ফেলতে চাই।'

আঁৎকে ওঠেন হেমাঙ্গবাবু — 'কাকে?'

'এমন একজনকে যার মরার সময় হয় নি। যার এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে। যে দড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ক্ষিদে বাড়ায়।'

'কেন?'

'ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো ওপারে। ও আমার সাথে সাথে থাকবে ছায়ার মতো।' ছেলেটির মুখে এক চিলতে চালাক চালাক হাসি ফুটে উঠলো, 'তাহলে আমার আর ক্ষিদে পাবে না।'

ক্রমশঃ সন্ধানী বেড়ালের মতো হয়ে এলো ওর চোখ মুখ। বললো, 'আমি রোজ দরজায় ঘা মেরে মেরে তেম্‌নি একজনকে খুঁজছি। আজ আপনার দরজায় ঘা মেরেছিলাম ঐ একই কারণে। দরজাটা খুলে গেল।'

হেমাঙ্গবাবুর কানে তখন সব কথা ঢুকছিল না। তিনি তখন তাঁর সারা মুখে, চোখে গলার স্বরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কত কিছু। বদ্ধ উম্মাদ নয়তো?

ছেলেটা আচমকা শুধিয়ে বলে, 'আচ্ছা দুর্ভিক্ষ কেন হয়, বলুন তো? আপনার কি ধারণা?'

'আমার ধারণা?' হেমাঙ্গবাবু অনিশ্চিত চোখে তাকান, 'আমার ধারণা জেনে কি লাভ?'

'দেখবো আমার ধারণার সঙ্গে মেলে কি না।'

'তোমার ধারণাটা কি শুনি?'

'আমার তো ধারণা, —আপনার জন্যই দুর্ভিক্ষ হয়।'

'আমার জন্যে?' বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন হেমাঙ্গবাবু।

'আলবৎ।' গর্জ্জে উঠলো ছেলেটা। 'অমন অবেলায় বেহালা বাজালে দুর্ভিক্ষ হবে না? আপনি জানেন না, বেহালার সুরে বাঁশের ঝাড়ে ফুল আসে? আর ইঁদুরে গাছের ছাল খুবলে খুবলে খায়?'

বলতে বলতে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলো ও।

'দেখুন তো, আমার কেমন ক্ষিদে পেয়ে গেল। আমি এখন কি খাই?'

ছেলেটা সারা ঘরে আঁতিপাঁতি চোখ চারায়। কিছু খুঁজতে থাকে।

হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলো ও। সূর্য্যি ডুবে গেছে। চারপাশ থেকে গুঁড়ি মেরে মেরে নেবে আসছে অন্ধকার। দু'চোখে নিদারুণ বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে ও তাকালো হেমাঙ্গবাবুর দিকে। শুধালো, 'কতদিন বেহালা বাজাচ্ছেন আপনি?'

আচমকা এমন প্রশ্নে বিমূঢ় চোখে তাকালেন হেমাঙ্গ বাবু। বললেন, 'অনেক দিন। প্রায় সারা জীবন।'

'বেহালা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেলে কেমন আওয়াজ বেরোয় শুনেছেন কোনও দিন?' ছেলেটা তির্যক দৃষ্টিতে শুধালো।

হেমাঙ্গবাবু ভয়ে আশঙ্কায় আচ্ছন্নের মতো মাথা নাড়েন।

'আমি শুনেছি'। ও ফিসফিস্ করে বলতে লাগলো, 'প্রচণ্ড আক্ষেপে পাহাড় ফেটে চৌচির হলে ধরিত্রির বুকে যখন সৃষ্টি হয় গভীরতম খাদ, তখন চরাচর কাঁপিয়ে যে প্রলয়ের আওয়াজ ওঠে, বেহালা ভাঙ্গার আওয়াজটা অনেকটা সেই রকম।

হেমাঙ্গবাবু যেন মুহূর্তে বোবা বনে যান।

ছেলেটি দু'পা এগিয়ে এলো। শীর্ণ হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হতে লাগলো বারবার।

'শুনবেন নাকি আওয়াজটা?' হেমাঙ্গবাবুর কানের কাছে মুখ নাবিয়ে এনে ছেলেটি লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে বললো, 'একটি বার?'

বলেই আচমকা দু'হাতে মাথার ওপর তুলে ধরলো বেহালাখানা। এবং হেমাঙ্গবাবু কিছু বুঝে উঠবার আগেই প্রচণ্ড জোরে আছাড় মারলো মেঝেতে।

ওর চোখেমুখে এক পাশবিক আনন্দ। একটা প্রতিশোধ নেবার উল্লাস! ফিসফিসিয়ে বললো, 'এবার এখানে মহাপ্রলয় শুরু হবে। এই পালঙ্কের ধার ঘেঁসে মেঝেখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এক্ষুনি। তার মধ্য দিয়ে তাণ্ডবনৃত্যে বয়ে যাবে এক রুদ্রস্রোতা নদী। পালান। যেদিকে দু'চোখ যায় পালান্।'

বলতে বলতে—

এবং অপরিসীম আক্রোশে খলখল হাসতে হাসতে ঘর থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও।

মুহূর্তে মিলিয়ে গেল আঁধারে।

সুন্দরবনে বাঘ দেখা

১.

পাখিরালা। তার পোশাকি নাম পাখিরালয়। অর্থাৎ কিনা, পাখির আলয়।

লঞ্চঘাটাতে কাঠের জেটি। জেটির দু'ধারে উঁচু রেলিং। জেটি পেরিয়ে উঁচু বাঁধ। বাঁধের ওপারে কাঁচা রাস্তা।

ভার্মা সাহেবের পুরো দলটা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে নদীটাকে দেখছিলেন। জেটির গায়ে ওঁদের সরকারি লঞ্চখানা দুলছিল।

বিকেল গড়িয়ে আসছে। চোখ ফেরালে দূরে দেখা যায় কালচেপানা সজনেখালি। ততক্ষণে আঁধার মাখতে শুরু করেছে সে।

এই শীতের মরসুমে এই অঞ্চলে টুরিস্টদের ভিড় মন্দ হয় না। নদীর জলে ভার্মা সাহেবদের লঞ্চটার কাছাকাছি আরও কয়েকখানা লঞ্চ।

বাঁধের গা ঘেঁসে যে কাঁচা রাস্তাটা, তার দু'পাশে গজিয়ে উঠেছে কিছু পান-সিগারেট, চা-তেলেভাজার দোকান। নেহাতই মরসুমী দোকান ওগুলো। লঞ্চ থেকে নেমে টুরিস্টদের দল এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকল করছে বাচ্চারা, পাশের পান-সিগারেট, লজেন্স-বিস্কুটের দোকান থেকে ললিপপ কিনছে। বয়স্করা চায়ের দোকানের কাঠের বেঞ্চিতে বসে চা-মামলেট খাচ্ছে। ভার্মা সাহেব জানেন, এরা আর অধিকক্ষণ থাকবে না। এদের একটা অংশ গিয়ে ডেরা পাতবে সজনেখালির টুরিস্ট লজে। বাকিরা যে-যার লঞ্চের মধ্যেই রাত কাটাবে কেবিনে। এসব লঞ্চে তেমন ব্যবস্থা থাকে।

ভার্মা সাহেব সঙ্গের মানুষগুলির দিকে তাকান। আপাত পরিতৃপ্ত মুখগুলির আড়ালে বুঝি সামান্য আশাভঙ্গের বিষাদ। অথচ সকালে যখন শুরু হয়েছিল যাত্রা, প্রত্যেকের মুখ চকচক করছিল খুশিতে। দুলতে দুলতে এগিয়ে চলছিল লঞ্চ। সারেঙয়ের কেবিনের সামনে কাঠের প্রশস্ত প্লাটফর্মের ওপর জাজিম পাতা ছিল। তাকিয়াও দু'তিনটে। তাতে এলিয়ে বসেছিলেন মিসেস ভার্মা, মিসেস চতুর্বেদী, মিসেস পালও। দু'পাশের সারবন্দী গার্ডেন-চেয়ারে বসে ছিলেন ভার্মাসাহেব, মিঃ অরবিন্দ চতুর্বেদী, দু'সাহেবের তিনটে ছেলেমেয়ে গায়ত্রী, রিংকি আর ডন। পালসাহেবের জন্যও নির্দিষ্ট ছিল চেয়ার, কিন্তু তিনি বসবার অবকাশ পাচ্ছিলেন না। অতিথিদের জন্য চা-কফি, প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন তিনি। সিঁড়ি বেয়ে ঘনঘন ওঠা-নামা করতে গিয়ে ঐ শীতের সকালেও কপালে, নাকের ডগায় বিন্দুবিন্দু ঘাম ....। ভার্মাসাহেব সর্বসমক্ষে

বার দু'তিন মিঃ পালের উদ্দেশে 'আজকের ট্রিপে আমাদের গার্জিয়ান এন্ড গাইড' বলে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই ট্রিপের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ঝক্কি তিনি অনুগ্রহ করে মিঃ পালের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর, মিঃ পাল, রাজ্য সিভিল সার্ভিসের একজন বিশ বছরের সিনিয়রিটিসম্পন্ন অফিসার, সারাক্ষণ চোখেমুখে এক ধরনের চৌকস ভাব ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। মিঃ ভার্মা যখন অতিথিদের সঙ্গে তাঁর ঘটা করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তেই তিনি বুঝেছেন, আজ তাঁকে সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি একেবারে নিশ্ছিদ্র করে তুলতে হবে। কেন কি, 'মিঃ পাল থাকলে আর আমাদের কোনই ভাবনা নেই, উনি একাই একশো' ... পিয়ন-চাপরাশীদের সামনে উচ্চারিত ভার্মাসাহেবের স্তুতিবাক্যগুলি সারাক্ষণ চরকার মতো ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ তুলেছে মিঃ পালের মগজে। আর, তার ফলে, মিউজিক-সিস্টেমে মৃদু সেতার বাজতে শুরু করেছে রবিশঙ্করের, উচ্চাঙ্গের প্রাতরাশ, ফিনফিনে পোর্সিলিনের প্লেটে, ...তৎসহ চা-কফি, কাজু ...., এবং বেলা সামান্য চড়তেই মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য পেপসি, এবং সাহেবদের জন্য দামি হুইস্কি। দেখতে দেখতে পুলকিত উচ্ছ্বসিত অরবিন্দ চতুর্বেদীর চোখদুটি চকচক করে উঠেছে বারবার। আজ ধামাকাটা জমে যাবে!

ভার্মাসাহেব জিভ কেটে বলেন, ছিঃ, ধামাকা বলে না। এটা একটা ইমপর্ট্যান্ট ট্যুর। সুনডোরবোনের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এর ওপর। প্রশ্নটা বাঁচা-মরার বলেই সম্ভবত মিঃ চতুর্বেদী সামান্য মনোযোগী হন, ব্যাপারটা একটুখানি বুঝিয়ে বল ইয়ার।

তখন কাজু সহযোগে হুইস্কি পান চলছিল। জাজিম-পাতা প্লাটফর্মের ওপর সুদৃশ্য ট্রে-তে হুইস্কির জোড়া-বোতল এবং মিনেরেল ওয়াটার, হাতে হাতে ফিনফিনে কাচের গ্লাসগুলি, ... রোদ্দুর পড়ে ঝিলিক মারছিল ওদের শরীরে। আর, মিঃ পালের ব্যস্ততা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। লঞ্চের নিচের তলা থেকে পারসে মাছ ভাজবার সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল নোনা হাওয়ায়। ভার্মাসাহেব মাঝেমাঝেই বলে উঠছিলেন, অ্যাতো ছোটাছুটি করছেন কেন, পাল? চেয়ার খালি রয়েছে, বসুন। এনজয় করুন। খুব গদগদ হাসিতে মুখ ভরিয়ে মিঃ পাল বলে ওঠেন, এনজয় তো করছি স্যার।

মিঃ চতুর্বেদী খুব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান মিঃ ভার্মার দিকে, সকলের এনজয় করবার ধরন তো একরকম নয়, ইয়ার।

—না, না, সবাই তো আমরা এনজয় করতেই এসেছি...। বলেই পরমুহূর্তে তা ভুলে গিয়ে মিঃ পালকে একটা ফরমায়েশ করে বসেন মিঃ ভার্মা।

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে ভার্মাসাহেব আজকের ট্যুরটার গুরুত্ব বোঝাতে থাকেন চতুর্বেদীকে। বলেন, এনটায়্যার সুনডোরবোনের টোট্যাল রিসোর্সেস, তার ল্যান্ড, ওয়াটার, ফ্লোরা, ফোনা, তার একজিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ... টেকেন টুগেদার ... একটা ইনটিগ্রেটেড প্রোজেক্ট ফর টোট্যাল ডেভেলপমেন্ট...ভার্মাসাহেব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন, একটা মিটিং ডেকেছি সজনেখালির টুরিস্ট লজে। যেসব গভর্মেন্ট-ডিপার্টমেন্ট-গুলো এই এলাকায় কাজ-টাজ করছে, সবাইকে ডেকেছি। সবাই মিলে একসঙ্গে ভাবতে হবে। একটা কনসার্টেড এফোর্ট চাই। আফটার ওল, একা-একা মানুষের ভালো করা যায় না। অ্যা সিঙ্গাল স্প্যারো কান্ট ব্রিং দ্য স্প্রিং।

মিসেস ভার্মা আর মিসেস চতুর্বেদীর মন ওসবে নেই। কতক্ষণ আর ঐসব ভারী ভারী আলোচনা চালাবে বাপু!

মিসেস চতুর্বেদী বলে ওঠেন, মানুষের ভালো করবার কথা বলছো, সুনডোরবোনে আবার মানুষও থাকে নাকি?

মিসেস পাল, পাশেই বসে রয়েছেন বটে, কিন্তু দুই মহিলা কেবল নিজেদের মধ্যেই গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন সারাক্ষণ। মিসেস পালের সঙ্গে কদাচিৎ কথা বলছেন। মিসেস পাল চুপটি করে বসে বোবার মতো শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা। মিসেস চতুর্বেদীর প্রশ্নটা শুনে কথা বলবার একটা সুযোগ পেয়ে যান বুঝি। বলেন, সে কি! সুন্দরবনে মানুষ থাকে না?

মিসেস চতুর্বেদী আকাশ থেকে পড়েন, আমরা তো চিরকাল শুনে আসছি, সুনডোরবোনে বাঘ থাকে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। শোনামাত্রই বাচ্চাগুলোর গা-ছমছম উচ্ছ্বাস, বাঘ দেখতে পাবো তো, আঙ্কল?

ভার্মাসাহেব মৃদু হেসে এড়িয়ে যেতে চান প্রসঙ্গটা। তাই দেখে মহিলাকুল নাছোড়বান্দা।

মিসেস ভার্মা ভ্রূসঙ্গমে অপরূপ ঢেউ তুলে বলেন, তুমি কিন্তু এদের কমিট করেছ। গ্লুকোন-ডি'র বিজ্ঞাপনের ঢংয়ে বলেন, য়্যু প্রমিস্‌ড...!

অরবিন্দ চতুর্বেদী হলেন ভার্মাসাহেবের ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে পড়াশোনা। একটা বিশাল প্রাইভেট কোম্পানির ভারী অফিসার চতুর্বেদী। বছর দুয়েক আগে কোলকাতায় বদলি হয়ে আসায় দু'বন্ধুতে একেবারে নরক গুলজার। চতুর্বেদীর স্ত্রী গায়ত্রীও কবে কবে খুব বন্ধু হয়ে গেছে মিসেস ভার্মার। সেই কারণেই জেলা সদরে বদলি হয়ে আসার পর থেকেই চতুর্বেদীকে তাড়া দিচ্ছিলেন ভার্মাসাহেব, চলে আয়, তোদের সুনডোরবোন দেখাবো। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। অ্যাতোদিনে সময় হলো ওদের।

স্ত্রীর মিষ্টি অনুযোগে খুব বিপাকে পড়ে যান ভার্মাসাহেব। হ্যাঁ, কমিট তো করেইছি। আসলে, বাঘ দেখা, ইন ফ্যাক্ট, আ ম্যাটার অব্ চান্স। আমি তো কম বার এলাম না..., বাট...।

—দেখেন নি? বাঘ? মিসেস চতুর্বেদীর দু'চোখে ভরাট কৌতূহল, —একবারও না?

ভার্মা সাহেবের চোখেমুখে চাপা অস্বস্তি। স্মৃতিতে প্রাণপণ হাতড়াতে থাকেন, —একবার...মনে হচ্ছে...দেখেছিলাম...এক লহমার জন্য...। চোখের ভুলও হতে পারে। আসলে, হোগলা-হেতালের ঝোপগুলোতে এমন গা মিশিয়ে থাকে ওরা,...ভুল হয়ে যায় দেখায়।

—দেখিস নি ভাবছিস কেন? আলবৎ দেখেছিস। অত পেসিমিস্টিক কেন তুই? সহসা চতুর্বেদী উত্তেজিত, —না দেখলেও ভাব, দেখেছিস। তুই কি জানিস, চোখের এই দেখা, না দেখার মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে থাকে? আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে তো বলেইছে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই চারপাশের যা-কিছু দেখছি আমরা, এই গাছ-গাছাল, হোগলা-হেতালের বন, এই নদী, আকাশ, তুই, আমি, সবই নাকি অলীক মায়া। কিছুই নাকি বাস্তবে নেই।

—তোর ঐ অলীক মায়ার তালিকায় কি গায়ত্রীও রয়েছে? নাকি স্রেফ তোতে-আমাতেই তালিকা শেষ?

—না, না ঠাট্টা নয়। চতুর্বেদী তিলমাত্র ঢিলে দিতে চান না। একেবারেই টানটান হয়ে থাকেন তিনি। —ব্যাপারটা ভাবতে গেলে...., সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই যে...।

—অ্যাই, অ্যাই অরবিন্দ্ , তোর হলোটা কি? হঠাৎ এমন দার্শনিক হয়ে উঠলি কেন?

—মাঝে মাঝে ওকে ফিলোসফিতে পায়। পাশ থেকে ফুট কাটেন গায়ত্রী।

—ফিলোসফিতে পায়? চতুর্বেদীকে সহসা তর্কে পেয়ে বসে। গায়ত্রীর দিকে কটমট করে তাকান, ...ফিলোসফিটা খারাপ জিনিস?

—খারাপ কে বললে? ভার্মা সাহেব বলে ওঠেন, সোপেনআওয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তিটা ইয়াদ কর, দর্শনচর্চা হলো, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত্রিতে একজন অন্ধ লোকের এমন একটি কৃষ্ণকায় বেড়াল খোঁজা, যে বেড়ালের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই।

—তাহলে তুই কি বলতে চাস যে, জীবনে দর্শনের কোনই মূল্যই নেই?

—থাকলেও, এখানে, এই ঘোর সুনডোরবোনে, সব দর্শনই মূল্যহীন।

—ঠিক। এখানে ব্যাঘ্র-দর্শনই একমাত্র দর্শন। পাশ থেকে পুনরায় ফুট কাটেন গায়ত্রী।

—রাইট, ভেরি রাইট। মিসেস ভার্মা সারা শরীর দুলিয়ে সায় দেন, —তোমার মিটিং ক'টায়?

—ডেকেছি তো একটায়। ভার্মাসাহেব হাতঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সময় দেখে নেন, —বোধ করি পৌঁছতে পারবো না।

—ওখানেই তো লাঞ্চ?

—হ্যাঁ, লাঞ্চ সেরেই মিটিংয়ে বসবো। দু'টো-আড়াইটে বাজবে।

লঞ্চ চলছিল ঢিমেতালে। হাওয়া বইছিল ফুরফুরিয়ে। চোখের সামনে দিয়ে ধীরলয়ে সরে সরে যাচ্ছিল প্রকৃতি। বাইনোকুলার ঘনঘন হাতবদল হচ্ছিল। ক্যামেরায় সাটার টেপা চলছিল ঘনঘন। হুইস্কির বোতলটা খুলতে খুলতে চতুর্বেদী বলেছিলেন, রাতে কি লঞ্চেই থাকছি?

—সেটা কিঞ্চিৎ রিস্কি আমার মতে। ভার্মাসাহেব বলেন, —পাখিরালায় জেলা পরিষদের বাংলো বুক করা রয়েছে। এবার তোমরাই ডিসাইড কর, লঞ্চে নাকি বাংলোয়।

—বাঘ নাকি সাঁতরে সাঁতরে চলে আসে লঞ্চে?

—নিঃশব্দে তার নির্বাচন করা শিকারটিকে নাকি তুলে নিয়ে যায়? অন্যেরা নাকি জানতেই পারে না?

—না বাব্বা, ...। খুব ভয় মেশানো আদুরে গলা মিসেস চতুর্বেদীর, —অত সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। বাংলোই ভালো।

—অবশ্য লঞ্চে থাকলে রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় বাঘ দেখবার সুযোগ থাকতো। চতুর্বেদী বলেন।

—চাঁদের আলো কই? ভার্মাসাহেবের চোখেমুখে টিটকিরি, কৃষ্ণপক্ষ চলছে। পূর্ণিমার ঢের দেরি।

—ক'দিন অপেক্ষা করে পূর্ণিমার দিনে এলেই হতো। মিসেস চতুর্বেদীর গলায় আক্ষেপ।

—ওরেব্বস! চোখ কপালে উঠে যায় ভার্মাসাহেবের, —ঐ সময়ে সরকারি লঞ্চ ফ্রি পাওয়া অসম্ভব।

—কেন?

—ঐ দিনগুলোতে ভি-ভি-আই-পিদের ট্যুর থাকে সুনডোরবোনে। তাদেরও তো এলাকার কিছু কিছু উন্নতি করতে সাধ যায়, না কী? ভার্মাসাহেব হো-হো করে হেসে ওঠেন।

মিটিংটা যতখানি সময় নেবে বলে ভাবা গিয়েছিল, ততটা সময় নিল না। একে তো সজনেখালি পৌঁছতে দুটো বেজে গিয়েছিল,...সুধন্যখালির ওয়াচ্-টাওয়ারে মহিলাকুল আর বাচ্চারা অনেকখানি সময় নিয়ে নিল, বাঘ না দেখে নামতেই চায় না কিছুতেই। বাঘ অবশ্য দেখা দেয় নি শেষ অবধি। দুঃখী দুঃখী মুখ করে বনবিভাগের যেসব রক্ষীরা প্রায় লুকিয়ে বসেছিল ওয়াচ-টাওয়ারের ঘেরাটোপে, তাদের থেকেই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান মিসেস ভার্মা আর মিসেস চতুর্বেদী।

—তোমরা কি এখানেই থাকো?

—দিনের বেলায় এখানে, রাতের বেলায় লঞ্চে।

—রাতে বাড়ি ফেরো না?

লোকগুলোর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তাও বিড়বিড় করে জানায়, তাদের বাড়ি অনেক দূরে। কারো মুর্শিদাবাদে, কারো বা বীরভূমে কিংবা মেদিনীপুরে।

—বাড়ি যাও না?

—মাসে একবার যাই, মাইনে পেলে।

—এদের কী মজা! বাচ্চাগুলো কলকলিয়ে ওঠে, —রোজ বাঘ দেখতে পায়।

মিসেস চতুর্বেদী শুধোন, তা...ই! রোজই বাঘ দ্যাখ তোমরা?

লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মিসেস চতুর্বেদীর দিকে। গলায় খুব উষ্মা ফুটিয়ে বলে, আমরা বাঘ দেখতে চাই নে।

—ও মা, কে...ন? বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে তোলেন মিসেস ভার্মা।

ওরা জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে। চোখে-মুখে চাপা বিদ্বেষ জমে।

ভার্মাসাহেব ইংরেজিতে প্রাঞ্জল করেন ব্যাপারটা। আসলে, নিজের চাকরিটাকে খুব কম লোকই ভালোবাসতে পারে। এদের চাকরিই হলো, বাঘ দেখা।

একসময় ওদের একজন সামান্য অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, বেশ আমরা বসেছিলাম চুপচাপ, আপনারা এসে সোরগোল তুললেন, ...বাঘেরা জেনে গেল, এই টাওয়ারের ওপর মানুষ রয়েছে। আপনারা তো একটুন বাদে চলে যাবেন, আমাদের বিপদ গেল বেড়ে।

বলতে বলতে লোকটা খুব দুঃখী-দুঃখী হাসলো।

সজনেখালিতে পৌঁছতে পৌঁছতে লাঞ্চ প্রায় ঠান্ডা হওয়ার উপক্রম। কাজেই, লাঞ্চটা সেরে নিয়ে মিটিং করতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। টুরিস্ট-লজের কোনও ঘরে একটুখানি গড়িয়ে নিতে চাইছিলেন মহিলারা, কিন্তু সে সময় আর পেলেন না। শীতের বেলা। সাড়ে-তিনটের মধ্যে বেরোতে না পারলে পাখিরালা পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে।

২.

জেলা পরিষদের বাংলোতে, গ্রীলঘেরা প্রশস্ত বারান্দায় বেশ জুত করে বসেছেন সবাই। যে লোকটা ট্রে-তে করে জল নিয়ে এল, ভার্মাসাহেব দেখেই বোঝেন, কেয়ার-টেকার নয় সে। কেয়ার-টেকারকে চেনেন তিনি। ইতিমধ্যে দু'চার বার এসে থেকেছেন এই বাংলোতে। জেরা করে বুঝতে পারেন, কেয়ার-টেকারের মাসতুতো ভাই। বাজিতপুরের দিকে বাড়ি। শীতের মরসুমে সাহেব-সুবোদের ভিড় বাড়ে বাংলোতে। রান্নাবান্না, চা-জলখাবার, বিছানা পাতা, ফাই-ফরমায়েশ, ...কেয়ার-টেকার একা সামাল দিতে পারে না। মাসতুতো ভাইটিকে সেই কারণেই ডেকে নিয়েছে মাস-দুয়েকের তরে।

গ্লাসভর্তি ট্রে-খানা সেন্টার-টেবিলে সসম্ভ্রমে নাবিয়ে দিয়ে ধীরপায়ে চলে যায় লোকটি। একটুবাদে ট্রে-তে করে চায়ের কাপ আর কাজুর প্লেট নিয়ে পুনরায় হাজির হয়।

লোকটাকে খুব নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন ভার্মাসাহেব। খুব যান্ত্রিক হাতে প্রত্যেকের সামনে চায়ের কাপ সাজিয়ে দিচ্ছিল সে। মুখের অসংখ্য জটিল রেখায় ভাঙচুর হচ্ছিল ঘনঘন। এই ধরনের মানুষেরা খুবই মিস্টিরিয়াস হয়। আপাত ভাবলেশহীন মুখ দেখে ভেতরের জোয়ার-ভাঁটা আন্দাজ করা যায় না তিলমাত্র।

এক টুকরো কাজু প্লেট থেকে তুলে নিয়ে অলস দাঁতে কাটতে কাটতে ভার্মাসাহেব শুধোন, নাম কি?

লোকটা জবাব দেয় না। কী যেন ভাবতে থাকে। এদিক-ওদিক তাকায়। একসময় খুব অস্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করে, রতিকান্ত।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাহেব-মেমসাহেবরা সমবেতভাবে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। ভার্মাসাহেব হাসেন নি। অধস্তনদের সামনে এমন কথায় কথায় হেসে ওঠা তাঁকে মানায় না। বরং আচমকা এমন সমবেত খ্যা-খ্যা হাসিতে তাঁর সযত্নলালিত ব্যক্তিত্বের বলয়টিতে সামান্য টোল পড়ে বুঝি। এক ধরনের অস্বস্তি ফুটে ওঠে সারা মুখে।

নাম বলবার সঙ্গে সঙ্গেই হুজুরেরা অমন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন কেন, রতিকান্তর মগজে তা ঢোকে না বুঝি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। মনে মনে ভয় পেয়ে যায়।

—কত মাইনে পাও? চতুর্বেদী খুব তাচ্ছিল্য সহকারে শুধোন।

সহসা খুব উদাস হয়ে যায় রতিকান্ত। খুব ধীরলয়ে মাথা দোলাতে থাকে দু'দিকে, মাইনা টাইনা পাই না।

চতুর্বেদী প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন। সরকারি প্রশাসনের অন্ধিসন্ধি তাঁর একেবারেই অজানা। একটা লোক বিনে মাইনেতে কেন কাজ করে, সেটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। বলেন, মাইনে ছাড়াই কাজ কর তুমি?

ভার্মাসাহেবকে বাধ্য হয়েই নাক গলাতে হয়। ইংরেজি ও হিন্দি সহযোগে তিনি চতুর্বেদীকে বুঝিয়ে দেন, কেমন করে মাইনে ছাড়াও সরকারি প্রশাসনে কত কিসিমের ইনসেনটিভ চালু রয়েছে এদের জন্য। কেমন করে মাইনে না দিয়েও প্রায় সম পরিমান

অর্থ একজন মানুষকে পাইয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু চতুর্বেদীর মাথায় সহজে ঢুকতে চায় না সে অঙ্ক। ভার্মাসাহেব নাচার হয়ে বলেন, ধর, এই যে আমরা চা খাবো এখানে, এই লোকটাই বানালো, পরিবেশন করলো। দশ কাপ চা, বাজারদরেই দাম নেবে। লাভ রইল অর্ধেক। ধর, রাত্তিরে এই বাংলোয় যারা থাকে, খায়, তাদের রান্নাবান্না করে দিল। মিলপিছু দর ধরলে বেশ কিছুটা নাফা থাকে। নিজের খাওয়াটাও ঐ সঙ্গো হয়ে যায়। তারপর ধর, বাংলোর পর্দা, চাদর, তোয়ালে, লেপ-বালিশের ওয়াড়, ইত্যাদি কেচে, ধুয়ে ইস্ত্রী করে নিল এরাই, লন্ড্রীর দরে বিল করলো। বাংলোর ভেতরে ঝোপ-আগাছা সাফ করলো, লনের ঘাস ছাঁটলো, লেবার চার্জ বাজারদরে ওরাই পেল। এছাড়া, বখশিস বাবদ সদাসর্বদা টাকাটা সিকিটা তো রয়েছেই।

আলোচনাটা প্রায় গবেষণার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে দেখে বাদ সাধেন মিসেস ভার্মা। —হয়েছে, হয়েছে, অফিসের কিস্যা থামাও। সারাক্ষণ শুধু অফিসের কথা! এমন কাজপাগল মানুষ জন্মেও দেখি নি বাবা! বলতে বলতে আহ্লাদে মাখো-মাখো হয়ে আসে মিসেস ভার্মার মুখ। বলেন, তার চেয়ে ওকে শুধোও না, এই এলাকায় বাঘ রয়েছে কিনা। এরা তো বারোমাস তিরিশ দিন থাকে, বলতে পারবে ঠিক ঠিক।

ভার্মাসাহেব এক ঝলক দেখেন রতিকান্তকে। শুধোন, বাড়িতে কে কে আছে?

আবার ভাবতে বসে রতিকান্ত। চোখেমুখে এমন অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে, যেন এই প্রশ্নটার জবাবের জন্য তাকে স্মৃতির ভাণ্ডারটিকে হাতড়াতে হচ্ছে। একটুবাদে ফিসফিসিয়ে বলে, বউ...বাচ্চা...।

—জমি-জিরেত রয়েছে?

রতিকান্ত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সাহায্যের আশায় চারপাশে আলুথালু তাকায়। শেষে সারা মুখে প্রায় নাক ঝাড়বার মুদ্রা ফুটিয়ে বলে, নাহ্।

—চলে কেমন করে?

রতিকান্ত কেমন যেন ডুবে যেতে থাকে নিজের মধ্যে। ডুবেই থাকে অনেকক্ষণ। একসময় ভুস করে ভেসে উঠে বলে, চলে না।

বাংলোর আসল কেয়ার-টেকার হরিপদ। জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে হাজির হয় এতক্ষণে। সমবেত জেরার হাত থেকে ও-ই বাঁচায় রতিকান্তকে। বলে, যাহ্, যাহ্, মুরগিটা কেটে ফ্যাল্ দি'নি।

রতিকান্ত ধীরপায়ে চলে যায়।

—আজ কী রাঁধবে, হরিপদ?

নিজের নামটা সাহেবের অমন ঠিকঠাক মনে আছে, এতেই বুঝি কৃতার্থ হয়ে যায় হরিপদ। গদগদ গলায় বলে, মুগের ডাল, পোটাটো চিপ, মটর-পনির, চিকেন, চিংড়ির মালাই-কারি, আর সালাড, হুজুর। ভাত, চাপাটি দুইই থাকবে' নি।

হরিপদকে ভারী সাদামাটা লাগে সকলের। কোনও মারপ্যাঁচ নেই কথাবার্তায়, অভিব্যক্তিতে। কোনও মোচড় নেই গলার স্বরে। অমন মানুষের প্রতি বড় একটা মনোযোগ দিতে চায় না কেউই। কাজেই, হরিপদকে ছেড়ে ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় সবাই।

শীতটা যতখানি পড়বে ভাবা গিয়েছিল, ততটা পড়ে নি। খাওয়া-দাওয়ার পর সামনের গ্রীলঘেরা বারান্দায় প্রাক-শয্যা গুলতানি। টুথপিক দিয়ে দাঁতের মধ্যেকার মাংসের কুচিগুলিকে নিপুণ হাতে বের করে আনছিলেন ভার্মাসাহেব। এমনি সময়ে রতিকান্ত আসে।

মিসেস চতুর্বেদীর ফরমায়েশ মতো জলের জাগ আর গ্লাস এনে সামনের সেন্টার-টেবিলে নাবিয়ে দেয়। চলে যেতে চাইছিল, চতুর্বেদীই থামান ওকে। —রতিকান্ত, শোন।

রতিকান্ত থমকে দাঁড়ায়। তখন লোডশেডিং চলছে। হ্যারিকেনের তেরচা আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ডানদিকে। বাঁ দিকটায় নিকষ অন্ধকার। সব মিলিয়ে রতিকান্তর মুখখানাকে বড়ই রহস্যময় লাগে।

ভার্মাসাহের আর চতুর্বেদী, সারা সন্ধে বেশিমাত্রায় পান করেছেন দুজনেই। ওদের সসম্ভ্রমে সঙ্গ দিয়েছেন পালসাহেব। বাংলোয় দু'খানা মাত্তর ঘর। কাজেই, পালসাহেবের থাকবার ব্যবস্থা লঞ্চে। রাতের খাওয়া সেরে পালসাহেব সস্ত্রীক চলে গিয়েছেন লঞ্চে। হরিপদ ওঁদের পৌঁছাতে গিয়েছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও বাড়ছে। কনকনে হাওয়া বইছে। উত্তুরে হাওয়া। গ্রীলঘেরা বারান্দায় বসে ঢুলুঢুলু চোখে বাইরেটা দেখতে থাকেন চতুর্বেদী। বলেন, কী নির্জন লাগছে, তাই না?

ভার্মাসাহেব ঢুলুঢুলু হাসেন।

—এদিকে গ্রাম-ট্রাম নেই? লোকালয়?

—নাহ্। এই ঘোর জঙ্গলে আর গ্রাম কোথায়? ভার্মাসাহেব অনুমোদনের আশায় তাকান রতিকান্তর দিকে, ...কী হে, গ্রাম-ট্রাম আছে নাকি এদিকে?

—আছে তো। খুব নির্লিপ্ত জবাব রতিকান্তর।

—আছে? ক'টা?

—চারপাশেই রয়েছে হুজুর।

—তাতে মানুষ থাকে?

—থাকে বৈকি। অনেক মানুষ থাকে।

—কী বলছো? ভার্মাসাহেব রতিকান্তর প্রতি সামান্য বিরক্ত বুঝি,...আমি তো কতবার এসেছি এদিকটায়, একটা গ্রামও তো নজরে পড়ে নি। খালি তো জঙ্গল আর জঙ্গল। গ্রাম কই? মানুষ কই?

রতিকান্তর সারা মুখে আলোআঁধারি ছায়াখানি প্রকট হয়। চোখের মণিজোড়া সামান্য জ্বলে ওঠে। খুব চেরা গলায় বলে ওঠে, মানুষ কী করে দেখবেন, হুজুর? সুন্দরবনে তো কেউ মানুষ দেখতে আসে না। মানুষ দেখতে চায়ও না।

—তবে? ভার্মাসাহেব ঢুলুঢুলু চোখে তাকান।

—সবাই বাঘ দেখতে আসেন, হুজুর। বাঘ।

বলতে বলতে দপ্ করে জ্বলে ওঠে রতিকান্তর চোখ। ক্ষণিকের তরে পশুর চোখের মতো নীলাভ হয় চোখের মণি।

এবং, ভার্মাসাহেবের মনে হয়, সুন্দরবনে এসে, বহুদিন বাদে, এই প্রথম, আচমকা বাঘ দেখে ফেলেছেন তিনি।